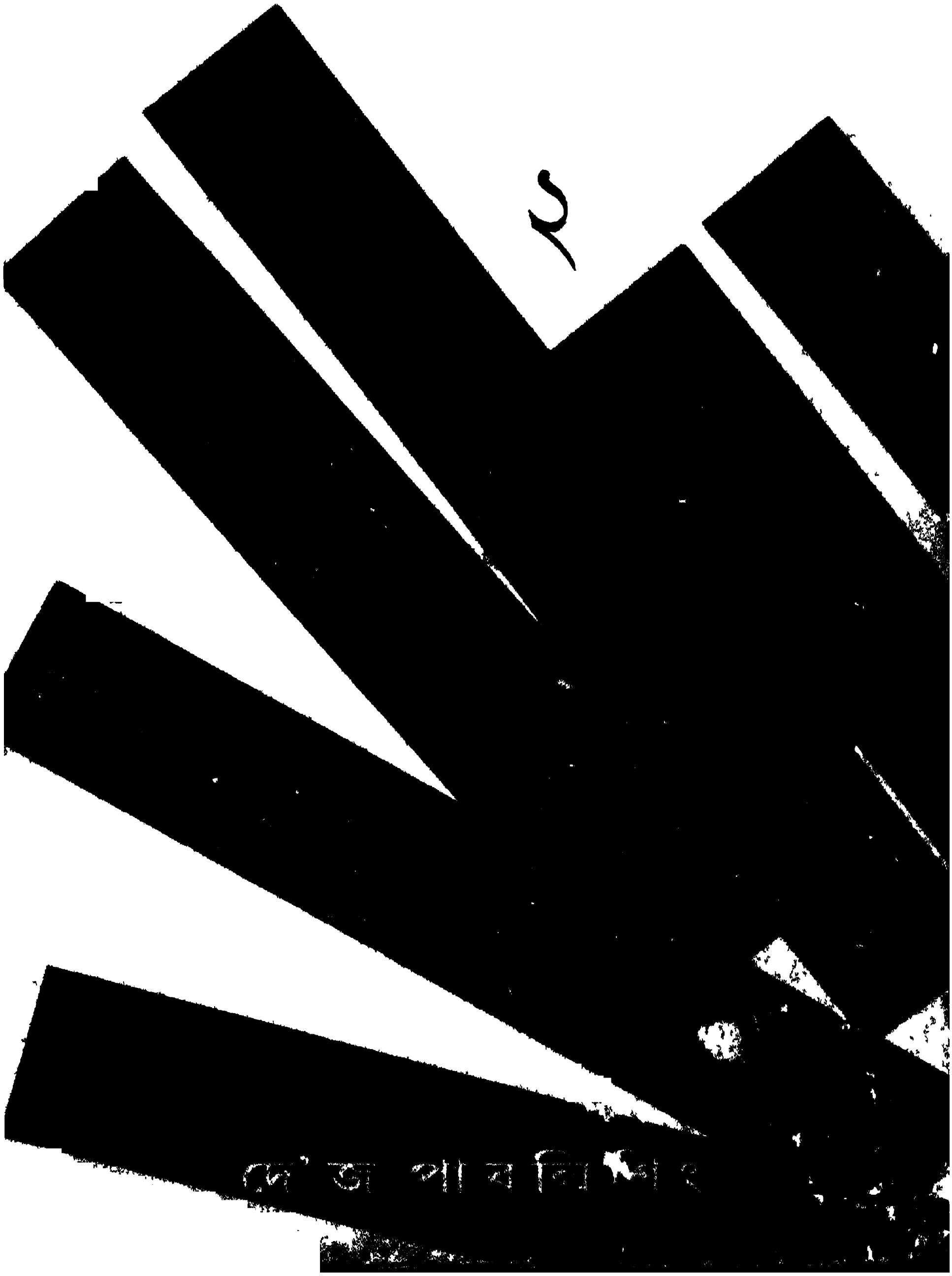
প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র

২



দে'জ পাবলিশি

প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র ২

প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড



সম্পাদনা ও ভূমিকা : ড. বিষ্ণু বসু

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

PRAFULLA ROY RACHANASAMAGRA (VOL II)
A Collected works of PRAFULLA ROY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs 250.00

প্রচ্ছদ · প্রণবেশ মাইতি

দাম : ২৫০ টাকা

ISBN - 81-295-0027-2

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন . অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩



কথাসাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

বাঘবন্দী
মেঘের কোলে রোদ
রচনা সমগ্র (১ম)
আধ ডজন চোর
মানুষের মহিমা
অতল জলের দিকে
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান
সম্পর্ক
এক নায়িকার উপাখ্যান
এই ভুবনের ভার
ইস্পাতের ফলা
আকাশের নীচে মানুষ
মানুষী
অদিতির উপাখ্যান
সাধ-আহ্লাদ
চরিত্র
যুদ্ধযাত্রা
দুই দিগন্ত
জন্মভূমি
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
আক্রমণ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
দায়বদ্ধ
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
স্বর্গের ছবি
একাকী অরণ্যে
বিন্দুমাত্র
শীর্ষবিন্দু
রাবণবধ পালা
তিনমূর্তির কীর্তি
ভালোমানুষ চোর
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
হীরের টুকরো
আমাকে দেখুন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
আমাকে দেখুন ৪ পর্ব একত্রে
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
আলোয় ফেরা
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১ম, ২য়
সিন্ধুপারের পাখি
নোনাজল মিঠে মাটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বনির্বাচিত গল্প
অনুপ্রবেশ
মোহর
ক্রান্তিকাল
ক্ষমতার উৎস
গল্প সমগ্র ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
মানবজীবন
ভাগাভাগি

প্রসঙ্গত

'আমি পূর্ব বাংলার একজন উদ্বাস্তু, এই বাংলায় পাকাপাকিভাবে এসেছিলাম সেই পঞ্চাশ সালে, ঢাকায় বাংলা ভাষা আন্দোলনের কিছু আগে। নিজে ছিন্নমূল বলে হয়তো ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে শরণার্থীদের পুনর্বাসন হয়েছে সব জায়গায় গিয়েছি। চতুর স্বার্থপর ক্ষমতালোভীর দল গদিতে চড়ার জন্য যে লক্ষ লক্ষ সরল নিষ্পাপ মানুষকে তাদের জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দিল, আমার সেই স্বদেশবাসীরা কোথায় কিভাবে আছে তা দেখার এক অদম্য জেদ সেই সময়টা আমাকে যেন পেয়ে বসেছিল—' এভাবেই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিশেষ সময়েব একটি বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছিল প্রফুল্ল রায়ের কোনো এক ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক লেখায়। একজন বিখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক একবার লিখেছিলেন সমষ্টি মানুষেব ট্র্যাজেডি হয না, তাদের হয় ডিজাস্টার (disaster)। ট্র্যাজেডি ঘটে একান্তই ব্যক্তি মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে। তাই ইতিহাসের বৃহত্তম একসোডাস-এর সংঘটনা আমরা দেখেছি স্বাধীনতা থেকে উপার্জিত বিভাগোত্তর বাংলায়, তার তুল্য ডিজাস্টার ইতিহাসে কমই ঘটেছে। শুধু ঘটেছিল নয়। এখনো ঘটে চলেছে। ইতিহাসের এ ট্র্যাজিক উল্লাস যেন নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়িয়েছে প্রফুল্ল রায়কে। তাই দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীর ঢল নেমেছিল সীমান্তের এপারে। পশ্চিম-বাংলা ছোট রাজ্য, তাব তেত্রিশ হাজার বর্গমাইল ভূ-খণ্ডের উপরে এসে পড়ল লক্ষ লক্ষ বাড়তি মানুষেব চাপ। এই ভারবহনেব শক্তি পশ্চিম বাংলার ছিল না। শরণার্থীরা তো শুধু এই রাজ্যের দায় নয়, সারা দেশেব। তাই পুনর্বাসনের জন্য বড় বড় সব প্রোজেক্ট তৈরি হল। ঠিক হল বেশ কিছু ছিন্নমূল কৃষিজীবী পরিবারকে পাঠানো হবে আন্দামানে ও দণ্ডকারণ্যে।

আন্দামান ও অন্যত্র ছিন্নমূল বাঙালিরা কী দুঃসহ অবর্ণনীয় পবিবেশের মধ্য দিয়ে নিজেদের পুনর্বাসিত করার প্রবল চেষ্টা চালিয়েছে তার কিছু আন্তরিক চলচ্ছবি প্রফুল্ল রায় প্রায় সাবাজীবন ধরে প্রকাশ করে গেছেন তাঁর নানা সময়ে লেখা গল্পে ও উপন্যাসে। এ বিষয়ে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন তাতে যে শুধু সমষ্টির বিপর্যয় ধরা পড়েছে তা নয়, ব্যক্তি জীবনেও তার দীর্ণ অতীত কোন গভীরতর মাত্রা পেয়েছিল এও তিনি প্রকাশ করে গেছেন দুরন্ত দক্ষতায়। রচনাসমগ্র-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে মূলত এ শ্রেণীরই চারটি উপন্যাস ও চারটি ছোটগল্প।

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে এ খণ্ডে সংকলিত রচনাসমূহের কিছু প্রাসঙ্গিক পরিচয় পেশ করা যেতে পারে। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসের পটভূমি আন্দামান। প্রফুল্ল রায় সেখানে গিয়েছিলেন ছিন্নমূল মানুষদের সঙ্গে। আন্দামানে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের নিয়ে এটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস। বেরিয়েছিল পাঁচের দশকের উপান্তে। তাতে তিনি মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে অবস্থিত দ্বীপে ছিন্নমূল মানুষগুলোর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কিছু ছবি পেশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'পুনর্বাসনের কাজ প্রথমে শুরু হয়েছিল সাউথ আন্দামানে। সেখানেই শহর পোর্ট ব্লেয়ার—এই দ্বীপমালার হেড কোয়ার্টার।' তারপর উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আন্দামানের আরো অন্য ক'টি দ্বীপে। এইসব হতভাগ্য কেন্দ্রচ্যুত দরিদ্র বিভিন্নজীবী বাঙালিদের রোপন করা হয়েছিল আন্দামানের নানা অঞ্চলে। তারই কঠোরতম জীবনচিত্র অভিব্যক্ত হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' ও আরো বেশ কিছু লেখায়। এ সব রচনা তাই বলে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের দলিল হয়ে থাকে নি, বরং হয়ে উঠেছে চিরকালের দুঃখসুখ-মথিত মানব মানবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবন্ত কথাচিত্র।

'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসটির কথাই ধরা যাক। এক সময় আন্দামান ছিল কালাপানির মাঝখানে ভয়ঙ্কর দ্বীপমালায় অপরাধীদের পেনাল কলোনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতাপের পরিচয়। শুধু দাগী আসামীরাই নয়, স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদেরও নির্বাসিত করা হত সেলুলার জেলে। তাই আদিম অধিবাসী জারোয়া, গ্রেট আন্দামানীজ ও ওঙ্গীদের সঙ্গী হিসেবে এখানে একসময়ে বসবাসে বাধ্য হয়েছিলেন ভারতের মূল ভূখণ্ডের নানা প্রদেশের মানুষজন। তাঁরা ইতিমধ্যেই এ অঞ্চলে একটি মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য প্রথম যুগে উত্তর আন্দামানের পেনাল কলোনির আয়ু ছিল মাত্র চার বছর। যেহেতু সেখানকার আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও স্যাঁতসেঁতে, মৃত্যুহার ছিল অস্বাভাবিক বেশি। কিন্তু বিদেশি শাসকদের হৃদয়হীনতাও যে সে বসতি বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি, আমাদের স্বদেশি ক্ষমতালোভীদের নির্লজ্জ হৃদয়হীনতা আবার সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল অন্য ধরনের এক পেনাল কলোনি, স্বাধীনতা লাভের প্রায় ন'বছর পর— উনিশ শ' ছাপান্ন সালে। প্রফুল্ল রায়ের ভাষায়, 'এবার আবেক অঙ্ক, আরেক দৃশ্য। এবার আর কয়েদি নয়, জাহাজ বোঝাই হয়ে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু এসেছে। উত্তর আন্দামানের নতুন ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব তাদেরই হাতে।' তারা হল 'নিঃস্ব ভীরু মৃতমুখ একদল মানুষ'। তারা নিত্য ঢালী রসিক শীল হরিপদ তিলি উজানী বুড়ি কাপাসীদের দল। এবং পাল সাহাব—যার কর্তব্যনিষ্ঠার ওপর ভর করে গড়ে উঠতে চলেছে বন কেটে বসত। চারদিকে নিবিড় অরণ্য, পদে পদে মৃত্যুভয়। কেউ জানেনা, পরমুহূর্তের পরিণতি কী হতে পারে, তবু তাদের বেঁচে থাকার অদম্য তাগিদ জীবনের আশ্চর্য রহস্যকে প্রতিষ্ঠিত করে চলে। মূল থেকে বিভক্ত হয়ে, ইতিহাস থেকে উৎপাটিত হয়ে, নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা রচনা করে চলে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাব্য। হয়তো ইতিহাসেব ঊষাকালে এভাবেই প্রাচীন মানুষদের দল গড়ে তুলেছিল বিবিধ জনগোষ্ঠী। আমাদের সভ্য সমাজ আবার একদল মানুষকে নিক্ষেপ করেছে নিষ্ঠুর এক আদিম জীবনযাপনের মধ্যে।

কিন্তু হার মানে নি কেউ। বোধহয় মানুষের জীবকোষের মধ্যেই নিহিত থাকে টিকে থাকার অপার রহস্য। তাই মাটি ও জঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রাম করে সমুদ্রবেষ্টিত এক দ্বীপের মধ্যে চলতে থাকে নতুন এক সমাজ গড়ে তোলার গভীর সাধনা। অকর্ষিত জমিকে উর্বরা করে তোলার চেষ্টা চলে, বাব বার বন এসে গ্রাস করে তাদের চাষের মাঠ, খরার প্রকোপে সরস মাটি তেজি রোদে শুকিয়ে যায়। এমনকি যে বুড়ো রসিক শীল সারাটা জীবন আবাদ করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে, মাটির মেজাজ সে বোঝে, মাটি কতখানি জল পেলে গর্ভিণী হয়ে ফসলের জন্ম দিতে পারে তা তার জানা—সেও কখনো হতাশ হয়ে বলে ওঠে, 'জমিন অহনও বীজ রুয়ার যুগ্য হয় নাই। মাটি আর কয়টা দিন জল খাউক। হের পরে দেখা যাইব।' এই প্রত্যয়— 'হের পরে দেখা যাইব'— এ বাক্য শুধু রসিকের নয়, নতুন অধিবাসী সকলের মনের প্রত্যয়।

সংসার তথা সমাজের স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষগুলোর মধ্যে দেখা দিয়েছে বিদ্বেষ হিংসা ঘৃণা শত্রুতা। প্রখর সংক্ষোভের মধ্যে ফেটে পড়েছে রিরংসা, কিন্তু এ সকল সামান্য উৎপাত অতিক্রম করে ক্রমে নির্মিত হয়েছে ভালবাসার বলয়, এসেছে যুবক-যুবতীদের মধ্যে মিলনের অদম্য কামনা। এসেছে প্রেম যার পরিণাম ঘটেছে পরিণয়ে। ভালবাসার এ বলয়ে বাঁধা পড়েছে শুধু যে বাঙালিরাই তা নয়। এসেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নরনারী। এমনকি তার বাইরেরও কিছু মানুষ। তাদের জন্য জান লড়িয়ে দেবার মতো আছে একজন— পাগলা পালসাহাব। 'পালসাহাব কে? পালসাহেব শুধু একটা মানুষ না। সে হল জীবন— জীবনের প্রতীক। এই দ্বীপের আশা-হতাশা, পাপ-পুণ্য, আনন্দ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যু— সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে সে।' প্রফুল্ল রায়ের পাঠকদের জানা আছে 'পালসাহাব' নিতান্ত একটি কল্পিত চরিত্র নয়, সে বাস্তব। তার আছে রক্তমাংসের অস্তিত্ব। তার সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই আন্দামানের এক দ্বীপে নির্মিত হতে পেরেছিল ভিন্নতর এক নতুন সমাজ। এ সমাজে সকল

বিচ্ছিন্নতাকে সরিয়ে দিয়ে জন্ম নিতে পারে নবীন মানবতা। এবং ভিন্নতর এ মানবিকতাকে যেন প্রতিষ্ঠা দিতেই প্রফুল্ল রায় উপন্যাসটির উপসংহারের কাছে এসে সৃষ্টি করেন এমন একটি পরিস্থিতি যা মানুষকে মহিমময় করে তোলে।

নিত্য ঢালীর মেয়ে উপসাগরের জলে ডুবে যাচ্ছিল। তার সুতীব্র চীৎকার 'বাচাও, আমারে বাচাও—' লা তে'কে সচকিত করে তুলল। 'দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাপাসীর শরীরটা জলের ওপর ভাসিয়ে রাখল লা তে। ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে ধরা।' কাপাসীকে আক্রমণ করতে আসছিল হিংস্র এক হাঙর। তারপর চলে মানুষে হাঙরে মরণপণ লড়াই। জলের হাঙরের মতো নিষ্ঠুর প্রাণীর তুলনা পৃথিবীতে কমই আছে। তবু লা তে পিছু হটে না। একটিমাত্র ছোরা সম্বল করে হাঙরের সঙ্গে লড়াই করে চলে সে। অনাত্মীয় এক রমণীর প্রাণ রক্ষার জন্য। দুনিয়ার অন্যতম মহৎ এ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সফল হয়। হাঙর মেরে 'টলতে টলতে ধুঁকতে ধুঁকতে কাপাসীকে নিয়ে খুব সাবধানে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে ম্যানগ্রোভ বনে উঠে গেল লা তে।' এবং এবার বেহুঁশ কাপাসীর দিকে তাকাল লা তে। কেন যেন তার মনে হল, আন্দামানের দরিয়ায় হাঙরের মুখ থেকে এমন সিপি সারা জীবনে আর তুলতে পারে নি। তবু কিন্তু কাপাসীর বাপ নিত্য ঢালীর আমন্ত্রণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না লা তে। সে সমুদ্রের চরিত্র বুঝে ফেলেছে। তাই সমগ্র একাগ্রতা নিয়ে এগিয়ে চলে তার উদ্দিষ্ট মায়াবন্দরের দিকে। জীবনের রহস্য যে এমনটাই।

জীবন ও মৃত্যুর এই বিচিত্র পরিবেশে অতঃপর জন্ম নেয় এ দ্বীপের প্রথম সন্তান। তিলির ছেলে হয়েছে। সদ্যোজাত শিশুর কান্নায় আন্দামান যেন ভরে গেল। পালসাহাব আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে কোলে তুলে নিল। তারপর? তিলিব বাচ্চাটা এখন আর কাঁদছে না। চোখ বুজে হাত মুঠো করে একান্ত নির্ভয়ে পালসাহাবেব হাতে শুয়ে রয়েছে।

'ফুলের মতো নরম উষ্ণ ছোট্ট একটি মানুষ। পরম মমতায় তাকে বুকের ওপর তুলে নিল পালসাহাব। একদৃষ্টে এই দ্বীপের প্রথম শিশুটির মুখ দেখতে লাগল।'

এ উপন্যাসের পাঠকরা জানেন তিলির সব স্বত্ব ছেড়ে হরিপদ এ দ্বীপ থেকে একদিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। পালসাহাব জানে, 'একজন পঙ্গু রুগ্ণ বিকলাঙ্গ মানুষের জন্য তো একটা সুস্থ স্বাভাবিক সজীব মানুষ মূল্যহীন হয়ে যায় না।'

'একজনের জন্য আর একজনের জীবন নষ্ট হয়ে যায় না'— পালসাহাবের এ জীবনবোধ এ উপন্যাসে যেন এক প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে আনে। যারা দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে এক প্রজন্মের জীবনকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল তাদের সব স্বার্থপরতাকে অগ্রাহ্য করে আগমন ঘটে নতুন প্রাণের এবং প্রমাণ করে দেয় 'মৃত্যুটা আর যাই হোক জীবনের চেয়ে ঢ্যাঙা নয়' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

(২)

'নোনা জল মিঠে মাটি' যদি হয়ে থাকে বিপুল এক জনগোষ্ঠীর বিপর্যয় ও পুনর্বাসনের যৌথ প্রয়াস, তাহলে রচনাসমগ্র-এর এই খণ্ডে সংকলিত বাকি তিনটি উপন্যাস হল কিছু মানুষের ব্যক্তিগত বিপদ ও সংকট থেকে উত্তরণের নিবিড় চলচ্চিত্র। সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন এখানে প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যে একটি অন্তর্লীন মিল রয়েছে যদিও তাদের বিন্যাস আলাদা। মনে রাখতে হবে, এ উপন্যাসসমূহে অবলম্বিত সময় হল পঞ্চাশ ও ষাটের দশক। এ দু'টি দশক মূলত উনিশ শো সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে উদ্ভূত বাঙালি জীবনের সংকটময় সময়। যে বিপুল জনস্রোত অদ্ভুত এক রাজনৈতিক অভিঘাতে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে এপার বাংলায় এসে প্রচণ্ড সংশয় ও সংকটের মধ্যে পড়েছিল এবং যার ফলে প্রচুর মানুষের জীবনে সংঘটিত হয়েছিল নানাবিধ অর্থনৈতিক ও আত্মিক বিপর্যয়, প্রফুল্ল রায় এ সকল উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন তারই বিশ্বাসযোগ্য বিন্যাসকে। তাই 'এখানে পিঞ্জর' থেকে শুরু করে

'আমার নাম বকুল' অথবা 'আলোয় ফেরা' পর্যন্ত প্রসারিত বিবরণসমূহে যেন একটি কথাই বার বার উঠে এসেছে মীনা বকুল জয়া অমলেশ রাজার মতো কিছু তরুণ তরুণী। তারা অবশ্য একই স্থানে একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে নি, তাদের সকলেরই আছে নিজস্ব জীবনযাপন, নিজেদের মতো বেঁচে থাকার ধরন। কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেই রয়েছে একটি সাধারণ লক্ষণ এবং তা হল সময়ের দুর্বিপাক থেকে উঠে আসা সংকট ও সংঘর্ষ। 'এখানে পিঞ্জর' উপন্যাসের অমলেশ ও নীলার কথাই ধরা যাক। পশ্চিম বাংলা থেকে অনেক দূরে আরব সাগরের তীরে অমলেশের অবস্থান। তার সঙ্গে নবেন্দুর পরিচয় একেবারেই আকস্মিক। কিন্তু সত্যই কি আকস্মিক? নবেন্দু তো দেশভাগের কলঙ্ক নিয়ে উঠে-আসা অতি সামান্য এক উদ্বাস্তু পরিবারের যুবক, জীবিকার সন্ধানে আছড়ে পড়েছিল মুম্বাইয়ের অপরাধ জগতের ক্ষুদ্রতম অংশের সঙ্গে। অন্য অনেক যুবকের মতো তার পরিণতিও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের স্পর্শ পায় নি, তাই অবশ্যম্ভাবী অথচ স্বাভাবিক উপসংহার অর্জন করেছে তার জীবন। অত্যন্ত ক্ষীণ বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে সে, কিন্তু তার অভিঘাত প্রবাসী বাঙালি অমলেশকে যেন তাড়না করে ফিরিয়ে এনেছে পশ্চিম বাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অমলেশ ইচ্ছে করলেই নবেন্দুর দায় এড়িয়ে যেতে পারত, কিন্তু এ উদাসীন পৃথিবীতে হয়তো কিছু বিবেকী মানুষ মাঝে মাঝেই থেকে যায় যার জন্য সংসার হয়ে ওঠে সহনীয়। অমলেশ যেন এ 'অসম্ভব' দায় মেনেই জড়িয়ে যায় নবেন্দুর অর্থজর্জর পরিবারের সঙ্গে, তার পরিচয় ঘটে নবেন্দুর বোন নীলার সঙ্গে। নীলাও এখনকাব অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে নিরুপায় জীবনযাপন করছিল। অমলেশ এসব জানা সত্ত্বেও ক্রমে এক নিবিড় মমতায় জড়িয়ে পড়ে এই পরিবারের সঙ্গে এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে কখন যেন দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক অপ্রতিরোধ্য সম্পর্ক। এ উপন্যাসের পরিণতি অবশ্যই হতে পারত বিচ্ছেদের মধ্যে, কিন্তু অমলেশের বিবেকী বাস্তবতা তা হতে দেয় নি। তাই প্রফুল্ল রায় এ উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটান এভাবে :

'জীবনের প্রথম তিরিশটা বছর বাংলাদেশ অমলেশের স্মৃতিতে ছিল, অনুভূতিতে ছিল না। তারপর একদিন খেয়ালের বশে নবেন্দুর কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে বীজপুর ছুটে গিয়েছিল, গিয়েই টের পেয়েছিল একটা পিঞ্জরে এসে পড়েছে। বীজপুরের সেই পিঞ্জরটা থেকে বেরুবার কোনও পথ তার সামনে খোলা নেই। নীলা যতবার হাতছানি দেবে, ঘুরে ঘুরে ততবার তাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে।'

স্মৃতি থেকে অনুভূতিতে অগ্রগমনের ইতিকথা হল, 'এখানে পিঞ্জর', এ পিঞ্জর মানবিকতার বন্ধন, উৎসাহের উত্তরণ।

(৩)

'আমার নাম বকুল'। কিন্তু বকুল কি সত্যই কোনো নাম, নাকি একটি নীরব উৎসর্গের পরিণাম? বকুল নামের তরুণীটিও ছিল বিভাগোত্তর বাংলার এক জটিল সময়ের শিকার। উপন্যাসের গোড়াতেই পাঠক যখন পেয়ে যান একটি গোপন বিবাহের বর্ণনা, সঙ্গতভাবেই তার মনে হতে পারে তিনি অতঃপর মুখোমুখি হবেন একটি অত্যন্ত সাদামাঠা প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে। কিন্তু ভুল ভাঙে খানিক পরেই। কাহিনী একটু এগোলেই। বকুল বিয়ে করেছিল, সংসার করতে পারে নি। এমন নয় যে তার স্বামী বিজন তাকে প্রতারণা করেছিল, অথবা অস্বীকার করার প্রবণতা দেখিয়েছিল। বিজন তার জন্য ঘর সাজিয়ে প্রতীক্ষা করেছিল। কিন্তু তা পর্যবসিত হয়েছিল অন্তহীন প্রতীক্ষায়। কেননা বকুলের পরিবার, তার বাবা, ভাই, ভাই বউ এবং অন্যান্যরা তার ওপর যে অর্থনৈতিক দায় চাপিয়ে দিয়েছিল, তার থেকে রেহাই পেতে যে ধরনের বিবেকহীনতার দরকার, বকুল ও বিজন তা আয়ত্ত করতে পারে নি। এ উপন্যাসের একটি উদ্দীপক বিষয় হল এই যে যখনই পাঠকের মনে হবে এই বুঝি তাদের সংকট কাটল, তাদের মিলনের আর বাধা রইল না, তখনই আবার গভীরতর কোনো সংকট এসে তাদের বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করে। তাই কখনো বকুল কখনো বিজন ক্রমাগত অনিচ্ছাকৃত ব্যবধান রচনা করে চলে নিজেদের

জীবনে, সংসার সাজাবার জন্য সংগ্রহ করা খালি ফ্ল্যাটটি তারা কখনোই আর ভরে তুলতে পারে না। বকুলের যেমন সমস্যা ছিল কিছু পরিজন, তার ভাই ভাইবউ, বিজনেরও ছিল কখনো দিদি ও ভাগনে। এবং শেষ পর্যন্ত যখন সব সমস্যা সমাধানের সমীপবর্তী, তখনই যেন দুর্মর নিয়তি তাদের জীবনে নিয়ে এল ওপার বাংলা থেকে উৎখাত-হওয়া উদ্বাস্তু জেঠামশাই ও তাঁর পরিবারকে। এ জাতীয় দায় ইচ্ছে করলেই অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করতে পারত বকুল অথবা বিজন, কিংবা দু'জনেই। কিন্তু তা তারা করে নি। সময়ের সমগ্র বিষকে আকণ্ঠ ধারণ করে তারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু মনুষ্যত্বকে এড়িয়ে যায় নি। বকুল ও বিজন যেন অমলেশেরই অন্যবিধ সম্প্রসারণ। তাই উপন্যাসের উপান্তে এসে বিজন যখন বলে, '. . যা দিনকাল, কিছু করা সম্ভব না। ... তুমি আমি বোধহয় কোনওদিনই একসঙ্গে থাকতে পারব না'— তার উত্তরে বকুল কিছু বলে না। বলার যে কিছু ছিল না।

(৪)

'আলোয় ফেরা'-ও মূলত দু'টি তরুণ-তরুণীর কাহিনী। তবে তাদের বয়স বিজন ও বকুলের তুলনায় কম। তাদের নাম হল রাজা ও জয়া। এবারের ঘটনাস্থল কলকাতা থেকে একটু দূরে শ্যামনগরে। 'কলকাতার এত কাছে, তবু শ্যামনগর যেন এ কালের শহর না, আদ্যিকালের কোনও নগরী'। রাজার বসবাস শ্যামনগরে এবং জয়ার নবীপুরে। রেল ইয়ার্ডের মাল চুরি এবং ছিনতাইয়ের ব্যাপারে পুলিশের নজর ছিল রাজার ওপরে, কিন্তু তাকে ধরতে পারছিল না তারা। এবং ধরা পড়লেও রমলা নামক এক সন্দেহজনক রমণী তাকে ছাড়িয়ে এনে যুক্ত করে দিতে চায় আরো বড় অপরাধচক্রের সঙ্গে। বিধবা বৌদি ও তার সন্তানদের ভরণপোষণের ভার বেকার রাজার ওপর। তাই তার অনিবার্য নিয়তি ছিল পাপের পঙ্কিল পথে ক্রমাগত তলিয়ে যাওয়া। কিন্তু জয়ার সংস্পর্শ তাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যায়। জয়াকেও রমলা নিজের অসাধু ব্যবসার কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু রাজার মানসিক উত্তরণ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিপার্শ্বের কলুষ, পরিবারের অর্থনৈতিক অসহায়তা প্রভৃতি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার অদম্য বাসনায় রাজা ভিন্নতর ও উন্নততর জীবনের সন্ধানে যাত্রা করে। তাকে মানসিক সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন ফাদার ডোনাল্ডস। রাজার এককালের সঙ্গীরা বেশ ক্ষুব্ধ হতে থাকে, হয়তো বা নিজেদের একান্ত নিরুপায়তার জন্যই। রমলাদি শত্রুতা শুরু করে, তবু রাজা দমে না। কেননা তার এখন শক্তিশালী এক মানসিক আশ্রয় জুটেছে। তাই একদা যে বৌদির সঙ্গে ছিল প্রণয় বৈরিতার সম্পর্ক, তার মধ্যেও নেমে আসে আশ্চর্য এক সাহচর্যের সমর্থন। মানুষ তো আসলে অসহায়, পরিপার্শ্বের চাপের ওপরই তার ভালমন্দের অনেকটাই নির্ভর করে। ভালবাসার অমৃত মন্ত্র জীবনে এনে দিতে পারে পূর্ণতার আশ্বাস। এ পূর্ণতাকে যদি একবার অন্তরের ভেতর থেকে অবলম্বন করা যায়, তাহলে 'আলোয় ফেরা' খুব কঠিন হয় না। কারাগারও তখন আর তেমন বাধা হতে পারে না।

(৫)

ছোটগল্প নিয়েই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব। অনেকটা যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জেদের বশেই একদিন একটি ছোটগল্প নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন 'দেশ' সাপ্তাহিকের দপ্তরে। তখন তার বয়স মাত্র বিশ। পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন কয়েক বছর আগে। গল্পের নাম 'মাঝি'। 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৯৫৪-তে। তার কিছুকাল পর এই পত্রিকাতেই আবার প্রকাশিত হল 'চোর'। একই বছরে। প্রথম আবির্ভাবেই পাঠক সমাজে বিখ্যাত হয়ে গেলেন লেখক। তারপর প্রায় অর্ধ শতক ধরে তিনি উপন্যাসের সঙ্গে অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন। এখনো লিখে চলেছেন।

পূর্ব বাংলা থেকে রক্তের মধ্যে স্মৃতির মধ্যে যে জীবন প্রবাহকে বহন করে এনেছিলেন তারই অনিবার্য প্রকাশ ঘটেছিল এসব গল্পে। তখন দেশভাগের দুঃসহ যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বাঙালির চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিবেকী লেখক তাঁকেই বলা যায় যিনি মনুষ্যত্ব লঙ্ঘনকারী এ সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠে চিরকালীন শান্তি কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী হন। 'মাঝি' এমনই এক মানবিকতার কাহিনী। মুসলমান মাঝি নিজের প্রাণ ও অর্থের মায়া দূরে সরিয়ে রেখে অসহায় হিন্দু যুবতীকে যেভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছিল তার চলচ্ছবির প্রকাশ দেখে স্বতঃই মনে আসে রবীন্দ্রনাথের এ অমোঘ বাক্যটি 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'।

'মাঝি' যদি হয় দু'টি যুযুধান সম্প্রদায়ের মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ, তাহলে 'রাজা যায় রাজা আসে' তারই এক ভিন্নতর বিন্যাস। দেশের নেতারা ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলি যে লোভ দেখিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছেদের বীজ রোপণ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল তার আড়ালে কতখানি উচ্চবর্গীয় নীচতা ছিল সেকথা সেকালে স্বল্পই প্রকাশ পেয়েছিল। তাই দরিদ্র কৃষিজীবী মুসলমান রাজেক মিথ্যা প্রলোভনে ভুলে হিন্দু বৈকুণ্ঠ সা'র জমির মালিক হবার খোয়াব দেখেছিল। এমনকি ধনী তোরাব আলির মেয়ের সঙ্গে শাদির সম্ভাবনায় উত্তেজিত হয়েছিল। দু'টি সম্প্রদায়ের ধনীদের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। তাই রাজেক পুনরপি দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে নিজের মনেই বলে চলে, 'দ্যাশখান দুই ভাগ হয়। সাহাবা ভুইমালীরা যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে। তাতে তব কীবে, তব কী?' এ উচ্চারণ তো শুধু রাজেকের নয়। সর্বদেশের সর্বকালের দরিদ্র মানুষের অনিবার্য আত্মকথন।

নিম্নবর্গের এহেন মানুষগুলির অন্তরের প্রতিবাদ হিসেবেই যেন 'চর' গল্পে সুখীর মুখে ধ্বনিত হয় আশ্চর্য সংলাপ। নিরন্তর তাড়নার মধ্য দিয়ে আশ্রয়চ্যুত হবার সর্বনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সুখী কোলের শিশুটিকে 'শাণিত হাতিয়ারের মতো সামনে তুলে নির্ভুল পা ফেলে তারা যাবে আরো, আরো অনেকবার', কেননা ছদন শিকদারের কাছ থেকে 'আরো পাঁচশো ট্যাকা' অন্যায়ের প্রতিশোধ হিসেবে আদায় করতেই হবে। 'চোর' গল্পের আকলিমাতেও ঘটেছে এই মানসিকতার ভিন্নতর প্রকাশ।

জীবনের রহস্য কখনো সম্পূর্ণ অপাবৃত হয় না এ সংসারে। তাই পৃথিবীতে যেমন আছে সুবিধাভোগীর দল তেমনি তাদের সমান্তরালে নিরন্তর আবির্ভূত হতে থাকে রাজেক সুখী আকলিমার মতো মানুষেরা। তারা ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বস্তরে, প্রফুল্ল রায়ের গল্প থেকে গল্পান্তরে।

বিষ্ণু বসু

উ প ন্যা স

সূচিপত্র

নোনা জল মিঠে মাটি

কথামুখ

শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এক শ' মাইল দূরে এই দ্বীপ, যার নাম উত্তর আন্দামান। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, জাপানি শিল্পী হকুসাইর আঁকা একটি অপূর্ব নিসর্গচিত্র।

এই দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান চমকপ্রদ। সামনের দিকে ঘোড়ার খুরের আকারে উপসাগর, নাম এরিয়াল বে। এরিয়াল বে'র নীল জলে উড়ুক্কু মাছেরা রুপোলি ডানায় ঝিলিক হেনে ছুটে বেড়ায়। পারের কাছে অক্টোপাস আর হাঙরেরা শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরে।

উপসাগরের ওপারে সমুদ্র—আন্দামান সী। সমুদ্র—নিঃসীম, গম্ভীর, অশেষ। সেখান থেকে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ ছুটে আসে। এরিয়াল বে'কে মাতিয়ে, পারের ক্ষয়িত শিলায় আর ম্যানগ্রোভ বনে বিপুল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দ্বীপটা চড়াই-উতরাইয়ে তরঙ্গিত। এখানে গভীর অরণ্য। চুগলুম-দিদু-প্যাডক-পেমা, এমনি নানা গাছের জটিল জটলা। এক কোণে মাঝারি একটা পাহাড়, নাম স্যাডল পিক।

উত্তর আন্দামানের ভৌগোলিক অস্তিত্বের মধ্যে যত বিস্ময় তার কণামাত্র নেই তার ইতিহাসে। চেঙ্গিস খানের মতো কোনো দুঃসাহসী নৃশংস এখানে অভিযান চালায় নি। অষ্টম হেনরি কি শাজাহানের মতো কোনো নৃপতি এখানে রাজত্ব করেন নি। ফরাসি বিপ্লব কি হলদিঘাটের যুদ্ধের মতো কোনো বিচিত্র ঘটনাই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমুদ্র-বেষ্টিত এই দ্বীপ নির্জনে, নিঃশব্দে হাজার হাজার বছর মূক হয়ে পড়ে ছিল।

অবশ্য খ্রিস্টজন্মের অনেক আগেই চিনা এবং জাপানিরা এই দ্বীপের কথা শুনেছিল। আরব বণিক এবং ভারতীয় শ্রমণ-শ্রমণীরা মধ্যযুগে পূর্ব সমুদ্রে পাড়ি জমাতেন। অনুমান হয়, সাময়িক বিশ্রাম এবং স্বাদু জলের সন্ধানে তাঁদের বহর উত্তর আন্দামানে ভিড়ত।

নিকোলা কন্টি, মাস্টার ফ্রেডরিক, মার্কো পোলো কিংবা টলেমি বঙ্গোপসাগর দিয়ে যেতে যেতে সম্ভবত এই দ্বীপে এসে থাকবেন। নজির আছে, মালয়ী জলদস্যুরা এখানকার আদিম বাসিন্দাদের ধরে শ্যাম এবং কম্বোডিয়ার রাজ-দরবারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দিত।

উত্তর আন্দামানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের শুরু সতের শ' বিরানব্বুইর ডিসেম্বর মাসে। কিড সাহেব নামে জনৈক প্রবল-প্রতাপ ইংরেজ ক্যাপটেন দুশ' দুর্দান্ত কয়েদি নিয়ে দক্ষিণ আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এখানে এসেছিলেন। তখন এই দ্বীপটার নাম দেওয়া হল পোর্ট কর্ণওয়ালিশ।

কিড সাহেব কয়েদিদের জঙ্গল সাফ করতে লাগিয়ে দিলেন। জঙ্গল সাফ হল, জমি সার্ভে হল, জরিপ হল। বেতপাতার চাল মাথায় নিয়ে ঝুপড়ি উঠল। নতুন যে উপনিবেশ গড়ে উঠল, সরকারি পরিভাষায় তার নাম 'পেনাল কলোনি'।

দ্রুত এই কলোনি জমে উঠল। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে নানা মানুষ আসতে লাগল আশ্রয় আর জীবিকার খোঁজে।

কিড সাহেব আসার আগেও এখানে মানুষ বাস করত। তারা বর্বর, হিংস্র। তারাই এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা। তাদের বিভিন্ন জাত—ওঙ্গে, জারোয়া, গ্রেট আন্দামানিজ, সেন্টিনালিজ। দ্বীপবাসী আদিম উলঙ্গ নিগ্রো জাতীয় মানুষগুলির সঙ্গে ধীরে ধীরে সভ্য মানুষের বন্ধুত্ব হল।

এত সত্ত্বেও কিড সাহেবের কলোনির পরমায়ু মাত্র চার বছর। সতের শ' বিরানব্বইতে যার শুরু, ছিয়ানব্বইতে শেষ।

উত্তর আন্দামান দ্বীপটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং স্যাঁতসেঁতে। মৃত্যুহার এখানে অস্বাভাবিক বেশি। ফলে কলোনি উঠে যায়। উঠে যাওয়ার সময় এখানকার জনসংখ্যা ছিল আট শ' কুড়ি। তাদের মধ্যে কয়েদি মাত্র দু শ' সত্তর জন।

কলোনি উঠে যাওয়ার পর কয়েদিদের পেনাঙের পেনাল সেটেলমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকি সবাই বাংলাদেশে ফিরে আসে।

সেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল। কলোনি উঠে গেলেও কোম্পানি আন্দামানের ওপর কর্তৃত্ব ছাড়ে নি। প্রতি বছর পোর্ট কর্ণওয়ালিশে জাহাজ পাঠিয়ে তদারকি করত।

কয়েক বছর পর জাহাজ পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে জঙ্গল আবার তার দাবি নিয়ে এগিয়ে এল। গভীর অরণ্যের নিচে উপনিবেশ হারিয়ে গেল।

পোর্ট কর্ণওয়ালিশের রঙ্গমঞ্চে একটি অঙ্কের শেষে যবনিকা পাত ঘটল। তারপর কতকাল চলে গিয়েছে।

উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালে আবার যবনিকা উঠল। এবার আর এক অঙ্ক, অন্য এক দৃশ্য। এবার আর কয়েদি নয়, জাহাজ বোঝাই হয়ে পূর্ব বাংলাব উদ্বাস্তুরা এসেছে। উত্তর আন্দামানের নতুন ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব তাদেরই হাতে।

কাহিনী

সেই দুপুরে উপসাগর জ্বলছিল।

শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে শ' খানেক মাইল দূরে উত্তর আন্দামানে এই উপসাগর, যার নাম এরিয়াল বে।

এরিয়াল বে'র নীল জল জ্বলছিল। পারের ম্যানগ্রোভ বন জ্বলছিল। আকাশে আটকে-থাকা সিন্ধুশকুনগুলো ঝলসে যাচ্ছিল।

উপসাগর আজ বড় শান্ত। তার নীল জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না। জলের তলায় বাদামি বালির বিছানা। সেখানে অতি সন্তর্পণে বুকে হাঁটছে নানা আকারের কড়ি। যাদের নাম টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, ফ্রগ শেল। বালির ওপর তাদের চলার দাগ আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে এক ঝাঁক রুপোলি তীরের মতো উড়ুক্কু মাছেরা খানিকটা ছুটেই উপসাগরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের ফিনফিনে ডানায় দুপুরের রোদ ঝিলিক মারে।

সমুদ্র ফুঁড়ে যে অন্ধ উন্মাদ বাতাস পারের ম্যানগ্রোভ বনটাকে ইচ্ছামতো নাস্তানাবুদ করে যায়, সেই বাতাসও আজ নেই।

এরিয়াল উপসাগরে আজ কোনো শব্দ নেই। নীল জল একেবারেই নিস্তরঙ্গ। আকাশের সিন্ধুশকুনগলো ডানা নাড়ে কি নাড়ে না। ম্যানগ্রোভ বনের মাথা নড়ে কি নড়ে না।

ঘোড়ার খুরের আকারে উপসাগরটা যেখানে বেঁকে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সীগাল পাখি। পাঁশুটে রঙের পাখিটা অনড় দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। সার্ডিন মাছ চোখে পড়লেই তার চোখা ধারাল ঠোঁটদু'টো বিদ্যুৎগতিতে জলের ভেতর ঢুকে যাবে!

উপসাগরটা নিঝুম, নিস্তব্ধ। হঠাৎ চারদিক চমকে দিয়ে শব্দ উঠল। বিকট, গম্ভীর, শিব-ছিঁড়ে-দেওয়া আওয়াজ দূরের সমুদ্রে প্রলয় তুলে শাসাতে শাসাতে উপসাগরের দিকে এসে পড়ল।

চোখের পলকে শান্ত স্তব্ধ উপসাগরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পাঁশুটে রঙের সীগাল পাখিটা ডানায় ঝটপট শব্দ তুলে কোন দিকে উড়ে পালাল। জলের নিচে কড়িগুলো বুকে হাঁটতে হাঁটতে থমকে গেল।

সমুদ্র থেকে এখন ঢেউ ছুটে আসছে। একের পর এক বিপুল, বিরাট সব ঢেউ।

একসময় উপসাগরটা যেখানে ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে একটা চিমনি দেখা দিল। চিমনিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা জাহাজ হয়ে গেল।

সতের শ' বিরানব্বইতে উপনিবেশ পত্তনের আশায় কিড সাহেবের জাহাজ এসেছিল। দীর্ঘ একশ' চৌষট্টি বছর পর স্থায়ী বসতি গড়তে আবার জাহাজ এল।

এটা উনিশ শ' ছাপান্ন সালের এক মধ্য দুপুর।

জাহাজ আসার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা ভোজবাজি ঘটে গেল যেন।

উপসাগরের পারটা বালির। এখানে সেখানে অজস্র ম্যানগ্রোভ গাছ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ বালির ওপর লাল রঙের ছোট ছোট অগুনতি কাঁকড়া ছোটাছুটি করছিল। সামুদ্রিক শামুকগুলি নিঃশব্দে গুটিগুটি পায়ে হাঁটছিল। এখন তারা শক্ত খোলের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে রইল। বেলাভূমি জুড়ে কত যে গর্ত! সীমাসংখ্যাহীন। কাঁকড়াগুলো চোখের পলকে গর্তে ঢুকে পড়ল।

জাহাজ আসার শব্দে জঙ্গল ফুঁড়ে কোত্থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল। উপসাগরের পারে এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

উপসাগরের বাঁ দিকে সমুদ্র। ডান দিকে একটা খাড়ি। খাড়ির পর জটিল অরণ্য। উপসাগরটা খাড়ির কাছে সরু হয়ে হয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে, কে জানে।

খাড়ির মুখে এবার গুটিকতক কাঠের ডিঙি দেখা দিল। উথলপাথল ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে ডিঙিগুলো জাহাজের দিকে এগুতে লাগল।

পারের কাছটা অগভীর। বড় জাহাজ সেখানে ভিড়তে পারে না। কাজেই উপসাগরেব মাঝখানে জাহাজটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কড় কড় শব্দে মোটা শিকল আর নোঙর নামল জলে।

দুপুরটা জ্বলছে। পারের ম্যানগ্রোভ বন জ্বলছে, চুগলুম দিদু আর প্যাডক গাছগুলো জ্বলছে, দূরে স্যাডল পিকের মাথা জ্বলছে। আকাশের গায়ে যে সিন্ধুশকুনগুলো ঝলসে যাচ্ছিল, তারা এসে জাহাজের চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করল।

জাহাজ আসতে সবচেয়ে খুশি হয়েছে উড়ুক্কু মাছেরা। ফিনফিনে ডানায় রুপোলি রোদ মেখে, সেই রোদে ঝিলিক হেনে হাজার হাজার উড়ুক্কু মাছ জাহাজের চারপাশে ওড়াউড়ি করছে। উপসাগরের এই ডানাওলা জলজ প্রাণীরা জাহাজটাকে বুঝিবা সমুদ্র থেকে আসা একটা বিরাট মাছ ভেবে নিয়েছে।

এতক্ষণে ডিঙিগুলো জল সাঁতরে জাহাজের গায়ে গিয়ে লেগেছে।

এদিকে ধীরে ধীরে সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলতে শুরু করেছে। রোদের তেজ মরে আসছে।

একসময় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজ থেকে একে একে অনেকগুলো মানুষ ডিঙিতে নেমে এল। ডিঙিগুলো উপসাগরের পারে মানুষগুলোকে নামিয়ে আবার জাহাজটার দিকে ছুটল। কতবার যে মানুষ নিয়ে ডিঙিগুলো পারে এল, সে হিসাব কে রাখে।

এই নিঝুম, নিঃসঙ্গ দ্বীপে অনেক অনেকদিন পর মানুষ এল। অসংখ্য মানুষ।

উপসাগরের পারে ম্যানগ্রোভ বনের নিচে ডেলা পাকিয়ে বসল তারা। ভীত চোখে বন, সমুদ্র আর দ্বীপ দেখতে লাগল।

এই মানুষগুলোর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই যেন। তাদের সকলের চোখের ভাষাই এক, মুখের চেহারা অভিন্ন। ভিড়ের মধ্য থেকে তাদের কাউকেই আলাদা করে নেওয়া যায় না।

অনেক, অনেকদিন পর উত্তর আন্দামানে মানুষ এসেছে। নিঃস্ব, ভীরু, মৃতমুখ একদল মানুষ।

দুই

বিকেলের দিকে উপসাগরে ঢেউ উঠল। আর উপসাগরে যত ঢেউ উঠল, তার চেয়ে অনেক বেশি উঠল কাপাসীর সর্বাঙ্গে। হাসির ঢেউ। হাসির দমকে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল কাপাসী। বুক-পিঠ-কোমর-পেট, সমস্ত দেহ তরঙ্গিত হতে লাগল তার।

দুপুরে এই উপসাগর জ্বলছিল। তার নিস্তরঙ্গ নীল জলে ঢেউ উঠছিল কি উঠছিল না। কিন্তু এখন সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছে। নীল জল এখন আর জ্বলছে না। এখন উঁচু উঁচু বিশাল ঢেউগুলি পারের ম্যানগ্রোভ বন আর ক্ষয়িত শিলায় আছাড় খাচ্ছে।

উপসাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাপাসী হাসে। পারের বালিতে পায়ের ছাপ গেঁথে গেঁথে সে ছোটে। ছোটে আর হাসে। সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসে কাপাসী।

জোড়া ভুরু, মাজা শ্যামলা রং, ঘন পালকে-ছাওয়া টানা চোখে কালো মণি দু'টো টলটল করে। শ্যামল দেহ এখন ভাদ্রের নদী। নদী কেন, অথৈ অকূল সমুদ্রের উপমা দেওয়াই বুঝি ঠিক। এক কথায় সে রূপসী। তার সুঠাম শরীরে যত রূপ তত যৌবন। সেই রূপ সেই যৌবন যেন দেহের কানা ছাপিয়ে উপচে পড়ে।

কাপাসী হাসে। ধারাল, তীব্র, বিচিত্র হাসি। হাসির শব্দে সাগরপাখিগুলো ম্যানগ্রোভ বনের মাথা থেকে উড়ে উড়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপ সচকিত হয়ে ওঠে।

বালির ওপর মানুষগুলো ডেলা পাকিয়ে বসে ছিল। ভীত, জর্জরিত, নিঃস্ব একদল মানুষ। এক [illegible] গা ঠেকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ত্রস্ত চোখে এদিক সেদিক দেখছিল। ভেবেই পাচ্ছিল না, দিনের পর দিন কূলকিনারাহীন অথৈ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এ তারা কোথায় এল! যে জীবন তারা পেছনে, অনেক দূরে ফেলে এসেছে সেই বড় সাধের জীবনটাকে বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর অরণ্যময় দ্বীপে কেমন করে কোথা থেকে নতুনভাবে শুরু করবে, ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় উপসাগরের পারে কাপাসীর হাসি হঠাৎ মেতে উঠেছে। মানুষের পিণ্ডটা চমকে উঠতে লাগল।

কথায় বলে, মন বুঝে ক্ষণ। কাপাসীর হাসি মনও বোঝে না, ক্ষণও বোঝে না। বড় অবুঝ তার হাসি মাতনেই থাকে।

মানুষের জটলাটার একধারে বসে ছিল বুড়োবুড়িরা, একধারে বয়স্ক বৌ ঝি'রা, একধারে যুবতী মেয়েরা। জলের কিনারা ঘেঁষে বসে ছিল জোয়ান ছেলেরা। বাচ্চাগুলো মা-বাপের গায়ে গায়ে লেপটে ছিল।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'হাসে কে?'

বুড়ি বাসিনী বলে, 'কার পরাণে এমুন ফূর্তি জাগল! হাসনের আর সময় গময় নাই?'

একটি বয়স্কা বউ ঘোমটার তলায় মুখ বাঁকাল। বলল, 'পোড়ার মুখে হাসিও আসে। এতটুক শরম ভরম নাই! পোড়ার মুখে পোড়ার হাসি।'

যুবতীরা কিছুই বলে না। চুপচাপ মুখ বুজে বসেই থাকে।

জোয়ান ছেলেরাও কিছু বলে না। অবাক হয়ে দেখে, উপসাগরের পারে পায়ের দাগ এঁকে এঁকে কেমন করে সুঠাম শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে কাপাসী ছুটছে। অবাক হয়ে কাপাসীর হাসির তীব্র, অবুঝ, বিচিত্র শব্দ শোনে তারা।

বাচ্চাগুলোও কিছু বলে না। মা-বাপকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে থাকে।

বুড়ো রসিক শীল আবার বলে, 'হাসে কে?'

বুড়ি বাসিনী আবার বলে, 'পোড়াব মুখে ঈশ্বর হাসিও দেয়! আমরা চিন্তায় মরি। আলিসান সমুন্দুর পাড়ি দিয়া কুনখানে আইলাম! আর মাগী হাসে, অঙ্গ ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া হাসে। মাগীটা কে?'

বয়স্কা বউটি ঘোমটার তলা থেকে বলে, 'কাপাসী। নিত্য ঢালীর মাইয়া।'

রসিক শীল এবার ডাকে, 'অ নিত্য—'

ভিড়ের ভেতর থেকে একটা মানুষ উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত মুখে চোখা চোখা, কাঁচাপাকা দাড়ি, মজবুত বুক, শক্ত কবজি, কিন্তু চোখ দু'টি ঘোলাটে, বিবর্ণ। ধরা ধরা, ভাঙা স্বরে সে বলল, 'আমারে ডাকলা রসিক খুড়া?'

'হ।'

'ক্যান?'

'মাইয়া অমুন হাসে ক্যান?'

'মাইয়ার মনে কী আছে, আমি ক্যামনে জানুম?'

রসিক শীল এবার খেপে উঠল, 'এতটুক লাজ শরম নাই, নিলাজ ডাকাবুকা মাগী।' একটু থেমে আবার বলে, 'মাইয়ার হাসন সামাল দে নিত্য।'

'মাইয়ার হাসন কি আমার বশে? তুমি তো হগলই (সকলই) জানো খুড়া।' মুখখানা কাঁচুমাচু করে তাকিয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

একটু কী যেন ভাবে রসিক শীল। হঠাৎ স্বরটাকে নরম করে বলে, 'হগলই বুঝি নিত্য। কিন্তুক এ হইল আন্ধারমান (আন্দামান দ্বীপ)। বিদ্যাশ, অচিন জায়গা। তরাসে বুক শুকাইয়া যায়। মাইয়ার পরাণেই খালি ডর নাই।'

বিষণ্ণ গলায় নিত্য ঢালী বলে, 'অর জনমটাই ব্রেথা (বৃথা) হইয়া গেছে খুড়া। ডর, শরমভরম, কিছুই কি অর আছে! কুন সময় হাসব, কুন সময় কান্‌ব (কাঁদবে), কে কইতে পারে!'

রসিক শীল আর কিছু বলে না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। তার ঘোলা ঘোলা চোখ দু'টিতে সহানুভূতির ছায়া পড়ে। কিছুক্ষণ পর সে বলে, 'হগলই তো বুঝি নিত্য, কিন্তুক মানুষের মন তো বুঝ মানব না। এত বড় মাইয়া, যেখানে হেখানে হাসন কি মানায়! দেখায় ক্যামুন?'

নিত্য ঢালী উত্তর দেয় না।

কেমন মানায় কেমন দেখায়, তা বুঝে কি আর কাপাসী হাসে? উপসাগরের পারে বেলাভূমিতে

পা গেঁথে গেঁথে সে শুধু ছোটে। ছোটে আর হাসে। কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই। তার অবুঝ হাসি ম্যানগ্রোভ বনের মধ্য দিয়ে হাওয়ায় ভর করে সরসরিয়ে ছুটে যায়।

কত বছর পর উপনিবেশ গড়ার আশায় মানুষ এসেছে এই দ্বীপে। মানুষের হাসি এসেছে। নির্জন, নিঃসঙ্গ বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ কত বছর পর মানুষের হাসি শুনছে!

ঘোমটার তলায় অল্পবয়সী বউরা বলে, ঘোমটা খসিয়ে বয়স্ক মেয়েমানুষগুলো বলে, 'হাসন! হাসন না তো মরণ! মাগীর অঙ্গে এত হাসনও আছে! হগল খুয়াইয়া মাইনষে অ্যামুন হাসতেও পারে!'

কেন জানি বুড়ো রসিক শীল বলে, 'আহা, হাসুক হাসুক। হগলই তো অর গেছে, জনমটাই ব্রেথা হইয়া গেছে। হাসলে এট্টু যদিন শান্তি পায় তো হাসুক।'

জাহাজ আসার শব্দে জনাকতক মানুষ জঙ্গল ফুঁড়ে এরিয়াল উপসাগরের পারে চলে এসেছিল। এখনো তারা একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে আছে চারজন আদিবাসী রাঁচি কুলি। তাদের নাম ধানোয়ার, কচ্ছপ, ডুগুডুগু আর টিরকি। একজন পাটোয়ারি—আতমন সিং। একজন চেন-ম্যান—নিবারণ সাপুই। আর একজন কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টান্ট—সংক্ষেপে সি. এ। সি. এ নামের আড়ালে তার আদত নামটা হারিয়ে গিয়েছে। অনেকে অবশ্য তাকে পালসাহাব বলেও ডাকে।

দলটা এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

সি. এ পালসাহাব সামনে এগিয়ে এল। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, বোতামহীন হাফ শার্টের ফাঁকে রোমশ মাংসল বুক, ভাঙা ভাঙা ক্ষয়ে-যাওয়া নখ, মাথায় ফেল্টের হ্যাট। হ্যাটটার আদি বর্ণ কী ছিল, পালসাহাবও হয়তো বলতে পারবে না। লোমওলা বুক, মুখময় আগাছার মতো অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়িগোঁফ, নোংরা দাঁত আর জংলী অমার্জিত চেহারা থেকে তার সঠিক বয়স বার করা দুরূহ ব্যাপার।

উপসাগরটাকে চমকে দিয়ে পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'শালে লোগ, আমি সি. এ পালসাহাব। কথাটা মনে রাখবি। এখন আমার সাথ সাথ চল।'

মানুষের ডেলাটা নড়ে উঠল। কাপাসীর হাসি আচমকা থেমে গেল।

অনেক, অনেক দূরে বড় সাধের একটা জীবনকে ফেলে এসেছে মানুষগুলো। স্মৃতি ছাড়া সেখান থেকে তারা কিছুই আনতে পারে নি। নিঃশব্দে, খালি হাতে তারা উঠে দাঁড়াল।

এদিকে এরিয়াল উপসাগরের মাঝখানে ঘড় ঘড় শব্দ উঠল। বিকট আওয়াজে জাহাজিরা নোঙর তুলছে। পারের মানুষগুলো চকিত হয়ে ফিরে তাকাল।

একটু পরেই জাহাজটা দূরের সমুদ্রে রওনা হল।

তিন

এরিয়াল উপসাগরটা ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে একদিকে সমুদ্রে মিশেছে। আর একদিকে সরু হয়ে হয়ে একটা খাড়ির সৃষ্টি করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে, কে জানে।

অগভীর খাড়ির দু'পাশে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। নোনা জলে পাথর ক্ষয়ে গিয়েছে। দু'পাশ থেকে ম্যানগ্রোভ গাছগুলো খাড়ির ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

এতক্ষণ খাড়ির মুখে ঘন নীল নোনা জল ফুলে ফুলে উঠছিল, গেঁজে গেঁজে ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। এবার সেখানে একটা ছোট মোটর বোট দেখা দিল। বোটটার ভট্ ভট্ শব্দ কানে আসছে। দেখেই বোঝা যায়, এটা শেল কালেক্টারদের বোট। নাম 'নটিলাস'।

'শেল' অর্থাৎ সামুদ্রিক শঙ্খ কড়ি বা শামুক। এদের রূপের বাহার যত, নামের বাহার তত। কোনোটার নাম টার্বো, কোনোটার ট্রোকাস, কোনোটার বা সান ডায়াল। আরো আছে—যেমন নটিলাস, ফ্রগশেল, ক্লাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

শঙ্খ, কড়ি, শামুক। 'শেল' কালেক্টাররা এগুলোকে বলে 'সিপি'।

অগভীর উপসাগরে ডুব মেরে মেরে ডুবুরিয়া 'সিপি' তোলে। আন্দামানের 'সিপি' জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশের বন্দরে চালান যায়। বঙ্গোপসাগরের শঙ্খকড়ি শৌখিন বিদেশির চোখ ধাঁধায়। বিলাসিনী বিদেশিনীর শখ মেটায়।

'নটিলাস' বোট এবার ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে খাড়ির মুখ থেকে উপসাগরের কিনার ঘেঁষে এগুতে থাকে। শব্দ ওঠে কি ওঠে না। উপসাগরে যে ঢেউ উঠছে, 'নটিলাস' বোট তাতে বাড়তি আলোড়ন তোলে না।

জলের নিচে বাদামি বালির বিছানা। মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে ছোট ছোট ক্ষয়িত পাথর। পাথরের গায়ে কত কালের শ্যাওলা জমে পিছল হয়ে আছে। সবুজ রঙের জলজ লতার গোছা পাথরগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে।

কাচের মতো স্বচ্ছ, নীলচে জলের তলায় সবই পরিষ্কার দেখা যায়। শেষবেলার রোদে বালির কণাগুলি চিকমিক করে। শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে রুপোলি আঁশে ঝলক দিয়ে ছোট মায়া মাছগুলি উলসে ওঠে।

'নটিলাস' বোট আস্তে আস্তে এগুতে থাকে।

বোটটার মাঝখানে ছোট একটা শেড। শেডের একদিকে দু'টো মানুষ চুপচাপ বসে রয়েছে। তাদের একজন বর্মী, নাম লা তে। লা তে 'নটিলাস' বোটের ডাইভার। আন্দামানের উপকূল আর উপসাগরের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে সে 'সিপি' তোলে। জলের নিচে দৃষ্টিটাকে নামিয়ে দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে রয়েছে সে।

লা তে'র পাশে খিলাফৎ খান। খিলাফৎ পাঠান। সে ডুবুরি নয়, ফরেস্ট গার্ড। কী শখ হয়েছে খিলাফতের, সে-ই জানে। আজ লা তে'দের সঙ্গে 'নটিলাস' বোটে সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছে।

শেডের ওপাশে বসে রয়েছে পানিকর। 'নটিলাস' বোটের মালিক। উত্তর আন্দামানের এই এলাকাটা 'শেল' তোলার জন্য সরকারেব কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে সে।

লা তে'র পাশ থেকে খিলাফৎ খান ডাকে, 'এই—'

লা তে জবাব দেয় না।

ভোঁতা, কর্কশ স্বরে খিলাফৎ আবার ডাকে, 'লা তে, এ শালে লা তে।'

লা তে এবার চমকে উঠল, 'হাঁ হাঁ খান সাহাব, কী বলছ?'

নরম করে একটা খিস্তি দিল খিলাফৎ, 'নালায়েক কাঁহিকা, কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছে না—'

এক মুহূর্ত খিলাফৎ খানের দিকে তাকিয়ে রইল লা তে। পরক্ষণেই তার দৃষ্টিটা উপসাগর ফুঁড়ে জলের তলায় চলে গেল।

ইতিমধ্যে ঢেউ মরে আসতে শুরু করেছে। নীল জল এখন স্থির, শান্ত।

'নটিলাস' বোট এতটুকু আলোড়ন না তুলে এগিয়ে যায়। জলতলে বালির বিছানায় বুকে হাঁটছে টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস। কোনোরকম শব্দ হলেই উপসাগর থেকে তারা অথৈ সমুদ্রে পালিয়ে যাবে।

বালির ওপর আঁকাবাঁকা আড়াআড়ি অসংখ্য দাগ। ওগুলো 'সিপি' চলার চিহ্ন।

একটা টার্বো গুটি গুটি এগুচ্ছিল। তীক্ষ্ণ নজরে সেটাকে লক্ষ করছিল লা তে। হঠাৎ পাশ থেকে পিঠে কনুইর গুঁতো পড়ল। লা তে লাফিয়ে উঠল, 'হাঁ হাঁ, খানসাহেব কুছু বলছ?'

'শালে উল্লু, দরিয়ায় এলে পাগলা বনে যায়! আমাকে বসিয়ে রেখে 'সিপি' তুলবি, আর আমি মুখ বুজে বসে থাকব! অ্যায়সা চলবে না।' খিলাফৎ খান খেঁকিয়ে উঠল।

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে, কুতকুতে চোখ দু'টো পিট পিট করে লা তে বলল, 'হাঁ হাঁ, জরুর—'

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ খিলাফৎ খান হুস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'লা তে, সরকার এই ডিগলিপুরের জঙ্গল সাফ করে ফেলছে।'

'হাঁ—'

'বড় বড় পেমা বরগাত দিদু গাছগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে লোপাট করে দিচ্ছে। ডিগলিপুরে জঙ্গল আর থাকবে না।'

'হাঁ—'

'এখানে ক্ষেতিবাড়ি হবে, গাঁও বসবে, কলোনি হবে।'

অন্যমনস্ক, উদাসীন ভঙ্গিতে লা তে সায় দেয়, 'হাঁ—' কথার পিঠে কথা বলছে বটে, কিন্তু কোনোদিকে খেয়াল নেই তার। খিলাফতের কথাগুলো তার কানে যায় কি যায় না। তীক্ষ্ণ চোখে উপসাগরের তলায় তাকিয়েই রয়েছে সে।

অনেক নিচে বিরাট একটা ক্লাম একজোড়া সাদা ডালা খুলে আয়েশ করে শুয়ে আছে। দুই ডালার মধ্যে সবুজ রঙের আলোকপিণ্ড ঝিকমিক করে। ক্লামটার চারপাশে দু'টো বাচ্চা হাঙর দারুণ খুশিতে ডিগবাজি খায়। মাঝে মাঝে সারি সারি ধারাল দাঁতে ক্লামটাকে ঠুকরে ঠুকরে সোহাগ জানায়।

চাপা মঙ্গোলিয়ান চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে লা তে'র। থ্যাবড়া নাকের ডগা উত্তেজনায় তির তির করে কাঁপছে। কোমরে একটা ছোরার বাঁট দেখা যায় তার। নিজের অজান্তেই লা তে'র হাত বাঁটটার ওপর এসে পড়ল। আস্তে আস্তে বোটের শেষ মাথায় এসে দুই পা জোড়া করে ওত পেতে বসল সে।

পাশ থেকে খিলাফৎ খান আবার বলতে লাগল, 'কিড সাহাবের কলোনি উঠে গিয়েছিল। ভালই হয়েছিল।'

লা তে জবাব দিল না।

খিলাফৎ নিজের খেয়ালেই বকে যায়, 'লেকিন এত বছর বাদে আবার মানুষ এল। দুশমনেরা এখানেও আমাকে টিকতে দেবে না।'

লা তে এবারও নিরুত্তর। একদৃষ্টে ক্লাম আর বাচ্চা হাঙর দু'টো দেখতে লাগল।

'বুঝলি লা তে—' বলে একটু থামল খিলাফৎ। লা তে'র দিক থেকে সায় না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ হারামী, এ লা তে—'

কিন্তু আধাআধি কথা খিলাফতের মুখেই রয়ে গেল। বাকিটা শেষ হওয়ার আগেই উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লা তে।

সঙ্গে সঙ্গে হাঙরের বাচ্চাদু'টো পাথরের খাঁজে পালিয়ে গেল। ক্লামটা ডালা বন্ধ করে সবুজ আলোর ডেলাটাকে লুকিয়ে ফেলল।

কয়েক মিনিটের ভেতর ডুব দিয়ে ক্লামটাকে বোটের ওপর তুলে আনল লা তে। সে পাকা ডুবুরি, ওস্তাদ ডাইভার। জলে নামলে সমুদ্র থেকে কিছু কর আদায় না করে ফেরে না। আন্দামান সমুদ্রের সঙ্গে তার সারা জীবনের সম্পর্ক। কোন উপসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো আসে, কোথায় সান ডায়ালের আস্তানা, কোথায় মুক্তা-ঝিনুক মেলে, সব—সব লা তে'র জানা। অক্টোপাসের সঙ্গে যুঝে যুঝে, হাঙরের মুখ থেকে কিংবা হিংস্র রেমোরা মাছের সঙ্গে লড়াই করে 'সিপি' তোলে সে। অন্য ডাইভাররা যখন দশটা 'সিপি' তোলে, লা তে তোলে বিশটা।

'সিপি' তোলার মরশুমের অনেক আগেই শেল কালেক্টররা তাকে বায়না করে। দিন কয়েক আগে এবার 'সিপি'র মরশুম শুরু হয়েছে। এই মরশুমে তাকে কাজে নিয়েছে পানিকর।

শেডের ওপাশে একটা খুশি খুশি গলা শোনা গেল। পানিকর বলছে, 'কী 'সিপি' তুললি রে লা তে?'

'ক্লাম।'

'বহুত আচ্ছা—'

ক্লামটাকে বোটের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে জুত করে বসল লা তে। পানিকরই বোট চালাচ্ছিল। আস্তে আস্তে জলে এতটুকু ঢেউ না তুলে উপসাগরের কিনার থেকে বোটটাকে একটু দূরে সমুদ্রের দিকে নিয়ে এল।

রোদ এখন নিবু নিবু। বিষণ্ণ, মলিন আলো উপসাগরের জলে অল্প অল্প দোল খায়।

খিলাফৎ খান নিজের ঘোরে বলতে লাগল, 'আজকালের মধ্যে এখানে মানুষ আসবে, বহোত বহোত আদমী। তাদের জন্যে জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে। তারা এখানে কলোনি বানাবে।'

'হাঁ—' অভ্যাসবশে একটি মাত্র শব্দ করে সায় দিল লা তে। অন্য কোনোদিকে তার নজর নেই। উপসাগরের দিকে ঝুঁকে সে আরো 'সিপি' খুঁজছে।

'মানুষ হল বেইমান, দুশমন—'

'হাঁ—'

'শালে, এখান থেকে চলে যাব।'

'হাঁ—'

হঠাৎ শেডের ওপাশ থেকে পানিকর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই লা তে, এ খিলাফৎ—'

'হাঁ—হাঁ—'লা তে আর খিলাফৎ চমকে উঠল।

পানিকর বলল, 'ওই দ্যাখ জাহাজ—

'জাহাজ!' খিলাফৎ খান আঁতকে উঠল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল উপসাগর থেকে একটা বিরাট জাহাজ ভাসতে ভাসতে দূর সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা ঘুরে উপসাগরের পারে গিয়ে পড়ল। সেখানে একদল মানুষ কাতার দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলেছে।

বুকে একটা চাপড় মারল খিলাফৎ। গলায় আক্ষেপের স্বর ফুটল তার, 'আঃ, আদমীগুলো এসে পড়ল! জঙ্গলের জান এবার বিলকুল খতম।'

খিলাফৎ খান দেখল, কিড সাহেবের কলোনি উঠে যাবার একশ' ষাট বছর বাদে আবার মানুষ এসেছে উত্তর আন্দামানে।

চার

আগে আগে চলেছে সি. এ পালসাহাব, মাঝখানে মানুষের দলটা, সবার পেছনে পেছনে আসছে ফরেস্টের কুলি, সরকারি চেনম্যান, পাটোয়ারি আর জবাবদারেরা।

উপসাগরের পর খানিকটা সমতল। সেখানে ম্যানগ্রোভ বন। সমতল জায়গাটা ক্রমশ চড়াই হয়ে ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে প্যাডক, পাপিতা, চুগলুম গাছের বন। মোটা মোটা বেতের লতা গাছগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে অরণ্যকে জটিল করে তুলেছে।

আন্দামানের অরণ্য।

কতকাল ধরে এই বনভূমি বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপের দখল নিয়েছে। কিড সাহেবের কলোনি উঠে যাওয়ার পর এই নির্জন, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অধিকার কায়েম করতে কোনো দিন দ্বিতীয় কোনো দাবিদার জোটে নি। বছরের পর বছর এই দ্বীপে কত বনস্পতি, কত ক্ষুদ্র নগণ্য উদ্ভিদই না জন্মেছে। গাছে ফুল ধরেছে, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ। বীজের মধ্যে অরণ্য আবার নতুন করে জন্ম নিয়েছে। শিকড়ে বাকড়ে সন্তান সন্ততিতে এই অরণ্য কতকাল ধরে এই দ্বীপের মাটি ঢেকে রেখেছে।

সবার আগে আগে চলেছে পালসাহাব। হাতে একটা ধারাল বর্মী দা। দা দিয়ে লতাপাতা ডালপালা কেটে ছেঁটে পথ করে এগুচ্ছে সে। শুধু সে-ই না, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ যারা নতুন এই দ্বীপে এল তাদের মধ্যে যে সব শক্তসমর্থ পুরুষ রয়েছে তারাও জঙ্গল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে।

অরণ্য কি সহজে পথ দিতে চায়! ডালপালার হাজার বাহু বাড়িয়ে এই দ্বীপের নতুন শরিকদের ক্রমাগত বাধা দিচ্ছে। কোথাও রয়েছে হাওয়াই বুটির ঝোপ, কোথাও বেতকাঁটার ঝাড়, কোথাও নাম না-জানা বুনো গাছের চাপ-বাঁধা দেওয়াল।

কতকাল এই অরণ্যে সূর্যালোক ঢোকে নি! নিঝুম, নিস্তব্ধ, ছায়াশীতল এই বনভূমি।

শ্যাওলা-ধরা পিছল মাটির ওপর দিয়ে দুলে দুলে, কখনো গুঁড়ি মেরে, কখনো উবু হয়ে এগুচ্ছে পালসাহাব। আর সমানে উৎসাহ দিচ্ছে, 'আ যা, কেমন আচ্ছা সড়ক বানিয়ে দিচ্ছি। মাথা সামাল রেখে আমার পিছু পিছু আ যা। কোঈ ডর নেহী।'

ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকায় পালসাহাব। হলদে নোংরা দাঁতগুলো মেলে খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, 'শালে লোগ, ঘাবড়াও মাত। তোদের সাথ আমি আছি।' বলেই বুকে চাপড় বসায়।

পায়ে পায়ে ঠোক্কর, মাথায় গুঁতো আর চারপাশ থেকে ডালপালা এবং কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে মানুষের পিণ্ডটা এগিয়ে চলেছে।

প্যাডক, চুগলুম কি দিদু গাছের মাথা থেকে থোকায় থোকায় জোঁক পড়ছে। কতকালের ক্ষুধার্ত এই সব রক্তচোষা জীব। এই প্রথম তারা মানুষের রক্তের স্বাদ পাচ্ছে।

বুড়ো রসিক শীল ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে। কাঁপা কাঁপা, ফিস ফিস স্বরে সে বলে, 'এই আমরা আইলাম কুনখানে!'

মানুষের ডেলাটার ভেতর থেকে কে যেন বলে, 'নিঘ্‌ঘাত মইরা যামু। এট্টা দিনও বাচুম না।'

চলতে চলতে কান্নার শব্দ উঠল। সেই মৃতমুখ, নিঃস্ব মানুষগুলো গলা মিলিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। অসহায়, ভীত মানুষের কান্না উত্তর আন্দামানের এই স্তব্ধ অরণ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কতকাল পর এখানে মানুষ কাঁদছে! কান্নার শব্দ নিবিড় বনভূমি ভেদ করে বাইরে যায় না, বৃদ্ধ প্রাচীন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জমাট বেঁধে যেতে লাগল যেন।

গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকছিল পালসাহাব। হঠাৎ উঠে ঘুরে দাঁড়াল। ফেল্ট হ্যাটের নিচে যে মুখটা দেখা যায় সেটা বিরক্ত এবং ভয়ানক হয়ে উঠেছে। কপাল কুঁচকে গিয়ে অনেকগুলো আঁকিবুঁকি ফুটেছে। নাকটা ফুলে ফুলে মোটা হচ্ছে।

পালসাহাব গর্জে উঠল, 'কৌন কৌন—কে কাঁদছে? কাঁদো মাত। এ জঙ্গল আমার এলাকা, এখানে চিল্লানি চলবে না। উল্লু লোগ—' বলেই আবার ঘুরে ঝোপটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেল।

মুহূর্তে কান্নার আওয়াজ ঝিমিয়ে এল।

অন্ধকার, হিমাক্ত, নিঝুম এই বনভূমির মাথায় আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। বোঝা যায়, অরণ্যের বাইরে এখনো অল্পস্বল্প রোদ রয়েছে। কিন্তু সে রোদের রং কী, তেজ কতটা, বুঝবার উপায় নেই।

নিশির ডাকের মতো বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে মানুষগুলো পালসাহাবের পিছু পিছু চলেছে। কোথায় চলেছে, নিজেরাই জানে না। সে সম্পর্কে তাদের যেন আগ্রহ পর্যন্ত নেই। কী এক দুর্বোধ্য, নিষ্ঠুর নিয়তি মানুষের ডেলাটাকে ক্রমাগত ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে চলেছে।

মাথার ওপর থেকে থোকায় থোকায় যে জোঁক ঝরছে, মানুষের রক্ত শুষে শুষে কচি পটলের মতো ফুলে উঠে আপনা থেকেই একসময় সেগুলো গা থেকে খসে পড়তে লাগল।

এদিকে কান্নার শব্দটা ঝিমিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু একেবারে থামে নি। অনুচ্চ করুণ স্বরে মানুষগুলো বিনিয়ে বিনিয়ে এখন কাঁদছে।

বুড়ো রসিক শীল বলে, 'হা ঈশ্বর, কপালে এত লেখছিলা! এই কুন দ্যাশে মারতে আনলা! হা ঈশ্বর—' বলতে বলতে তার গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর মানুষের চাপা কান্না আর এই নিথর বনভূমিকে হঠাৎ চমকে দিয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রখর হাসির শব্দ উঠল। কাপাসী হাসছে। ক্রমশ উথলপাথল হয়ে উঠতে লাগল হাসিটা।

একটা কাঁটাঝোপ কেটে কেটে পথ বানাচ্ছিল পালসাহাব। হাসির শব্দে সে ঘুরে দাঁড়াল। দাড়িভর্তি জংলী মুখটা খিঁচিয়ে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'কৌন, কৌন হাসতা?'

কাঁপা, ভীরু স্বরে কে যেন জবাব দিল, 'নিত্য ঢালীর মাইয়া কাপাসী। কাপাসী হাসে সাহেব বাবা।'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'এ হল ডিগলিপুর, নর্থ আন্দামান। এখানে হাসি চলবে না।'

হাসি চলবে না। কিন্তু চলল।

এক ধমকে এক দল মানুষের কান্না প্রায় থামিয়ে দিয়েছিল পালসাহাব। কিন্তু কাপাসীর হাসি থামানো গেল না। উত্তর আন্দামানের স্তব্ধ অরণ্যে চমক দিয়ে দিয়ে কাপাসীর হাসি মাততেই লাগল।

পালসাহাবের ভুরু দু'টো কুঁকড়ে রইল কিছুক্ষণ। বিড় বিড় করে সে বলল, 'বহোত তাজ্জবের লেড়কী!' বলেই আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করল।

পালসাহাবের পিছু পিছু মানুষের পিণ্ডটা কতক্ষণ যে চলল, হিসাব নেই। টিলা-চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, জঙ্গল ফুঁড়ে ফুঁড়ে কোথায় কতদূরে চলেছে, ওরা জানে না। চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে, কাঁটার খোঁচায় সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। জোঁকের পেটে তাজা রক্তের মাসুল দিয়ে তারা চলেছে তো চলেছেই।

একসময় বোঝা গেল, অরণ্যের মাথায় আকাশটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। রোদ আর নেই।

ডানা ঝাপটিয়ে সিন্ধুসারসগুলো বনের আশ্রয়ে ফিরে যাচ্ছে। ক্বঁক ক্বঁক শব্দে কোয়াক পাখিরা ডেকে উঠল। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে সন্ধ্যা নামল।

পালসাহাব নামে এক অনিবার্য নিয়তির পিছু পিছু চলতে চলতে মানুষগুলো একসময় একটা টিলার মাথায় এসে পড়ল।

এ জায়গাটা অনেকখানি পরিষ্কার। এলোমেলো কিছু ঝোপঝাড় থাকলেও বড় বড় গাছ চোখে পড়ে না। ফলে অন্ধকার এখানে তত গাঢ় নয়।

পালসাহাব থমকে দাঁড়াল। পেছন দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল, 'আ গিয়া, ট্রানজিট ক্যাম্প আ গিয়া—'

পাঁচ

ট্রানজিট ক্যাম্প।

উঁচু টিলাটার মাথায় কতকগুলো বাঁশের খুঁটি এখানে ওখানে পুঁতে রাখা হয়েছে। সেগুলোর গায়ে গোটাকতক লণ্ঠন বাঁধা।

বঙ্গোপসাগরের এই আদিম দ্বীপের রাত্রিগুলো কেমন যেন সৃষ্টিছাড়া। এখন যত না অন্ধকার তার চেয়ে ঢের বেশি কুয়াশা।

সেই বিকেল থেকেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। প্রথমে ফিনফিনে একটা পর্দার মতো অরণ্যকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর ধীরে ধীরে সেই কুয়াশা জমাট বেঁধে, গাঢ় হয়ে দিগন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। চারপাশ থেকে নিরেট কুয়াশার খাড়া খাড়া দেওয়াল আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে।

অরণ্য বা আকাশ, কিছুই এখন দেখা যায় না। কোনো কিছুর নির্দিষ্ট আকার ঠিকমতো বোঝা যায় না। সব এখন অবলুপ্ত। ঘন সাদা কুয়াশা আন্দামানের এই টিলাটাকে গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে যেন।

বাঁশের ডগায় মিট মিট করে লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। মৃদু আলোতে কুয়াশা এবং অন্ধকার সামান্য ফিকে হয়েছে মাত্র।

টিলার মাথাটা অনেকখানি জুড়ে সমতল। জঙ্গল সাফ করে এখানে জমি বার করা হয়েছে। এপাশে ওপাশে সারি সারি কতকগুলি ঝুপড়ি চোখে পড়ে।

অরণ্যকে দলে পিষে এবং মুচড়ে দিয়ে বাতাস ছুটে আসছে। দমকা বাতাসের ঘা খেয়ে খেয়ে লণ্ঠনগুলো নিবে যাওয়ার উপক্রম হয়, নির্জীব হয়ে পড়ে। নিজেদের ক্ষীণ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা পাল্লা দিয়ে বাতাস কুয়াশা এবং অন্ধকারের সঙ্গে যুঝে চলেছে।

আবছা আলোতে বোঝা যায়, এধারে ওধারে ছড়ানো ঝুপড়িগুলোর মাথায় বেতপাতার চাল, বাঁশের বেড়া, বাঁশের পাটাতন।

সি. এ পালসাহাব টেনে টেনে চিল্লাল, 'দেখে নে শালে লোগ, এই হল ট্রানজিট ক্যাম্প। তোদের আস্তানা।'

পালসাহাবের পেছনে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কেউ জবাব দেয় না। শূন্য দৃষ্টিতে ঝুপড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে।

পালসাহাব বলল, 'যতদিন না নিজের নিজের কোঠি বানিয়ে নিতে পারবি ততদিন এখানেই থাকতে হবে।'

এর মধ্যে পাটোয়ারি, চেনম্যান এবং রাঁচির কুলিরা অনেকগুলো মশাল ধরিয়ে ফেলেছে। এবার অন্ধকার এবং কুয়াশা অনেকটা পিছু হটল।

পালসাহাব মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা, সবাই ঝোপড়ির ভেতর যা। এবার খানা মিলবে।'

মানুষগুলো নড়ল না। আগের মতোই শূন্য চোখে ঝুপড়ি ক'টার দিকে তাকিয়ে রইল।

পালসাহাব আবার বলল, 'ঝোপড়ির ভেতর যা, খানা মিলবে।'

পুরো পাঁচটা দিন বঙ্গোপসাগরের অগাধ কালো জল পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছে মানুষগুলো। এই পাঁচ দিন তাদের ঠিকমতো খাদ্য জোটে নি। জাহাজ থেকে চারপাশে পারাপারহীন সমুদ্র দেখতে দেখতে অদ্ভুত এক ভয়ে তারা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। বুঝে উঠতে পারছিল না, এই বিপুল কালাপানি পেরিয়ে তারা কোথায় চলেছে।

যতদূর নজব যেত, কালো কুটিল দুর্জ্ঞেয় বঙ্গোপসাগর। তাদের মনে হয়েছিল, এই সমুদ্রের শেষ নেই। সমুদ্র কোনোদিন ফুরোবে না।

কিন্তু সমুদ্র একদিন ফুরলো। কূলও মিলল। শক্ত নির্ভরযোগ্য মাটির দেখা পাওয়া গেল। এরিয়াল উপসাগরে এসে জাহাজ নোঙর ফেলল।

ভয়েও বুঝি এক ধরনের নেশা আছে। ভয়ঙ্কর সমুদ্র দেখে যে নেশা ধরেছিল, সেই নেশার ঘোর এখনও কাটেনি এই মানুষগুলোর।

পালসাহাব এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কি রে শালেরা, ঝোপড়ির ভেতর যাবি না! খানা খাবি না!'

পাঁচটা দিন জাহাজে ভাল করে খেতে পারে নি। তবু খাদ্যের কথায় মানুষগুলোকে এতটুকু উৎসুক দেখাল না। বিন্দুমাত্র চঞ্চল হল না কেউ। এই মুহূর্তে তাদের খিদে এবং তেষ্টার অনুভূতিও যেন লোপ পেয়েছে।

এবার পালসাহাব আর চিল্লাল না, খেঁকাল না। মানুষগুলোকে বেতের মোটা একটি ডাণ্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঝুপড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই হয়তো এই মানুষগুলোর স্বভাব অনেকখানি বুঝে ফেলেছে পালসাহাব। এদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা নেই। আর থাকলেও সে ইচ্ছা তাদের ওপর কোনো ক্রিয়াই করে না। অন্যের ইচ্ছায় কি তাড়নায় তারা নড়ে চড়ে, চলে ফেরে।

ঝুপড়ির ভেতর ঢুকিয়ে সবাইকে সারি সারি বসিয়ে দিল পালসাহাব। পাটোয়ারি এবং চেনম্যানরা বড় বড় প্যাডক পাতায় ভাত, ডাল এবং সুরমাই মাছের সুরুয়া দিতে লাগল।

মানুষগুলো গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে টিলার মাথায় এই নতুন আশ্রয় আর চেনম্যান পাটোয়ারিদের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে কী ভাবছে, তারাই জানে।

পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'খা শালেরা, হাতের সামনে খানা রয়েছে। গপাগপ মুখে ঢোকাবি তো। খাওয়ার কথাও বুদ্ধুগুলোকে বলে দিতে হয়! বহোত তাজ্জবের আদমী সব।'

চিল্লিয়ে ধমকে, একরকম জবরদস্তি করেই পালসাহাব মানুষগুলোকে খাওয়াল।

খাওয়ার পালা চুকে গেলে পাটোয়ারি আর চেনম্যানরা ঝুপড়িগুলো সাফ করে ফেলল। পালসাহাব বলল, 'মরদানারা (পুরুষেরা), আমার সাথ আয়।'

পালসাহাবের মুখ থেকে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মানুষগুলো উঠে পড়ল এবং তার পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এল।

টিলার মাথায় মোট চল্লিশটা ঝুপড়ি। পালসাহাব বলল, 'বিশ ঝুপড়িতে মরদানারা থাকবে, বাকি বিশ ঝুপড়িতে বালবাচ্চা নিয়ে জেনানারা থাকবে।'

পালসাহাবই থাকার সব বন্দোবস্ত করে দিল। সামনের দিকের ঝুপড়িগুলো পুরুষদের। পেছনের ঝুপড়িগুলো মেয়েদের।

বাইরে রাত্রি আরো গাঢ় হয়েছে। কুয়াশা এবং অন্ধকারের তলায় উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে যেন।

পালসাহাব বলল, 'এবার আমি যাব। জোঁক, কানখাজুরা (এক ধরনের বিষাক্ত বিছে) আর সাপ

মেহেরবানি করে যদি রাত্তিরটা তোদের বাঁচিয়ে রাখে, তা হলে কাল সকালে আবার দেখা হবে।' বলে পালসাহাব হাসল। হাসলে দু'পাটির সবগুলো ভাঙা, বাঁকা, হলদে ছোপধরা দাঁত বেরিয়ে পড়ে।

বিকট শব্দ করে হাসতে থাকে পালসাহাব। হাসির দাপটে ভুরু আর হনু প্রায় জোড়া লেগে চোখ দু'টো ঢেকে যায়। বিশাল মাংসল শরীর দুলতে থাকে।

খানিক পর হাসির দাপট কমল। পালসাহাব বলল, 'আমি যাচ্ছি। লেকিন একটা কথা মনে রাখিস শালে লোগ। কোনো হারামী জেনানাদের ঝুপড়ির দিকে যাবি না। গেলে হাড্ডি চুরচুর করে ফেলব, জান তুড়ে দেব। এই জঙ্গল আমার দুনিয়া, এখানে দুশমনি বেয়াদপি চলবে না। হোঁশিয়ার! মানুষগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে পালসাহাব ঝুপড়ির বাইরে এল। চেনম্যান এবং পাটোয়ারিরা আগেই চলে গিয়েছে। পালসাহাব একটা মশাল ধরাল। তারপর খাড়াই টিলাটা বেয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে গেল। সেখান থেকে গভীর জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

মুহূর্তে উত্তর আন্দামানের কুয়াশা, অন্ধকার এবং অরণ্য পালসাহাব আর তার মশালটা গ্রাস করে ফেলল।

ছয়

নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে পালসাহাব। তার হাতের মশালটা গাঢ় কুয়াশাকে ঠেলে খুব বেশি পিছু হটাতে পারছে না।

মশাল থেকে যেটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে অন্ধকারে আন্দামানের অরণ্যে পথ চলার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। একটা বেতঝোপের মধ্যে গুঁজে সেটা নিভিয়ে ফেলল পালসাহাব।

এবার একটানা অন্ধকার, নিবিড় বনভূমি আর ঘন কুয়াশা নিরেট দেওয়াল হয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত্রির অন্ধকারে পালসাহাবের চোখজোড়া যেন জ্বলতে থাকে। অরণ্য ভেদ করে এগিয়ে চলেছে সে। এখন হাতে শুধু একটা বর্মী দা বাগিয়ে ধরা। বেতকাঁটা এবং ডালপালার খোঁচা লাগলেই সেগুলো কেটে কেটে পথ বানিয়ে নিচ্ছে।

বিচিত্র মানুষ পালসাহাব। রাতের এই অন্ধকার, এই কুয়াশা আর আদিম এই অরণ্যের মতোই সে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়।

জঙ্গল ফুঁড়ে চলতে চলতে হঠাৎ বড় ভাল লেগে গেল পালসাহাবেরা। প্যাডক গাছের পাতা থেকে মাথার ওপর থোকায় থোকায় জোঁক পড়ছে, বাড়িয়া পোকা কামড়াচ্ছে সমানে, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। এই নিস্তব্ধ রাত্রির অরণ্য পালসাহাবকে যেন জাদু করেছে। মোহগ্রস্তের মতো সে হাঁটতে লাগল।

কতকাল পর উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আজ নতুন মানুষ এসেছে। পালসাহাব ভাবছে, একদিন সে-ও এসেছিল এই দ্বীপে। ঠিক এই দ্বীপে নয়, এসেছিল দক্ষিণ আন্দামানে।

কত বছর আগে আন্দামানে এসেছিল, আজ আর মনে করতে পারে না পালসাহাব। বিশ বছর হতে পারে, পঁচিশ বছরও হতে পারে, কিংবা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। কতকাল যে সে আন্দামানের জঙ্গলে কাটাচ্ছে তার হিসেবই বা কে রাখে। এই দ্বীপ হিসেবের জগতের বাইরে।

জমির ব্যাপারে দাঙ্গা এবং খুনের অপরাধে পঁচিশ বছরের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছিল পালসাহাব। সেলুলার জেলে দু' মাস বিশ দিন মেয়াদ খেটে 'আন্দামান রিলিজ' নিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজে আসে।

বিশ, পঁচিশ কি তিরিশ বছর আগের অতীতের প্রায় অনেকটাই স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে পালসাহাবের। পুরনো জীবনটা তার কাছে প্রায় ঝাপসা। সে জন্য বিশেষ মাথাব্যথাও নেই তার।

শুধু মনে আছে, দেশ ছিল তার সুদূর পূর্ব বাংলায়—ময়মনসিং জেলায়। মনে পড়ে, কোথায় যেন অগুনতি গাছের ছায়ায় ছায়ায় শান্ত একটি গ্রাম ছিল, মাটির দেওয়াল আর টিনের চালের একটি ছোট্ট ঘর ছিল। তকতকে করে নিকানো আঙিনায় বাতাবি গাছের দীঘল ছায়া পড়ত। কোত্থেকে লেবু ফুলের

মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসত। মাটির দেওয়ালে সিঁদুর দিয়ে কী যেন আঁকা ছিল। সেই আঁকা ছবিটার নাম যে কী? এক এক সময় অনেক ভেবেও মনে করতে পারে না পালসাহাব। উঠোনে ভারি নরম চেহারার কোমলমুখী এক বউ ঘুরে বেড়াত। বাতাবি গাছের ছায়ায় গোলগাল একটি অবোধ শিশু খিলখিলিয়ে হেসে উঠত।

দুপুরের রোদে ঢেউটিনের চালটা পালিশ করা রুপোর মতো জ্বলত। কোথায় যেন ঘুঘু ডাকত। ঠিক সেই সময় কে এক কৃষাণ সর্বাঙ্গে মাটি মেখে, কাঁধে লাঙল ফেলে ফিরে আসত। সেই ঝকঝকে উঠোন, ঘুঘুর ডাক, বাতাবি গাছের ছায়া মোহ ধরাত মনে। কোমলমুখী বউ তখন গোলগাল নাদুস-নুদুস ছেলে কোলে নিয়ে বসেছে ছায়াভরা স্নিগ্ধ আঙিনায়। শিশুটি তার অমৃতভরাট বুকে অপার তৃপ্তির উৎসে মুখ ডুবিয়েছে। দেখে দেখে মুগ্ধ চোখে পলক পড়ত না সেই কৃষাণের।

পঁচিশ তিরিশ বছর আগের সেই জীবনটার খেই একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে পালসাহাব। টুকরো টুকরো, অস্পষ্ট কতকগুলো ছবি স্বপ্নের মতো শুধু মনে পড়ে।

আচ্ছন্ন স্মৃতিব গভীর থেকে মাঝে মাঝে এখনো সেই বউ, বাতাবি গাছের ছাযায় সেই ছেলে, দুপুরের সেই খা খা রোদ, ঘুঘুর ডাক, সেই মুগ্ধ কৃষাণের ছবি ভেসে ওঠে। কোথায় কতদূরে তাদের ফেলে এসেছে, ঠিক করে উঠতে পারে না পালসাহাব। কোনোদিন আদৌ তারা সত্য ছিল কিনা, কে তার হদিস দেবে?

আন্দামানে আসার পর সেই বউ আব সেই ছেলেব কাছে ফিরে যাওয়াব জন্য প্রথম প্রথম উন্মাদ হয়ে উঠত পালসাহাব। খেত না, ঘুমতো না, কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না। উপসাগবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিনরাত কী যে ভাবত, সে-ই জানে। সাঁতবে দেশে ফেবার জন্য দু দু'বার সে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে। দু'বারই সেলুলার জেলের পেটি অফিসার আর টিন্ডালরা তাকে সমুদ্র থেকে তুলে এনেছে।

একদিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজে পালসাহাবকে জঙ্গলে চালান দেওযা হল। তারপব এই দ্বীপপুঞ্জের অরণ্যে কত বছর যে কেটে গেল, আজ আর পালসাহাব হিসেব করে বলতে পারবে না।

ইয়ার-দোস্তরা আগে আগে জিজ্ঞেস করত, 'পালসাহাব, তোমার সাজার মেয়াদ তো ফুরিয়েছে। এবার মুলুকে ফিরবে না?'

পালসাহাব মুখে কিছু বলত না। মাথা ঝাঁকিয়ে জানাতো, যাবে না।

ইয়ার-দোস্তরা বলত, 'গাঁও-মুলুকে জরু-বেটা কেউ নেই?'

পালসাহাব এবারও জবাব দিত না। ঝকঝকে উঠোনে স্নিগ্ধ চেহাবার একটি বধূ আর একটি অবোধ শিশুর ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠত শুধু। সঙ্গে সঙ্গে মনটা উদাস হয়ে যেত।

কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপমালা যেন জাদু করেছে পালসাহাবকে। কতকাল ধরে তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন কুহকিত হয়ে আছে এর অরণ্যের মধ্যে। এর উপসাগর-উপকূল-পাহাড় এবং সমুদ্রের মধ্যে মিশে গিয়েছে সে। এই দ্বীপের সঙ্গে তার অস্তিত্ব এখন একাকার। এখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে পালসাহাব।

না, কোনোদিনই এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও সে যেতে পারে নি। সেই বউ আর শিশুর টানেও না।

তা ছাড়া, পালসাহাব যাবেই বা কোথায়? পঁচিশ তিরিশটা বছর আন্দামানের এই দ্বীপে দ্বীপেই তার কাটল। এই দীর্ঘ সময়ে সেই বউ, সেই শিশু, সেই ঝকঝকে আঙিনার ঠিকানা পৃথিবী থেকে একেবারেই মুছে গিয়েছে কিনা, সে খবর পালসাহাব জানে না। খুনের অপরাধে জেলখাটা দ্বীপান্তরের আসামী পুরনো সমাজে ফিরে গেলে কে কেমন ভাবে নেবে, সে সম্বন্ধে ভয় আছে তার। হয়তো নিজের স্ত্রী-পুত্র থেকে শুরু করে সবাই তার গায়ে থুতু দেবে। কিন্তু এই আন্দামানে কে কার গায়ে থুতু দেয়? এখানে সবাই তো খুন বা অন্য কোনো মারাত্মক অপরাধের আসামী।

এই দ্বীপের বাইরে কোথাও যেতে চায় না পালসাহাব। যাওয়ার মতো কোনো ঠিকানাও তার নেই। এখানে আসার আগে তার যে অতীত ছিল, পৃথিবীর বুকে তার যে ঠিকানা ছিল, এতদিনে সেই ঠিকানা এবং অতীত, দুই-ই খুইয়ে বসেছে সে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপগুলির বাইরে যে বিপুল দুর্জ্ঞেয় জগৎ পড়ে রয়েছে সে সম্বন্ধে পাল সাহাবের মনে অদ্ভুত এক সংশয় আছে, বিচিত্র এক ধরনের ভয়ও। মনে মনে সেই পৃথিবীটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণাও খাড়া করতে পারে না পালসাহাব। সেটা কেমন, তার স্বরূপ কী, যখনই সে সম্বন্ধে কিছু ভাবতে বসে, থই আর মেলে না। ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। ফলে একসময় ভাবনাটা ছেড়েই দেয় সে।

না, কোনোদিন এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না পালসাহাব।

আজকাল সেই কোমলমুখী বউ আর সেই গোলগাল শিশুটির কথা ঠিকমতো মনেও পড়ে না। যদিও বা পড়ে, মনটা সামান্য উদাস হয় মাত্র। তাদের কোথায়, কত পেছনে যে ফেলে এসেছে পালসাহাব! যেন গত জন্মের স্মৃতি।

এখানে আসার আগে বাংলাতেই কথা বলত পালসাহাব। সে ভাষাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছে। তার বদলে আজকাল হিন্দি এবং উর্দু মেশানো বিচিত্র আন্দামানী বুলি শিখেছে।

এই দ্বীপপুঞ্জ একটু একটু করে পঁচিশ তিরিশ বছরে পালসাহাবকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

সেলুলার জেল থেকে 'আন্দামান রিলিজ' পাওয়ার পর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কুলির কাজ নিয়ে এসেছিল সে, তারপর হয়েছে জবাবদার। শেষ পর্যন্ত 'পারমোশ' (প্রমোশন) পেয়ে হয়েছিল ফরেস্ট গার্ড।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু এবং মালাবার থেকে মোপলা কৃষাণরা সেটেলমেন্টের জন্য বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপগুলোতে আসতে শুরু করেছে। অরণ্য সংহার করে দক্ষিণ মধ্য ও উত্তর আন্দামানে, হ্যাভলক দ্বীপে উপনিবেশ বানাবার কাজ চলছে। উদ্বাস্তু উপনিবেশ, সরকারি পরিভাষায় যার নাম 'রিফুজি সেটেলমেন্ট'। আন্দামানের অরণ্যময় বর্বর দ্বীপগুলিতে জীবনের উৎসব শুরু হয়েছে।

হঠাৎ কী খেয়াল হল পালসাহাবের, ফরেস্টের কাজ ছেড়ে সেটেলমেন্টের কাজ ধরল। এখন সে কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টান্ট। সংক্ষেপে সি. এ পালসাহাব।

অন্ধকার আর কুয়াশা ঠেলে, বর্মী দায়ের ফলায় পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে পালসাহাব। উত্তর আন্দামানের এই অরণ্যের সব অন্ধিসন্ধি, কোথায় কোন ঝোপ, কোথায় প্যাডক গাছের জটলা, কোথায় দিদু আর পেমা গাছগুলি তাদের খাড়া খাড়া মাথা আকাশের দিকে তুলে রেখেছে, সমস্ত পালসাহাবের মুখস্থ। একরকম চোখ বুজেই সে এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারে।

চলতে চলতে একসময় পথ ফুরোয়। ছোট্ট একটা টিলায় এসে পড়ে পালসাহাব। চেঁচিয়ে ডাকল সে, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

কোনো জবাব মিলল না।

পালসাহাব বিড় বিড় করে বলল, 'শালীর সন্ধে হলেই নিদ। নিদ আর নিদ। নিদ আজ ঘোচাচ্ছি।' তারপর গলা তিনপর্দা চড়াল। 'এ শালী মা-তিন, জলদি ওঠ।'

'কৌন রে?' ঘুম-জড়ানো ভাঙা ভাঙা স্বরে মা-তিন বলল।

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি রে শালী, তোর বাপ! হারামীর বাচ্চার খালি নিদ আর নিদ। জলদি বাতি জ্বাল।'

ও পক্ষও চুপচাপ রইল না। হিংস্র গলায় মা-তিন বলল, 'গালি দিবি না শালে। জান তুড়ে দেব। তুই কত বড় বাপ হয়েছিস, একবার দেখব। কুত্তার বাচ্চা কাঁহাকা!'

গভীর রাতে যখন বঙ্গোসাগরের এই দ্বীপ কুয়াশা এবং অন্ধকারের তলায় একেবারেই ডুবে গিয়েছে, তখন পালসাহাব আর মা-তিনের মধ্যে খানিকটা অশ্লীল, অকথ্য গালিগালাজের আদান প্রদান হয়ে গেল।

একটু পরে কুয়াশা ফুঁড়ে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল। আলোটা পালসাহাবের দিকে এগিয়ে আসছে।

আবছা, ছেঁড়া ছেঁড়া আলোতে বোঝা যায়, ছোট্ট টিলার মাথায় হাওয়াই বুটির জঙ্গল উদ্দাম হয়ে রয়েছে। ওপাশের উতরাইর দিকটা প্রকৃতির অদ্ভুত খামখেয়ালিতে ন্যাড়া। সেখানে একটা ঘাসও জন্মায় নি। ওই ন্যাড়া উতরাইটায় পালসাহাবের ঝুপড়ি। কুয়াশায় আর অন্ধকারে ঝুপড়িটা থাবা গেড়ে বসে থাকা আদিম জন্তুর মতো দেখায়।

আলোটা সামনে এসে পড়ল। দেখা গেল, লণ্ঠন জ্বালিয়ে মা-তিন এসেছে।

হাওয়াই বুটির জঙ্গলের ওপাশে বিরাট এক খাদ। রোজই এই খাদটা পর্যন্ত এসে মা-তিনকে ডাকে পালসাহাব। অন্ধকারে খাদে নামতে ভয় হয় তার।

লণ্ঠনের আলোয় খাদের ভেতরটা দেখতে দেখতে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ওপারে চলে গেল পালসাহাব। এখনো সে বিড় বিড় করে বকে চলেছে, 'খিলাফৎ ঠিকই বলেছিল, বর্মী মাগীগুলো বহুত খারাবী।'

মা-তিন পালসাহাবের কথাগুলো ঠিক শুনে ফেলেছে। সে গর্জে উঠল, 'বর্মী মাগীগুলো বহুত খারাবী! দুশমন কাঁহাকা, এত সাল ঘর করে এখন বেইমানির কথা বলছিস!' বলতে বলতে তার চাপা কুতকুতে চোখ থেকে আগুন ঠিকরোতে লাগল। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধ বুকটা দ্রুত তালে ওঠানামা করছে। ফোঁস ফোঁস করে গরম নিশ্বাস পড়ছে।

সেই ভয়ঙ্কর মূর্তির দিকে তাকিয়ে পালসাহাবের মুখে কথা যোগায় না।

হাওয়াই বুটির জঙ্গল পেছনে ফেলে ঝুপড়ির সামনে এসে পড়ল দু'জনে। বাঁশের ঝাঁপ খুলে প্রথমে মা-তিন ভেতরে ঢুকল। পেছনে পালসাহাব।

বাঁশের পাটাতনের তলায় একপাল শুয়োর ডেলা পাকিয়ে রয়েছে। মানুষের সাড়া পেয়ে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে উঠল। মাচানের তলা থেকে অনেকগুলো কুকুর আহ্লাদে কেঁউ কেঁউ করে ডাকল। কুকুর এবং শুয়ারের গা থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসছে। জান্তব গন্ধে ঝুপড়ির বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে যেন।

শুধু কি কুকুর আর শুয়োরের গন্ধ? নাপ্পির গন্ধ, শুঁটকি মাছের গন্ধ, আধসিদ্ধ গোসাপের চামড়ার গন্ধ, নোংরা চটচটে বিছানা থেকে ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ, সব মিলিয়ে একটা মিশ্রিত উগ্র গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই টিলার অন্ধকার, কুয়াশা এবং বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা যায়, ঝুপড়ির ভেতর তিনটে বাঁশের মাচান। শোওয়ার জন্য দু'টো, খাওয়ার জন্য একটা। খাওয়ার মাচানটা বেশ উঁচু।

বাঁশের দেওয়ালে বর্মী দা এবং সড়কি গোঁজা রয়েছে। বোঁচকা-বুচকি, ভাঙা জং-ধরা দু'চারটে টিনের পেটরা ঝুপড়ির এ কোণে ও কোণে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে।

গজর গজর করতে করতে একটা কাঠের থালায় ভাত, নাপ্পি আর শুঁটকি মাছের সুরুয়া ঢেলে পালসাহাবের দিকে ঠেলে দিল মা-তিন। নিজেও একটা থালা টেনে নিল।

পালসাহাব বলল, 'আজ তারা এসে গেছে।'

মা-তিন কিছুই বলল না। শুঁটকি মাছের থকথকে ঝোল দিয়ে ভাত মেখে বড় বড় গ্রাস তুলতে লাগল মুখে।

ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে পালসাহাব বলল, 'এখানে কলোনি বসবে, কুঠিবাড়ি উঠবে, জঙ্গল সাফ হয়ে ক্ষেতিবাড়ি হবে।'

মা-তিন পালসাহাবের দিকে তাকায় না। তার মুখেচোখে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। নিজের মনে ভাতের দলা মুখে পুরতে থাকে।

পালসাহাব আপন খেয়ালেই বকে যায়, 'খুব ভাল হবে। এই দ্বীপে যত মানুষ আসে ততই ভাল।' বলতে বলতে মুখ তোলে। লক্ষ করে, তার কোনো কথাই শুনছে না মা-তিন। কিছুক্ষণ মা-তিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর নরম স্বরে ডাকে, 'এ মা-তিন, এ শালী, আমার দিকে তাকা।'

'কী বলছিস?'

'শালী, গোসা করেছিস?'

ঘাড় গুঁজে নিজের থালাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে মা-তিন। চাপা গলায় ফুঁসে ওঠে, 'হারামী।'

এবার এক কাণ্ডই করে বসে পালসাহাব। কাঠের থালাটা এক পাশে ঠেলে উঠে আসে। এঁটো হাতেই মা-তিনকে জাপটে ধরে তার সুরুয়া-লেপটানো মুখে এক দমে গোটা বিশেক চুমু খায়।

সমানে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে মা-তিন। আঁচড়ে কামড়ে পালসাহাবকে ফালা ফালা করে ফেলতে থাকে। বলে, 'ছাড়, ছাড়।'

'না না—'

পালসাহাব দু'হাতে মা-তিনের মাংসল, নরম শরীরটা জড়িয়ে নিয়ে বুকের কাছে গুটিয়ে আনে। তার জাপটানিতে মনে হয়, হাড়গুলো ভেঙে মা-তিন একটা পিণ্ড পাকিয়ে যাবে।

পাটাতনের তলা থেকে শুয়োরের পাল এবং মাচানের তলা থেকে কুকুরের পাল মা-তিন আর পালসাহাবের কাণ্ড দেখে। দেখে দেখে শব্দ করতে পর্যন্ত ভুলে যায় তারা।

'ছাড়—ছাড়—ছাড়—' মা-তিন সমানে চিল্লায়। দাপাদাপি করে। হঠাৎ পায়ের গুঁতো লেগে মাচানের ওপর থেকে লণ্ঠনটা নিচে পড়ে নিবে যায়। মুহূর্তে বাইরের কুয়াশা আর অন্ধকার ছুটে এসে ঘরটাকে ভরে ফেলে। আর তারই মধ্যে উন্মাদের মতো পাল সাহাব মা-তিনকে সোহাগ জানাতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সমস্ত কিছুই সৃষ্টিছাড়া। অনেক, অনেক দূরে সভ্য ভদ্র মানুষের জগতে যে নিয়মে প্রণয়ের প্রকাশ ঘটে, এখানে তা খাটে না। প্রণয় এখানে হৃদয়ের সূক্ষ্ম পথ ধরে চলে না। তার প্রকাশ বন্য, বর্বর এবং শারীরিক।

মাচানের বিছানা থেকে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠছে। বাঁশের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে সাদা ধোঁয়ার আকারে হিমাক্ত কুয়াশা ঢুকছে।

মাচানে শুয়ে শুয়ে মা-তিন আর পালসাহাবের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়।

সাত

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রথম রাত্রিটা পার হয়ে গেল।

কাল সন্ধ্যায় পালসাহাব ভয় ধরিয়ে গিয়েছিল, সাপ জোঁক আর কানখাজুরারা যদি করুণা করে মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে আজ দেখা হবে। মানুষগুলো সত্যিই বেঁচে আছে। কিং কোব্রা আর কানখাজুরার দল তাদের কাছে ঘেঁষে নি। তাদের বাঁচিয়ে রেখে এই দ্বীপ কোন গূঢ় মতলব হাসিল করতে চায়, কে বলবে।

এখন সকাল।

সারা রাত এই দ্বীপের ওপর স্তরে স্তরে কুয়াশা পড়েছে। সেই কুয়াশার নিচে পাহাড়-অরণ্য, সব কিছু এখনো অবলুপ্ত। অবশ্য কুয়াশা ভেদ করে সোনার তারের মতো দু' চারটে সরু রোদের রেখা এসে পড়েছে টিলার মাথায়।

মানুষগুলো ঝুপড়ির বাইরে এসে বসল।

কাল মনে হয়েছিল, এক একটা মানুষ রক্ত মাংসের জড়পিণ্ড ছাড়া কিছু নয়। তাদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। এমনকি নিজেদের কোনোরকম ইচ্ছা-অনিচ্ছা পর্যন্ত নেই। অন্যের ইচ্ছায় কি তাড়নায় তারা নড়ে চড়ে, চলে ফেরে।

কাল বিকেলেও মানুষগুলো একসঙ্গে ডেলা পাকিয়ে ছিল। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে পুরো একটা রাত কাটিয়ে কালকের সংশয়, জড়তা এবং ভয় তারা খানিকটা যেন কাটিয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে, তাদের আলাদা আলাদা অস্তিত্বও আছে।

কালকের সেই মৃতমুখ, বিষণ্ণ মানুষগুলো চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এখন এই দ্বীপের স্বরূপটা বুঝবার চেষ্টা করছে।

বুড়ি বাসিনী বলল, 'এতবড় সমুন্দুর (সমুদ্র) পাড়ি দিলাম, পাচ-পাচটা দিন পারকূল দেখি নাই। ডরে বুকের লৌ (রক্ত) জইমা গেছিল।' একটু থামে সে। কাপড়ের একটা গিঁট খুলে কাঁচা তামাকপাতা

বার করে মুখে পোরে। তারপর আবার বলে, 'পারকূল যহন পাইছি, মাটি যহন মিলছে, তহন আমরা বাচুম।'

ঝুপড়ির সামনে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল মানুষগুলো। কুয়াশা দ্রুত কেটে যেতে লাগল। সূর্যরশ্মি ক্রমশ সতেজ হচ্ছে।

চারদিক থেকে উঠে এসে মানুষগুলো বুড়ি বাসিনীকে ঘিরে বসল।

বাসিনী আবার বলল, 'আমরা বাচুম, নিচ্চয় বাচুম।'

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'আমরা যে বাচুম, কী কইরা বুঝলা?'

'আমার মন কয়।'

পাটের ফেঁসোর মতো এক মাথা রুক্ষ চুল। শরীরের চামড়া ঢিলে হয়ে গিয়েছে। মুখের চামড়া কুঁচকে অসংখ্য আঁকিবুকি ফুটে উঠেছে। সমস্ত মুখটা জুড়ে কত যে দাগ, তার লেখাজোখা নেই। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। গলায় এক লহর তুলসীর মালা। চোখে মাছের আঁশের মতো পুরু ছানি। এই হল বুড়ি বাসিনী। সে মুখ তুলল। ছানিভরা চোখের বিবর্ণ ঘোলাটে দৃষ্টি কুয়াশার স্তরের ওপারে পাঠিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এততেও যহন মরি নাই, ভগমান তার সাধখান মিটাইয়া মারতে পারে নাই, তহন বাচুম, নিচ্চয় বাচুম। তরা দেখিস—'

তার গলায় জীবন সম্পর্কে অটুট বিশ্বাসের সুর ফোটে। কুয়াশার স্তরের ওপারে কোন দুর্জ্ঞেয় জগৎ থেকে সে এই বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে, কে বলবে।

নিত্য ঢালী দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে এক ধারে বসে ছিল। এবার সে মাথা তোলে। নিরাশ, বিমর্ষ গলায় বলে, 'না, কুনো আশাই নাই।' বলতে বলতে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকায়।

বুড়ি বাসিনী বলল, 'কিসের আশা নাই?'

'পরাণে বাচনের।' টেনে টেনে শ্বাস নেয় নিত্য ঢালী। শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বলে, 'কুনখানে সাত পুরুষের ভিটামাটি পইড়া রইল। আর হগল খুয়াইয়া কুনখানে মরতে আইলাম! না না খুড়ি (কাকী), মিছাই তুমি আশার কথা শুনাও, বাচার কথা শুনাও।' নিত্য ঢালী একেবারেই ভেঙে পড়েছে। তার মনে বাঁচার সামান্য আকাঙ্ক্ষাটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

রসিক শীলও সায় দেয়, 'পাচদিন কালাপানি পাড়ি দিয়া আন্ধারমান (আন্দামান) আইছি। কপালের লিখন কি খণ্ডান যায় খুড়ি! ভগমানের ইচ্ছা, এই দ্বীপেই আমরা মরি।'

বুড়ি বাসিনী সস্নেহে বলে, 'মইরা তো আছিই রসিক, তাই বইলা বাচার শ্যাষ চ্যাষ্টাখান করুম না? পরাণটা বাচানের লেইগা (জন্য) কী না করেছি আমরা? পিছের দিনগুল্যার কথা একবার ভাইবা দ্যাখ দেহি। কথায় কয়, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

রসিক শীল কিছু বলে না। ডাইনে-বাঁয়ে খালি মাথা ঝাঁকায়। মাথার ঝাঁকানিতে কী যে সে বোঝাতে চায় সঠিক বোঝা যায় না।

বাসিনী আবার বলে, 'তরা পুরুষ মানুষ, এমুন কইরা ভাইঙ্গা পড়িস না।'

রসিক শীল বলল, 'ভাইঙ্গা কি সাধে পড়ি খুড়ি! কাইল বিকালে জাহাজ থনে এই দ্বীপে নামছি। কুনখানে নামছি, জঙ্গলের ভিতর দিয়া ভিতর দিয়া পালসাহাবের পিছে পিছে কুনখানে আইসা পড়ছি, ভাইবা ভাইবা কূল পাই না। মানুষ নাই, জন নাই, আত্মবান্ধব নাই। যেদিকে চোখ মেলবা, খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। দেইখা মনে লয়, কুনো কালে এই দ্বীপে মানুষ আহে নাই।' দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'জঙ্গলের দিকে একবার চাইয়া দেখছ খুড়ি, বুকখান থরথরাইয়া কাপে। জঙ্গল দেখলে বাচনের সাধখান আর থাকে না। হা ভগমান, কালাপানি পাড়ি দিয়া এই কুনখানে আনলা? কপালে কী যে লেখছ, তুমিই জানো।'

চারপাশে মানুষগুলো নির্জীব স্বরে বলে, 'ঠিক কথা।'

বুড়ি বাসিনীর ঘোলা ঘোলা, বিবর্ণ চোখ দু'টো হঠাৎ ঝকঝকিয়ে ওঠে। 'মুখে খালি মরণের কথা। ক্যান, বাচনের কথা কইতে পারস না? তরা জীয়ন্ত মানুষ, না কতগুলান মড়া?'

অতি দুঃখে হাসে মানুষগুলো।

রসিক শীল বলে, 'খুড়ি এককালে মানুষ আছিলাম ঠিকই। যহন দ্যাশ আছিল, ঘর আছিল, চৌদ্দ

পুরুষের ভিটেমাটি আছিল। কিন্তুক এই জীবনটার উপুর দিয়া কয়টা বছর যা গেল, হেইতে আর আমরা মানুষ নাই।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না। বাসিনীকে ঘিরে ঝিম মেরে বসে থাকে।

হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে, 'পালসাহাব কাইল রাইতে কইয়া গেছিল, আইজ সকাল হইলে আইব। কই, অহনও তো আইল (এল) না!'

মানুষগুলো চকিত হয়ে উঠল, 'ঠিকই তো।'

'তবে কি পালসাহাব আর আইব না!'

রসিক শীল বলল, 'এই নিঃঝাম জঙ্গলে আমাগো (আমাদের) দ্বীপান্তরি দিয়াই বুঝিন গেল পালসাহাব। এইখানেই আমরা মরুম।'

রসিক শীলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো ডেলা পাকিয়ে গেল। বউ-বাচ্চা-ছেলে-মেয়ে-বুড়ো, যারা ঝুপড়ির ভেতর ছিল, ছুটে এসে মানুষের পিণ্ডটার মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেল। তারপরেই কান্নার রোল উঠল। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অন্তরাত্মাকে চমকে দিয়ে নতুন আগন্তুকেরা ভয়ে আতঙ্কে কাঁদছে। বুঝিবা এই ভীষণ অরণ্যে মৃত্যুর স্বরূপটা কিছু বুঝে, বাকিটা না-বুঝে জীবনের জন্য শেষ বারের মতো তারা কেঁদে নিচ্ছে।

পরস্পরের গলা জড়িয়ে মানুষগুলো ডুকরে ডুকরে ডাক ছেড়ে জীবনের অন্তিম কান্না কাঁদছে। এমন যে বুড়ি বাসিনী, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের গভীর অরণ্যে যে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, হঠাৎ ভয় পেয়ে সে-ও কাঁদতে শুরু করেছে।

সবাই কাঁদে, কিন্তু একজন কাঁদে না। সে কাপাসী। অনেক দূরে বসে কান পেতে এতগুলো মানুষের কান্নার বিচিত্র ধ্বনি শুনতে থাকে। শুনতে শুনতে আপন মনেই হাসে। আশ্চর্য! সে হাসিতে শব্দ নেই।

কাঁদতে কাঁদতে একসময় কান্নার উদ্যম ফুরিয়ে গেল। জড়াজড়ি করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মানুষগুলো।

ন্যাড়া টিলাটার মাথায় সারি সারি মুখ। শঙ্কিত, ভয়াতুর, পাণ্ডুর।

এদিকে কুয়াশার স্তরগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। রোদের ঝাঁঝ বাড়ছে। প্রথমে কুয়াশা ফুঁড়ে সোনার তারের মতো রোদ আসছিল। এখন ঢল নেমেছে। ঝলমলে সোনালি রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

টিলাটার চারপাশে জটিল অরণ্য। সেদিকে তাকালে বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরে। অদ্ভুত এক ভয়ে স্নায়ুগুলো আড়ষ্ট হয়ে যায়।

একসময় দেখা গেল, সামনের জঙ্গল ফুঁড়ে একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসছে। ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে মানুষগুলো।

চড়াই বেয়ে লোকটা যখন প্রায় টিলার মাথায় এসে উঠেছে, ঘোলা ঘোলা চোখের ওপর একটা হাত রেখে বুড়ি বাসিনী বিড় বিড় করে বলে, 'আমাগো হারাইন্যা, না!' তার স্বরে বিস্ময়।

মানুষগুলো এবার নড়েচড়ে বসে। তাদের চোখেমুখে কৌতূহল ফুটেছে। সকলে প্রায় একই সঙ্গে গলা মেলায়, 'হ, হারাইন্যা।'

ততক্ষণে হারান ওপরে উঠে এসেছে। বুড়ি বাসিনীর পাশে বসে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল সে। এই সকাল বেলায় যখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে চারদিকে তখন তার কপালে কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

বছর পঁচিশেক বয়স। কালো পাথরে খোদাই চেহারা, ছোট ছোট চাপা চোখের ওপর ভুরু দু'টো টান টান হয়ে রয়েছে। খাড়া চোয়াল, ঈষৎ থ্যাবড়া নাক। লম্বা লম্বা কিছু চুল এলোমেলো হয়ে কপালের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। দাড়ির রোঁয়াগুলো শক্ত এবং ধারাল। এই হল হারান।

কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে চামড়া কেটে কুটে গিয়েছে, কাঁধের ওপর খানিকটা মাংস থেঁতলানো; সারা গা বেয়ে তাজা রক্ত ঝরছে। কিন্তু কোনো খেয়াল নেই তার, ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাইকে একবার দেখে নিয়ে দু'পাটি সাদা ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল হারান।

বুড়ি বাসিনী বলল, 'বিহানে (সকালে) উইঠা কুনখানে গেছিলি, হারাইন্যা?'

হারান বলল, 'জাগাখান (জায়গাটা) ঘুইরা ঘাইরা এট্টু দেইখা আইলাম ঠাউরমা।'

'একা একা জঙ্গলে গেলি, ডর ধরল না?'

সবগুলি দাঁত মেলে হি হি করে হাসল হারান। কিছু বলল না। বাসিনী বলল, 'হাসস যে?'

'হাসনের কথায় হাসুম না, তুমি তো জানো ঠাউরমা, কুনো কিছুতে আমার ডর নাই।' আঙুল দিয়ে নিজের নিরেট, চওড়া ঢালের মতো বুকটা দেখিয়ে হারান বলে, 'দেখ, দেখ ঠাউরমা—এই বুকখানের ভিত্‌রে এতটুক ডর নাই।' বলেই হেসে ওঠে সে।

রসিক শীল একটু দূরে বসে ছিল। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে হারানের পাশের জায়গাটা দখল করে বসল। বলল, 'পুরা জাগাখান দেখছস হারাইন্যা?'

'হ।'

'কেমুন দেখলি?' আগ্রহে রসিকের চোখজোড়া চক চক করে।

'বড় বাহারের জাগা তালই (তালুই)। এই পাহাড়টার পিছে একখান খাল আছে, খালে যা মাছ দেখলাম তালই—' কথাটা পুরো না করেই তালুতে জিভ ঠেকিয়ে লোভাতুর একটা শব্দ করে হারান। তারপর বলে, 'সারা জম্ম হেই মাছ খাইয়া ফুরাইতে পারবা না।'

'ক'স (বলিস) কী!'

'সাচা কথাই কই।'

'আর কী দেখলি?'

'আর কী দেখলাম, তুমিই কও দেহি তালই?'

'কী দেখলি, আমি ক্যামনে জানুম?'

হারান মিটি মিটি হাসে। বলে, 'চাষী কিষাণের পোলা, দেখুম আর কী? দেখলাম মাটি। এক দলা মাটি হাতে নিয়া চাপ দিলাম। ঝুরঝুরাইয়া গুড়া হইয়া গেল। এই মাটিতে সোনা ফলব।'

'সাচা?'

'সাচা গো তালই।' হাতের তালুটা চিত করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় হারান। বলে, 'দেখ—'

হারানের হাতে এক ডেলা ভিজে, নরম মাটি। ডেলাটা নিজের হাতে নিয়ে অল্প অল্প চাপ দেয় রসিক শীল। ভেঙে সেটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। এ মাটি মিহি, মসৃণ, মোলায়েম। এ মাটি আঠা আঠা, সরস।

রসিক শীল বলল, 'বড় বাহারের মাটি। ঠিকই কইছস হারাইন্যা, এই মাটিতে সোনা ফলব।'

বুড়ি বাসিনী বলল, 'পিরথিমীতে মাটির লাখান খাটি বস্তু আর নাই রে। হেই মাটি একবার হারাইছি। মাটি হারাইয়া কয়ডা বচ্ছর কত দুঃখুই না পাইলাম!'

বাসিনীর বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ধীরে ধীরে সে বলে, 'এই আন্ধারমান দ্বীপে আইয়া আবার মাটি মিলল। আমরা মরুম না রে, বাচুম। নিচ্চয় বাচুম।'

চারপাশে মানুষগুলো চুপচাপ বসে রয়েছে। বুড়ি বাসিনী নতুন করে তাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, 'এই মাটিই আমাগো বাচাইব।'

মানুষগুলোর চোখমুখ চক চক করে। অনুচ্চ, ফিস ফিস গলায় তারা বলে, 'বাচুম, আমরা বাচুম।'

বাঁচবার নেশায় মানুষগুলো এখন বুঁদ হয়ে বসে থাকে।

একটু দূরে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে রয়েছে কাপাসী। হাঁটুর ওপর মাথাটা হেলিয়ে পলকহীন তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি স্থির এবং শূন্য। চোখের পাতা পড়ছে না। মেঘের মতো ঘন কালো চুল ভেঙে মুখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ উত্তর আন্দামানের এই টিলাটিকে চমকে দিয়ে শব্দ করে হেসে উঠল কাপাসী। হাসির দমকে সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে।

কাপাসীর হাসি ক্রমশ মেতে উঠতে লাগল।

কাপাসী হাসে আর বলে, 'বাচার সাধ কত শয়তানগো! কেউ বাচব না, সগলে মরব। মর, মর তরা।'

আট

পুব দিকের জঙ্গল ভেদ করে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে একসময় পালসাহাব এসে পড়ল।

বেলা অনেক চড়েছে। সূর্যটা আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। দ্বীপের নোনা মাটি তেতে উঠতে শুরু করেছে।

এক ঝাঁক বুনো টিয়া সামনের জঙ্গল টপকে কোন দিকে যে উড়ে গেল, কে তার হদিস দেবে।

প্রথমে টিলার মাথায় উঠল পালসাহাব। তার পিছু পিছু উঠল সরকারি চেনম্যান নিবারণ সাপুই, পাটোয়ারি আত্মন সিং এবং চার জন আদিবাসী রাঁচি কুলি—ধানোয়ার, কচ্ছপ, ডুঙডুঙ আর টিরকি।

টিলার মাথায় উঠেই পালসাহাব কিছুক্ষণ খ্যা খ্যা কবে হাসল। তারপর আচমকা হাসিটা থামিয়ে বলল, 'বহুত তাজ্জবকি বাত!'

পাশ থেকে চেনম্যান নিবারণ সাপুই বলল, 'কিসের তাজ্জব পালসাহাব?'

পালসাহাব নিবারণের প্রশ্নের জবাব দিল না। রসিক শীলেরা তখনো টিলার মাথায় বসে ছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচাল, 'শালে লোগ, এখনো বেঁচে আছিস!'

হারান বলল, 'হ পালসাহাব, মরি নাই।'

পালসাহাব বলল, 'সাপ কানখাজুরা আর জোঁক যখন তোদের সাবাড় কবতে পারে নি, তখন মালুম হচ্ছে বাঁচবি। জানেব জোর আছে তোদের।'

হারান বলল, 'ঠিকই কইছেন পালসাহাব, আমাগো জানেব জোর আছে। তা না অইলে এত কষ্ট সইযাও তো মরি নাই। বুকেব ভিতরে বাচনেব সাধখান অহনো তাজাই আছে।'

পালসাহাব বলল, 'বহুত আচ্ছা।'

অনেকক্ষণ কেউ আব কিছু বলল না।

তেজী রোদে জঙ্গলের মাথা জ্বলছে। নীল আকাশ জ্বলছে। কোত্থেকে যেন দু' চার টুকরো মৌসুমি মেঘ বাতাসের তাড়া খেয়ে ভাসতে ভাসতে উত্তর আন্দামানের এই আকাশে এসে জমা হযেছিল। মেঘের টুকরোগুলো জ্বলছে।

অন্যমনস্কের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে পালসাহাব কী ভাবছিল, সে-ই জানে। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে অদ্ভুত গাঢ় গলায় বলল, 'পাববি—এই শালে লোগ?'

'কী পারুম পালসাহাব?' অবাক হয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকায় মানুষগুলো।

'আন্দামানের এই জঙ্গল সাফ করে গাঁও বসাতে, ক্ষেতিবাড়ি বানাতে, মকান তুলতে? পারবি?' বলতে বলতে ফের অন্যমনস্ক হয়ে যায় পালসাহাব। অরণ্যের মাথায় উত্তর আন্দামানের সীমাহীন নীলাকাশ। তার ওপাবে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলল সে। এই মুহূর্তে কোথায় যেন সে একটা সুন্দর ছবি দেখছে। সেই ছবিটার কথাই বিড় বিড় করে বলতে লাগল, 'মাটির ঘর থাকবে, দেওয়ালে দেওয়ালে ঘি আর সিন্দুর দিয়ে আঁকবি। কী আঁকবি?—এই শালেরা?' বলতে বলতে পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল। কিছুতেই সে মনে করতে পারছে না, মাটির দেওয়ালে ঘি আর সিঁদুর দিয়ে কী আঁকতে হবে। ঘি আর সিঁদুরের সেই চিত্রটির যে কী নাম, একেবারেই ভুলে গিয়েছে সে। পালসাহাব আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বল না, কী আঁকবি?'

বুড়ি বাসিনী বলল, 'বসুধারার কথা ক'ন (বলেন) নিকি সাহেব বাবা?'

'হাঁ—হাঁ, ঠিক বাত। বসুধারা—বসুধারাই আঁকবি। কত সাল বাদ বসুধারার নাম শুনলাম।' আবার তন্ময় হয়ে গেল পালসাহাব, 'একটা আঙনা (উঠোন) থাকবে, বাতাবি লেবুর গাছ থাকবে, ঘুঘু ডাকবে, একটা লেড়কা, একটা বহু—তার হাতে কাঙনা, পায়ে মল—' গলাটা ভারী হয়ে আসতে লাগল পালসাহাবের। সুদূর আকাশের ওপারে একটি অপরূপ ছবি দেখতে দেখতে নিমেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে। কতকাল আগে বসুধারা-আঁকা একটি মাটির ঘর, ঝকঝকে তকতকে উঠোন, বাতাবি ফুলের গন্ধ, ঘুঘুর ডাক, একটি নাদুস নুদুস ছেলে আর মল-বাজানো কোমল মুখের একটি বউ—সব

মিলিয়ে স্বপ্নের মতো সুন্দর একটি ছবি ছিল। ছবিটা এক মুগ্ধ কৃষাণের চোখ জুড়িয়ে দিত।

সেই ছবিটা কোথায় যেন হারিয়ে এসেছে পালসাহাব। আশ্চর্য, তার কথাই সে এখন বলছে, 'বহুটার পায়ে মল বাজবে, আঙনায় ধান মলবি, খড়ের পালা সাজিয়ে রাখবি। বহুকে রূপার বিছা হার বানিয়ে দিবি—'

আচমকা তীব্র, তীক্ষ্ণ, অবুঝ হাসির শব্দ উঠল। হাসিটা ক্রমশ মেতে উঠতে লাগল। কাপাসী হাসছে। উন্মাদ হাসির দাপটে তার সারা দেহ বেঁকেচুরে দুমড়ে যাচ্ছে।

কত কাল আগের একটা সুন্দর স্বপ্ন চোখের সামনে ভাসছিল। মুহূর্তে সেটা ছিঁড়ে গেল, আর সেই ছবিটা কোথায় যেন উধাও হল। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পালসাহাব। তারপর হঠাৎই খেপে উঠল সে, 'কৌন—কৌন হাসতা? কে হাসছে?'

পাশ থেকে হারান বলল, 'কাপাসী হাসে সাহাব বাবা।'

'কাল যে জেনানা হেসেছিল—সে?'

'হ, সাহাব বাবা।'

'এমন হাসে কেন?'

'অর পরাণে বড় দুঃখু। তাই হাসে।'

কাল যে কথাটা বলেছিল, আজও তা-ই বলল পালসাহাব, 'বহুত তাজ্জবের আওরত। দুখ থাকলে আদমীরা কাঁদে। এ শালী হাসে!' বলতে বলতে কাপাসীর সামনে এসে দাঁড়াল। ডাকল, 'এ লেড়কী—'

কাপাসী জবাব দিল না, ফিরেও দেখল না, সমানে হাসতেই লাগল।

পালসাহাব এবার খেঁকিয়ে উঠল, 'হাসো মাত। এখানে হাসি চলবে না। এ লেড়কী—'

অবুঝ, অস্বাভাবিক, বিচিত্র হাসি। কাপাসীর সে হাসি থামে না। পালসাহাবের ধমক অগ্রাহ্য করে মাততেই থাকে।

পালসাহাব বলল, 'লেড়কী পাগলী নাকি?'

দুই হাঁটুর ফাঁকে ঘাড় গুঁজে বসে ছিল নিত্য ঢালী। এবার সে মুখ তুলল। ভাঙা ভাঙা, ধরা গলায় বলল, 'হগলই অদ্দিষ্ট সাহাব বাবা। আমার কপাল।' বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে।

পালসাহাব চেঁচাল, 'কাঁদো মাত শালে। তুম কৌন?'

'আমি নিত্য ঢালী—কাপাসীর বাপ।' বলে একটু থামে নিত্য, তার বুকের গভীর থেকে অনেকগুলো স্তর ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে সে বলে, 'সুখে কী আর কান্দি বাবা, চোখের জল ফালাইতে কার সাধ হয়? বড় দুঃখু বাবা। এই দুঃখু কুনোকালে ঘুচব না।' নিজের কপালটা দেখিয়ে নিত্য বলতে থাকে, 'এই যে কপাল সাহাব বাবা, এই কপালই কান্দায়। কপালের লিখা কি খন্ডান যায়?' বলে আর কাঁদে নিত্য ঢালী। কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে ওঠে। ঘোলাটে চোখের তারা দু'টো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নোনা জল ঝরতে থাকে।

গলার স্বরটা এবার নরম শোনায় পাল সাহাবের, 'কী হয়েছে তোমার লেড়কীর?'

'কাপাসী পাগল অইয়া গেছে। হগলই আমার দোষে, আমার পাপে।' দুই হাঁটুর ফাঁকে ফের মাথা গোঁজে নিত্য ঢালী। অদম্য কোনো যন্ত্রণায় তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

পালসাহাব বলে, 'লেড়কী পাগল হল কেন?'

নিত্য বলল, 'আইজ না বাবা, আর একদিন কমু। হে কথা কইতে গেলে বুক আমার ভাইঙ্গা যায়। বাপ না আমি শত্তুর, রাইক্ষস—'

পালসাহাব কী বুঝল সে-ই জানে, একেবারে চুপ করে গেল।

বেলা বেড়ে বেড়ে দুপুর হয়ে গেল একসময়। সূর্যটা এখন খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে। হঠাৎ যেন হুঁশ ফেরে পালসাহাবের। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে সে, 'শালেরা খানা খাবি না?' মানুষগুলো নড়ে চড়ে উঠল।

পালসাহাব চিল্লাতে লাগল, 'তোরা মানুষ না, দুসরা কিছু! কাল রাত্তিরে গিলেছিস, এখন দুফার।

তোদের খিদের হুঁশও থাকে না। উল্লু, বুদ্ধু, নালায়েক কাঁহাকা। খাওয়ার কথাও বলে দিতে হবে!' বলতে বলতে সে ঘুরে দাঁড়াল। পাটোয়ারি চেনম্যানদেব দিকে তাকিয়ে বলল, 'জলদি খানা লাও, জোর কদমে যাও—'

চেনম্যান পাটোয়ারি আর আদিবাসী রাঁচি কুলিরা টিলা থেকে নেমে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকল। খানিকক্ষণ পর মস্ত মস্ত লোহার বালতি বোঝাই করে ভাত ডাল এবং কচুঘেঁচু আলু কুমড়ো দিয়ে তৈরি ঘ্যাঁট নিয়ে ফিরল।

সঙ্গে সঙ্গে পালসাহাব টিলাব মাথায় মানুষগুলোকে কাতার দিয়ে বসিয়ে দিল।

একসময় খাওয়ার পালা চুকল। সূর্যটা পশ্চিম দিকে আরো খানিকটা হেলে পড়েছে তখন।

এতক্ষণ দু' চাব টুকরো মেঘ অনেক দূরে দূবে আকাশের এ মাথায় ও মাথায় আটকে ছিল। হঠাৎ সমুদ্র ফুঁড়ে উন্মাদ বাতাস উঠে এল। সেই বাতাস দিগন্তের ওপার থেকে মেঘের টুকরোগুলোকে উত্তর আন্দামানের মাথার ওপর টেনে আনতে শুরু করেছে।

পালসাহাব বলল, 'মরদানারা আমার সাথ চল।'

হারান বলল, 'কুনখানে যামু পালসাহাব?'

'জমিন লিবি না?' পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে, একটু আগে বলছিলি না, বাঁচতে চাস। জমিন না পেলে বাঁচবি কেমন করে? চল—'

পুরুষমানুষগুলো উঠে পড়ল।

সকলেব আগে আগে চলল সি এ পালসাহাব। মাঝখানে মানুষগুলো। একেবারে পেছনে পাটোয়াবি চেনম্যান এবং চারজন কুলি।

একটু পব টিলাব মাথা থেকে নেমে সকলে জঙ্গলে ঢুকল।

উত্তর আন্দামানেব এই অরণ্য—জটিল, দুর্জ্ঞেয়, ছায়াচ্ছন্ন। পৃথিবীর আলো সেই অরণ্য ফুঁড়ে ভেতরে ঢোকার ফাঁক খুঁজে পায় না। সরীসৃপেব চোখে জ্বলন্ত ফসফরাস ছাড়া এখানে কোনো আলো নেই। অরণ্যেব মধ্যে এক ধরনের বিচিত্র নীলাভ অন্ধকাব। সেখানে পেঁচার চোখ ধকধক কবে। দু'টো চড়াই দু'টো উতরাই এবং ছোট একটা উপত্যকা পার হয়ে মালভূমি পাওয়া গেল। দু'দিকে দু'টো খাড়া পাহাড়, মাঝখানে বিবাট অংশ জুড়ে মালভূমি। জায়গাটা মোটামুটি সমতল।

এখানে জঙ্গল নেই। হাজার বছরের বনভূমি নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। প্যাডক দিদু চুগলুম টমপিঙ—বিরাট বিরাট সব বনস্পতি আকাশেব দিকে কত কাল মাথা তুলে ছিল। মোটা মোটা মুথিয়া লতা, বেতের লতা আব থুমিয়া লতা গাছগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে অরণ্যকে নিবিড় করে রেখেছিল। হারানরা আসাব আগে পেট্রোল ছড়িয়ে ছড়িয়ে জঙ্গলে আগুন ধরানো হয়েছে। ডালপালা এবং ছাল পুড়ে পুড়ে গাছগুলি কবন্ধেব মতো সারি সারি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এসেছে করাত। করাতের ধারাল দাঁতে দাঁতে বিরাট বিরাট বনস্পতি খন্ড খন্ড হয়ে গিয়েছে।

গাছ পুড়েছে, লতা পুড়েছে, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির ঝোপ পুড়েছে। চারদিকে রাশি রাশি অঙ্গার স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। ছাই উড়ছে এখন। ঘাসবন পুড়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। মালভূমি জুড়ে এখন যেন একটা অন্তহীন মহাশ্মশান।

মানুষ আসবে। উপনিবেশ গড়বে। আগুনের মুখে, করাতের মুখে, শাণিত কুড়ালের মুখে জঙ্গল তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হাজার হাজার বছর ধরে এই দ্বীপের ওপর অরণ্য তার দাবি এবং দখল প্রতিষ্ঠা করে ছিল। মানুষের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের কাছে চিরদিনের জন্য সে তার দখল হারাল। জঙ্গলের তলা থেকে মুখ তুলেছে কুমারী মাটি।

পালসাহাব বলল, 'এই হল তোদের জমিন—'

মালভূমির এক কিনারে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে দু'পাশের পাহাড়, মাঝখানের মালভূমি এবং মাটির নমুনা দেখছিল।

পালসাহাব সস্নেহে বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ, ভাল করে দ্যাখ। জমিন পসন্দ তো?'

বুড়ো রসিক শীল এক ডেলা মাটি হাতের চাপে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পরখ করছিল। লোভে খুশিতে তার ঘষা ঘষা, বিবর্ণ চোখজোড়া চক চক করে উঠল। সে বলল, 'বড় বাহারের মাটি সাহাব বাবা। জমিন আমাগো পছন্দ হইছে।'

পালসাহাব আর কিছু বলল না, মালভূমিতে নেমে গেল। তার পিছু পিছু নামল পাটোয়ারি চেনম্যান এবং কুলিরা।

নিচে এসে খাকি প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করল পালসাহাব। হাঁকল, 'ভীমরাজ জয়ধর—'

'এই যে সাহাব বাবা—' মাঝবয়সী একটা লোক জমিতে নামল।

পালসাহাব বলল, 'তিন একর জমি তুই পাবি। জমি বুঝে নে। মাপ দেখে নে।' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে বলল, 'পাটোয়ারি চেনম্যান, তিন একর জমিন মাপ।'

চেনম্যান লোহার ফিতে দিয়ে জমি মাপতে লাগল।

এতক্ষণ চোখে পড়ে নি। এবার দেখা গেল, একটা হাওয়াই বুটির ঝোপের পাশে হাত তিনেক করে লম্বা, সমান মাপের অগুনতি বাঁশের টুকরো স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। চেনম্যান যেমন যেমন জমি মাপছে, রাঁচি কুলিরা সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে জমির সীমানা ঠিক করে দিচ্ছে। আর পাটোয়ারি একটা মোটা খাতায় জমির হিসাব টুকে রাখতে লাগল।

পালসাহাব হেঁকে যেতে লাগল, 'রসিক শীল, হারান দাস, মনোহর ভক্ত, বিপদভঞ্জন বিশ্বাস—'

একে একে সবাই নিজের নিজের জমি বুঝে নিতে লাগল।

জমি মাপামাপির ফাঁকে কখন যেন সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। অরণ্যের মাথায় এখন দিনের আলো ম্লান হয়ে আটকে রয়েছে। রোদের তেজ আব নেই। ঠান্ডা হিমেল বাতাস জঙ্গলের দিক থেকে উঠে আসতে শুরু করল।

পালসাহাব ডাকল, 'হরিপদ বারুই—'

কেউ জবাব দিল না।

পালসাহাব গলা চড়াল, 'কৌন হো হরিপদ বারুই? নালায়েক, হারামী, বুদ্ধ কাঁহাকা!'

সাড়া নেই।

টেনে টেনে বিরক্ত গলায় চিল্লাতে থাকে পালসাহাব, 'হরিপদ কুত্তা—'

পেছনের জঙ্গলটা ফুঁড়ে হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে বিশ বাইশ বছরের একটি যুবতী পালসাহাবের সামনে এসে দাঁড়াল। তার গায়ের রং মাজা কালো, উজ্জ্বল মসৃণ দেহ। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলো উড়ু উড়ু। সিঁথিতে গুঁড়ো গুঁড়ো শুকনো বাসি সিঁদুরের দাগ। পাতলা নাকে লাল পাথরের নাকছাবি। চোখের মণি দু'টো ঈষৎ কটা। বাঁ গালে একটা কাটা দাগ মেয়েটিকে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। তার দীর্ঘ দেহে উদ্দাম স্বাস্থ্য। তার মধ্যে কেমন এক ধরনের বন্যতা মিশে আছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেকটা চড়াই উতরাই ভেঙে দৌড়ে এসেছে মেয়েটা। ফলে পরিশ্রমে আর ক্লান্তিতে সমানে হাঁফাচ্ছে। বুকটা দ্রুত তালে উঠছে, নামছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তার।

মেয়েটা যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হুঁশ নেই পালসাহাবের। সে সমানে চিৎকার করছে, 'এ হারামী, এ হরিপদ কুত্তা—'

বিড়ালীর মতো কটা চোখ দু'টো কুঁচকে মেয়েটি ফুঁসে উঠল, 'অ্যাই ড্যাকরা, যমের অরুচি—'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই কৌন? এ আওরত—'

'আমি তিলি।'

'এই জঙ্গলে কী করতে এসেছিস?'

তিলি বলল, 'রূপ দেখাইতে রে যমের অরুচি পালসাহাব, রূপ দেখাইতে আইছি।'

হঠাৎ পালসাহাব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তামাশা মাত কর তিলি। এখন কাজের সময়।'

'এই দ্বীপে জনমনিষ্যি নাই, জঙ্গল দেখলে ডরে বুক কাপে। হেই জঙ্গল ভাইঙ্গা এইহানে আমি তামাশা মারতে আইছি! তামাশা মারনের মানুষ পাইলাম না আর!' তাচ্ছিল্যে মুখ বাঁকায় তিলি।

এবার তিলির দিকে তাকায় পালসাহাব। দেহের সবটুকু জোর গলায় ঢেলে চিল্লায়, 'এ হরিপদ—হরিপদ কুত্তা।'

সাপের মতো ফণা তোলে তিলি, 'তর বাপ কুত্তা, তর চৌদ্দ গুষ্টি কুত্তা—'

পালসাহাব বিমূঢ় হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে সে বলে, 'আজীব লেড়কী!' তারপর আস্তে আস্তে গলার স্বরটা চড়াল, 'গালি দিচ্ছিস কেন?'

'তুই ক্যান গালি দিতে আছস আমার সোয়ামীরে?'

'আমি কখন তোর সোয়ামীকে গালি দিলাম?'

'গালি দ্যাস, আর ট্যার পাস না ড্যাকরা?'

'নাম কী তোর সোয়ামীর?'

'ড্যাকরা পালসাহাব, সোয়ামীর নাম জিগাস (জিজ্ঞাসা করিস)। শরম লাগে না? মাইয়া মাইনষে সোয়ামীর নাম মুখে আনে?'

তিলির পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাবান। সে বলল, 'অর সোয়ামীর নামই হরিপদ বারুই।'

পালসাহাব চেঁচাল, 'হরিপদ কোথায়?'

তিলি বলল, 'তার হাঁপির (হাঁফানির) টান উঠছে, হেইর লইগা আমি আইলাম।'

'তুই এসেছিস কী করতে?'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তিলি। পলকহীন। একটা কথাও বলছে না সে। শুধু রাগে গর গর করছে। নাকের মধ্যে ফোঁস ফোঁস করে কেমন এক ধরনের জান্তব আওয়াজ করছে আর সমানে ফুঁসছে। ফোঁসানির তালে তালে অস্বাভাবিক পুষ্ট বুক দু'টো উঠছে, নামছে।

তিলির ভয়ঙ্কর মূর্তির দিকে তাকিয়ে এমন যে পালসাহাব, সে ও দু'পা পিছু হটল। বিড় বিড় করে বকতে লাগল, 'শালী, আওরত না দুসরা কুছ!'

পালসাহাবের গলা তিলির কান পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা, সে-ই জানে। তিলি এবার বলতে লাগল, 'বুকে দবদ, পিঠে দরদ, মানুষটা হাঁপির টানে কাহিল হইয়া রইছে। আর ড্যাকরা পালসাহাব জিগায় কিনা, আমি আইছি ক্যান? ক্যান আবার, জমিনের ভাগ নিতে। আমার ভাগের জমিন নিমু না বে পোড়ার মুখ?'

'জমিন লিবি? লে না শালী। তোর ভাগের জমিন আমি দেব না, আমার বাপ দেবে। বাপ রে বাপ, আওরত না দুসরা কুছ।'—বলে পেছন দিকে ঘুরে পালসাহাব চেঁচাল, 'এ পাটোয়ারি, এ চেনম্যান, জমিন মাপ। শালীর জমিন আভি বুঝিয়ে দে।'

চেনম্যানরা মাপজোখ করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিল।

জমি মাপতে মাপতে সন্ধে হয়ে এল। চারপাশের জঙ্গলের মাথায় সাদা ফিনফিনে কুয়াশার পর্দা নামতে লাগল।

জমি বাঁটোয়ারা বন্ধ করে পালসাহাব বলল, 'আজকের মতো কাম খতম। কাল আবার জমিন মেপে দেব। আন্ধেরা নেমে যাচ্ছে, সবাই ফিরে চল।'

পালসাহাবের পিছু পিছু মানুষগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল।

নয়

মায়াবন্দর থেকে রাত থাকতে থাকতেই ওরা বেরিয়ে পড়েছিল। বিরাট একটা সুরমাই মাছের মতো জল কেটে কেটে 'নটিলাস' বোটটা এইমাত্র উত্তর আন্দামানের এরিয়াল উপসাগরে পৌঁছেছে। ঘন্টায় পনের নটিক্যাল মাইল বেগে ছুটে এসেছে বোটটা। মোটর এঞ্জিনটা ক্লান্ত হৃৎপিন্ডের মতো একটানা শব্দ করে হাঁফাচ্ছে এখন।

'নটিলাস' বোটে সওয়ারি মাত্র তিনজন। মালিক পানিকর, নিজেকে সে বলে প্রোপ্রাইটার। প্রোপ্রাইটার পানিকর ছাড়া আরো দু'জন আছে। দু'জনই শেল ডাইভার। একজন লা তে, জাতে সে বর্মী। অন্য লোকটার নাম ধানুক, জাতে ওরাঁও।

রোজই রাত থাকতে থাকতে 'নটিলাস' বোট মায়াবন্দর থেকে এরিয়াল উপসাগরে আসে। এর কারণও আছে।

সারাদিন রোদে টগবগ করে ফুটবার পর রাত্তিরে সমুদ্র জুড়োতে থাকে। তখন অথৈ দরিয়া থেকে টার্বো ট্রোকাস ফ্রগশেল কোঞ্চ নি-ক্ল্যাম্প সান ডায়াল—এমনি নানা ধরনের 'শেল' গুটি গুটি বুকে হেঁটে সমুদ্র থেকে উপসাগর আর উপকূলের দিকে উঠে আসে। যখন রোদ ওঠে, আস্তে আস্তে রোদের তেজ বাড়তে থাকে, তখন সেই সমস্ত শেল আবার সমুদ্রের গভীরে পালিয়ে যায়। রোদের তেজ তারা সহ্য করতে পারে না। তাই সকাল বেলাটাই 'শেল' তোলার পক্ষে সেরা সময়। ডাইভাররা সকালেই সবচেয়ে বেশি 'শেল' তোলে।

এখনো ভাল করে ভোর হয় নি। উপকূলের ম্যানগ্রোভ বনগুলো ঝাপসা হয়ে আছে। দূরের স্যাডল পিকের মাথাটা প্রায় চোখেই পড়ে না। গাঢ় কুয়াশা আর অন্ধকার উপসাগর উপকূল বন পাহাড় এবং অনেক দূরের সমুদ্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কুয়াশা এবং অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। শুধু বোঝা যায়, 'নটিলাস' বোটটার চারপাশে আলকাতরার মতো কালো জল দুলছে।

উপসাগর থেকে শীতল জলো বাতাস উঠে আসছে। ঠান্ডায় কুঁকড়ে রয়েছে ধানুক। দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা তার গোঁজা। কিন্তু লা তে'র চামড়া কোন ধাতুতে তৈরি কে জানে। তার গায়ে কড়া রোদ বা তীব্র শীত কোনোটাই বেঁধে না। 'নটিলাস' বোটের পাটাতনের ওপর জুত করে বসে ডলে ডলে সারা দেহে সর্ষের তেল মাখছে লা তে, আর হুস হুস করে কেমন এক ধরনের শব্দ করছে।

মোটর বোটের এঞ্জিনটার পাশে চুপচাপ বসে ছিল প্রোপ্রাইটার পানিকর। এবার সে নড়ে চড়ে উঠল। বলল, 'এ লা তে—'

'হাঁ জি—'

'আজ বড় জাড় (শীত)!'

'কোথায়? আমার তো তেমন জাড় লাগছে না।'

'তুই কি মানুষ! তুই একটা জানোয়ার।'

লা তে কিছুই বলল না। হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। পানিকর তাকে জানোযার বলেছে। এ ব্যাপারে লা তে'র পুরাপুরি সায় আছে।

চাপা স্বরে পানিকর আবার বলে, 'জানোয়ার।'

খানিকটা সময় কাটে।

পানিকরই ফের শুরু করল, 'আজ আমরা অনেক আগে এসে পড়েছি, তাই না রে লা তে?'

'হাঁ মালিক।' গায়ে তেল ডলতে ডলতে জবাব দিল লা তে।

পানিকর স্বর চড়িয়ে ডাকল, 'এ ধানুক—ধানুক—'

'হাঁ জি—' কুকুরের মতো কুন্ডলী পাকানো ধানুক দুই হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা না তুলে জড়ানো স্বরে কুঁই কুঁই করে উঠল। হিমে গায়ের রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে তার।

এবারই প্রথম 'শেল' ডাইভারের কাজ নিয়েছে ধানুক। খাড়ি কি উপসাগর থেকে ডুব দিয়ে দিয়ে সামুদ্রিক শামুক তুলতে হবে। হাঙর অক্টোপাস এবং বিষাক্ত সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে লড়াই করে 'সিপি' (শেল) শিকার করতে হবে। খুব সম্ভব এই সবই ভাবছে সে। যতই ভাবছে, অদ্ভুত এক ভয় চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরছে। ভয় আর শীত, এই দুইয়ে ধানুক বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে। হাঁটু দু'টো ঠক ঠক কাঁপছিল তার। কিছুতেই পা দু'টো বশে আনতে পারছে না সে।

পানিকর আবার বলল, 'ডর লাগছে ধানুক?'

'হাঁ মালিক। বদমাস মচ্ছির (হাঙর) সাথ লড়াই করে 'সিপি' তুলতে হবে। জরুর মরে যাব।' হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলে প্রায় কেঁদেই ফেলল সে।

হাঙর অক্টোপাসের মুখ থেকে 'সিপি' তোলার লোক সহজে মেলে না। আন্দামানে যে ক'জন শেল ডাইভার আছে, 'সিপি' তোলার মরশুম শুরু হওয়ার আগেই মহাজনেরা তাদের আগাম টাকা দিয়ে বায়না করে রাখে।

এই মরশুমে একমাত্র লা তে'কেই পেয়েছে পানিকর। লা তে ওস্তাদ ডাইভার। সারা আন্দামানে তার জুড়ি নেই। যত ওস্তাদই হোক লা তে, একজন মাত্র ডাইভারের ভরসায় গোটা মরশুম চালানো যায় না। তা ছাড়া, এই বছরের জন্য সরকারের কাছ থেকে পুরো উত্তর আন্দামানের লাইসেন্স পেয়েছে পানিকর। এখানকার উপকূল আর উপসাগরে যত 'সিপি' আসে, একমাত্র সে-ই তুলতে পারবে। কিন্তু উত্তর আন্দামানে কত যে খাড়ি, কত যে উপসাগর, কত যে উপকূল, কে তার হিসাব রাখে।

অনেক চেষ্টা করেছে পানিকর। ডাইভার জোটাবার জন্য নানা দিকে লোক পাঠিয়েছে সে, কিন্তু লা তে ছাড়া আর একটা ডাইভারও জোটাতে পারে নি। সবাই অন্য অন্য মহাজনের কাজ নিয়ে দক্ষিণ আন্দামান, নিকোবর, মধ্য আন্দামান কি লিটল্ আন্দামানে চলে গিয়েছে।

মাস্‌খানেক হল, ফরেস্টের কুলি হয়ে আন্দামানে এসেছিল ধানুক। সারা দিন জঙ্গলে কাজ করত। রাত্তিরে মায়াবন্দরে এক কারেনের কুঠিতে শুতে আসত। কারেনটাও ফরেস্টে কাজ করে। জবাবদারির কাজ। এবারের 'সিপি'র মরশুমে মায়াবন্দরে কুঠি ভাড়া করে আছে পানিকর। তার ঠিক পাশেই কারেন জবাবদারের বাড়ি।

সারাদিন লা তে'কে নিয়ে শেল তুলে রাত্তিরে মায়াবন্দরের আস্তানায় ফেরে পানিকর। আস্তানা বলতে ছোটখাটো একটা কাঠের বাড়ি। সেটার সামনে খানিকটা খোলা মাঠ। সেখানে দড়ির খাটিয়া পেতে নেয় পানিকর। গোটা দুই লণ্ঠন জ্বেলে দেয় কারেন জবাবদার। ধানুক আসে, জবাবদার আসে, মায়াবন্দরের করাত কলে যারা কাজ করে, তারাও এসে পড়ে। তারপর গান-বাজনা-নাচ-হল্লা শুরু হয়ে যায়। রোজই পুরোদস্তুর আসর বসে।

এই আসরেই ধানুকের সঙ্গে পানিকরের আলাপ-পরিচয় হয়েছে।

ধানুকের গলা ভারি মিঠে। ডান হাতে বাঁ কানটা চেপে, বাঁ হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে, ঘাড় সামান্য কাত করে গেয়ে ওঠে :

'ছারা রা-রা—ছা-রা-রা-রা-
দেখ চলি যা.
দেখ চলি যা,
ভগলুকা বহিনিয়া, পতিয়াকা বিটিয়া, জোয়ানিয়া ছোকরিয়া
পতলি কোমরিয়া লছকিয়া লছকিয়া
দেখ চলি যা
দেখ চলি যা,
ছারা-রা-রা—ছা-রা-রা-রা-'

গলায় গিটকিরি খেলে ধানুকের। কোমল নিখাদ থেকে গলাটাকে যখন চড়ায় তুলে ওস্তাদি টান মারে সে, 'তিরছি নজরিয়া, পাতলি কোমরিয়া—' চারপাশ থেকে হল্লা ওঠে, 'শাবাশ—'

ধানুক তুখোড় ফুর্তিবাজ। দু' চার দিনের মধ্যে তার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে নিয়েছিল পানিকর। পানিকর অনেক বুঝিয়েছে তাকে, 'জঙ্গলে কুলিগিরি করে জিন্দেগী খতম করে কী লাভ? কত রুপাইয়া তলব (মাইনে) মেলে?'

'তিন শ' রুপাইয়া।'

'ফুঃ!' তাচ্ছিল্যের সুরে পানিকর বলেছে, 'ওই টাকায় কী হয়! মুলুকে কে কে আছে তোমার?'

'জরু আছে, দুই লেড়কা আছে।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ধানুকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল পানিকর। তারপর বলেছিল, 'তোমাকে আমি মাসে মাসে পাঁচ শ' রুপাইয়া দেব।'

'কাঁহে?'

'তুমি আমার কাছে কাজ করবে।'

'কী কাজ?'

'সিপি চেনো?'

'হাঁ জি।'

'দরিয়া থেকে সিপি তুলবে। আর মাসে মাসে পাঁচ শ' রুপাইয়া পাবে। জঙ্গলের নোকরি তুমি ছেড়ে দাও।'

একটু ভেবে ধানুক বলেছিল, 'ঠিক হ্যায় মালেক।'

ফরেস্টের কাজ সত্যিই ছেড়ে দিল ধানুক। মাসে মাসে পাঁচ শ'। অর্থাৎ অতগুলো টাকার লোভটাকে কিছুতেই সামলাতে পারে নি সে।

মায়াবন্দরের অগভীর উপসাগরে নামিয়ে ধানুককে দিনকয়েক তালিম দিল পানিকর। সমুদ্র থেকে কেমন করে সিপি তুলতে হয়, তার প্রক্রিয়া শেখাল।

তারপর আজই প্রথম ধানুককে নিয়ে সিপি তুলতে বেরিয়েছে পানিকর।

'নটিলাস' বোটের ডেকে শীত আর দুর্বোধ্য এক ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে ধানুক। মাঝে মাঝে নাকের ভেতর শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠছে।

হাতে পায়ে কড়ুয়া তেল ডলতে ডলতে লা তে ধমকে ওঠে, 'এ শালে, কাঁদছিস কেন?'

'মর যায়েগা, মর যায়েগা, জরুর মর যায়েগা। হু হু—' ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলে ফেলে ধানুক, 'আমি সিপি তুলব না। পাঁচ শ' রুপাইয়া তলব আমার দরকার নেই।'

কিছুক্ষণ খ্যা খ্যা করে হাসে লা তে। তারপর বলে, 'ডরপোক কাঁহিকা। মরবি কেন? হয়েছে কী? তাগড়া জোয়ান মরদ, কেমন কাঁদছে দেখ! বুরবক—বুদ্ধু—'

'সিপি তোলার সময় বদমাশ মচ্ছি (হাঙর) জরুর কাটবে।' ধানুকের ফোঁপানি বাড়তেই থাকে। একদমে সে বলে যায়, 'জঙ্গলের কামই আমার ভাল, আমি আভী মায়াবন্দর ফিরে যাব। দরিয়ায় নেমে জান দিতে পারব না।'

লা তে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার তাকানোর ভঙ্গিতে ঘৃণা আর অবজ্ঞা মেশানো।

একটু পরেই ভোর হয়ে এল। সারা রাত এই উপসাগরের ওপর কুয়াশা আর অন্ধকারের যে জালটা ছড়িয়ে থাকে, এই মাত্র অদৃশ্য হাতে কে যেন একটানে সেটা গুটিয়ে নিয়েছে। ঝাঁক ঝাঁক সোনার তীর ছুঁড়ে দিনের প্রথম রোদ গাঢ় কুয়াশার স্তরগুলিকে ছিঁড়ে ফেলেছে। অনেক, অনেক দূরে যেখানে আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যে সীমারেখাটা মুছে গিয়েছে সেখানে বিরাট সোনার থালার মতো সূর্যটা দেখা দিতে শুরু করেছে।

উপসাগরের জল কাচের মতো স্বচ্ছ। 'নটিলাস' বোট সন্তর্পণে সামনের দিকে এগুতে থাকে। ফলে জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না।

জলের নিচে বাদামি বালির বিছানা। সেখানে অগুনতি টার্বো আর ট্রোকাস পড়ে রয়েছে। এতটুকু নড়াচড়া নেই তাদের।

জলের দিকে ঝুঁকে ছিল লা তে। তার চাপা কুতকুতে চোখদু'টো চক চক করছে। নিচে টার্বো আর ট্রোকাসগুলোর চারপাশে ঝাঁক ঝাঁক হাঙরের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জলতলের জগৎটা দেখতে দেখতে আচমকা উপসাগরে লাফিয়ে পড়ল লা তে। ঝপাং করে একটা শব্দ হল।

তারপর সারাদিন উপসাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে সিপি তুলল লা তে।

সমুদ্রের কাছ থেকে কি সহজে খাজনা মেলে! নোনা জলের সঙ্গে অবিরাম যুঝে যুঝে, হাঙর আর অক্টোপাসের সঙ্গে অনবরত লড়াই করে সিপি তুলতে হয়।

যতক্ষণ উত্তর আন্দামানের আকাশে দিনের শেষ আলোটুকু ছিল, যতক্ষণ জলের নিচে টার্বো ট্রোকাসগুলোকে দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ উপসাগর থেকে ওঠে নি লা তে। সমানে সিপি কুড়িয়েছে।

দুপুরের দিকে একবার মাত্র মোটর বোটে উঠেছিল লা তে। খান দশেক শুকনো রুটি আর খানিকটা ভাজি খেয়েই আবার জলে নেমে পড়েছে সে।

দ্বীপ আর অরণ্যের ওধারে সূর্যটা কখন যে নেমে গিয়েছে, লা তে টের পায়নি।

এখন যতদূর তাকানো যায়, গোটা সমুদ্র জুড়ে সন্ধে নামার আয়োজন চলছে। আবছা অন্ধকার আর কুয়াশায় চারদিক কেমন যেন বিষণ্ণ, মলিন। এখন উড়ুক্কু মাছগুলি ফিনফিনে রুপোলি ডানায় জল কাটছে না। পাঁশুটে রঙের সাগরপাখিরা সারাদিন দরিয়ায় ঘোরার পর ক্লান্ত ডানায় আকাশ মাপতে মাপতে দ্বীপের আশ্রয়ে ফিরে যেতে শুরু করেছে।

দিনের শেষ রোদটুকু মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপসাগর থেকে মোটর বোটে উঠে এল লা তে। সারা দিন নোনা জলে কাটাবার পর জল শুকিয়ে লা তে'র সারা গায়ে দানা দানা নুন ফুটে বেরিয়েছে।

শেডের এপাশে চুপচাপ বসে রয়েছে ধানুক। দুই হাঁটুর ফাঁকে তার মাথাটা গোঁজা। হাঙর অক্টোপাস আর হিংস্র সব মাছের ভয়ে সে জলে নামে নি। তোষামোদ করে, ধমক ধামক দিয়ে, আরো বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও তাকে সমুদ্রে নামাতে পারে নি পানিকর। অনেক বোঝাবার পর লা তে'ও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ধানুক জলে তো নামেই নি, সারাদিন কিছু খায়ও নি। দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা ঢুকিয়ে প্রাণের ভয়ে অবুঝ শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সমানে কেঁদে গিয়েছে। আর ভেবেছে, তিন শ' টাকার লোভে সিপি তোলার কাজটা না নিলেই ভাল করত। এর চেয়ে ফরেস্টের নোকরি ঢের ভাল। মেহনত হয়তো বেশি, তলব (মাইনে) হয়তো কম, কিন্তু প্রাণের ভয় তো নেই। কিছুতেই সিপি তুলবে না ধানুক। মায়াবন্দরে গিয়ে ফরেস্টের নোকরিতে আবার ফিরে যাবে সে।

শেডের ওপাশে বসে আছে প্রোপ্রাইটার পানিকর। তার গা ঘেঁষে উবু হয়ে রয়েছে লা তে। পানিকর আজ বেজায় খুশি। সিপিতে সিপিতে 'নটিলাস' বোটের আধাআধি ভরে ফেলেছে লা তে।

এই মরশুমে সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে 'শেল' উপসাগর আর উপকূলের দিকে উঠে আসছে। চোখ দু'টো সামান্য কুঁচকে প্রোপ্রাইটার পানিকর মনে মনে হিসেব কষতে লাগল। এটা তার মুদ্রাদোষ। কোনো কিছু ভাবতে শুরু করলেই আপনা থেকে তার চোখ দু'টো কুঁচকে যায়। পানিকর ভাবল, সব মরশুমেই এমন সিপি আসে না। পনের বছর ধরে আন্দামানের সমুদ্র ইজারা নিয়ে 'শেল' তুলছে সে। কিন্তু এই মরশুমের মতো এত সিপি ক্বচিৎ চোখে পড়েছে।

হিসেব কষতে কষতে পানিকরের মনে হল, এবার ঠিকমতো সিপি তুলতে পারলে বাকি জীবনের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে না। ভাবল, পোর্ট ব্লেয়ার শহরে একটা বাড়ি কিনে কায়েম হয়ে বসবে।

সিপির ব্যবসা বড় অনিশ্চিত। সব কিছু দরিয়ার মর্জির ওপর নির্ভর করে। যে বছর সমুদ্রের মেজাজ দরাজ থাকে সে বার পানিকররা দু' পয়সা কামিয়ে নেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বঙ্গোপসাগর বড় কৃপণ হয়ে যায়। তখন উপকূলের দিকে সিপি আসে না। যা-ও আসে তা হল ফ্রগ শেল, ক্লাম, স্পাইডার—বাজারে যেগুলোর দর কানাকড়িও না। সেই সব সময় মাথায় হাত দিয়ে বসে পানিকররা। ইজারার টাকা, ডাইভারদের মজুরি, মোটর বোটের তেলের খরচ, খাইখরচা—এসব দিয়ে কিছুই প্রায় ওঠে না। লাভ দূরের কথা, জমানো টাকা ঢেলে তাল সামলানো দায় হয়ে ওঠে।

দরিয়ায় দরিয়ায় সিপির পেছনে, আর সিপির সঙ্গে সঙ্গে অনিশ্চিত ভাগ্যের পেছনে পনের বছর ধরে ঘুরছে পানিকর। কিন্তু ভাগ্যকে মুঠোর ভেতর পুরতে পারছে কই? পানিকর ভাবল, এই মরশুমটা ভালয় ভালয় কাটলে হয়। পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে অন্য ব্যবসার ফিকির দেখবে। তার অনেক দিনের সাধ, একটা ছোটখাটো হোটেল খোলে।

পানিকরের ভাবনাটা নানা পথ ঘুরে আবার সিপির মধ্যে এসে পড়ল। এ বছর ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, সান ডায়াল উপসাগরের দিকে উঠে আসছে। দরিয়া এবার দরাজ হাতে ঢেলে দিতে চাইছে। কিন্তু শুধুমাত্র লা তে'র ভরসায় এত বড় একটা মরশুম চালানো যাবে না। শিখিয়ে পড়িয়ে ধানুককে এনেছিল। অক্টোপাস আর হাঙরের ভয়ে হারামীটা তো জলেই নামল না। অথচ এই মরশুমে অনেক, অনেক ডাইভার দরকার। এত ডাইভার পায় কোথায় পানিকর?

চোখ দু'টো কুঁচকেই আছে। কপালের ওপর অনেকগুলো ভাঁজ পড়েছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল পানিকরের। পাশেই উবু হয়ে রয়েছে লা তে। তার পাঁজরে আস্তে একটা গুঁতো দিয়ে সে ডাকল, 'এ লা তে—'

'হাঁ মালেক—'

'ডিগলিপুরে তো বহোত নয়া আদমী এসেছে?'

'হাঁ মালেক। জাহাজে করে এই সেদিনও এল। আমরা দেখলাম না?'

'শুনেছি পাঁচ ছ' মাইল দূরে ওদের সেটেলমেন্ট বসছে।'

লা তে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, 'আমিও শুনেছি।'

পানিকর বলল, 'দো চার রোজের মধ্যে একবার সেটেলমেন্টে যাব।'

'কী মতলব মালেক?'

'কাম আছে।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে পানিকর।

কিছুই না বুঝে পানিকরের দেখাদেখি লা তে'ও মাথা নাড়তে থাকে।

দশ

শুধু কি বুড়ি বাসিনী, আজকাল উদ্ধব বৈরাগীও বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। একা নিজেই কি দেখছে, আব দশজনকেও দেখাচ্ছে।

উদ্ধব হল জাত বৈরাগী।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসার আগে অন্য একটা জীবন ছিল উদ্ধবের। সেই জীবনটাকে একটা ধু ধু স্বপ্নের মতো মনে হয়। সেই জীবনটা আদৌ সত্য ছিল কিনা, এক এক সময় উদ্ধবের মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

জিরানিয়া গ্রামের কথা মনে পড়ে।

সেই গ্রামের শিয়র ঘেঁষে একটা নদী দিবারাত্রি বয়ে যেত। নদীর নাম ধলেশ্বরী। রসিক সুজনেরা বলত উজানিয়া গাঙ, মাতানিয়া নদী। ধলেশ্বরীর কাচেব মতো স্বচ্ছ জলে উজান-ভাটার ঢেউ খেলত।

নদীর পারে কত যে হিজল গাছ, তার লেখাজোখা নেই। ধলেশ্বরীর জল যেমন মিঠে, হিজলের ছায়া তেমনি মিঠে। হিজলের ঠান্ডা ছায়ায় জিরানিয়া গ্রামটি জুড়িয়ে থাকত।

ধলেশ্বরীর পারে জিরানিয়া গ্রামটি বেশ বড়। মোট তিন শ' ঘর সদগোপ, যুগী আর সোনারুর বাস। ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া আর ঢেউটিনের চালের সারি সারি ঘর। আম গাছ, জাম গাছ, বেতফলের গাছ, বউন্যা আর ঝিকিট গাছ। পাখি? তাও হাজার রকমের। শালিক, ডাহুক, হাড়গিলা, বখারি, তিতির, কাদাখোঁচা—কত যে, কে তার হিসেব রাখে। আর আছে জমি—একফসলা, দোফসলা, তেফসলা। বছরভর মাটিতে বীজ ছড়িয়ে যাও। মাটিও অকৃপণ হাতে দিয়ে যাবে। আহা, বাহারের জমি। বছরের কোনো সময় তার ঝাঁপি শূন্য হয় না।

মাটি মানুষ পাখি গাছ ছায়া নদী, এই সব নিয়েই জিরানিয়া গ্রাম।

তাঁতি, সদগোপ, সোনারু। জিরানিয়া গ্রামের কেউ কৌলিক ব্যবসা করত না। সবাই চাষ-আবাদ করত। মাটি নিয়ে মেতে থাকত। তাই জিরানিয়া ধনী গৃহস্থের গ্রাম হয়ে উঠেছিল।

উদ্ধব কিন্তু ব্যতিক্রম। তার বিষয়-বাসনা ছিল না। উদাসীন মানুষটির ছেলে-বউ-সংসার, কিছুই নেই। পৃথিবীর কোনো কিছুর জন্য টান কি মোহ, লোভ কি আসক্তি, কিছুই বোধ করত না সে।

ধলেশ্বরীর কিনার ঘেঁষে একখানা দোচালা ঘর তুলে নিয়েছিল উদ্ধব। সম্পত্তি বলতে এই ঘরটাই ছিল তার সর্বস্ব। এই ঘরখানাই শুধু নয়, খান দুই আট হাতি ধুতি, খান দুই ফতুয়া, একটা জলচৌকি, রাধামাধবের যুগলমূর্তির একটি ছবি, আর ছিল একটি সারিন্দা। সারিন্দাটা নিজেই বানিয়েছিল উদ্ধব। নিজের হাতেই সেটাতে তার লাগিয়ে নিয়েছিল। তারই শুধু বাঁধে নি, সুরও সাধত।

নিজেই গান বাঁধত উদ্ধব, সুরও বাঁধত। ভোর হতে না হতে সারিন্দায় ছড় টানতে টানতে বেরিয়ে পড়ত। গলাটি ভারি মিষ্টি। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে সে গাইত ঃ

'যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে,
যন্ত্রী বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে,
যন্ত্র বাজে না, বাজে না।'

জিরানিয়া গ্রামে তিন শ' ঘর গৃহস্থের বাস। আর গৃহস্থদের দাক্ষিণ্যের মুঠোটি কৃপণ নয়। সারা গ্রাম না ঘুরলেও চলত। সাত বাড়ি থেকে সাত মুঠো পেলেই অক্লেশে দিন চলে যেত। তা ছাড়া, সঞ্চয়ের মোহ নেই উদ্ধবের। দু'বেলা খাওয়ার মতো জুটলেই সে গ্রাম ছেড়ে নদীর পথ ধরত।

নদীর পারে খা খা শূন্য বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে সারিন্দার ছড় টেনে উদাস মনে গাইতে গাইতে কোন দিকে যে চলে যেত, দিশা থাকত না।

'কাম ক্রোধ লোভ ত্যজহ
কাঞ্চনময় হবে এ দেহ।'

গান বেঁধে, সুর সেধে, সারিন্দায় ছড় টেনে আর সাত গৃহস্থের ঘর থেকে সাত মুঠো জুটিয়ে জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত উদ্ধব।

কিন্তু ধলেশ্বরীর জলধারায় আচমকা কোত্থেকে একদিন অন্ধ উন্মাদ একটা স্রোত ছুটে এল। হিজল গাছের ঠান্ডা ছায়ায় শান্ত গ্রামটা চমকে উঠল।

আগের দিন বড় গৃহস্থ মহিন্দর সোনারু ঢাকা শহরে গিয়েছিল। খবরটা সে-ই এনেছে। ঢাকা থেকে ফিরেই গ্রামের সবাইকে নিজের বাড়ি ডেকে আনল। এমন যে বিষয়-বিমুখ উদ্ধব, যার কোনো ব্যাপারেই মোহ নেই, সেও বাদ পড়ল না।

খবরটা শোনার পর থেকেই সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছে মহিন্দর সোনারু। জিরানিয়া গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ সে। সমাজের শিরোমণি। পুরো দু শ' কানি তেফসলা জমি তার।

শহর-গঞ্জের খবরের রকমই আলাদা।

জিরানিয়া গ্রামের বাসিন্দারা কোনো কালে ইতিহাস-ভূগোল পড়ে নি। পুঁথি, পুরাণ, খবরের কাগজ, কোনো কিছুর কড়িও তারা ধারে না।

ঢাকা শহরে গিয়ে মহিন্দর যে খবরটা শুনে এসেছে তা হল এই। দেশখানা নাকি দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, জমিজিরাত ছেড়ে, এই গ্রাম আর ধলেশ্বরীর মায়া কাটিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

মহিন্দর সোনারুর উঠোনে ঠাসাঠাসি করে বসে ছিল মানুষগুলো। তারা ভেবেই পায় না, কেমন করে দেশটা ভাগ হয়ে গেল। যেমন বাতাস তেমনি বইছে। মাটিতে দাগ পড়ল না, নদীর জলে রেখ পড়ল না, তবু কিসের কারসাজিতে দেশখানা ভাগ হয়ে গেল? দেশ যে কেমন করে ভাগাভাগি হয়, বাপের বয়সে জিরানিয়া গ্রামের বাসিন্দারা কোনো কালে শোনে নি।

এই গ্রামের মাটির সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির যোগ। সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে, এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে হবে। বড় গৃহস্থ মহিন্দরের খবরটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু কথাটা নাকি সত্যি। খবরের কাগজে বেরিয়েছে। খবরের কাগজের কয়েকটা ছাপা অক্ষরের মর্জিতে জিরানিয়া গ্রামের সঙ্গে এত কালের সম্বন্ধটা চুকিয়ে চলে যেতে হবে? মন সায় দিয়ে ওঠে না। তা ছাড়া, তারা যাবেই বা কোথায়? এই গ্রামের সীমানার বাইরে যে বিপুল পৃথিবী পড়ে রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোনো ধারণাই নেই। কতটুকুই বা তারা দেখেছে!

ঘরবসত ছেড়ে চলে যেতে হবে। ধলেশ্বরীর পারে হিজল গাছের ছায়ায় শান্ত, নিরুদ্বেগ জিরানিয়া গ্রামটা ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল।

কিন্তু মহিন্দর সোনারুর খবরটা যে মিথ্যে নয়, কয়েক দিনের মধ্যেই টের পাওয়া গেল। এক মাস যেতে না যেতেই আশেপাশের গ্রামগুলিতে ভাঙন ধরল। আগমপুর, রসুনিয়া, বেতকা, গোপীগঞ্জ, নানা জায়গা থেকে চারমাল্লাই, ছ' মাল্লাই নৌকো বোঝাই হয়ে মানুষজন চলে যেতে লাগল।

একবার ভাঙন শুরু হলে তা ঠেকানো কি সোজা কথা! চারপাশ থেকে বেড়া আগুনের মতো ভাঙন এসে পড়ল জিরানিয়া গ্রামে। প্রথম গ্রাম ছাড়ল সোনারুরা। তারপর সদগোপেরা। তারও পর যুগীরা। ধলেশ্বরীর জলে ভেসে ভেসে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকোর বহর চলে যেতে লাগল তারপাশায়, ভাগ্যকুল কি মুন্সিগঞ্জের স্টিমারঘাটায়।

শেষ পর্যন্ত গ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে ছিল উদ্ধব। কিন্তু কিসের আশায়, কার ভরসায় সে পড়ে থাকবে?

একটা মানুষও আর নেই। ফাঁকা গ্রামটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত উদ্ধব। সব ব্যাপারেই সে নিস্পৃহ। তবু জনহীন, শূন্য গ্রামটার দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠত। নিজের অজান্তে কখন যেন চোখ দু'টো সজল হয়ে উঠত।

একদিন রাধামাধবের ছবিখানা, আট হাতি ধুতি দু'টো, খাটো ফতুয়া আর সারিন্দাটা পুঁটুলিতে বেঁধে নৌকোয় উঠল উদ্ধব। জিরানিয়া গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ঘুচে গেল।

গ্রাম ছেড়ে নানা ঘাটে ঘুরে কলকাতায় এসে উঠল উদ্ধব। এখানে নিদারুণ জীবন শুরু হল তার। প্রথমে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্ম থেকে ফুটপাতে, ফুটপাত থেকে রিফিউজি ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে মরতে লাগল।

এখানে কোথাও সাত গৃহস্থের ঘর থেকে সাত মুঠো মেলে না। এখানে দাক্ষিণ্যের হাত বড় কৃপণ। পেটের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল উদ্ধব। শুধু কি উদ্ধব, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ খাদ্যের জন্য, খিদে নামে আদিম জৈবিক দাবিটাকে ঠান্ডা করার জন্য না করল হেন কাজ নেই।

পৃথিবীর সেই প্রথম যুগে অর্ধপশুগঠন বর্বর মানুষ যেভাবে দিন কাটাত, কলকাতায় আসার পর অবিকল সেইভাবেই তাদের দিন কেটেছে। একেক সময় তার ধন্দ লেগেছে, একে আদৌ বেঁচে থাকা বলে কিনা।

জিরানিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে ন'টা বছর কাটিয়ে দিয়েছে উদ্ধব। এই ন'বছরে একটু একটু করে অদ্ভুত এক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। মৃত্যু ছাড়া একে কী-ই বা বলা যায়। জীবনে সব ব্যাপারেই উদ্ধব নির্বিকার, নিরাসক্ত। তবু নাড়ির টান রয়েছে যে মাটির সঙ্গে, সেই জিরানিয়া গ্রামের কথা ভাবতে ভাবতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যেত। গ্রামের মানুষগুলো ছন্নছাড়ার মতো কে কোথায় যে ভেসে গেল! ঘর গেল, বসত গেল, আত্মবান্ধবেরা গেল। মাথার ওপরকার কয়েকজন নেতা আর মুরুব্বির কারসাজিতে সমস্ত গেল। সব খুইয়ে শুধুমাত্র একমুঠো খাদ্যের জন্য জানোয়ারের মতো ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকা। আর যাই হোক, এর নাম জীবন নয়। এর চাইতে মৃত্যুও কাম্য। ন'টা বছর বেঁচে থেকেও মরে রইল উদ্ধব।

সারিন্দাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে এই ন' বছরে। গানের একটি পদও বাঁধে নি উদ্ধব। গলায় একদিনের জন্যও তার সুর ফোটে নি।

ন'বছর পর হঠাৎ একদিন ক্যাম্পে খবর এল, আন্দামান দ্বীপে গেলে জমিজিরাত, হাল-হালুটি, সব মিলবে। যে জীবন তারা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর ওপারে রেখে এসেছে, আন্দামান দ্বীপে গেলে তা ফিরে পাবে।

আশায় আশায় সকলে বুক বাঁধল। জমি পাবে, মাটি পাবে, নতুন করে বেঁচে উঠবে। বাঁচার নেশায় অন্ধ হয়ে কত মানুষ যে কালাপানির জাহাজে উঠল, তার লেখাজোখা নেই। তাদের সঙ্গে উদ্ধবও উঠল। সে বাঁচতে চায়।

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে এসে তিন একর অর্থাৎ ন'বিঘে জমি পেয়েছে উদ্ধব। সারাদিন কোদালের মুখে মাটি কেটে কেটে জমি চৌরস করে সে। রাতে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে গানের আসর বসায়।

সারিন্দাটা ভেঙে গিয়েছে, সে জন্য দুঃখ নেই তার। আন্দামানে এসে একটা দো-তারা বানিয়ে নিয়েছে। দো-তারার তারে আঙুলের ঘা মেরে মেরে গুন গুন করে সুর তোলে :

'পরবাসী নাইয়া রে-এ-এ-এ—'

পালসাহাব উদ্ধবের গান-বাজনার সবচেয়ে বড় সমঝদার। উদ্ধবের গানের সময় দুই হাঁটুতে তাল ঠোকে সে। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকায় আর বলে, 'বহোত আচ্ছা উস্তাদ, বহোত আচ্ছা—' উদ্ধবকে সে উস্তাদ বলে।

পালসাহাবের গলা যেমন কর্কশ, তেমন বাজখাঁই। মাঝে মাঝে নিজের স্বরের মহিমা ভুলে উদ্ধবের সুরে সুর মেলাতে যায় সে, 'পরবাসী লাইয়া রে-এ-এ—' নিজের কানেই নিজের স্বরটা কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায়। সুর থামিয়ে পালসাহাব বলে, 'বুঝলি উস্তাদ, গলাটা আমার বহোত নালায়েক, বদখত। শালে যেন ঘোড়ার ডাক ডাকে।' নিজের গলার সঙ্গে হ্রেষাধ্বনির তুলনা দিয়ে খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে সে।

বাঁচার স্বপ্ন দেখছে উদ্ধব।

ধলেশ্বরী পারের যে সুর, যে গান কলকাতায় এসে হারিয়ে ফেলেছিল সে, বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এই দ্বীপে এসে সেই সুর সেই গান আবার ফিরে পেয়েছে।

এখন সন্ধে।

কুয়াশা আর অন্ধকারের তলায় উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা তলিয়ে যাচ্ছে। আকাশ দেখা যায় না। চারপাশের অরণ্যকে ধোঁয়ার পাহাড়ের মতো মনে হয়।

সারাদিন জমি মাপজোখ করেছে পালসাহাব। এত মানুষকে তো দু'একদিনে জমি মেপে দেওয়া সম্ভব নয়। যাদের এখনো দেওয়া হয়নি, হিসেব করে তাদের অনেককে জমি বুঝিয়ে দিয়ে বাঁশের খুঁটি পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিয়ে এসেছে।

দিনের শেষে মানুষগুলো এখন ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে। সবার আগে আগে চলেছে পালসাহাব।

আজ কী তিথি কে জানে। কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে নিচের পৃথিবীতে। সে আলোতে কিছুই স্পষ্ট নয়। এই ট্রানজিট ক্যাম্প, টিলা, চারপাশের জঙ্গল—সব কেমন যেন ঝাপসা, রহস্যময়।

খানিকক্ষণ পর টিলা বেয়ে ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে উঠতে উঠতে পালসাহাব হাঁকল, 'এ উস্তাদ, উস্তাদ হো—'

সকলের পেছনে টিলা বাইছিল উদ্ধব। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পালসাহাবের কাছে এসে পড়ল। বলল, 'এই যে পালসাহাব— '

'হাঁ উস্তাদ, দিল চায়—' বলে একটু থামল পালসাহাব। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেসা করল, 'দিল কী চায় বল দিকি উস্তাদ?'

ভয়ে ভয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকাল উদ্ধব। এই বিচিত্র মানুষটাকে আদৌ বুঝতে পারে না সে। কখন কোন কথায় সে খেপে উঠবে, কোন কথায় খুশি হবে, আগে থেকে তার হদিস মেলে না। পালসাহাবের চরিত্র বড় দুর্জ্ঞেয়। তাই সব সময় উদ্ধব তটস্থ হয়ে থাকে। বেশ ভেবে চিন্তে তার কথার জবাব দিতে হয়।

পালসাহাব আবার প্রশ্ন করল, 'আমার দিল কী চায় উস্তাদ?'

এবারও জবাব দিল না উদ্ধব। পালসাহাবের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

পালসাহাব উদ্ধবের পিঠে একটা হাত রেখে সস্নেহে বলল, 'নালায়েক বুদ্ধু, এত্তে রোজ আমার সাথ থেকেও দিলের কথাটা বুঝতে পার না উস্তাদ! দিলের কথা না বুঝলে দোস্ত বনবে কেমন করে?'

কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে উদ্ধব বলল, 'হ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

যে মানুষগুলো জমির ভাগ নিতে গিয়েছিল, তারা ট্রানজিট ক্যাম্পের ঝুপড়িগুলোর ভেতর ঢুকে পড়েছে।

পালসাহাব বলল, 'এ উস্তাদ, দিল চায় একটু গানা-বাজনা হোক।'

অবাক হয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উদ্ধব। এই মানুষটা সম্বন্ধে ভেবে ভেবে থই পায় না সে।

সারাদিন অসুরের মতো খেটেছে পালসাহাব। এক হাতে জমি মেপেছে, আর এক হাতে বাঁশ পুঁতে সীমানা ঠিক করেছে। উদ্ধব ভাবতে চেষ্টা করল, হাজার খেটেও কি লোকটার ক্লান্তি আসে না? সারাদিন খাটুনির পর যখন চোখ দু'টো বুজে আসে, আপনা থেকেই ঢুলুনি লাগে, শরীরটা আর বশে থাকতে চায় না, তখনো গান-বাজনা করার মতো উদ্যম কোথায় পায় পালসাহাব?

অফুরন্ত প্রাণশক্তি পালসাহাবের। অদম্য তার উৎসাহ। তার উদ্যম হাজার অপচয়েও ফুরোয় না। আজকের উদ্ধব জানে না, কিন্তু বহুকাল পরের আর এক উদ্ধব জেনেছিল, পালসাহাবের দৌলতেই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে সে। শুধু সে-ই না, এখানে যারা উপনিবেশ গড়তে এসেছে, পালসাহাবের কল্যাণে তারা সকলেই। উত্তর আন্দামানের এই নিদারুণ দ্বীপে তারই জন্য নতুন করে তারা বেঁচে উঠেছে।

পালসাহাব এবার তাড়া লাগায়, 'যাও উস্তাদ, গান-বাজনার ইন্তেজাম কর। জলদি —'

ঝুপড়ি থেকে দো-তারাটা নিয়ে এল উদ্ধব।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সামনে খানিকটা সমতল ঘাসের জমি। সেখানে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল উদ্ধব আর পালসাহাব।

দো-তারার তারে মৃদু মৃদু ঘা মারে উদ্ধব। টুং টাং করে সুর ফোটে। দুই হাঁটুর ওপর চাপড় মেরে মেরে তাল দেয় পালসাহাব। দো-তারার বাজনা যখন জমে ওঠে তখন বলে, 'লাগাও উস্তাদ, গানা লাগাও—'

দো-তারার শব্দ পেয়ে আন্য ঝুপড়িগুলোর ভেতর থেকে হারান, বসিক শীল আব বুড়ি বাসিনী বেরিয়ে এসেছে। সরাসরি পালসাহাব আর উদ্ধবের গা ঘেঁষে তারা বসে পড়ল।

পালসাহাব অস্থির হয়ে উঠল, 'লাগাও উস্তাদ—'

উদ্ধব গান ধরল ঃ

'গোরানাম লইতে অলস
করো না রসনা,
যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?'

পালসাহাব সায় দেয়, 'ঠিক ঠিক, বহোত সাচ বাত বলেছ উস্তাদ। ঢেউ দেখলেই কি নৌকো ডুবাতে হয়?'

উদ্ধব উত্তর দেয় না। গানের শেষ পদটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানা তালে নানা সুরে গাইতে থাকে, 'ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল পালসাহাব। উদ্ধবের মুখে হাত চাপা দিয়ে গান থামিয়ে দিল। তারপর বলল, 'একটু থাম উস্তাদ, আগে শালে লোগদের ডেকে আনি। তাদের তুমি সমঝিয়ে দাও। শালেবা মুখ বেজার করে থাকে, খালি কাঁদে। আরে নালায়েক বুদ্ধুর দল, ডরের কী আছে। এক জিন্দেগী তুড়ে গেছে, কী করা যাবে! মুর্দা কোলে করে কে আর কতক্ষণ বসে থাকে? এই দ্বীপে জমিন পেয়েছিস। নয়া জমানা, নয়া জিন্দেগী বানা।' বলেই পালসাহাব ট্রানজিট ক্যাম্পটার দিকে ছুটল। ঝুপড়িগুলোর সামনে এসে চিল্লাতে লাগল, 'এ শালে লোগ, এ কুত্তার দল বেরিয়ে আয়।'

পালসাহাবের চেল্লাচিল্লিতে ক্যাম্প থেকে সবাই সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দৌড়ে বেরিয়ে এল। সকলকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধবরা যেখানে বসে আছে সেখানে এসে পড়ল পালসাহাব। বলল, 'গাও উস্তাদ, তোমার সেই গানটা ফিরসে শুরু কর। ওদের সমঝিয়ে দাও, জিন্দেগীতে বহোত ভারী ভারী তুফান আসে। তুফান দেখেই যারা নাও ডুবিয়ে দেয় তারা মানুষ না।' গলার স্বরটা গভীর শোনাতে থাকে

পালসাহাবের। অনেক কথাই সে বলে যায়। জীবনে কত ভারী ভারী ঝড় আসে, ঘর বসত সাধ বাসনা কত বার ভেঙে যায়, তাই বলে কি হতাশ হলে চলে! কোনো ব্যাপারে কোনো আপসোস রাখতে নেই। বিমুখ, প্রতিকূল অবস্থা থেকে সব বাধা, সব হতাশা ভেঙেচুরে ওঠার নামই তো জীবন। এই কথাগুলিই নিজের ভাষায়, নিজের নিয়মে বলে যায় পালসাহাব।

উদ্ধব গাইতে থাকে ঃ

'ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি,
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?'

এগার

চারপাশে নোনা জল, মাঝখানে মিঠে মাটি।

মাপজোখ করে সেই মাটি সকলকে ভাগ করে দিয়েছে পালসাহাব। বাঁশের ছোট ছোট টুকরো পুঁতে সীমানাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের মাটি হারিয়ে এসেছে মানুষগুলো। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেল।

নিঃস্ব, নির্ভূম, দুঃখী মানুষগুলো মাটি পেয়েছে। জমি বাঁটোয়ারা করতে করতে পালসাহাব বলেছিল, 'জমিন দিলাম। এবার নতুন করে বেঁচে ওঠ।'

বলতে বলতে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে সে। তার চোখ দু'টো চারদিকের উঁচু উঁচু পাহাড় পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। গাঢ়, আপ্লুত স্বরে সে সমানে বলে গিয়েছিল, 'এখানে গাঁও বসাবি, ধান মলবি, দেওয়ালে ঘিউ-সিন্দুর দিয়ে বসুধারা আঁকবি ...'

মানুষগুলো জবাব দেয় নি। শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে।

নতুন বসতের আশায় সমুদ্র পেরিয়ে যারা এখানে এসেছে তাদের কেউ বারুই, কেউ সোনারু, কেউ কামার, কেউ কুমোর, কেউ জেলে, কেউ মালো, কেউ যুগী, আবার কেউ সদগোপ। কিন্তু এ-সবই তাদের বিগত জীবনের পরিচয়, যে জীবন তারা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পারে পারে হারিয়ে এসেছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ মানুষগুলোর অতীত পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়েছে। এখানে কেউ আর কামার-কুমোর-সদগোপ কি যুগী নয়, এখানে সকলের একটি মাত্র পরিচয়, একটি মাত্র বৃত্তি। মাটি পেয়ে সবাই এখানে কৃষাণ হয়ে গিয়েছে।

কৃষির দৌলতেই পৃথিবীর আদিম যাযাবর মানুষ প্রথম গৃহী হয়েছিল। হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে যারা এই দ্বীপে এসেছে, একদিন তারাও গৃহস্থ ছিল। তাদের নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, সভ্য একটা জীবন ছিল। কী না ছিল তাদের! ঘরভদ্রাসন, জমিজিরাত—সব।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের মাটি মরশুমে মরশুমে ফসলের লাবণ্যে ভরে উঠত। দূর থেকে ফসলের খেত দেখে মনে হত, কেউ যেন পরম আদরে একখানা নকশি-কাটা আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে।

ফসল ওঠার পর আসত ঢপের নৌকো, জারি সারি এবং নানা লীলাপালার দল। গানে গানে নদীতীরের গ্রাম মাতোয়ারা হয়ে উঠত। গায়কেরা বড় দরদ দিয়ে পিরীতের গীত গাইত :

'ও সজনী, প্রাণ সজনী, মুখ তুলিয়া চায়।
ভরা দেহের গাঙ্গে লো সই, সাধের জোয়ার যায়।'

জীবনে রং ছিল, রস ছিল। গৃহপালিত জীবনটিকে ঘিরে স্বপ্ন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত। আহা, যেদিকে তাকানো যায়, সুধা যেন উছলে উছলে পড়ত।

কিন্তু কী বিড়ম্বনা!

কোথায় কোন হিল্লি দিল্লিতে কারসাজি হল। আর তারই ফলে দেশখানা দু'টুকরো হয়ে গেল। ভূগোলের হট্টগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের মানুষের তৈরি বড় সাধের ঘর ভেঙে গেল। সেই সব গ্রাম, সেই জীবন, সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন কোথায় পড়ে রইল! সে যেন অন্যজন্মের স্মৃতি। সুখী, গৃহী মানুষগুলি যাযাবর হয়ে পৃথিবীর আদিম পরিচয়ে ফিরে গেল।

কী নিদারুণ প্রহসন! কুৎসিত, বিষাক্ত রাজনীতি পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের গৃহস্থ মানুষগুলোকে কত হাজার বছর পর আবার নতুন করে যাযাবর করে দিল।

নিঃস্ব মানুষগুলো কয়েকটা বছর ভূমিহীন ইহুদিদের মতো ঘোরার পর এই দ্বীপে আবার মাটি পেয়েছে। পায়ের নিচে আশ্রয় পেয়ে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাল-হালুটি, লাঙল-বলদ এখনো আসে নি। তবে পালসাহাব সবাইকে একটা করে কোদাল দিয়েছে। সেই কোদাল নিয়ে সকলে জমিতে নেমেও পড়েছে। মাটি কোপাচ্ছে। জমি চৌরস করছে।

পালসাহাব এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। দেখতে দেখতে পাগলার চোখে স্বপ্ন নিবিড় হয়ে আসে।

অরণ্যের তলায় এতকাল যে মাটি বন্দিনী হয়ে ছিল, সে তো কুমারী। মানুষের ভোগের জন্য তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। কোদালের কোপ পড়ছে তার শরীরে। এই দ্বীপের মাটি এই প্রথম মানুষের স্পর্শ, পুরুষের স্পর্শ পাচ্ছে।

পাগলা পালসাহাব ভাবে, একদিন এখানে হাল বলদ আসবে। লাঙলের ধারাল ফলায় ফলায় মাটি তৈরি হয়ে যাবে। তারপর একদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামবে। একদিন নরম মাটি বীজদানা পেয়ে গর্ভিণী হয়ে উঠবে। তারপর ফসলের লাবণ্যে দিগ্‌দিগন্ত ভরে যাবে।

এক কিনারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলা পালসাহাব সেই স্বপ্নই দেখতে থাকে। দেখে দেখে সাধ আর মেটে না।

বার

এতকাল এই মাটির ওপর অরণ্য চেপে বসে ছিল। পরম নিশ্চিন্তে সে তাব সংসার বাড়িয়েই যাচ্ছিল। তার অধিকারে হাত দেওয়ার মতো দ্বিতীয় কোনো দাবিদাব এখানে ছিল না।

উত্তর আন্দামানের এই জটিল অরণ্যে মানুষের নজর চলে না। পৃথিবীর আদিম অন্ধকাবকে নিজেব বুকের ভেতর ধরে রেখে নির্বিঘ্নে তার দিন কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। মানুষের প্রয়োজন এসেছে। উদ্ধব বৈরাগী, রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর, বুড়ো-জোয়ান, সকলেই কোদালের মুখে পরল পরল মাটি তুলছে। শুধু কি পুরুষ মানুষবাই এসেছে, ঘরের বউ-ঝিরাও জমিতে নেমে পড়েছে।

হরিপদ বারুইর বুকে টানের দোষ। নড়াচড়া করলেই ব্যথাটা বাড়ে। তাই তার বউ তিলি এসেছে। শুধু কি তিলি? হিমি ক্ষিরি সারী কাপাসী বুড়ি বাসিনী, এমন আরো কত জন এসেছে, কে তার হিসাব রাখে।

যে সব ঘরের বাপ-ভাই-সোয়ামী অক্ষম অপারগ, নিত্য দিন ব্যারামে ভোগে, সেই সব ঘরের বউ-ঝিদের জমিতে না নেমে উপায় কী? বিশেষ করে এই আন্দামান দ্বীপে।

পাগলা পালসাহাব যেন ঘোরের মধ্যে ছুটতে থাকে। মাটি কোপাতে কোপাতে তিলি হয়তো হয়রান হয়ে পড়ে। ছোঁ মেরে তার কোদালখানা ছিনিয়ে খানিকটা কুপিয়ে দেয় জঙ্গল। পোড়া ছাইয়ের স্তূপ সরাতে সরাতে বুড়ো রসিক শীলের হয়তো জিভ বেরিয়ে পড়ল। ছুটে গিয়ে পালসাহাব তাকে সরিয়ে দিল।

দীর্ঘ উপত্যকার এক মাথা থেকে আর এক মাথায় ছুটে বেড়াচ্ছে পালসাহাব। এর মাটি কুপিয়ে দেয়, ওর জমির আগাছা সাফ করে, তার কোদালের আছাড়ি পরিয়ে দেয়।

পালসাহাবের ওপর বিচিত্র এক নেশা যেন ভর করেছে। ঠিক নেশা নয়, পাগলার প্রাণের মধ্যে কোথায় যেন উৎসব শুরু হয়েছে। পালসাহাব দেখতে পাচ্ছে, প্রাণেই শুধু নয়, উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ জুড়ে জীবনের অনন্ত উন্মাদনার সূচনা হয়েছে।

এখন বেলা কত, কে জানে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলার বয়স বোঝার যো নেই। তা ছাড়া, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে যারা নয়া বসতের আশায় আশায় এসে পড়েছে, এমনিতেই তারা সময়ের কড়ি ধারে না।

মাথার ওপর আকাশের বিরাট অংশটা জ্বলছে। এক ঝাঁক সাগরপাখি উড়তে উড়তে বুঝিবা এরিয়াল উপসাগরের দিকেই চলে গেল। একটু পরেই সূর্যটা দ্বীপের মাথায় এসে পৌঁছুবে। আজ সবার শেষে জমিতে এল হারান। দেখল, জমি কোপানো চলছে। কোদালের মুখে মুখে পরল পরল মাটি উঠছে।

উত্তর দিকে পাহাড় ঘেঁষে হারানের জমি। আচমকা সেদিক থেকে ডাকটা ভেসে এল, 'এ শালে হারান, এ কুত্তা লবাবকা বাচ্চা, ইধর আয়।'

খিস্তির নমুনাতেই বোঝা গেল, পালসাহাব। নিজের জমির দিকে দৌড়ল হারান।

পালসাহাব হারানের জমি কোপাচ্ছিল। কপালে মুখে হাতে পায়ে, সারা দেহ মাটি-মাখা। কামিজ আর প্যান্টে, মাথার ফেল্ট হ্যাটে, রোমশ বুকে, পাটকিলে রঙের এক মুখ দাড়িতে ডেলা ডেলা মাটি লেগে রয়েছে। ঘামে ভিজে সেই মাটি লেপটে গিয়েছে। কী অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে পালসাহাবকে!

মুখখানা কাঁচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়াল হারান।

'এত দেরি করলি যে? সব আদমী এক পর্দা মিট্টি তুলে ফেলল—' বলে একটু থেমে, এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিল পালসাহাব। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে শোন, এই দ্বীপ আমার এলাকা। এখানে লবাবী চলবে না। রোজ সুবেতে (সকালে) জমিন কোপাতে না এলে পিটিয়ে হাড্ডি ঢিলা করে দেব। বাতটা ইয়াদ রাখিস।' বলতে বলতে হারানের জমি থেকে উঠে এল পালসাহাব।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হারান। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে তার। বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে যে মানুষটার হাতে তাদের মরা-বাঁচা নির্ভর সেই পালসাহাব নিজে তার জমি কুপিয়ে দিয়েছে। এ লজ্জা কোথায় রাখবে হারান। মাথা তুলে সে পালসাহাবের দিকে তাকাতেই পারছে না। কাঁপা ভীরু গলায় একসময় সে বলল, 'আপনে আমার জমিন কুপাইলেন (কোপালেন) ক্যান? আমার কত অপরাধ হইল!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ হারানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পালসাহাব। তারপর বলল, 'দিল হল তাই তোর মিট্টি কুপিয়ে দিলাম। সবার জমিন কোপানো হচ্ছে, খালি তোরটাই বাদ পড়ে থাকবে?' বলতে বলতে থেমে গেল পালসাহাব। হঠাৎ স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল সে। আকাশের ওপারে কোথায় যেন দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলল। এই দ্বীপের নতুন মানুষ আর অরণ্যের তলা থেকে বার করে আনা নতুন মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে পালসাহাব।

এখন, এই মধ্যদুপুরে সূর্যটা যখন সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে, পাগলা পালসাহাব সেই স্বপ্নটাই দেখতে লাগল। অনুচ্চ, ফিস ফিস স্বরে সে বলল, 'এই দ্বীপে তোরা এক সাথ এসেছিস। এক সাথ তোদের জমিন ভাগ করে দিয়েছি। এক সাথ তোরা মিট্টি কোপাবি, ফসল ফলাবি। কেউ আগে না, কেউ পিছে না। সবাই এক সাথ। কেউ পিছে পড়লে আমি তার কাম করে দেব।' বলতে বলতে থেমে গেল।

খানিকক্ষণ পর নিচু গলায় হারান ডাকল, 'পালসাহাব—'

পালসাহাবের হুঁশ নেই। উঁচু উঁচু পাহাড়ের ওপারে কোথায় যেন সেই স্বপ্নটা তখনো দেখে চলেছে সে। এই মুহূর্তে পালসাহাবকে ঠিক বোঝা যায় না। সে এখন দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, অনেক দূরের স্পর্শাতীত জগতের মানুষ।

ভয়ে ভয়ে হারান আবার ডাকল, 'পালসাহাব—'

'হাঁ—' একটু আগের ঘোরটা কেটে গেল পালসাহাবের। সঙ্গে সঙ্গে সে খেঁকিয়ে উঠল, 'আমার মুখের দিকে চেয়ে কী দেখছিস হারামজাদকে বাচ্চে? যা, আপনা কাম কর—' হারানের ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে জমিতে নামিয়ে দিল পালসাহাব। তারপর পশ্চিম দিকে তিনখানা জমি বাঁয়ে রেখে বুড়ো রামকেশবের জমির দিকে ছুটল।

এদিকে মাটিতে কোপ মেরেই হারান চমকে উঠল। কোদালের মুখে মাটির যে পরলটি উঠল, তার নিচে সরুমোটা কত যে শিকড় রয়েছে, লেখাজোখা নেই।

সরকারি বনবিভাগের লোকেরা মাটির ওপরের জঙ্গল সাফ করে গিয়েছিল। কিন্তু অরণ্যকে নির্মূল করা এতই সহজ! মাটির নিচে কত কাল ধরে হাজার হাজার শিকড় নামিয়ে অরণ্য তার দখল কায়েম করে রেখেছে। শুধু কি শিকড়, মাটির গর্ভে হাওয়াই বুটি, জলডেঙ্গুয়া, ইকড় ঘাস, কড়ুই ঘাস, প্যাডক-দিদু-চুগলুম গাছের কত বীজই না জমা হয়ে রয়েছে! আর এই সব বীজ আর শিকড়ের মধ্যেই রয়েছে নতুন অরণ্যের সম্ভাবনা।

তবু প্রাণপাত করে জমি কুপিয়ে চলল হারান। কোদালের ঘায়ে মাটির সঙ্গে টুকরো টুকরো শিকড় উঠে আসছে।

এই দ্বীপের মাটি চমৎকার। হাতে তুলে চাপ দিলে গুঁড়ো গুঁড়ো, ঝুরো ঝুরো হয়ে যায়। কিন্তু বিঘের পর বিঘে সেই মাটিকে অরণ্যের দখল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সোজা ব্যাপার নয়।

এতকাল অরণ্য এই দ্বীপের মাটির গভীর তলদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এখন কোদালের মুখে মুখে মাটির ওপর তার হাজার হাজার বছরের দাবি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। নতুন করে বাঁচার জন্য মানুষের বিপুল পরিমাণে জমি দরকার।

সমানে মাটি কোপাচ্ছে হারান। সারা গায়ে বনপোড়া ছাই মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

বন বিভাগের লোকেরা জঙ্গল পুড়িয়ে বড় বড় গাছগুলো কেটে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এখনো অজস্র হাওয়াই বুটি আর জলডেঙ্গুয়ার ঝোপ রয়েছে।

হারান এক একবার ধারাল দা দিয়ে ঝোপঝাড় সাফ করে, আবার মাটি কোপায়। পিছল মাটি থেকে কত যে জোঁক বেয়ে বেয়ে গায়ে উঠছে, খেয়াল থাকে না তার। যখন খেয়াল হয়, দা দিয়ে জোঁকগুলোকে চেঁছে ফেলে। যেগুলো পিঠের দিকে বা পায়ের গোছের পেছন দিকে লেগে থাকে সেগুলো রক্ত শুষে শুষে কচি তেলাকুচের মতো ফুলে আপনা থেকেই খসে পড়ে।

একসময় বেলা ঢলে পড়ল। রোদের তেজও মরে আসতে শুরু করল। কোদালটা নামিয়ে রেখে একবার পেছনে তাকায় হারান। আজ বেশ খানিকটা জমি কোপানো হয়েছে। কিন্তু আরো অনেকটাই বাকি। পুরো জমি কোপাতে অন্তত মাসখানেক লেগে যাবে।

এবার অন্য দিকে তাকায় হারান। চারপাশের জমিগুলোতে কাজ চলছে। তার চোখ দু'টো এধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে পাশের জমিতে এসে পড়ল।

বাঁশের টুকরো পুঁতে পুঁতে সবার জমির সীমানা ঠিক করে দিয়েছে পালসাহাব। হারানের জমির ঠিক পাশেই নিত্য ঢালীর জমি। কিন্তু আজ নিত্য জমি কোপাতে আসে নি। তার বদলে এসেছে কাপাসী।

কাপাসী মাটিতে দু'চার কোপ বসায় আর হাঁপায়। হাঁপায় আর কাঁদে। কাঁদে, কিন্তু শব্দ হয় না। চোখ বেয়ে নোনা জলের যে ধারা নামে, হাতের পিঠ দিয়ে তা মুছে ফেলে কাপাসী।

হারান অবাক হয়ে গিয়েছে। যে কাপাসীকে কোনোদিন কাঁদতে দেখে নি সে এখন কাঁদছে। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হারান। তারপর এদিক সেদিক দেখে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। খুব আস্তে ডাকে, 'কাপাসী—'

'কে?' কাপাসী চমকে উঠল।

'আমি, আমি।' বলে একটু থেমে কী যেন ভেবে নিল হারান। বলল, 'কান্দো (ক্যাঁদো) ক্যান?'

'কই কান্দি? কান্দি না তো।'

'এই যে দেখলাম। অহনো তো তোমার চোখ ভিজা।'

'ভুল, ভুল দেখছ পুরুষ।' ভিজে চোখদু'টো হাতের পিঠে ঘষে ঘষে মোছে কাপাসী। তারপর শব্দ করে অদ্ভুত হাসে। বলে, 'কান্দি না। এই তো হাসি।' হেসে হেসে ঢলে পড়ে কাপাসী। হাসির দমকে দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়। সর্বাঙ্গ দিয়ে অস্বাভাবিক, অবুঝ হাসি হাসছে মেয়েটা।

অবাক তাকিয়ে থাকে হারান। কাপাসীর হাসির এই তীব্র, বিচিত্র শব্দটা যখনই সে শোনে, তখনই অদ্ভুত এক ভয় তাকে ঘিরে ধরে।

আচমকা যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা কাপাসীর হাসি থেমে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারান বলে, 'তুমি জমিন কুপাইতে আইছ যে! নিত্য তালুই কই?' সে নিত্য ঢালীকে তালুই ডাকে।

কাপাসী বলল, 'বাবায় আহে নাই। পিত্তি শূলের ব্যথাখান বাড়ছে। হেইর লেইগা আমি জমিন কুপাইতে আইছি।'

মাঝে মাঝে সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলে কাপাসী। তখন আশায় বুক বাঁধে হারান। খুশিতে আনন্দে চোখ দু'টো চক চক করে তার। নিজের মনকে সে বুঝ মানায়, আর দশ জনের মতো কাপাসী আবার স্বাভাবিক হবে। তাকে ঘিরে জীবনের সুন্দর সাধটাকে মিটিয়ে নেবে সে। কাপাসীকে ঘিরে হারানের বুকে কত যে আশা, কত যে সাধ!

কাপাসী বলতে থাকে, 'বাপে শূলের বেদনায় কাতর। আমি জমিন না কুপাইলে ফসল ফলামু ক্যামনে? খামু কী?' এরপর আর কথা বাড়ায় না। কোদালটা তুলে মাটিতে কোপ বসায়।

হারান চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। মেয়েমানুষের হাতে কত শক্তিই বা ধরে! কোদালের ফলা মাটির নিচে এক কড়ও ঢোকে না। মাটির ওপর আঁচড় বসায় মাত্র। হারান হাসে। বলে, 'এই কোপের কাম না কাপাসী। পরল পরল মাটি তুইলা জমিনরে উথালপাথাল কইর‍্যা ফালাইতে অইব। তবে না মাটি চাষের যুইগ্য অইব। তবে না মাটি ফসলের জন্ম দিব।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'কোদালখান আমারে দাও, আমি জমিন কুপাইয়া দেই।'

খুব নিরাসক্ত মুখ করে কাপাসী বলে, 'না।'

হারান জোরজার করতে থাকে, 'দাওই না কোদালখান।'

'না, তুমি তোমার জমিনে যাও।' বলে আর মাটি কোপায় কাপাসী।

হারান বলে, 'যা কোপ মার, হেইতে কুনো কালে জমিন চৌরস অইব না কাপাসী।'

'দেখ পুরুষ, লয়ন ভইরা দেখ, ক্যামন কোপ মারি!' জোরে, আরো জোরে কোপ বসায় কাপাসী। এবার কোদালের ফলা পরল পরল মাটি তুলতে থাকে। আর কোপাতে কোপাতে ফের তীব্র, অবুঝ গলায় হেসে ওঠে সে।

গভীর এক দুঃখের ছায়া পড়ে হারানের মুখে। চাপা এক কষ্ট তাকে চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরতে থাকে। একটু আগে স্বাভাবিক ভালমানুষের মতো কথা বলছিল কাপাসী। এই মুহূর্তে সেই অদ্ভুত হাসিটার মধ্য দিয়ে আবার অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। হারানের মনে হল, কেঁদে ওঠে। যে কান্নাটা গলার ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, অতি কষ্টে তা বাগ মানালো হারান।

পশ্চিম দিকের পাহাড় ঘেঁষে বুড়ো রসিক শীলের জমি। তার মাটি কুপিয়ে দিচ্ছিল পালসাহাব। হাসির শব্দে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, সেটাকে ঠিক করে মাথার ওপর বসাল। তার বিরক্ত মুখে অগুনতি ভাঁজ পড়ল। রোমশ ভুরু দু'টো কুঁচকে যেতে লাগল।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল পালসাহাব, 'কৌন, কৌন হাসতা? শালের জান লে লেগা।'

পাশ থেকে কে যেন বলল, 'কাপাসী হাসে বাবা।'

হাতের কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দৌড়তে দৌড়তে কাপাসীর জমিতে এসে পড়ল পালসাহাব।

জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে হুমকে উঠল, 'এই মাগী, হাসো মাত। হাসবি না। তোর হাসি শুনলে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়।'

হাসিটা তুমুল হয়ে উঠল কাপাসীর। হাসতে হাসতেই সে বলে, 'আঁই ড্যাকরা, আঁই পালসাহাব, আমার হাসন থামাইতে চাস?'

'হাঁ। এখানে অ্যায়সা হাসি চলবে না।'

'হাসন তো থামাইতে চাস! আরে সোনা, আমার হাসন কি তর বশে?'

পালসাহাব গর্জে ওঠে, 'চোপ—'

হাসিটা বাড়তেই থাকে কাপাসীর। সে বলে, 'ধমক দিয়া আমার হাসন থামাইতে পারবি না। আমার হাসন তর বশে না, আমার বশে না। এই পিরথিমীর কুনো মনিষ্যের বশে না।'

এবার আর কথা বলে না পালসাহাব। একদৃষ্টে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাপাসী হাসে আর কথা বলে। তার গলাটা বড় করুণ শোনায়, 'ভগমান জম্মের সোময় কপালে যা লেখছিল, তা কি মিছা হয় পালসাহাব? হাসতে হাসতেই আমার পরাণ যাইব।'

পালসাহাব মুখটা অন্য দিকে ঘোরায়। কী যে ভাবে, সে-ই জানে।

অনেকটা সময় কাটে। হঠাৎ পালসাহাবের নজরে পড়ে, কাপাসীর জমির এক কোনায় হারান দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে খেপে ওঠে, 'অ্যাই শালা, এখানে কী করছিস?'

হারান থতমত খেল। কাঁপা গলায় বলল, 'কাপাসী জমিন কুপাইতে পারে না। দুই চার কোপ দিয়াই হাপায়, হয়রান হইয়া পড়ে। তাই—'

'তাই কী হয়েছে?' পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল।

মাথাটা নামিয়ে আস্তে আস্তে হারান বলল, 'তাই অর জমিনটা কুপাইয়া দিতে আইছিলাম।'

'হারামী, নালায়েক কাঁহাকা! রসিক শীলের জমিন থেকে আমি দেখেছি, কতক্ষণ ধরে শালে তুই কাপাসীর কাছে ঘুরঘুর করছিস। আওরতের গায়ের গন্ধ না পেলে দিলে ফুর্তি লাগে না! যাও কুত্তা, আপনা কাম কর। আপনা জমিন বানাও।'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে নিজের জমিতে গিয়ে নামল হারান।

আর কাপাসীর হাসি আরো তীব্র হতে লাগল। শরীরটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, 'আমার উপকারী বান্ধব, জমিন কুপাইয়া দিতে চায়! ঠিক করছস পালসাহাব, অরে খেদাইয়া দিছস। অত উপকার আমার সইব না। হিঃ—হিঃ—হিঃ—'

সন্ধের আগে আগে কাজ বন্ধ করে দিল পালসাহাব।

আজকের মতো মাটি কোপানো, জমি চৌরস করা কি জঙ্গল সাফ করা শেষ।

এখন সূর্যটাকে আকাশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আকাশটা জঙ্গলের ওপারে যেখানে ধনুরেখায় নেমে গিয়েছে, এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন সেদিকে উড়ে যাচ্ছে।

সবাইকে নিয়ে পালসাহাব ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। গোটা পাঁচেক টিলা, অনেকগুলো চড়াই-উতরাই আর ছোট পাহাড়ী নদী কিলপঙ পেরিয়ে ট্রানজিট ক্যাম্প। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

জমি কোপাতে কোপাতে সেই যে হাসতে শুরু করেছিল কাপাসী সে হাসি এখনো থামে নি। চারপাশের অরণ্য এবং পাহাড়গুলিকে চমক দিয়ে হাসতে হাসতে সে চলেছে।

সবার আগে আগে চলছে পালসাহাব আর হারান।

হঠাৎ পালসাহাব ডাকল, 'হারান—'

হারান মুখে কিছু বলল না। আস্তে আস্তে পালসাহাবের পাশে ঘেঁষে এল।

পালসাহাব আবার ডাকল, 'এই হারান—'

হারান এবারও নিরুত্তর।

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল পালসাহাব। হারানের কাঁধে একটা হাত রেখে নিজের দিকে টেনে নিল। সস্নেহ, গাঢ় গলায় বলল, 'কি রে কুত্তা, গুস্‌সা করেছিস?'

'না।' ঘাড় গোঁজ করে এগুতে লাগল হারান।

'করেছিস, জরুর গুস্‌সা করেছিস।'

হারান ফিস ফিস করে বলে, 'কার উপুর গোসা করুম পালসাহাব?'

'আমার ওপর।' পালসাহাব বলতে থাকে, 'তোকে কাপাসীর জমিন থেকে ভাগিয়ে দিয়েছি, তাই তোর মেজাজ বিগড়ে গেছে।'

হারান জবাব দেয় না। তার পাঁজরে আস্তে একটা গুঁতো মারে পালসাহাব। ডাকে, 'অ্যাই, মুখ তোল।'

'কী ক'ন?' মুখ না তুলেই বলে হারান।

'কাপাসীর সাথ তো তোর অনেক কালের জান-পয়চান, তাই না?'

আধফোটা স্বরে হারান কী যে বলে, বোঝা যায় না।

পালসাহাব আবার বলে, 'জান-পয়চান না থাকলে এত দরদ হয়? আপনা জমিনের কাম ফেলে কাপাসীর জমিন কোপাতে যাস। সবই সমঝেছি রে হারান, তোর দিলের অন্দরে মহব্বতের খুসবু আছে।'

পালসাহাবের গলাটা কেমন যেন রহস্যময় শোনায়।

'কী যে ক'ন পালসাহাব!' হারানের গলা শোনা যায় কি যায় না। অদ্ভুত এক লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলে।

পালসাহাব বলে, 'শরমাচ্ছিস (লজ্জা কচ্ছিস) কেন রে? জোয়ান মরদানা জোয়ানীর সঙ্গে মহব্বত করবে, এ তো দুনিয়ার কানুন।' বলতে বলতে হঠাৎ খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল পালসাহাব। একটু পর আচমকা হাসিটা থামিয়ে আবার শুরু করল 'এই বল না, কাপাসীর সাথ তোর কত কালের জান-পয়চান?'

'দুই বচ্ছরের জানাশুনা পালসাহাব। আমরা এক সাথ এক গাড়িতে কইলকাতায় আইছিলাম। দুই বচ্ছর এক সাথে শিয়ালদা ইস্টিশনে কাটাইছি।'

'দু' সাল ধরে মাগীটা হাসছে?'

'হ পালসাহাব, দুই বচ্ছর তারে এমুন হাসতে দেখি।'

'মাগী হাসে কেন?'

'হে তো জানি না পালসাহাব।'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'তা কেন জানবি! বুদ্ধু, নালায়েক, হারামী কাঁহাকা! আপনা পেয়ারের লেড়কী এমন বেতর্বিয়ত হাসি হাসে, আর তুই শালে কুচ্ছু জানিস না!'

একটু দম নেয় পালসাহাব। আবার বলে, 'কাপাসী পাগলী না কি রে হারান? ওর বাপ নিত্য তো বলে পাগলী।'

'পাগল না ভালমানুষ, কাপাসী যে কী, কিছুই জানি না। কিছুই বুঝতে পারি না।'

'হুঁ—' হুস করে বড় রকমের একটা শ্বাস ফেলে পালসাহাব।

হারান বলে, 'কাপাসীর কথা তার বাপের কাছে শুইনেন পালসাহাব।'

পালসাহাবের গলাটা এবার বড় শান্ত শোনায়, 'মনে হয়, কাপাসীর বুকে বহুত দরদ, বহুত কষ্ট। লেড়কী বহুত বদনসিব (মন্দ ভাগ্য)।' একটু থেমে উদাস স্বরে বলে, 'নিত্যর কাছে যাব। লেড়কীর জিন্দেগীর কথা শুনতে চাই।'

পাহাড়ের চড়াই-উতরাই বেয়ে মানুষগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলে।

আর কাপাসীর তীব্র, অবুঝ হাসিটা মাততেই থাকে।

তের

পুরো দিনটা নেশার ঘোরেই যেন কেটে যায়।

রাত থাকতে থাকতে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে পালসাহাব। তখন মা-তিন পাশের মাচানে ঘুমোতে থাকে।

চেনম্যান, পাটোয়ারিদের নিয়ে পালসাহাব যখন ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে পৌঁছয়, তখন সকালের প্রথম রোদ সবে রাতের কুয়াশা আর অন্ধকার ফালা ফালা করতে শুরু করেছ।

এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে সারাটা দিন মেতে থাকে পালসাহাব। সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে তাদের নিয়ে জমিতে যায়। মাটি কোপানো, জমি চৌরস করা, জঙ্গল সাফ করা, ক্যাশ ডোল দেওয়া, এমনি কাজের তদারকিতে দিনটা কাবার হয়ে যায়।

এক দন্ড এই মানুষগুলোর সঙ্গে না থাকলে উপায় আছে! হয়তো জমি কোপাবে না, মাটি বানাবে না, এমনকি খাবে না পর্যন্ত। হয়তো ট্রানজিট ক্যাম্পের টিলার মাথায় জড়াজড়ি করে ডেলা পাকিয়ে বসে ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকবে।

এই মানুষগুলোর নিজস্ব কোনো ইচ্ছা নেই। পালসাহাবেব ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা। তাই সবসময পালসাহাবকে এদের তাড়িয়ে ফিরতে হয়। ধমকে, চিল্লিয়ে, খিস্তিখেউড করে চালাতে হয়।

দুপুরেও ঝুপড়িতে ফিরতে পারে না পালসাহাব। এদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া সেবে নেয়।

জমির কাজ চুকিয়ে, মানুষগুলোর খাওয়ার পর্ব শেষ করে, উদ্ধবকে দিয়ে গান-বাজনা করিয়ে যখন ঝুপড়ির দিকে পালসাহাব ফিরে যায়, তখন সমস্ত দ্বীপ জুড়ে স্তরে স্তবে কুয়াশা নামতে থাকে। অরণ্য নিঝুম হয়ে যায়, রাত্রি গভীর হতে থাকে।

আজও অনেকটা রাত হয়ে গেল। এখন হাওয়াই বুটির ঝোপে ঝিঁঝিদের একটানা বিষণ্ণ বিলাপ চলছে। জঙ্গলের মাথায় নাম না-জানা বুনো পাখিগুলি ককিয়ে ককিয়ে মরছে।

আজকের কুয়াশা অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি গাঢ়। তা ছাড়া, দক্ষিণ দিক থেকে মৌসুমি বাতাস ছুটেছে।

ঝুপড়ির সামনের সেই খাদটার কাছে এসে পালসাহাব ডাকাডাকি শুরু করল, 'এ মা-তিন, মা-তিন—'

অন্য দিন দু' তিন ডাকেই জবাব মেলে। আজ অনেক চিল্লাচিল্লি করল পালসাহাব, মা-তিনের সাড়া না পেয়ে অশ্রাব্য খিস্তি করল। তারপর বিড় বিড় করে বকতে বকতে অন্ধকারেই খাদটা পেরিয়ে ঝুপড়িতে এসে ঢুকল।

তাজ্জবের ব্যাপার।

ঝুপড়ির ভেতর লণ্ঠন জ্বলছে। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা ঢুকিয়ে পাটাতনের ওপর বসে রয়েছে মা-তিন। তার চাপা কুতকুতে চোখদু'টো জ্বলছে। যেন আগুনের ফুলকি।

পালসাহাব ভেবেছিল, মা-তিন বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে তাকে বসে থাকতে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে খেঁকিয়ে উঠল, 'জেগে বসে রয়েছিস! এদিকে ডেকে ডেকে গলা আমার ফেঁসে গেল।'

মা-তিন নড়ল না। হাঁটুতে থুতনি রেখে যেমন বসে ছিল, তেমনি বসে রইল। একটা কথাও বলল না। শুধু তার চোখ দু'টো জ্বলতেই লাগল।

পালসাহাব গর্জে উঠল, 'হারামী আওরত, জবাব দিচ্ছিস না কেন? জেগে বসে রয়েছিস, তবু লালটিন (লণ্ঠন) নিয়ে আমাকে পথ দেখাতে গেলি না! তুই ভেবেছিস কী? খাদে পড়ে যদি আমার হাড্ডি ভাঙত?'

এবার কথা বলে মা-তিন। গলাটা তার অদ্ভুত শোনায়, 'হাড্ডি ভাঙলে ভালই হত, আমার দিল খোশ হত। তবু তুই ঝুপড়িতে থাকতি, আমার আঁখের সামনে থাকতি।' একটু দম নেয় সে। পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'এখন তো তামাম দিন রিফুজি লোকদের নিয়ে মেতে থাকিস। আমার কথা ভুলে যাস।'

পালসাহাব চেঁচাল, 'এটা আমার নোকরি। নোকরি না করলে কী খাবি রে শালী?'

অবুঝ গলায় মা-তিন বলে, 'নোকরি উকরি আমি বুঝি না। সেই সুবেতে বেরিয়ে যাস, ফিরিস মাঝ রাতে। আমি একা একা ঝুপড়িতে থাকতে পারব না।'

কিছুক্ষণ মা-তিনের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল পালসাহাব। তারপর খিঁচিয়ে উঠল, 'নোকরি উকরি ছেড়ে ঝুপড়ির অন্দর থাকব! দিনরাত তোর গায়ের গন্ধ শুঁকব আব মহব্বতের মিঠা মিঠা কথা বলব। কি রে হারামী, এই তো তোর মতলব?'

পাটাতন থেকে উঠে আসে মা-তিন। পালসাহাবের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ায়। গাঢ় গলায় বলে, 'হাঁ, এই আমার মতলব।'

'পন্দর সাল মহব্বতের মিঠা কথা শুনিয়েছি, কত পেয়াব করেছি, তবু তোর তিয়াস মেটে না?'

'না।'

পালসাহাব ভাবতে চেষ্টা করে, পনের বছর একসঙ্গে থেকে এত পেয়ার ভালবাসার কথা শুনে, এত আদর এত সোহাগ ভোগ করেও অরুচি ধরে না মা-তিনের, এতটুকু বিতৃষ্ণা আসে না? মেয়েমানুষটার খাঁই যে কত!

পনের বছর ধরে মা-তিনের দেহের মনের সব দাবিই পূরণ করে আসছে পালসাহাব। তবু তার আরো চাই।

এতকাল মা-তিনকে নিয়েই আকণ্ঠ মজে ছিল পালসাহাব। ছোট একটি ঝুপড়ি, ছোট একটি নোকরি, মা-তিন, ছোট ছোট সুখ, ছোট সোহাগ আর আনন্দে বিভোর হয়ে ছিল। পৃথিবীব অন্য কোনো দিকে মুখ তুলে তাকাবার ফুরসতই ছিল না। তার আধা বর্বর হৃদয় জুড়ে, চোখ জুড়ে যে ছিল সে মা-তিন। সারা দুনিয়াকে এক পাশে সরিয়ে মা-তিনকে নিয়ে এই দ্বীপে পনেরটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে পালসাহাব। মা-তিনকে নিয়েই বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত সে। কিন্তু সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল।

আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে গার্ডের কাজ করত পালসাহাব। সেটা ছেড়ে রিফিউজি সেটেলমেন্টে ঢুকেছে। এই সেটেলমেন্টের কাজ নেওয়ার পর থেকেই জীবনটা ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে তার। আশ্চর্য জীবন-রসিক হয়ে উঠেছে সে।

এতকাল পালসাহাবের যে মহব্বত একটি মাত্র নারীকে ঘিরে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, আজকাল সেটাই অসংখ্য মানুষের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। পালসাহাবের সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ আর প্রাণশক্তি মা-তিনকে ডলে পিষে আর সোহাগ জানিয়ে একদিন হয়তো ফুরিয়ে যেত। সেই প্রাণশক্তিটা এখন হাজার হাজার মানুষের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। অসংখ্য মানুষকে ভালবাসার মধ্যে অদ্ভুত এক নেশা আছে। সেই নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে পালসাহাব।

বহু মানুষের ভেতর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মা-তিনের কথাটা আজকাল তেমন মনে থাকে না তার। উপনিবেশ তৈরির কাজে সারাদিন এমন ডুবে থাকে যে ঝুপড়িতে ফেরার কথা প্রায়ই ভুলে যায়।

হাজার হাজার মানুষ পেয়েছে পালসাহাব। নিজেকে তাদের মধ্যে অকৃপণ ভাবে ঢেলে দিতে পেরেছে। কিন্তু মা-তিন পেয়েছে কী? কিছুই না। বরং তার নিজস্ব বলতে যা কিছু সবই হারাতে বসেছে। পনের বছর ধরে পালসাহাব নামে একটি মাত্র পুরুষকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে মা-তিন। পালসাহাব ছাড়া আর কোনো মানুষের এতটুকু ভালবাসা সে কোনোদিন পায় নি। এজন্য তার আপসোস নেই, দুঃখ নেই, বিন্দুমাত্র ক্ষোভও নয়। পালসাহাবের মহব্বত এত প্রবল,

এত প্রখর, এত অপর্যাপ্ত যে পুরো পনের বছর ভোগ করেও তা ফুরোতে পারে নি মা-তিন। কোনোদিন তা পুরনো হয় নি। সবসময় মনে হয়েছে তা তাজা টাটকা সতেজ।

পালসাহাব আজকাল তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সারাদিন কতটুকু সময়ই বা তাকে কাছে পায় মা-তিন? ভোর হতে না-হতেই ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে মাঝ রাতে।

এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলো তার কাছ থেকে পালসাহাবকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এ জন্য ভয়ানক রাগ হয় মা-তিনের, আক্রোশ হয়, ভয় হয়। বিচিত্র এক যন্ত্রণা তাকে দিনরাত আচ্ছন্ন করে রাখে।

মা-তিন আর পালসাহাব পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। একসময় মা-তিনই শুরু করল, 'তামাম দিন তুই রিফুজিদের সঙ্গে কাটাস।'

পালসাহাব বলল, 'তবে কি তোর সাথ থাকব?'

'হাঁ, জরুর—'

'কভী নেহী—' পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'পন্দর সাল তোর গায়ের গন্ধ শুঁকছি। আর পারব না। আমার দুসরা কাম আছে, বহুত ভারী কাম। এই জাজিরাতে (দ্বীপে) নয়া মানুষ এসেছে, নয়া জিন্দেগী বানাচ্ছে। সেই আদমীগুলোর সাথ সাথ থাকব, না তোর সাথ থাকব রে হারামী?'

'পন্দর সাল আগে সেই কথাই তো ছিল। সেই ভরসাতেই তো তোর কাছে এসেছি। ইয়াদ হয় না, কী কথা দিয়েছিলি?'

'হয়, হয়। লেকিন আর পারব না। এতগুলো সাল পেয়ার করেছি। এখনো তোর খাঁই মিটল না।' পালসাহাব বলতে থাকে, 'তুই কি আমার শাদি-করা আওরত যে তামাম জিন্দেগী পেয়ার করতে হবে?'

'কী বললি!' মা-তিন ফুঁসে উঠল। চাপা কুতকুতে চোখজোড়া ধক ধক করতে লাগল। ক্রুদ্ধ বুকটা ফোঁসানির তালে তালে ওঠানামা করছে। ধাঁ করে বাঁশের বেড়া থেকে একটা বর্মী দা টেনে বাগিয়ে ধরল সে। সামনে চিল্লাতে লাগল, 'নিকাল শালে, আভি নিকাল—'

মা-তিনের ভয়ানক মূর্তি দেখে এমন যে দুর্দান্ত পালসাহাব, তার বুকও কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর গুটি গুটি পিছু হটতে হটতে ঝুপড়ির বাইরে চলে গেল।

ভেতর থেকে ঝাঁপটা টেনে বন্ধ করে দিল মা-তিন।

রাত আরো বেড়েছে। অন্ধকার আর কুয়াশা পাল্লা দিয়ে গাঢ় হতে শুরু করেছে। এখন এই দ্বীপের কিছুই স্পষ্ট নয়। নিরেট অন্ধকার ফুঁড়ে দৃষ্টি চলে না। পাহাড় জঙ্গল আকাশ, এই দ্বীপের সব কিছুই যেন অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ঝুপড়ির ভেতর অস্থির পায়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে মা-তিন। বাঁশের পাটাতন মচমচ করছে।

মা-তিন দাপায় আর অদ্ভুত শব্দ করে কাঁদে। মাঝে মাঝে কান্না থামিয়ে ফোঁসে, 'হারামীর বাচ্চা, শালে দুশমন, পন্দর সাল পর এখন বলছে, আমি ওর শাদি-করা আওরত না! আরে কুত্তা, শাদি-করা আওরত কি আমার চেয়ে বেশি সুখ দিত? বেশি মহব্বত করত? বেইমান—' ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটানা বলেই যায় সে।

ঝুপড়ির বাইরে একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে পালসাহাব। এখন বুঝি বা তার দুঃখই হচ্ছে। মা-তিনকে এমন করে না বললেই হত। মেয়েমানুষটার দিল-ভরা গোসা। একটুকুতেই খেপে ওঠে।

কিন্তু কী করবে পালসাহাব? মেজাজটা আজ তার বশে ছিল না। সারা দিন এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে সে জমি কুপিয়েছে, মাটি চৌরস করেছে, বনতুলসী আর জলডেঙ্গুয়ার ঝোপ সাফ করেছে। সারা দিন পর হয়রান হয়ে, জীবনীশক্তির অনেকখানি অপচয় করে একটু শান্তি, একটু বিশ্রামের আশায় মা-তিনের কাছে এসেছিল পালসাহাব। রোজই সেটেলমেন্টে যে উদ্যম যে উৎসাহ সে খরচ করে, মা-তিনের কাছে এসে তা পূরণ করে নেয়।

আজ খাদটার কাছে এসে ডেকে ডেকে গলা ফাটাল পালসাহাব। তবু যখন মা-তিনের সাড়া মিলল না, তখনই মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফুটন্ত রক্ত সরাসরি তার মাথায় চড়ে বসেছিল।

জঙ্গল ফুঁড়ে মৌসুমি বাতাস ছুটছে। একসময় ঠান্ডা হাওয়ায় মাথা জুড়িয়ে এল। ধীরে ধীরে পালসাহাব উঠে দাঁড়াল।

এখন ঝুপড়িতে কোনো শব্দ নেই। মা-তিনের দাপাদাপি থেমে গিয়েছে।

ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপের ফাঁকে চোখ রাখল পালসাহাব। লণ্ঠনটা জ্বলছে। পাটাতনের ওপর আলুথালু পড়ে রয়েছে মা-তিন। রুক্ষ চুলগুলো লুটোচ্ছে। বুকের ওপর একটা উড়নি ছিল, সেটা খসে পড়েছে।

দেহটা তির তির করে কাঁপছে। এতক্ষণ শব্দ করে ফোঁপাচ্ছিল মা-তিন। এখন ফোঁপানিটা আর নেই। অনেকক্ষণ পর পর জোরে জোরে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সে। বড় অসহায় দেখাচ্ছে মেয়েমানুষটাকে।

দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। কণ্ঠার কাছে অসহ্য এক ব্যথা, অদ্ভুত এক কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। মা-তিনের জন্য জীবনে এই দ্বিতীয় বার কষ্ট বোধ হচ্ছে পালসাহাবের, কান্না পাচ্ছে।

মা-তিনের জন্য আরো একবার কষ্ট হয়েছিল পালসাহাবের। কিন্তু সে সব পনের বছর আগের কথা।

আস্তে আস্তে পালসাহাব ডাকল, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

মা-তিন জবাব দিল না।

গভীর গলায় পালসাহাব আবার ডাকল, 'মা-তিন, এ শালী, ঝাঁপটা খোল না। খুব যে গুস্‌সা!'

চুপচাপ পড়ে রইল মা-তিন।

পালসাহাব আর ডাকাডাকি করল না। বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে ফের বসে পড়ল।

চারপাশে গাঢ় কুয়াশা আর অন্ধকার খাড়া খাড়া দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো ভেদ করে পালসাহাবের দৃষ্টিটা অনেক, অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে যে কষ্টটা হচ্ছে, গলার কাছে যে কান্নাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, সেই কষ্ট আর কান্না পালসাহাবকে পনের বছর আগের অনেকগুলো বেহিসাবি বেপরোয়া দিনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

এতকাল পরও কিসমত খানকে অবিকল মনে করতে পারে পালসাহাব। ভারতবর্ষের মেনল্যান্ড থেকে একই জাহাজে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে তারা আন্দামানে কয়েদ খাটতে এসেছিল।

সাত বছর সাজা খাটার পর সরকারি টিকিট (সেলফ সাপোর্টার্স টিকেট) পেল কিসমত খান। তারপর এক মঙ্গলবার মেয়ে-কয়েদিদের কয়েদখানা রেভিবারিক জেলে গিয়ে ম্যারেজ প্যারেডে দাঁড়াল। ম্যারেজ প্যারেড অদ্ভুত এক প্রথা। আন্দামান দ্বীপে পুরুষ কয়েদিদের জন্য যেমন সেলুলার জেল, মেয়ে-কয়েদিদের জন্য তেমনি রেভিবারিক বা সাউথ পয়েন্ট জেল। পুরুষ কয়েদিরা সরকারি সেলফ সাপোটার্স টিকেট পাওয়ার পর বিয়ে করার অনুমতি পেত।

সে আমলে মঙ্গলবার মঙ্গলবার জেলার এবং জেল সুপারিনটেন্ডেন্টদের তদারকিতে সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় ম্যারেজ প্যারেড হত। ম্যারেজ প্যারেড হল এক ধরনের বিচিত্র স্বয়ম্বর সভা। পুরুষ আর মেয়ে-কয়েদিরা কাতার দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াত। তারপর যে যার ইচ্ছামতো সাথী পছন্দ করত। বর এবং কনে পরস্পর রাজি হওয়ার পর ডেপুটি কমিশনার বা চিফ কমিশনারের অফিসে ছাপানো কাগজে (ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ফরমে) টিপছাপ দিয়ে বিয়েটা রেজিস্ট্রি করিয়ে নেওয়া হত।

ম্যারেজ প্যারেডে এসে বর্মী যুবতী মা-তিনকে পছন্দ করে ফেলেছিল কিসমত খান। কিসমত খানের মাংসল গর্দান, খাড়া চোয়াল, মজবুত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মা-তিনের চাপা কুতকুতে চোখজোড়া মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মা-তিনকে বিয়ে করে শাদিপুরে চলে গেল কিসমত খান।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে একই সঙ্গে একই দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে পালসাহাব আর কিসমত খান

এসেছিল। এত বছর একসঙ্গে কয়েদ খেটে, হুইল ঘানি ঘুরিয়ে, রম্বাস ছেঁচে, সড়কের পাথর ভেঙে, ফুসফুসে একই সমুদ্রের নোনা বাতাস টেনে দু'জনের মধ্যে যা গড়ে উঠেছিল, তা হল পাকা দোস্তি।

শাদিপুরের কুঠিতে মা-তিনকেই শুধু তুলল না, পালসাহাবকেও জোর করে নিয়ে গেল কিসমত খান।

পাঠান কিসমতের রক্তে খানিকটা আদিমতা ছিল। তার রুচি অদ্ভুত। বিশেষ করে স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল বন্য, হিংস্র। রাতে চুটিয়ে মদ গিলে শাদিপুরের কুঠিতে ফিরত। আর ফিরেই মা-তিনকে নিয়ে পড়ত।

কুঠিতে মার্বেল কাঠের নিরেট একটা ডান্ডা ছিল। সেটা দিয়ে মা-তিনকে উন্মাদের মতো পিটত কিসমত। যতক্ষণ না তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত ছুটত, হাড় চুরচুর হয়ে যেত, যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ত, ততক্ষণ ছাড়ত না।

পাশের ঝুপড়িতে দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকত পালসাহাব। কোনো কোনো দিন অসহ্য হলে ছুটে আসত। কিসমতের গর্দান ধরে বাইরে বার করে চিল্লাত, 'শরাবি হারামী, আওরতটাকে পিটিয়ে পিটিয়েই এক রোজ খতম করে ফেলব।'

'হাঁ হাঁ জরুর, শালীকে একরোজ খতম করবই।' খ্যা খ্যা করে হেসে উঠত কিসমত খান। জড়ানো জড়ানো মাতাল গলায় বলত, 'ওটাকে কোতল করতে পারলে আমার দিল খুশ হবে।'

পালসাহাব ধমকে উঠত, 'চোপ শালে, বেদরদী দুশমন।'

পালসাহাবের খিস্তি গ্রাহ্যই করত না কিসমত খান। নিজের খেয়ালেই বলে যেত, 'আওরত লোগদের না পিটলে সজুত থাকে না। একরোজ দেখবি হাতের মুঠা থেকে ছুটে যাবে।'

যে সময় কিসমত খান নেশার ঘোরে থাকত না, তখন তাকে বোঝাত পালসাহাব, 'বেফায়দা মা-তিনের জান চুরচুর করিস কেন? আওরতটা তো বহুত আচ্ছা। বদমাশ না, বেয়াদপ না, বেতর্বিয়ত না। তোর জন্যে ওর দিলে বহুত পেয়ার।'

কিসমত জবাব দিত না। ডাইনে এবং বাঁয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে কী যে বোঝাত, সে-ই জানে।

পালসাহাব আবার বলত, 'শাদি করেছিস, আওরতটাকে থোড়া পেয়ার কর।'

পাঠান কিসমত অস্থির হয়ে উঠত, 'দ্যাখ ইয়ার, আমাদের পাঠান মুলুকে এক কানুন আছে। কানুনটা বহুত আচ্ছা।'

'কী কানুন?'

'জেনানা যতই পেয়ারী হোক, যতই খুবসুরত হোক, যতই বেকসুর বেগুনাহ্ হোক, মরদরা তামাম দিন কাজের পর রাতে কুঠিতে ফিরে একবার পিটবেই।'

'কেন?'

কিসমত বলত, 'এতে জেনানার দিল ঘরে থাকে। না হলে শালীরা চিড়িয়ার মাফিক দুসরা মরদের পিছে উড়তে চায়।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করত। গলাটা তার সাঙঘাতিক শোনাত তখন, 'দ্যাখ দোস্ত, মুলুকে থাকতে আমাদের কানুন তুড়ে আমার শাদি-করা আওরতকে পেয়ার করেছিলাম। দিলের পুরা মহব্বত তাকে ঢেলে দিয়েছিলাম। অন্য মরদানার মাফিক রাতে ফিরে আমি তাকে পিটতাম না, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতাম। লেকিন—'

'লেকিন কী?'

'লেকিন শালী আমার দিল তুড়ে দিয়ে গেল। আমার পেয়ারের দাম কেমন করে পেয়েছিলাম, জানিস?'

'কেমন করে?'

'এক রোজ কাজ থেকে ফিরে দেখলাম কোঠি ফাঁকা। শুনলাম, শালী গাঁওয়ের ছট্টু খানের সাথ ভেগেছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। সাত রোজ তাদের আসমান জমিন তোলপাড় করে ঢুঁড়ে বেড়ালাম। আমাদের

গাঁওয়ের পর তিনটে পাহাড়, ছোট একটা নদী। তার পরে এক শহর। শহরে গিয়ে দু'টোকে খুঁজে পেলাম। তারপর এক সাথ দু'টোকেই কোতল করে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে এই জাজিরাতে এসেছি।'

পালসাহাব চুপচাপ শুনে গিয়েছিল। একটা কথাও বলে নি।

কিসমত খান থামে নি, 'বুঝলি দোস্ত, দুনিয়ার কোনো আওরতকেই আমি বিশোয়াস করি না। এক মরদে কোনো শালীই খোশ না। শালীরা শাদি করে এক মরদকে, আর বিশটা মরদ ছুপকে ছুপকে পোষে।'

'ঝুট।' পালসাহাব গর্জে উঠেছিল।

'না, সচ।'

এরপর কিসমত খান যা বলেছিল, তার মধ্যে প্রচুর খিস্তি মিশে ছিল। সে সব বাদ দিলে যা দাঁড়ায় তা হল, দুনিয়ার তাবত স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনও সৎ নেই। সবাই নষ্ট, বদ, দুশ্চরিত্র।

জীবনে একবার ঘা খেয়েই একটা অটুট সত্যে পৌঁছে গিয়েছে কিসমত খান। সেটা থেকে কোনোভাবেই তাকে সরানো যাবে না। সে সার বুঝেছে, পৃথিবীর কোনো মেয়েমানুষকেই বিশ্বাস করতে নেই।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ট্রান্সপোর্টের কাজ সেরে, মদ খেয়ে প্রতি বাতে কুঠিতে ফিরত কিসমত খান। নিয়ম করে মার্বেল কাঠের ডাণ্ডটা দিয়ে মা-তিনকে পিটত, আব চিল্লাত, 'পিটিয়ে পিটিয়ে তোর জান লবেজান করে দেব। তোকে সাবাড় কবে আর একটা শাদি করব। যতগুলো আওবত পাব, সবগুলোকে খতম করব। শালী হারামীর পাল।'

একটা মেয়েমানুষ তাকে ঠকিয়েছে। তাই দুনিযার সব মেয়েমানুষের ওপর কিসমতের আক্রোশ।

অনেক বুঝিয়ে, ধমকে, কিছুতেই পাঠান কিসমতের স্বভাবটা শোধরাতে পারে নি পালসাহাব। কিসমত যখন মা-তিনকে ঠেঙাত, পাশের কুঠরিতে হয দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকত সে, নইলে বেরিয়ে যেত। মা-তিনের জন্য অদ্ভুত এক কষ্ট, বিচিত্র এক দুঃখবোধ বুকের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠত তার।

একদিন ব্যাপাবটা চরমে উঠল।

সেদিন মাত্রা ছাড়িয়ে মদ গিলে এসেছিল কিসমত খান। মারটাও এমন বেহিসাবি হয়েছিল, যার ফলে তিন দিন বেহুঁশ পড়ে ছিল মা-তিন।

আজও হুবহু মনে করতে পাবে পালসাহাব। সেদিন কিসমতের হাত থেকে ডাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়ে কিল-ঘুষি-লাথি মারতে মারতে তাকে ঘরেব বাইরে বার করে দিয়েছিল সে।

পালসাহাবের মার খেতে খেতে কিসমত গোঙাচ্ছিল, 'আমার জেনানাকে আমি মারি, কাটি, কোতল করি, তোর কিরে শালা? কুত্তিটাব জন্যে তোর যে বহুত দরদ, বহুত পেয়ার—'

'হাঁ রে কুত্তা—দরদ—'

কিসমত খান খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'অতই যখন পেয়ার তখন কুত্তিটাকে নিয়ে নিলেই পারিস। লে লেও শালীকো।'

ফস করে পালসাহাব বলে ফেলেছিল, 'জরুর লে লেঙ্গে। তোর মাফিক হারামীর কাছে মা-তিনকে আর রাখব না।'

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সমস্ত কিছুই সৃষ্টিছাড়া।

সৎ, সুস্থ, ভদ্র মানুষের পৃথিবীতে যে নিয়মে জীবন বয়ে চলে, এখানে তা গ্রাহ্য নয়। এখানকার নিয়ম কানুন, সব কিছুই আলাদা। যে রীতিতে ভদ্র মানুষ জীবনের কথা ভাবে, জীবনের মূল্য কষে, সেই রীতির সঙ্গে এই দ্বীপের বাসিন্দাদের রীতি আদৌ মেলে না। আদৌ খাপ খায় না।

সেদিন মদের ঘোরে মা-তিনকে পিটেছিল কিসমত খান, আবার মদের ঘোরেই মা-তিনকে পালসাহাবের হাতে তুলে দিয়েছিল। পালসাহাবও নিজের নিয়মে তার ন্যায় এবং নীতি গড়ে তুলেছিল।

যে মা-তিন এত মার খায়, সে কিসমতের বিয়ে-করা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিতে পালসাহাবের রুচি বা নীতিবোধে এতটুকু বাধে নি।

নেশার ঘোরেই মা-তিনকে তুলে দিয়েছিল কিসমত খান। নেশা ছুটবার পরও একই কথা বলেছে সে, 'শালীকে দিয়ে আমার পোষাবে না। তুই ওকে লিয়ে লে পালসাহাব। এবার দুসরা আওরত আনব।'

হাসপাতালে তিন দিন ছিল মা-তিন। হুঁশ ফিববার পর চোখ মেলেই যাকে সে দেখেছে সে পালসাহাব।

অস্থির, অবুঝ গলায় মা-তিন বলেছিল, 'তুমি পালসাহাব, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি ওই দুশমন ডাকুটার কাছে আর যাব না। জরুর ও একদিন আমাকে খতম করে ফেলবে। জরুর—'

গাঢ়, কাঁপা গলায় পালসাহাব বললেন, 'ওর কাছে তোকে যেতে হবে না। তোকে আমি বাঁচাব। কুত্তাটার হাত থেকে জরুর বাঁচাব। আমার জিন্দেগীর কসম।'

পালসাহাবের স্বরে আশ্বাস ছিল, দৃঢ়তা ছিল। তার ওপর নির্ভর করা চলে। নিজের জীবনের নামে কসম খেয়ে সে মা-তিনকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছে।

মা-তিনের দ্বিধা ছিল না, সন্দেহ ছিল না। কোনো দিকে নজর দেওয়া কি কোনো কিছু ভাবাব মতো মনের অবস্থাও ছিল না। কিসমতের হাত থেকে বাঁচাব জন্য এক অন্ধ, উন্মাদ ইচ্ছা তাকে পেযে বসেছিল।

পালসাহাব যে হাতটা বাড়িযে দিয়েছিল, চোখ বুজে সেটা চেপে ধবেছিল মা-তিন। সে বাঁচতে চেয়েছে।

'মেরিন ডিপার্টমেন্টে' তখন বার্জ চালাবার কাজ করত পালসাহাব। 'মেরিনে'র কাজ ছেড়ে 'ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে' চাকরি নিল সে। তারপর একদিন মা-তিনকে নিযে মিডল আন্দামানের লং আইল্যান্ডে চলে গেল। সেখানে যাওয়ার আগে মা-তিন কতকগুলো শর্ত কবিয়ে নিয়েছিল। পুরো হৃদয়টা তাকে দিতে হবে। কিসমত খানের মতো সে ঠেঙাতে পারবে না। অন্য স্ত্রীলোকেব দিকে নজর দেওযা চলবে না। মা-তিনকে নিয়েই তাকে সুখী থাকতে হবে। মা-তিনের দিল-মর্জি, জান-জিন্দেগী, সবসময় খুশি রাখতে হবে। কিসমতের কাছে যা পায় নি, সেই অগাধ ভালবাসা এবং অঢেল সোহাগ পালসাহাবের কাছ থেকে আদায় করে নেবে মা-তিন।

এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল পাল সাহাব।

লং আইল্যান্ডে আসার পর পনেরটা বছর পার হয়ে গিয়েছে।

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা গুঁজে ঝিম মেরে বসে ছিল পালসাহাব।

রাত আরো গাঢ় হয়েছে। বাতাসে হিম ভাবটা শতগুণ বেড়েছে। সামনে কুয়াশা আব অন্ধকার দিয়ে গাঁথা দেওয়ালাটা আরো নিরেট হয়েছে। আলোব ছুঁচের মতো সেটা বিঁধে বিঁধে জোনাকি জ্বলছে।

পালসাহাব অন্ধকার দেখছিল না, কুয়াশা দেখছিল না, এমনকি জোনাকিও না। তার চোখ দু'টো অনেক, অনেক দূরে কোথায় যেন হারিযে গিয়েছে।

ঝুপড়ির ভেতর মা-তিন বুঝি পাশ ফিরল। ক্যাঁচা বাঁশের পাটাতন মচ মচ করে উঠল।

হাঁটুর ফাঁক থেকে থুতনিটা তুলে খাড়া হয়ে বসল পালসাহাব।

এবার মা-তিনের অনুচ্চ, বিষণ্ণ এবং কেমন এক ধরনের ভোঁতা কান্না-মেশানো দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কান পেতে মা-তিনের ফোঁপানি শুনল পালসাহাব।

তারপর হঠাৎ একসময় ঝুপড়ির ভেতরে সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

কখন যে পালসাহাবের ঘাড়টা হাঁটুর ওপর কাত হয়ে পড়েছিল, কখন যে ঘুমের আঠায় চোখ জুড়ে এসেছিল, হুঁশ ছিল না।

মা-তিনের ঠেলাঠেলিতে ধড়মড় করে উঠল পালসাহাব। চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'কৌন, কৌন রে?'

মা-তিন খেঁকিয়ে উঠল, 'কৌন আবার? এত রাতে তোর কোন রিস্তেদার আসবে? আমি—আমি—'

পালসাহাব কিছু বলল না। মাথা খাড়া রাখতে পারছে না সে। ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

এবার মা-তিন পালসাহাবের চুলের মুঠি পাকিয়ে ধরল। তারপর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এ শয়তান, অন্দর চল। ঠান্ডায় বুখার (অসুখ) ধরলে আমাকেই তো ভুগতে হবে। না তোর শাদি-করা সাত জন্মের আওরত এসে ভুগবে? চল—' মা-তিন পালসাহাবের চুল ঝাঁকাতে লাগল।

মা-তিনের কাঁধে ভর দিয়ে ঝুপড়িতে ঢুকল পালসাহাব। ঢুকেই সরাসরি বিছানায় গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নাক থেকে ভোঁস ভোঁস আওয়াজ বেরুতে শুরু করল।

এক মুহূর্ত পাল সাহাবের রকম সকম দেখল মা-তিন। তার চাপা, কুতকুতে চোখজোড়া ঝিক ঝিক করে জ্বলতে লাগল। চাপা, তীব্র গলায় সে ডাকল, 'পালসাহাব, এ পালসাহাব—'

পালসাহাব সাড়া দিল না। সমানে তার নাক ডাকতে লাগল।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মা-তিন। তারপর হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঁচড়ে, কামড়ে, খিমচে, লাথি মেরে পালসাহাবকে ফালা ফালা করে ফেলল।

পলকে ঘুম ছুটে গেল। লাফ মেরে উঠে বসল পালসাহাব। তাকে ফালা ফালা করে হাঁপাতে শুরু করেছে মা-তিন। বুকটা শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে জোরে জোরে ওঠানামা করছে। কপালে, থুতনিতে দানা দানা ঘাম দেখা দিয়েছে।

পালসাহাব তাজ্জব বনে গিয়েছে। বিমূঢ়, কিছুটা বা ভীত। বিহ্বল গলায় সে বলল, 'এমন করছিস কেন?'

টেনে টেনে মা-তিন বলতে লাগল, 'তোকে কি ঘুমোবার জন্যে ঝুপড়িতে ঢুকিয়েছি? হারামজাদ কাঁহাকা—'

'তবে কী জন্যে?'

এবার এক কাণ্ডই করল মা-তিন। পালসাহাবের পাশে ঘন হয়ে বসল। বড় নরম গলায় বলল, 'কাছে আয়।'

'কী?'

'তুই আগের মতো আমাকে আর পেয়ার করিস না।'

'ঝুট।'

'সচ।'

'কভী নেহী।'

অনেক সময় গলায় স্বরে আর মুখেচোখে মনের ছায়া পড়ে। পালসাহাবের স্বরটা বুঝতে চেষ্টা করল মা-তিন। আড়চোখে তার মুখ দেখতে লাগল।

পালসাহাবের মুখে কোন ছায়া পড়েছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মা-তিন। সে বলল, 'সচই যদি পেয়ার করিস, তবে তামাম দিন আমাকে ঝুপড়িতে ফেলে রেখে যাস কেন?'

'কোথায় রেখে যাব?'

'কোথাও রাখতে হবে না। আমাকে তোব সাথ নিয়ে যাবি।'

'তুই যাবি?' কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না পালসাহাব। অবাক হয়ে মা-তিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা-তিন বলল, 'আমিও তোর সাথ যাব। তোর সাথ কাম করব।'

'সচ। পালসাহাবের চোখ দু'টো খুশিতে চক চক করতে লাগল।

শান্ত গলায় মা-তিন বলল, 'সচ, জরুর সচ।'

উন্মাদের মতো মা-তিনকে দু'হাতে জাপটে ধরল পালসাহাব। চোখা চোখা দাড়িভরা মুখটা তার নরম গালে ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল, 'কালই তোকে কলোনিতে নিয়ে যাব।'

'ছাড়, ছাড়—'

মা-তিন চিল্লাতে থাকে। পালসাহাব ছাড়ে না। বরং তার দেহটা একপিণ্ড তলতলে নরম কাদার মতো বুকের কাছে তুলে নিয়ে যেন ছানতে থাকে।

একসময় মা-তিনের চিল্লানি থামে। অদ্ভুত সুখে চোখ দু'টো তার বুজে আসে। চোখ বুজেই পালসাহাবের প্রবল, প্রখর, সাঙ্ঘাতিক সোহাগ ভোগ করতে থাকে সে।

এখন একবার যদি মা-তিনের মুখের দিকে তাকাত পালসাহাব, দেখতে পেত, মেয়েমানুষটার ঠোঁটে সূক্ষ্ম, ধূর্ত, দুর্বোধ্য হাসি ফুটে আছে।

চোদ্দ

তিলির স্বামী হরিপদ বারুই কিছুই আনতে পারে নি। না বলতে কিছুই না। না জমিজমা, না বিত্ত ব্যাসাদ, না সোনাদানা, কিছুই না। এমনকি নীরোগ একটি দেহ, উজ্জ্বল পরমায়ু কি সুস্থ একটি মন—তাও না। সব খুইয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে সে। সুখ আনন্দ এবং খুশির স্বাদ কবেই ভুলে গিয়েছে সে।

আজকাল ট্রানজিট ক্যাম্পের মাচানে শুয়ে শুয়ে দিনরাত হাঁপায় হরিপদ। হাঁপানির টানটা যখন বাড়ে, কাশতে কাশতে দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে দুমড়ে যায়। শুকনো জিরজিরে বুকের হাড়গুলো মট মট করতে থাকে। বুঝিবা ভেঙেই যাবে। চোখের ডেলাদু'টো ঠেলে বেরিয়ে পড়ে। হাজার চেষ্টা করেও কাশিটাকে সহজে সামলাতে পারে না সে।

কাশির দমকটা যখন কমে আসে, ক্লান্তিতে অবসাদে নির্জীব হয়ে পড়ে হরিপদ। চোখ দু'টো আপনা থেকেই বুজে আসে। গলার ভেতর থেকে অনুচ্চ ঘড়ঘড়ে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুতে থাকে। তখন মাছের মতো হাঁ করে শ্বাস নেয় হরিপদ। শ্বাস নেওয়ার তালে তালে অশক্ত, দুর্বল দেহটা তোলপাড় হতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের ওপারে সেই পদ্মা-মেঘনার দেশ থেকে কিছুই আনতে পারে নি, কিন্তু রুগ্ন, বিষাক্ত, ভয়ানক একটা মন নিয়ে এসেছে হরিপদ। আর সেই মনের ভেতর পুরে এনেছে একটা কদর্য বাতিক, যার নাম সন্দেহ। পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করে না হরিপদ। বিশ্বাস করার মতো মনের জোর এবং সাহস তার নেই।

হরিপদর সব চেয়ে বেশি সন্দেহ তিলির ওপর।

হাঁপানি আর নানা ধরনের আধিব্যাধি দেহের মতোই তাব মনটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। সহজ, স্বাভাবিক, সুস্থ—এমন কোনো কিছুই সে ভাবতে পারে না। দিবারাত্রি শুয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে। কী যে সে বকে যায়, কে তার হদিস দেবে। মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে কাঁদে। তার গলা থেকে অসুস্থ, অস্বাভাবিক, ভাঙা ভাঙা এক ধরনের শব্দ বেরোয়।

এই দ্বীপে হরিপদকে কেউ কোনোদিন হাসতে দেখে নি।

সেই বিকেল থেকে পাখিটা ডাকছে।

কখনও তীব্র অবুঝ, কখনও মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ। একেক সময় ভাঙা কর্কশ গলাতেও ডেকে উঠছে।

কী পাখি ওটা? একবার হরিপদর মনে হল, এই দ্বীপেরই কোনো সাগরপাখি, যার নাম সে জানে না। একবার মনে হল ভীমরাজ পাখি। অনেকক্ষণ ডাকটা শুনেও হরিপদ ঠিক করতে পারল না, পাখিটা কোন জাতের? কী নাম তার?

মাচানের ওপর উঠে বসল হরিপদ। ট্রানজিট ক্যাম্পের জানালায় চোখ রেখে আতিপাতি করে খুঁজল। কিন্তু না, পাখিটা দেখা গেল না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে সেটা ডেকে সারা হচ্ছে, কে জানে।

পাখি খুঁজতে গিয়েই হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল হল হরিপদর। জঙ্গলের মাথার রোদ নিবু নিবু হয়ে গিয়েছে। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো আবছা হয়ে যাচ্ছে। সাগরপাখিরা সমুদ্রের দিক থেকে দ্বীপে ফিরতে শুরু করেছে।

একসময় কেউ যেন রোদটুকু গুটিয়ে নিল। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে বিষণ্ণ, ছায়া ছায়া একটা পর্দা নেমে আসতে লাগল।

প্রথমে বিরক্ত, তারপর খেপে উঠল হরিপদ। সেই সকালে বেরিয়েছে তিলি, এখনো ফিরছে না। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটু পরেই পুরোপুরি সন্ধে নেমে যাবে।

এখনো তিলি কেন ফিরল না? এই চিন্তায় অস্থির হয়ে রইল হরিপদ। তিলির ভাবনাটা ক্রমাগত তার মাথায় চোখা পেরেকের মতো ঢুকে যেতে লাগল যেন।

আবছা অন্ধকার গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে হরিপদ বকতে লাগল, 'ঘরে সোয়ামী হাপির টানে মরে। মাগীর হেইদিকে মন নাই। তর মন যে কুনখানে, আমি জানি। এই ঘরে শুইয়া শুইয়া আমি হগল ট্যার পাই।' বকতে বকতে একসময় হাঁপানির টান ওঠে। হরিপদ হাঁপায় আর কাশে। কাশতে কাশতে জিভটা আধ হাতখানেক বেরিয়ে পড়ে। কাশির দমকটা একটু কমলে আবার শুরু করে, 'নষ্ট দুষ্ট মাগী। মনে কী মতলব নিয়া এই দ্বীপে আইছস, আমি বুঝিন কিছুই বুঝি না! সোয়ামী তর ব্যারামে ভোগে, আর তুই দিন দিন ফোলস (ফুলিস)। কোন সুখ তর মনে? সারা দিনে একবারও আমার কাছে আসস না। আমি বাচলাম না মরলাম, তর তাতে কি আহে যায়! সব্বনাশী—'

নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিড় বিড় করে হরিপদ, 'সব্বনাশী, আমারে ঘরের মইধ্যে রাইখ্যা নাগর লইয়া ফুর্ত্তি করে। আমি কিছুই বুঝি না, না? আমি আন্ধা হইয়া গেছি? কিছুই আমাব কানে আহে না? আমি হগল শুনি, হগল দেখি, হগল বুঝি। খালি মুখখান খুলি না। দিন আহুক। অ্যামুন দিন অ্যামুন যাইব না। চিরটা কাল অ্যামুন ব্যারামে ভুগুম না লো মাগী। এট্টু ভাল হইতে দে, তরে আমি সজুত (সিধে) করুম।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'হে ভগমান, মাগীর এত নষ্টামি তুমি সইও না। হে ভগমান—'

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল হরিপদ, সেই সময় তিলি ঝুপড়িতে ঢুকল। তাকে দেখে মুখটা ঘুরিয়ে নিল হরিপদ। তিলি গায়ে মাখল না। আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়াল। হরিপদর একটা হাত ধরে বলল, 'ক্যামুন আছ? হাপির টানটা আইজ কম?'

এক ঝটকায় তিলির হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল হরিপদ। গোঁজ হয়ে বসে রইল সে।

তিলি আবার হাত ধরল। বলল, 'কী হইল? কথা কও না ক্যান?'

হরিপদ ভেংচে উঠল, 'অত সোহাগে কাম নাই।'

'কী যে কও।' অবাক হয়ে হরিপদর মুখের দিকে তাকাল তিলি।

'কী আবার কই! যা যা মাগী, চোখের সুমুখ থিকা যা। তরে দেখলে পাপ। তর নাম মুখে আনলে পাপ।'

'সোয়ামী হইয়া এমুন অকথা কুকথা কও!' তিলির গলায় বড় দুঃখের স্বব ফোটে।

'হ কই, এক শ' বার কই। যতবার পারি ততবার কই।' হরিপদ হাঁপাতে লাগল, 'অহন তুই যা।'

'কই যামু?'

'সারাটা দিন যে নাগরের লগে কাটাইয়া আইলি তার কাছে যা মাগী। যা যা—'

তিলি এবার রুখে উঠল, 'মুখে যা আহে, তাই যে কও।'

'হ কই। আমার মাথা কাটবি নিকি?'

'সারাটা দিন আমি অন্য পুরুষ লইয়া কাটাই?'

'কী করস না করস, তর ধম্ম তর মন জানে। আমি ব্যারামে ভুগি, ঘর ছাইড়া বাইরে যাইতে পারি না। তর কত সুবিধা, কত সুযুগ।' হরিপদ তিলির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'পাচজনের মুখে পাচ কথা শুনি। মুখ বুইজা শুনতে হয়। ঈশ্বর আমারে মাইরা (মেরে) রাখছে। হগলই কপালের দোষ।' হরিপদ জোরে জোরে কপাল চাপড়ায়।

সেই সকালে পালসাহাবের সঙ্গে জমি কোপাতে বেরিয়েছিল তিলি। দুপুরে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে নাকে মুখে দু'চার দলা ভাত গুঁজে আবার জমিতে ফিরে গিয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। তার আগেই আগাছা বেছে, মাটি কুপিয়ে চৌরস করে রাখতে হবে। তাই সমস্ত দিন জমি তৈরির কাজ চলছে।

সারাটা দিন খেত কোপাবার পর শরীর আর বশে থাকে না। হাত দু'টো যেন যন্ত্রণায় খসে পড়ে। কোমর খাড়া রেখে দাঁড়াতে পারে না তিলি। শরীরের নিচের দিকটা বুঝি ছিঁড়েই পড়বে।

উদয়াস্ত খেটে খুটে একটু জিরোবার আশায় ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে আসে তিলি। এখন দেহটাকে বিছানায় সঁপে দিতে পারলে সে বাঁচে। একটু যে ঘুমোবে, তার কি উপায় আছে!

হরিপদ বলল, 'অহনো খাড়ইয়া আছস! যা যা কুচরিত্তির, মরদচাটা মাগী—'

ভাঙা ভাঙা, কাতর গলায় তিলি বলল, 'বড় সুখে রাখছ!' অতি দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে তার। সারা দিন পর ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে হরিপদর গঞ্জনা আর সয় না।

হরিপদর জন্য কী না করেছে তিলি! ধর্ম বল, কর্ম বল, পুণ্য বল, স্বামীই হল সব। স্বামীর মধ্যেই সকল ধর্ম, সকল পুণ্যের সার। সে সারাৎসার। স্বামী ভজলে ভগবান তুষ্ট। স্বামী বিহনে জগৎ অন্ধকার। সকল ঈশ্বরের সেরা ঈশ্বর হল স্বামী। তার জন্য সতী নারী না পারে কী? না করে কী? জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এই সব কথা শুনে আসছে তিলি। শুনতে শুনতে তার মনে একটা সংস্কার গড়ে উঠেছে। এই কারণে হরিপদর সব গঞ্জনা সয়েছে সে। অকাতরে সব দুঃখ মাথায় পেতে নিয়েছে।

হরিপদ কি আজই ভুগছে? হাঁপির টান নিয়েই তিলিকে সে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর একটা দিনও কি তিলির সুখে কেটেছে? সুখ দূরের কথা, একটু স্বস্তিও কি মিলেছে কোনোদিন? হাজার চেষ্টা করেও সে কথা মনে করতে পারে না তিলি।

দেশে থাকতে তামাকের ব্যবসা করত হরিপদ। হাটে হাটে ঘুরে চট বিছিয়ে দোকান পাতত। মাখা তামাক, শুখা তামাক, গুঁড়ো তামাক, পাতা তামাক। নানা জাতের তামাক বেচত।

তামাকই শুধু বেচত হরিপদ। কিন্তু কাঁচা তামাক শুকিয়ে দিত কে? তামাক দা-কাটা করত কে? তামাকে চিটে গুড় মাখাত কে? সব, সব কিছুই তিলি করত। হরিপদ যে করবে, সে সময় কোথায় তার? শরীরে তেমন সামর্থ্যই বা কোথায়? ঘরে যতক্ষণ থাকত, বসে বসে হাঁপাত আর কাশত। রোগা, জিরজিরে, অস্থিসার বুকটার তোলপাড় দেখে বড় মায়া হত তিলির।

হরিপদর মন পাওয়ার জন্য কী না করেছে তিলি? তামাকের কাজ করেছে, তাব রোগের সেবা করেছে, আবার সংসারের সব ঝামেলা মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু হরিপদর মন যে কোথায়, বিয়ের দশ বছর পরও তার খোঁজ পায় নি তিলি। যত দিন গিয়েছে, বোগ যত বেড়েছে, হরিপদর সন্দেহ আর গঞ্জনাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

রোগে দিন দিন কহিল হয়ে পড়েছে হরিপদ। শরীরটা আরো রোগা, আরো জীর্ণ, আরো কাবু হয়েছে। কিন্তু দিবারাত্রি এত খেটেও, হরিপদর এত কুকথা সয়েও দিনে দিনে অঢেল স্বাস্থ্যে, অফুরন্ত যৌবনে ভরে উঠেছে তিলি। তার সুছাঁদ মুখ, পুষ্ট বুক, কানায় কানায় ভরা দেহ দেখতে দেখতে খেপে উঠেছে হরিপদ।

তিলির শরীরটা হরিপদর আয়ত্তের বাইরে। হাঁপির টান ভেতরটা এত ঝাঁঝরা করে ফেলেছে যে তিলির অফুরন্ত শরীরের দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার উপায়ই বা কী।

তিলির দিকে যখনই তাকায়, যখনই তার কথা ভাবে, হরিপদর মাথাটা গরম হয়ে ওঠে।

ট্রানজিট ক্যাম্পের এই ঝুপড়িটার বাইরে রাত গাঢ় হয়েছে। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে।

তিলির মতো জমি থেকে সেটেলমেন্টের অন্য সকলেও ফিরে এসেছে। বাইরে তাদের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। সব গলা ছাপিয়ে পালসাহাবের গলাটাই বেশি শোনা যায়।

হরিপদ বিড় বিড় করতে থাকে, 'আমি না বুঝি কী? না দেখি কী? না শুনি কী?'

'হ হ, তুমি হগলই বোঝ। এইবার এট্টু থাম। আর পাগলামি করে না।'

একদৃষ্টে তিলির দিকে তাকায় হরিপদ। সে ভেবেই পায় না, এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, দেশভাগের

পর ভাসতে ভাসতে এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরে মরা, কোনো দিন এক মুঠো জোটে, কোনোদিন জোটেও না, তবু তো তিলি টসকায় না! এত স্বাস্থ্য, এত অঢেল যৌবন সে পায় কোথায়?

হরিপদ ভাবতে থাকে, মনে ফুর্তি না থাকলে দেহ কি ভরে ওঠে? সে নিজে তো অশক্ত, পঙ্গু, ব্যারামী মানুষ। তার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়। নিশ্চয় অন্য কেউ আছে। অন্য কেউ তিলির মনে রসের যোগান, ফুর্তির যোগান দেয়। না হলে এই দ্বীপে এসে ভাল করে না খেতে পেয়েও এমন ভরন্ত, সুঠাম, সুছাঁদ দেহ কেমন করে পায় তিলি! এই চিন্তাটা হরিপদকে অস্থির করে তোলে।

ভাবতে ভাবতে হরিপদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'থামুম, ক্যান থামুম? আমার বুকে বইসা আমারই দাত ভাঙবি। আর আমি মুখ বুইজা সহ্য করুম। আমি জানি, সারাটা দিন তুই ক্যান বাইরে থাকস? তর হাজার নাগর। উই পালসাহাব, উই হারান, উই গুপী, হগলের লগে তর ঢলাঢলি, মাখামাখি। তর—'

জীবনভর অনেক সয়েছে তিলি। তবু চিরটা দিন হরিপদর মন যুগিয়ে চলেছে। আজ হঠাৎ যেন কী হয়ে গেল তার। মাথায় ভেতর হাজারটা চোখা চোখা শলা যেন ক্রমাগত বিঁধতে লাগল। মুহূর্তে সারা জীবনের একটা মোটামুটি হিসাব কষে নিল সে।

আজ পর্যন্ত হরিপদর কাছ থেকে কী সে পেয়েছে? না একটু সুখ, না সোহাগ, না একটু শান্তি। সারাটা জীবন মানুষটা তাকে জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, উঠতে বসতে দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর সন্দেহ করেছে। অথচ তার জন্য কী না করেছে! দেহকে দেহ মানে নি। গতরকে গতর ভাবে নি। তবু অকৃতজ্ঞ, নির্দয় মানুষটার কাছে কোনোদিন সুখ পেল না তিলি। এ দুঃখ তার মরলেও ঘুচবে না।

তিলি রুখে দাঁড়াল। বলল, 'কী পাইছি তোমাব কাছে? কুনোদিন দুইটা মিঠা কথাও কও নাই। তমস্ত জনম খালি দিয়াই গেলাম, পাইলাম না কিছু। তুমি আবার কও নাগর নিয়া আমি ঢলাঢলি করি, পরপুরুষের লগে আমার মাখামাখি ! বেশ কথা, ভাল কথা। তুমি সোয়ামী, তোমার মনে যদিন এই সন্দ জাগে, আমি কী করতে পারি? কিছুই না।'

হরিপদ টেনে টেনে বলে, 'সন্দ জাগে! মানুষের মনে মিছাই বুঝি নি সন্দ জাগে? তুই নষ্ট, কুচরিত্তির। তুই কত বড় সতীর ঝি সতী, হগল জানি।'

তিলি হঠাৎ রুখে উঠল, 'আমার অঙ্গ, আমার গতর উড়াইয়া দিমু, পুড়াইয়া দিমু। যা পরাণে চায় তাই করুম। না পাইলাম এট্টু সুখ, না পাইলাম একটা পোলা। কী নিয়া বাচুম, কী নিয়া দুঃখু ভুলুম, কিসের আশায় বুক বান্ধুম? সোয়ামী পাইলাম, কিন্তুক তার শরীল পাইলাম না, মন পাইলাম না। ভরা শরীলে, ভরা যৈবনে বুকের ভিতরে যখন খা খা করে, এমন একটা বান্ধব পাইলাম না যারে মনের কথা শুনাইয়া জুড়ামু।' একটু থামল তিলি। উত্তেজনায়, দুঃখে, যন্ত্রণায় বুকটা কাঁপিয়ে দীর্ঘ গরম নিশ্বাস পড়ছে। অন্ধকারে চোখ দু'টো ধক ধক করছে।

তিলি আবার শুরু করল, 'এই অঙ্গ, এই জনম বাইখ্যা কী করুম? কারো ভোগে লাগলাম না, কামে লাগলাম না। তভু তমস্ত জীবন মাইনষে সন্দই করল। সন্দ আর সন্দ থাকে ক্যান? এইবার সন্দ সত্য হউক। এই অঙ্গ নিয়া যখন জ্বালা, তখন এরে রাখুম না। লুটাইয়া দিমু, উড়াইয়া দিমু, বিলাইয়া দিমু।'

'তাই দে মাগী, তাই দে। তর পরাণে যা চায় তাই কর।' চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় টেনে টেনে চেঁচায় হরিপদ। চেঁচায় আর হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে কেঁদে ফেলে।

পনের

বুঝিবা একটা চিতল হরিণ, কিংবা একটা ময়ূর।

হারানের মনে হঠাৎ কেন যে হরিণ আর ময়ূরের ভাবনা এল, তা সে-ই জানে। অবশ্য হারান দেশে থাকতে ময়ূর দেখেছে। এই দ্বীপে এসে হরিণ দেখেছে।

টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাকে দেখে হারান ময়ূর আর হরিণের কথা ভাবছে, আসলে সে কিন্তু ময়ূরও না, হরিণও না। সে কাপাসী।

বাঁ দিকে একটা পাহাড়। নাম যার স্যাডল পিক। স্যাডল পিক থেকে মিঠে জলের একটা নদী পাক খেয়ে খেয়ে নিচে নেমে এসেছে। লোকে বলে কিলপঙ নদী। কিলপঙের সরু নীল ধারা ওপর থেকে

খরবেগে নামছে। পাথর নুড়ি আর গাছের শিকড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে নীল জল অবিরাম বেজে চলে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে সোনার তীরের মতো বিকেলের রোদ এসে কিলপঙ নদীটাকে বিঁধছে যেন।

হারান বিকেলের রোদ দেখছিল না, জলের বাজনা শুনছিল না। সে দেখছিল কাপাসীকে।

হয়তো কাপাসী জল নিতে এসেছে। কিন্তু জল তো সে তুলছে না। নদীর পারে চুপচাপ বসে বসে কী যে করছে, এত দূরের টিলার মাথা থেকে ঠিক বুঝতে পারে না হারান।

আজ জমি চৌরস করতে যায় নি হারান। সকালে কাঁপিয়ে জ্বর এসেছিল তার।

খিদিরপুর ডকে আন্দামানের জাহাজে উঠবার আগে সরকারি লোকেরা খান দুই পাটের কম্বল দিয়েছিল। সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে সারাদিন ট্রানজিট ক্যাম্পের মাচানে পড়ে ছিল হারান। জ্বরের দাপটে মাথা খাড়া করতে পারে নি। দুপুরের দিকে ঘাম ছুটিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে। তারপরও অনেকক্ষণ মাচান ছেড়ে উঠতে পারে নি। শরীরটা খুব কাহিল লাগছিল।

দেশে থাকতে এমন জ্বরে মাঝে মাঝেই পড়ত হারান। মাধব কবিরাজ বলত পিত্তজ্বর।

দেশ থেকে কিছুই আনতে পারেনি হারান। কিন্তু পুরনো রোগটা হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে ঠিক ধাওয়া করে এসেছে।

কথায় কথায় বুড়ি বাসিনী বলে, 'সু তো আহে না, পিছে পিছে দিন রাইত কু'টাই ঘোরে।'

ভালটা না আসুক, মন্দটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বীপ পর্যন্ত এসে পড়েছে। হাজার বার একই রোগে ভুগে ভুগে তার নিদানটা জেনে ফেলেছে হারান। শুধু নিদানই না, ওষুধ-বিষুধ, টোটকা-টাটকাও তার জানা। বাসক পাতা ছেঁচে রস খেলে বেশ কিছুদিন পিত্তজ্বরটা মাথা চাড়া দিতে পারে না।

বিকেলের দিকে দুর্বলতা একটু কমলে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হারান। জঙ্গলে গাছ খুঁজতে খুঁজতে এই টিলার মাথায় এসে উঠেছে।

বাসক পাতার উগ্র গন্ধ ঠিকই নাকে আসছে। কিন্তু ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে সেটা খুঁজে বার করা সহজ কথা নয়। তা ছাড়া, বাসক গাছের কথা এখন আর ভাবছে না সে।

ঘুরে ঘুরে সেই চিন্তাটাই তার মাথায় আসছে। একটা চিতল হরিণ, না একটা ময়ূর? কেন যে হরিণ আর ময়ূরের কথা ভাবছে, হারান নিজে ঠিক করে উঠতে পারে না।

অনেকক্ষণ টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল হারান। কিন্তু নদীর পারে ঠায় বসেই আছে কাপাসী, তাব উঠবার নামগন্ধ নেই। অগত্যা আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল হারান।

এর নাম নদী!

তা যে দেশের যে রীতি। তা না হলে হাত তিরিশ চল্লিশ চওড়া একটা সোঁতা খালকে কেউ নদী বলে!

কিলপঙ। বড় খালের চেয়ে সরু একটা জলরেখার নাম নদী। অন্য দিন তাজ্জবের কথাটা ভেবে খুব একচোট হাসে হারান। কিন্তু আজ নদীর দিকে মন নেই, চুপচাপ কাপাসীর পেছনে এসে দাঁড়াল সে।

খাটো গেরুয়া রঙের একটা জামা পরেছে কাপাসী। জামাটায় গোল গোল খয়েরি ফুটকি। শাড়িটার রং মেঘের মতো। এতক্ষণে হরিণ আর ময়ূরের ভাবনাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

পিঠময় চুল ছড়িয়ে রয়েছে। নদীর দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছে কাপাসী। চোখ থেকে গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোটায় জল ঝরছে। নদীপারের শুকনো মাটি মুহূর্তে সেই জল শুষে নিচ্ছে।

হারান চমকে উঠল। আস্তে আস্তে ডাকল, 'কাপাসী—'

ডাকটা কাপাসীর কানে পৌছয় নি। আগের মতোই বসে রইল সে।

হারান আবার ডাকল, 'কাপাসী—'

মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে থেকে যেন কাপাসী তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। অস্ফুট গলায় বলল, 'তুমি—'

'হ—হ—আমি—'

গভীর উৎকণ্ঠায় কাছাকাছি এগিয়ে গেল হারান।

মুখ ঘুরিয়ে আবার নদীর দিকে তাকাল কাপাসী। আবার সে উদাসীন হয়ে গেল। আগের মতোই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল।

হারান মনে মনে ভাবে, আহা কাঁদুক, কাপাসী কাঁদুক। কাপাসীকে কাঁদতে দেখলে তার আশা হয়। সে ভরসা পায়। যে দুঃখে, যে ব্যথায় কাপাসীর বুক ফাটে, নোনা জল হয়ে চোখ ফেটে তা ঝরে যাক। আহা কেঁদে কেঁদে বুকটা হালকা হোক মেয়েটার। অনেক পুড়েছে, অনেক জ্বলেছে কাপাসী। এবার একটু জুড়োক। কাপাসীর বুকের ভেতর যে কান্না জমাট বেঁধে আছে, এতদিনে বুঝি সেটা পথ পেয়েছে।

হারান ডাকে, 'কাপাসী—'

'কও—'

'কান্দো, যত পার কান্দো।'

'কত দিন কান্‌তে চাইছি, পারি নাই। ঈশ্বর এট্টু কান্‌তেও দ্যায় নাই। যহন কান্‌তে চাইছি, ঈশ্বর হাসাইছে। কত শাস্তি পাইলাম। ভগমান, তোমার মনে কী যে আছে—' বলতে বলতে থেমে যায় কাপাসী।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে হারান। ধরা ধরা গলায় কী যে বলে, বোঝা যায় না।

রোদের তেজ একসময় মবে আসে। জঙ্গলের মাথায় বিষণ্ণ একটু আলো আটকে রয়েছে। স্যাডল পিকের দিক থেকে ঠান্ডা মৌসুমি বাতাস ছুটে আসে। এই দ্বীপে আরো একটা দিন ফুরিয়ে যেতে থাকে।

ফিস ফিস করে হারান বলল, 'সে কথা ভুইলা যাও কাপাসী—'

'ভুলতেই তো চাই পুরুষ। কিন্তুক পারি কই? পাবি না, পারি না, পারি না। কিছুতেই যে পারি না। হা ঈশ্বর!' কাপাসী অস্থির হয়ে ওঠে। দু'হাতে চুল ছেঁড়ে। জোরে জোবে মাথাটা ঝাঁকায় আর কাঁদে। তীব্র, অবোধ কান্না। মুখের ওপর গাঢ় যন্ত্রণার ছাপ পড়ে।

কেঁদে কেঁদে একসময় ক্লান্ত হযে চুপ কবে যায় কাপাসী। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে সে। তার পিঠে একটা হাত রাখল হারান। বলল, 'ভুইলা যাও কাপাসী, ভুইলা যাও। না ভুললে দুঃখু তো ঘুচব না। সারা জনম কষ্ট পাইবা।'

'ভুলুম, ভুলুম। কিন্তুক ক্যামনে?' হাতেব ফাঁক থেকে মুখ তোলে কাপাসী। ভেজা, ভাঙা গলায় বলে, 'ক্যামনে ভুলুম পুরুষ?'

বঙ্গোপসাগরের ওপার থেকে কিছুই আনতে পারে নি কাপাসী। সে কুমারী মেয়ে। কুমারী মেয়ের থাকেই বা কী? একটি সুন্দর, অনাঘ্রাত শবীর আর নিষ্পাপ মন। সম্বল বল, বিত্ত বল, বৈভব বল, এই দু'টোই তার সব। এই শরীর আর এই মন।

কাপাসী যখন এসেছে, তখন তার শরীরও এসেছে, মনও এসেছে। কিন্তু এ শরীর, এ মন তো নিষ্পাপ কুমারী মেয়েব নয়।

নিজের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা, আকণ্ঠ এক দুঃখ পুরে এই দ্বীপে এসেছে কাপাসী। সেই দুঃখ কেমন করে ভুলবে সে? কেমন করে? এর উত্তর হারানের জানা নেই।

কাপাসী এখনো বলছে, 'কইয়া দাও পুরুষ, ক্যামনে ভুলুম?'

হারান উত্তর দিল না। কাপাসীর দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারে এমন মন্ত্র তার জানা নেই।

অনেকটা সময় কেটে গেল। জঙ্গলের মাথা থেকে একসময় বিষণ্ণ আলোটুকু কে যেন মুছে দিল। কিলপণ্ড নদীর জল ছোট ছোট নুড়ি, পাথর আর গাছের শিকড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে একটানা বেজে চলেছে। জলের শব্দ ছাড়া আপাতত চরাচরে আর কোনো আওয়াজ নেই।

চৌকো তেলের টিন কেটে মোটা লোহার তার পরিয়ে বালতি বানানো হয়েছে। সেই বালতি নিয়ে জল তুলতে এসেছিল কাপাসী। সেটা এক পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে।

হারান বালতিটা তুলে নিয়ে জল ভরল। কাপাসীর কাছে এসে বলল, 'ক্যাম্পে লও (চল)। সন্ধ্যা হইয়া আইল।'

কাপাসী উঠে দাঁড়াল। তারপর দু'জনে পাশাপাশি টিলা বাইতে লাগল।

হারান বলল, 'আমাগো হগল গেছে। ঘর গেছে, বসত গেছে, জমিজমা গেছে। সাত পুরুষের ভিটামাটি ছাইড়া আমরা ভাইসা পড়ছি। কম দুঃখু, কম কষ্ট পাইলাম এই কয় বছরে! ভাবতে বইলে মাথার ঠিক থাকে না।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'এই দ্বীপে আইয়া আমরা মাটি পাইছি। আশ্যয় পাইছি। পুরান ঘরবসত, পুরান ভিটামাটির দুঃখু ভুলতে বইছি। পুরান দুঃখু না ভুললে নূতন কইরা বাচুম ক্যামনে? আমাগো বাচতে হইব। য্যামুন কইরা পারি আমরা বাচুম। উই যে পালসাহাব কয়, মনিষ্য হইয়া জম্মাইছি, বাচার লেইগা যুঝুম না?'

বলতে বলতে কাপাসীর মুখের দিকে তাকাল হারান। আবছা আলোতে তার মুখটা ঠিক বোঝা যায় না। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই আবার বলল, 'ঠিক কিনা?'

কাপাসী অস্ফুট একটা শব্দ করল।

হারান বলে, 'কুত্তা বিড়ালও বাচার লেইগ্যা কী না করে! আমরা মানুষ, আমরা বাচুম না? বাচো কাপাসী, তুমি ভাল হইয়া ওঠ। এইটুক বোঝ না, তুমি বাচলে যে আমিও বাচি?'

খুব কাছে এসে গাঢ় গলায় সে বলতে থাকে, 'পুরান দুঃখু ভুইলা যাও কাপাসী, য্যামনে পার ভোল। দেইখো অ্যামুন দিন অ্যামুন থাকব না। সুদিন আইব।'

'সুদিন আইব! কী যে কও পুরুষ, যত পরস্তাব (রূপকথা)!' বলতে বলতে হঠাৎ তীব্র অবুঝ অস্থির গলায় সেই হাসিটা হেসে উঠল কাপাসী।

হাবান চমকে উঠল। কান্নার ভেতর দিয়ে অনেক কাছে এসে পড়েছিল কাপাসী। হাসি দিয়ে হারানকে আবার অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই হাসিটাই আবার তাকে অস্বাভাবিক করে ফেলেছে।

হারান আর কিছু বলে না। অসহ্য, আকণ্ঠ এক ব্যথায় সে বোবা হয়ে গিয়েছে।

কাপাসী হাসতেই থাকে।

মুখ বুজে কাপাসীর হাসি শোনে হারান। এই হাসির অনেক পরত নিচে কত কান্নাই না জমে আছে! কখনো সখনো হাসিটা ঠেলে সরিয়ে কাপাসীর কান্না বেরিয়ে পড়ে। একটু আগে সেই কান্নাটাই তো শুনেছে হারান।

ষোল

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ জুড়ে উৎসব শুরু হয়েছে। জীবনের উৎসব। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পারে পারে যে জীবন তারা ফেলে এসেছে, বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে তাকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার কাজে লেগেছে সবাই।

জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, বউ-ঝি, কেউ বসে নেই। কুড়াল কোদাল নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সবাই নয়। একজন বাদ। কাপাসীর বাপ নিত্য ঢালীর এই দ্বীপের কোনো ব্যাপারেই উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই। এমনকি লাভ-লোকসানের বোধটাই নেই। সব ব্যাপারেই সে উদাসীন, একেবারেই নির্বিকার।

জঙ্গলের তলা থেকে, সাপ-জোঁক-কানখাজুরা আর হাজার জাতের সরীসৃপের মুখ থেকে মানুষগুলো মাটি ছিনিয়ে নিয়েছে। কোদালের ফলায় ফলায় মাটি চৌরস করছে। মানুষের ঘাম, রক্ত আর শ্রমে উপনিবেশ গড়ে উঠছে।

পালসাহাব বলেছে, মাটি চৌরস হয়ে যাওয়ার পর সরকার থেকে বাঁশ, খুঁটি, দড়ি, বেতপাতা,

কাঠ—ঘর তৈরির সব রকম সরঞ্জাম পাওয়া যাবে। শুধু কি সরঞ্জামই, বসতের জন্য খানিকটা করে উঁচু জমিও মিলবে।

তখন আর ট্রানজিট ক্যাম্পে একসঙ্গে সবাইকে ডেলা পাকিয়ে থাকতে হবে না। সবারই নিজের নিজের মাথা গোঁজার মতো বাড়িঘর হবে।

যে মাটি তারা হারিয়ে এসেছে, হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আবার তা ফিরে পেয়েছে। পায়ের নিচে মাটি পেয়ে সেই মাটিকে তারা বড় ভালবেসে ফেলেছে। প্রাণের সবটুকু উত্তাপ ঢেলে পরম মমতায় সেই মাটিকে তারা তৈরি করে নিচ্ছে।

মাটি। মাটি। নতুন মাটি। নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটি। সেই মাটি পেয়ে মানুষগুলো মেতে উঠেছে। বিভোর হয়ে আছে।

জমি কোপানো হয়েছে অনেকটা, জঙ্গলও সাফ হচ্ছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ঘরবসত উঠবে। প্রথম বৃষ্টির জল পেলে বীজদানা রোয়া হবে। দেখতে দেখতে উপনিবেশ জমে উঠবে।

কিন্তু কাপাসীর বাপ নিত্য ঢালীর তাতে কিছুই যায় আসে না। সে জমিও কোপায় না, জঙ্গলও কাটে না। ট্রানজিট ক্যাম্পের কোনো কাজেই সে নেই। এই দ্বীপের সঙ্গে নিত্যর যেন বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই উপনিবেশের জন্য সে এতটুকু আগ্রহ বোধ করে না।

সাত পুরুষের ঘর ভদ্রাসন এবং ভিটামাটি ছেড়ে আসার শোকটা তার প্রাণে সব চেয়ে বেশি বেজেছে। এই শোকটা তাকে একবারে অথর্ব করে ফেলেছে।

মুখভরা কাঁচাপাকা নোংরা দাড়ি। মেরুদণ্ডটা দু'টো খাঁজ খেয়ে দুমড়ে আছে। খসখসে কালো চামড়া থেকে খই ওড়ে। বয়স এখনো পঞ্চাশ পেরোয় নি। এরই মধ্যে চুলগুলো পেকে কেমন একটা পাঁশুটে রং ধরেছে। খাওয়া-শোওয়ার ঠিক নেই। ইচ্ছা হলে খেল, ইচ্ছা হলে ঘুমলো। টিকে থাকতে হলে সাধারণ যে জৈবিক নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়, সে সবের বিশেষ ধার ধারে না নিত্য। তার নগদ ফলও সে পাচ্ছে।

শরীরটা দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাংসহীন দেহের চওড়া চওড়া হাড়গুলি বেরিয়ে পড়েছে। নাকের দু'পাশে গোলাকার দু'টো বড় গর্ত। সেই গর্তের ভেতর গরুর চোখের মতো একজোড়া অবোধ, অসহায় চোখ। ফুর্তি নেই, হাসি নেই, আনন্দ নেই। বেঁচে থাকতে হলে মানসিক যে উপকরণগুলির দরকার, তার ছিটেফোঁটাও নেই নিত্যর মধ্যে। অকালে সে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। দেশভাগ তাকে একেবারে বিকল করে ফেলেছে।

দিনরাত দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে ট্রানজিট ক্যাম্পের টিলায় চুপচাপ বসে থাকে নিত্য। কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। নিজের খেয়ালে বিড় বিড় করে কী যে বকে যায়, কে বলবে।

প্রথম প্রথম পালসাহাব ধমক ধামক দিয়েছে। কিছুই লাভ হয় নি। কোনো উত্তরই দেয় নি নিত্য। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়েই থেকেছে। পালসাহাবের কোনো কথাই যেন তার কানে ঢোকে নি।

ধমকে, চিল্লাচিল্লিতে যখন কিছুই হল না, তখন তার পিঠে একখানা হাত রেখে অনেক বুঝিয়েছে পালসাহাব, 'দ্যাখ শালে, দুঃখু করে আর কী করবি? তামাম জিন্দেগী এমন করে চলবে না।'

ডাইনে-বাঁয়ে নিত্য মাথা ঝাঁকিয়েছে। এভাবে কী যে সে বোঝাতে চেয়েছে, কে বলবে।

পালসাহাব আবার বলেছে, 'হাল এমন থাকবে না নিত্য। জমানা এক রোজ বদলাবেই। জমিন পেয়েছিস, ফসল ফলা। মাটি পেয়েছিস, কুঠি বানা। অ্যায়সা জমানা অ্যায়সা থাকবে না রে, কভী অ্যায়সা থাকবে না।' তার স্বরটা আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে উঠেছে।

হাজার বুঝিয়েও নিত্য ঢালীকে বশে আনতে পারে নি পালসাহাব। যে জিদ ধরেছে বুঝ মানবে না, তাকে বুঝ মানানো কি সহজ কথা! অবশ্য পালসাহাব হার মানে নি, হাল ছাড়ে নি।

প্রায় রোজই সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে নিত্যকে নিয়ে পড়ে পালসাহাব। আবার জমির কাজ সেরে সন্ধের পর আর এক দফা বোঝায়।

কিন্তু আজকাল পালসাহাব আসার আগেই ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ে নিত্য ঢালী। বয়স যথেষ্টই হয়েছে। জীবনে তো কম দেখে নি, কম শোনে নি, কম বোঝে নি সে। অভিজ্ঞতাও কম হয়

নি। পালসাহাব নতুন কি আর বোঝাবে? এ সব কি আর সে জানে না? সবই জানে, সবই বোঝে। কিন্তু আশায় বুক বাঁধতে পারে কই?

পালসাহাব বলে, জমানা বদলে যাবে, এমন দিন এমন থাকবে না। নিত্য তা জানেও। তবু তার মন বুঝ মানে না। তার সামনে আশা নেই, ভরসা নেই।

জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এরিয়াল উপসাগরে যাওয়ার পথটা খুঁজে বার করেছে নিত্য ঢালী। সকালে পালসাহাব ট্রানজিট ক্যাম্পে আসার আগে সে উপসাগরের পারে চলে যায়। সারাটা দিন এবং রাতের অনেকটা সময় কাটিয়ে যখন ক্যাম্পে ফেরে, অন্ধকার আর গাঢ় কুয়াশায় সমস্ত দ্বীপ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সে আসার আগেই পালসাহাব তার ঝুপড়িতে চলে যায়।

আজও এরিয়াল উপসাগরের পারে এসে পড়ল নিত্য ঢালী।

এখানে এক ধারে বিরাট এক পাথরের চাঁই। নোনা জলে পাথরটার অনেকখানি ক্ষয়ে গিয়েছে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে কচ্ছপের আকৃতি ধারণ করেছে। রোজ এই পাথরটার ওপর এসে বসে নিত্য।

বেশ খানিক আগেই রোদ উঠেছে।

সামনের দিকে নাম না-জানা ছোট্ট একটা দ্বীপ। সকাল হলেও কুয়াশা পুরোপুরি ঘোচে নি, হালকা একটা পর্দার মতো দ্বীপটাকে জড়িয়ে আছে।

ফিনফিনে রুপোলি ডানায় সোনালি রোদ গায়ে মেখে উড়ুক্কু মাছেরা উড়ছে। সাগরপাখিগুলো ছোঁ মেরে মেরে উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সামনে যতদূর তাকানো যায়, অনেক ছোট ছোট দ্বীপ। সেগুলোকে ঘিরে আছে অথৈ, অগাধ জল।

সমুদ্র থেকে ঢেউ আসে উপসাগরে, বিপুল আক্রোশে পাবের ভাঙা ভাঙা ক্ষয়িত পাথরে আছাড় খায়। নোনা জল অবিরাম গর্জায়।

উড়ুক্কু মাছ, কুয়াশা, দূরের দ্বীপপুঞ্জ, সাগরপাখি, কিছুই দেখছিল না নিত্য ঢালী। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের কথাই ভাবছিল। কী মানুষ ছিল সে, আর কী হয়ে গেল!

পালসাহাব যখন বলে, 'জমিন পেয়েছিস, ফসল ফলা। মাটি পেয়েছিস, বসত বানা—' তখন মনে মনে হাসে নিত্য ঢালী। বিড় বিড় করে বলে 'জমিনের কী দেখছস পালসাহাব! ফসলের কী দেখছস! আমারে ফসলের কথা শুনায় হালার পুঁত।'

তাজ্জবের কথাই।

যে লোকটা দেশে থাকতে অসুরের মতো খাটতে পারত, এক হাতে পঁচিশ কানি তিন-ফসলী জমি চষত, আউশ আমন আর রবি শস্য, বছরে তিনবার ফসল তুলত, তাকে চাষের কথা শোনায় পালসাহাব! যে লোকের সাতাশের বন্দের আচটালা ঘর ছিল তিনখানা, ডোল ছিল আটখানা, তাকে ঘর-বসতের কথা শোনায় পালসাহাব!

সবই ছিল। কিন্তু আজ আর কিছুই নেই। ঘর না, ভদ্রাসন না, জমিজিরাত, হাল হালুটি কিছুই না। এমন যে বংশের মান ইজ্জত, তাও না। শুধুমাত্র প্রাণটুকু ধিকি ধিকি টিকে আছে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে নিত্য ঢালীর। মানই যখন বাঁচল না, তখন আর প্রাণের মায়া সে করে না।

একেক সময় নিত্য ভাবে, আবার সে দেশে ফিরে যাবে। শরীর আর মন এমন ভেঙে পড়েছে, যাতে নতুন করে এই দ্বীপে জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সব উদ্যম, সব উৎসাহ তো তার নিঃশেষই হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একমাত্র ভাবনা তার কাপাসীকে নিয়ে। কিন্তু কাপাসীকে নিয়ে আবার কিসের চিন্তা? কাপাসী সব ভাবাভাবির বাইরে। বাপ হয়ে সে কাপাসীকে বাঁচাতে পারল কই? যে বেড়া আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে এই দ্বীপে পালিয়ে এসেছে তা ঠেকাতে পারল কই? কাপাসীকে যখন বাঁচাতেই পারল না, তখন আর এখানে থেকে কী হবে? কপালে যা আছে হোক, দেশেই ফিরে যাবে নিত্য ঢালী।

কাপাসীর কথা মনে হতেই অবোধ শিশুর মতো শব্দ করে অনেকক্ষণ কাঁদল নিত্য। কেঁদে কেঁদে

ক্লান্ত হয়ে পড়লে একসময় ঝিম মেরে বসে রইল। কোঁচকানো, তোবড়ানো গালে চোখের নোনা জলের দাগ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে লাগল তার।

ভট—ভট—ভট। হঠাৎ এরিয়াল উপসাগরে মোটর বোটের শব্দ উঠল। নিত্য ঢালী চমকে ওঠে, কিন্তু চমকটা বেশিক্ষণ থাকে না, আস্তে আস্তে থিতিয়ে যায়।

রোজ ঠিক এই সময়ে মোটর বোটটা এরিয়াল উপসাগরে আসে। একটা লোক, তার নাকটা থ্যাবড়া, চোখদু'টো কুতকুতে, লাফ মেরে জলে নামে। তারপর ডুব দিয়ে দিয়ে জল থেকে কী যেন তুলে আনে। অন্য একটা লোক মোটর বোটে বসে থাকে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত, যতক্ষণ আলো থাকে, যতক্ষণ উপসাগরের তলাটা অস্পষ্ট হয়ে না যায়, ততক্ষণ জলেই থাকে থ্যাবড়া-নাক লোকটা। এই লোকদু'টো আর এই মোটর বোটটা কোত্থেকে আসে, কেনই বা আসে, উপসাগর থেকে কী-ই বা তোলে, কিছুই জানে না নিত্য ঢালী।

প্রথম প্রথম খেয়াল করত না নিত্য। নিজের চিন্তায় যে অস্থির তার অন্য দিকে মন দেওয়ার সময় কোথায়?

কিন্তু ধীরে ধীরে তার কৌতূহল হতে লাগল। আজকাল মোটর বোটের শব্দ শুনলেই নিত্য কান খাড়া করে। যতক্ষণ বোটটা উপসাগরে ঘোরাঘুরি করে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। থ্যাবড়া-নাক কুতকুতে-চোখ লোকটা জল থেকে কী তোলে, তা লক্ষ করে।

কৌতূহল তার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সতের

যুবতীর সাধের কি শেষ আছে?

তার সমস্ত মন আর সর্বাঙ্গ জুড়ে শুধু সাধ আর সাধ। স্বামীর সাধ, সন্তানের সাধ, ঘরের সাধ। কত যে অফুরান বাসনা!

সাধ তো কত। তবু একটাও মিটল না তিলির। একটা আশাও তার পূরণ হল না। স্বামী পেয়েছে ঠিকই। বাপ-মা গুরু-পুরুত আগুন সাক্ষী রেখে যার হাতে সঁপে দিয়েছে সে স্বামী বৈকি।

স্বামী! আজকাল হরিপদর কথা ভাবলেই ঠোঁট দু'টো বিদ্রূপে বেঁকে যায় তিলির। ফিস ফিস করে সে বলে, 'সোয়ামী! সাত জন্মের ভাতার!' অবজ্ঞায় নাকের ডগাটা তির তির করে কাঁপে তার।

সারা জীবনে হরিপদ তাকে দিয়েছে কী? অরণ্যের তলা থেকে, সাপ-জোঁকের মুখ থেকে এই দ্বীপের মাটি ছিনিয়ে নিতে নিতে নিজের জীবনের হিসাব কষে তিলি। এতকাল মুখ বুজে হরিপদর মন যুগিয়ে চলেছে সে। আজকাল সারাক্ষণই হিসেব কষে, সারা জীবনে কী পেল, কতটুকু পেল!

হরিপদ তাকে কিছুই দেয় নি। না বলতে কিছুই না। একটা ছেলে না, মনের মতো একটা ঘর না। এমন কি নীরোগ তাজা একটা দেহ পর্যন্ত নয়।

তিলির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে বার বছরের কিশোরী। দেখতে দেখেতে সে ভরে উঠল—প্রচুর স্বাস্থ্যে, অফুরন্ত যৌবনে।

কোনো দিন হরিপদ কি তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে? দেখবে কি? আজন্ম তার বুকে হাঁপির টান, অস্থিসার রোগা জিরজিরে দেহ, লিকলিকে হাত-পা। বুকে হাত চেপে হিক্কা আর হাঁপানি সামলাবে, না তিলির ভরন্ত-পুরন্ত যৌবনের দিকে তাকাবে? সময় কোথায় হরিপদর? সামর্থ্য কোথায়?

অধর্ম বল, পাপ বল, যুবতীর শরীর তো তার নিজের বশে নয়। রাত যখন গাঢ় হয়েছে, তিলির নিশ্বাস দ্রুত তালে পড়েছে, দৃষ্টি সাপের চোখের মতো জ্বলেছে। নিশ্বাস গরম হয়ে উঠেছে। তার মনে হয়েছে, রক্তের মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছে। ভেতরের তাপ দ্রুত চামড়ায় ফুটে বেরিয়েছে। গায়ে জল ঢেলেও সে তাপ জুড়োতে পারে নি তিলি।

ওপরে জল ঢেলে চামড়া ঠান্ডা করা যায়, কিন্তু ভেতরের তাপ কি তাতে জুড়োয়? রক্তে আগুন কি এত সহজে নেবে? বনের আগুন তো সবাই দেখে, মনের আগুন দেখার চোখ ক'জনের? আর

যারই থাক, অন্তত হরিপদর সে চোখ নেই। যদি থাকত? থাকলেই বা কী হত? কিছুই না। কোনো আসানই হত না তিলির।

নিয়ত রোগে ভোগে যে হরিপদ, দিবারাত্রি হাঁপির টানে যে কাবু হয়ে থাকে, সাধ্য কি তার তিলির মনের আগুন দেহের আগুন নেবায়?

ভরা শরীর আর ভরা যৌবন নিয়ে সারাটা জীবন শুধু জ্বলছেই তিলি। তবু দেহের জ্বালার কথা সে ভাবে নি। মনের পোড়ানিকে সে মানে নি। হরিপদর মন যুগিয়েই সে চলে এসেছে এতকাল।

তবু তার মন পেয়েছে কই তিলি? রোগা, অস্থিসার দেহটার মধ্যে হরিপদর মনটা যে কোথায়, এত বছর একসঙ্গে ঘর করেও খুঁজে পেল না তিলি।

কিন্তু কত আর সয়?

এখন কত রাত, কে বলবে। ট্রানজিট ক্যাম্পটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

কুয়াশা, অন্ধকার আর গাঢ় একটি ঘুমের মধ্যে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। টিলার পাশ থেকে বন তুলসীর ঝাঁঝাল গন্ধ আসছে। থেকে থেকে একটা রাত-অন্ধ বুনো পাখি ককিয়ে উঠছে। এলোপাথাড়ি হাওয়া ছুটছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে।

পাখির ককানি আর হাওয়ার শনশনানি ছাড়া এই দ্বীপে এখন অন্য কোনো শব্দ নেই।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সামনে, টিলার মাথায় একা চুপচাপ বসে আছে তিলি। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা গোঁথে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ দু'টো ধক ধক করছে তার।

মুহূর্তে খুন চেপে গেল তিলির মাথায়। শুধু কি খুন, আগুনও ধরে গিয়েছে যেন। কিছু একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে সে ছাড়বে না।

অসহ্য উত্তেজনায় কাঁপছে তিলি। প্রবল বেগে শিরায় শিরায় কী এক স্রোত ছুটে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই তা থামানো যাচ্ছে না। থামাতে চায়ও না তিলি।

এই কুয়াশা, এই অন্ধকার আর শরীরের এই থরথরানির মধ্যে তিলি ঠিক করে ফেলল, সর্বনাশেই সে গা ভাসাবে। পাপপুণ্য, মান-ইজ্জতের কথা সে ভাববে না। স্বামীর কথা ভাববে না। যে স্বামী থেকেও নেই, তার কথা ভেবেই বা কী হবে? লজ্জা-নিন্দা-ভয়, তিলি আজ সব কিছুর বাইরে।

লোকে কী বলবে, সে কথাও তিলি ভাবে না। লোক না পোক। না না, পৃথিবীর কাউকে ডরায় না সে। ভয়-ডর কিছুই তাকে আজ বেঁধে রাখতে পারবে না। মাথায় যে খুন চেপেছে, যে আগুন ধরেছে, সেই খুন আর আগুন তিলির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

অনেক সয়েছে তিলি। আর না।

এতকাল হরিপদর খালি সন্দেহই ছিল। সেই সন্দেহের সঙ্গে কোনোরকমে আপস করে তার ঘর করেছে তিলি। সন্দেহটা তবু সইত। কিন্তু আজ ঝুপড়ি থেকে লাথি মেরে তাকে বার করে দিয়েছে হরিপদ। এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ দর দর করে রক্ত ঝরছিল। রক্তটা অবশ্য এখন বন্ধ হয়েছে।

টিলার মাথায় বসে তিলি আজ প্রথম ভাবল সুখ থাক, শান্তি থাক, সোহাগ থাক, দু' মুঠো ভাত যে বউকে দিতে পারে না সে আবার কিসের স্বামী?

এখন কী করবে তিলি? কী করতে পারে?

কী না পারে সে? হরিপদর সন্দেহ সত্য করে দিতে পারে। হরিপদর মুখে চুনকালি লেপে দিতে পারে। নিজের মন, নিজের অঙ্গ লুটিয়ে দিতে পারে, উড়িয়ে দিতে পারে, পুড়িয়ে দিতে পারে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। এক পা এক পা করে এগুতে এগুতে ট্রানজিট ক্যাম্পের শেষ মাথায় এসে পড়ল। এখানে ছোট একটা বেতপাতার ঝুপড়ি। ঝুপড়িটার সামনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। এদিক সেদিক একবার দেখে নিল। একটু দ্বিধা, একটু ভয়, তারপরেই মনঃস্থির করে ফেলল। ঝুপড়ির বেড়ায় আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগল তিলি। একটা, দু'টো, তিনটে। পর পর অনেকগুলো।

কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া নেই।

প্রথমে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ঝুপড়ির বেড়া ঝাঁকাতে লাগল তিলি। চাপা তীব্র গলায় ডাকতে লাগল, 'জামাই, জামাই—' তার কণ্ঠস্বর সাপের হিসানির মতো শোনাচ্ছে।

ঝুপড়ির ভেতর এবার মচ মচ শব্দ হল। কেউ যেন বাঁশের মাচানে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। সেখানে থেকে ঘুমজড়ানো আবছা স্বর ভেসে এল, 'কে, কে?'

'আমি, আমি—'কাঁপা গলায় তিলি বলল, 'জামাই আমি। তরাতরি (তাড়াতাড়ি) বাইরে আস।'

একটু পরেই কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপ খুলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপড়ি থেকে একটা লোক গুঁড়ি মেরে বাইরে বেরিয়ে এল।

গাঢ় কুয়াশা চুঁইয়ে আবছা অনুজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে পড়েছে। এ এমন এক আলো যাতে মানুষের চোখ দেখা যায়, কিন্তু চোখের কথা পড়া যায় না। মাটি দেখা যায়, কিন্তু মাটির রং বোঝা যায় না।

লোকটা এগিয়ে এসে তিলির মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তিলি বলল, 'জামাই, তুমি আইছ!' লোকটা যে বেরিয়ে এসেছে, নিজের চোখে দেখেও ঠিকমতো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তিলি।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সবাই তাকে 'জামাই' বলে ডাকে। আসলে আর দশ জনের মতো বাপ-মায়ের দেওয়া নাম একটা আছে তার। কিন্তু 'জামাই' শব্দটার নিচে সে নামটা হারিয়ে গিয়েছে।

তার আদত নাম যোগেন—যোগেন করাতি।

ফিসফিস করে তিলি বলল, 'আমি আইলাম—'

'ব্যাপারখান কী? এত রাইতে আমার কাছে! কিছুই যে বুঝি না।' খানিক ভয়, খানিক উত্তেজনা, এবং খানিক বিস্ময়ে যোগেনের গলা অল্প অল্প কাঁপে।

তিলি এবার ডুকরে উঠল, 'আমার আর কেউ নাই। কিচ্ছু নাই। বাচার উপায় নাই।'

তিলির একটা হাত ধরল যোগেন। বলল, 'অ্যামুন কইরো না, অ্যামুন করতে নাই। গলার আওয়াজে কেউ বাইর হইয়া পড়ব। আমাগো দেইখা ফেলব—' ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল যোগেন।

'দেখুক, দেখুক। আইজ কোনো কিছুতে আমার ডর নাই। শরম-ভরমের মাথা খাইয়া আমি পুরীর বাইর হইছি।'

'চুপ কর, চুপ কর। কেও শুনব।'

'শুনুক, শুনাইতেই তো চাই। পিরথিমীর হগলে শুনুক। লাজ-নিন্দা আইজ গেরাহ্যি করি না। ক্যান করুম?' তিলি যেন রুখে ওঠে।

'অবুঝ হইও না তিলি। বুঝ মান, ধৈয্য ধর—' তিলির একটা হাত ধরে ছিল যোগেন। এবার অন্য হাতটা ধরল। বলল, 'বুঝি, মনটা তোমার বশে নাই। দুঃখু পাইছ। কিন্তুক অত অবুঝ হইলে কি চলে!' তিলিকে বোঝাতে থাকে সে। কিন্তু যে জেদ ধরেছে বুঝ মানবে না, তাকে বোঝানো কি এতই সহজ? মুখের কথায় কি সে বুঝ মানে?

তিলি খেপে উঠল, 'জনমভর খালি বুঝই মানলাম, খালি ধৈয্যই ধরলাম। কিন্তুক পাইলাম কী? কী পাইছি, তুমিই কও পুরুষ—'

'আমি কী কমু?' বিমূঢ় মুখে তিলির দিকে তাকিয়ে রইল যোগেন।

'ভাল ভাল। বড় সুখের কথা শুনাইলা পুরুষ, বড় শান্তি দিলা!' মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে তিলি বলতে থাকে, 'তমস্ত জীবন তুমার কথায় ভরসা কইরা আছি। তুমি য্যামুন কইছ, হেইমতো চলছি। মনেরে কইছি, ধৈয্য ধর। কিন্তুক আর পারি না—' কথাটা শেষ না করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল তিলি।

'কান্দে না, কান্দে না—' সস্নেহ, গাঢ় গলায় যোগেন বলতে থাকে, 'থির হও, থির হও। মাথা ঠিক রাখ।'

তিলির কান্না তাতে থামে না, বাড়তেই থাকে। এদিকে কী বিপাকেই না পড়েছে যোগেন! কেউ

যদি এখন অন্য ঝুপড়ি থেকে বেরোয় তা হলে উপায় থাকবে না। দুর্নাম রটে যাবে। পাঁচ মুখে পাঁচ কথা ছড়িয়ে পড়বে। কেউ তাকে বুঝবে না। কোনো কিছু বিচার করে দেখবে না। দুর্নাম যখন রটে, বিচার বিবেচনা না করেই রটে। তখন দু'হাতে ক'টা মুখ চাপা দেবে যোগেন?

ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে একটু দূরে, টিলার মাথাটা যেখানে সবচেয়ে উঁচু, কুয়াশা চোঁয়ানো চাঁদের আলোয় সেই জায়গাটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে আছে। তিলির হাত ধরে সেখানে নিয়ে এল যোগেন। পাশাপাশি বসল।

সামনের জঙ্গলের মাথায় চাপ চাপ অন্ধকার জমে রয়েছে। অন্ধকারের ওপর সাদা কুয়াশা ফেনার মতো ভাসছে। গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ে লক্ষকোটি জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে।

মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে বাড়িয়া পোকারা হন্যে হয়ে উঠেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে তিলি আর যোগেনের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কামড়ে কামড়ে চামড়া ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। কিন্তু তিলির হুঁশ নেই। বাড়িয়া পোকার কামড় তার গায়ে যেন বিঁধছে না। অস্থির গলায় সে বলছে, 'পিছনের হগল কিছু মুইছা চইলা আইছি। অহন তুমিই ভরসা—'

'কী কও তিলি!' যোগেন চমকে উঠল।

'ঠিকই কই।' তিলি অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল, 'মনে আছে হেই কথা?'

'কোন কথা?'

'একদিন তুমি কইছিলা যেইদিন আর সোয়ামীর লগে মানাইতে পারুম না, যেইদিন হেয় (সে) আমারে পুরীর বাইর কইরা দিব, হেইদিন তুমি আমারে আশ্যয় দিবা। মনে পড়ে পুরুষ?'

'পড়ে। কিছুই ভুলি নাই।'

'শোন পুরুষ—'

'কও—' তিলির মুখের দিকে তাকাল যোগেন।

'হ, কমু। কওনের লেইগাই নিশি রাইতে তুমার ঘুম ভাঙ্গাইছি।' বলে একটু থামল তিলি। বুকের ভেতর আবদ্ধ বাতাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। আবার শ্বাস টানল। তারপর বলতে লাগল, 'মায়ের কাছে শুনছি, বাপের কাছে শুনছি, পিরথিমীর হগল মনিষ্যের মুখে শুনছি, সোয়ামী হইল হগল গুরুর গুরু। মাথার মণি। তমস্ত জনম তারে মাথাতেই রাখছি, তার মন যুগাইয়া চলছি। ভরা শরীলে ভরা যৈবনে পুড়ছি, জ্বলছি, খাক হইছি। তভু নিজের কথা ভাবি নাই। যৈবনের দিকে তাকাইয়া, নিজের ভরা শরীলের দিকে তাকাইয়া বুক কাপছে। যুবতীর যৈবন কি তার নিজের বশে! ডরে অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া রাখছি। তভু সোয়ামী আমারে ফিরাও দেখল না।' এক মুহূর্ত উদাস হয়ে রইল তিলি। আবার শুরু করল, 'ফিরা ফিরা তুমার কাছে আইছি। তুমি সোয়ামীর কাছে ফিরাইয়া দিছ। সোয়ামীর লেইগা কী করছি আর কী না করছি, তুমি তো হগলই জান।'

'জানি।'

'কিন্তুক আর পারি না। আর পারুম না।' তিলি জ্বলে উঠল, 'আমারে নিয়া সোয়ামী আর ঘর করব না। আমারে বাইর কইরা দিছে।' বলতে বলতে হঠাৎ এক কান্ড করে বসল তিলি। যোগেনের হাঁটুর ওপর কপাল ঠুকতে লাগল, 'আমি আর ফিরুম না, ফিরুম না, ফিরুম না। তুমি আমারে লও (নাও) জামাই—'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল যোগেন। একসময় ধাতস্থ হয়ে দু'হাতে তিলির মুখটা তুলে ধরল। বলল, 'অবুঝ হইও না—'

'না না, অনেক সইছি। আর পারি না, আর পারি না। হা ভগমান!' একটানা কাঁদতেই লাগল তিলি।

কান পেতে তিলির কান্নার ধ্বনি শুনতে লাগল যোগেন।

অনেকক্ষণ পর কান্না থামল। মাঝে মাঝে থেমে থেমে কেমন এক ধরনের হেঁচকির মতো শব্দ করতে লাগল তিলি। শরীরটা থির থির কাঁপতে লাগল। তার পিঠে একখানা হাত রাখল যোগেন। নরম গলায় বলল, 'চল, তুমারে ঘরে দিয়া আহি—'

চকিতে মুখ তুলল তিলি। রুক্ষ চুল ভেঙে মুখময় ছড়িয়ে রয়েছে। চোখের জলে দুই গাল ভেজা।

তিলির গলা চিরে তীক্ষ্ণ, ধারাল শব্দ বেরুল, 'কী কইলা?'

গাঢ় কুয়াশা চুঁইয়ে যেটুকু চাঁদের আলো এসেছে তাতে তিলির মুখটা ঠিকমতো দেখা যায় না। যেটুকু দেখা গেল, তাতেই চমকে উঠল যোগেন। ভয়ে ভয়ে বলল, 'চল, ঘরে চল—' তিলির সম্বন্ধে সে মনঃস্থির করে উঠতে পারছে না। আসলে সংসার সমাজ লোকনিন্দা, এ সবই বিরাট আকার নিয়ে তাকে বিচলিত করে তুলেছে।

'ঘর!' আচমকা শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। হাসির দাপটে তার দেহটা ভেঙেচুরে যেন একটা ডেলা পাকিয়ে যাবে। হাসতে হাসতেই সে বলল, 'ঘর তুমি কারে কও! চাইর পাশে চাইর খান বেড়া আর উপুরে একখান চাল থাকলেই ঘর হয়! আ গো পুরুষ—'

বিব্রত গলায় যোগেন বলল, 'তোমার সোংসার—'

'সোংসার! হ, আমারই সোংসার!' বলেই চুপ করে গেল তিলি।

জঙ্গলের মাথায় সাগরপাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। একসময় মনে হল, চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। রাত আর বেশি নেই। একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে। আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রানজিট ক্যাম্পটা জেগে উঠবে। চেনম্যান, পাটোয়ারি, রাঁচি কুলি, এই সব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পালসাহাব এসে পড়বে।

নিজেকে শক্ত করে নিল যোগেন। রুক্ষ গলায় বলল, 'ওঠ—'

'ক্যান?'

'তরাতরি ওঠ। লষ্ট মাগী!'

যোগেনের গলার আওয়াজে তিলি ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু উঠল না।

এবার একটা হাত ধরে টান মেরে তিলিকে দাঁড় করিয়ে দিল যোগেন। বলল, 'ঘর-সোংসার-সোয়ামী ছাইড়া নিশি রাইতে লাগরের কাছে আইছ! কুচরিত্তির মাগী!'

তিলি বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। যোগেন যে এভাবে তাকে এত কঠোর কথা বলতে পারে, শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না। সেই সুযোগে তাকে টানতে টানতে ট্রানজিট ক্যাম্পটার দিকে নিয়ে চলল যোগেন।

যে মেয়েমানুষ লজ্জা-নিন্দা-ভয় আর শরম-ভরমের মাথা খেয়ে ঘরের বার হয়েছে তার অপ্রস্তুত ভাব কতক্ষণ থাকে? যোগেনের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তিলি বলল, 'তোমার মতলবখান কী?'

'কী আবার মতলব?' যোগেন রুখে উঠল।

'আমারে কই নিয়া চললা?'

যোগেন জবাব দিল না। হাত বাড়িয়ে তিলির হাতটা ফের ধরে ফেলল।

তিলি বলল, 'কথা কও না যে?'

'কী কমু?'

'আমারে কই নিয়া চললা?'

'যেইখানে থাকলে তোমারে সব থিকা বেশি মানায় হেইখানে।'

'অ!' বলে একটু চুপ করে রইল তিলি। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'চল।'

তিলির হাত ছেড়ে দিল যোগেন। দু'জনে পাশাপাশি ট্রানজিট ক্যাম্পের ঝুপড়িগুলোর দিকে এগুতে লাগল।

তিলি ডাকল, 'জামাই—'

'কও।'

'আমি আবার আহুম। দেখুম, কয় বার তুমি আমারে ফিরাইতে পার। আমি জানি, বেশিদিন আমারে ঠেকাইয়া রাখতে পারবা না। হ গো পুরুষ—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল তিলি। অল্প একটু হাসল। তারপর সামনের একটা ঝুপড়িতে ঢুকে গেল। হরিপদ আর সে এটাতেই থাকে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল যোগেন। অস্ফুট গলায় বলল, 'মাইয়ামানুষ, তোমার মনে কী আছে তুমিই জান!'

আঠার

চারপাশে সমুদ্র, মাঝখানে দ্বীপ। আদিগন্ত নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটি। একদিন মাটি কোপানো, আগাছা বাছা শেষ হল। এখন শুধু অঝোর ধারায় কয়েক পশলা বৃষ্টির অপেক্ষা।

বীজদানা বোনার পক্ষে এটা সুদিনও নয়, মরশুমও নয়। কিন্তু সুদিন বা মরশুম না হলে কী হবে, পালসাহাবের তর আর সয় না। পাগলা সেই যে স্বপ্ন দেখেছে, উত্তর আন্দামানের কুমারী মাটি ফসলে ফসলে ভরে যাবে, তাতেই সে বিভোর হয়ে আছে। চোখ থেকে সেই স্বপ্নটা কিছুতেই মুছে যাচ্ছে না।

শীতের এক মধ্য দুপুরে মানুষগুলো বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে এসেছিল। এখন চৈত্র মাস যায় যায়। প্রায় তিনটে মাস তারা এখানে কাটিয়ে দিল।

আসল বর্ষা শুরু হবে সেই জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি।

কিন্তু এখন, এই চৈত্রে সমস্ত আন্দামান দ্বীপ জুড়ে একটা অসময়ের বর্ষার মহড়া চলে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আচমকা মৌসুমি বাতাস ওঠে। সেই বাতাসটা পোড়া তামারঙের টুকবো টুকরো অসংখ্য মেঘকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এই দ্বীপের মাথায় এনে তোলে। এখানে এসে মেঘগুলো জমাট বেঁধে যায়। দিগন্ত আড়াআড়ি ফেড়ে বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় যেন গুরু গুরু ঘা পড়ে।

আকাশের সাজসজ্জা শেষ হলে একসময় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সীসার ফলার মতো অজস্র ধাবায বর্ষা নামে।

পালসাহাবের ইচ্ছা, অসময়ের বর্ষার জল পেয়ে মাটি নবম হলেই বীজদানা পুঁতবে। ফসল ফলুক আর নাই ফলুক, জঙ্গলের মুখ থেকে যে মাটি পাওয়া গেল তার গর্ভিণী হওয়ার ক্ষমতা কতখানি অন্তত তা পরখ করা যাবে।

নৈর্ঋত কোণের মৌসুমি বাতাস যদিও উঠল, কিন্তু মেঘ আর চোখে পড়ে না। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে শেষ পর্যন্ত খেপে উঠল পালসাহাব। খুব একচোট খিস্তি করল, 'শালে, হারামীব বাচ্চা—'

কিন্তু আন্দামানের মেঘ তার খাস তালুকের প্রজা নয় যে তার হুমকিতে ছুটে আসবে।

জমি চৌরস হয়ে গিয়েছে। এখন মানুষগুলোর হাতে কোনো কাজ নেই। অগত্যা বাঁশ খুঁটি বেতপাতা কাঠ পেরেক, ঘর তৈরির য্যবতীয় সবঞ্জাম মানুষগুলোকে বাটোয়ারা কবে দিল পালসাহাব। ঘর তোলার জন্য জমি মাপজোখ করে দিল। বলল, 'এবার আপনা আপনা কোঠি বানিয়ে নে। বিশ রোজের মধ্যে কোঠি বানানো শেষ করা চাই।'

বিশ দিনের মধ্যেই ঘর তৈরি শেষ হল। ট্রানজিট ক্যাম্প ছেড়ে সবাই যে যার ঘরে গিয়ে উঠল।

কুড়ি দিন পরও আকাশের অবস্থা যেমনকে তেমন। এখনো মেঘের দেখা নেই।

আজকাল ফেল্ট হ্যাটটা খুলে, ভুরু কুঁচকে প্রায় সারাক্ষণই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে পালসাহাব। বিরক্ত গলায় গজ গজ করে, 'আশমানের মর্জি বোঝা যায় না। শালে আওরতের দিলের মাফিক বেতর্বিয়ৎ। কোনো বার বারিষ (বর্ষা) আগে আসে, কোনো বার হাজার মাঙলেও আসে না।'

আজ 'ক্যাশ ডোল' দেওয়ার তারিখ।

'ডোল' অর্থাৎ সরকারি খয়রাত। উদ্বাস্তুরা আন্দামানে আসার পর থেকে পূর্ণবয়স্কদের জন্য মাসিক মাথাপিছু পনের টাকা আর চোদ্দ বছরের নিচের বাচ্চাদের জন্য দশ টাকা হিসাবে 'ডোল' বরাদ্দ করা আছে।

ব্যবস্থা হয়েছে, যতদিন না আন্দামানের মাটিতে ফসল ফলবে, পুনর্বাসন ঠিকঠাক মতো হবে, যতদিন না উপনিবেশ গড়ে উঠবে, ততদিন এই মানুষগুলো সরকারি সাহায্য পাবে।

পালসাহাবের ঝুপড়ির সামনে মানুষগুলো 'ডোল' নেওয়ার জন্য জমায়েত হয়েছে। এখন দুপুর।

মাথার ওপরে নির্মেঘ, নীল আকাশ ঝকমক করছে। যেদিকে যতদূর তাকানো যাক, কোথাও এক টুকরো মেঘের চিহ্ন নেই।

এক ঝাঁক সাগরপাখি অনেক উঁচুতে ডানা ছড়িয়ে ঝিম মেরে আছে। তাদের ডানা নড়ে কি নড়ে না। আকাশ থেকে তপ্ত রোদ এই দ্বীপের ওপর এসে পড়েছে। বসে বসে মানুষগুলো ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে।

নিচু একটা বাঁশের মাচানে বসে আছে পালসাহাব। তার সামনে উঁচু বাঁশের টেবিল। টেবিলের ওপর থাকে থাকে এক টাকা, দু'টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট আর রেজগি সাজানো।

পালসাহাব খাতা দেখে নাম ডাকছে, 'রসিক শীল—'

ভিড়ের ভেতর থেকে রসিক শীল উঠে এল।

পালসাহাবের এ পাশে পাটোয়ারি আতমন সিং, আর এক পাশে মা-তিন। মা-তিনও পালসাহাবের সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছে।

আতমন সিং খাতায় রসিক শীলের টিপসই নিল। মা-তিন তাকে হিসেব করে গুনে ডোলের টাকা দিল।

পালসাহাব আবার হাঁকল, 'চন্দর করাতি—'

ভিড় থেকে আর একজন উঠে দাঁড়াল।

সবাইকে ক্যাশ ডোল বুঝিয়ে দিতে দিতে সন্ধে নেমে গেল।'

তুলোর মতো সাদা মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে এখন। সমুদ্রের দিক থেকে সব পাখি সারা দিন পর দ্বীপে ফিরে আসছে।

রাঁচি কুলি ধানোয়ার চারপাশে চারটে পাটের মশাল জ্বালিয়ে দিল। দুপুরে রসিক শীলেরা যখন ক্যাশ ডোল নিতে এসেছিল তখনই পালসাহাব বলে রেখেছিল, 'শালে লোগ, ডোলের রুপেয়া পেলেই ভাগবি না। তোদের সাথ বহুত কাজের কথা আছে।'

অতএব সরকারি খয়রাত্ পেয়েও কেউ উঠে যায় নি।

ডোল দেওয়ার পর যে টাকা বেঁচেছে সেগুলো একটা বেতের বাক্সে পুরে তালা আঁটল পালসাহাব। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'এ রসিক শীল, এ যুগেন, এ বুড্‌টী, এ বুড্‌ঢা, এ জওয়ান, এ জওয়ানী—'

তিনটে মাস এক সঙ্গে এই দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে মানুষগুলো বুঝে ফেলেছে, চিল্লাচিল্লি করাটা পালসাহাবের স্বভাব। কথায় কথায় সে বলে, 'শালে লোগ'। শব্দ দু'টো তার কথার মাত্রা। খিস্তি করাটা তার অভ্যাস।

পালসাহাবের চিল্লানিতে মানুষগুলো খাড়া হয়ে বসল।

পালসাহাব বলতে লাগল, 'অন্য সব সালে এর আগেই বারিষ নামে। লেকিন এ বছর আশমান যে কী মতলব করেছে—' কথাটা পুরো না করেই সে থেমে গেল।

জটলার মধ্য থেকে হারান উঠে দাঁড়াল। বলল, 'একটা কথা কমু পালসাহাব?'

'কী?' ফেল্ট হ্যাটটা কপালের ওপর তুলে পালসাহাব জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'মাটি তো কুপাইলাম, ঘর বানাইলাম। জল তো নামে না। বীজদানা রুইতে পারি না। অহন কী করুম? বিষ্টির আশায় কয়দিন বইসা থাকুম?'

'আরে হারামী—ইধর আয়—'

ভয়ে ভয়ে পালসাহাবের কাছে এসে দাঁড়াল হারান।

হারানের একটা হাত ধরে সস্নেহে পালসাহাব বলল, 'আমিও তো একই বাত ভাবছিলাম। তোদের সাথ একটা পরামর্শ করব। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।'

'কী মতলব?' সামনের লোকগুলো একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

'সবুর শালেরা, সবুর—' পালসাহাব ধমকে উঠল। পরক্ষণেই নরম গলায় শুরু করল, 'তামাম জিন্দেগী ডোলের ওপর ভরসা করে বাঁচা যায় না। সরকারি ভিক্ষের ওপর দো রোজ, দশ রোজ, বড় জোর এক সাল, দো সাল চলে। কী বলিস তোরা?'

'হ। হে তো ঠিকই।' সকলে সায় দিল।

'হাত আছে, পা আছে, মগজ আছে, বুদ্ধি আছে, খাটবার তাগদ আছে, তবে ভিক্ষে করে জিন্দেগী চালাবি কেন?'

'ঠিক কথা।' মানুষগুলো মাথা নাড়ে।

'মানুষ হয়ে জন্মেছিস, মানুষের মাফিক বাঁচবি।' বলে একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিল পালসাহাব। তারপর বলতে লাগল, 'কিসমতের দোষেই হোক আর যাতেই হোক, তোরা ঘরবস্তি হারিয়েছিস। এই জাজিরাতে এসে আবার ফিরেও পেয়েছিস। কেমন কিনা?'

'হ পালসাহাব—'

'এখানেই তোদের নয়া জিন্দেগী বানিয়ে নিতে হবে।' সবার মুখের ওপর দিয়ে, চোখদু'টো একবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেল পালসাহাব। বলতে লাগল, 'শোন শালেরা, আমার মাথায় কী মতলব এসেছে।'

'ক'ন—'

'মাহিনা খতম হলেই তোরা ক্যাশ ডোল পাস। পাস কিনা?'

'হ, পাই।'

'আসছে মাহিনা থেকে ক্যাশ ডোল আর পাবি না।'

মানুষগুলো আঁতকে উঠল, 'ক্যাশ ডোল না পাইলে খামু কী? অহনও জল নামল না, বীজ রুইলাম না, ফসল ফলল না। ডোল না পাইলে না খাইয়া মরতে হইব।'

পালসাহাব জবাব দিল না। তার চোখ দু'টো সামনের মানুষজন, দূরের কুয়াশা, আরো দূরের আবছা জঙ্গল পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

মাস যেই কাবার হয়, কানুন অনুযায়ী এই মানুষগুলো সরকারি ডোল পায়। পালসাহাব লক্ষ করে দেখেছে, সেটেলমেন্টের বেশির ভাগ লোকই এই খয়রাতের ওপর নির্ভর করে থাকে। ডোল পাওয়ার ভরসা আছে বলেই তার মনে হয়, মানুষগুলো যতটা প্রয়োজন ততটা খাটে না। কিন্তু ভাঙাচোরা বিকল জীবনকে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে ফের গড়ে তুলতে হলে এই মানুষগুলোকে আরো খাটতে হবে। এরা মাটি কুপিয়েছে, জমি বানিয়েছে, ঘর তুলছে, সবই ঠিক। কিন্তু এই তো সবে শুরু। আরো চাই। আরো ঘাম, আরো শ্রম।

শুধু শ্রম আর ঘামই কী? আরো বহু কিছুই চাই। পদ্মা-মেঘনা পারের মাটি খুইয়ে এসে মানুষগুলো এই দ্বীপটাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। পালসাহাব তা জানে। কিন্তু মাটির প্রতি ভালবাসাই তো শেষ কথা নয়। এই দ্বীপে এসে পায়ের তলায় যে আশ্রয় তারা পেয়েছে, বাঁচার জন্য সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তা আঁকড়ে ধরতে হবে।

অনেক কষ্টের পর তারা এই দ্বীপ পেয়েছে। অফুরান বঙ্গোপসাগরের নোনা জল ঠেলে এসে এই মাটি মিলেছে। এই মাটির জন্য আরো তাপ, আরো মমতা চাই। পালসাহাব ভেবেছে, এই মানুষগুলোর মন আরো দ্বীপমুখী করে দিতে হবে।

শুধু কি দ্বীপমুখী? এদের জীবনমুখী না করা পর্যন্ত যে তার শান্তি নেই, তার থামা চলবে না। তার সব স্বপ্ন, সব আয়োজনই তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পালসাহাব জানে, এই মানুষগুলো তার ইচ্ছায় চলে, ফেরে, ওঠে, বসে। তার ধমকে খায়, ঘুমোয়। দু'চার জন ছাড়া বাকি সকলেই কেমন যেন ঠান্ডা, নির্জীব, বিকল। কিন্তু এমন করে, এই নিস্তেজ মানুষগুলোকে সম্বল করে, এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তো জীবন গড়া যায় না।

পালসাহাবের মনের গঠনটা অদ্ভুত। নিজের নিয়মে সে এই উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবেছে।

দেশভাগ এই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে সাতপুরুষের ভিটেমাটি, জমিজিরেত থেকেই শুধু উৎখাত করে নি, সুস্থ সহজ স্বাভাবিক জীবন থেকেও উন্মূল করে দিয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে ভাসতে ভাসতে তারা পশ্চিম বাংলার সরকারি ত্রাণ শিবিরে এসে মাথা গুঁজেছিল। ন' দশ বছর ক্যাশ ডোল অর্থাৎ গভর্নমেন্টের খয়রাতের ওপর তারা বেঁচে ছিল।

দেশভাগ তাদের ঘরছাড়া করেছে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বছরের পর বছর কাটিয়ে তারা অনেক কিছু খুইয়েছে। মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে মোটামুটি জীবনের যে ধর্মগুলো মেনে চলতে হয়, ক্যাম্পে এসে সেগুলো তারা হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাম্প তাদের ক্যাশ ডোল, অর্থাৎ ভিক্ষের ওপর নির্ভর করতে শিখিয়েছে। নিজের খাদ্য যে নিজেকে জুটিয়ে নিতে হয়, নিজের জীবন যে নিজের নিয়মে গড়ে তুলতে হয়, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে সব কিছুই যে নিজেকে অর্জন করতে হয়, জীবনের এই সোজা, মোটা দাগের কাথাটা তারা ভুলে গিয়েছে। খয়রাতের ওপর নির্ভর করাটা এদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

পালসাহাব লক্ষ করে দেখেছে, সেটেলমেন্টের দু' চারজন বাদ দিলে বাকি সবাই তার তাড়ায় জমি কুপিয়েছে, মাটি চৌরস করেছে, ঘর বানিয়েছে। সে জোর না করলে এসব ওরা করতই না। আসলে ওরা জানে, মাস কাবার হলে ক্যাশ ডোল তো মিলবেই। এমন একটা মনোভাব মানুষগুলোর মধ্যে কাজ করে। তা হলে আর খাটি কেন?

পালসাহাব ভেবেছে, এদের ঘা দিতে হবে। সরকারি খয়রাতের ওপর এদের নির্ভরতা, নিশ্চিন্ততা ঘুচিয়ে দিতে হবে।

ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেবে পালসাহাব। ভিক্ষের ওপর এই মানুষগুলো বেঁচে থাকুক, সে তা চায় না।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল পালসাহাব। হঠাৎ সেটা ছুটে গেল।

মশাল চারটে টিমিয়ে টিমিয়ে জ্বলছে। কুয়াশা আর অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হচ্ছে। আবছা আলোতে মানুষগুলো এখনো বসে রয়েছে। ঠিক বসে নেই, অনুচ্চ ভোঁতা চাপা গলায় তারা কাঁদছে।

ফেল্ট হ্যাটটা মাথায় ঠিক করে বসাল পালসাহাব। মোটা ভুরু দু'টো কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোখের বাদামি রঙের ঘোলাটে মণি দু'টো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। নাকের ডগাটা ফুলতে লাগল। নাকের ফুটো থেকে পাঁশুটে রঙের রোঁয়া বেরিয়ে পড়েছে; সেগুলো নড়তে লাগল। পালসাহাব উত্তেজিত হলে রোঁয়াগুলো নড়তে থাকে। রোমশ চওড়া বুকের ওপর থাপ্পড় মেরে পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'এ শালে ভেড়ীর বাচ্চারা, কাঁদছিস কেন?'

মুহূর্তে কান্নার শব্দটা থেমে গেল।

পালসাহাব গজ গজ করতে থাকে, 'শালে লোগদের খালি কান্না আর কান্না। পয়দা হবার পর কুত্তাগুলো খালি কাঁদতেই শিখেছে।'

কান্নাটা থেমে এসেছিল। কিন্তু একটু পর ফের শোর তুলে সবাই কাঁদতে শুরু করল।

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল পালসাহাব। সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে চিল্লাল, 'আবার, আবার! যে শালে কাঁদবে, তাকে কোতল করে ফেলব।'

ভিড়ের ভেতর থেকে রসিক শীল উঠে দাঁড়ায়। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'কান্দুম না তো কী করুম? আমাগো কপালই হইল কান্দনের। হা ভগমান—'

'এ কুত্তা, যা বলবি সিধা করে বল। অত ভ্যাজর ভ্যাজর আমি শুনতে চাই না। বল—'

পালসাহাবের মারমুখী চেহারা দেখে রসিক ভয় পেয়ে গেল। যা বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এবার আর পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল না। রসিক শীলের পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ডর নেই।' ডাইনে বাঁয়ে দু'পাশে মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে বলতে লাগল, 'যা বলতে চাস বলে ফ্যাল।'

রসিক শীল ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, বলবে কিনা। কথাটা শুনে পালসাহাব যদি খেপে ওঠে? বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে একসঙ্গে এতগুলো দিন কাটিয়েও তারা এই লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কখন কোন কথায় যে সে রেগে উঠবে, কোন ব্যাপারে যে তার মেজাজ খুশি থাকবে, আগে থেকে তার হদিস মেলে না।

রসিক শীলের মনের কথাটা বুঝি পড়েই ফেলল পালসাহাব। তার দাড়ি গোঁফে ভরা মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফুটল। সে বলল, 'মেজাজটা আমার বহুত বেতর্বিয়ৎ। সে জন্যে ঘাবড়াবি না—সমঝাচ্ছিস?'

বিড় বিড় করে রসিক শীল কী যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না। তার ঠোঁট দু'টো কাঁপতে লাগল।

পালসাহাব তাড়া লাগায়, 'বলে ফ্যাল, বলে ফ্যাল—জলদি কর—'

কাঁপা কাঁপা গলায় রসিক শীল শুরু করল, 'সাহাব বাবা, আমি কই কি ক্যাশ ডোল বন্ধ হইয়া গেলে খামু কী?'

'খাবি কী?' পালসাহাব যতই ভেবেছিল, মেজাজ খারাপ করবে না, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ভেংচে ভেংচে সে বলল, 'কী আর খাবি? আশমানের হাওয়া আর কিলপঙ নদীর পানি গিলে জান বাঁচাবি। আর কুছু মিলবে না। শালে লোগদের স্রিফ খাওয়ার কথা। দুনিয়ায় খাওয়া ছাড়া আর কোনো চিন্তাই যেন নেই। কুত্তা কাঁহাকা, হারামী কাঁহাকা—' এক দমে বিশ পঁচিশটা খিস্তি আউড়ে যায় পালসাহাব।

সামনের মানুষগুলো এক একবার শোর তুলে কেঁদে ওঠে। আবার তাদের কান্নাটা ঝিমিয়ে পড়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কান্নার শব্দ শুনল পালসাহাব। জোরে জোরে বাতাস টেনে ফুসফুস ভরাল। তারপর বলল, 'কাঁদিস না, কাঁদিস না—বাত শোন। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। হাঁ হাঁ, তোদের ভুখা যাতে মরতে না হয় তার মতলব—'

মানুষগুলো কান খাড়া করে বসল। পালসাহাব বলতে লাগল, 'এই জাজিরার জঙ্গলে হরিণ আর শুয়োর আছে। মেরে মেরে খাবি। খাবার পর যে গোস্ত বাঁচবে, মাযাবন্দরে আমি বেচে দেব। হরিণের ছাল আর শিং পুট বিলাসে (পোর্ট ব্লেয়ার) নিয়ে বিক্রি করে আসব। তাতে তোদের ভাল রোজগার হবে। হবে কিনা?'

মানুষগুলো ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

'আরো ধান্দা আছে।' পালসাহাব রোজগারের অনেক উপায় বাতলে দেয়।

ধানের জমির পাশ দিয়ে সরু একটা খাল এঁকে বেঁকে পাক খেতে খেতে সোজা এরিয়াল উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। ডিগলিপুরের খাল।

বছরের সব ঋতুতে ডিগলিপুরের খালে মাছ মেলে। নানা জাতের সামুদ্রিক মাছ। পার্শে, সুরমাই, তারিনি, মায়া, লাল ভেটকি, পমফ্রেট—নোনা জলের মিঠে মাছ।

ব্যবস্থা হল, জঙ্গল থেকে প্যাডক গাছ কেটে তক্তা বানিয়ে নৌকো তৈরি করবে মানুষগুলো। পালসাহাব মায়াবন্দর থেকে সুতো কিনে আনবে। সেই সুতোয় জাল বুনে তারা ডিগলিপুরের খালে নৌকো ভাসাবে। মাছ মারবে। খাওয়ার পর যে মাছ বাঁচবে, সে সব মায়াবন্দরে বেচে আসবে পালসাহাব। এই দ্বীপের যেখানে যেটুকু পাওয়া যায়—কাঠ মাছ হরিণ শুয়োর—সব কিছুই নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে কাজে লাগাক তারা, পালসাহাবের এটাই ইচ্ছা।

শুধু কি হরিণ শুয়োর আর মাছ মারা, জীবিকার অন্য ফিকিরও পালসাহাবের মাথায় এসেছে। হঠাৎ সে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'এ বিন্দ্রাবন (বৃন্দাবন) শীল, মুলুকে থাকতে কী কাম করতি?'

'নাপিতের কাম।' একটা লোক উঠে দাঁড়িয়ে জানালো।

এবার অন্য একটা লোককে ডাকল পালসাহাব। 'এ মহিন্দর, তুই কী করতি?'

'সাহেব বাবা, আমি ছুতার মিস্তিরি আছিলাম।'

একে একে সকলের খবর জেনে নিল পালসাহাব। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসার আগে কেউ ছিল ছুতোর, কেউ সোনারু, কেউ কামার, কেউ নাপিত, কেউ জেলে, কেউ মালাকার। নানা বৃত্তি, নানা পেশার সব মানুষ।

পালসাহাব মনে মনে একবার ভাবল, আপাতত এত পেশার কাজ এই দ্বীপে মিলবে না। কিন্তু যাদের কাজ মিলবে, তাদের কিছুতেই সে বসিয়ে রাখবে না।

পালসাহাব বলল, 'আসল বারিষ আসতে দেরি আছে। এত রোজ বসে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া খালি মিট্টির ওপর ভরসা করলেই তো হবে না, রুজির অন্য সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

পালসাহাব সব বন্দোবস্ত করে দিল। যতদিন এই দ্বীপে বর্ষা না নামে, ততদিন একদল মাছ মারবে, হরিণ-শুয়োর মারবে। আর এক দলকে নিয়ে শহর পোর্ট ব্লেয়ার যাবে পালসাহাব। সেখানে নানা কাজে তাদের লাগিয়ে দেবে। আসল কথা, সকলকে নিজের নিজের রুজি রোজগার করে নিতে হবে।

ক্যাশ ডোল বন্ধের নাম শুনে মানুষগুলো সাঙঘাতিক ভয় পেয়েছিল। পালসাহাবের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে তারা আবার ভরসা পেয়েছে। নতুন আশায় তাদের চোখগুলো চকচক করতে থাকে।

পালসাহাব বলে, 'কি রে, সবাই কাম করবি তো? রাজিবাজি?'

মাথা নেড়ে সবাই সায় দেয়। তারা রাজি।

উনিশ

এখন আর ট্রানজিট ক্যাম্প নয়। ঘর তুলে মানুষগুলো গৃহী জীবন ফিরে পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে পুরোদস্তুর ঘর-সংসার পাতার উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে।

হারান আর হারানের ঠাকুমা উজানী বুড়ি, এই দু'জনকে নিয়ে একটা আস্ত সংসার।

দু'জনের সংসারের নানা টুকিটাকি কাজ সেরে দু'টি ভাত ফোটাতেই দিন কাবার করে ফেলে উজানী বুড়ি। হাত তার চলতেই চায় না। চলবেই বা কেমন করে? বয়স কি কম হল? তিন কুড়ি পুরিয়েও আরো দশ বছর বুঝি পার হতে চলল। সঠিক হিসেব বুড়ি রাখে না।

কাঠ বাঁশ পেরেক দড়ি, সরকারি নানা সরঞ্জাম পেয়ে হারান একখানা মাঝারি আকারের দোচালা ঘর তুলেছে।

বেতপাতার পুরু ছাউনি, চারপাশে ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া, নিচে মাটি থেকে হাত দুই উঁচু বাঁশের পাটাতন। পাটাতন না করে উপাই নেই। রাজ্যের পোকামাকড়, সাপ-বিছে-জোঁক তা হলে ঘুরে ঢুকে পড়বে।

ঘরটার সামনের দিকে এক টুকরো সমতল জমি। সেখানে বুক সমান উঁচু চেঁচা ঘাস গজিয়ে ছিল। ঘাস সাফ করে ফেলেছে হারান। মাটি নিকিয়ে উঠোন তকতকে করে তুলেছে উজানী বুড়ি।

উঠোনের এক ধারে শুকনো পাতা, গাছের ডাল আর কাঠ ডাঁই-করা। আর এক ধারে একটা দো-আখা (দু'মুখো উনুন) বানানো হয়েছে।

সেই দুপুরে ভাত চাপিয়েছে উজানী বুড়ি। ভাত আর ফোটে না। এদিকে বেলা প্রায় হেলতে চলেছে।

ক্যাশ ডোল পেয়ে লাল লাল, মোটা মোটা চাল এনেছিল হারান। সহজে আর সেদ্ধ হতে চায় না।

আখার মুখে শুকনো পাতা আর সরু সরু ডাল গুঁজে দিচ্ছে উজানী বুড়ি। আর বিড় বিড় কবে কী যেন বকছে।

গায়ের ঢিলে চামড়া কুঁচকে কুঁচকে গিয়েছে তার। গাল ভেঙে তুবড়ে রয়েছে। হনুর হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। পাটের ফেঁসোর মতো এক মাথা চুল। দুই মাড়িতে গোটা সাতেক কালো কালো ভাঙা দাঁত। সবসময় মাথাটা অল্প অল্প কাঁপে। পিঠটা বেঁকে কুঁজের মতো দেখায়। যত সে কথা বলে, তার চেয়ে ঠোঁট দু'টো অনেক বেশি নড়ে।

ভাত ফুটতে ফুটতেই হারান এসে পড়ল।

জল-কাদা মেখে হারানের মূর্তি যা খুলেছে! গোঁজের খোঁচা খেয়ে গায়ের চামড়া অনেক জায়গায় কেটে গিয়েছে। ফলে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ঘাড়ের কাছে দু'টো জোঁক লেগে রয়েছে। হারানের ভ্রূক্ষেপ নেই।

উঠোনের এক কোণে জাল আর একটা মাঝারি আকারের সুরমাই মাছ নামিয়ে রাখল হারান।

পালসাহাবের ব্যবস্থা অনুযায়ী জনকয়েক পোর্ট ব্লেয়ারে রোজগারের খোঁজে গিয়েছে। হারান এই দ্বীপেই আছে। মাছ মারাই এখন তার কাজ। সেই সকালে ডিগলিপুরের খালে গিয়েছিল। দুপুর পর্যন্ত জাল বেয়ে বেয়ে বিস্তর মাছ মেরেছে। খাওয়ার মতো একটা সুরমাই মাছ হারানকে দিয়ে বাকি সব মাছ নিয়ে মায়াবন্দরে বেচতে চলে গিয়েছে পালসাহাব।

চোখে মাছের আঁশের মতো পুরু ছানি। ভুরুর ওপর একটা হাত রেখে উজানী বুড়ি বলল, 'কে রে, হারাইনা আইলি?'

'হ, ঠাউরমা—'

'কী চাউল যে কিনা আনছস! হেই কুন দুফারে আখায় বহাইছি, ফুটতেই চায় না।'

হারান কিছুই বলল না। বাঁশের খুঁটিতে জাল টাঙিয়ে শুকোতে দিল।

রোদের তেজ মরে আসছে। জঙ্গলের দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ছুটেছে। উজানী বুড়ির শীত শীত লাগে। এই বয়সে রক্তের আগুন জুড়িয়ে যায়। ভেতর থেকে তাপ না পেলে শরীর কি গরম রাখা যায়! সিঁটানো হাত-পা আখার পাশে রাখে উজানী বুড়ি। গনগনে আগুনের উত্তাপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেঁকতে সেঁকতে বিড় বিড় করতে থাকে, 'আর পাবি না। কুন সোময় ভাত ফুটব, কুন সোময় মাছ রান্ধুম আর কুন সোময় যে হারাইনারে খাইতে দিমু—'

উঠোনের আরেক ধারে বসে ডলে ডলে গায়ের কাদা তুলছিল হারান।

উজানী বুড়ি ডাকল, 'হারাইনা—'

'কী ক'স?'

'এহানে আয় দেখি—'

উঠে এসে উজানী বুড়ির পাশে বসল হারান।

ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল উজানী বুড়ি। নাতির মুখটা দেখে নিল। কথাটা বলবে কি বলবে না, একবার ভাবল।

হারান বলল, 'কিছু কইতে চাস ঠাউরমা?'

'হ।' কিভাবে শুরু করবে, মনে মনে একবাব তা ভেঁজে নিল বুড়ি। তারপর বলল, 'বুঝলি সোনা ভাই, এই আন্ধারমান দ্বীপে আইসা আমরা মাটি পাইলাম।'

হারান বলল, 'হে তো পাইলাম।'

'ঘর পাইলাম।'

'হ। হেইতে হইছে কী?'

'আগে শোন। জমিনে এইবার ধান ফলব। ধান হইলে আর ভাবনা নাই। আমরা না খাইয়া মরুম না।'

হারান বিরক্ত হয়ে উঠল, 'এই কথা তো দুই বচ্ছরের একটা ছাও জানে।'

'হ হ, এই কথা হগলে জানে।' বলে একটু থামে উজানী বুড়ি। শুকনো ফোকলা মুখে অল্প হাসে। কালচে মাড়ি দু'টো বেরিয়ে পড়ে। সে বলতে থাকে, 'আর একখান কথা আছে রে দাদা। হেইটাই আসল।'

'তরাতরি কইয়া ফালা—'

'হ, কই।' উজানী বুড়ি বলল, 'ঘর বসত, জমিজিরাত, হগলই যহন ফিরা পাইলাম, এইবার আমার মনের সাধখান মিটাইয়া দে ভাই। কয়দিন আর বাচুম। বুড়া হইছি, কুর্নদিন দেখবি, উজানী বুড়ি চোখ বুজছে।'

'তর মতলবখানা কী ঠাউরমা?' চোখ কুঁচকে বুড়ির দিকে তাকাল হারান।

'একা একা আর দিন কাটে না। এইবার আমারে এট্টা সতীন আইনা দে। দুই সতীনে মনের সুখে চুলাচুলি করি।'

'কী ক'স ঠাউরমা! তর মাথাখান কি খারাপ হইল!'

'ক্যান রে ভাই?' হারানের পাশে আরো ঘন হয়ে বসল উজানী বুড়ি। বলল, 'আমার মাথা খারাপ হইব ক্যান? মাথা আমার ঠিকই আছে। তুই এট্টা বিয়া কর হারান। বুড়া বয়েসে নাতিন বউ লইয়া এট্টু লাড়াচাড়া করি।' বলতে বলতে হঠাৎ দু'হাতে চোখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল উজানী বুড়ি।

হারান ভয় পেয়ে গেল। বুড়ির কান্না একবার শুরু হলে সহজে থামতে চায় না। নরম গলায় সে বলল, 'কান্দিস না ঠাউরমা—'

চোখ থেকে হাত সরিয়ে এবার কপাল চাপড়ায় উজানী বুড়ি। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে আর বলে, 'কী আছে আমার? স্বজন নাই, বান্ধব নাই, পুত নাই, পুতের বৌ নাই। হগলেরে খাইয়া বইছি। আমি শুগাতাপা (শোকতাপ-পাওয়া) মানুষ। পিরথিমীতে কেউ নাই আমার। থাকার ভিত্‌রে তুই এট্টা মাত্তর নাতি। তুই যদি আমার সাধটা না মিটাস, কে মিটাইব? আর কে আছে?'

'অবুঝ হইস না ঠাউরমা, উতলা হইস না—' উজানী বুড়ির একটা হাত ধরে হারান। তারপর উদাস গলায় বলে, 'অহনও ধান ফলল না, প্যাটের চিন্তা ঘুচল না। পালসাহাব ক্যাশ ডোল বন্ধ কইরা দিব পরের মাস থিকা। দুইটা প্যাটই ভরাইতে পারি না। এইর মইধ্যে আর একখান প্যাট আইয়া জুটলে উপাস দিয়া মরতে লাগব।'

হঠাৎই কান্না থামাল উজানী বুড়ি। বলল, 'আ আমার কপাল, তুই প্যাটের চিন্তা করস নিকি (নাকি)! ভগমান যহন প্যাট দিছে, হেই প্যাট ভরানের ব্যাবোস্তাও কইরা দিব।' হারানকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সে বলল, 'কী ভাবস রে সোনা? কার কথা?'

'কিছুই না, কারো কথাই না।' বলেই চুপ করল হারান।

উজানী বুড়ি এবার আসল কথাটা পাড়ল, 'বুঝলি ভাই, আমি তর কুনো আপত্তি শুনুম না। জষ্ঠি মাসে তর বিয়া লাগাইয়া দিমু। শোন ভাই—'

'কও—'

'চন্দর আইছিল।'

'কুন চন্দর?'

'চন্দর জয়ধর। হেই যে গোয়ালন্দ থিকা এক গাড়িতে আমরা কইলকাতায় আইছিলাম। এক লগে কেম্পে নয় দশ বচ্ছর কাটাইলাম। এক জাহাজে আন্ধারমান দ্বীপে আইলাম। মনে নাই?'

'আছে।'

'চন্দরের মাইয়া পাখি—' খাকারি দিয়ে ঘড়ঘড়ে গলাটা সাফ করে নিল উজানী বুড়ি। এক নাগাড়ে বলতে লাগল, 'পাখি তো বড়সড়, বিয়ার যুইগ্য হইয়া উঠছে। বড় ভাল মাইয়া—সোন্দর মাইয়া—'

'ভাল তো ভাল। সোন্দর তো সোন্দর। এই হগল আমারে শুনাইয়া কী হইব?'

'তরে শুনামু না তো শুনামু কারে? তেমুন বান্ধব পামু কই? পাখিরে আমি সতীন করুম।'

'থাম বুড়ি—' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হারান। চেঁচাতে লাগল, 'আমি উই পাখি পুখিরে বিয়া করুম না।'

'তবে কারে বিয়া করবি রে শুয়োরের ছাও? উই রাইক্ষসীরে?' উত্তেজিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল উজানী বুড়ি।

খানিকক্ষণ থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল হারান। কাপাসীর কথাটা তবে কি জেনে ফেলেছে ঠাকুমা?

উজানী বুড়ি চিলের মতো চেঁচাতে লাগল। গলার শিরাগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে উঠেছে। তীক্ষ্ণ, খ্যাসখ্যাসে শব্দ করে সে বলতে লাগল, 'শুয়োরের ছাও, কথা ক'স না ক্যান? মনে করছস, আমার কান নাই, কিছুই শুনি না। মনে করছস, আমার চৌখ নাই, কিছুই দেখি না। আমার মন নাই, কিছুই বুঝি না। বয়েস হইছে, তাই মনে করলি, আমি হগল খুয়াইছি। কিছুই খুয়াই নাই। হ রে বান্দর, কিছুই খুয়াই নাই।' পাটের ফেঁসোর মতো রুক্ষ চুল উজানী বুড়ির। সেই চুল উড়ে এসে মুখটা ঢেকে ফেলেছে। ছানিপড়া ঘোলাটে চোখ দু'টো ধক ধক করছে। বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছে। শুকনো ঢিলে স্তন দু'টো দুলছে। উত্তেজনায় বাঁকা, দুমড়নো, ছোট শরীরটা থর থর কাঁপছে।

উজানী বুড়ির উগ্র, ভয়ানক মূর্তির দিকে তাকিয়ে হারান তিন পা পিছিয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, 'কী জানস তুই?'

'হগল জানি—' উজানি বুড়ি বলতে থাকে, 'আমি ক্যান, এই আন্ধারমান দ্বীপের হগলে জানে। উই লষ্ট কুচরিত্তির মাগীটার লগে তর ঢলাঢলি—'

ঠাকুমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হারান রুখে উঠল, 'চুপ মার মাগী। না হইলে তরে শ্যাষ কইরা ফালামু। লষ্ট, কুচরিত্তির তুই কারে ক'স?'

'কারে আবার রে ড্যাকরা! তর পরানের বান্ধবরে। উই নিত্য ঢালীর মাইয়া কাপাসীরে। নাম তো কইলাম, এইবার জোকের মুখে লবণ পড়ল। কথা ক'স না ক্যান রে যমের অরুচি? মাথায় কি ঠাটা (বাজ) পড়ল!'

'তুই তারে লষ্ট ক'স ঠাউরমা, কুচরিত্তির ক'স!' বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকে হারান। উজানী বুড়ি যে কাপাসী সম্পর্কে এভাবে বলবে, শুনেও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সে।

'যার শরীল লষ্ট হইয়া গেছে তারে কুচরিত্তির কমু না? একশ' বার কমু। কী করবি তুই? যার মুখ আছে হে এই কথা কইব। উই মাগী লষ্ট, দুষ্ট, কুচরিত্তির—' একটু থেমে কী যেন ভেবে নিল উজানী বুড়ি। তারপর হঠাৎ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল, 'আমার সোনা দাদা, লক্ষ্মী ভাই, তুই উই রাইক্ষসীর কথা ভুইলা যা। ও তর মাথা খাইছে। আমার সব্বনাশ করছে। সব্বনাশী মাগী।'

উজানী বুড়ির কান্নার শব্দ হারানের কানে ঢুকছিল না। বিমর্ষ গলায় বলে, 'শরীলটা তার লষ্ট হইছে ঠিকই, কিন্তুক হেইতে তার দুষ কই?'

হঠাৎই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল উজানী বুড়ি, হঠাৎই আবার কান্নাটা থামিয়ে দিল। একদৃষ্টে হারানের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝে নিল। তারপর টেনে টেনে বলতে লাগল, 'পরাণের বন্দুরে লষ্ট কইলে কুচরিত্তির কইলে বড় লাগে, বুকে জ্বালা ধইরা যায়!'

হারান এবার আর কিছু বলল না।

উজানী বুড়ি গলা চিরে চেঁচাতে লাগল, 'কিন্তুক তা হইব না। পরান থাকতে আমি তা হইতে দিমু না।'

চিৎকার করে উঠল হারান, 'হইব হইব, এক শ' বার হইব। আমার মনে যা আছে হেয়া করুম। পারলে তুই আমারে ঠেকাইস মাগী—'

'ওরে বিয়া করবি? তা হইলে তর মনের সাধই মিটাবি? উই লষ্ট পাগল মাগীটারে ঘরে আনবি?' উজানী বুড়ির চোখ দু'টো ধক ধক করতে লাগল।

হারান সমানে চেঁচায়, 'হ—হ, কাপাসীরেই আমি বিয়া করুম। তারে এট্টু ভাল হইতে দে—'

হারানের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল উজানী বুড়ি। উপুড় হয়ে শুয়ে দু'হাতে চুল ছিঁড়তে, মাটিতে মুখ ঘষতে আর কপাল ঠুকতে লাগল। বলতে লাগল, 'তর মনে যা আছে, কর। তর সাধই মিটা রে শয়তানের ছাও। তার আগে আমারে মার, আমারে শ্যাষ কর। হেইর পর উই মাগীর কাছে যা। ভগমান গো, তুমার মনে এই আছিল! সব্বনাশী আমার সব্বনাশ কইরা ছাড়ল!'

উজানী বুড়ি র কান্না উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল।

কুড়ি

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে পালসাহাব যেন জীবন-রসিক হয়ে উঠেছে।

এখন দুপুর।

এতদিনে আন্দামানের আকাশে মেঘ আসতে শুরু করেছে। নৈর্ঋত কোণ থেকে মৌসুমি বাতাসের তাড়া খেয়ে পোড়া তামা রঙের টুকরো টুকরো মেঘ এই দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে।

সেটেলমেন্টের মধ্যে দিয়ে অলস, লক্ষ্যহীন গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পালসাহাব। মনটা আজ ভারি হালকা হয়ে রয়েছে। এই দুপুর, উজ্জ্বল রুপোলি রোদ, চারপাশের ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল—আজ সব কিছুই ভাল লাগছে।

অকারণে, নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়েও এক এক সময় মনটা বড় খুশি হয়ে ওঠে। চলতে চলতে মুখ তুলে একবার আকাশের মেঘ দেখে নিল পালসাহাব। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।

অন্য সময় হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে মেতে উঠত পালসাহাব। কিন্তু এই মুহূর্তে মেঘের ভাবনাটা মনের মধ্যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। অন্য একটা চিন্তা পালসাহাবকে পুরোপুরি দখল করে বসল।

মা-তিনকে নিয়ে সেই পোর্ট ব্লেয়ার থেকে লং অ্যাইল্যান্ড এসেছিল পালসাহাব, তারপর পনেরটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। এতগুলো বছরের মধ্যে মাত্র বারকয়েক পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছে সে। জঙ্গলে থেকে থেকে শহর বন্দরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

এতকাল এই অরণ্যের বাইরে সভ্য মানুষের জগতে কোথায় কী ঘটছে, সে সব সম্বন্ধে আদৌ মাথাব্যথা ছিল না পালসাহাবের। শহর বন্দরের কোনো খবরই রাখত না সে। আসলে বাইরের জগতের কোনো ব্যাপারে এতটুকু কৌতূহল ছিল না তার।

পালসাহাবের স্বভাব অমার্জিত হলেও তার মধ্যে প্রচুর নিরাসক্তি মিশে আছে। এই উদাসীনতা আর জঙ্গলের আদিম জৈবিক নিয়মের খাত বেয়ে জীবনটাকে সে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে ছিল আন্দামানের আদিম অরণ্য। ঝুপড়িতে ছিল মা-তিন। অরণ্য তাকে দিয়েছে আদিমতা, মা-তিন দিয়েছে স্থূল আর জৈবিক জীবনের আস্বাদ। মা-তিন আর এই দ্বীপের বনভূমিকে নিয়ে এক ফুৎকারে জীবনের এতগুলি বছর উড়িয়ে দিয়েছে পালসাহাব। এক আদিম নারী আর আদিম অরণ্য পালসাহাবকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।

হয়তো মা-তিন আর অরণ্যকে নিয়ে মসৃণ নিয়মেই সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারত সে। কিন্তু একদিন তাল কাটাল। বছর কয়েক আগে একবার পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছিল পালসাহাব। পুরনো আমলের দোস্ত ইদ্রিস-রোশনলাল-সাহা-হামিদ, যাদের সঙ্গে সেলুলার জেলে কয়েদ খেটেছে, তাদের জনকয়েকের সঙ্গে জাহাজ ঘাটেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাদের একসঙ্গে ওখানে দেখে পালসাহাবের কেমন যেন ধন্দ লেগেছিল। কথাবার্তা বলে মনে হয়েছিল, ইদ্রিসরা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। তাদের হালচালের সঙ্গে তার যেন খাপ খায় না।

পোর্ট ব্লেয়ার ঘুরে এসে পালসাহাব বুঝেছিল, সেই আগের শহরটা আর আগের মতো নেই। একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।

পুরনো শহরে এখানে ওখানে জঙ্গল ছিল। জঙ্গল সাফ হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে পাক খেয়ে আঁকাবাঁকা নতুন নতুন সড়ক নানা দিকে ছুটেছে। নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। এবারডিন বাজারে, ফুঙ্গি চাউঙ্গে, ডিলানিপুরে, হ্যাডো আর চৌলদারিতে জমজমাট বসতি গড়ে উঠেছে। একটা জটিল ধাঁধার মধ্যে যেন গিয়ে পড়েছিল পালসাহাব।

শুধু কি শহরটা, সেখানকার হালচাল, জমানা, কেতা, মানুষজন সবই বদলে গিয়েছে।

হঠাৎই পালসাহাবের মনে হয়েছে, ওই শহর আর মা-তিন এবং জঙ্গলকে নিয়ে তার যে জীবন—এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দুইয়ের মধ্যে কোনো মিল নেই। মনে হয়েছিল, শহরটা কারসাজি করে তাকে অনেক পেছনে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

ওই শহরটা যেমন আজব এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, ওখানকার খবরগুলোও ঠিক তেমনি। অন্য বন্ধুরা, যারা একদিন তাকে দেখলে মেতে উঠত, প্রচুর কথা কইত, প্রচুর খিস্তি করত, তামাশা আর হল্লায় মশগুল হয়ে পড়ত, তারা পালসাহাবের সঙ্গে দু' চার কথা বলেই সরে পড়ল। তাদের নাকি হরেক কাজ, হরেক হুজ্জুত, বহু ঝামেলা। পুরনো দিনের সেই তাপ আর নেই। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

শুধু ইদ্রিসই পুরনো দোস্তের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল। তার হাল হকিকতের খবর নিয়েছিল আর অদ্ভুত অদ্ভুত খবর দিয়েছিল, 'বুঝলি ইয়ার, তুই তো জঙ্গলে জিন্দেগী খতম করছিস। এদিকে কী হচ্ছে শুনেছিস?'

'কী?' সভ্য দুনিয়ার কোনো খবরই জানে না পালসাহাব। কেউ প্রশ্ন করলে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আজাদী আসছে।' ইদ্রিস বলেছিল।

'আজাদী কৌন চিজ? কোন জাহাজে আসছে?'

'আ রে নালায়েক বুদ্ধু, তুই কিছু জানিস না। বাতাচ্ছিস, আজাদী কৌন চীজ? আ রে হারামী!' পালসাহাবের অজ্ঞতায় যেন মজাই লেগেছিল ইদ্রিসের। কর্কশ গলায় হেসে উঠেছিল সে।

ইদ্রিস কেন যে হাসছে, এই কথাটা সঠিক বুঝতে না পেরে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে ছিল পালসাহাব।

তারপর থেকেই আজব শহরটা তার দুর্জ্ঞেয় হালচাল, জমানা, কেতা নিয়ে বার বার পালসাহাবকে হাতছানি দিতে লাগল। শহর যেন জাদু করল তাকে। ন'মাস ছ'মাসে কি বছরে এক আধ বার যখনই ফুরসত পায়, পোর্ট ব্লেয়ার আসতে লাগল পালসাহাব। এখানে এসেই সরাসরি এবারডিন বস্তিতে চলে যেত সে। ইদ্রিসের কুঠিতে গিয়ে উঠত।

অনেক খবর রাখত ইদ্রিস। শহর বন্দরের মানুষ ইদ্রিস। তার খবরের জাতই আলাদা।

একবার পোর্ট ব্লেয়ার এসে পালসাহাব শুনল, ইন্ডিয়া নাকি আজাদ হয়ে গিয়েছে।

মোপলা ইদ্রিস পালসাহাবের পিঠে এক থাপ্পড় মেরে বলেছিল, 'বুঝলি নালায়েক, মুলুক তো আজাদ হয়ে গেল। এবার থেকে খুদ আপনা রাজ।'

মুলুক কোথা দিয়ে কেমন করে আজাদ হয়ে গেল, ঠিক বুঝে উঠতে পাবে নি পালসাহাব। না বুঝেই খুব একচোট মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলেছিল, 'হাঁ—'

আর একবার পোর্ট ব্লেয়ার এসে পালসাহাব মজাদার এক খবর শুনল। এবার ইদ্রিস বলেছিল, 'জানিস শালে, এংরাজবালারা ইন্ডিয়া মুল্লুক ছেড়ে ভেগে যাচ্ছে।'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'তাদের মুল্লুকে। এবার থেকে আমরাই আপনা মুল্লুকের বাদশা বনলাম।'

ইংরেজ সম্বন্ধে পালসাহাবের অদ্ভুত এক মনোভাব আছে। তারা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে সেলুলার কয়েদখানা বানিয়েছে। হাজার মাইল কালাপানি পাড়ি দিয়ে এখানে তাকে কয়েদ খাটতে এনেছে। রস্বাস ছেঁচা, হুইল ঘানি টানা, সড়ক বানানো, পাথর পেষা—এমনি সব কাজে সামান্য গাফিলতি হলেই পেটি অফিসার আর টিন্ডালদের দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে জান লবেজান করে ফেলত।

শুধু কি তাই? সেই ধু ধু গ্রামটা, সেই মুগ্ধ কৃষাণ বউ, সেই তকতকে করে নিকানো আঙিনা, সেই ঘুঘুর ডাক, কৃষাণ বউর কোলে নাদুস নুদুস একটি ছেলে, সব মিলিয়ে এই স্বপ্নময় ছবিটাকে ইংরেজবালারা একটু একটু করে পালসাহাবের জীবন থেকে অনেক, অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

ইংরেজ সম্পর্কে পালসাহাবের অদ্ভুত এক আক্রোশ ছিল। ইদ্রিস যখন জানালো, ইংরেজরা ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন খুশিতে মনটা ভরে গিয়েছিল পালসাহাবের।

তারপর ক'বছর কেটে গিয়েছে।

সেটা কোন তারিখ, কোন সাল, আদৌ মনে করতে পারে না পালসাহাব। অবশ্য মনে করার দায়ও নেই তার। সেদিন ইদ্রিস বলেছিল, 'শুনেছিস ইয়াব, এই জাজিরাতে নয়া নয়া মানুষ আসছে।'

'কোত্থেকে আসছে?'

'মেরিন ডিপার্টমেন্টের মুন্সিজির কাছে শুনলাম, বঙ্গাল মুলুক থেকেই নাকি নয়া আদমীরা আসবে। বহুত, বহুত আদমী—'

'কী মতলব?'

'এখানে নয়া সেটেলমেন্ট হবে। রিফুজি সেটেলমেন্ট।' বলে একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়েছিল ইদ্রিস। আবার শুরু করেছিল, 'এই জাজিরাতে রিফুজিরা নয়া বসত গড়বে।'

'রিফুজি কোন চিজ রে?' যে পালসাহাবের কোনো ব্যাপারেই মাথা ব্যথা নেই, হঠাৎ রিফুজি সম্পর্কে তার আগ্রহ দেখা দিল।

রিফিউজি যে ঠিক কী, ইদ্রিসও জানে না। ভাসা ভাসা, আবছা আবছা যেটুকু সে শুনেছে, তাতে

রিফিউজিদের সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট নয়। শুধু এটুকুই সে জানে, একদল নতুন মানুষ বাংলা দেশ থেকে খুব শিগগিরই এখানে এসে পড়বে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে নতুন গাঁ বসাবে।

ইদ্রিস বলেছিল, 'তুই আবার যখন আসবি, তখন বলব রিফুজি কী চিজ। সমঝালি?'

'আচ্ছা।'

এর পরের বার পোর্ট ব্লেয়ার এসে রিফিউজিদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিল পালসাহাব।

ইন্ডিয়া মুলুক নাকি দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান। বাংলা মুলুক দু'টুকরো হয়েছে। পুব দিক পাকিস্তানে, পশ্চিম দিক হিন্দুস্তানে। পুব বাংলার হিন্দুরা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে এই আন্দামান দ্বীপে আসছে। তাদের কুঠি নেই, ডেরা নেই, মাটি নেই। বাঁচার আশায়, ঘরের আশায়, মাটির আশায় কালা পানি পাড়ি দিয়ে সেটেলমেন্ট গড়তে আসছে তারা।

গাঢ় গলায় ইদ্রিস বলেছিল, 'আদমীগুলো ইন্ডিয়ার আজাদীর জন্যে বহুত কিমত (দাম) দিল। বাপ-নানার কোঠি ছাড়ল, মিট্টি ছাড়ল। ইন্ডিয়ার আজাদীর জন্যে তাদের জিন্দেগী বরবাদ হয়ে গেল।' দীর্ঘ মন্থর একটা শ্বাস ফেলেছিল ইদ্রিস।

রিফিউজিদের কথা ভাবতে ভাবতে সেই ছবিটাই বার বার মনে পড়ছিল পালসাহাবের। সেই কৃষাণ বউ, তার কোলে নাদুস নুদুস ছেলে, ঝকঝকে নিকানো আঙিনা, জাম গাছের ছায়া, একদিন সেই স্বপ্নময় সুন্দর পৃথিবীটা থেকে পালসাহাবও উৎখাত হয়ে এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল।

এই দ্বীপে সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে নির্মূল হয়ে যারা নতুন সেটেলমেন্ট গড়তে আসছে তাদের সঙ্গে তার নিজের কোথায় যেন একটা বিচিত্র মিল খুঁজে পেয়েছে পালসাহাব। রিফিউজিদের জন্য সহানুভূতিতে তার মন ভরে গিয়েছিল।

এরপর থেকে তো নিজের চোখেই সব দেখছে পালসাহাব।

কয়েক বছর ধরে জাহাজ ভরে ভরে উদ্বাস্তুরা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসছে। প্রথমে তারা দক্ষিণ আন্দামানে, পোর্ট ব্লেয়ারের আশে পাশে সেটেলমেন্ট গড়ল। তারপর হ্যাভলক দ্বীপ এবং মধ্য আন্দামানে জীবনের সীমানাকে বাড়াল। এখন যারা আসছে তাদের বসতি হচ্ছে উত্তর আন্দামানে।

উত্তর আন্দামানে উপনিবেশ গড়তে গড়তে পালসাহাব যেন জীবন-রসিক হয়ে উঠেছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ ইন্ডিয়া মুলুকের আজাদীর জন্য সাত পুরুষের ভূমি ছেড়ে আসছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক মূল্য দিয়েছে তারা। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ধুঁকে ধুঁকে, এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরে ঘুরে, বাজারে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে, কলকাতার ফুটপাতে, গাছতলায় কত মানুষ যে শেষ হয়ে গেল, কে তার হিসাব রাখে! কতখানি মনুষ্যত্বের যে অপচয় ঘটল, কে তার হদিস দেবে!

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে কত যুবতী মেয়ে যে নষ্ট হয়ে গেল, কত যুবতী মেয়ের দেহ যে বিকিয়ে গেল, কত ঘরের বউ যে ঘর-সংসার-স্বামী-সন্তান ছেড়ে শহর বাজারের খাপরা ছাওয়া রংমহলে গিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, চোখে সুর্মা টেনে দাঁড়াল, তার লেখাজোখা নেই। পুব বাংলার কত কুমারী মেয়ে আড়কাঠির কারসাজিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় কোথায় যে পাচার হয়ে গেল, কে তা বলে দেবে!

রিফিউজিদের মুখে অনেক কথাই শুনেছে পালসাহাব। দেশভাগের পর মানুষগুলো ভাসতে ভাসতে এখানে সেখানে এসে উঠল। সময়ই বা কোথায়? যে হাত তারা সামনে পেল, সেটা ধরেই উঠতে চাইল, বাঁচতে চাইল। কিন্তু সেই হাতটা ধাক্কা মেরে কোথায় কত দূরে নামিয়ে দিল, সেটা যখন তারা বুঝল, ভয়ে-আতঙ্কে-বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল।

কত শত বছর লেগেছিল পদ্মা-মেঘনা পারের সেই জীবনটাকে মানুষের প্রাণের তাপে সুন্দর, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে। কিন্তু দেশভাগ এক ধাক্কায় তাকে লক্ষ লক্ষ বছর পেছনে হটিয়ে দিয়েছে। এ জীবন এখন পেটের তাড়নায় বর্বর, হিংসায় হিংস্র এবং স্বার্থে আদিম হয়ে উঠেছে। দেশভাগ একটা জাতিকে পঙ্গু, বিকল এবং অথর্ব করে দিল।

এ দেশে মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান, এত বিরাট অপচয় কোনোদিন আর হয় নি।

লক্ষ লক্ষ মানুষ কিংবা বিশাল, বিপর্যস্ত একটা জাতির কথা পালসাহাব ভাবে না। অত বড় ভাবনার মতো মানসিক ব্যাপ্তিও তার নেই।

তবে যে ক'টি ভাঙাচোরা পঙ্গু মানুষ সে হাতের কাছে পেয়েছে, তাদের নিয়েই উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে নতুন করে নিজের নিয়মে জীবন গড়তে শুরু করেছে পালসাহাব।

আহা, পাগলা পালসাহাব জীবন-রসিক হয়ে গেল।

সেটেলমেন্টের মধ্য দিয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে এবং দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে পালসাহাব। হঠাৎ সেই তীব্র, অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসির শব্দটা তার কানে এল।

পালসাহাব চমকে উঠল। ঘুরে ঘুরে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। একটু পরেই তার নজর পড়ল, বাঁ দিকের ছোট একটা টিলার মাথায় নিত্য ঢালীর ঘর। সেখান থেকে শব্দটা আসছে।

হাসির তীব্র, অবুঝ ধ্বনি বুঝিয়ে দিল, কে হাসছে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল পালসাহাব। তারপব লম্বা লম্বা পা ফেলে টিলা বাইতে শুরু করল।

একুশ

ঘরটার সামনে খানিকটা ঘাসের জমি। জমিটার এক কোণে দুই হাঁটুব ফাঁকে ঘাড গুঁজে চুপচাপ বসে আছে নিত্য ঢালী। আজ আব সে এরিয়াল উপসাগবে যায় নি। পালসাহাব সেটেলমেন্টে আসাব আগেই সে এরিয়াল উপসাগরে পালিয়ে যায়। পালসাহাব চলে যাওযার পর বেশি রাতে ফিবে আসে।

আজ নিত্য ঢালী ধরা পড়ে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে কাপাসীব হাসির শব্দটা আসছে। আস্তে আস্তে নিত্য ঢালীর পেছনে এসে দাঁড়াল পালসাহাব। নরম গলায ডাকল, 'এ নিত্য—'

নিত্য ঢালী বুঝি ডাকটা শুনতে পায় নি। অনড় হযে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি বসে রইল।

পালসাহাব আবার ডাকল, 'এ নিত্য—'

এবার হাঁটুর ফাঁক থেকে ঘাড় তুলল নিত্য ঢালী। ঈষৎ রক্তাভ, ঘোলা ঘোলা চোখ। ঘোর ঘোব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। অন্য সময় হলে পালসাহাবকে দেখে নিত্য ঢালী ভয় পেয়ে চমকে উঠত। কিন্তু আজ কিছুই করল না। আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইল।

আশ্চর্য! যে পালসাহাবের মুখ থেকে খেঁকানি আর খিস্তি ছাড়া কিছুই বাব হয় না তার আজ হল কী! নিত্য ঢালীর পাশে ঘন হয়ে বসল সে। পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলল, 'এ নিত্য, কী হয়েছে রে? এমন করে বসে আছিস?'

নিত্য ঢালী এতক্ষণে কথা বলল। নিজের কপালটা দেখিয়ে ভাঙা ভাঙা, ফ্যাসফেসে শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল, 'কী আর হইব সাহাব বাবা, হইছে আমার কপাল। হা ভগমান—' ভাঙা তোবড়ানো মুখ, কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘোর ঘোব চোখ, দোমডানো কুঁজো পিঠ। নিত্য ঢালীকে দেখতে দেখতে কেমন যেন দুঃখ হয় পালসাহাবেব। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। বলে, 'কী হয়েছে বলবি তো। অমন করে বসে থাকলে সব দুখ তোর ঘুচবে?'

পালসাহাবের কথার মধ্যে প্রাণের তাপ রয়েছে। নিত্য ঢালী বলল, 'কান পাতেন সাহাব বাবা, হগল শুনতে পাইবেন।'

'শুনেছি, কাপাসীর হাসি তো?'

'হ সাহাব বাবা—'

দীর্ঘ, মন্থর একটা শ্বাস ফেলল নিত্য ঢালী। বলল, 'এই হাসিটা শুনলেই পরাণটা আমার খাক হইয়া যায়। এ আমি সইতে পারি না, কিছুতেই যে সইতে পারি না। হা ভগমান—'

দু'হাতে সমানে বুক থাপড়ায় নিত্য।

মৌসুমি বাতাস নৈর্ঋত কোণ থেকে টুকরো টুকরো মেঘগুলোকে আন্দামানের আকাশে নিয়ে আসছে। এতক্ষণ তীব্র, ধারাল রোদ ছিল। মেঘ সেই রোদকে ম্যাড়মেড়ে, নিবু নিবু এবং কাবু করে ফেলেছে। আন্দমানের আকাশে মেঘ আসছে। অর্থাৎ বৃষ্টি নামার আয়োজন শুরু হয়েছে।

ঘরের মধ্যে কাপাসীর অবুঝ হাসিটা কলকল করে মাতছে। আজ যেন একটু বাড়াবাড়িই করছে সে। থেকে থেকে, দমকে দমকে, কখনো বা ফুলে ফুলে হেসে উঠছে মেয়েটা।

পালসাহাব বলল, 'আজ অ্যায়সা হাসছে কেন কাপাসী?'

'জানি না বাবা, বুঝি না। পাগলের মাথায় কুনদিন কী চাপে, ক্যামনে কমু সাহাব বাবা!'

গাঢ় গলায় পালসাহাব বলল, 'আচ্ছা নিত্য, একটা কথার জবাব দিবি?'

'কী কথা বাবা?'

'লেড়কী কি সচই পাগল হয়েছে?'

'হ সাহাব বাবা—' নিত্য ঢালী একেবারে ভেঙে পড়ে।

কী একটু যেন ভেবে নিল পালসাহাব। তারপর বলল, 'ইয়াদ আছে, একরোজ বলেছিলি, লেড়কীর কথা বলবি—'

'হ সাহাব বাবা। সত্যই আপনে শুনবেন?'

'হাঁ রে শালে, শুনবার জন্যেই তো এলাম। এই কলোনির হর আদমীর সুখ দুখ, সব কথাই তো আমার শুনতে হবে, বুঝতে হবে। আমি তোদের কথা না শুনলে কে শুনবে? কে আছে তোদের?' গলাটা অদ্ভুত মায়াময় শোনায় পালসাহাবের।

একবার পালসাহাবের মুখের দিকে তাকাল নিত্য ঢালী। কেন যেন তার মনে হল, এই মানুষটা তাকে শান্তি দিতে পারে। মনে হল, দশ বছর ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণায় সে বিকল হয়ে আছে, সে সব বলে সে একটু জুড়োতে পারবে, একটু হালকা হবে। এই মানুষটাকে বিশ্বাস করা চলে। হয়তো বা নিজের দুঃখ যন্ত্রণার শরিক করে নেওয়া যায়। নিত্য ঢালী শুরু করল।

পুব বাংলার আর দশটা কৃষাণ গ্রামের মতোই ছিল নিত্য ঢালীদের গ্রামটি। সামনে ছোট একটি নদী। শান্ত, স্নিগ্ধ, ছোট গ্রাম। নাম হীবাকুপি। নদীব নাম মাতানি। পৃথিবীর হট্টগোল থেকে অনেক দূরে এই নগণ্য জনপদ। এই গ্রামের বাইরে কোথায় কী ঘটছে, ওখানকার মানুষেরা তার খবর রাখত না। কোনো ব্যাপারের কড়িই তারা ধারত না। হাজার বছরের অতল ঘুমে হীরাকুপি গ্রামটা তলিয়ে ছিল।

মাস গিয়েছে, বছর ঘুরেছে, ঋতুচক্রে সময় পাক খেয়ে ফিরেছে। পৃথিবীতে কত পরিবর্তন ঘটল, কত ওলট পালট হল, কত কিছু তোলপাড় হয়ে গেল। রাজ্যপাট থেকে কত রাজা গেল, কত রাজা এল। কোথাও বিপ্লব হল, কোথাও গণবাসুকী ফণা তুলল। মাটির নিচের ভারকেন্দ্রে কোথাও আলোড়ন শুরু হল। কিন্তু হীরাকুপি গ্রাম সেই যে অতল ঘুমে তলিয়ে ছিল, সে ঘুম আর ভাঙে নি। এখানে সময়ের ওঠাপড়ার কোনো ইতিহাস নেই। সময় এই গ্রামটাকে অতি সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে।

জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝামাঝি সময় নদী যেমন স্থির, এখানকার জীবনও ঠিক তেমনি। এখানে উজানের মাতামাতি নেই, ভাটার টান নেই।

নিজেদের চারপাশে লম্বা লম্বা দেওয়াল খাড়া করে মানুষগুলো পরম নিশ্চিন্তে খায় দায়, ঘুমোয় আর উর্বরা নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়। পৃথিবীর কাছে, জীবনের কাছে এমন করেই তারা দায় সারে, জন্মের ঋণ শোধ করে। বাইরের পৃথিবীর সব ঢেউ এখানকার চারপাশের দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে যায়।

এখানে উদ্দীপনা নেই, উত্তেজনা নেই। মিঠে নদী মাতানির পারে নিতান্তই ঘুমন্ত, নিরুদ্বেগ, নিরুত্তেজ একটি গ্রাম।

হীরাকুপি গ্রামে ঢালীদের বাস। রাজা বাদশার আমলে ঢালীরা ছিল পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল।

কিন্তু সে আমল আর নেই। থাকবেই বা কেমন করে? রাজা বাদশাই যখন নেই, তাদের কাল আর থাকে কেমন করে!

ঢালীপাড়ার সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ কুঞ্জ ঢালী। সে বলত, 'ঢালীরা কি যে সে জাইত, পাইক-লাইঠাল—বীরের জাইত।'

কিন্তু রাজা বাদশাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢালীদের বীরত্ব গেল, হাতের লাঠি গেল। লাঠি হারিয়ে ঢালীদের কেউ কেউ মাছমারা হল, কেউ কৃষাণ হল, কেউ মাঝিগিরি ধরল। আবার কেউ কেউ নানা উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

নিত্য ঢালী পঁচিশ কানি তে-ফসলা জমি রাখত। আউশ ফলত, আমন ফলত, রবি ফসল ফলত। তিন জনের সংসার তার। বউ দামিনী, মেয়ে কাপাসী আর সে নিজে। ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ, অফুরন্ত শান্তিতে বিভোর হয়ে ছিল তারা।

কিন্তু মাতানি নদীর পারে সেই ঘুমন্ত হীরাকুপি গ্রামটা একটা ঝাঁকানি খেয়ে হঠাৎ একদিন জেগে উঠল।

নিত্য ঢালী হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে, 'সব্বনাশ আইল সাহাব বাবা, চাইর পাশ থিকা বেড়া আগুন গেরামটারে ঘিরা ধরল।'

একটু থামে নিত্য ঢালী। খুব একচোট হাঁপায়। টেনে টেনে দম নেয়। বুকটা হাপরের মতো হাঁস হাঁস শব্দ করতে থাকে। আবার সে শুরু করে, 'বাবা পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না হেই আগুনেরে ঠেকাইতে। আমার সব্বস্ব পুড়াইয়া, জ্বালাইয়া, খাক কইরা দিয়া গেল। কপালে যা লিখা ছিল, তাই হইল।'

মাঝে মাঝে থেমে, কেঁদে, হাঁপিয়ে, বুক আর কপাল থাপড়ে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অনেক কথাই বলে যায় নিত্য ঢালী।

দামিনী বউ তাকে বার বার বলেছিল, এইখানে আর বেশি দিন থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। হবে সোনাদানা না থাক, বিত্ত-ব্যাসাদ না থাক, প্রাণটা তো আছে। বিয়ের যোগ্য মেয়ে আছে।

পঁচিশ কানি তে-ফসলা জমি, সাতপুরুষের ভিটেমাটি বাগবাগিচা ঘর ভদ্রাসন, বিষয়ী মানুষের মনে এসবের জন্য বড় কঠিন মায়া। এগুলো ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন ঠিক সায় দেয় নি। নিত্য ঢালী বলত, আর ক'টা দিন দেখাই যাক।

দামিনী বউ চেঁচাত, চুল ছিঁড়ত, দু'হাতে নিত্য ঢালীকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলত, 'ড্যাকরা, যমের অরুচি—তুই আমার সব্বনাশ করবি। মাইয়ার যদি কিছু হয়—হে ভগমান—' মাটিতে আছড়ে পড়ে জোরে জোরে কপাল ঠুকত দামিনী বউ।

হীরাকুপি গ্রামে ভাঙন ধরল একদিন। কুঞ্জ ঢালী, মাধব ঢালী, রাজেন ঢালীরা আসাম চলে গেল। এক দল ত্রিপুরা রওনা হল। এক দল গেল কলকাতা। একে একে সবাই গ্রাম ছাড়ল।

দামিনী বউ বলত, 'হগলে গ্রাম ছাড়ল, ভিটামাটি ছাড়ল। তোমারই খালি বিষয়ের লেইগা যত মায়া! অহনও বাচনের পথ আছে। লও, হগলের লগে আমরাও যাই।'

'যাবি তো, খাবি কী? এই গেরামের বাইরে কে আমাগো লেইগা ভোগ সাজাইয়া রাখছে? এই গেরামের বাইরে আমরা চিনি কী? জানি কী? হেহানে গিয়া কী করুম?'

'হগলের যা হইব, আমাগোও হেয়াই হইব। এইহানে আমার বুক কাপে। কেউ নাই, হগলে গেছে গিয়া। গেরামটা য্যান শ্মশান।'

নির্জীব সুরে নিত্য ঢালী বলত, 'দেখি আরো কয়টা দিন—'

আরো ক'টা দিন দেখতে গিয়েই যা হওয়ার তা হয়ে গেল। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটা যেন নিশুতিপুর। কোথাও সাড়া নেই, শব্দ নেই। চারদিক নিঝুম।

যে দু'চার ঘর তখনও গ্রাম ছাড়ে নি তারা ফিস ফিস করে কথা বলে। দিন থাকতেই নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে দুয়ারে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে। হীরাকুপি গ্রাম থেকে জীবনের অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে। কে বলবে এটা ঢালীদের গ্রাম! কে বলবে ঢালীরা একদিন রাজা বাদশার পাইক-বরকন্দাজ ছিল।

সেটা কোন তারিখ, কী বার, হুবহু মনে আছে নিত্য ঢালীর। সর্বনাশের দিনের কথা কেউ কি ভোলে! কৃষ্ণপক্ষের রাত ছিল সেটা। চরাচর ঘুটঘুট করছে। অন্ধকার ফেড়ে ফেড়ে মাতানি নদীতে অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠল। হীরাকুপি গ্রামের অন্তরাত্মাটাকে ভয়ানক চমকে দিয়ে হল্লা উঠল, 'হো-ও-ও-ও—'

'হো-ও-ও-ও—'

হল্লা আর মশাল একসময় হীরাকুপি গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘরে ঘরে আগুন লাগল। ঘরপোড়া আগুন কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে কী যে বোঝাতে চাইল, কে জানে।

রাত্রির আত্মাকে তীরের মতো বিঁধে চতুর্দিকে প্রাণফাটা চিৎকার উঠল। সেই সঙ্গে হল্লা। শেষ পর্যন্ত আগুন আর হল্লা নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে এসে পড়ল।

চালে আগুন জ্বলছে, কপাট ভাঙা হয়ে গিয়েছে। গরিব ঢালীর ঘরে সোনাদানা নেই, বিত্ত-ব্যাসাদ নেই, একমাত্র বিয়ের যোগ্য যুবতী মেয়ে ছাড়া লুট করার মতো কিছুই ছিল না।

এখনো সেই সর্বনাশা দুর্ভাগোর রাতটা নিত্য ঢালীর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। শব্দ করে ফুলে ফুলে কাঁদে সে। ভাঙা ভাঙা, ধরা গলায় বলে, 'চৌখের উপুর যা দেখলাম, পারি না, কুনো দিন ভুলতে পারি না। হা ঈশ্বর, অ্যামন সোন্দর পিরথিমী বানাইছ, অ্যামুন সোন্দর মানুষ বানাইছ, কিন্তুক তার মনে এত পাপ দিলা ক্যান?'

হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে নিত্য ঢালী আবার বলে, 'শয়তানেরা কাপাসীর দিকে আগাইয়া আইল। ঠেকাইতে গেলাম, লাঠির একখান ঘাই খাইয়া মাটিতে পড়লাম। পারলাম না, আমি পারলাম না। বাপ হইয়া যা পারলাম না, মা হইয়া হেয়া করতে গেল দামিনী বউ। শয়তানগো মুখামুখি রুইখা খাড়ইল। মাইয়ার মান বাচানের লেইগা কী না করলে হেয় (সে)। কইল, 'আমারে আগে মার, মাইরা ফালা। তবে মাইয়ার গায়ে হাত দিতে পারবি। তার আগে না রে শয়তানেরা।' দুই হাতে কাপাসীরে আবডাল কইরা রাখল দামিনী বউ। মা-পঙ্খী য্যামুন তার ছাওরে আবডাল করে। বার বার লাঠির ঘাই খায়, বার বার পড়ে। পড়ে আর ওঠে। শ্যাষে তারা সড়কি মারল, এক হাত ফলাটা কাপাসীর মায়ের বুকে বিন্ধা গেল। হেই যে পড়ল, আর উঠল না।'

এবার আর নিত্য ঢালী কাঁদল না। অদ্ভুত চোখে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল। এ সেই চোখ নিরন্তর কষ্টে যা উদাস, সীমাহীন দুঃখে যা ঝাপসা।

চুপচাপ পাশে বসে রয়েছে পালসাহাব। আবছা গলায় সে বলল, 'তারপর কী হল?'

'দামিনী বউ মরল। কাপাসীরে ছিনাইয়া নিয়া মাতানি নদী পার হইয়া কুত্তারা চইলা গেল সাহাব বাবা। সাত দিন পর তারে আবার ফিরা পাইলাম। কিন্তুক এ কুন কাপাসী! হা ভগমান—' বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল নিত্য ঢালী। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'সাহাব বাবা, বাপ হইয়া কই, কাপাসী যদি মরত, আর যদি না ফিরত তা হইলে আমি বাচতাম। মনেরে বুঝাইতে পারতাম। কিন্তুক কাপাসী ফিরল। তারে নিয়া কইলকাতায় আইলাম। হেইখান থিকা এই আন্ধারমান আইছি। কিন্তুক সাহাব বাবা—'

'বল—'

'কাপাসী ফিরা আইল ঠিকই, কিন্তু তার মাথাটা খারাপ হইয়া গেল। দিন রাইত খালি হাসে। হাসন আর থামে না। তার হাসন শুনলে বুক আমার কাপে। সাহাব বাবা, এর থিকা যদিন কাপাসী মরত—'

ধরা ধরা, ভারী গলায় পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'থাম—'

এমন যে দুর্দান্ত পালসাহাব, দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে যে এখানে কয়েদ খাটতে এসেছিল, নিত্য ঢালীর দুঃখের কথা শুনতে শুনতে সে তার দুর্ভাগ্যের শরিক হয়ে গিয়েছে। বুকের ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করছে, কণ্ঠার কাছে বিচিত্র এক কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। চোখ দু'টো নোনা জলে বুঝি ভরেই গিয়েছে। চোখ ঢাকবার জন্য ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল পালসাহাব। তারপর উঠে দাঁড়াল।

অদ্ভুত একটু হাসল নিত্য ডালী। বলল, 'খালি দুঃখের কথা শুইনাই আপনের মনটা খারাপ হইয়া গেল সাহাব বাবা?'

'হাঁ রে কুত্তা—'

'আমি যে দশ বছর ধইরা এই দুঃখুরে বুকের ভিত্‌রে পুষতে আছি। এই দুঃখু যে আমারে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক কইরা ফালাইল। আমার কথাটা এট্টু ভাবেন সাহাব বাবা, এট্টু ভাবেন। এই দুঃখু বুকে নিয়া কিছুই যে করতে পারি না। কুনো কামেই যে মন বশ খায় না। এই দ্বীপে আইসা হগলে মাটি কুপায়, ঘর বানায়, মাছ মারে। আমিই খালি পলাইয়া থাকি।'

পালসাহাব কিছুই বলল না। এলোমেলো পা ফেলে টিলা বেয়ে নিচে নামতে লাগল। আর পেছনে নিত্য ঢালীর ঘরে কাপাসীর হাসি কল কল করে বাজতে লাগল।

বাইশ

যে মেঘের জন্য পালসাহাব উন্মুখ হয়ে ছিল তা অনেক আগেই এসে পড়েছিল। এবার বৃষ্টি শুরু হল। সীসার রঙের মতো দীর্ঘ ধারাল ফলায় বর্ষণ চলছে। উত্তর আন্দামানের আকাশ পাহাড় জঙ্গল, সব কিছু বৃষ্টিতে আবছা হয়ে গিয়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ারে নিয়ে গিয়ে বিনোদ ভুঁইমালীকে ছুতোরের কাজে, অনন্ত শীলকে নাপিতের কাজে, রাখুকে গুরুস্বামীর দোকানের কাজে, এমনি প্রায় জন পনেরকে নানা কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছিল পালসাহাব। আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখেই তাদের আবার ডিগলিপুর ফিরিযে এনেছে।

বৃষ্টি পড়ছে। এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে যে মাটি কুপিযে চৌবস করে রেখেছিল পালসাহাব, তা নরম সরস হয়ে যাচ্ছে।

আবাদের পক্ষে এখন সুদিনও না, মবশুমও নয়। তবু নোনা জলের মাঝখানে যে মিঠে মাটি পাওয়া গেল তার গর্ভ ধারণের ক্ষমতা কতখানি তা দেখবার জন্য বীজ ছড়াবে পালসাহাব।

দিন তিনেক বৃষ্টি হল। কিন্তু তাতে বীজ বোনা চলে না।

তবু সবাইকে নিয়ে জমিতে এল পালসাহাব। মাটি বেশ নরম হয়েছে।

পালসাহাব বলল, 'কি রে, এই জলে বীজ ফেলা যাবে?'

বুড়ো রসিক শীল সারাটা জীবন আবাদ করে কবে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে। মাটির মেজাজ সে বোঝে। মাটি কতখানি জল পেলে গর্ভিণী হয়ে ফসলের জন্ম দিতে পারে তা তার জানা। মাটি আর জল সম্বন্ধে তার অনেক কালের অভিজ্ঞতা। পালসাহাব তাকেই আবার বলল, 'কি বে বুড়ঢা, তোর কী মনে হয়?'

এক ডেলা মাটি হাতে তুলে ছেনে ছেনে পবখ করল রসিক শীল। মাথা নেড়ে বলল, 'না সাহাব বাবা—'

'কী না?'

'জমিন অহনও বীজ রুয়ার যুইগ্য হয় নাই। মাটি আর কয়টা দিন জল খাউক। হের পরে দেখা যাইব।'

'আচ্ছা।'

এর পর দিন সাতেক আকাশ বিমুখ হয়ে রইল। তার কৃপণ মুঠি বেয়ে এক ফোঁটা জলও ঝরল না। মাটি সরস হয়েছিল, কিন্তু তেজী রোদে আবার শুকিয়ে যেতে লাগল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষগুলো বলল, 'হায় ভগমান, তুমি এমুন বৈমুখ হইলা।'

সাত দিন পর আরো দশ দিন কাটল।

আকাশে টুকরো টুকরো অসংখ্য মেঘ এখনো রয়েছে। সেই মেঘ নিঙড়ে এক ফোঁটাও জল কিন্তু ঝরছে না। আন্দামানের মেঘ এবারের মতো আর কখনো এত নির্দয় হয় নি।

অনেক দিন পর মানুষগুলোকে নিয়ে আবার জমিতে এল পালসাহাব। খেতের দিকে তাকিয়ে তার চোখ স্থির হয়ে গেল। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

মাঝখানের ক'দিনের তেজী রোদে মাটি শুকিয়ে গিয়েছে। আর সেই শুকনো মাটি ফুঁড়ে অসংখ্য সবুজ অঙ্কুর মাথা তুলেছে। যতদূর তাকানো যায়, সবুজে সবুজে জমি ছেয়ে আছে।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'বীজ রুইলাম না, তভু জমিন এ কুন ফসলে ভইরা গেল সাহাব বাবা?'

পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, বিলকুল সর্বনাশ—'

পালসাহাবের চিৎকারে রসিক শীলেরা ভয় পেয়ে গেল। ফিস ফিস করে তারা বলল, 'কী হইছে সাহাব বাবা?'

'জঙ্গল, জঙ্গল—হুই দ্যাখ, মুথিয়া লতা, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটি গজিয়ে রয়েছে।' চিল্লাতে চিল্লাতে আরো অনেক কথা বলল পালসাহাব।

অরণ্য কি এত সহজে নির্মূল করা যায়? এই দ্বীপের মাটিতে হাজার হাজার বছর ধরে জঙ্গলের বীজ মিশে আছে। মুথিয়া লতার বীজ, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির বীজ, প্যাডক আর চুগলুম গাছের বীজ। নানা জাতের গাছ আর আগাছার বীজ।

মাটির ওপরের জঙ্গল হয়তো সাফ করা যায়। কিন্তু তার অস্তিত্বের সঙ্গে, তিন পরল নিচে তার গর্ভকোষে যে জঙ্গল রয়েছে, তাকে কেমন করে নিশ্চিহ্ন করা যাবে? যেই জল পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফুঁড়ে জঙ্গল মাথা তুলেছে। পালসাহাব হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলকে নির্মূল করতে না পারলে ফসল কিছুতেই ফলানো যাবে না। মাটিতে জল পড়লেই যদি আগাছা মাথা তোলে তা হলে বীজদানা কেমন করে রুইবে?

পালসাহাব বিড় বিড় করতে লাগল, 'বিলকুল সর্বনাশ। এ মিট্টিতে তো ফসল ফলানো যাবে না।'

এই মাটিটুকুর আশায় হাজার মাইল নোনা জল ঠেলে আন্দামানে এসেছে মানুষগুলো। কিন্তু বৃষ্টি পড়লেই যদি জঙ্গল মাথা তোলে তা হলে ফসল কেমন করে ফলবে? আর ফসল না ফললে তারা কিসের ভরসায় এই দ্বীপে থাকবে? আন্দামানের এই মাটিই তাদের শেষ ভরসা, কিন্তু জঙ্গল তার দখল ছাড়তে রাজি নয়। বাঁচার আর আশা নেই। নির্ঘাত তারা মরে যাবে। আচমকা উত্তর আন্দামানের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাকে চমকে দিয়ে মানুষগুলো শোর তুলে কান্না জুড়ে দিল। হতাশায় দুঃখে তারা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

অন্য সময় হলে এক ধমকে তাদের কান্না থামিয়ে দিত পালসাহাব। কিন্তু এই মুহূর্তে কী যে সে বলবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না। তার গলায় ধমকও যেমন ফুটল না, একটা সান্ত্বনার কথাও তেমনি যোগাল না। বিব্রত, বিমূঢ় পালসাহাব নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

সকলের সঙ্গে বুড়ি বাসিনীও এসেছিল। সে কাঁদছিল না। এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোর কান্না শুনছিল। পুরুষমানুষের কান্না অসহ্য লাগে তার। হঠাৎ সে সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'কান্দস ক্যান? কান্দনের হইল কী?'

রসিক শীল বলল, 'কান্দুম না, কও কী তুমি খুড়ি! যে মাটির ভরসায় কালাপানি পাড়ি দিয়া এত দূরে আইলাম, হেই মাটি এমুন বিশ্বাসঘাতী হইল! হা ঈশ্বর, বাচুম ক্যামনে? আর যে বাচ্চার পথ নাই—'

'ভাসুর পুত, তরা কী হগল ভুললি? আট দশ বচ্ছর আমরা রিফুজি হইছি, কিন্তুক তার আগে তো ঘরবসত, জমিন-জমা— বেবাকই আছিল। আছিল কিনা?' বুড়ি বাসিনী রসিক শীলকে 'ভাসুর পুত' বলে। কখনো কখনো নাম ধরেও ডাকে। রসিক শীল তার ডাকের ভাসুর পো। নইলে এমনি কোনো সম্পর্ক নেই।

তিন কুলে কেউ নেই বাসিনীর। বাপ না, ভাই না, স্বামী না, সন্তান না। না বলতে কেউ না। সবাইকে খেয়ে বসে আছে সে।

দেশভাগের পর ফরিদপুর জেলার ছোট্ট গ্রাম ছিপতিপুর থেকে ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসেছিল বাসিনী। শিয়ালদা স্টেশনে রসিক শীলের সঙ্গে তার আলাপ। প্রথম আলাপেই সে তার সঙ্গে খুড়ি-ভাসুর পো সম্পর্ক পাতিয়ে নিল। সম্পর্কই শুধু পাতানো হল না, রসিকের সংসারে গিয়ে উঠল বাসিনী।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধুবুলিয়া ক্যাম্প। ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ। ন'দশ বছর রসিকদের সঙ্গে কাটিয়ে দিল বাসিনী।

বাসিনী আগের কথাটা আবার বলল, 'তরা কী হগল ভুললি ভাসুর পুত?'

'কী ভুললাম খুড়ি?'

'চাষের কাম।'

'ভুলুম ক্যান? চাষ-আবাদের কথা কেও নি ভোলে!'

'হ, ভুলছস। না হইলে শুদাশুদি কান্দস?' বলে একটু থামে বাসিনী। এক ডেলা মাটি হাতে নিয়ে ফের শুরু করে, 'এই মাটি সোনার মাটি, বাহারের মাটি। এই মাটিতে সোনা ফলব। কিন্তুক কোদাল দিয়া মাটি চষলে হইব না রসিক।'

'তব ক্যায়সা?' পাশে দাঁড়িয়ে বাসিনীর কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল পালসাহাব। সে বলল, 'তব ক্যায়সা রে বুড্‌টী। মাটি চষা হবে কেমন করে?'

'খালি কোদালের কাম না সাহাব বাবা। লাঙ্গল লাগব। হালহালুটি আর বলদ লাগব। পরল পরল মাটি তুইলা জঙ্গলেরে সাফ কইরা ফালাইতে হইব। তবে নি মাটি ফসল ফলাইব। এই দ্বীপে চাষ কি এমনে এমনে হয়?'

'ঠিক বাত বুড্‌টী। হাল-বলদের বন্দোবস্ত করছি। আজ সোমবার, পরশু বুধবার। বুধবার তো জাহাজ আসবে, তাই না রে শালে লোগ?'

মানুষগুলো সায় দিল, 'হ।'

প্রতি বুধবার অর্থাৎ সপ্তাহে একবার মাত্র পোর্ট ব্লেয়ার থেকে জাহাজ আসে উত্তর আন্দামানের এই উপনিবেশে। যে জাহাজটা আসে তার নাম 'চলুঙ্গা'।

অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে উত্তর আন্দামানের এই ডিগলিপুর কলোনি। 'চলুঙ্গা' জাহাজই বাইরের পৃথিবী আর এই কলোনির মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র।

ঠিক হল, বুধবার পোর্ট ব্লেয়ারে যাবে পালসাহাব। সে জানালো, বড় অফসরদের (অফিসারদের) সঙ্গে দেখা করে হাল-বলদের ব্যবস্থা করে আসবে।

তেইশ

উদ্ধব বৈরাগীর মনটা বড় সরস, বড় সজীব। খুশির রসে সব সময় তার মুখখানা টসটস করে। দেশভাগের পর আট দশটা বছর তার জীবন থেকে সব সুর, সব গান, সব আনন্দ মুছে গিয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসে পায়ের নিচে মাটি পেয়ে আবার সব ফিরে পেয়েছে সে। সেই সুর, সেই গান, সেই আনন্দ। এখন বিকেল। উপসাগরের দিক থেকে সাগরপাখিরা এখনো দ্বীপে ফিরে আসে নি। জঙ্গলের মাথায় হলুদ রঙের উজ্জ্বল ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে রয়েছে। দো-তারার তারে আঙুলের টোকা মেরে সুর তুলতে থাকে সে। তিড়িং-টুঙ তিড়িং-টুঙ বাজাতে বাজাতে একসময় গানও ধরে। রসের গান :

সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।
তর সোনার অঙ্গ জরজর,
তর বুকের ভিতর থরথর,

তুই কী করিতে কী যে কর,
মরলাম ভেবে সেই ভাবনা।
সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।

উদ্ধবের প্রাণটা আজ অকারণ খুশিতে ভরে আছে। না হলে কি সে এই রসের গান ধরত!

গাইতে গাইতে কিলপঙ নদীর পারে এসে পড়ে সে।

সোনার বল্লমের মতো কয়েকটা রোদের রেখা কিলপঙ নদীটাকে বিঁধে রেখেছে।

কয়েকটি যুবতী মেয়ে জল নিতে এসেছিল। উদ্ধবকে দেখে তারা চঞ্চল হল।

কিলপঙ নদীর পারে গুঞ্জন উঠল, 'খাইছে লো, বৈরাগী ভাই আইছে। মুখখান তার যা আলগা, কিছুই বাধে না।'

বাউল বৈরাগী মানুষ উদ্ধব। মাপজোখ করে কথা বলা তার স্বভাবেই নেই। যা তার প্রাণে আসে, তাই বলে ফেলে। তার রাখ রাখ, ঢাক ঢাক নেই। মনের কথা সে মনের মধ্যে গোপন করে রাখতে জানে না। জিভের আগায় যা আসে তাই বলে বসে। কী বলতে কী যে বলবে উদ্ধব, আগে ভাগে তার হদিস মেলে না। যুবতীরা শুধু এটুকু জানে, উদ্ধবের মুখে কিছুই আটকায় না। তাই তারা কাঁটা হয়ে থাকে।

কিলপঙ নদীর পারে দাঁড়িয়ে রঙ্গ শুরু করল উদ্ধব। গানের প্রথম পদ দু'টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেনে টেনে গাইতে লাগল ঃ

সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা—

গায় আর নাচে উদ্ধব। একসময় গান থামিয়ে সে বলল, 'সোনাদিদিরা, জল নিতে আইছ বুঝিন?'

'হ।' যুবতীরা সংক্ষেপে জবাব দেয়।

এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, বাঁচার জন্য এই যে অন্তহীন লড়াই, তবু মানুষের প্রাণ তো মরে না। প্রাণের সেই আনন্দ মরে না। অন্তত উদ্ধব বৈরাগীর মতো মানুষ প্রাণের সেই আনন্দটাকে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেও মরতে দেয় না।

উদ্ধবদের জন্যই মানুষ বার বার মরেও বার বার বাঁচে। তারা যে দুঃখ এবং যন্ত্রণাকে নিঙড়ে নিঙড়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দ বার করতে জানে।

উদ্ধব বলে, 'জল নিতে আইছ, না জল সইতে আইছ দিদিরা?'

একটি মেয়ে বলে, 'বিয়া লাগল কার যে জল সইতে আসুম?'

'ক্যান, তোমাগো হগলের।'

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফিক করে একটু হাসে মেয়েটি। অন্য মেয়েদের মুখ লাল হয়ে ওঠে।

হাসতে হাসতে সেই মেয়েটি বলে, 'কার লগে বিয়া?'

'আমার লগে!'

বলেই গেয়ে ওঠে উদ্ধব ঃ

সোনাদিদিরা,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। খিল খিল, ফিক ফিক হাসি। জলের টিন নিয়ে তর তর করে টিলা বেয়ে বেয়ে যুবতীরা চলে যায়।

যুবতীদের কান্ড দেখে ফোকলা মুখে হাসে উদ্ধব বৈরাগী। প্রাণখোলা, উদার হাসি।

যুবতীদের পেছন পেছন উদ্ধবও চলে যেত, কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ল, নদীর পারে তিলি বসে আছে। কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কী যেন ভাবছে। কী ভাবছে তিলি?

উদ্ধব নিজের মনেই বলল, 'আমি তো আর অন্তরযামী না। তিলি কী ভাবে, ক্যামনে জানুম?'

টিলা থেকে নিচে নেমে এল উদ্ধব। তিলির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। এক একদিন বয়সটা অনেক কমে যায় তার। অদ্ভুত এক ছেলেমানুষি তখন তাকে পেয়ে বসে। উদ্ধব ডাকল, 'তিলি—'

তিলি জবাব দিল না। যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

একদৃষ্টে তিলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে উদ্ধব। মেয়েটার কপালে মেটে সিঁদুরের মস্ত এক টিপ। সেটা দেখতে দেখতে গান শুরু করল সে :

তুমি কি দিয়া ভুলাইলা
শ্যামচান্দের মন রে—
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত (অবাক) আমি।
তোমার কপালের সিন্দুরে
ঝলমল ঝলমল করতাছে
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত আমি।
তুমি কি দিয়া—

তিলি হঠাৎ খেপে উঠল, 'তুমি থাম দেখি বৈরাগী দাদা—'

'ক্যান, থামুম ক্যান? থামনের হইল কী?'

'রসের কথা কি সব্বক্ষণ ভাল লাগে?'

'আমার তো লাগে।'

'তোমার কথা ছাড়ান দাও।'

'ক্যান, আমার কথা ছাড়ান দিমু ক্যান? আমি কি পিরথিমী ছাড়া?'

বিষণ্ণ একটু হাসল তিলি। বলল, 'হ গো, তা-ই। তুমি বাউল বৈরাগী মানুষ। তোমার কথাই ভিন্ন। তোমার সব্ব অঙ্গে রস, তোমার পরাণভরা রস। হইতা যদি সোংসারী মানুষ, বুঝতা জ্বালা কারে কয়। বুঝতা সোংসারের ভাপে রস ক্যামনে শুকাইয়া যায়।'

উদ্ধব কিছুই বুঝতে চায় না। আপন মনে গেয়ে ওঠে :

তোমার কপালের সিন্দুরে
ঝলমল ঝলমল করতাছে,
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত আমি—

তিলি আরো খেপে ওঠে, 'খুব তো সিন্দুরের বাখান কর। কিন্তুক এই সিন্দুরের যে কী জ্বালা, হেয়া তো কুনো কালে বুঝলা না বৈরাগী ভাই। হইতা মাইয়ামানুষ, পিরথিমীতে আমার লাখান আর এক তিলি হইয়া জম্ম নিতা, বুঝতা সিন্দুরের জ্বালা কারে কয়!'

আর মজা করল না উদ্ধব। তিলির পাশে বসে পড়ল। তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'কী হইছে রে দিদি?'

তিলি জবাব দিল না।

তিলির কাঁধে অল্প একটু ঠেলা মেরে উদ্ধব আবার বলল, 'হরিপদর লগে কিছু হইছে?' তার গলায় উদ্বেগ ফোটে।

বড় দুঃখে হাসে তিলি। বলে, 'এইটা কি আর নয়া কথা বৈরাগী ভাই! জনমভর কুন দিনটা বাদ গেছে, যেইদিন তার লগে আমার লাগে নাই? এট্টা দিনও চুলাচুলি ছাড়া যায় নাই গো ভাই, এট্টা দিনও না।'

তিলি এমনিতেই ঘোমটা দেয় না। আজ কী মনে করে দিয়েছিল। ঘোমটাটা খসে পড়েছে। ঘোমটা-খসা, উদাসীন তিলি নদীর দিক থেকে চোখ ফেরায় না। হরিপদকে নিয়ে তিলির যে দুর্বিষহ জীবন তার কথা কলোনির সবাই জানে। এ ব্যাপারে তিলিদের দিক থেকে ঢাকাঢাকি বা গোপন করার চেষ্টাও নেই।

আর কিছু রটুক আর না-ই রটুক, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ার খবরটা ঠিকই জানাজানি হয়ে যায়।

কথায় কথায় বুড়ি বাসিনী প্রায়ই বলে, 'সু তো রটে না, কু'টাই রটে।'

গভীর গলায় উদ্ধব বলে, 'মানাইয়া নে দিদি, মানাইয়া নে। হাজার হউক সোয়ামী তো।'

উদ্ধব আন্দাজ করে নিয়েছে, হরিপদর সঙ্গে আজও তিল্লির কিছু একটা হয়েছে। তিলির মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোয় সে। বলে, 'মাইয়া মাইনষের জন্ম নিয়া এই পিরথিমীতে আইছস। মাইয়া মাইনষেরে অনেক কিছু সইতে হয় দিদি, অনেক সইতে হয়—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ একসময় তিলি ডাকল, বৈরাগী ভাই—' ডেকেই থেমে গেল।

উদ্ধব বলল, 'কী ক'স?'

কী যেন একটু ভেবে নিল তিলি। তারপর বলল, 'আইচ্ছা বৈরাগী ভাই, আমি তো একজনের বউ।'

'হ। হেয়া তো ঠিকই।'

'আমার এই শরীল, এই মন যহন সোয়ামীর কুনো কামে লাগল না তহন এগুলানরে যদিন উড়াইয়া দেই, পুড়াইয়া দেই—'

'তর কি মাথা খারাপ হইয়া গেল?' উদ্ধব শিউরে উঠল।

তিলি তার কথার জবাব দিল না। নিজের খেয়ালেই বলতে লাগল, 'নিন্দা রটব। জানি পিরথিমীর হগল মানুষ আমার গায়ে ছ্যাপ (থুথু) দিব, মুখে চুনকালি মাখাইব। তভু এ ছাড়া আমার আর উপায় নাই বৈরাগী ভাই।'

উদ্বিগ্ন স্বরে উদ্ধব বলল, 'তিলি, তর মনে কী আছে রে বইন (বোন)?'

'আমার মনে যা আছে, সোময় হইলেই জানতে পারবা। মনে যা আছে হেয়া আমি করুম, করুম, করুম। নিচ্চয় করুম। এই কথা তোমারে কইয়া রাখলাম।' বলতে বলতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ, রিনরিনে গলায় হেসে উঠল তিলি। তার বিড়ালীর মতো কটা চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল।

তিলির চোখে সর্বনাশ দেখতে পেল যেন উদ্ধব। সে মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল।

চব্বিশ

এখন দুপুর।

সেই সকালে উপসাগরে নেমেছিল লা তে। নটিলাস, টার্বো, ট্রোকাস, সান ডায়াল, নানা জাতের নানা চেহারার সামুদ্রিক কড়ি তুলে খানিকটা আগে জল থেকে উঠেছে।

এরিয়াল উপসাগরটা ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে ডান দিকে যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে একটা কালো পাথরের চাঙড়ার ওপর এখন চুপচাপ বসে আছে লা তে।

বাঁ দিকে খানিকটা দূরে একটা প্যাডক গাছের নিচে তিন টুকরো ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে নিয়েছে পানিকর। উনুনে ভাত ফুটছে।

আকাশে পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো, ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে রোদের তেজ এতটুকু মরে নি। তীব্র, ধারাল, উত্তেজক রোদে নোনা জল গেঁজে গেঁজে উঠছে।

দুই হাঁটুর মাথায় থুতনি রেখে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে লা তে। জল শুকিয়ে গায়ে নুন ফুটে বেরিয়েছে। আন্দামানের দরিয়ার সঙ্গে কত কালের জানাশোনা তার। বার চোদ্দ বছর বয়স থেকে শেল ডাইভারের কাজ করে আসছে সে। কোন উপসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো আসে, কোন উপকূলে হাঙর আর অক্টোপাসের আস্তানা, কোথায় পার্ল শেল, কোথায় ফ্রগ শেল, কোথায় নটিলাস আর কোথায় নী-ক্লাম মেলে, এ সব খবর লা তে'র জানা। রেমোরা মাছ, হাঙর আর কামটের সঙ্গে লড়ে লড়ে সে সিপি তোলে। দরিয়া থেকে কর আদায় করে। পনের বিশ বছর ধরে সিপি তুলতে তুলতে দরিয়ার সঙ্গে অদ্ভুত এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে লা তে'র। সঙ্গে যখন কেউ থাকে না, যখন

একেবারেই একা হয়ে পড়ে, কিংবা যখনই একটু ফুরসত পায়, নিরিবিলি সমুদ্রের মুখোমুখি গিয়ে বসে লা তে। ফিস ফিস করে সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলে। দরিয়ার সঙ্গে লা তে'র অনেক কালের নিবিড় বন্ধুত্ব। তার সত্তার সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে, স্বভাবের সঙ্গে সমুদ্র মিশে আছে।

এখন ঝিম দুপুর।

শীতের অনেক আগেই সুদূর হিমালয় থেকে হাজার হাজার পাখি বাতাসে ভাসতে ভাসতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ডিম পাড়তে আসে। শীত যেই শেষ হয়, ডিম পাড়া যেই সারা হয়, পাখিরা আবার ফিরে যায়।

ছোট ছোট ডানায় দিগন্ত মাপতে মাপতে পাখিরা এখন হিমালয়ে ফিরে যাচ্ছে।

লা তে পাখি দেখছিল না। সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফেরাতে মন তার সায় দিচ্ছিল না।

উপসাগরটা অগভীর। এখানে জল নীলচে। কিন্তু দূরে জল গভীর, গম্ভীর, গহীন কালো। অনেক দূরে, যার পর আর দৃষ্টি চলে না, যেখানে আকাশের নীল আর সমুদ্রের কালো একাকার, সেই জায়াগাটা ধূসর হয়ে রয়েছে। সাদা কুয়াশার মতো কী যেন জমে আছে সেখানে। কেমন যেন দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় দেখায়।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল লা তে। অগভীর উপসাগরের মেজাজ সে কিছুটা জানে, নানা জাতের সিপির খবরও তার জানা। কিন্তু বহু দূরে সমুদ্র যেখানে অথৈ অতল, সেখানকার কথা তার জানা নেই।

এতকাল নোনা জলে ডুবে ডুবেও সমুদ্রকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারল না লা তে। দরিয়া রহস্যময় হয়েই রইল তার কাছে। সমুদ্র শুধু জল, ঢেউ আর গর্জনই নয়। সে আরো কিছু। সমুদ্র যে ঠিক কী, অল্পই বুঝতে পারে লা তে। বেশির ভাগই তার না-বোঝা।

দূরে তাকিয়ে লা তে ভাবল, আর উপসাগরের অগভীরে না, যেখান থেকে সিপিরা উপকূলের দিকে আসে, সমুদ্রের সেই অথৈ এলাকায় একবার সে যাবে। ফিস ফিস করে বলতে লাগল, 'যাব। জরুর একরোজ দরিয়ার অন্দরে ডুব মারব। দেখব, তার ভেতর কী আছে।'

'শালে কি পাগলা বনলি! বিজির বিজির করে কী বকছিস!'

লা তে চমকে উঠল। কখন যে পানিকর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারে নি। লাল লাল দাঁত বার করে খুব একচোট খ্যা খ্যা করে হাসল লা তে। তারপর বলল, 'কী মতলব মালেক?'

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'কী আবার মতলব! নালায়েক হারামীটা দরিয়া দেখলে বাওরা বনে যায়! খাবি না? কখন খানা পাকানো হয়ে গেছে!'

'হাঁ, মালেক—' লা তে উঠে পড়ল।

খেতে বসে পানিকরের হঠাৎ চোখে পড়ল। শুধু আজই নয়, দিনকয়েক ধরেই লোকটাকে দেখছে সে। ডাকল, 'লা তে—'

'হাঁ, মালেক—'

'হুই দ্যাখ, লোকটা আজও এসেছে।'

'হাঁ।' সংক্ষেপে জবাব সেরে মাছের সুরুয়া দিয়ে ভাত মাখতে লাগল লা তে।

পানিকর বলল, 'মনে হচ্ছে, লোকটা রিফুজি সেটেলমেন্টের কেউ হবে।'

লা তে জবাব দিল না।

পানিকর বলল, 'তোকে এক রোজ বলেছিলাম, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ইয়াদ আছে?'

'আছে।' বলে একটু কী ভেবে নিল লা তে। ফের বলল, 'লেকিন আপনার মতলবটা তো জানি না।'

ফিস ফিস করে পানিকর বলল, 'জানবি জানবি। সময় যখন হবে তখন আপসে জানতে পারবি। থোড়া সবুর কর।' পানিকরের চোখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

খাওয়ার পালা চুকিয়ে পেতলের থালাগুলো উপসাগরের জলে ধুয়ে মোটর বোটে রাখল পানিকর। তারপর বলল, 'চল লা তে—'

'কোথায়?'

'হুই লোকটার সঙ্গে খাতির জমিয়ে আসি। ওর মারফতই রিফুজি সেটেলমেন্টে যাব। সমঝালি?'

লা তে মাথা ঝাঁকায়।

অন্য দিনের মতো আজও এরিয়াল উপসাগরে এসেছে নিত্য ঢালী। নোনা জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যে পাথরটা কচ্ছপের আকার নিয়েছে, তার ওপর চুপচাপ বসে আছে। উদাস চোখে সামনের দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে সেই পুরনো কথাগুলোই ভাবছে সে। কী মানুষ ছিল সে, আর কী হয়ে গেল! ঘরে অঢেল সোনাদানা মণিমাণিক্য না থাক, তবু দেশে থাকতে নিত্যর হাত-ভরা পয়সা ছিল। পাট-বেচা, ধান-বেচা কাঁচা পয়সা। পঁচিশ কানি তেফসলা জমি রাখত সে। অভাব তার কোনোকালেই ছিল না। যে মানুষ দেশে থাকতে এত পয়সা নাড়াচাড়া করেছে, সরকারি খয়রাতের সামান্য ক'টি টাকা ছাড়া এখন তার হাতে আর কিছুই পড়ে না।

তা ছাড়া কাপাসী যে আবার কোনোদিন ভাল হবে, সুস্থ হবে, এমন আশা নিত্যর মন থেকে প্রায় নির্মূলই হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে তার মতো দুঃখী আর কে?

দূরের সমুদ্র-দ্বীপ-আকাশ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম নিত্যর মনে হল, দিনটা বুঝি ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লহমায় তার ভুল ভাঙল। নিজের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ দু'টো ভিজে গিয়েছিল। চোখের জলই সামনের সব কিছু ঝাপসা করে ফেলেছে।

হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে আচমকা নিত্য ডাকটা শুনতে পেল, 'এ বুড়ঢা—'

মুখ ফিরিয়ে নিত্য ঢালী দেখল, সেই লোক দু'টো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো চুল যার, সে মোটর বোট চালায়। আর কুতকুতে চোখ, থ্যাবড়া-নাক একটা লোক, যে উপসাগরের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে কী যেন তোলে।

পানিকর বলল, 'তোমাকে রোজ এখানে দেখি।'

'হ বাবা—' নিত্য ঢালী হাউ হাউ করে উঠল, 'কী আর করি বাবা, কুলোনিতে মন বহে না। খালি দুঃখু আর দুঃখু। ঘরভরা দুঃখু, পরাণ ভরা দুঃখু। দুঃখুর আর পারকূল নাই। তাই এইহানে আইসা যতক্ষণ পারি একা থাকি। যাউক উই হগল কথা।' একটু থামল নিত্য। খানিক পরে উৎসুক সুরে বলল, 'বাবা, আপনেরাও তো রোজ এইহানে আহেন।'

'হাঁ, আমাদের রোজই আসতে হয়।'

'হেয়াই দেখি। আইচ্ছা বাবা, একখান কথা জিগামু (জিজ্ঞেস করব)?'

'কী কথা?'

'রোজই দেখি উই উনি—' লা তে'কে দেখিয়ে নিত্য ঢালী বলল, 'জলে ডুব দিয়া দিয়া কী য্যান তোলে। কী তোলে বাবা?'

'সিপি (শেল)।'

'সিপি দিয়া কী হয়?'

'বিক্রি করি।'

'ও।'

নিত্য ঢালী চুপ করে গেল। পানিকর আর লা তে তার পাশে ঘন হয়ে বসল।

পানিকর বলল, 'আমার নাম পানি্কর। আমি প্রোপ্রাইটার, মালেক। আর এই বর্মীটা হল লা তে। ডাইভার। বুঝলে বুড়ঢা?'

নিত্য ঢালী সামান্যই বুঝল। লা তে এবং পানিকর নামধারী দু'টি আজব মানুষের দিকে অবাক তাকিয়ে রইল শুধু।

পানিকর আবার বলল, 'তোমার নাম কী?'

নিত্য তার নাম বলল।

'তোমরা তো রিফুজি?'

'হ, বাবা।'

'তোমরাই তা হলে কলোনি বানাচ্ছ?'

'হ, বাবা।'

খানিকটা চুপচাপ।

এরিয়াল উপসাগর সমানে গর্জায়। বিরাট বিরাট ঢেউগুলো বিপুল আক্রোশে পারের ম্যানগ্রোভ বনে আছাড় খায়।

হঠাৎ একসময় পানিকর বলে, 'আচ্ছা বুড়ঢা, তুমি কাম করবে?'

বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

পানিকর বোঝায়, 'তামাম দিন এই পাথরটার ওপর তো চুপচাপ বসেই থাক। তার চেয়ে কাম কর না, রুপাইয়া মিলবে।'

'টাকা পামু?' নিত্য ঢালীর ঘোলাটে চোখ চক চক করে।

'কাম করবে আর টাকা পাবে না?' অদ্ভুত শব্দ করে পানিকর হাসে।

নিত্য ঢালী মনে মনে কী যেন ভাবে। বিড় বিড় করে কী বকে। বুঝিবা ভাবে, যতক্ষণ সেটেলমেন্টে থাকবে ততক্ষণ কাপাসীর অবুঝ হাসি শুনতে হবে। কাপাসীর হাসি তাকে অস্থির, ব্যাকুল করে তোলে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালে বিচিত্র এক যন্ত্রণা তাকে বিকল করে দেয়।

কাপাসীর চিন্তা থেকে কিছুক্ষণ মুক্তি পাওয়ার জন্য এই নির্জন উপসাগরের পারে এসে চুপচাপ বসে থাকে নিত্য ঢালী। কিন্তু এখানে এসেও কি রেহাই মেলে! দামিনী বউ, কাপাসী, দেশভাগ, মাতানি নদীর পারে সেই ছোট হীবাকুপি গ্রাম, জমিজিরেত, সাত পুরুষের ভিটেমাটি—হাজারটা ভাবনা হাজার দিক থেকে তার মাথায় নখ বেঁধায়। তাকে কাবু করে ফেলে।

এই চিন্তা, এই অসহ্য দুঃখ আর যন্ত্রণা কিছুক্ষণের জন্যও অন্তত ভুলে থাকতে চায় নিত্য ঢালী। কিন্তু কেমন করে?

নিত্য ঢালী ভাবল, পানিকরের কাছেই কাজ করবে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে আর যাই হোক, কাপাসীর কথা খানিকটা সময়ের জন্যও ভুলতে পারবে। হা ঈশ্বর, এই কাজটা যেন তার হয়।

দুই হাঁটুর ফাঁক থেকে থুতনি তুলে নিত্য ঢালী বলল, 'কিন্তুক পানিকর বাবা, আমি কি আপনের কাম পারুম?'

'পারবে, পারবে। জরুর পারবে। লা তে তোমাকে সব শিখিয়ে দেবে।'

নিত্য ঢালীর সঙ্গে এ কথা সে কথা বলে একসময় উঠে পড়ল দু'জনে। লা তে আর পানিকর পাশাপাশি চলেছে। কাজটা হাসিল হয়েছে, সেই খুশিতেই মশগুল হয়ে আছে পানিকর। এবারকার মরশুমে লা তে ছাড়া অন্য ডাইভার পায় নি সে। একজন মাত্র ডাইভারের ভরসায় পুরো মরশুম চালানো দুরূহ ব্যাপার। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ধানুককে ভাগিয়ে এনেছিল। কিন্তু হাঙর আর কামটের ভয়ে সে তো জলেই নামল না।

পানিকর ভাবছিল, নিত্য ঢালীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে কিছুটা অন্তত কাজ চলবে। তা ছাড়া, মাথায় অন্য একটা মতলব আছে। সেটা ভাবতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। নিত্য ঢালীর মারফত সে রিফুজি সেটেলমেন্টে ঢুকবে। তাকে সেখানে ঢুকতেই হবে।

পঁচিশ

দিন সাতেক পোর্ট ব্লেয়ারে কাটিয়ে ফিরে এল পালসাহাব। এরিয়াল উপসাগর থেকে জঙ্গল পেরিয়ে সেটেলমেন্টে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল। প্রথমেই নিজের ঝুপড়িতে গেল না সে। কলোনির সবাইকে উদ্ধব বৈরাগীর ঝুপড়িতে ডেকে আনল।

চারপাশে চারটে মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে উদ্ধব।

ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে নামানো রয়েছে পালসাহাবের। ফলে কপাল আর ভুরু ঢাকা পড়েছে। মশাল থেকে যেটুকু আলো পাওয়া গিয়েছে তাতে মুখের চামড়া পোড়া তামার মতো দেখাচ্ছে। বাদামি চোখদু'টো ধক ধক করছে।

সবাই ভয়ে ভয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভিড়ের মধ্য থেকে বুড়ি বাসিনী উঠে দাঁড়াল। বলে, 'কী হইল সাহাব বাবা, কিছু সুরাহা হইল?'

পালসাহাব জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়েই রইল।

বাসিনী আবার বলল, 'হাল বলদের কী হইল সাহাব বাবা?'

'কুছু না, কুছু না—'

দু'হাতে মুখ ঢাকল পালসাহাব। ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'তোদের জন্যে কুছু করতে পারলাম না। এত চেষ্টা করলাম। লেকিন—' ফুসফুসটা খালি করে বড় একটা শ্বাস ফেলল পালসাহাব। তাকে ভীষণ হতাশ দেখায়।

সামনের মানুষগুলো আঁতকে উঠল, 'হাল বলদ পাওয়া যাইব না?'

মাথাটা ঝুলে পড়েছে। আস্তে আস্তে ডাইনে বাঁয়ে সেটা নেড়ে পালসাহাব বলল, 'না। বড় বড় অফসরদের এত বললাম, কিছুই হল না। দো' চার মাহিনার আগে বলদ কি ভইস আসার উপায় নেই। ইন্ডিয়া মুল্লুকের মেনল্যান্ড থেকে বলদ ভইস আসবে। লেকিন জাহাজই পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!'

যে মানুষের ভরসায় তারা বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়ছে, যার প্রাণশক্তি হাজার অপচয় করেও ফুরোয় না, সেই পালসাহাবকে এমন নিরাশ হতে, এমন ভেঙে পড়তে আগে আর কোনোদিনই দেখে নি মানুষগুলো।

'সব্বনাশ! তাইলে কী হইব?' অনুচ্চ, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বিলাপের মতো শব্দ করতে লাগল মানুষগুলো।

'হাল বলদ না পাইলে চাষ হইব ক্যামনে? কত আশা লইয়া আন্ধারমান আইছি। মাটি পাইছি। কিন্তুক ভগমান বাদ সাধল। এইবার কী করুম, কুনখানে যামু? ক্যামনে বাচুম?'

জীবনে যখন কোনো সমস্যা আসে, তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পর্যন্ত এই মানুষগুলো হারিয়ে ফেলেছে। দেশভাগ তাদের মনের জোর একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে। সমস্যা যখনই সামনে এসে পড়ে সহজে তারা সমাধানের উপায় খুঁজে পায় না, আর পায় না বলেই বিব্রত, বিমূঢ় মানুষগুলো সমস্বরে কান্না জুড়ে দেয়।

আজও তারা কাঁদছে। হাল বলদ দিয়ে চষে পরল পরল মাটি তুলে ফেলতে না পারলে এই দ্বীপে ফসল ফলাবার সম্ভবনাই নেই। অথচ পালসাহাব বলছে, দু' চার মাসের আগে বলদ কি মোষ মিলবে না। এরকম একটা বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে মানুষগুলো কাঁদা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে।

ওদের কান্না শুনলে অন্য দিন পালসাহাব খিস্তি করত, খেঁকিয়ে উঠত। কিন্তু আজ নিজেই প্রায় ভেঙে পড়েছে। সে কিছুই বলল না।

বুড়ি বাসিনী এক কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে পালসাহাবের কাছে এগিয়ে এল। ডাকল, 'সাহাব বাবা—'

'হাঁ—' অস্ফুট একটা শব্দ করল পালসাহাব।

'আর কুনো উপায়ই কি নাই? অন্য কুনো জাগা থিকা হালের বলদ আনা যায় না?'

'যায়। লেকিন—'

'লেকিন কী সাহাব বাবা?'

'অনেক রুপেয়ার দরকার।' বলে একটু থামল পালসাহাব। তারপর শুরু করল, 'পুট বিলাস (পোর্ট ব্লেয়ার) থেকে আসার সময় একবার লং আইল্যান্ড নেমেছিলাম। লং আইল্যান্ড থেকে রঙ্গত গেলাম। রঙ্গতে রিফুজি সেটেলমেন্ট হয়েছে। সেখানে খোঁজ করলাম হালের জন্যে যদি বলদ কি ভইস মেলে।'

'মিলল বাবা?' আগ্রহে বুড়ি বাসিনীর মুখটা ঝকমক করে।

'মিলেছে। ওখানকার রিফুজিরা চোদ্দটা বলদ বেচতে চায়। লেকিন এক একটার দাম তিন শ' রুপেয়া। চোদ্দটার দাম পুরা চার হাজার আউর দো শ' রুপেয়া। অত রুপেয়া কোথায় পাব?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মানুষগুলো কান্না থামিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকে।

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ল পালসাহাবের। সে বলল, 'একটা উপায় হতে পারে।'

'কী উপায়?'

'সব রুপেয়া এক সাথ না দিলেও চলবে। পয়লা দফে এক হাজার রুপেয়া দিতে হবে। তারপর মাহিনায় মাহিনায় দিতে হবে। ভাবছি ক্ষেতির সময় তোবা তো ক্যাশ ডোল পাবি। এক এক আদমীর ডোল থেকে মাহিনায় এক এক টাকা কেটে বলদের দাম দেওয়া যেতে পারে। দিবি তোরা?'

'দিমু, দিমু—'

এতক্ষণ মানুষগুলো দম বন্ধ করে বসে ছিল। এবার একটা উপায় খুঁজে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

পালসাহাব ধমকে ওঠে, 'চোপ, চোপ শালে লোগেরা। হল্লা গুল্লা লাগিয়ে দিয়েছে! আগে সব শোন। পয়লা দফের হাজার রুপেয়ার কী হবে?'

মুহূর্তে উৎসাহ চুপসে গেল। মানুষগুলো আগের মতোই আবার মলিন মুখে বসে থাকে।

অনেকটা সময় কেটে যায়।

প্রথম দিকে প্রবল উদ্যমে জ্বলে জ্বলে মশালগুলো এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। জঙ্গলের দিকে থেকে উলটোপালটা, ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে।

হঠাৎ বাসিনী বলল, 'আপনেরা এট্টু খাড়ন, আমি আইতে আছি।' বলতে বলতেই পুব দিকের টিলাটার দিকে ছুটল। কিছুক্ষণ পব হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বলল, 'এইটা দ্যাহেন দেহি সাহাব বাবা—'

পুরনো গড়নের একটা সোনার বিছে হার পালসাহাবের হাতে তুলে দিল বুড়ি বাসিনী। পালসাহাব তাজ্জব বনে গিয়েছে। বলল, 'সোনার হার কোথায় পেলি রে বুড়টী?'

'হে অনেক কথা সাহাব বাবা। উই হার আমার শাউড়ি আমার বিয়ার সময় দিছে। আমার শাউড়ি হের বিয়ার সময় হের শাউড়ির কাছ থিকা পাইছিল।' একটু থামল বুড়ি বাসিনী। পরক্ষণে উদাস গলায় শুরু করল, 'দ্যাশখান দুই ভাগ হওয়ার পর কিছুই তো আনতে পারি নাই, খালি শ্বউরকুলের উই চিহ্নটুক ছাড়া। কত বিপদ আপদ গেছে, কতদিন না খাইয়া থাকছি। তবু উইটুক সোনা বেচতে পারি নাই।' আবার থামে বাসিনী। অল্প অল্প হাঁপায়। ঘোলা ঘোলা, আবছা আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'সাহাব বাবা, আমার তিনকুলে কেও নাই। হোয়ামী না, পুত না, বাপ না, ভাই না, বান্ধব না। খালি উই রসিকই যা আছে। আমারে খুড়ি ডাকছে। ও ছাড়া আর কেউ নাই। নিজের বিপদ আপদের কথা ভাবি না। তিন কাল গেছে। কয়দিন আর বাচুম! তাই ভাবলাম, এই হারখান যদিন হগলের কামে লাগে, উপকারে লাগে—'

একদৃষ্টে বাসিনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে পালসাহাব। কিছু একটা সে বলতে চাইল, পারল না। অদ্ভুত এক আবেগে তার গলা বুজে গেছে।

একটু আগে মানুষগুলো চিৎকার করে কাঁদছিল। কান্না থামিয়ে এখন তারা পালসাহাবের মতোই বাসিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে যত আনন্দ, তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়। সমস্যাটার যে এমন একটা সমাধান হয়ে যাবে, আগে কেউ কি তা ভাবতে পেরেছিল?

বাসিনী বলল, 'হারটার ওজন আছিল পাচ ভরি। উইটা বেচলে হাজার ট্যাকা হইব না সাহাব বাবা?'

'হবে হবে, জরুর হবে।'

এবার এক কান্ডই করে বসল পালসাহাব। পাগলা দু'হাতে বুড়ি বাসিনীকে ওপরে তুলে ধরল। তারপর কয়েক পাক ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'তুই মানুষ না, এই সেটেলমেন্টের সব শালে লোগের মা।'

পাক খেতে খেতে বুড়ি বাসিনী চেঁচাতে লাগল, 'ছাড়েন সাহাব বাবা, ছাড়েন। পড়লে নিঘ্ঘাত মইরা যামু, মইরা যামু।'

যতই চেঁচাক বাসিনী, পালসাহাব তাকে ছাড়ে না।

ছাব্বিশ

উজানী বুড়ির হয়েছে যত জ্বালা। সেই যে সেদিন বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ঝাগড়া হল, তার পর থেকে হারান আর ঘরমুখো হয় না। সকাল-দুপুর-রাত, সারাটা দিনের মধ্যে একবার এসে বুড়ির খোঁজও নেয় না। কোথায় কোথায় যে সে কাটায়!

পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই উজানী বুড়ির। এক ওই হারান। একটা মাত্র নাতি। তার হাত ধরে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেছে সে। ঘব তুলেছে হারান। কিন্তু সেই ঘর শূন্য, খাঁখাঁ। হারানই যদি না থাকে তবে সেই ঘর দিয়ে কী হবে? একা একা কেমন করে দিন কাটায় উজানী বুড়ি!

এখন সকাল। উঠোনের কিনারে দুই হাঁটু আর এক মাথা জোড়া করে চুপচাপ বসে রয়েছে উজানী। আবছা, উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দু'টো ফোলা ফোলা, টকটকে লাল। বোঝা যায়, কয়েকদিন ধরে সে সমানে কাঁদছে।

পুব দিকের কুয়াশা ভেদ করে রোদ দেখা দিয়েছে। সূর্যটাকে এখন এক দলা নরম রক্তিম মাখনের মতো দেখায়।

উঠোনের আর এক কিনারে একটা ছোট প্যাডক গাছ। গাছটা পাতার জিভ মেলে রোদের নির্যাস শুষছে। মগডালে একটা হলদিবনা পাখি আর তার পাখিনী বাসা বুনেছে। এখন পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। একা একা পাখিনীটা চেঁচামেচি শুরু করেছে।

উজানী বুড়ির মন নানা ভাবনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। নানা জনে নানা কথা তাকে বলে যাচ্ছে।

কাল রাতে কুমী এসেছিল। সে বলেছে, 'বুঝলা মাউই, তোমার হারাইনা রাইক্ষসীর মায়ায় পড়ছে। উই যে হাসনী ঢলানী কাপাসী—পাগল না ছাই, হে-ই তোমার নাতির মাথাখান খাইতে আছে। নাতিরে বান্ধো, তার মন বান্ধো। নাইলে কাইন্দা কূল পাইবা না।'

উজানী বুড়ি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কেমনে তারে বান্ধুম কুমী? হে কি দুধের শিশু যে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখুম?'

'বিয়া দাও, বিয়া দাও মাউই। তা হইলেই ঠিক হইয়া যাইব।'

'দিমু, তাই দিমু। কিন্তুক শয়তানটা যে ঘরেই আহে না। কী করি! হা ভগমান, হারাইনার মতিগতি ভাল কইরা দাও।' কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গিয়েছিল উজানী।

উজানী বুড়ি হারানের কথাই ভাবছিল এই মুহূর্তে। কেমন করে তার মতিগতি ভাল হবে, তার মন কাপাসীর দিকে থেকে ফিরবে, ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল।

মেয়েমানুষের দেহই হল সব। ধর্ম বল, কর্ম বল—দেহ ছাড়া মেয়েমানুষের আছে কী? দেহই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে বাকি থাকে কী? কিছুই না। মেয়েমানুষ তখন শুধুই ফক্কিকার।

কাপাসীর শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে কোন কাজে আসবে? তাকে নিয়ে ধর্ম চলবে না, কর্ম চলবে না, সমাজ সংসারে অচল সে। এই সোজা, সহজ কথাটা কেন যে বোঝে না হারান!

হলদিবনা পাখিনীটা বড় ক্যাচর ক্যাচর লাগিয়েছে। দু'দন্ড সুস্থির হয়ে বসে একটা কথা যে ভাববে, তার কি যো আছে!

হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলল উজানী বুড়ি। পাখিনীটা পাতার ভেতর দিয়ে নেচে নেচে বেড়ায়। আর ডাকে, 'চিকির-চিকির চিক-চিক—'

উজানী বুড়ি বলে, 'মাগীর আহ্লাদ দ্যাখ। আমি মরি আমার জ্বালায়.। আমি জ্বলি আমার দুঃখুতে। যা যা, এইহান থিকা যা। চৌখের আবডালে যা।'

পাখিনীটা ডাকে, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

'পুরী আমার শূইন্য, বুক খা কা করে। ঘরে আমার কেও নেই। আর তবা, যত রাইজ্যের পাখপাখালি আপদ আইসা জুটছস। যা যা—হুস—'

পাখিনী যায় না। ঘাড় বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর ডেকে ওঠে, 'চিকির-চিকির চিক-চিক—'

'তর কি, তর পরাণে কত সুহাগ, কত আহ্লাদ। উজানী বুড়ি হইয়া পিরথিমীতে জম্ম নিতি, তা হইলে বুঝতি। এইবার থাম—থাম লা মাগী। হারাইনা নাই। তোগো নিয়া আমি কী করুম? পারলে তারে আইনা দে।' পাখিনীটা কী বুঝল, সে-ই জানে। আগের মতোই নাচল, লাফাল, ডাকল, 'চিকির-চিকির চিক-চিক—'

অনেকক্ষণ পাখিনীটার সঙ্গে ঝগড়া করল উজানী।

একসময় পুরুষ পাখিটা ফিরে এল। খুব একচোট চেঁচামেচি করে তাকে নিযে বাসায় ঢুকল পাখিনীটা।

এদিকে একটু থিতিয়ে নিয়ে আবার হারানের কথা ভাবতে শুরু করল উজানী। না, এই শেষ বয়সে ছেলেটা তাকে আর শান্তিতে থাকতে দেবে না। সেই যে দেশভাগ হল, তারপর ক'টা বছর ক্যাম্পে, ক্যাম্পে, স্টেশনের প্লাটফরমে কিভাবে যে বেঁচে থেকেছে! দিন কেটেছে তো রাত কাটে নি। রাত যদি বা ফুরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অফুরন্ত দুঃখের দিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুঃখ, দুঃখ। দুঃখের যেন শেষ নেই, পাব নেই, কূল নেই। সুখ শান্তি সোহাগ অহ্লাদ বলে পৃথিবীতে আরো কিছু কিছু যে বস্তু আছে, সে সবের স্বাদ একেবারেই ভুলে গিয়েছিল উজানী বুড়ি। অনেক দুঃখ, অশেষ যন্ত্রণা পার হয়ে একদিন এই দ্বীপে এসেছিল তারা। পায়ের নিচে মাটি পেয়ে উজানী বুড়ি স্বপ্ন দেখেছিল, হারানের বউ আসবে। নাতির বউকে নিয়ে জীবনের শেষ সাধটা সে মিটিয়ে নেবে। কিন্তু সবই কপাল, সবই অদৃষ্ট।

জীবনে কোনো সাধই মিটল না উজানী বুড়ির। সতের বছর বয়সে যখন তার ভরা যৌবন তখন স্বামী মরল। রাঁড়ী হল সে। তারপর একে একে সবাইকে খেল। ছেলেকে খেল, ছেলের বউকে খেল। আপন বলতে একটা মাত্র নাতি। উজানী বুড়ি শোকাতাপা মানুষ। কোথায় তাকে একটু শান্তি দেবে হারান, তা নয়। নিত্য ঢালীর নষ্ট পাগল মেয়েটাকে সে বিয়ে করতে চায়।

উজানী বিড় বিড় করে বকতে লাগল, 'কিন্তুক সোনা, তুমি যা ভাবছ তা হইব না। আমি যদ্দিন পিরথিমীতে আছি তদ্দিন আমার মতেই চলতে ফিরতে হইব।'

একটু থেমে পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'বজ্জাতের ছাও, সাত দিন তুই ঘরে ফিরস না। মরতে মরতে সারা গেরাম তরে খুজছি, কিন্তুক পাই নাই। তুই যে কোথায় আছস, বুঝাতে পারছি। আইজ হেইখানেই যামু।'

সাত দিন ধরে সমানে হারানকে খুঁজছে উজানী। তার কি সেই দিন আছে? সেই গতরও কি আছে? না গতরে সেই সামর্থ্য আছে? এ কি পদ্মা-মেঘনা পারের সেই সমতলের দেশ! এ আন্দামান দ্বীপ। চড়াই-উতরাই, টিলা-জঙ্গল। যতদূর যেদিকে তাকানো যায়, শুধু পাহাড়ের ঢেউ। একটু টিলা বাইতেই হাঁপ ধরে যায় উজানী বুড়ির।

একে বয়স হয়েছে। তার ওপর বাতের ব্যথা, শূলের ব্যথা, বায়ুর দোষ। হাজার জাতের রোগ উজানীর জীর্ণ, কুঁজো, অস্থিসার শরীরে বাসা বেঁধেছে।

এই ক'দিন হারানকে খুঁজতে বেরিয়ে একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসেছে উজানী। তাকে না পেয়ে হতাশায় দুঃখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে নিজের ওপর, হারানের ওপর, চোখের সামনে যে পড়েছে তার ওপর খেপে উঠেছে উজানী। মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদেছে আর বলেছে, 'হারাইনা রে, এই বয়েসে বড় দুঃখু দিলি। তর মুখের দিকে তাকাইয়া বুক বানছি (বেঁধেছি)। হেই বুকখান আমার ভাইঙ্গা দিলি রে—'

হারানের কথা ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল উজানী।

হারান যে কোথায় আছে, কাল রাতে কুমী তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। উজানী ঠিক করে ফেলল, যেমন করে পারুক আজ তাকে ধরবেই।

সাতাশ

অনেক, অজস্র মানুষ।

শুধু মানুষ হিসাবেই তাদের পরিচয় নয়। তাদেব মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য ভাগ আছে, ভেদ আছে, সীমারেখা আছে। পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী জাতও নির্দিষ্ট আছে। কেউ জেলে, কেউ তাঁতি, কেউ মালো, কেউ যুগী, কেউ সোনারু, কেউ বারুজীবী, কেউ বা নাপিত।

দেশভাগ সব ভাগ, সব ভেদ, সব সীমাবেখা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। এদের তখন একটা মাত্র পরিচয়। কেউ আব জেলে, যুগী বা সোনারু নয। এমনকি মানুষও না। তখন তারা উদ্বাস্তু, সরকারি ভাষ্যে রিফিউজি।

এতদিন তাদের জাত ছিল না। রিফিউজি ক্যাম্পে, স্টেশনেব প্ল্যাফরমে কি খোলা আকাশের নিচে মানুষগুলো এক, অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেয়েছে। ঘর পেয়েছে। সংসার পেয়েছে। পায়েব নিচে মাটি পেযে, মাথাব ওপর ছাউনি পেয়ে, সংসার পেয়ে আবার তারা সমাজ গড়ে তুলেছে। মাটি আর ঘর, সমাজ আর সংসারই শুধু না, দেশভাগের পর যে জাত তারা হারিয়ে ফেলেছিল, যে ভাগ, যে ভেদ এবং যে সীমারেখাগুলো ভেঙে গিয়েছিল, সে সব ফিরে এসেছে।

উত্তর আন্দামানের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে মানুষ এসেছে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জাত এসেছে। জাতের সঙ্গে তার বিচারও এসেছে।

হাজাব হাজার বছর ধরে পদ্মা-মেঘনা পারে মানুষ যে জীবন গড়ে তুলেছিল, পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই এই দ্বীপে এসে গেল।

আজ বেরুতে একটু দেরি একটু করে ফেলেছে নিত্য ঢালী।

লা তে তাকে সিপি তোলার কায়দা কানুন শিখিয়ে পড়িয়ে নিযেছে। ইদানীং উপসাগরে ডুব দিযে দিয়ে সিপি তোলে। কোনটা কোন জাতের সিপি, কোনটার নাম টার্বো, কোনটার নাম নটিলাস, কোনটার নাম সান ডায়াল, কোনটা ফ্রগ শেল—সব চিনে ফেলেছে নিত্য ঢালী। লা তে'ই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

জলের সঙ্গে যুঝে যুঝে সিপি কুড়োতে হয়। সিপি তোলার অভ্যাস না থাক, জলের সঙ্গে যোঝার অভ্যাস আছে নিত্য ঢালীর। সে জল-বাংলার, সেই পদ্মা-মেঘনা পারের মানুষ।

নতুন কাজে প্রচুর উৎসাহ নিত্যর। ভোর হতে না হতে এরিয়াল উপসাগরে চলে যায়। সারা দিন সিপি তুলে সেটেলমেন্টে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়।

এ কাজে ভয় যে নেই তা নয়। হাঙর, কামট এবং বিষাক্ত মাছেরা আছে। অক্টোপাস আছে। যে কোনো মুহূর্তে চোরা ঘূর্ণির ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা। তবু উৎসাহ পাচ্ছে নিত্য ঢালী। তার প্রথম কারণ,

কিছুক্ষণের জন্য হলেও কাপাসীর কথা, জীবনের হাজারটা চিন্তার কথা সে ভুলে থাকতে পারে। আরো একটা কারণ আছে। রোজ কাজের শেষে দশ টাকা হিসেবে মজুরি দেয় পানিকর।

কাজের কথা পালসাহাবকে বলেছে নিত্য ঢালী। সে যে একটা কিছু নিয়ে আছে, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে দু'পয়সা রোজগার করছে, এতে পালসাহাব খুব খুশি।

তার পিঠে একটা চাপড় মেরে পালসাহাব বলেছিল, 'শাবাশ শালে নিত্য। এই তো চাই।'

আজ অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। ফলে জঙ্গলের মাথায় আর কুয়াশা নেই। পুব দিকে আকাশ থেকে ঝকঝকে রোদের ঢল নেমে এসেছে। বনভূমি ফাঁকা করে সাগরপাখিরা সমুদ্রে চলে যাচ্ছে।

চড়াই-উতরাই বেয়ে জঙ্গল ফুঁড়ে অন্তত মাইল ছয়েক যেতে পারলে এরিয়াল উপসাগর। সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে যাবে।

রোদের চেহারা দেখে অস্থির হয়ে পড়ে নিত্য ঢালী। কিন্তু ঘর থেকে বাইরে পা দিয়েই চমকে উঠল সে। হারানের ঠাকুমা উজানী বুড়ি টিলা বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। ঘরটার সামনে এসে খুব একচোট হাঁপায় সে। বড় বড় শ্বাস টানতে থাকে।

পাটের ফেঁসোর মত রুক্ষ, আঠা-আঠা চুল উড়ছে বুড়ির। ঘোলাটে চোখ দু'টো জ্বলছে। বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছে। দেখেই বোঝা যায়, বুড়ি ভয়ানক উত্তেজিত।

উজানী বলল, 'এই যে ঢালীর পুত—'

'কী কও মাসি?'

নিত্য ঢালী উজানী বুড়িকে মাসি ডাকে। ডাকেরই মাসি সে। এমনি কোনো সুবাদ নেই। দু'জনের জাত গোত্র ভিন্ন। এক জায়গায় থাকতে হলে যেটুকু সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে হয় তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

উজানী খেপে উঠল, 'মাসি! আমি তর কুন জন্মের মাসি রে শয়তানের ছাও!'

মাথা ঠান্ডা রেখে নিত্য ঢালী বলে, 'সকালে উইঠ্যা কি কাইজার (ঝগড়ার) মন নিয়া আইছ মাসি?'

'হ রে ঢালীর ছাও। যদি এক বাপের পুত হ'স তা হইলে সত্য ক'বি (বলবি)।'

মেজাজ কতক্ষণ আর ঠিক রাখা যায়? নিত্য ঢালীও তেতে উঠল, 'দেখ বুড়ি, আর যাই কব বাপ তুইলো না। ভাল হইব না কইলাম।'

'বাপ তুলুম, জাত তুলুম, তর চৌদ্দ গুষ্টি তুলুম। কী করবি? আমার মাথা কাটবি?'

'চুপ মার বুড়ি—' নিত্য ঢালী রুখে উঠল, 'নাইলে তরই একদিন কি আমারই একদিন। সক্কালবেলা ভগমানের নাম করব, না মাগী আইছে আমার লগে কাইজা মারতে। যা যা, চৌখের সুমুখ থিকা যা—'

'যামু যামু—' হঠাৎ ডুকরে উঠল উজানী, 'যামু, সত্যই যামু। হারাইনারে বাইর কইরা দে। তারে নিয়া আমি অহনই চইলা যামু।'

'হারান!' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

'হ হ, হারান—আমার নাতি। সাত দিন হে ঘরে ফিরে না। সাত দিন তারে দেখি না। দে নিত্যা, তারে বাইর কইরা দে।'

'কী কও তুমি মাসি! হারান তো এইহানে আহে নাই।'

'মিছা কইস না নিত্য। এই দ্বীপের হগলে জানে, হারান তর ঘরে আছে।' নিত্য ঢালীর একটা হাত ধরল উজানী। তার বুকে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল, 'তর ভালা হইব নিত্য, হারানরে তুই ফিরাইয়া দে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হইয়া গেল মাসি! কে তোমারে লাগাইছে, তুমিই জান। ভগমানের কিরা (দিব্যি) কাইটা কই, হারানরে আমি পনর দিনের মইধ্যে দেহি নাই।' একটু থেমে নিত্য ঢালী বলল, 'আমি কামে যামু। তুমি ঘরে যাও মাসি।'

নিত্য ঢালীর হাতটা ধরে ছিল উজানী বুড়ি। হঠাৎ সেটা ছেড়ে সে ফুঁসে উঠল, 'ঢালীর পুত তর মনে কী আছে, আমি জানি। কিন্তুক তুই যা ভাবছস, তা হইব না।'

নিত্য ঢালী অবাক হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি মরি আমার জ্বালায়। তুমি আমার পোড়ানি বাড়াও। খোলসা কইরা কও দেহি, তোমার মনে কী আছে!'

'আমার মনে যা আছে, কমু। কিন্তুক তুই যদি সত্য না ক'স তো তর মাইয়ার মাথা খাবি।'

শান্ত গলায় নিত্য ঢালী বলল, 'খামু। এইবার কও।'

'তর মাইয়ার লগে হারানের বিয়া দিতে চাস না?'

'কী কও তুমি!'

'আমি একা কমু ক্যান? পিরথিমীর হগলে কয়। তর মতলব জানতে কারো বাকি নাই।'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে নিত্য ঢালী। তারপর বলে, 'যদি হারানের লগে কাপাসীর বিয়া দেই, ক্ষেতিটা কী হয়!'

'হা ভগমান, তুমি অহনও আছে! অহনও আকাশে চন্দর সুরুয ওঠে। ভগমান পোড়াকপাইলার মাথায় ঠাটা (বাজ) ফালাও।'

কেঁদে ককিয়ে চেঁচিয়ে অস্থির হয়ে উঠল উজানী বুড়ি, 'নিত্যা, তুই কি ভুইলা গেলি তরা ঢালীর জাত। আর আমরা কাপালী। যে সে কাপালী না, শিউলি কাপালী। পাগলচান আমাগো গুরু। ভিন জাতের লগে কি আমাগো বিয়া হয়, না হইতে পারে! হে ছাড়া—'

উজানী বুড়ির কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরের ভেতর থেকে সেই তীব্র, অবুঝ হাসির শব্দটা ভেসে আসতে লাগল। কাপাসী হাসছে। উজানী বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'একে ভিন জাত, তার উপুর উই পাগল লষ্ট মাইয়া—'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিত্য ঢালী, 'বাইর হ, অহনই বাইর হ। নাইলে তরে খুন করুম।'

নিত্য চেঁচায় আর হাঁপায়। হাঁপায় আর বলে, 'বাপ তুললি, কিছু কইলাম না। গুষ্টি তুললি, চৌদ্দ পুরুষ তুললি, তভু মুখখান বুইজা রইলাম। জাত গোত ধোয়ালি, হেয়াও সইলাম। কিন্তুক আর না। মাইয়ার নামে এট্টা মোন্দ কথা কইলে তর দাত আমি ছুটাইয়া দিমু। যা যা, বাইর হ মাগী—'

নিত্য ঢালীর মারমুখী চেহারা দেখে এক পা, এক পা করে পিছু হটে উজানী বুড়ি। আর একটা শব্দও তার মুখ থেকে বেরোয় না।

মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে।

উজানী বুড়ি চলে যাওয়ার পর উঠোনের এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে নিত্য ঢালী। বেলার মনে বেলা বাড়ে। রোদের তাপ চড়তে থাকে। নোনা জলের মাঝখানে এই মিঠে মাটির দ্বীপ তেতে ওঠে।

চুপচাপ বসেই থাকে নিত্য। আজ আর তার এরিয়াল উপসাগরে যাওয়া হয় না।

আটাশ

বুড়ি বাসিনীর হারটা বেচে এগার শ'টাকা পেয়েছিল পালসাহাব। সেই টাকা দিয়ে প্রথম কিস্তির দাম মিটিয়ে মিডল আন্দামানের রিফিউজি জি সেটেলমেন্ট থেকে চোদ্দটা বলদ নিয়ে এসেছে সে।

চোদ্দ বলদে সাতটা হাল নেমেছে। এখন দিন রাত চাষ চলছে।

সাতটা মাত্র হাল। সাতটা হালে কি আর এতজনের জমি চষা যায়? তাই পালসাহাবের ব্যবস্থা অনুযায়ী দিনে এবং রাতে মাটি চষার কাজ চলছে।

দিনের আলোতে হাল চালাবার অসুবিধা নেই। রাতেও মশাল জ্বালিয়ে কাজ চলছে।

লাঙলের ফলায় ফলায় মাটি উথলপাথল হয়ে যাচ্ছে; পরল পরল উপড়ে আসছে।

পালসাহাব ঠিক করে ফেলেছে, নতুন বর্ষা নামার আগেই এই দ্বীপকে সে পুরোপুরি চৌরস করে ফেলবে।

সেটেলমেন্টের একটি মানুষেরও জিরান নেই, বিশ্রাম নেই। খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া তারা জমিতেই কাটাচ্ছে।

পালসাহাব আজকাল নিজের ঝুপড়িতেই ফেরে না। দু'বেলা মা-তিন তার জন্য ভাত নিয়ে আসে জমিতে।

এর মধ্যেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন খিলাফৎ খান রিফিউজি সেটেলমেন্টে এল। জঙ্গল সাফ হয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। টিলায় টিলায় বেতপাতার চাল মাথায় নিয়ে ঘর উঠেছে। দ্বীপের কী হাল ছিল, আর এই নতুন মানুষগুলো এসে কী হালই না করেছে!

সরাসরি চাষের জমিতে এসেই উঠল খিলাফৎ। হাতের সামনে পালসাহাবকে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'এ শালে পালসাহাব—'

'আরে আও আও, খিলাফৎ দোস্ত—' লম্বা রোমশ একটা হাত বাড়িয়ে খিলাফৎকে কাছে টেনে নিল পালসাহাব। বলল, 'তারপর কী মনে করে ইয়ার?'

'নিজের আঁখে সব কুছ দেখতে এলাম।'

লাল লাল, নোংরা দু'পাটি দাঁত মেলে খুব একচোট হাসল পালসাহাব। বলল, 'ক্যায়সা দেখলে?'

'বহুত খারাপ।' বলে একটু থামল খিলাফৎ খান। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'এই জঙ্গল বহুত বদনসিব।'

'কেন?'

'আরে হারামী, তা না হলে কি তোর হাতে পড়ত! এত রোজ জঙ্গলে কাম করলি, তবু জঙ্গলকে ভালবাসতে শিখলি না। জঙ্গলের সাথ উলফতি মহব্বতি, কিছুই হল না। জঙ্গলেব এ কী হাল কবেছিস পালসাহাব!' খিলাফৎ পাঠানের গলায় দুঃখ, আক্ষেপ এবং বেদনা-মেশা অদ্ভুত স্বর ফোটে।

'কী হাল করেছি?'

'জঙ্গলের জান তুড়েছিস। কেটে কুটে তাকে লবেজান কবে ফেলেছিস।'

'ভালই তো হয়েছে।' পালসাহাব হাসল, 'এখানে গাঁও বসছে, ক্ষেতিবাডি হচ্ছে, খামাব হচ্ছে, কুঠিবাড়ি উঠছে। মানুষ এসেছে।'

'আ রে, থাম থাম। মানুষ পুরা দুশমন, পুরা হারামী। না, তোবা আমাকে এখানে আর টিকতে দিবি না। উত্তরে, সেই ল্যান্ডফল জাজিরাতে চলে যাব। জরুর যাব। সেখানে এখনো বিলকুল জঙ্গল আব জঙ্গল। মানুষ কোনোদিন সেখানে যেতে পারবে না।'

এরপর থেকে প্রায়ই আসতে লাগল খিলাফৎ খান। পালসাহাবের সঙ্গে গল্প করে সে। নতুন বাসিন্দাদের অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। তাদের সঙ্গেও গল্প করে। গল্প আর কি, শুধু জঙ্গলের কথা। উত্তর দক্ষিণ এবং মধ্য আন্দামান, হ্যাভলক দ্বীপ, সেন্টিনেল দ্বীপ—আন্দামানের দ্বীপমালা জুড়ে যে অরণ্য মাথা তুলে আছে, তার কথা বলে।

প্যাডক পাপিতা চুগলুম দিদু—এক এক রকম গাছের নাকি এক এক বকম মেজাজ। জঙ্গলে ঢুকলে গাছেরা নাকি তার সঙ্গে কথা বলে। জঙ্গলের সঙ্গে তার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। এই জঙ্গল তাকে মানুষের দুশমনি বেইমানির হাত থেকে বাঁচিয়েছে, তাকে শান্তি দিয়েছে, স্বস্তি দিয়েছে। এমন একটা সময় এসেছিল যখন বার বার দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মবতে চেয়েছে খিলাফৎ। বার বাব গলায় রশি দিতে চেয়েছে। কিন্তু আন্দামানের জঙ্গল তাকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছে।

এমনি সব আজব আজব কথা বলে খিলাফৎ খান।

খিলাফৎ খান ফরেস্ট গার্ড। কত কাল যে আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঠিক হিসাব কি সে নিজেই জানে! জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে, নানা জাতের গাছ দেখে আর নিজের দিকে তাকায় খিলাফৎ খান। গায়ে খসখসে, কোঁচকানো চামড়া যেন গাছের ছাল, লোমগুলি যেন গাছের শ্যাওলা, হাত-পা যেন ডালপালা, মাথার চুল যেন গাছের রাশি রাশি পাতা। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সে এক প্রাচীন বৃক্ষ হয়ে গিয়েছে।

খিলাফতের যা মনের গঠন তাতে নিজের সঙ্গে গাছের উপমা দেওয়ার মতো কল্পনাশক্তি তার নেই।

কিন্তু অনেক কাল জঙ্গলে কাটিয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এই উপমাটা তার মনে এসেছে। জঙ্গল তাকে বাঁচিয়েছে। খিলাফতের জীবনে এর চেয়ে বড় সত্যি আর নেই।

মানুষের ওপর বিশ্বাস প্রেম ভালবাসা, ইত্যাদি হারিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল খিলাফৎ।

পালসাহাব যে সময় আন্দামান আসে, তারও দশ পনের বছর আগে খিলাফৎ খান এখানে এসেছিল। সে সময় সেলুলার জেল তৈরির কাজ চলছে। ভাইপার দ্বীপের কয়েদখানায় দু'মাস বিশ দিন কয়েদ খেটে জঙ্গলে কুলি খাটতে যায় সে। তারপর পঞ্চাশ না ষাট বছর পার হল, অত হিসেব খিলাফৎ রাখে না।

অনেক হিসেবই গোলমাল হয়ে গিয়েছে। স্মৃতি থেকে অনেক মানুষ অনেক ঘটনা হারিয়ে গিয়েছে তার। কত কিছু যে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে! তবু আজও, অবিকল সেই ঘটনাটার কথা মনে করতে পারে খিলাফৎ।

চাচাতো ভাই হায়দার যেদিন তাকে মিথ্যে খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে সমস্ত জীবনের সাজা খাটাতে আন্দামান পাঠাল সেদিন বিস্ময়ে দুঃখে যন্ত্রণায় বোবা হয়ে গিয়েছিল সে। আল্লাহ্‌র কাছে, দিনদুনিয়ার মালেকের কাছে সে শুধু কেঁদেছিল, 'খুদা, তুমি তো জানো আমি সাচ্চা মানুষ। বিলকুল বেকসুর, বেগুনাহ্—'

তখনো মানুষের ওপর কিছু কিছু বিশ্বাস ছিল খিলাফতের। আশা ছিল, সাজার মেয়াদ ফুরোলে সে দেশে ফিরবে। দেশে তার শাদি-করা বিবি আছে। বিবির কাছে থাকবে সে। বহু বছর পর বিবিকে ফিরে পাবে, এই বিশ্বাসের জোরে মুখ বুজে দ্বীপান্তরী সাজা খেটে গিয়েছে খিলাফৎ। কিন্তু সব বিশ্বাস একদিন হারিয়ে ফেলল সে, মানুষকে অবিশ্বাস করতে, ঘৃণা করতে শিখল।

দক্ষিণ আন্দামানের গারাচারামাতে তখন জঙ্গল 'ফেলিং' অর্থাৎ বন কাটা চলছে।

দেশ থেকে হঠাৎ চিঠি এল, তার বিবি সেই চাচাতো ভাইয়ের ঘর করছে। খবরটা পেয়ে উন্মাদের মতো হয়ে উঠল খিলাফৎ খান। বার তিনেক সমুদ্রে লাফ দিল। তিন বারই ফরেস্টের কুলিরা তাকে তুলে আনল। বার দুই গলায় দড়ি দেওয়ার সব বন্দোবস্ত করে ফেলল। দু'বারই ফরেস্টের জবাবদাররা তাকে বাঁচাল।

এই সব ঘটনার পর থেকে তাকে পাহারা দিয়ে রাখা হত। মরে যে খিলাফৎ বাঁচবে, তার কোনো উপায়ই রইল না।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

ঋতুর চাকায় মাস বছর সময় পাক খেয়ে ফিরতে থাকে। জঙ্গলে জঙ্গলেই তার দিন কেটে যায়। জঙ্গলের ঠান্ডা হিম হিম ছায়া একটু একটু করে খিলাফতের সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিতে লাগল।

মানুষের সঙ্গ ছেড়ে জঙ্গলের আরো গভীরে নেমে গেল সে। অরণ্য তাকে আশ্রয় দিল, গভীর অন্তহীন স্নেহে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

মানুষের কাছ থেকে অনেক, অনেক দূরে সরে গিয়ে জঙ্গলের গভীর, নিবিড় স্বাদ একটু একটু যেন বুঝতে পারল খিলাফৎ।

তার মনের এক দিকে মানুষের প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা, আর এক দিকে জঙ্গলের জন্য অপার মমতা, অশেষ অফুরন্ত ভালবাসা।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন খিলাফৎ দেখতে পেল, তার গায়ের চামড়া গাছের ছালের মতো খসখসে, মাথাটা গাছের ঝুপসি পাতার মতো, হাত-পা ডালপালার মতো। খিলাফৎ দেখল, পঞ্চাশ ষাট বছর আন্দামানের জঙ্গলে কাটিয়ে প্যাডক, চুগলুম কি দিদু গাছের মতো সে-ও একটা গাছ হয়ে গিয়েছে।

আজকাল প্রায় রোজই ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে আসে খিলাফৎ। বলে, 'এখানে আর থাকব না। উত্তরে, বিলকুল উত্তরে ল্যান্ডফল জাজিরাতে, যেখানে স্রিফ জঙ্গল আর জঙ্গল, সেইখানেই চলে যাব। কোনো আদমীকে সেখানে আর যেতে হবে না।'

নতুন বাসিন্দাদের কেউ কিছু বলে না। অবাক হয়ে আন্দামানের এই আজব মানুষটার কথা শোনে। কিছু বোঝে, বেশির ভাগটা বোঝে না।

একদিন দুপুরের দিকে ধুঁকতে ধুঁকতে এল খিলাফৎ।

অনেক বয়স হয়েছে। শিরদাঁড়াটা বয়সের ভারে বেঁকে গিয়েছে। ঝুঁকে ঝুঁকে সে হাঁটে। এখন চোখদু'টো টকটকে লাল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। একটু চলে, আবার থামে। হাঁপায়, কাশে। তারপর দম নিয়ে টলতে টলতে এগোয়।

খিলাফৎকে দেখে এটাই মনে হয়, একটা জীর্ণ, বয়স্ক, প্রাচীন গাছ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে পৌঁছেছে।

পালসাহাব তাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল।

জমিতে লাঙল চলছিল। লাঙল ফেলে সবাই পালসাহাবের পিছু পিছু ছুটল।

টলতে টলতে টক্কর খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল খিলাফৎ। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে জাপটে ধরল পালসাহাব। আর ধরেই চমকে উঠল। খিলাফতের গা অসহ্য গরম। প্রচন্ড জ্বর হয়েছে।

পালসাহাব বলল, 'এ কি, মালুম হচ্ছে তোমার বুখার!'

'হাঁ।' বলতে বলতে ঘাডটা ভেঙে পড়ে খিলাফতের। পালসাহাব কাঁধে মাথা রেখে নির্জীব গলায় বলে, 'বুখারই মালুম হচ্ছে।'

'বুখার নিয়ে তোমার আসা ঠিক হয় নি খানসাহাব। চল, শোবে চল। থোড়া আরাম করে 'বীটে' ফিরবে।'

ঘোর ঘোর, রক্তাভ চোখ দু'টো একবার মেলল খিলাফৎ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল। কিছু বলল না সে।

আস্তে আস্তে খিলাফৎকে হাঁটিয়ে সামনের একটা টিলার দিকে এগুতে লাগল পালসাহাব। মানুষগুলো পিছু পিছু আসছিল। এক ধমকে তাদের আবার জমিতে পাঠিয়ে দিল, 'শালে কুত্তার পাল, আপনা কামে যা—'

খিলাফতের বুক থেকে ঘড়ঘড়ে হাঁপানিব মতো একটা শব্দ আসছে। পালসাহাব বলল, 'তখলিফ হচ্ছে?'

'হাঁ। বুকটা ফেটে চুর চুর হয়ে যাবে রে পালসাহাব। আর হাঁটতে পারছি না।' গলার ভেতব থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরুতে লাগল খিলাফতের।

পালসাহাব খুব নরম সুবে বলল, 'আর একটু খানসাহাব, থোড়া দূর। এই এসে গেল—'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?'

এক মহূর্ত কী যেন ভাবল পালসাহাব। তার চোখ দু'টো হঠাৎ খুশিতে চিক চিক করে উঠল। গাঢ় গলায় বলল, 'যেখানে নিয়ে গেলে মানুষের ওপর বিশোয়াস ফিরে পাবে, দিলের তাপ পাবে, যো কুছ হারিয়ে ফেলেছ তার সব ফিবে পাবে, সেইখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি খানসাহাব।'

খিলাফৎ জবাব দিল না।

উনত্রিশ

সেটেলমেন্টের শেষ মাথায় রামকেশবের ঘর। রামকেশব ফরিদপুর জেলার মানুষ।

সাত পুরুষের ভিটেমাটি হারাবার শোক রামকেশবের প্রাণে কতটুকু বেজেছে, তাকে দেখে বুঝবার যো নেই।

কথা রামকেশব খুব কমই বলে। সাতটা প্রশ্ন করলে একটা জবাব মেলে কি মেলে না। বড় চাপা মানুষ সে। একেবারে পাথরের মতো ঠান্ডা, নির্জীব।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে চলে যেন রামকেশব। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। দিনরাত কী এক চিন্তায় যেন জর্জর হয়ে আছে। রামকেশবের সংসারে সে ছাড়া আর মাত্র একটি মানুষ। সে হল তার বউ ক্ষিরি। আরো দু'জন ছিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তারা নেই।

রামকেশব যেমন চাপা স্বভাবের মানুষ, তার বউ ক্ষিরি ঠিক উলটো। দিনরাত সে কথা বলে। লোক না পেলে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই বকে যায়। ডিগলিপুরের বাসিন্দারা বলে, ক্ষিরির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

মাথা খারাপ হওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। না হওয়াই ছিল বিস্ময়ের।

দেশভাগের দুঃখ তবু সইত, কিন্তু ছেলেমেয়ে হারানোর কষ্ট সইল না। রামকেশব আর ক্ষিরি—একজন দুঃখে পাথর, আর একজন মুখর।

দেশ দু'টুকরো হওয়ার পর আর দশজনের মতো রামকেশবরাও কলকাতায় এসেছিল। সঙ্গে ছিল ছেলে আর মেয়ে। পরী আর সুবল। পরী বড়, বছর সতের বয়স। সুবল ছোট, বয়স দশ।

শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সে সব দিনে লঙ্গরখানার সদাব্রত বসেছিল। মাথা পিছু এক ডাব্বা কালচে খিচুড়ি, আর এক খাবলা ঘ্যাঁট।

লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে আমাশা ধরল সুবলের। আমাশা থেকে রক্ত আমাশা। তাতেই একদিন ছেলেটা মরল। বাকি রইল মেয়েটা।

পরী তখন যুবতী হয়েছে। লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়েও অঢেল স্বাস্থ্যে সে শুধু যুবতীই না, রূপসীও হয়ে উঠেছে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বাপ-মায়ের বুক কাঁপে। তারা কাঁদে আর বলে, 'হা ভগমান, একটারে নিছ, আর একটারে রাখ। বাপ-মায়ের বুক খালি কইরা দিও না।'

ঠিক খুপরি না, খোপও না। শিয়ালদা স্টেশনের পাশে যে ফালতু জমি আর ফুটপাত পড়ে রয়েছে তারই এক টুকরো দখল করে পেটা টিন, পিচবোর্ড, চট দিয়ে ঘিরে নিয়েছিল রামকেশব। শুধু রামকেশব কেন, আরো অনেকেই।

হাত ছয়েক মাত্র উঁচু ছাউনি। সামনের দিকে সুড়ঙ্গ। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বর্ষা, লজ্জা-শরম, সব কিছুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ওই ছাউনিটাই একমাত্র ভরসা। জন্ম-মৃত্যুও ওই একই ছাউনিতে।

রামকেশব স্টেশনে ভিক্ষে করত। ভিক্ষে করতে করতে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ব্যবসাটির কায়দা কানুন শিখে নিয়েছিল। সংসার, মেয়ে-বউ, কারো দিকে তার নজর ছিল না। ভিক্ষে করবে, না সংসারের দিকে নজর রাখবে?

ক্ষিরি মেয়েকে নিয়ে ছাউনিতে থাকত। সামনের দিকে ফুটপাত। সেখানে তিন টুকরো ইট সাজিয়ে টিনের কৌটোতে জাউ রাঁধত। পচা ঘেয়ো আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধত। আর লক্ষ করত, সামনের ল্যাম্প পোস্টের গায়ে ঠেসান দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে।

লোকটার পোকায়-খাওয়া দাঁত, ধূর্ত ধারাল চোখ, ওলটানো চুল। পরনে পাজামা আর বুকখোলা শার্ট।

চোখাচোখি হলেই লোকটা দাঁত বার করে হাসত। খুক খুক করে কাশত। লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরালেই ক্ষিরি দেখতে পেত, পরী একদৃষ্টে সেই লোকটার দিকেই তাকিয়ে আছে।

মেয়েকে ঠেলে গুঁতিয়ে ছাউনিটার ভেতর ঢোকাতে ঢোকাতে ক্ষিরি চেঁচাত, 'মর মর, তুই মর। আমার হাড্ডি জুড়াউক।'

রোজ সকালে এসে দাঁড়াত লোকটা। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকত। অনেক রাতে রামকেশব ফিরে এলে তাকে আর দেখা যেত না।

মেয়েকে দু'হাতে আগলে আগলে রাখত ক্ষিরি। তবু তাকে বাঁচাতে পারল কই?

ক'দিন পর ব্যাপারটা তার চোখে পড়ে গেল।

সন্ধের একটু আগে, কর্পোরেশনের লোকেরা তখনো রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি, একটা চৌকো ফাঁকা বনস্পতি তেলের টিন নিয়ে কল থেকে জল আনতে গিয়েছিল ক্ষিরি। ফিরে এসে দেখে সেই লোকটা পরীর সঙ্গে ফিস ফিস করে কী যেন বলছে।

ক্ষিরিকে দেখেই লোকটা চট করে সরে গেল। জলের টিন নামিয়ে রেখে পরীর চুলের মুঠি ধরল ক্ষিরি। বলল, 'সব্বনাশী, উই শয়তান তরে কী কয়?'

'ছাড় মা, ছাড়। হগল কমু তোমারে।'

'ছাড়ুম না, কিছুতেই না। আগে ক' কী কয় হেই শয়তানে—'

'আমারে শাড়ি দিতে চায়, ট্যাকা দিতে চায়, মিঠাই দিতে চায়।'

'আইজই পেরথম উই শয়তানটার লগে কথা ক'লি?' চিলের মতো ধারাল, হিংস্র চোখে তাকিয়ে থাকে ক্ষিরি।

'না মা, তুমি যহনই এদিক উদিক যাও, তহনই ও আমার লগে কথা কইতে আহে।'

'আমারে ক'স নাই ক্যান সব্বনাশী?' 'চুলের মুঠি ছেড়ে পাগলের মতো পরীর নাকে মুখে কিল চড় বসাতে থাকে ক্ষিরি। মার খেয়ে পরী পড়ে যায়। এবার নিজের চুল ছেঁড়ে ক্ষিরি। দুম দুম করে বুকে কিল মারতে মারতে বলে, 'তুই মর। আমিও মরি। আমার কী হইব! হে ভগমান!'

মার খেয়ে পরী পড়ে গিয়েছিল। টেনে হিঁচড়ে তাকে এবার ছাউনিটার ভেতর ঢুকিয়ে দেয় ক্ষিরি।

এত করেও পরীকে বাঁচান গেল কই? একদিন তাকে পাওয়া গেল না। ল্যাম্প পোস্টের গায়ে ঠেসান দিয়ে যে লোকটা দিনরাত বিড়ি ফোঁকে, সেও উধাও হয়েছে।

সুবল মরল। পরী নিখোঁজ হল। ঠিক নিখোঁজ না, সে-ও আরেক ভাবে মরল। দেশভাগই তাকে মারল।

তারপর থেকেই ক্ষিরি যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

সেটেলমেন্টের শেষ মাথায় সব চেয়ে উঁচু টিলাটার ওপর রামকেশবের ঘব।

ঘরটার সামনে বসে দিনরাত উকুন বাছে ক্ষিরি। কালো কালো লিকগুলি নখের মাথায় রেখে টিপে টিপে মারে। পট পট শব্দ হয়। উকুন মারে আর বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। কাঁদে আর বলে, 'আমার সুবল রে, আমার পরী রে, তরা কই। তরা নাই, আমার কোল-বুক খালি হইয়া গেছে। তরা আয়, ফিরা আয়। আয় রে বাপ, আয় রে মা। আমার লক্ষ্মী সুনা, আমাব মণি মাণিক্যি। আয়, তরা না আইলে আমার পুরী যে আন্ধার।' শুধু বিনিয়ে বিনিয়েই কাঁদে না ক্ষিরি, অভিসম্পাত দেয়। চোখের সামনে যাকে পায় তাকেই শাপাশাপি করে, 'পুতের মাথা খা। মাইয়ার মাথা খা। আমার লাখান পুতখাকী মাইয়াখাকী হইয়া নিঃবংশ হ। তরা পুত নিয়া মাইয়া নিয়া সুখে ঘর করস। অত সুখ সইব না। পুতের সুখ মাইয়ার সুখ আমার ভোগে লাগল না। মনে করস, তোগো ভোগে লাগব? কিছুতেই না। আমার বুক আমার ঘর খা খা করে। তোগো বুকও খা খা করব। শ্মশান হইয়া যাইব।'

ছেলেমেয়ে নিয়ে কাউকে সংসার করতে দেখলে খেপে ওঠে ক্ষিরি। বলে, 'সইব না, সইব না। অত সুখ ভোগে লাগব না। আমারও লাগে নাই, তোগোও লাগব না।'

ছেলেমেয়ের সুখ ঘুচেছে ক্ষিরির। অন্য কাউকে সেই সুখে বিভোর দেখলে বুকের ভেতরটা জ্বলে যায় তার।

সুবল আর পরীকে হারিয়ে স্নেহ প্রীতি মমতা, জীবনের সমস্ত কিছু খুইয়ে ফেলেছে ক্ষিরি। পৃথিবীর কোনো মানুষের জন্যই তার মনে এতটুকু কোমলতা নেই।

এখন দুপুর।

আজও উকুন বাছছিল ক্ষিরি। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল।

খিলাফৎকে নিয়ে পালসাহাব এসে পড়ল। ডাকল, 'এ চাচী—' ক্ষিরিকে চাচী ডাকে সে।

একবার মুখ তুলেই আবার উকুন বাছতে লাগল ক্ষিরি।

পালসাহাব বলল, 'এই দ্যাখ, কাকে এনেছি—'

'কারে আনছস পালসাহাব?'

'বল তো কাকে এনেছি?'

কারো দিকে না তাকিয়েই ক্ষিরি বলল, 'তুইই ক'।'

একটু কী যেন ভাবল পালসাহাব। তারপর বলল, 'তোর লেড়কাকে নিয়ে এসেছি চাচী।'

'সত্য?' সংশয়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পালসাহাবের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষিরি। আবার বলল, 'সত্য ক'স?'

'হাঁ হাঁ সচ, জরুর সচ—'

উকুন বাছতে বাছতে উঠে এল ক্ষিরি। খিলাফতের থুতনি ধরে নেড়ে নেড়ে মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এ তো বুড়া মানুষ। এ আমার সুবল হইব ক্যামনে? তুই যে কী ক'স পালসাহাব! তর মাথা খারাপ।'

এতক্ষণ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল ক্ষিরি। এবার তীক্ষ্ণ শব্দ করে হেসে উঠল।

গাঢ় গলায় পালসাহাব বলল, 'বুড়্‌ঢা হোক আর বাচ্চা হোক, এ-ই তোর ছেলে। খুব বুখার হয়েছে। চল, একে ঘর নিয়ে যাই।'

'ব্যারাম হইছে?'

'হাঁ।'

'তুই যহন ক'স আমার পুত তহন ঘরেই নিয়া চল।' বলেই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল ক্ষিরি, 'ও আমার সুবলা রে, মায়ের বুক খালি কইরা দিয়া তুই কই গেলি!' কাঁদতে কাঁদতে পালসাহাব আর খিলাফৎ খানকে নিয়ে সে ঘরে ঢুকল।

মাচানের ওপর ছেঁড়া চট আর ছেঁড়া কাঁথার উঁচু বিছানা। তার ওপর খিলাফৎকে শুইয়ে দিল পালসাহাব।

জ্বরে মুখটা টস টস করছে। চামড়ায় অসহ্য তাপ। মুখ হাঁ হয়ে আছে। ঘড়ঘড়ে হাঁপানির টানের মতো শব্দ হচ্ছে। টেনে টেনে গাঢ় মন্থর শ্বাস নিচ্ছে খিলাফৎ। বুকটা তোলপাড় হচ্ছে। গলার কাছটা ধুক ধুক করছে। মাঝে মাঝে অস্ফুট গলায় কী যেন বলছে খিলাফৎ, ঠিক বোঝা যায় না।

পালসাহাব ডাকল, 'কাছে আয় চাচী—'

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ খিলাফতের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষিরি। চোখ কুঁচকে কী ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বিছানার পাশে এসে বসল।

খিলাফতের মুখের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজছে ক্ষিরি। হঠাৎই কী যেন সে পেয়ে গেল।

ক্ষিরির মুখটা এখন চকচক করছে।

ত্রিশ

রাত যেন অথৈ কালো সমুদ্র। সেই সমুদ্রেব ওপর সাদা ফেনার মতো কুয়াশা ভাসছে।

কুয়াশার স্তরগুলি ভেদ করে আকাশ পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয় না। সেখানে হয়তো চাঁদ আছে, হয়তো নেই।

মায়াবন্দরের জাহাজঘাটায় এখন তিনটি মূর্তি বসে আছে। প্রোপ্রাইটার পানিকর, ডাইভার লা তে এবং একজন নতুন মানুষ। কাল পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এখানে এসেছে। নাম আধারকর। আধারকর পানিকরের অনেক কালের পুরনো বন্ধু।

এখন কত রাত, কে বলবে।

জাহাজঘাটার একধারে করাত-কল। সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দূরে টিলার মাথায় সারি সারি কাঠের বাড়ি, প্যাডক আর নারকেল গাছ। সমস্ত কিছু গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

মায়াবন্দরের এই দ্বীপের এখন কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। সব কিছু ঝাপসা। সমুদ্রের অশান্ত গর্জন আর মৌসুমি বাতাসের একটানা মাতামাতি ছাড়া এখানে আর কোনো শব্দ নেই।

আধারকর বলল, 'আমার কথাটা ভেবে দেখেছ?'

'হাঁ।' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল পানিকর। ফিস ফিস করে বলল, 'তোমার মতলবটা বহুত আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ। তারপর আধারকর আবার শুরু করল, 'বুঝলে দোস্ত, সিপির ব্যবসাতে আর সেই সুখ নেই। দরিয়া শালে মক্ষীচুষ (কৃপণ হয়ে) গেছে।'

আধারকরও সিপির কারবারী। বছর দশেক আন্দামানের দরিয়া থেকে সিপি কুড়িয়ে বিদেশের বাজারে চালান দিচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র ক্রমশ কৃপণ হয়ে যাচ্ছে। আগে আগে যত সিপি মিলত, ইদানীং আর তত পাওয়া যায় না। ডাইভারদের মজুরি, মোটর বোটের তেলের দাম, খাই খরচ—হাজারটা ঝামেলা মিটিয়ে পোষাতে আর চায় না।

সিপির ব্যবসাতে আগে লাভ ছিল। কিন্তু আজকাল আগের সেই মধু নেই। অথচ আধারকর ভাগ্য ফেরাতে চায়।

ভাগ্য ফেরাতে হলে দরিয়ার মর্জির ওপর ভরসা করে থাকলে চলে না। সিপির পেছনে অনিশ্চিতভাবে কতদিন আর ছোটা যায়?

আধারকরের মাথায় তাই অন্য একটা ফিকির এসেছে। পানিকর তার অনেক কালের বন্ধু। তাকে নিয়েই নতুন কাজে নামতে চায় সে। আজ ক'মাস ধরে পানিকরকে সমানে ফুসলোচ্ছে।

আধারকর বলল, 'বাঁচতে তো হবে। হাড্ডি চুর চুর করে সিপি তুলব। সেই সিপি সাফ করব। তারপর চালান দেব। না না, অত খাটুনি পোষায় না পানিকর।'

'ও তো ঠিক বাত।'

'দেখ ইয়ার, এই দুনিয়াতে লাভের ব্যবসা সিরফ দু'টো আছে। একটা শরাবের—' বলতে বলতে আধারকর ঝুঁকে পড়ল। তারপর পানিকরের কানে মুখটা গুঁজে চাপা গলায় বলতে লাগল, 'আর একটা হল আওরতের।'

পানিকর মুখে কিছু বলল না। কিন্তু খুব একচোট মাথা ঝাঁকাল। আধারকর আবার শুরু করল, 'জানো ইয়ার, আমার এক শালা পাঞ্জাবি রিফুজি লেড়কীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। একেবারে লাল হয়ে গেল।'

অন্ধকারে পানিকরের চোখ দু'টো ধক ধক করে

আধারকর থামে না, 'তাই ভাবছিলাম, এখানে এমন একটা ব্যবসা ফাঁদলে কেমন হয়? সে কথা তোমাকে আগেও জানিয়েছি।'

কুয়াশা আর অন্ধকারে সমুদ্র রহস্যময় হয়ে আছে। উঁচু উঁচু ঢেউগুলি পাবে এসে আছাড় খায়। জলের রং আঁচ করা যায় না। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যায়, কুয়াশা আর অন্ধকারের নিচে বিপুল সমুদ্র উথলপাথল হচ্ছে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে লা তে। দিনের সমুদ্রকে তবু কিছু কিছু বুঝতে পারে সে। কিন্তু অফুরন্ত অন্ধকারে নিজেকে জড়িয়ে যে অস্পষ্ট সমুদ্র এখন দুর্জ্ঞেয় রহস্যে মেতে আছে, তাকে কোনোদিনই বুঝতে পারে না।

লা তে'র পাঁজরে কনুই দিয়ে আস্তে একটা গুঁতো মারল পানিকর। ডাকল, 'এ লা তে—'

লা তে চমকে উঠল, 'হাঁ মালেক, কুছু বললেন?'

'আর শালে, দরিয়া দেখলে হুঁশ থাকে না।'

লা তে কিছু বলল না। শব্দ করে খুব একচোট হাসল।

পানিকর বলল, 'শালে একদম পানির পোকা।'

'হা হা—' লা তে হাসতেই লাগল। পানির পোকা বলাতে সে খুশিই হয়েছে।

'থাম শালে, আধারকরের বাত শোন।'

'কহিয়ে আধারকরজি—'

আধারকর বলতে লাগল, 'শরাবের ব্যবসা তো করা যাবে না। শুনছি সিরকার আন্দামানে শরাব বিলকুল বন্ধ করে দেবে। তাই ভাবছি, আওরতের ব্যবসাটাই চালু করব।'

লা তে শিউরে উঠল, 'লেকিন—'

'লেকিন ফেকিন কুছ নেহী। আগে আমার বাত শোন।' বলে, কেশে গলাটা সাফ করে নিল আধারকর। আস্তে আস্তে বলল, 'এক এক লেড়কীর জন্যে আমি হাজার রুপেয়া দেব।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে।

তারপর পানিকরই প্রথম কথা বলল, 'হা-জা-র রু-পে-য়া—' তার স্বরে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা সন্দেহ এবং অনেকখানি লোভ মেশানো।

'হাঁ, ইয়ার।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই কখন যেন লা তে উঠে চলে গিয়েছে।

মায়াবন্দরের জাহাজঘাটায় অন্ধকার আব কুয়াশা মেখে বাকি দু'টো মূর্তি বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকে।

একত্রিশ

দিন-মাস-বছর দিয়েই শুধু নয়, সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-আনন্দ দিয়েও মানুষ তার জীবনকে, তার আয়ুকে মেপে মেপে চলে। জীবনের এই নিয়ম বুঝি সব জায়গাতেই এক। তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। বঙ্গোপসাগরের এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপেও জীবনের সেই সনাতন নিয়মটি কাজ করে যায়।

নিত্য ঢালীর সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে উজানী বুড়ি ভেবেছিল, চুলোয় যাক হারান। তাকে আর খুঁজবে না। বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছিল, 'যা, তর বান্ধবরা যেইখানে আছে হেইখানেই যা। তাগো কাছেই থাক। তব মুখ আমি আর দেখতে চাই না। ক্যান দেখুম? যে না দ্যাখে আমারে তারে লউক চামারে।'

মুখে তো এত বলল, তবু মনকে বুঝ মানাতে পারল কই? ভেবেছিল, হারানের ব্যাপারে সে পাষাণ হবে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। ক্ষুব্ধ, অভিমানী মনটা যেই একটু থিতলো, সঙ্গে সঙ্গে হারানের খোঁজে আবার বেবিয়ে পড়ল উজানী বুড়ি।

হারান নিত্য ঢালীর বাড়িতে ওঠে নি। এ ক'দিন সে ছিল উদ্ধব বৈরাগীর কাছে। সেখানে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কেঁদে, ভাই-দাদা-সোনা বলে নাতির মনটাকে নরম করে ফেলল উজানী বুড়ি।

শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরল হারান।

হারান ঘরে ফিরলেই বা কী, তার আগে উদ্ধব বৈরাগীর কাছে থাকলেই বা কী, উজানী বুড়ির সেই যে সন্দেহ হয়েছিল তা আর ঘুচল না। তার ধারণা, হারান নিত্য ঢালীর ঘরেই ছিল। ওর গন্ধ পেয়ে উদ্ধবের কাছে চলে গিয়েছিল।

আজকাল হারানকে আর বিয়ের কথা বলে না উজানী বুড়ি। ভাত জ্বাল দিতে দিতে কি উঠোন নিকোতে নিকোতে নিজের মনেই আক্ষেপ করে, 'বিরিক্ষ (বৃক্ষ), আগে আছিলা কার? তোমার। অহন কার? অমুক বান্ধবের।' একটু থামে। আবার শুরু করে, 'কিন্তুক এই বান্ধবেরা আছিল কুনখানে? যহন দুই বছরের শিশু রাইখা বাপ মরল, মা মরল, তহন তারা আইতে পারে নাই? হেই শিশু অহন বড় হইছে, হাত-পা হইছে, পাখ হইছে অহন তো বান্ধব জুটবই। জুটুক জুটুক। তর কপাল তুই খাবি। আমার আর কি? কিছুই না। আমার আর কয়দিন! তিন কাল গেছে। গতর নাই, বয়েস নাই, আমার কিছুই নাই। ভাবছিলাম তর সোংসার গুছাইয়া দিয়া যামু। কিন্তুক নিজের কপাল নিজে পোড়াইলে পরে কী করতে পারে?' বুড়ি সমানে বকে যায়।

সবই দেখে হারান, সবই শোনে। কিন্তু মুখ খোলে না। মুখ খুললেই তো অনর্থক চেঁচামেচি। একটা অনর্থ বেধে যাবে।

তাই দেখেও হারান দেখে না, শুনেও শোনে না। কানে তুলো আর চোখে ঠুলি দিয়ে মুখ বুজে থাকে। আদতে উজানী বুড়িকে গ্রাহ্যই করে না হারান।

অনেক আগেই সকাল হয়েছে।

দ্বীপের পাখিরা সমুদ্রে চলে গিয়েছে। দিনের প্রথম রোদ জঙ্গলের মাথায় ঝলকাচ্ছে।

বাঁশের মাচানে এখন শুয়ে রয়েছে হারান।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে সোনার তারের মতো সরু সরু রোদের রেখা চোখে এসে বিঁধছে। সকাল বেলার ঘুমের মৌতাত ছুটে যাচ্ছে। অগত্যা রোদ ঠেকাবার জন্য কাঁথাটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিল হারান। কিন্তু কাঁথা মুড়ি দিলেই কি ঘুমোবার যো আছে?

গুপী, বিলাস আর যোগেন এসে ডাকাডাকি শুরু কবল, 'হারান, আঁই হারান, আর কত ঘুমাবি? ওঠ ওঠ—'

উঠতেই হল। বিরক্ত গলায় বিড় বিড় করে হারান, 'না, সুখের ঘুমটুক যে ঘুমামু তার উপায় নাই। বিহানে আইতে কইছি, শয়তানেরা রাইত থাকতে উইঠা আইছে।' মাচানে বসেই আড়মোড়া ভাঙল সে। একটা একটা করে হাত-পায়ের বিশটা আঙুল মটকাল। গুনে গুনে দশটা হাই তুলল।

বাইরে গুপীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, 'হারান, আঁই হারান—মরলি নিকি? ওঠ—ওঠ—'

'আরে, যাই যাই—' ক্যাচা বাঁশের ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এল হারান। আর বেরিয়েই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

গুপীরা একপাল কুকুর নিয়ে এসেছে। জন্তুগুলো উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল হারান। বিস্ময়ের ভাবটা কাটলে জিজ্ঞেস করল, 'এত কুত্তা দিয়া কী হইব?'

'কাইল রাইতের কথা আজ বিহানেই ভুললি!' গুপীরা বলতে থাকে, 'তুই তাজ্জব করলি হারান। তর মনখান কই থাকে রে বান্দর?'

হারান জবাব দিল না। তার মনে পড়েছে, কাল রাতেই ঠিক করা হয়েছিল, আজ সকালে তারা জঙ্গলে শুয়োর মারতে যাবে। তাই গুপীরা কুকুর নিয়ে এসেছে। নাঃ, আজকাল সব ব্যাপারেই বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে তার।

গুপীরা তাড়া লাগাল, 'চল—সুয্যি উইঠা গেছে ... দেরি করনের কাম নাই।'

আগে আগে কুকুরের পাল চলল। পেছন পেছন গুপী, হারান, বিলাস আর যোগেন।

শুয়োর মারতে তারা পশ্চিম দিকের পাহাড়ে যাবে।

টিলার পর টিলা পেরিয়ে, চড়াই-উতরাই ভেঙে, জঙ্গল ঠেঙিয়ে হারানরা চলেছে। চলতে চলতে একবার মুখ তুলে ওপরে তাকাল তারা। সূর্যটা আকাশ বেয়ে বেয়ে অনেকখানি উঁচুতে উঠে এসেছে। পশ্চিমা বাতাস এতক্ষণ ঢিমে তালে বইছিল। হঠাৎ খেপে উঠল। জঙ্গলের মাথা মুচড়ে মুচড়ে তার মাতামাতি শুরু হল।

নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে দিয়ে পথ। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল হারান। গুপীরা বলল, 'কী হইল, এইহানে খাড়লি যে!'

'তরা জঙ্গলে যা, আমি এট্টু পরে যামু।'

বেলা চড়ছে। রোদের তাত বাড়ছে। গুপীরা আর দাঁড়াল না; কুকুরের পাল নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

ঝিম মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হারান। এখান থেকে নিত্য ঢালীর ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। উঠোন, বাঁশের পাটাতনের দাওয়া, ঘরের বেড়া, ঝাঁপ—সব কিছুই স্পষ্ট।

উঠোনে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসেছে নিত্য ঢালী আর একটা লোক। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হারানের দিকে পেছন ফিরে সে বসে আছে।

পেছন দিকটা দেখে হারান যতদূর আন্দাজ করতে পারছে তাতে মনে হয় লোকটা এই সেটেলমেন্টের কেউ না।

এই উপনিবেশের কাকে না চেনে হারান! সবার চেহারা তার মুখস্থ। দূর থেকে দেখেই সে বলতে

পারে কে যোগেন, কে পালসাহাব আর কে রসিক শীল। কিন্তু এই লোকটাকে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে একেবারে নতুন মনে হচ্ছে।

লোকটা সম্বন্ধে বেশ ধন্দে পড়ে গেল হাবান। কী নাম, কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, নিত্য ঢালীর সঙ্গে এত মাখামাখি হল কী করে, এমনি হাজারটা প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুলতে লাগল।

একসময় হারানের চোখে পড়ল, কথা বলতে বলতে নিত্য ঢালী আর সেই লোকটা টিলা বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে।

পাশেই একটা প্যাডক গাছ। সরকারি বনবিভাগের লোকেরা গাছটার ডালপালা এবং ছাল পুড়িয়ে দিয়েছে। কী যেন ভেবে আধপোড়া কবন্ধ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল হারান। যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তা-ই।

লোকটা এই সেটেলমেন্টের কেউ নয়। চামড়ার রং কুচকুচে কালো, পুরু পুরু ঠোঁট, কোঁকড়া চুল।

লোকটাকে কোত্থেকে নিত্য ঢালী জুটিয়ে এনেছে, ঈশ্বরই জানে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এরিয়াল উপসাগরের দিকে চলে গেল নিত্য ঢালী।

প্যাডক গাছটার গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হারান। তার চোখে পড়ল, খোলা বারান্দার পাটাতনে একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে কাপাসী। নতমুখ, আঁটা ঠোঁট, উদাসীন চোখ। পশ্চিমা বাতাস এক একবার খেপে উঠে চুলগুলো উড়িয়ে নিয়ে কাপাসীর মুখ ঢেকে দিচ্ছে।

টিলা বেয়ে তর তর করে ওপরে উঠে এল হারান। কিছুক্ষণ উঠোনের এক কিনারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

নাঃ, যেমন ছিল তেমনি বসে রইল কাপাসী। কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই।

ধীবে ধীরে কাপাসীর সামনে এসে দাঁড়াল হারান। একবাব মুখ তুলেই নামিয়ে নিল কাপাসী।

হারান ডাকল. 'কাপাসী—'

শান্ত গলায় কাপাসী বলল, 'কও—'

'নিত্য তালুইর লগে একজনেরে দেখলাম। নয়া মানুষ মনে হইল।'

'ও, তাইলে দেখা হইছে!'

একটু থতমত খেল হারান। বলল, 'এইখান দিয়া শুয়োর মারতে যাইতে আছিলাম। দেখলাম, নিত্য তালুই আর নয়া মানুষটা সমুন্দুরের দিকে গেল। তাই—'

'তাই খবর নিতে আইলা?'

'হ।'

অনেকক্ষণ আর কেউ কিছু বলে না। হারান ভেবেছিল, নিজের থেকেই সব জানাবে কাপাসী। লোকটা কে, কী নাম, কেন এসেছিল, ইত্যাদি। কিন্তু যখন সে কিছুই বলল না, রীতিমতো ক্ষুব্ধ হল। ক্ষোভ, দুঃখ মনের মধ্যে চেপে রাখতে জানে হারান। নিজের গরজেই ফের জিজ্ঞেস করল, 'নয়া মানুষটা কে?'

'পানিকর ভাই। বাপে তার কাছে কাম করে। পানিকর ভাই বড় ভালামানুষ। কামের বদলে ট্যাকা দ্যায়। আমাগো কত তত্ত্বতালাস করে।' এবার পানিকর সম্বন্ধে একসঙ্গে অনেক কথা বলে কাপাসী।

'পানিকর ভাই! এর মইদ্যে সম্বন্দও পাতান হইয়া গেছে!' হারানকে উত্তেজিত দেখায়।

কাপাসী বলতে থাকে, 'মাইনষের লগে মাইনষের সম্বন্দ পাতাইতে হয় না। আপনা থিকাই পাতান থাকে। বুঝলা পুরুষ—'

'অ্যাত দিন বুঝি নাই।'

খানিকটা চুপচাপ। তারপর হারানই আবাব শুরু করে, 'তোমার পানিকর ভাই কি রোজই আহে?' বলে চোখ কুঁচকে কাপাসীর দিকে তাকায়।

'পেরায়ই আহে। আমাগো কত উপকার করে।'

টেনে টেনে হারান বলে, 'উপকারী বান্ধব! তা এই বান্ধবখান এতদিন কই (কোথায়) আছিল?'

কাপাসী জবাব দেয় না।

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হারান। কিন্তু যে কাপাসী উদাসীন তার সঙ্গে সেধে সেধে কত কথাই বা বলা যায়!

মাথার ভেতরটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল হারানের। সে বলল, 'আমি অহন যাই।'

মুখে কিছুই বলল না কাপাসী। মাথাটা সামান্য কাত করল শুধু।

উত্তেজনায়, দুঃখে এবং ক্ষোভে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। ভারী, নিরেট কান্না গলার ভেতর ডেলা পাকিয়ে আছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

টিলা বেয়ে টলতে টলতে নিচের দিকে নামছিল হারান। একটা কথা ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কাপাসীর পানিকর ভাই এল। সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্র, অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসিও থেমে গেল। অন্য দিনের মতো কাপাসী আজ তো কল কল হাসিতে মেতে উঠল না!

কাপাসীর কথা যতই ভাবে, মাথাটা ততই গরম হয়ে ওঠে হারানেব। একবার বসতেও বলল না, নিজের থেকে একটা কথাও বলেনি সে। হারান কিছু জিজ্ঞেস কবলে দু' কথায় দায় সেরেছে।

হারানের মনে হল, তার সম্বন্ধে কাপাসী কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কেন?

খেয়াল ছিল না, কাপাসীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন নিজেব ঘরে ফিরে এসেছে।

আজ আর হারানের শুয়োর মারতে যাওয়া হল না।

বত্রিশ

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে বর্ষা এসে গেল। চৈত্র থেকে যে ছন্নছাড়া দিশেহারা মেঘগুলি আকাশময় ভেসে বেড়াচ্ছিল, আষাঢ়ে সেগুলো জমাট বেঁধে গেল।

আকাশটা মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। মেঘ এত নিবেট এত জমাট যে আকাশের নীল দেখাব মতো কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। মাঝে মাঝে আকাশটা আড়াআড়ি চিড় ধরে। কড় কড় শব্দে বাজ গর্জায়। সাপের জিভের মতো বিদ্যুৎ লিক লিক করে। আর দিনরাত আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় গুরু গুরু ঘা পড়ে।

পশ্চিমা বাতাসের দাপট বড় সাঙ্ঘাতিক। কিন্তু আন্দামানের মেঘ এত ঘন, এত ভারী যে ঝড়ো হাওয়াও তা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। মেঘের গায়ে বাড়ি খেয়ে বাতাস ফিরে যায়।

মেঘ উড়িয়ে নেবে কি, বাতাসই রাশি রাশি মেঘ তাড়িয়ে তাড়িয়ে আন্দামানের আকাশে নিয়ে আসছে।

একদিন সব আয়োজন শেষ হল। তারপরেই শুরু হল বৃষ্টি। এখানে বর্ষণের বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই, সময়ের হিসেব নেই। দিনরাত ঝরছে তো ঝরছেই।

পুরু মেঘের স্তর আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে দিবারাত্রি। দূরের কাছের টিলা-জঙ্গল-পাহাড়, সব কিছু ঝাপসা হয়ে আছে।

সীসের মতো বৃষ্টির রঙে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

বর্ষা নামার আগেই পালসাহাব নয়া সেটেলমেন্টের বাসিন্দাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, 'এবার বারিষ নামবে, খুব সাবধান। চালে আর এক দফা ছাউনি চাপা।'

আন্দামানের বর্ষার স্বরূপ এই নতুন মানুষগুলো জানে না। আগে ভাগে তাদের সতর্ক করে না দিলে বিপদ অনিবার্য।

জল যেই নামে, সব গর্ত বুজে যায়। গর্তের যারা বাসিন্দা, সাপ-বিছে-কানখাজুরা, এমনি নানা

জাতের সরীসৃপ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। মানুষের ঘর ছাড়া এই আদিম, বর্বর দ্বীপে নিরাপদ আশ্রয় কোথায় মিলবে? সরাসরি তারা ঘরেই এসে ঢোকে।

পালসাহাবের কথামতো নতুন বাসিন্দারা ঘরের চালে পুরু করে আর এক পরল বেতপাতা এবং তার ওপর টিন চাপিয়েছে। সাপ-বিছে-পোকামাকড় যাতে ঢুকতে না পারে সেজন্য বেড়ার গায়ে সব ফাঁকফোকর ন্যাকড়া গুঁজে গুঁজে বুজিয়ে ফেলেছে। ঘরের আড়াগুলো তক্তা দিয়ে আটকে দিয়েছে।

সাতদিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে।

দু'মাস আগেও কিলপণ্ড নদীটাকে দেখে হারান হেসেছিল। হাত বিশেক চওড়া একটা তিরতিরে, প্রায় স্রোতহীন খালের নাম কিনা নদী!

এখন যদি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে হারান দেখত! সোঁতা খালটার চেহারা কি ভয়ানকই না হয়ে উঠেছে। বিশ হাত চওড়া খালটা এখন পঞ্চাশ হাত হয়ে গিয়েছে। আর তীরের মতো দুর্দম বেগে জল ছুটছে। স্রোতের তোড়ে শেকড়সুদ্ধ বিরাট বিরাট গাছগুলি উপড়ে যাচ্ছে।

বর্ষার দৌলতে কিলপণ্ড নদী কী মারাত্মকই না হয়ে গেল!

শুধু কি কিলপণ্ড নদীই, ওপাশের ডিগলিপুরের খালটারও একই দশা। বর্ষার জল পেয়ে সেটাও খেপে উঠেছে। ফুলে ফেঁপে ফেনিয়ে উঠে এরিয়াল উপসাগরেব দিকে ছুটছে।

এদিকে এই বৃষ্টির মধ্যেও পালসাহাব বেবিয়ে পড়েছে। রোজই সে সেটেলমেন্টটা টহল দিয়ে বেড়ায়। এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। জল হোক, ঝড় হোক, অসুখ হোক, বিসুখ হোক, কিছুতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার যো নেই।

পায়ে গাম বুট, গায়ে রবারেব রেনকোট। পা ফেললেই বুট কাদায় গেঁথে যায়। সঙ্গে সঙ্গে টেনে তোলে পালসাহাব। অতি কষ্টে কাদা আর বৃষ্টির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে এগোয়। এগোয় আর চিল্লায়, 'শালে লোগ, হোঁশিয়ার। সাপ-বিছে-কানখজুরা বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকবে।' কিন্তু বৃষ্টির একটানা শব্দে পালসাহাবের গলার আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।

টহল মারতে মারতে এর-ওর-তার ঘরে গিয়ে বসে পালসাহাব। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা বলে, 'এবার তো তোদের বহোত মজা। বারিষ পড়ল। মিট্টিও লাঙলের গুঁতোয় চৌপট হয়ে আছে।'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ পালসাহাব। বষ্যাটা এট্টু ধরলেই বীজ রুইতে যামু।'

'মালুম হচ্ছে ফসল এই মিট্টিতে ভালই ফলবে।'

'তাই মনে হয়।' সকলেই ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়।

কিছুক্ষণ বসেই উঠে পড়ে পালসাহাব। আয়েশ করে বসে গল্প করার সময় কোথায়? এই বর্ষাতেও তার অনেক কাজ। কারো চাল হয়তো ফুটো হয়েছে, তা মেরামত করে দেয়। কেউ হয়তো ব্যারামে পড়েছে, তার ওষুধের ব্যবস্থা করে। প্রতিটি ঘরে ঘুরে সকলের খোঁজ খবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটেলমেন্টের শেষ মাথায় উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে আসে পালসাহাব। গামবুট রেনকোট খুলতে খুলতে বলে, 'তামাক সাজো উস্তাদ—'

মায়াবন্দর থেকে হুঁকো, কলকি, মাখা তামাক যাবতীয় সরঞ্জামই এনে দিয়েছে পালসাহাব। জুত করে তামাক টানতে টানতে সে বলে, 'লাগাও উস্তাদ, সেই গানাটা লাগাও।'

রোজই এক নিয়ম। কী গান তা আর বলতে হয় না। উদ্ধব তা বুঝে নেয়।

দো-তারার তারে আঙুল টেনে টেনে টুং টাং শব্দ করে উদ্ধব। তারপর খানিকক্ষণ গুন গুন সুর ভেঁজে গাইতে থাকে ঃ

ওরে যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?

একসময় হুঁকোর শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক, অনেক দূরে সীসারঙের বৃষ্টিতে আকাশটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দিগন্তের ওপারে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলে পালসাহাব।

আহা, বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে পাগলা পালসাহাব জীবন রসিক হয়ে গেল।

তেত্রিশ

একটানা বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। কবে যে এই বর্ষণ থামবে, আদৌ থামবে কিনা, আকাশের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই।

যোগেনের ঘরটা একেবারে কিলপঙ নদীর ধার ঘেঁষে। নদীর তোড়ে ঘরের পেছন থেকে অনেকখানি মাটি ধসে গিয়েছে। এখনো মাটির বড় বড় চাঙড়া খসে পড়ছে।

ঘরের চালটা তিন চার জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছে। জল পড়ে ঘর ভেসে যাচ্ছে। এত বৃষ্টি যে বাইরে বেরিয়ে বেতপাতা এনে চাল ছাইবে, তার উপায় নেই। অগত্যা ঘরে বসে ভিজেই চলেছে যোগেন।

খাওয়াদাওয়া একরকম বন্ধ। বৃষ্টি না ধরা পর্যন্ত উনুন জ্বালাবার কোনো আশাই নেই।

বর্ষা নামবার আগে কিছু চিঁড়ে আর গুড় যোগাড় করে রেখেছিল যোগেন। চিঁড়ে চিবিয়েই ক'টা দিন চলছে।

এখন দুই হাঁটুতে থুতনি ঢুকিয়ে মাচানের ওপর জবুথবু হয়ে বসে আছে সে।

ঘরের সব ফাঁক-ফুটোয় ন্যাকড়া গুঁজে এঁটে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও রোখা যাচ্ছে না। কোন পথে, কখন, কিভাবে যে পোকা-মাকড়-জোঁক ঢুকে পড়ছে, কে জানে। ঘরময় বাড়িয়া পোকা, গন্ধী পোকা, জোঁক, বিছে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। এ ঘর যেন তাদের রাজত্ব।

জোঁকগুলো যোগেনের রক্ত শুষে ফুলে ফুলে আপনা থেকেই খসে পড়ে। বাড়িয়া পোকা আর গন্ধী পোকারা কামড়ে কামড়ে চামড়া ফুলিয়ে দিয়েছে।

দিনের পর দিন সমানে জোঁক আর পোকাদের উৎপাত সয়ে সয়ে শরীরে এখন আর সাড় নেই।

বাইরের দিকে একবার তাকাল যোগেন। দুর্জ্ঞেয় আকাশটা দেখে বোঝা যায় না এখন বেলা কত। সকাল, দুপুর না সন্ধ্যা?

হঠাৎ চমকে উঠল যোগেন।

ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে বিরাট একটা সাপ ঘরের মধ্যে ঢুকল। কুচকুচে কালো রঙ। ফণায় সাদা নকশা।

ঘরে ঢুকে সাপটা জুল জুল করে এদিক সেদিক তাকাল। তার চোখ দু'টো দু'টুকরো নীলার মতো জ্বলছে। জলে ভিজে সাপটার গায়ের আঁশ মসৃণ, পিছল এবং চকচকে।

সাপটা বুঝি বা তাপ চায়। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য উষ্ণ, নিরাপদ একটি আশ্রয় তার দরকার।

হঠাৎ সাপটার চোখে পড়ল, মাচানের ওপর একটা লোক বসে আছে। যোগেনও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল প্রাণীটার দিকে।

সাপের সঙ্গে মানুষের চোখাচোখি হল। ঠিক সাপ আর মানুষ নয়। যেন দুই সাঙ্ঘাতিক প্রতিপক্ষ।

যোগেনের চোখের দিকে তাকিয়ে সাপটা কী বুঝল, কে জানে। সাঁ করে লেজের ওপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। আধ হাত চওড়া বিরাট ফণাটা একটু একটু দুলতে লাগল। পাতাহীন চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল। চেরা জিভ লিক লিক করতে লাগল।

এক মুহূর্ত আচ্ছন্নের মতো বসে রইল যোগেন। মেরুদণ্ড বেয়ে ঠান্ডা হিমের স্রোত নেমে গেল

তার। একটাই মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই ধাঁ করে পাশ থেকে ঝকঝকে বর্মী দা'টা তুলে বাগিয়ে ধরল সে।

বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে একটি ঘরের দখল নিয়ে এই মুহূর্তে একজন মানুষ আর একটা সাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

এই ঘর একজনেরই হবে। হয় মানুষের, নয় সাপের। দু'জন প্রতিপক্ষ এক ঘরে থাকা অসম্ভব।

সাপের ফণা দুলছে। ছোবল পড়বার আগেই যোগেন দা চালিয়ে দিল। সাপের দেহ থেকে ফণাটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। প্রায় পাঁচ হাত লম্বা ধড়টা মুহূর্তে নিচে আছড়ে পড়ল। তির তির করে কাঁপতে লাগল। খানিক পর কাঁপুনি থেমে স্থির হয়ে গেল।

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে দা চালিয়ে দিয়েছিল যোগেন। উত্তেজনা কেটে গেলে মাচানের ওপর আচ্ছন্নের মতো বসে রইল সে। কপালে, কানে, নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটল। জামা ভিজে গিয়েছে। শ্বাস টেনে টেনে হাঁপাতে লাগল যোগেন।

কতক্ষণ বসে ছিল, খেয়াল নেই। যখন হুঁশ হল, বাইরের আকাশ আরো আবছা হয়ে যাচ্ছে। বুঝিবা একটু আগে দিন ছিল। দিনটা মরে মরে এখন রাত নামছে।

অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে যোগেন। এখন কী করবে, সেই কথায় সে ভাবছিল।

হঠাৎ ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপে কে যেন ঘা মারল।

যোগেন চমকে উঠল, 'কে?'

'আমি। আমি ছাড়া আবার কে?' বৃষ্টির একটানা শব্দের সঙ্গে মিশে গলার স্বরটা দুর্বোধ্য শোনাল। কে কথা বলছে যোগেন বুঝতে পারল না।

বাইরে থেকে এবার ঝাঁপ ধরে ঝাঁকানি শুরু হল। অসহিষ্ণু, কিছুটা বা উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'তরাতরি দুয়ার খোল।'

অগত্যা বাঁশের মাচান থেকে নিচে নামল যোগেন। কিন্তু ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপটা খুলেই তিন পা পিছিয়ে আসতে হল, 'তুমি!'

'হ হ, আমি। চিনতে পারলা না! এই কয়দিনে আমি কি এতই বদলাইয়া গেলাম পুরুষ!'

যোগেন জবাব দিল না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

যে ঘরে ঢুকেছিল, এবার তীক্ষ্ণ রিনরিনে গলায় সে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'না চিনার তো কথা না পুরুষ। তোমার লগে আমার কত জন্মের সম্পক্ক। তাই না?'

বিমূঢ় ভাব অনেকটাই কেটে গিয়েছে যোগেনেব। এবাব সে বলল, 'তুমি ঘরে যাও তিলি, ঘরে যাও—'

তিলি কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'ঘরে ফিরার লেইগা আইজ আহি নাই।'

'কিন্তুক এ ভালা না, এ ভালা না। বড় মোন্দ, বড় পাপ—'

তিলি কিছুই বলল না। আগের মতোই তীক্ষ্ণ, ধারাল শব্দ করে হাসতে লাগল। তিলির হাসির শব্দটা ছুঁচের মুখের মতো যোগেনের সমস্ত শরীরে বিঁধতে লাগল যেন।

বৃষ্টিতে নেয়ে এসেছে তিলি। সারা দেহ কাদায় মাখামাখি। শাড়িটা জলে ভিজে, বুকে লেপটে আছে। শাড়ির তলায় একজোড়া সুগোল, নিটোল বুক। গালে আর কপালে তিনটে জোঁক লেগে আছে। তিলির হুঁশ নেই। বিড়ালীর মতো কটা চোখ দু'টো জ্বলছে তার। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনটে চোখা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। মুখে হিংস্র এবং সূক্ষ্ম একটি হাসি মিহি পর্দার মতো জড়িয়ে আছে। তিলির মনে কী আছে, কে জানে।

যোগেন অনেকটা পিছু হটেছে। তিলিও এক পা এক পা করে তার দিকেই এগুতে থাকে।

নির্জীব গলায় যোগেন আবার বলে, 'তুমি যাও—' বলে বটে, গলায় কিন্তু তেমন জোর পায় না যোগেন।

শব্দ করে হাসে তিলি। বলে, 'আগেই তো কইছি, যাওয়ার লেইগা আহি নাই।'

যোগেন শেষ চেষ্টা করে, 'কেও দেইখা ফালাইব—'

'কেউ দেখব না পুরুষ।' তিলি বলতে থাকে, 'এই দুয্যুগে (দুর্যোগে) পিরথিমীর কেও বাইর হয় না। ভগমান এই দিনটা খালি আমার লেইগাই বানাইছে। হ গো পুরুষ—' তিলির ঠোঁট দু'টো চিরে আরো কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। তার হাসি ক্রমশ সাবা মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তিলি আদৌ হাসছে কী? যোগেন ঠিক বুঝতে পারে না। তার সমস্ত চেতনা যেন দ্রুত আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকে।

চৌত্রিশ

যোগেন আর তিলির একসঙ্গে জড়ানো একটা অতীত আছে।

এই সেটেলমেন্টের কারো সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক নেই যোগেনের। তবু সবাই তাকে জামাই ডাকে।

একসঙ্গে থাকতে হলে একটা কিছু সম্বন্ধ পাতিয়ে নিতেই হয়। কেউ হয় খুড়ি, কেউ তালুই, কেউ মাউই, কেউ জেঠা। যোগেন হয়েছে জামাই।

সেটেলমেন্টের আর কারো সঙ্গে থাক আর নাই থাক, অনেক দিন, সেই দেশভাগের আগে থেকেই তিলি আর যোগেনের মধ্যে একটা গোপন সম্পর্ক আছে।

ঢাকা জেলার বাজিতপুর গ্রামে তিলির শ্বশুরবাড়ি। সেই গ্রামেরই নাপিত বাড়ির ঘবজামাই যোগেন। তিলি যে গ্রামের বউ সেই গ্রামেরই জামাই যোগেন। গ্রাম সুবাদে এমনিতেই দু'জনের মধ্যে রয়েছে রসের সম্পর্ক।

যোগেনের বউ নিমি যেদিন মরল আর তিলির ওপর রুগ্ণ, অস্থিসার, খিটখিটে হরিপদর সন্দেহ যেদিন থেকে শুরু হল সেদিন থেকেই দু'জনের সম্পর্কটা শুধু রসেবই বইল না, অন্য কিছুরও হল।

নতুন সম্পর্কটা টের পেতে অনেক দিন লেগেছিল দু'জনের।

কাছাকাছি বাড়ি। মাঝখানে ছোট একটা মাঠ।

যখন তখন যোগেন আসত তিলিদের বাড়ি। তিলি যেত যোগেনদের বাড়ি। গ্রাম দেশে এই যাওয়া আসা কেউ কু চোখে দেখে না। সোজা, সহজ মানুষ সব। মন কু না হলে কি চোখ কু হয়?

যোগেন ঘরজামাই। ঘরের কোনো কাজেই সে আসে না। নিয়ম কবে দু'বেলা শ্বশুরেব অন্ন ধ্বংস করা ছাড়া তার অন্য কাজ নেই। এই শর্তেই নাপিতরা যোগেনকে ঘরজামাই করে এনেছিল।

দিনরাত যোগেনের অফুরন্ত ফুরসত। যতদিন বউ বেঁচে ছিল ততদিন তবু খানিকটা সময় ঘবে কাটাত যোগেন। কিন্তু বউ যেই মরল, মনও উড়ু উড়ু। ঘরে আর মন বশ খায় না। ঘুরে ঘুরেই সে কিসের টানে যেন তিলির কাছে আসে।

তিলির হয়েছে মরণ। নিত্য দিন হাঁপির টানে ভোগে হরিপদ, তা যেন তিলির দোষ। দিনে দিনে হরিপদ রোগে আরো কাহিল হয়ে পড়ছে, তাও তিলির দোষ। হরিপদর চোখের সামনে দেখতে দেখতে তিলি প্রচুর স্বাস্থ্যে ভরে উঠছে, সেটাও তিলিরই দোষ।

হরিপদ তামাকের ব্যবসা করত। সেজন্য হাটে যেতে হত। যতক্ষণ সে হাটে থাকত ততক্ষণই তিলির যা একটু স্বস্তি, যা একটু শান্তি। না হলে তিলির জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই।

যতক্ষণ হরিপদ বাড়িতে থাকত সমানে খিটির খিটির করত, 'মাগী এত ফোলে ক্যামনে? কী খাইয়া ফোলে? ভগমান তুমি কি আন্ধা (অন্ধ) হইলা? আমারে শুকাইয়া মাগীরে ফুলাও!' খিচ খিচ করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল হরিপদর।

মুখ বুজে সব সয়ে যেত তিলি।

হাজার হোক, মানুষ তো। মানুষের দেহ, মানুষেব মন তো। কত আর সয়! কত সওয়া যায়!

দিবারাত্রি সংসারের কাজ করেছে। হরিপদর রোগের সেবা করেছে। হরিপদ তামাক বেচতে যাবে, তার ব্যবস্থা করেছে। গতরকে গতর মানে নি তিলি। তবু হরিপদর খিটির খিটির কমে নি। উঠতে বসতে তার খালি সন্দেহ আর সন্দেহ। যোগেন আসত, সুবল আসত, গোকুল আসত। হাজারটা মানুষ আসত। গ্রামের যে-ই আসুক না, তাদের সঙ্গে তিলিকে জড়িয়ে দিনরাত্ত সন্দেহই কবেছে হরিপদ।

হরিপদ বলত, 'অরা ক্যান আহে, আমি জানি। তুই ক্যান দিন দিন ফোলস হেয়াও জানি।'

'জানো তো ভাল। মোন্দ কথা ভাবতে তোমার যত সুখ!' তিলি রুখে উঠত।

তিলিকে সন্দেহ করাটা স্বভাব হয়ে উঠেছিল হরিপদর। তার ব্যারামটার সঙ্গে সন্দেহ বাতিকটাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

এমনিতে তিলি হাসিখুশি, প্রাণের প্রাচুর্যে ঠাসা। সবসময় রঙ্গরসে মেতে থাকতে ভালবাসে। তিলির প্রাণশক্তি এত প্রচুর এত পর্যাপ্ত যে হরিপদর কুটিল সন্দেহ এবং খিচখিচানির পরেও সে উজ্জ্বল, সরস, তাজা থাকতে পারত।

এমন যে তিলি, এক একদিন বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ বসে থাকত। গালে হাত দিয়ে আকাশে চোখ রেখে কী যেন ভাবত।

হরিপদ হয় তো হাটে গিয়েছে, কি অন্য কারণে বাড়িতে নেই। এদিক সেদিক দেখে লুকিয়ে চুরিয়ে তিলির কাছে আসত যোগেন। হরিপদ থাকলে যোগেন তার বাড়ি ঢুকত না। হরিপদ যে তিলির সঙ্গে তার মাখামাখি পছন্দ করে না, এটুকু যোগেন বুঝে নিয়েছিল।

যোগেন ডাকত, 'বউ—'

'আগো জামাই, তুমি! আমি ভাবলাম কে না কে।' ঠোঁট টিপে হাসত তিলি।

'হরিপদ দাদায় নাই?'

'তারে বুঝি জবর ডর?'

'না, ডর ঠিক না। তয়—' বলতে বলতে থেমে যেত যোগেন।

একটু চুপচাপ। তারপর তিলিই শুরু করত, 'বসো, তোমাব লগে কথা আছে।'

তিলির পাশ ঘেঁষে বসে পড়ত যোগেন। বলত, 'কও।'

আকাশেব দিকে চোখ বেখে কী একটু যেন ভাবত তিলি। তাবপর হঠাৎ আকুল হয়ে বলত, 'আইচ্ছা জামাই—' কথা শেষ না করেই থেমে যেত।

'কও, যা কইতে চাও কইয়া ফালাও।'

'জামাই, সারাটা জনম কি আমি দুঃখুই পামু? কপালে দুঃখুর লিখা লইয়াই কি আমি পিরথিমীতে আইছিলাম?'

তিলিব প্রশ্নের জবাব যোগেনেব জানা নেই। বিমর্ষ মুখে তিলির দিকে তাকিয়ে থাকত সে।

দু'হাতে যোগেনকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তিলি আবার বলত, 'কও জামাই কও, আর কদ্দিন আমি দুঃখু পামু?'

যোগেন কিছুটা আন্দাজ করেছিল। আস্তে আস্তে সে বলেছে, 'বনিবনা কইরা লও। অত মন কষাকষি হইলে দুঃখু খালি বাড়বই বউ। ততই কষ্ট পাইবা।'

'ও—' একটি মাত্র শব্দ করে চুপ করে যেত তিলি।

তিলির দিকে তাকিয়ে যোগেনের মুখে আর কথা যোগাত না।

হরিপদ আর তিলিব মধ্যে যে বনিবনা নেই, মিল নেই, মোটামুটি এই কথাটা বুঝতে দেরি হয় নি যোগেনের। তিলির বিষণ্ণ, উদাস চেহারাই সে কথা সর্বক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কী-ই বা করতে পারে যোগেন! সে নিরুপায়। মুখ বুজে চুপচাপ তিলির দুঃখের কথা শোনা ছাড়া তার কিছুই করার ছিল না।

এক এক দিন দুঃখটা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিলি কাঁদত। বলত, 'আর পারি না, আর পারি না জামাই। দিন রাইত উঠতে বইতে খালি সন্দ আর সন্দ।'

'ধৈয্য ধর, ধৈয্য ধর বউ।' যোগেন তাকে বোঝাত।

'আর কত ধৈয্য ধরুম?'

'মনেরে বুঝ মানাও বউ।'

'আর কত বুঝ মানামু?'

এরপর আর কথা খুঁজে পেত না যোগেন।

কথায় বলে বনের বাঘে খায় না, খায় মনের বাঘে। হরিপদর হয়েছে সেই দশা। তার মনে সেই যে সন্দেহ বাতিকটা জন্মেছে, তা আর ঘোচে না। দিন দিন বাড়তেই থাকে। হরিপদর মনে যে বাঘটা ছিল সেটাই একদিন তাকে খেল। হরিপদকে তো আর খেল না, খেল তিলিকে। হরিপদর সন্দেহই একটু একটু করে তিলিকে যোগেনের দিকে এগিয়ে দিল।

বাজিতপুর গ্রামে এমন একটা মানুষ নেই, যাকে মনের কথা বলে তিলি জুড়োতে পারত। এক ছিল ওই যোগেন।

এদিকে মেয়ে মরেছে তো জামাইর আদরও ঘুচেছে। দু'বেলা দু'পেট ভাত গিলতে শাশুড়ির গঞ্জনা সইতে হয়। শ্বশুর দিনরাত ক্যাট ক্যাট করে। চোখমুখ বুজে খাওয়ার সময় শ্বশুরবাড়ি ঢুকত যোগেন, নইলে সারাটা দিন কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়াত, কে বলবে।

স্বামীর দেওয়া গঞ্জনা সইত তিলি। শাশুড়ির দেওয়া ভাতের খোঁটা সইতে হত যোগেনকে। তিলি আর যোগেন, দু'জনের দুঃখের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল ছিল।

একদিন খাওয়া হল না যোগেনের। ঘর-জামাইর চামড়া যতই পুরু হোক, খিদের মুখে ভাতের খোঁটাটা বড় বিঁধল।

শ্বশুর বলেছিল, 'লবাবের ছাও, একখান কুটা লাড়ো না, একখান কাম কর না। দুই বেলা ভাতেব থালের সুমখে (সামনে) বইতে শরম লাগে না?'

শাশুড়ি ঘোমটার ফাঁকে নথ-পরা নাক নেড়ে বলেছিল, 'শরম নাই গো, শরম নাই। আমরা হইলে অনুন গু মুত গিলতে পারতাম না। গলায় দড়ি দিতাম।'

সামনের ভাত ফেলে উঠে গিয়েছিল যোগেন। তারও জুড়োবার একটা জায়গাই ছিল এই গ্রামে। সরাসরি সেইখানেই চলে এসেছিল সে।

কিন্তু তিলিদের উঠানে পা দিয়েই চমকে উঠেছে যোগেন। বারান্দার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল তিলি। চুল উড়ে উড়ে মুখের ওপর এসে পড়ছিল। চোখ দু'টো পাকা করমচার মতো লাল। দেখেই বোঝা গিয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে তিলি কাঁদছে। কাছে এগিয়ে এসে যোগেন ডেকেছিল, 'বউ—'

'জামাই, তুমি আইছ! সেই বিহান থিকা তোমার কথাই ভাবতে আছিলাম।' উঠে এসে যোগেনের দু'হাত চেপে ধরেছিল তিলি।

তিলির চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে যোগেন বলেছে, 'কী হইছে বউ, অমুন কান্দো ক্যান?'

'সাধে কি কান্দি? কপালে কান্দায়।' অতি দুঃখে হেসেছে তিলি। বলেছে, 'সোয়ামী আইজ ঘরের বাইর কইরা দিল। কইল, মাগী তর মন যেইখানে যাইতে চায় হেইখানে যা!' সোয়ামী আমারে লষ্ট, দুষ্ট, কুচরিত্তির কইল। আর পারি না জামাই, আর পারি না।'

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে যোগেন। দুঃখ জুড়োতে তিলির কাছে এসেছিল সে। নিজের কথা আর বলা হয় নি।

তিলি অস্থির হয়ে উঠেছিল। কেঁদেছে আর বলেছে, 'অনেকদিন ভাবছি, কিন্তুক আমি ঘরের বউ। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। আইজ আর পারুম না। পিরথিমী জানব, আমার মনে পাপ আছে। আমি মোন্দ, লষ্ট। যার মনে যা আছে হেই ভাবুক। তুমি আমারে বাচাও পুরুষ, আমারে বাচাও।'

'ক্যামনে?' যোগেনের গলা কেঁপে উঠেছিল।

'পুরুষে য্যামনে মাইয়া মাইনষেরে বাচায়।' বলে একটু থেমেছে তিলি। কী ভেবে ফের বলেছে, 'তুমি আমারে কোথাও নিয়া চল জামাই।'

শান্ত গলায় যোগেন বলেছিল, 'যামু।'

'চল, অহনই যাই। এই পুরীতে এক দন্ড আমার থাকতে সাধ নাই।'

'অহন না, আইজও না, কাইলও না। যেদিন বুঝুম, পিরথিমীর কুনোখানে তোমার আশ্যয় নাই, হরিপদ দাদায় সত্যসত্যই তোমারে আর চায় না হেই দিন তোমারে নিয়া যামু।'

'সত্য?'

'সত্য। তোমারে ছুইয়া কই।'

তারপরও ক'বছর পার হয়ে গিয়েছে।

একদিন দেশভাগ হল। ভাসতে ভাসতে তিলিরা কলকাতায় এল। তিলিদের সঙ্গে যোগেনও এল কলকাতায়। হরিপদ ব্যারামী মানুষ। মনে তার যা-ই থাক, বিপদের দিনে যোগেনকে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেল, ভরসা পেল।

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে, রিফিউজি ক্যাম্পে কয়েক বছর কাটিয়ে এখন তারা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে।

যোগেন আর তিলির পেছনের অতীতটা মোটামুটি এই রকম।

পঁয়ত্রিশ

এ বৃষ্টি যেন কোনোদিন থামবে না।

বাইরে আকাশ আরো কালো হয়ে যাচ্ছে। অবিরাম বর্ষণের সঙ্গে যুঝে যুঝে এই দ্বীপ দিনের কাছ থেকে যেটুকু আলো পেয়েছিল, সন্ধে এসে তা মুছে দিতে শুরু করেছে।

মড় মড় শব্দে বাইরে গাছ ভেঙে পড়ছে। যোগেনের ঘরের ঠিক পেছনেই ঝুপ ঝাপ আওয়াজ হচ্ছে। কিলপঙ নদী দুর্জয় বেগে মাটি ধসিয়ে দিচ্ছে।

একটানা বৃষ্টির শব্দ, মাটি খসার শব্দ, খ্যাপা নদীর শব্দ, উন্মাদ বাতাসের শব্দ, গাছ ভাঙার শব্দ—সব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা সৃষ্টির সেই আদিম দুর্যোগের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছে।

ঘরের ঝাঁপ খোলা রয়েছে। তীব্র, ধারাল রেখায় ভেতরে বৃষ্টির ছাট আসছে। কিন্তু কারো হুঁশ নেই। তিলিরও না, যোগেনেরও না।

পিছু হটতে হটতে বাঁশের মাচানে গিয়ে ঠেকেছে যোগেন। হটবার আর জায়গা নেই।

এদিকে তিলি যোগেনের একটা হাত ধরে ফেলেছে। তার চোখের তারা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ফিস ফিস গলায় সে বলল, 'এইবার পুরুষ!'

ভীরু, অসহায় স্বরে যোগেন বলল, 'নিজের সব্বনাশ কইরো না তিলি। অহনও সময় আছে, ফিরা যাও।'

'সব্বনাশের কথা না ভাইবা কি মাইয়া মাইনষে ঘরের বাইর হয়!' অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। বলল, 'নিজের কথা ভাবি না পুরুষ। নিজের ভাবনা আমার ঘুচছে।'

'তবে কী ভাব তুমি?' নির্জীব গলায় প্রশ্ন করল যোগেন।

'তোমার সব্বনাশ করুম, দিন রাইত এই কথাই ভাবি। বুঝলা?' যোগেনেব গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিল তিলি।

যোগেন জবাব দিল না।

তিলি বলতে লাগল, 'সোয়ামীর কাছে দুঃখু পাইয়া কত বার তোমার কাছে আইছি পুরুষ। তুমি ফিরাইয়া দিছ।'

'তোমার ভালার লেইগাই ফিরাইছি।'

তিলি হাসল। আস্তে আস্তে বলল, 'আ গো পুরুষ, মাইয়া মাইনষের কিসে ভালা কিসে মোন্দ, হে কি তোমরা বোঝ? আমার ভাল মোন্দ আমারেই বুঝতে দাও।'

একটু চুপচাপ।

তিলির ভেজা কাপড় থেকে টপ টপ করে জল ঝরছে। একেবারে নেয়ে গিয়েছে সে। হাতের

আঙুলগুলো সিঁটানো। ঠান্ডায় কাঁপছে তিলি। কাঁপতে কাঁপতেই বলল, 'খাড়ইয়া খাড়ইয়া কী দেখ পুরুষ, আমি এইদিকে টালকিতে (শীতে) কাইপা মরি। একখান কাপড় দাও।'

টিনের ছোট একটা বাক্স থেকে শুকনো কাপড় বার করে তিলির হাতে দিল যোগেন।

তিলি বলল, 'হা কইরা তাকাইয়া দেখ কী! যত বলদ (বোকা) নিয়া আমার কারবার। ড্যাবা ড্যাবা চৌখে আমার দিকে তাকাইয়া থাক! শরম নাই? আমার দিকে পিছন দিয়া খাড়ও।'

অগত্যা তিলির দিকে পেছন ফিরে ডান পাশের বেড়ায় চোখ রাখল যোগেন।

একা মানুষ যোগেন। তার একার এই সংসার। ঘরে মেয়েমানুষ নেই যে তিলি ভিজে এলে শাড়ি যোগাবে। নিজের একখানা ধুতিই দিয়েছে সে। ক্ষিপ্র হাতে ভেজা শাড়ি বদলে শুকনো ধুতি পরে ফেলেছে তিলি। ভেজা শাড়িটা নিঙড়ে সারা শরীর মুছেছে।

তিলি বলল, 'অহন মুখ ফিরাও পুরুষ।'

যোগেন ঘুরে দাঁড়াল।

তিলি এবার এক কান্ডই করল। আস্তে আস্তে যোগেনের কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, 'বার বার তুমি ফিরাইয়া দিছ। এইবার আর পারবা না।'

যোগেন জবাব দিল না।

যোগেনের বুকে একটা হাত রেখে গাঢ় গলায় তিলি বলল, 'ডর লাগে পুরুষ?'

'হ।' আধফোটা শব্দ করল যোগেন।

'ডর আর শরম-ভরমের মাথা না খাইলে কি আমারে পাইবা!'

যোগেন চুপ করে রইল।

খ্যাপা বাতাস বৃষ্টির ছাটকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসছে। এতক্ষণে তিলির যেন হুঁশ হল। সে বলল, 'ইস, ঘর এক্কেবারে ভিজা গেল।' ছুটে গিয়ে কাঁচা বাঁশের ঝাঁপটা বন্ধ করে দিল সে।

একটানা বৃষ্টি বঙ্গোপসাগরের এই উলঙ্গ, বর্বর দ্বীপটাকে, শুধু কি দ্বীপটাকেই, যোগেনের এই ছোট্ট বেতপাতার ঘরটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

বাইরে এই দ্বীপ যখন অন্ধ, আদিম দুর্যোগে মেতে উঠেছে তখন ঘরের ভেতর যোগেন আর নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

বার বার এসেছে তিলি। বার বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে যোগেন। কিন্তু আজ আর তাকে ফেরানো গেল না।

আন্দামানের বর্ষা শুধু মাটিকেই না, জীবনকেও বুঝি সরস এবং উর্বর করে তোলে।

ছত্রিশ

বর্ষার আগে আগেই সিপি তোলার মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সিপি তোলা শেষ হল বলেই কি কাজ শেষ হয়ে গেল! কাজ শেষ হতে হতে আবার মরশুম শুরু হয়ে যাবে।

সমুদ্র থেকে যে সব সিপি তোলা হল, এবার সেগুলো সাফ করার পালা। অ্যাসিড দিয়ে প্রতিটি সিপির ওপরকার চুন এবং জমাট সামুদ্রিক নুনের স্তর পরিষ্কার করতে হবে।

সিপি সাফ করার পর বাছতে হবে। যেগুলো কুলীন জাতের সিপি, যেমন টার্বো ট্রোকাস নটিলাস, বাজারে যাদের চড়া দাম সেগুলোকে কাঠের বাক্সে বোঝাই করা হবে। জাহাজে উঠে তারা যাবে কলকাতা এবং মাদ্রাজ। কলকাতা মাদ্রাজ থেকে আবার জাহাজে উঠবে। আন্দামান সমুদ্রের সিপি পৃথিবীর কোথায় কোথায় যে চলে যাবে, অত খবর পানিকর রাখে না। এজেন্টের কাছে বেচে দিয়েই সে খালাস।

ফ্রগ শেল, নী-ক্লাম—বাজারে যে সিপির দর কানাকড়িও না সেগুলো একে ওকে বিলিয়ে শেষ করবে পানিকর।

এখন সিপি সাফ করার কাজ চলছে।

একটানা দু' সপ্তাহ বৃষ্টির পর আকাশটা দিন দুই চুপচাপ রইল। থমথমে চেহারা দেখে মনে হল, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। যখন আবার ঢালতে শুরু করবে, এই দ্বীপ ফের ভাসিয়ে দেবে।

এর মধ্যেই ফাঁক বুঝে মায়াবন্দর থেকে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে এসে উঠল পানিকর। এরিয়াল উপসাগরের পার থেকে পুরো ছ'মাইল টিলা-জঙ্গল ভেঙে থকথকে কাদা আর জোঁকের সঙ্গে লড়তে লড়তে এসেছে সে।

কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে খাবলা খাবলা মাংস উঠে গিয়েছে। সমস্ত শরীর জুড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। কাদায় একেবারে মাখামাখি। পানিকরের হাল দেখে দুঃখও হয়, হাসিও পায়।

বারান্দায় বাঁশের পাটাতনে বসে চাল বাছছিল কাপাসী। পিঠটা উদোম, কাপড় সরে গিয়েছে। ঘাড় আর গলার কাছে রাশি রাশি রুক্ষ, তেলহীন চুল ছড়িয়ে রয়েছে। মুখটা ঠিকমতো দেখা যায় না, চুলে ঢাকা পড়েছে। পালকের মতো সরু কালো ভুরুর একটুখানি শুধু নজরে পড়ে।

শাড়ির লাল জমিতে চৌকো চৌকো সবুজ খোপ কাটা। শাড়িটা কাপাসীর সুঠাম চিকন কোমরে কি বশই না মেনেছে!

এখন দুপুর। আকাশ থেকে মেঘভাঙা রুপোলি রোদ এসে কাপাসীর গায়ে পড়েছে। উদোম পিঠ, রুক্ষ চুল, হাত, সরু ভুরু—সব চকচক করছে।

কাপাসীকে কেমন যেন দুর্বোধ্য দেখায়। শুধু দুর্বোধ্যই নয়, একটানা বৃষ্টির পর দুপুরের মেঘভাঙা উজ্জ্বল রোদে অলৌকিক মনে হয়।

টিলা বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পানিকর। কাপাসীর চুল-হাত-পিঠ দেখতে দেখতে পানিকরের চোখ দু'টো চকচক করছে।

পানিকর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই একটা চুগলুম গাছ। চুগলুমের পুরু পুরু বিরাট পাতায় বৃষ্টিব জল আটকে ছিল। রোদ সেই জল পুরোপুরি শুষে নিতে পারে নি। বাকি যেটুকু আছে, বাতাসের ঝাঁকানি খেয়ে ঝুপ ঝুপ করে পানিকরের গায়ে ঝরে পড়ল। তবু তার হুঁশ নেই।

একদৃষ্টে কাপাসীর দিকে তাকিয়েই আছে পানিকর।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপাসীর খোলা পিঠটা দেখল পানিকর। তারপর একসময় টিলা বেয়ে ওপরে উঠে এল। আস্তে আস্তে ডাকল, 'কাপাসী—'

'কে?' কাপাসী চমকে উঠল।

'আমি—আমি পানিকর—'

শাড়ির আঁচল দিয়ে পিঠটা ঢাকতে ঢাকতে কাপাসী বলল, 'পানিকর ভাই, আপনে আইছেন! আহেন আহেন।'

বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পানিকর। তার কিম্ভুত চেহারার দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় ঠেসে কাপাসী হাসে। পুরো হাসিটা বেরোয় না। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কিছুটা বেরোয়, বাকিটা মুখের ভেতর উথলে উথলে উঠতে থাকে। আটকানো হাসির দমকে কাপাসীর শরীরটা থরথরিয়ে কাঁপে।

বোকার মতো পানিকরও একটু হাসে।

কাপাসী বলে, 'আপনের এই কী হাল হইছে পানিকর ভাই!'

পানিকর যেন কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করে, 'কী করব? বারিষে মাটি গলে আছে। পা ফেললেই কোমর পর্যন্ত গেঁথে যায়। যা জোঁক! কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে চামড়া ছিঁড়ে গোস্ত আউর খুন বেরিয়ে পড়েছে।'

পানিকর আর কাপাসীর হাসাহাসি, কথাবার্তার মধ্যেই নিত্য ঢালী এসে পড়ে।

পনের দিন পর বৃষ্টি থামায় সকালে উঠেই একটা ঝাঁকি জাল নিয়ে ডিগলিপুরের খালে গিয়েছিল নিত্য। ডুলা বোঝাই করে পার্শে, তারিণী, লাল ভেটকি আর মায়া—নোনা জলের মিঠে মাছ মেরে এনেছে। পানিকরকে দেখেই মাছ আর জাল উঠোনে নামিয়ে রাখল সে। ছুটতে ছুটতে তার সামনে এল। বলল, 'কখন আইলেন পানিকর বাবা?'

'এই তো এলাম চাচা—' পানিকর আগে আগে নিত্য ঢালীকে নিত্য বুড়ঢা ডাকত। আজকাল চাচা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে।

নিত্য ঢালী আবার বলল, 'বিহানে উইঠা মাছ মারতে বাইর হইছিলাম। বুঝলেন নি বাবা, বড বাহারের মাছ। আইজ না খাইয়া যাইতে পারবেন না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—' পানিকর হাসল।

মেয়ের দিকে ঘুরে নিত্য বলল, 'পানিকর বাবায় খাইব। লাল ভেটকির পাতবি, আর পাইশ্যা মাছ দিয়া সউরষার ঝাল পাক করিস কাপাসী। মন দিয়া পাক করবি। এক বার খাইলে য্যান পানিকর বাবায় তমস্ত জনম ভুলতে না পারে।'

কাপাসী মুখে কিছু বলল না। মাথা ঝাঁকিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠোনের যেখানে জাল আব মাছ রেখেছে নিত্য, আস্তে আস্তে সেদিকে চলে গেল।

এবার পানিকরকে তাড়া লাগাল নিত্য ঢালী, 'চলেন, চলেন বাবা, গাও ধুইতে চলেন।'

কিছুক্ষণ পর কিলপঙু নদী থেকে একেবারে নেয়ে ঘবে ফিরল দু'জনে।

নিত্য ঢালীব দেওয়া একটা শুকনো কাপড় কোমবে জড়িযে জুত কবে বাঁশেব মাচানে বসল পানিকর। নিত্যও মুখোমুখি বসল।

পানিকর বলল, 'ক'দিন কী বারিষই না হল!'

'যা কইছেন বাবা, আমাগোও জলেব দ্যাশ। হেই মাতানি নদী, হেব পাবে ঘব। কিন্তুক এমুন বিষ্টি বাপেব জন্মে দেখি নাই।'

পায়ের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে অল্প অল্প হাসে পানিকর। বলে, 'এ আব কী বাবিষ। কোনো কোনো সাল দশ বিশ রোজ না, হয়তো মাসখানেক ধরেই চলল।'

'ক'ন কী বাবা!'

'সাচই বলি। সবে তো এসেছ। আমার কথা সাচ কি ঝুট, নিজের আঁখেই দেখবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর পানিকর ফের শুরু করল, 'আজ বারিষ থেমেছে। সকালে উঠে তোমাব কথা মনে পড়ল চাচা। আর দেবি কবলাম না। সিধা চলে এলাম।'

'ভাল করছেন বাবা, খুব ভাল কাম করছেন। বড় আনন্দ দিলেন। আমার কথা যে ভোলেন নাই, কি সুভাগ্যি!' খুশিতে নিত্য ঢালীর রুক্ষ, খসখসে মুখটা আলো হয়ে যায়। সে বলতে থাকে, 'কয়দিন আপনের দেখা নাই। দেখা হইব ক্যামনে! যা বিষ্টি! মনে মনে আইজ বিহান থিকা আপনের কথাই ভাবতে আছিলাম।'

'বহুত তাজ্জবের বাত!' অবাক হয়ে কিছুক্ষণ নিত্য ঢালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পানিকর। তারপর বলল, 'আমিও যে তোমার কথাই ভাবছিলাম চাচা—'

'দুইজনের ভাবনা তাইলে মিলা গেল!'

ঘরের ঝাঁপটা খোলা। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া, টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে এতক্ষণ রোদ আসছিল। এখন সূর্যটা ভাসমান মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

একটা ঘন ছায়ার পর্দা যেন উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটাকে ছেয়ে ফেলেছে হঠাৎ। অনেক দূরে উঁচু উঁচু টিলা। সেগুলোর মাথায় বিরাট বিরাট গর্জন গাছ। গাছগুলোর মাথায় ধোঁয়ার মতো সাদা সাদা কী যেন জমেছে। আকাশ টিলা গাছ মেঘ, সবই দেখা যায় কিন্তু অস্পষ্ট নিস্তেজ আলোতে মনে হয়, কেমন যেন রহস্যময়।

বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পানিকর। কী একটু ভেবে সে শুরু করল, 'দেখ চাচা, কাম ঠিক সুবিধে হচ্ছে না। একা লা তে'কে দিয়ে হবে না। ভাবছি—'

'কী ভাবতে আছেন বাবা?'

'ভাবছি, তোমাকে মায়াবন্দর নিয়ে যাব।'

মায়াবন্দর যাওয়ার নাম শুনে নিত্য ঢালী দমে গেল। ঢোক গিলে বলল, 'কিন্তুক পানিকর বাবা—'

সতর্ক চোখে নিত্য ঢালীর মুখচোখ ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল পানিকর। আস্তে আস্তে বলল, 'লেকিন কী চাচা?'

'আমি গেলে চলব ক্যামনে? কাপাসীরে কার কাছে রাইখা যামু? কে অ্যামুন নিজের জন আছে যে কাপাসীরে দেখব। কেউ তো নাই।' বলতে বলতে একটু থামে নিত্য। টেনে টেনে শ্বাস নেয়। ভোঁতা খ্যাসখেসে গলায় ফের শুরু করে, 'শত্তুর। চাইর দিকে যেই মুখ দ্যাখেন, সেই মুখই আমার শত্তুরের মুখ। শত্তুর পুরীর ভিত্রে মাইয়ারে রাইখা আমি মরতেও পারুম না পানিকর বাবা।'

'তবে—' চোখ কুঁচকে, কপালে ভাঁজ ফেলে বসে থাকে পানিকর। বলে, 'তবে কি হবে চাচা? লা তে তো একা একা এত সিপি সাফ করতে পারবে না। 'সিজন' ধরতে না পারলে খাব কী? সিপি চালান দিতে না পারলে—' বলতে বলতে সে থেমে যায়।

খানিকক্ষণ কী ভেবে হঠাৎ নিত্য ঢালী বলে, 'একটা কাম করলে ক্যামুন হয় পানিকর বাবা?'

'কী কাম?'

'সিপিগুলান যদিন আমার বাড়িতে আনেন। আপনে, লা তে, কাপাসী আর আমি চাইর জনে মিলা সাফ করতে পারি।'

ওপরের পাটির দাঁত নিচের পুরু কালো ঠোঁটে গেঁথে ভুরু দু'টো অল্প একটু কুঁচকে পানিকর বলে, 'তা হলে তো ভালই হয়। লেকিন দু'টো কথা—'

'আর কুনো কথা নাই। কাইলই আপনে সিপি লইয়া আমার এইখানে আইসা পড়েন।'

'আগে আমার কথাটা শোন চাচা। সিপি এখানে থাকলে তো আমাদেরও এখানে থাকতে হয়। না হলে রোজ মায়াবন্দর থেকে ডিগলিপুরে আসার বহুত ঝামেলা। এরিয়াল বে থেকে ছ'মাইল জঙ্গল ভেঙে রোজ এখানে আসা বহুত বড় তখলিফ—'

'হ—হ, হে কথা কইতে হইব নিকি! জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে আইতে যে কত কষ্ট, রোজই তো ট্যার পাই।'

নিত্য ঢালী থামে না। এক দমে বলে যায়, 'যাওন আহনের কাম নাই। আপনেরা এইখানেই থাকবেন।'

'লেকিন—' পানিকরের দ্বিধান্বিত ভাবটা কিছুতেই আর ঘুচতে চায় না।

'আবার কী হইল বাবা?'

'রিফুজি কলোনির কেউ যদি কিছু বলে! আমরা তো তোমাদের মুলুকের আদমী না। আমরা—'

এমনিতে নিরীহ, শান্ত মানুষ নিত্য ঢালী। হঠাৎ সে খেপে উঠল, 'কোন হালায় কী কইব! কারো কওনের তোয়াক্কা করি? কেও দুইটা পয়সা দিছে? কেও এক বেলা খাওয়াইছে যে কারো কথার ধার ধারুম? আমার ঘর, আমার বাড়ি, যারে খুশি তারে রাখুম। কোন হালায় কথা কইতে আইব!'

দু'হাত ধরে নিত্যকে শান্ত করল পানিকর। বলল, 'ঠিক আছে চাচা, ঠিক আছে। চটাচটি করো না। আমি সিপি আউর লা তে'কে নিয়ে কালই আসব।'

'হ হ, কাইলই আইবেন। যত তরাতরি পারেন, আইবেন। কে কী কয়, একবার দেখুম।' নিত্য ঢালীর উত্তেজনা কমে না। সমানে চিল্লাতেই থাকে সে।

নিত্য হঠাৎ কেন যে খেপে উঠল, পানিকর জানে না। না জানলেও তার লোকসান নেই।

সাঁইত্রিশ

তরিবত করে রেঁধেছে কাপাসী। মায়া মাছ ভাজা, তারিণী মাছের রসা, সরষে দিয়ে লাল ভেটকি আর পার্শে মাছের টক।

রাঁধার গুণে জলের মাছে এমন স্বাদ এমন গন্ধ খোলে, না খেলে কোনোদিন কি জানতে পারত পানিকর?

পানিকররা নিজেরাই যা পারে রেঁধেবেড়ে খায়। সিপি তুলতে তুলতে একটু সময় বার করে নিয়ে মোটর বোট থামিয়ে উপসাগরের পারে ওঠে। তিন টুকরো ইট সাজিয়ে উনুন পেতে নেয়। ভাত ফোটায়, মাছ রাঁধে। আধা সিদ্ধ, আধা পোড়া, আধা কাঁচা, না তেল, না ঝাল, না ঠিকমতো নুন—এমন এক বস্তু গিলে গিলে জিভ অসাড় হয়ে গিয়েছে।

আজ প্রচন্ড খাওয়া খেল পানিকর।

খাওয়াদাওয়ার পর বারান্দাব পাটাতনে এখন পাশাপাশি বসেছে দু'জনে। পানিকর আর নিত্য ঢালী।

পানিকর ঢেকুর তুলতে তুলতে বলে, 'বহুত খেয়েছি। একেবারে গলা পর্যন্ত ঠাসা। তোমার মেয়ে আচ্ছা খানা পাকায় চাচা।'

'এই কী আর খাইলেন পানিকর বাবা! থাকত হেই দ্যাশ, যাইতেন আমার বাড়ি, বুঝতেন খাওন কারে কয়! হগলই কপালের লিখা বাবা—' অল্প একটু হাসল নিত্য ঢালী। মুখটা বিষণ্ণ, করুণ, উদাস দেখাল। এই মুহূর্তে সে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটিতে যেন নেই। হাজাব মাইল সমুদ্র পাড়ি দিযে মাতানি নদীর পারে ঢালীদেব ছোট্ট গ্রামটিতে চলে গিয়েছে।

একসময় বিষাদ-মাখা গলায় নিত্য ঢালী বলল, 'কিছুই রইল না পানিকর বাবা। দ্যাশ গেল, ভিটা গেল, সাতপুরুষের হগল গেল। সব্বস্ব খুয়াইয়া এই দ্বীপে আইছি। পথেব ভিখারী হইয়া গেছি বাবা। থাকত হেই দ্যাশ—' গলাটা ভারী হয়ে বুজে গেল।

মৌসুমি বাতাসের তাড়া খেয়ে টুকরো টুকরো মেঘেবা পশ্চিম দিকে ফেরার হচ্ছে। আবার বোদ দেখা দিয়েছে। উজ্জ্বল, ধারাল, তেজী রোদ। মেঘভাঙা রোদ এমনিতেই বড় তীব্র। চোখে যেন বিঁধে যায়।

এখন ঠিক বিকেলও না, দুপুরও না। দুপুর আর বিকেলের ঠিক মাঝামাঝি। রোদেব তেজ মরে নি, কিন্তু রং বদলাতে শুরু করেছে। একটু আগে গলা রুপোর মতো ঝকঝকে আলো ছিল। এখন তাতে হলদে আভা লেগেছে।

টিলা-জঙ্গল-পাহাড়-আকাশ, সব কিছুই বড় স্পষ্ট। একটু আগে আবছা আলোতে মনে হচ্ছিল এগুলো অদ্ভুত রহস্যময়। কিন্তু এখন এই উজ্জ্বল রোদে সে সবের চারপাশ থেকে রহস্য সরে গিয়েছে।

পানিকর ডাকল, 'চাচা—'

'কী ক'ন বাবা?' নিত্য ঢালীর গলাটা এখনো ধরা ধরা। মাতানি নদীর পারের সেই গ্রামটার কথা ভেবে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

পানিকর বলল, 'তুমি যে বলছিলে, আমার সাথ তোমার কী যেন কাম আছে।'

'হ বাবা—' খাঁকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল নিত্য ঢালী। আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল সে, 'চোখ টাটায়। হগলের পরাণ কচকচ করে। উই যে আপনে দুইটা পয়সা দ্যান, আমি যে গতর খাটাইয়া রোজগার করি, কারো তা সয় না।'

পানিকর কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে মাথা ঝাঁকায়।

নিত্য ঢালী থামে না, 'পানিকর বাবা, বুঝলেন কিনা, চাইর পাশেই আমার শত্তুর। তা নাইলে উই যে উজানী বুড়ি, হারাইনার ঠাউরমা, আমার বাড়িত্ আইসা আমার মাইয়ারে লষ্ট কয়। আমি জানি, আড়ালে আবডালে কাপাসীরে হগলেই কুচরিত্তির কয়। কিন্তুক ভগমান জানে, মাইয়া আমার খাটি সোনা। তার ভিতরে এতটুক দাগ নাই, খাইদ নাই।' বলে, আর হাউ হাউ করে কাঁদে নিত্য।

সেই যে সেদিন উজানী বুড়ি বাড়িতে এসে ঝগড়া করল, কাপাসীকে নষ্ট-দুষ্ট-কুচরিত্তির বলে গেল, বাপ হয়ে কিছুতেই তা সইতে পারছে না নিত্য। দুঃখটা তার প্রাণে বড় বেজেছে।

কাপাসী কি সাধ করে শরীর নষ্ট করেছে? সে কথা কেউ না জানুক, নিত্য তো জানে। জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক দুঃখের দামে সে কথা সে জেনেছে।

কে হারান, কে উজানী বুড়ি, কে নষ্ট, কে কুচরিত্তির—কিছুই বোঝে না পানিকর। হাঁ করে নিত্য ঢালীর হাউ হাউ কান্নার বিচিত্র শব্দ শোনে।

নিত্য বলতেই থাকে, 'হগলে আমার মাইয়ারে লইয়া পড়ছে। হে পাগল মানুষ। পাগল হইয়াও তার বাচনের যো নাই।'

পানিকর চমকে উঠল, 'পাগল, কে পাগল!'

'কাপাসী বাবা, আমার মাইয়া—'

'কাপাসী পাগল!'

'হ বাবা, অ্যামনে বোঝনের উপায় নাই। ভাল মানুষ, থির, ধীর। বুঝ বুদ্ধি আছে। কিন্তুক মাঝে মইদ্যে ক্যামুন জানি হইয়া যায়। খালি হাসে।' গাঢ়, মন্থর, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল নিত্য ঢালী। বিষণ্ণ, করুণ সুরে বলতে লাগল, 'হেই হাসি শুনলে বুকের ভিতরটা কাপে পানিকর বাবা।'

এর আগেও বার দু'তিন ডিগলিপুরের এই সেটেলমেন্টে নিত্য ঢালীর এই ঘরে এসেছে পানিকর। কাপাসীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। কথাবার্তা হয়েছে। সহজ, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মতোই কাপাসী তার সঙ্গে কথা বলেছে। তার যে মাথা খারাপ, সে যে পাগল, একবারও এ সন্দেহ পানিকরের মনে আসে নি। কাপাসীর মুখেচোখে, কথাবার্তায়, চলায় ফেরায় পাগলামির কোনো লক্ষণই খুঁজে পায় নি সে।

রোদের রং দ্রুত হলুদ। জঙ্গলের মাথা ঝিম মেরে আছে। সকালে যে পাখিরা সমুদ্রে গিয়েছিল, বিকেলে তারা দ্বীপমুখী হতে শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ, নিঝুম জঙ্গল, নিবু নিবু হলুদ রোদ, দ্বীপে ফেরা পাখির ঝাঁক—সব মিলিয়ে গোটা চরাচর জুড়ে একটা শান্ত, উদাস সুর যেন সাধা হচ্ছে।

হঠাৎ তাল কেটে গেল।

উঠোনের এক কিনারে রান্নাঘর। সেখান থেকে অবুঝ গলায় দমকে দমকে হেসে উঠল কাপাসী।

নিত্য ঢালী আর পানিকর চমকে উঠল। নিত্য বলল, 'শুনলেন তো বাবা। এই হাসন আমি আর সইতে পারি না। হা ভগমান—'

কপাল থাপড়াতে লাগল নিত্য। বলতে লাগল, 'হগলই আমার দোষে, আমার পাপে। বাপ হইয়া তারে বেড়া আগুনের হাত থিকা বাচাইতে পারলাম না। এই দুঃখু আমার মরলেও ঘুচব না।'

অনেকক্ষণ পর কপাল চাপড়ানি আর কান্না থামল। ঝিম মেরে বসে রইল নিত্য ঢালী। পানিকরও চুপচাপ। আর একটানা হেসে হেসে হয়রান হয়ে কাপাসীও থামল একসময়।

হঠাৎ নিত্য ঢালী বলল, 'কামের কথাখান কই পানিকর বাবা—'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আপনেরে আমি বিশ্বাস করি। বাইচা থাকলে আমার পোলাও আপনের বয়েসেরই হইত।' বলে একটু চুপ করল নিত্য ঢালী। মনের কথাগুলো আগে পরে ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে নিল। তারপর ফের শুরু করল, 'একখান কথা আমি শুনছি। হেইটা সত্য কিনা আপনে ক'ন দেখি।'

'কী কথা?'

'পাগলগো নিকি হাসপাতাল আছে? হেইখানে চিকিচ্ছা করাইলে নিকি পাগলামি সারে?'

'হাঁ হাঁ—' পানিকর উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'ঠিকই শুনেছ চাচা। পাগলা গারদে পাঠালে কাপাসী জরুর সেরে উঠবে।'

'সাচা (সত্যি) ক'ন বাবা?'

'হাঁ হাঁ, সচ—'

'কাপাসী আবার আগের লাখান হইব?'

'হাঁ হাঁ—'

একটু চুপ।

কিছুক্ষণ আগে খানিকটা নিস্তেজ রোদ ছিল। এখন আর নেই। ছায়া ছায়া, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ লম্বা পাড়ি দিয়ে দ্বীপের মাথায় আসতে শুরু করেছে। রোদ ঢাকা পড়েছে। সাগরপাখিদের আর দেখা যাচ্ছে না। টিলা-জঙ্গল-পাহাড় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নিত্য ঢালী বলল, 'আপনে পাগলগো হাসপাতল চিনেন পানিকর বাবা?'

'হাঁ, চিনি।'

'তা হইলে কাপাসীরে বাচান বাবা, আমারে বাচান।' পানিকরের দু'হাত জরিয়ে ধরল নিত্য ঢালী। করুণ গলায় বলল, 'আমরা আপনের গুলাম হইয়া থাকুম।'

'ডর নেই। আমি সব বন্দোবস্ত করব। তুমি দেখো চাচা, কাপাসী জরুর আগের মতো হয়ে যাবে।'

'ঠিক তো বাবা?'

'আরে হাঁ হাঁ—' পানিকর বলল, 'এবার উঠি। আমাকে মায়াবন্দর ফিরতে হবে।'

পানিকর উঠে পড়ল। নিত্য ঢালীও সঙ্গে সঙ্গে উঠল। বলল, 'কাইলই সিপি আর লা তে'রে নিয়া আইবেন।'

পানিকর মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো, আসবে।

আটত্রিশ

দিন পাঁচেক হল পালসাহাব সেটেলমেন্টে নেই। কী একটা কাজে পোর্ট ব্রেয়াব গিয়েছে।

পালসাহাব থাকলে একটা কিছু সুরাহা হতই। দুর্ভাবনা করতে হত না। সে-ই সব সমস্যাব সমাধান করে দিত।

চোখেমুখে এখন অন্ধকার দেখছে হারান।

উজানী বুড়ির একটা মাত্র কাপড়। সেই কাপড়খানা এত পুরনো যে পিঁজে পিঁজে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কত যে ফুটো! এতদিন তালি দিয়ে সেলাই করে কোনোরকমে চালিয়ে এসেছে। এখন আর উপায় নেই। কোথায় তালি মারবে? ক'টা ফুটো বুজোবে?

উজানী বুড়ি সোজাসুজি একবারও হারানকে বলে না, 'আমার কাপড় ছিড়া গেছে। একখান নয়া কাপড় কিনা দে।'

না বলার কারণও আছে। বড় সাধ করে হারানের সঙ্গে চন্দ্র জয়ধরের মেয়ে পাখির বিয়ে দিতে চেয়েছিল উজানী। কিন্তু শেষ বয়সের শেষ সাধটা মিটল না। হারান সিধে মুখের ওপর বলে দিয়েছে, পাখিকে বিয়ে করবে না। অথচ হারান বিয়ে করবে। বিয়ে করবে কাকে, না ওই নিত্য ঢালীর নষ্ট-শরীর পাগল মেয়েটাকে। দুঃখটা প্রাণে বড় বেজেছে উজানীর। নিজের নাতিকে দিয়ে একটা সাধ মিটবে না, তার ওপর নিজের জোর খাটবে না, এ দুঃখ কোথায় রাখবে সে!

আজকাল বড় অবুঝ হয়ে উঠেছে উজানী বুড়ি। হারানের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। একটুতেই খেপে ওঠে। সোজাসুজি কাপড়ের কথা না বললেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিনিয়ে বিনিয়ে নানাভাবে কথাটা শোনায়।

আজ ভোরে উঠেই মাটির পাতিলে জাউ জ্বাল দিতে বসেছে উজানী।

পুব দিকটা আবছা আবছা। এখনও রোদ এই দ্বীপের মাথায় এসে পৌছুতে পারে নি।

উনুনের মুখে শুকনো পাতা গোঁজে উজানী। দপ দপ করে পাতা পোড়ে। টগ বগ করে জাউ ফোটে।

ফুটন্ত জাউর দিকে তাকিয়ে বুড়ি বকতে থাকে, 'কে আছে আমার? কেউ নাই। এই যে একখান কাপড় দিয়া সারা বচ্ছর বার মাস কাটাই, কেউ কি দ্যাখে? দ্যাখে না। কাপড়খান পিজ্জা পিজ্জা গেছে। এত বড় পিরথিমীতে কেউ নাই আমার যে একখান কাপড় দিতে পারে, যে আমার সুখ-দুঃখু বোঝে।'

ঘরের ভিতর বাঁশের মাচানে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল হারান। উজানী বুড়ির বকবকানিতে ঘুম ছুটে গেল। তবু উঠল না। চোখ বুজে কান খাড়া করে রইল।

উজানী বুড়ি থামে না, 'কাপড নাই, অহন আমি শরম ঢাকি ক্যামনে? আমি তো কেউ না, গাঙ্গের জলে ভাইসা আইছি। যত আপন হেই লষ্ট পাগল মাগীটা!'

টেনে টেনে একটু দম নেয় উজানী। নতুন উদ্যমে ফের শুরু করে, 'হেই বান্ধবেব কাপড় যদিন ছিড়ত, ডিগলিপুরের হগল মানুষ দেখত, কবে বাহারের শাড়ি আইসা গেছে। বান্ধবের লেইগা চুপে চুপে হগল আহে। বাহারের বাহারের শাড়ি, বাহারেব বাহারের বেলাইজ (ব্লাউজ), গন্ধত্যালের শিশরি। হগল কথাই কানে আহে। কালা তো আর হই নাই। কিন্তুক আমার বেলাতেই মুখ বেজার। আমার কাপড় যে ছিড়া গেছে, দেইখাও দ্যাখে না।'

ভোরে উঠেই নির্জলা মিথ্যা বকতে শুরু কবেছে উজানী বুড়ি। কবে সে কাপাসীকে বাহারের বাহারের শাড়ি, বাহারের বাহারের জামা, গন্ধতেল দিয়েছে, ভেবেই পায় না হারান। কে যে এই সব কথা উজানী বুড়ির কানে তোলে! সাত সকালেই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল হারানের।

কতক্ষণ আর বুড়ির বকবকানি শোনা যায়! মানুষের ধৈর্য বলে একটা কথা আছে। অগত্যা চোখ ডলতে ডলতে উঠে পড়ল হাবান। নাঃ, আজ যেমন কবে পারুক উজানী বুড়ির জন্য একখানা কাপড় কিনে আনবেই।

পালসাহাব সেটেলমেন্টে থাকলে চিন্তা ছিল না। না থাকাতেই হয়েছে যত বিপদ। নিজের হাতে এক্‌খানা পয়সাও নেই হারানের। কী যে সে করবে! এদিকে ঘরে টেকার উপায় নেই। যতক্ষণ নতুন কাপড় না আসবে ততক্ষণ বক বক করে উজানী বুড়ি তাকে জ্বালিয়ে মারবে।

ধারের আশায় আশায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেটেলমেন্টের সব ঘরে হন্যে হয়ে ঘুরল হারান।

পরনের কাপড় আর প্রাণটা ছাড়া বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে কে-ই বা কী আনতে পেরেছে! কার ঘরে সোনাদানা মণিমাণিক্য রয়েছে যে ধার দেবে!

শেষ পর্যন্ত উদ্ধব বৈরাগীর কাছে পাঁচটা টাকা মিলল। সেই টাকা ক'টা সম্বল করে যোগেনকে সঙ্গে নিয়ে এরিয়াল উপসাগরের দিকে রওনা হল হারান।

মাস দুই হল, উপসাগরের পারে একটা দোকান বসেছে। মালাবারী মুসলমান হাসমত আলির দোকান। হাসমতের দোকানে চাল-ডাল-মশলা কাপড়চোপড়, সব মেলে। ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে এই একটাই মাত্র দোকান।

ছ'মাইল চড়াই-উতরাই, টিলা-জঙ্গল ঠেঙিয়ে একবার সেখানে গিয়েছে, আবার ফিরেছে। সঙ্গে যোগেন। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বেজায় হতাশ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দু'জনে।

সেটেলমেন্টে ঢুকেই প্রথমে উদ্ধব বৈরাগীর ঘর। সেখানে আলো জ্বলছে। দূর থেকে খোলের আওয়াজ আর গানের সুর ভেসে আসছে।

জোরে পা চালিয়ে সরাসরি উদ্ধবের ঘরে এসে উঠল হারানরা। ওখানে আসর বেশ জমে উঠেছে।

রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর, বুড়ি বাসিনী—সেটেলমেন্টের অনেকেই এসে উদ্ধবের ঘরে জমা হয়েছে।

খোলঞ্চি হয়েছে রসিক শীল। বাঁ হাতে বাঁ কান চেপে ডান হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে উদ্ধব গান ধরেছে ঃ

সব্ব অঙ্গ খাইও রে কাক
না রাখিও বাকি,
শুধু কিষ্ণ দবশন আশে
রেখো দু'টি আখি।

তালের মাথায় মাথায় খোলে চাঁটি মারে রসিক শীল।

হারানদের দেখে গান থামাল উদ্ধব। সঙ্গে সঙ্গে খোলের আওয়াজও থামল। উদ্ধব বলল, 'কি রে সোনা, কহন ফিরলি?'

বিরস গলায় হারান বলল, 'এই তো আইলাম।'

উদ্ধব হারানের কাছে এগুতে এগুতে বলে, 'দেখি দেখি, ঠাউরমায়ের লেইগা কী কাপড় আনলি?'

'কাপড় আনি নাই বৈরাগী দাদা। এই ধর তোমার ট্যাকা।'

উদ্ধবের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে কাপড় কিনতে গিয়েছিল হারান সেটা ফেরত দিতে দিতে বলল, 'টাকা উধার (ধার) করলাম, কিন্তুক কামে লাগল না।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হারানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল উদ্ধব। আস্তে আস্তে বলল, 'ক্যান? হইল কী?'

'একখান মোটা কাপড়ের দাম চায় দশ ট্যাকা।' হারান উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'দশ ট্যাকা দিয়া কাপড় কিনা আমার কাম না। এইবার থিকা ঠিক করছি, ল্যাংটাই থাকুম। ঠাউরমায়েরে গিয়া কমু, কাপড়ের আশা ছাড় বুড়ি।'

গানের আসরের তাল আগেই কেটে গিয়েছিল।

রসিক শীল, বুড়ি বাসিনী, চন্দ্র জয়ধর, সবাই হারান আর উদ্ধবের কথা শুনছে।

উদ্ধব বলল, 'ক'স কি হারান, একখান মোটা কাপড়ের দাম দশ ট্যাকা!'

'ঠিকই কই বৈরাগী দাদা, বিশ্বাস না হয় জামাইরে জিগাও।' যোগেনকে আস্তে ঠেলা মেরে হারান বলল, 'কও জামাই।'

যোগেন সায় দিয়ে বলল, 'হ, হাসমত মিয়া উই দামই চাইল।'

'সব্বনাশ!' অদ্ভুত একটা শব্দ করল উদ্ধব।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

হঠাৎ চন্দ্র জয়ধর বলল, 'হাসমত মিয়ার কাছে গলাকাটা দাম। কয়দিন আগে মাইয়ার লেইগা একখান শাড়ি কিনতে গেছিলাম। পনের ট্যাকা দাম চায়। দিন পাইছে। ডিগলিপুরে আর দোকানও নাই। পরাণে যা চায়, মুখে যে দাম আহে, হেয়াই কয়।' একটু থামে চন্দ্র। আবার শুরু করে, 'মিঞা ভাই জানে, যে দাম কইব হেই দামেই মাল কিনতে হইব। জানে, তার দোকানে না গিয়া গতি নাই।'

কথায় কথা বাড়ে।

রসিক শীল বলল, 'সুযুগ পাইয়া কাপড় চাউল ডাইল মশল্লা, হগল জিনিসের দাম চড়াইয়া দিছে হাসমত। অত চড়া দরে মাল কিনতে হইলে আমাগো লাখান গরিব কি বাচে?'

উদ্ধব বলল, 'তা হইলে উপায় কী? বিহিত কী?'

এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি বুড়ি বাসিনী। এক কোণে বসে মুখ বুজে সকলের আক্ষেপ এবং ক্ষোভের কথা শুনছিল। এবার সে বলল, 'পালসাহাব কুলোনিতে নাই। হে না ফিরা ইস্তক কুনো বিহিত হইব না। আগে হে আহুক, এট্টা উপায় হইবই।'

আরো তিন দিন পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফিরে এল পালসাহাব। সব শুনে বলল, 'হাসমত শালে একটা ডাকু।'

রসিক শীল বলল, 'এত দরে তো মাল কিনা যায় না।'

'জরুর যায় না।'

পালসাহাব খেপে উঠল, 'এই ডিগলিপুর আমার এলাকা, এখানে অত মুনাফাবাজি চলবে না। হাসমত কুত্তার জান তুড়ব।' নাকের ফুটো দিয়ে পাঁশুটে রঙের অনেকগুলো রোঁয়া বেরিয়ে আছে। উত্তেজনায় সেগুলো নড়তে লাগল। ঘোলাটে বাদামি রঙের চোখদু'টো ধক ধক করছে। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হাতের মুঠি দু'টো কী একটা আঁকড়ে ধরার জন্য বার বার পাকিয়ে যাচ্ছে পালসাহাবের।

হঠাৎ উঠে একটা জখমী জানোয়ারের মতো পায়চারি করতে লাগল পালসাহাব। তারপর আচমকা থেমে চিল্লাতে শুরু করল, 'আঁই হারান, আঁই যোগেন, আঁই গুপী—চল, হাসমত শালের দোকান তুড়ে দিয়ে আসি।'

বুড়ি বাসিনী ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল। ধীর স্থির শান্ত মানুষ সে। বয়সের গুণেই হোক আর যে কারণেই হোক, মাথাটা সব সময়ই তার ঠান্ডা।

বাসিনীকে দেখে পালসাহাব বলল, 'এই যে মাঈ, তুই কুছু বলবি?' আজ কাল বাসিনীকে মাঈ ডাকে পালসাহাব।

বাসিনী বলল, 'হ বাবা।'

'বল বল—' বাসিনীর পাশে এসে দাঁড়াল পালসাহাব।

'কমু, কিন্তুক রাগ করতে পারবেন না সাহেব বাবা।'

'আরে না না, রাগ করব না। তুই আমার মাঈ। তোর ওপর রাগ করতে পারি!' বলতে বলতে হেসে ফেলল পাসলাহাব, 'তোদের ওপর আমি যখন তখন রাগ করি, তাই না? কী করব, মেজাজটা ইতনা খারাপ হয়ে গেছে! যাক, এবার তোর বাত শুরু কর মাঈ।'

বুড়ি বাসিনী বলল, 'হাসমত মিয়ার দোকান ভাইঙ্গা দিয়া কী হইব? কিছু সুরাহা হইব না। আমাগো অন্য উপায় দেখতে হইব।'

'কী উপায়?' একদৃষ্টে বাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পালসাহাব।

'আমি কই কি বাবা, এই ডিগলিপুরের কুলোনিতে আমরা তো এত মানুষ রইছি—'

'হ্যাঁ, ও তো ঠিক বাত। লেকিন তাতে হল কী?'

'আমারে কথাটা পুরা করতে দ্যান।'

'হাঁ হাঁ, তুই বল মাঈ।'

বাসিনী বলতে থাকে, 'আমরা এত মানুষ আছি। তবু আমাগো দোকান-পসার, হাট-বাজার নাই। এইহানে একখান বাজার বহাইলে কেমুন হয়?'

'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।' দু'হাতে বুড়ি বাসিনীকে জড়িয়ে ধরল পালসাহাব। বলল, 'অ্যায়সা অ্যায়সা কি তোকে মাঈ বলি! ঠিক মতলব ঠিক সময় তুই বাতলে দিস।'

এরপর হাট-বাজার সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

এমনিতে কারো হাতেই টাকা পয়সা নেই। অথচ মূলধন ছাড়া ব্যবসা হয় কেমন করে?

ঠিক হল, পালসাহাবই সব ব্যবস্থা করবে।

নিজে জামিন দাঁড়িয়ে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ধারে মাল এনে দেবে। মাল বেচার পর দোকানীরা মহাজনকে টাকা শোধ করে আসবে।

বাজার বসানোর কথাটা পাকা হয়ে গেল।

দিন কয়েকের মধ্যেই ডিগলিপুরের খালের পার ঘেঁষে খান পাঁচেক ছোট ছোট দোচালা ঘর উঠল। বাঁশের খুঁটির মাথায় বেতপাতার চাল। এটাই বাজার। উজানী বুড়ির কাপড়ের দৌলতে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে বাজার বসে গেল।

উনচল্লিশ

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে যারা উপনিবেশ গড়তে এসেছে এতদিন মনে হত তারা এক, অভিন্ন। তাদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। বউ বাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, সবাই মিলে মানুষের একটা পিন্ড। কিন্তু পায়ের নিচে মাটি আর মাথার ওপর ছাউনি পেয়ে তাদের অন্য স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে।

একমাত্র উপনিবেশ গড়ার ব্যাপারেই তারা একত্র হয়। না হলে প্রতিটি মানুষই তার মন অনুভূতি সুখ কি দুঃখ নিয়ে এই দ্বীপের মতোই আলাদা আলাদা, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। একেক জনের সমস্যা একেক রকম। একজনের স্বভাব চরিত্র কি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্যের আদৌ মিল নেই।

দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়েও প্রতিটি মানুষ দু'জায়গায় এক। প্রথমত, উপনিবেশ গড়ার কাজে। দ্বিতীয়ত, পালসাহাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায়। কেউই তার অভিযোগ নালিশ দুঃখ হতাশা কি আনন্দের কথা পালসাহাবকে না জানিয়ে পারে না।

এই দ্বীপের সব মানুষের সমস্ত দুঃখ সুখ এবং জীবনবোধের ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে একজন মাত্র মানুষ। সে পালাসাহাব। নিয়তির মতো, অমোঘ বিধানের মতো এই মানুষটিকে কোনোভাবেই অতিক্রম করা যায় না।

পালসাহাবকে ঘিরেই বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে জীবন গড়ে উঠছে।

শেষ পর্যন্ত কুমীকেও পালসাহাবের কাছে আসতে হল।

ডিগলিপুর সেটেলমেন্টে কুমীর মতো চরিত্র নেই।

কুমী বিধবা সধবা না কুমারী, বুঝবার যো নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কিন্তু ডান হাতে এক গাছি শাঁখা আছে। একহারা চেহারা। থ্যাবড়া নাক, গোল মুখে হনু দু'টো খাড়া হয়ে আছে। চৌকো থুতনি। চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করার উপায় নেই। কুমী যদি না বলে দেয়, তা হলে তিরিশও মনে হতে পারে, আবার চল্লিশ ভাবতেও দোষ নেই।

ওপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বড় সোজা মানুষ কুমী। কিন্তু চোখের দিকে তাকালেই ধারণা বদলে যায়। অমন ধূর্ত চোখ হাজারে একটা দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

কুমীর চোখের তারাদু'টো খাঁচার পাখির মতো ছটফট করে। খাঁচার পাখি হয়তো ঠিক নয়, উপমা হওয়া উচিত চরকি। চরকির মতোই ছোটাছুটি করে।

সরু কোমরের নিচে ভারী, মাংসল নিতম্ব। সেই নিতম্ব ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে ঘুরে বেড়ায় কুমী।

কোনোদিন হয়তো সাদা একখানা থান পরে বেরুল। হাতে শাঁখা নেই। চুলগুলো মাথার ওপর থুপথাপ করে বাঁধা।

কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করল, 'এই আবার কুন বেশ!'

অল্প একটু হেসে কুমী বলে, 'যুগিনী সাজলাম।'

আবার কোনোদিন টকটকে লাল ডুরে শাড়িতে শরীর সাজিয়ে, হাতে গোছা গোছা কাচের চুড়ি দিয়ে, পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে পথে বেরুল।

সেদিনও হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করল, 'এই আবার কুন বেশ!'

চোখের তারা দু'টো ঘুরিয়ে, কোমরের খাঁজে ঢেউ তুলে কুমী বলে, 'আইজ মুহিনী সাজলাম।'

ওপর থেকে দেখে যে কুমীকে খুব খারাপ মনে হয় তা নয়, কিন্তু তার ভিতরে ডুব দিতে পারলে যা পাওয়া যাবে তা হল কতকগুলো মারাত্মক প্যাঁচ।

কুমীর চামড়ার নিচে বুঝি বা রক্ত মাংস কি হাড় নেই। জটিল কুটিল অসংখ্য প্যাঁচ সেখানে ঠাসা।

সেটেলমেন্টের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় কুমী। কোন ঘরের সোয়ামী আর স্ত্রীতে বনিবনা নেই, দেশভাগের পর কোন ঘরের মেয়ের শরীর নষ্ট হয়েছে, কোন ঘরের বউ নিশি রাতে নাগরের কাছে ঢলাতে যায়, ঘুরে ঘুরে এই সব খবর সে যোগাড় করে। দিনরাত এই-ই তার কাজ। এতেই তার চরম সুখ। মাছির মতোই মানুষের জীবনের ঘা-গুলো খুঁটে খুঁটে আনন্দ পায় কুমী।

একটা ব্যাপার অনেক দিন ধরে দেখে দেখে, নিঃসন্দেহ হয়ে শেষ পর্যন্ত পালসাহাবের কাছে এল কুমী।

এখন দুপুর।

একটানা বর্ষার পর রোদ উঠেছে। উজ্জ্বল, ধারাল, তীব্র রোদ।

ঝুপড়ির সামনে বসে লাল খয়েরি হলুদ—নানা রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে চালু লাইন (এক ধরনের বড়শি) তৈরি করছিল পালসাহাব। কাল সকালে সে এরিয়াল উপসাগরে মাছ মারতে যাবে।

চালু লাইন বানাচ্ছিল আর গুন গুন গুন করে গাইছিল পালসাহাব ঃ

ভোবের তোরঙ্গ উঠল
উসকো লিয়ে কি
লাও ডুবাবে?

এমন সময় কুমী এসে ডাকল, 'পালসাহাব—'

গান থামিয়ে চমকে উঠল পালসাহাব। বলল, 'কৌন?'

'আমি কুমী—'.

লাল লাল দাঁত বাব করে একটু হাসল পালসাহাব। বলল, 'ও, তুই মুহিনী-যুগিনী (মোহিনী-যোগিনী)। আয় আয়, ব'স।' পালসাহাব কুমীকে মুহিনী-যুগিনী ডাকে।

পালসাহাবের পাশ ঘেঁষে ঘন হয়ে বসল কুমী।

পালসাহাব শুধলো, 'কিছু দরকার আছে?'

'হ বাবা।'

'বল, বলে ফ্যাল—'

সতর্ক চোখে চারদিক দেখে কুমী শুরু কবল, 'কথাটা কিন্তুক গুপন (গোপন)—'

'হাঁ হাঁ, বল না তুই—' চালু লাইন বানানো বন্ধ রেখে কুমীর মুখের দিকে তাকাল পালসাহাব।

একটা ঢোক গিলল কুমী। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে কথাটা বলার জন্য পালাসাহাবের কাছে এসেছিল। কিন্তু এখন সাহস হারিয়ে ফেলছে।

পালসাহাব তাড়া লাগল, 'কী হল বে?'

আবছা গলায় কুমী বলল, 'কিন্তুক—'

এবার পালাসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'লেকিন ফেকিন কুছ নেহী। জলদি কর শালী।'

কী ভেবে কুমী হঠাৎ উঠে পড়ল।

পালসাহাব বলল, 'উঠলি যে?'

কুমী জবাব দিল না। পালসাহাবকে পেছনে রেখে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিল।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল পালসাহাব। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। তারপর দৌড়ে গিয়ে কুমীকে ধরে ফেলল।

কুমীর একটা হাত ধরে টেনে হেঁচড়ে ঝুপড়িটার সামনে নিয়ে এল পালসাহাব। চিল্লাতে লাগল, 'মাগী মুহিনী-যুগিনী, বাত বলতে এসে না বলে চলে যাবি! তা হবে না।'

ত্রস্ত চোখে পালসাহাবের দিকে তাকাল কুমী। বলল, 'কমু, হগল কথা কমু। কিন্তুক আইজ না। অন্য দিন।'

'আজই তোকে বলতে হবে, আভী বলতে হবে।' এক ঝটকায় কুমীকে বসিয়ে দিল পালসাহাব। বলল, 'দিল্লাগী পেয়েছিস! বল শালী।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে নিল কুমী। তারপর শুরু করল, 'হে কথা কইতে বড় শরম লাগে পালসাহাব। আপনে সামনে রইছেন—' শেষ না করেই থেমে গেল সে।

পালসাহাব বলল, 'আমি সামনে থাকলে শরম লাগে?'

'হ পালসাহাব।'

'তা হলে আমার দিকে পেছন ফিরে ব'স।'

কথামতো বসল কুমী।

পালসাহাব বলল, 'এবার বল—'

কুমী বলল, 'কথাটা কিন্তুক বড় গুপন। আপনে বিশ্বাস করবেন না।'

'হাঁ হাঁ, গোপন। তোর কথা জরুর বিশোয়াস করব। বল তুই।'

অনেক ভণিতার পর কুমী বলল, 'উই হরিপদর বউ তিলি, উই মাগীর কথা—'

'উই মাগী কী করল?'

'কী করতে বাকি রাখছে?' উত্তেজনায় ঘুরে বসল কুমী। ফিস ফিস করে বলল, 'উই মাগী লষ্ট—'

'লষ্ট!' পালসাহাব চমকে উঠল।

'হ পালসাহাব, উই মাগীর শরীল লষ্ট হইয়া গেছে।'

'বুঝলি কেমন করে?'

'কী যে কন বাবা, সারা জনম এই কইরা কাটাইলাম।' বলে চোখ মটকাল কুমী। ধূর্ত শব্দ করে একটু হাসল। বলল, 'পালসাহাব, আমার চৌখেরে ফাকি দিয়া লাগর লইয়া ঢলাইব অ্যামন মাগী ডিগলিপুরের এই কুলোনিতে নাই।'

একদৃষ্টে কুমীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পালসাহাব। নাকের রোঁয়াগুলো একটু একটু নড়ছে।

এবার পালসাহাবের কানে মুখটা গুঁজে ছিল কুমী। গলা নামিয়ে বলল, 'রোজ রাইতে যহন পিরথিমী ঘুমে নিঝাম হইয়া থাকে তহন তিলি লাগরের কাছে যায় পালসাহাব।'

'লাগরটা কৌন শালা?'

'উই জামাই।'

'জামাই! যোগেনের কথা বলছিস?'

'হ বাবা—'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'ঝুট বাত।'

একটু সরে বসল কুমী। বলল, 'মিছা আমি কই না পালসাহাব। নিজের চৌখে রাইতের পর রাইত তিলিরে জামাইর কাছে যাইতে দেখছি। চৌখে তো আর ছানি পড়ে নাই। নিজের চৌখেরে অবিশ্বাস করি ক্যামনে?'

'শালী, তোর মুখে যত বদ কিস্‌সা। ভাগ মাগী—' পালসাহাব খেপে উঠল।

আশ্চর্য! কুমী ভয় পেল না। কোমরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এইর এট্টা বিহিত করলেন না পালসাহাব। ভুল করলেন, জবর ভুল করলেন।'

'যা মাগী, আভী আমার আঁখের সামনে থেকে ভাগ—'

'যাই বাবা, যাই—' পালসাহাবের ঝুপড়ির সামনে ঢালু উতরাই। সেটা বেয়ে নামতে নামতে কুমী বলল, 'আইজ আমারে খেদাইয়া দিলেন। কিন্তুক আমি আবার আহুম। ফিরা ফিরা আহুম।'

'যা শালী, তোর কোনো বাত আমি শুনতে চাই না।'

'শুনবেন বাবা, এক শ' বার শুনবেন। শুনতে হইবই।' হিক্কার মতো শব্দ করে টেনে টেনে হাসতে লাগল কুমী। বলল, 'অহন আমার কথা তিতা লাগে। কিন্তুক যেই দিন ফল ফলব, হেই দিন বুঝবেন, সাচা কথাই কইছিলাম। হেই দিন ফল ফলনের খবর দিতে আহুম বাবা।'

গলা বাঁকিয়ে, কোমর ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে উতরাই বাইতে বাইতে নিচের দিকে নেমে গেল কুমী।

চল্লিশ

পানিকর সেই যে বলে গিয়েছিল সিপি আর লা তে'কে নিয়ে কালই এসে পড়বে তা আর হয়ে ওঠে নি। কানখাজুরার (চেলা জাতীয় সরীসৃপ) কামড় খেয়ে পুরো দু'মাস ভুগল সে। বিষে সমস্ত শরীর তার নীল হয়ে গিয়েছিল।

মায়াবন্দর থেকে পানিকরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পোর্ট ব্লেয়ারের হাসপাতালে। সেখান থেকে খানিকটা সুস্থ হয়ে কাল রাতে মায়াবন্দরে ফিরে এসেছে সে। আর আজ সকালেই 'নটিলাস' বোটটা সিপিতে সিপিতে বোঝাই করে লা তে'কে সঙ্গে নিয়ে ডিগলিপুর রওনা হল।

পানিকররা নিত্য ঢালীর ঘরে এসে যখন পৌঁছল তখন বিকেল।

এখন রোদের তাপ কম, জেল্লা বেশি। ঝলমলে আলোয় চারপাশের জঙ্গলের গাঢ় সবুজ মাথাগুলি জ্বলছে।

দাওয়ার পাটাতনে বসে ভুক ভুক করে তামাক টানছিল নিত্য ঢালী। মৌতাত বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, চড়াই বেয়ে আগে আগে আসছে পানিকর। তার পেছনে বিরাট একটা টিনের তোরঙ্গ মাথায় চাপিয়ে লা তে।

পানিকরদের দেখে হুঁকো নামিয়ে নিত্য ঢালী ছুটে এল। বলল, 'আহেন পানিকর বাবা, আহেন।'

পানিকরকে নিয়ে দাওয়ায় গিয়ে বসল নিত্য।

উঠোনের এক ধারে টিনের তোরঙ্গটা নামাল লা তে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে নিত্য ঢালীর পাশে গিয়ে বসল।

নিত্য বলল, 'হেই যে কইয়া গেলেন রাইত পুয়াইলেই আইবেন, আর তো আইলেন না। দিনের মনে দিন যায়। রাইতের মনে রাইত যায়। কাপাসী আর আমি এট্টা এট্টা কইরা দিন গনি (গুনি)। আর চিন্তায় মরি। কিন্তুক কই পানিকর বাবা!'

'কী করব চাচা, আমাকে কানখাজুরায় কাটল। পুরো দু'টো মাস সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) কাটালাম।'

'বেশ মানুষ আপনে!' বেজার মুখে নিত্য ঢালী বলতে লাগল, 'আমরা যে এই ডিগলিপুরে আছি, এট্টা খবর তো পাঠাইতে হয়। আসলে আপনে আমাগো আপনজন ভাবেন না। আমরা পানিকর বাবা পানিকর বাবা কইরা মরলে কী হইব!' তার কথাগুলোতে প্রাণের তাপ রয়েছে।

পানিকর কিছু বলল না, অল্প একটু হাসল।

নিত্য ঢালী আবার বলল, 'অহন কেমুন আছেন পানিকর বাবা?'

'এখন তবিয়ত ভালই—' পানিকর বলতে থাকে, 'তবে কানখাজুরার বিষে কাবু হয়ে পড়েছি।' বলতে বলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল পানিকর, 'এরিয়াল বে'তে মোটর বোট বেঁধে এসেছি। বোটে আরো সিপি আছে। সিপিগুলো আনতে হবে।

চুপচাপ দুই হাঁটুতে থুতনি গুঁজে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল লা তে। পানিকরের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'আমি যাই মালেক, সিপিগুলো নিয়ে আসি।'

কোনো ব্যাপারেই ক্লান্তি নেই লা তে'র। দিনরাত সে অসুরের মতো খাটতে পারে। খানিকক্ষণ আগেই ছ'মাইল পাহাড় জঙ্গল ঠেঙিয়ে বিরাট একটা টিনের তোরঙ্গ নিয়ে এসেছে। একটু জিরিয়েই সব অবসাদ ঝেড়েঝুড়ে আবার সিপি আনতে ছুটছে। তার ধাতে চুপচাপ বসে থাকা নেই। একটা কিছু না কিছু নিয়ে সবসময় মেতেই আছে সে। তার মধ্যে এমন এক প্রাণশক্তি আছে, যা কখনো ফুরোয় না।

পানিকর বলল, 'তুই কি এত সিপি আনতে পারবি লা তে?'

'এক দফে পারব না। বার বার গিয়ে আনব।'

'তবে যা।'

সামনের উতরাই বেয়ে লা তে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর চনমনে চোখে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল পানিকর।

নিত্য ঢালী বলল, 'কী খোজেন পানিকর বাবা?'

'কুছু না, কুছু না—' পানিকর নিত্য ঢালীর দিকে মুখ করে বসল।

নিত্য ঢালী বলল, 'আপনেরা আইলেন, ভালই হইল। এইবার কামের কথা কওয়া যাউক।'

'হাঁ হাঁ চাচা, বল—'

'কই কি, আমার তো একখান মোটে ঘর। এক ঘরে এত জনের জাগা হইব না।'

'ঠিক বাত, ঠিক বাত—' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে পানিকর। নিজের অজান্তেই এদিক সেদিক তাকাতে থাকে।

পানিকরকে চারদিকে তাকাতে দেখে মনে মনে কীএকটু ভেবে নেয় নিত্য ঢালী। ফিস ফিস করে বলে, 'কিছু দরকার পানিকব বাবা?'

'আঁ্যা, নেহী নেহী---'

চমকে উঠেই সামলে নেয় পানিকর। নিজের মতলবটা এত তাড়াতাড়ি ফাঁস করতে রাজি নয় সে। কিছুক্ষণ পর শুধোয়, 'বল চাচা, কী যেন বলছিলে—'

'হ বাবা, কই।' পানিকরের ভাবগতিক ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না নিত্য ঢালী। সে বলতে থাকে, 'এক ঘরে তো এত জনের কুলাইব না। আর একখান ঘর বানাইয়া লইতে হইব।'

'হাঁ, জরুর।' ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে পানিকর সায় দিল, 'তুমি কোঠি বানাও চাচা। যা খরচ লাগে আমি দেব।'

নিত্য ঢালী উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'কাল থিকাই ঘর বানান শুরু করুম।'

'বহুত আচ্ছা।'

খানিকটা এ কথা সে কথার পর আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে পানিকর। নিত্য ঢালীর ঘরের আনাচ কানাচ, উঠোন, দূরের ঢালু উতরাই—চারপাশে তার চোখদু'টো চরকির মতো ঘুরতে থাকে!

নিত্য ঢালী বলে, 'কী দ্যাখেন বাবা?'

'কুছু না, কুছু না।' পানিকর ভালমানুষের মতো মুখ করে নিত্যর দিকে তাকায়।

নিত্য ঢালী নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'আপনেরা আইলেন, বড় ভাল হইল, বড় বাহারের হইল। কত বল ভরসা পাইলাম।'

'হাঁ—'

'পাচ মুখে পাচ কথা রটব—'

'হাঁ—'

'কিন্তুক আমি কারোরে ডরাই না। ক্যান ডরামু? আমি কি কারো কাছে দুই খান পয়সা ধারি? না কেউ দুই দিন আমারে খাওয়াইছে? উলটা আমার ঘরে আইসা আমার মাইয়ার নামে আকথা কুকথা কইয়া যায়।' বকতে বকতে হঠাৎ হুঁশ হল নিত্য ঢালীর। পানিকর তার কথা শুনছে না। অগত্যা বকবকানি থামিয়ে সরাসরি পানিকরের চোখের দিকে তাকাল সে।

দূরে উতরাইর দিকে তাকিয়ে আছে পানিকর। একদৃষ্টে কী যেন দেখছে। তার চোখ দু'টো ধক ধক করছে।

কী দেখছে পানিকর? তার দেখাদেখি উতরাইয়ের দিকে চোখ ফেরায় নিত্য ঢালী।

খানিকটা আগে জল আনার জন্য কিঁলপঙ নদীতে গিয়েছিল কাপাসী। ভেজা কাপড়ে, কাঁখে কলসি, এখন উতরাই বেয়ে উঠে আসছে সে। কলসি থেকে জল ছলকে ছলকে পড়ছে।

কাপাসীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার পানিকরের দিকে তাকাল নিত্য ঢালী। সোজা সহজ মানুষ সে। তবু কিছু একটা আন্দাজ করল। একটা কিছুর গন্ধ পেল যেন।

একচল্লিশ

বর্ষা নামার আগে লাঙলের ফলায় ফলায় জমি চৌরস হয়ে গিয়েছিল। তারপর বীজদানা বোনা হয়েছে।

কিন্তু লাঙল দিয়েও জঙ্গল পুরোপুরি মারা গেল না। হাজার হাজার বছর ধরে এই দ্বীপের অস্তিত্বের সঙ্গে অরণ্য মিশে আছে। এত সহজে একবার মাত্র লাঙল চালিয়ে সেই অরণ্যকে উৎখাত করা যায় না।

বর্ষার মেয়াদ ফুরিয়েছে। মাটির গর্ভ চিরে চিরে মাথা তুলেছে সবুজ নধর ধানের চারা।

দ্বীপের কুমারী মাটি এই প্রথম গর্ভিণী হয়েছে। সেই গৌরবে উত্তর আন্দামান লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে।

যতদূর তাকানো যায়, গাঢ় সবুজ রঙের ধানবন। ধানের গোছাগুলো কি সতেজ, কি পুষ্ট। ধানগাছ দেখেও সুখ।

কিন্তু পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ সুখ বলে বুঝি কিছুই নেই। সুখের সঙ্গে চিরদিনই দুঃখের খাদ মেশানো থাকে। না হলে ধানের সঙ্গে সঙ্গে কেন হাওয়াই বুটি, জলডেঙ্গুয়া আর নানা জাতের আগাছা মাথা তুলবে?

সারাদিন ডিগলিপুরের বাসিন্দারা জমিতে নিড়ান দেয়। আগাছা পরিষ্কার করে। জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির চারাগুলো শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে।

ধানের পাশে আগাছা থাকলে ফসলের জোর কমে যাবে।

সমস্ত দিন নিড়ান দিয়ে সন্ধের মুখে সবাই জমি থেকে উঠে কিলপঙ নদীতে যায়। পাহাড় ফুঁড়ে নেমে আসা ঠান্ডা জলে গায়ের মাটি ধুয়ে সরাসরি উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে গিয়ে জমা হয়।

সরকার থেকে খোল করতাল দিয়েছে। উদ্ধবের ঘরে সারাদিন কাজকর্মের পর গানের আসর বসে।

গানের ব্যাপারে ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের প্রচুর উৎসাহ। সমস্ত দিন খাটুনির পর যে জীবনীশক্তি তারা ক্ষয় করে, এই গানের আসরে এসে আবার তা ফিরে পায়। এখানে এসে অবসন্ন, শ্রান্ত মানুষগুলি সতেজ হয়ে ওঠে।

গানের ব্যাপারে সবচেয়ে যার বেশি উৎসাহ সে হল পালসাহাব। পালসাহাব আজ নেই। সেটেলমেন্টের জরুরি কাজে পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছে। অগত্যা তাকে বাদ দিয়েই আজ আসর বসল।

ঘরের দুই কোণে টিমিয়ে টিমিয়ে দু'টো কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। আবছা আলো আর ছায়া ছায়া অন্ধকারে এই ঘরের কিছুই স্পষ্ট নয়। মানুষগুলির ছায়া অস্বাভাবিক লম্বা আর বিকৃত হয়ে ঘরের বেড়ায় কাঁপছে।

কেরোসিনের ডিবে থেকে যত আলো পাওয়া যায়, তার হাজার গুণ বেশি মেলে ধোঁয়া। এই ধোঁয়ার গন্ধ বড় উগ্র, বড় তীব্র। নাকে ঢুকলেই মানুষগুলো খক খক কাশে।

ধোঁয়াটে আলোতে মানুষগুলোর চেহারা বোঝা যায়। কিন্তু নাক, চোখ বা চোখের ভাষা, কিছুই স্পষ্ট নয়।

উদ্ধবের ঘরে তামাকের সরঞ্জাম আছে। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরছে।

বুড়ো রসিক শীলই প্রথম বলল, 'লাগা রে উদ্ধব, একখান বাহারের গান ধর।'

'না না—' উদ্ধব বলল, 'পেরথমে আমি না। পেরথমে গান গাইব গুপী। দেখ না, গুপী গাওয়ার লেইগা কেমুন ছোক ছোক করতে আছে।'

গুপীর গান গাওয়ার প্রচন্ড শখ। তার নামটা উচ্চারণ করামাত্র ঘরের এক কোণ থেকে মাঝখানে উঠে এসে দাঁড়াল সে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় তিন লহর রুদ্রাক্ষের মালা। ভারি সরল মানুষ গুপী।

বাঁ হাতে বাঁ কানটা চেপে ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে খ্যাসখেসে, ভোঁতা গলায় গান জুড়ে দিল গুপী ঃ

তোমার চরণ তলে
হে গুরুচান রেইখো—
রেইখো আমারে—

গুপীর গানের মধ্যেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল হারান। একটা হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আর গাইতে হইব না সোনা।'

'ক্যান?' গুপীর মুখখান বড় করুণ দেখায়।

ততক্ষণে উদ্ধবের ঘরে হাসির রোল উঠেছে। হেসে হেসে, ঢলে ঢলে একজন আর একজনের গায়ে গড়াগড়ি খায়।

রোজই গুপীকে নিয়ে রঙ্গ করে হারানরা। রোজই প্রথমে তাকে গান গাইবার জন্য তুলে দেয়। আর সে গলা ছাড়লেই টেনে বসিয়েও দেয়।

দোষের মধ্যে গুপী হল নিপাট ভালমানুষ। কোনো প্যাঁচের কথা জানে না। কারো কোনো কথায় বা কোনো ব্যাপারেই নেই। জীবনে একটা মাত্র শখই আছে তার। গান গাওয়ার শখ।

প্রাণে শখ থাকলেই গলায় গান আসবে, এমন কথা নেই। হাঁ করলেই গুপীর গলা থেকে সরু-মোটা-মিহি, নানা জাতের চার পাঁচটা আওয়াজ একসঙ্গে বেরোয়। মনে হয়, তিনটে কুকুর আর দু'টো ঘোড়া পাল্লা দিয়ে চেঁচাছে।

এই মানুষগুলো, যারা পদ্মা মেঘনার দেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আশ্রয়ের আশায় এসে পড়েছে তাদের জীবনে রং কোথায়? রস কোথায়? সাত পুরুষের বাস্তু থেকে উৎখাত হয়ে আসার পর তাদের জীবনের সব রস, সব কৌতুক, সব আনন্দের উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রাণধারণের অন্তহীন যন্ত্রণা নিয়েই তাদের দিন কাটে। জীবনে যন্ত্রণা তো আছেই। দুঃখ, কষ্ট এবং দুর্ভাবনার পারকূল নেই।

দুঃখ এদের নিয়ত সঙ্গী। রোগ-ভোগ-শোকের মতো নিয়তির অমোঘ বিধানে দেশভাগের পর থেকে কষ্ট এদের সঙ্গে লেগেই আছে।

তবু মাঝে মাঝে মনকে চোখ না ঠেরে উপায় কী। বিশেষ এই আন্দামানে, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, নিদারুণ দ্বীপে।

গুপীকে নিয়ে রঙ্গ করে কিছুক্ষণের জন্য জীবনের অন্য চিন্তাগুলিকে তারা ভুলে থাকে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি করে এরা নিজেদের সরস, সজীব রাখে।

করুণ চোখে হারানের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল গুপী। এবার সে বলল, 'রোজ তরা অমুন হাসাহাসি করস ক্যান?'

'তর গলা শুইনা।'

'ক্যান, আমার গলায় হইছে কী?'

'তুই যহন গাস—' হাসতে হাসতে হারান বলে, 'মনে হয়, এক লগে তিনটা খাটাস চিল্লাইতে থাকে। বুঝলি?'

গুপী আর কিছু বলে না। সবাইকে ডিঙিয়ে ঘরের একটি কোণায় গিয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে। ভাবে, কাল আবার যখন তাকে গান গাইতে ডাকবে, কিছুতেই সে গাইবে না। অবশ্য এই প্রতিজ্ঞাটা রোজই করে গুপী, রোজই ভাঙে।

গুপীকে নিয়ে হাসাহাসি একসময় থামল।

হারান বলল, 'অনেক হইছে। এই দিকে রাইতও হইল। এইবার গান ধর বৈরাগী দাদা।'

'হ হ, গান ধর—' সবাই সায় দিল।

হারান বলল, 'আইজ রাধাতত্ত্বের গান শুনুম।'

ইতিমধ্যে খোল তুলে নিয়েছে রসিক শীল। টাটুম-টুটুম-টুম—খোলে শব্দ ওঠে। করতাল তুলে নিয়েছে যোগেন। ঢিমে তালে করতাল বাজে—ঝমর-ঝমর-ঝম।

গুন গুন করে সুর ভেঁজে উদ্ধব গান ধরে ঃ

না পুড়াইও রাধা অঙ্গ
　　না ভাসাইও জলে—
মরিলে তুলিয়া রেখো
　　তমালেরই ডালে—

রাধাতত্ত্বের গান ধরেছে উদ্ধব। সুরকে হৃদয়ের রসে জারিয়ে সে গায়। গলা থেকে মানিনী রাধার বেদনা যেন ক্ষরে ক্ষরে পড়ে।

রসিক শীল খোলে চাঁটি মারতে মারতে বলে, 'আহা কী। গান শুনালি উদ্ধব, পরাণ জুড়াইয়া গেল।'

আসর-ভরা মানুষ বিভোর হয়ে গান শোনে। সবাই মজে আছে যেন। সুরের মধ্য দিয়ে মধুর এক বেদনা মানুষগুলির অনুভূতির ভেতর ছড়িয়ে দিচ্ছে উদ্ধব ঃ

মরিলে তুলিয়া রেখো
তমালেরই ডালে—এ-এ—

সুরটাকে খাদে নামিয়ে, কখনও চূড়ায় তুলে দীর্ঘ টান দেয় উদ্ধব। সোজা সেটা যেন বুকের মধ্যে বিঁধে যায়। প্রাণের ভেতর কোন একটা অদৃশ্য তার যেন তির তির করে কাঁপে।

ঘরের এক কোণে বসে বসে বুড়ি বাসিনী, মনোরঞ্জন সানা, অক্রুর বিশ্বাস, এমনি অনেকেই হাতের পিঠে চোখ মুছছে।

রাধাতত্ত্বে আসর যখন মেতে আছে, ঠিক সেই সময় চিকন মাজা ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে আঙুল মটকাতে মটকাতে উদ্ধবের ঘরে ঢুকল কুমী। টেনে টেনে বলল, 'খুব তো আসর জমাইছ!'

কুমীকে ঢুকতে দেখেই গান থামিয়ে দিয়েছে উদ্ধব। গান থেমেছে কিন্তু তার রেশটা এখনও মুছে যায় নি।

একটু আগে এই ঘর, ডিগলিপুরের এই সেটেলমেন্ট, এই দ্বীপ—সমস্ত কিছু উদ্ধবের গানের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এই ঘরের মানুষগুলো চিরকালের এক ব্যথায় মগ্ন হয়ে ছিল। কিন্তু উদ্ধবের গানই তো শেষ কথা নয়। তার পরেও অনেক কিছু আছে। আছে জীবন। গানের স্বপ্নলোক কতক্ষণ আর মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন রাখতে পারে!

কুমী ফের বলল, 'খুব তো আসর জমাইছ! উই দিকে কী হইছে, খবর রাখ?'

কোল থেকে খোল নামাতে নামাতে রসিক শীল বলল, 'কী হইছে লো কুমী?'

'কী হইতে বাকি আছে!' মাজা বাঁকিয়ে গালে একখানা হাত রেখে কুমী দাঁড়িয়ে থাকে।

কুমীকে দেখলেই ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের বুক কাঁপে। তার সঙ্গে গূঢ়, গোপন এবং ভয়ানক সব খবর ঘোরে। পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত দুঃসংবাদ নিয়ে তার কারবার।

নানা জাতের নোংরা খবর যোগাড় করে সেটেলমেন্টের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। সবার কানে খবরগুলো না দেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

কুমীর বকম সকম দেখে এবং তার কথা শুনে মানুষগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'রঙ্গ করবি, না আসল কথাখান ক'বি?'

কুমী ঠোঁট টিপে হাসে। কিছুই বলে না। এটা তার স্বভাব। একবারে খবরটা দেয় না সে। রসিয়ে রসিয়ে, মজিয়ে মজিয়ে মানুষের উদ্বেগকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিয়ে খবরটা সে ফাঁস করে। এতেই তার সুখ।

রসিক শীল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'হাসন রাখ কুমী, কথাখান কইয়া যত পারস হাস।'

রসিক শীলই এতক্ষণ কথা বলছিল। আর সকলে চুপচাপ বসে ছিল।

এবার বুড়ি বাসিনী মুখ খুলল, 'মাগী রঙ্গী ঢঙ্গী। রঙ্গ কইরাই বাচে না। অনেক হইছে, এইবার ক'।'

আসরের ওপর দিয়ে চোখ দু'টো ঘুরিয়ে নিয়ে গেল কুমী। বুঝল, মানুষগুলো ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে। বিচিত্র এক তৃপ্তিতে তার মনটা ভরে গেল। এবার খবরটা ফাঁস করা যায়।

আসরসুদ্ধ মানুষ এবার তাড়া লাগাল, 'কও কও, তরাতরি কও। মাইনষেরে তুমি বড় জ্বালা দিতে পার। কমু কমু কইরাও কও না। মনখান উচাটন কইরা রাখ।'

চোখের তারা দু'টো নাচিয়ে অল্প হাসল কুমী। এতক্ষণ দুয়ারের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এবার আসরের মাঝখানে ঢুকে বসে পড়ল।

পানের রসে জিভ লাল করে এসেছিল কুমী। জিভটা সরু করে বার করে শুকনো ঠোঁট দু'টো চেটে চেটে ভেজাল। তারপর বলল, 'কমু, কমু। কিছুই লুকামু না।'

এবার আর কেউ কিছু বলল না। উদ্গ্রীব তাকিয়ে রইল।

কুমী শুরু করল, 'আঁই গো রসিক খুড়া, আঁই গো বাসিনী মাউই, তোমরা তো ডিগলিপুর কলোনির মাথা—'

রসিক শীল বলল, 'তাতে হইছে কী?'

'হইব আবার কী।' কুমী ঝেঁঝে উঠল, 'হইছে সবুনাশের মাথায় বাড়ি।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কুমীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রসিক শীল। মেয়েমানুষটার রকম সকম কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। আস্তে আস্তে সে বলল, 'কী ক'স তুই!'

'ঠিক কথাই কই—' কুমী বলতে লাগল, 'তোমরা তো চোখ বুইজা আছ। উই দিকে কুলোনিতে কী হইয়া গেল খোজ রাখ?'

'কুলোনিতে আবার কী হইল!'

'হইছে হইছে, ট্যার পাও নাই।' চোখ মটকে মটকে কুমী হাসে। বলে, 'উই যে নিত্য তালই, উপুর থিকা দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছখান উলটাইতে জানে না, কিন্তুক তলে তলে মানুষখান সোজা না।'

'বুঝলি ক্যামনে?'

'বুঝলাম, বুঝলাম—' চোখের পাতা নাচিয়ে হাসতেই থাকে কুমী। তার হাসিতে ধার আছে, কিন্তু শব্দ নেই।

রসিক শীল বলে, 'নিত্য আবার কী করল?'

'বিদ্যাশিরে ঘরে আইনা তুলছে।'

'বিদ্যাশি!' আসরভরা মানুষগুলো তাজ্জব বনে যায়।

কুমী থামে না, 'খালি বিদ্যাশি না, বিজাত-কুজাত। শুনলাম—'

'কী শুনলি?

'শুনলাম, নিত্য তালুই বিদ্যাশিরে ঘরেই রাখব।'

'ঘরে রাখব!'

'হ। শুনলাম আর একখান ঘর তুলব।'

উদ্ধবের ঘবে প্রথমে ভনভনানি শুরু হল। মনোরঞ্জন, অক্রুর, বুড়ি বাসিনী, হারান, যোগেন—সবাই একসঙ্গে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় ডিবের ধোঁয়া ধোঁযা তামাটে আলোতে মানুষগুলোর মুখ চকচক করে।

রসিক শীল খেপে উঠল, 'এ ক্যামুন কথা, আমরা কি মরছি' আমাগো জানাইল না, শুনাইল না, লুকাইয়া ছাপাইয়া বিদ্যাশিরে বিজাতিরে ঘরে আইনা তুলল! আমরা থাকতে বিদ্যাশি-বিজাতি আপন হইল! মানের ডর নাই! ধম্মের ডর নাই!'

কুমী জুড়ে দিল, 'তার উপুর ঘরে ডাকাবুকা যুবুতী মাইয়া আছে। ডর নাই গো খুড়া, শরম-ভবমেব ডর নাই।'

'এইর একখান বিহিত করন লাগে।' সবাই রুখে উঠল।

'কী বিহিত করবা? নিজের ঘরে যদি কেও অজাত-বিজাত আইনা তোলে, তুমি আমি কী কবতে পারি খুড়া?' বলে আর মিটি মিটি হাসে কুমী।

খবরটা এনে সবাইকে দিতে পেরেছে, এতেই কুমীর শখ মিটেছে। আর এই শখটা মিটিয়েই তার যত সুখ, যত আনন্দ। এর পর চুলোচুলি লাঠালাঠি যা করতে হয়, রসিক শীলরাই করবে। তার কাজ শেষ। কাজেই কুমী দরজার দিকে পা বাড়াল। মাজা ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে যেভাবে এই ঘরে ঢুকেছিল ঠিক সেইভাবেই চলে গেল।

কী বিহিত করা উচিত, ঠিক এই মুহূর্তে ভেবে উঠতে পারল না রসিক শীল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে শাসাতে লাগল, 'সোমাজের ডর নাই? সোংসারের ডর নাই? নিত্যার বুকের পাটাখান কত বড় হইছে দেখুম। আহুক পালসাহাব, আহুক—'

ঘরেব এক কোণে ঝিম মেরে বসে আছে হারান। কুমী বিদেশির নাম বলে যায় নি। তবু তার মনে কু-ডাক উঠেছে। কেন জানি তার মনে হচ্ছে, সেদিনের সেই কুচকুচে কালো, পুরু-ঠোঁট, কোঁকড়ান-চুল লোকটা, নাম যার পানিকর, তাকেই ঘরে এনে তুলেছে নিত্য দা।

বেয়াল্লিশ

সমস্ত রাত ঘুমতে পারল না হারান। মাথাটা গরম হয়ে রইল। মগজের ভেতর এত তাপ নিয়ে ঘুমনো যায় না।

এমনিতে বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জুড়ে যায়। নাকের ডাক শুরু হয়। কিন্তু আজকের কথা আলাদা।

বুকের মধ্য থেকে একটা অবুঝ, অসহ্য কান্না দুর্জয় বেগে উঠে এসে কণ্ঠার ঠিক কাছে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। কান্নাটা গলা ফেড়ে বেরোয় না, নামেও না। অনড়, নিরেট হয়ে থাকে।

গলাটা ভারী হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলতেও পারছে না হারান। মনে হয়, একরাশ তেতো ধারাল বালি তালুতে আটকে আছে। চোখদু'টো জ্বালা জ্বালা করছে।

ঠিক শিয়রের ওপরেই একটা বাখারির জানালা। সেটার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল হারান।

এটা বছরের মধ্য ঋতু। এখন শীতের গাঢ়তা নেই, কুয়াশায় ঘনত্ব নেই। জানালার ওপাশ থেকেই একটা মিহি আবছা পর্দা ঝুলেছে। এখনকার কুয়াশা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে না। তার গায়ে আলগাভাবে জড়িয়ে থাকে।

আজ কী তিথি, হারান জানে না। দ্বীপের মাথায় চাঁদির থালার মতো গোল একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় ডিগলিপুরের এই সেটেলমেন্টটা ভেসে যাচ্ছে। দূরের টিলা জঙ্গল আর পাহাড়ের মাথাগুলি ঝকঝক করছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হারান। জানালার ঠিক ওপাশে কতকগুলো পুরুষ জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। জ্বলে জ্বলে, উড়ে উড়ে তারা মেয়ে জোনাকিদের ফুসলোচ্ছে যেন। দ্বীপের মাটি থেকে ভেজা ভেজা বুনো গন্ধ উঠে আসছে।

দুধের মতো ধবধবে চাঁদের আলো, পুরুষ জোনাকিদের জ্বলা আর নেবা, দ্বীপের মাটির সিক্ত শীতল গন্ধ, কোনো দিকেই মন নেই হারানের।

বাতাসে হিমের আমেজ মিশতে শুরু করেছে। কেমন যেন শীত শীত করে। পায়ের কাছ থেকে কাঁথাটা তুলে গলা পর্যন্ত টেনে দিল হারান।

ঘরের ওপাশে আর একটা মাচান। সেখানে বুকে হাঁটু গুঁজে কুন্ডলী পাকিয়ে উজানী বুড়ি ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত, মন্থর, বড় বড় শ্বাস ফেলছে। বুকের মধ্য থেকে কেমন একটা অনুচ্চ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে।

কান খাড়া করে অনেকক্ষণ উজানী বুড়ির নিশ্বাসের শব্দ শুনল হারান। শ্বাস ফেলা আর শ্বাস টানাই নয়, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে বুড়ি। কেন কাঁদছে, কে জানে।

হারানের একবার মনে হল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে উজানী বুড়ি কাঁদছে। বুড়ো মানুষ কি স্বপ্ন দেখে কাঁদে? হয়তো বা। কিন্তু না, কোনো ভাবনাই মনের সেই আসল চিন্তাটা সরিয়ে দিতে পারল না। দাবিয়ে রাখতে পারল না। বার বার ঘুরে ঘুরে সেই ভাবনাটা মাথায় পাক খেতে লাগল। না, আজ আর হারানের ঘুম আসবে না।

একবার উঠে কলসি থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ছিটিয়ে এল হারান। কিন্তু যে চোখ জেদ ধরেছে ঘুমোবে না, জোড়া লাগবে না, হাজার জল ছিটিয়েও কি তা জোড়া লাগানো যায়।

অগত্যা আবার মাচানে ফিরে এল হারান। টান টান শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পর ছটফটানি শুরু হল। মাচানের ওপর এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে।

সেই দুঃখের দিনগুলি হুবহু মনে করতে পারে হারান। কষ্টের দিন মানুষ কি ভোলে, না ভুলতে পারে? থেকে থেকে সে সব যে ছুঁচের মুখের মতো বিঁধতে থাকে।

সুখের দিনের কথা মানুষ হয়তো ভোলে। কিন্তু দুঃখের দিনের বড় জ্বালা, বড় পোড়ানি। অস্তিত্বের সঙ্গে ধারাল কাঁটা হয়ে তা মিশে থাকে। একটু নিরালায় বসে বসে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করলেই সেই কাঁটাটা খচখচ করে ওঠে।

বছর দুই আগে শীতের এক ভোরে গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটাটা কুয়াশা আর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

স্টিমার থেকে নেমে একদল মৃতমুখ নিঃস্ব মানুষ—মেয়ে-পুরুষ-জোয়ান-বুড়ো-বউ-বাচ্চা, সকলে মিলে একাকার হয়ে বসে ছিল। তারা জানে না, সাতপুরুষের ভিটেমাটি ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে কোথায় কত দূরে, কোন অন্ধ নিয়তির টানে তারা চলেছে।

শুধু এটুকু তারা জানে, যেমন বাতাস তেমনি আছে, যেমন নদী তেমনই বইছে, মাটির ওপর দাগ পড়ে নি, তবু নাকি দেশখানা দু'ভাগ হয়ে গেছে। আর জানে, সাতপুরুষের ভিটেমাটির ওপর তাদের আর দাবি নেই। দেশের সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা ভেসে পড়েছে।

আপাতত তারা গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটায় এসে পৌঁছেছে। এখান থেকে বর্ডার অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার ট্রেন ধরবে। বর্ডার পর্যন্তই তাদের জানা আছে। বর্ডারে পৌঁছে তারা কোথায় যাবে সে ঠিকানা সম্পূর্ণ অজানা।

জড়াজড়ি গাদাগাদি করে মানুষগুলো চুপচাপ বসে ছিল। তাদের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। চারপাশে প্রচুর জায়গা। তবু কেন যে মানুষগুলো গাদাগাদি করে ছিল, তারাই জানে।

হঠাৎ তাদের ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে তীব্র, অবুঝ হাসির শব্দ উঠেছিল। সেই মেয়েটাই বুঝি হাসছে। এই দুঃসময়ে সে ছাড়া কে-ই বা হাসতে পারে!

মানুষের পিণ্ডটার মধ্যে হারান আর উজানী বুড়িও ছিল। কনুই দিয়ে হারানকে আস্তে একটা ঠেলা মেরে উজানী বুড়ি ফিস ফিস করে বলেছিল, 'হেই মাগীটা বে হাবাইনা, হেই হাসনি চলানি—'

'হ—' অস্ফুট শব্দ করে হারান চুপ করে গিয়েছিল।

উজানী বুড়ির গজগজানি থামে নি, 'সারাটা ইস্টিমার মাগী জ্বালাইতে জ্বালাইতে আইছে।'

একই স্টিমারে মুন্সিগঞ্জ থেকে তারা গোয়ালন্দে এসেছিল। অন্য মানুষ যখন দেশ হারানোর শোকে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে, ওই মেয়েটা তখন সারা শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে হেসে গিয়েছে সমানে। গোয়ালন্দে নেমেও সে হাসি থামে নি।

উজানী বুড়ি বলেছিল, 'শরম নাই, ভরম নাই। ডাকাবুকা মাগী হগল কিছুর মাথা খাইয়া হাসে। আমরা মরি আমাগো জ্বালায়। দ্যাশ গেল, ভিটা গেল। কুনখানে যাইতে আছি, জানি না। ডরে বুকখান কলার পাতের লাখান থরথরাইয়া কাপে। আর মাগী কিনা হাসে! হা ভগমান, কত নীলাই না দেখাইলা!'

আশে পাশে অগুনতি মানুষের ভিড়। ঠিক কোত্থেকে যে মেয়েটা হাসছে, দেখা যাচ্ছিল না।

মাথা তুলে বার দুই দেখার চেষ্টা করেছে হারান, কিন্তু অন্ধকার আর কুয়াশা ফুঁড়ে নজর চলে নি।

একসময় মেয়েটার অবুঝ, অস্বাভাবিক হাসি থেমে যায়।

অনেক দূরে স্টিমারঘাটায় আলো জ্বলছিল। সেই আলো এতদূরে এসে পৌঁছয় নি।

পরিচিত পৃথিবীর ওপর সমস্ত দাবি এবং দখল ছেড়ে মানুষগুলো পালিয়ে যাচ্ছে। আলোর সীমানার বাইরে এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে তারা নিঃশব্দে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না বর্ডারের ট্রেন আসবে এই মানুষগুলো ডেলা পাকিয়ে বসে থাকবে।

মানুষগুলোর আলাদা আলাদা নাম ছিল, আলাদা আলাদা চেহারা ছিল, অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু দেশভাগ তাদের সবাইকে একটি মাত্র নাম, একটি মাত্র অস্তিত্ব দিয়ে একাকার করে ফেলেছে। তারা শরণার্থী।

একসময় কুয়াশা কেটে গেলে অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে পুবের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছিল। স্টিমারঘাটায় তখনও আলো জ্বলছে। গাধাবোটের জেটিটা অল্প অল্প দুলছে। আলো পড়ে নদীর জল কালো কাচের মতো ঝকমক করছে।

ঘাড় গুঁজে সবার সঙ্গে একাকার হয়ে বসে ছিল হারান। আগের দু'টো রাত একটুও ঘুমাতে পারে নি। চোখ ঢুলে আসছিল। ঘাড়টা আপনা থেকেই হাঁটুর ওপর ভেঙে পড়ছিল। পৃথিবীর সব ঘুম হারানের চোখে যেন ভর করেছে তখন।

হঠাৎ গম্ভীর কর্কশ শব্দ উঠল। স্টিমারের ভোঁ। দৈত্যের মতো বিশাল চাকার ঘা খেয়ে স্টিমারঘাটার জল গেঁজে উঠতে লাগল। স্টিমার নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছিল। আবার বুঝি নারায়ণগঞ্জেই ফিরে যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ, দিবারাত্রি স্টিমারটার যাতায়াতের কামাই নেই। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ভাগ্যকুল, নানা ঘাট থেকে পেট বোঝাই করে করে মানুষ এনে গোয়ালন্দে ঢালছে। এটাতে চেপেই হারানরা এসেছিল দিন দুই আগে।

স্টিমারের আওয়াজে মাথা তুলেছে হারান। তুলেই চমকে উঠেছে। আবছা আলোতে চোখে পড়েছিল, বাঁ পাশে রেলের লাইন।

তখনও কলকাতার ট্রেন আসে নি। গাড়ি আসতে আসতে দুপুর হয়ে যাবে।

রেল লাইনের ওপর অনেক মানুষ বসে আছে। তাদের মধ্য থেকে সেই যুবতী মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তীব্র, অস্বাভাবিক শব্দ করে হেসে হেসে ঢলে পড়েছিল।

নদীর দিক থেকে জলো বাতাস হু হু করে ছুটে আসছিল। মানুষগুলো হি হি কাঁপছিল।

কনুই দিয়ে হারানের পাঁজরে আস্তে ঠেলা মেরেছিল উজানী বুড়ি। বলেছিল, 'উই যে রে হারাইনা, মাগীটা আবার হাসে।'

হারান কিছু বলে নি।

উজানী বুড়ি সমানে বকে গিয়েছিল, 'মাগী এত ঢলায় ক্যামনে? দ্যাশ গেল, ভিটা গেল, মাটি গেল, হগল খাইয়া আইসাও মাগীর বুক কাপে না!'

হারান হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'চুপ মার ঠাউরমা—'

হারানের মুখের দিকে চেয়ে কী বুঝেছে, উজানী বুড়িই জানে। থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল।

মেয়েটা তখনও হাসছে। কলকলিয়ে, মেতে মেতে, শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে অবিরাম হেসে চলেছে। হারানের মনে হয়েছে, হাসা বুঝি মেয়েটার ব্যারাম।

ঠাসবোনা অন্ধকার আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল। কুয়াশার পর্দাটা আর নেই। তখন পুবের আকাশে দিনের প্রথম সূর্য সবে মাথা তুলেছে। স্নিগ্ধ নরম আলো ফুটেছে। সে আলোতে তাপ নেই, জ্বালা নেই। বড় কোমল, বড় মধুর এই আলো।

নারায়ণগঞ্জের স্টিমারটা কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছে।

এখন জোয়ারের মাতামাতি নেই, ভাটার টান নেই। জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝামাঝি নদী এখন স্থির, নিরুত্তেজ। ছোট ছোট পলকা ঢেউগুলো দূর থেকে তরল কাচের মতো দেখাচ্ছিল। ছোট ঢেউয়ের ছোট খেয়ালে জেলেডিঙিগুলো টলমল করছিল।

হারান নদী দেখছিল না। সকালের প্রথম নরম আলো কি জেলেডিঙিগুলিও না। একদৃষ্টে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

একটা মধ্যবয়সী লোক, মাথায় যার কাঁচাপাকা চুল, চোখা চোখা নোংরা গোঁফদাড়ি, গোরুর মতো অবোধ চাউনি—মেয়েটার হাত ধরে বলছে, 'অমুন করে না, অমুন হাসে না। থির হ কাপাসী, থির হ।'

মেয়েটার নাম জানা গিয়েছিল। মধ্যবয়সী লোকটার কথায় কাপাসী স্থির হয় নি। কলকলিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নিজের ইচ্ছায় কি হাসি বাবা! বুকের ভিতর থিকা হাসি উথলাইয়া উথলাইয়া ওঠে। পারি না বাবা, হেই হাসনেরে ঠেকাইয়া রাখতে পারি না।'

কাপাসীর হাত ছেড়ে লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদেছে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছে, 'ভগমান, আমার আর বাচনের সাধ নাই। আমারে শ্যাষ কর। এই দুঃখু আর সইতে পারি না।' তার চোখ ফেটে টস টস করে নোনা জল ঝরে যাচ্ছিল।

কখনও কলকলিয়ে হেসে, কখনও চুপচাপ উদাস চোখে আকাশ কি নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছে কাপাসী।

দুপুরের তীব্র, উত্তেজক রোদে গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটা, নদীর ঢেউ আর আকাশ যখন জ্বলছে, ঠিক সেই সময় বর্ডারের গাড়ি এল।

মানুষগুলো ঝিম মেরে বসে ছিল। মাঝে মাঝে অনুচ্চ, অস্ফুট শব্দ করে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছিল। ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারিয়ে এসেছে। সেই শোকে দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা শেষবারের মত কাঁদছে। বর্ডারের ওপারে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, জানে না। সেই ভয়ে কাঁদছে। মিশ্র কান্নার শব্দে গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটা এখন সুবিশাল এক শোকসভা।

আকাশটা গলা কাঁসার মতো ঝকঝক করছিল। তার নিচে অমোঘ নিয়তির মতো বর্ডারের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পুঁথিপুস্তকে কয়েকটা অক্ষর বসল। আর সেই অক্ষরগুলির কারসাজিতে নিজের দেশ আর নিজের রইল না। সাতপুরুষের ভিটেমাটির ওপর নিজের দাবি কি দখল থাকল না। এখন পৃথিবীর কোথাও এই মানুষগুলির নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উন্মূল হয়ে তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চলে যেতে হচ্ছে।

এই মানুষগুলো জানল না, বুঝল না, কেন তাদের দেশ হারাতে হচ্ছে। কী এক অসহ্য তাড়নায় চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে, ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ট্রেনের কামরাগুলিতে ঢুকে পড়েছিল।

হাজার চেষ্টা করেও হারান নজব রাখতে পারে নি। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে কাপাসী আব সেই মধ্যবয়সী লোকটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

দুপুরে ট্রেন এসেছিল। ছাড়ল সন্ধের পর। মানুষ না, যেন দেশভাগের মর্মান্তিক শোকটাকে বয়ে বর্ডারের ট্রেন অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটে যাচ্ছিল।

মানুষগুলো আর কিছু জানুক আর নাই জানুক, সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝেছে, এই যাত্রা অনন্ত অফুরন্ত অশেষ দুঃখের যাত্রা।

দেশের মাটির বাইরে কোনোদিন তারা পা বাড়ায় নি। সেই তাদের প্রথম বাইরে বেরুনো। তারা বুঝতে পারছিল, এই পদ্মা-মেঘনার দেশে আর কোনোদিনই তারা ফিরবে না। বর্ডারের ট্রেন দেশেব বাইরেই রেখে আসে, ফিরিয়ে আনে না।

বাইরে কালো নিরেট অন্ধকার। সেদিন কী তিথি, কে জানে। খুব সম্ভব অমাবস্যা। অমাবস্যার অন্ধকার একটা অসহ্য শোককে, একটা নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে ঢেকে পৃথিবীর সব কিছু থেকে আড়াল করে মানুষগুলোকে বর্ডারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

মানুষগুলো তার মধ্যেই জেনে ফেলেছে, তাদের আর আলাদা আলাদা জাত নেই, আলাদা আলাদা নাম নেই। বুঝিবা আলাদা চোহারাও নয়। একই দুর্ভাগ্য তাদের সবাইকে একটা মাত্র নাম দিয়েছে। সেটা হল 'রিফ্যুজি'। বর্ডারগামী ট্রেনের সমস্ত মানুষই তখন এক। তাদের শোক দুঃখ যন্ত্রণা, সমস্ত কিছুই অভিন্ন।

বাঙ্কে, বেঞ্চের ওপরে এবং নিচে অজস্র মানুষ। পা ছড়িয়ে যে বসবে তার উপায় নেই। হাঁটু আর মাথা এক করে কুন্ডলী পাকিয়ে ছিল সবাই।

মানুষগুলো চুপচাপ নিঃশব্দে বসে থাকে। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রিটাকে চমকে দিয়ে ভোঁতা খ্যাসখেসে গলায় বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। আশ্চর্য, একই দুর্ভাগ্যের শরিক হয়ে তাদের কান্নার শব্দও হুবহু একই রকম হয়ে গিয়েছে।

এক কোণে বসে বসে হারান ঢুলছিল। হাঁটুর চোখা হাড়ে কপালটা বার বার ঠুকে যাচ্ছিল। তার গা ঘেঁষে বসে ছিল উজানী বুড়ি।

কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে মানুষগুলো এক একবার থামে। কিছুক্ষণ পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু করে।

হারান ভাবতে চেষ্টা করল, কখন থেকে এই মানুষগুলো কাঁদছে? উজানী বুড়ি আর সে মুন্সিগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দের স্টিমারে উঠেছিল। সেখান থেকেই মানুষগুলোকে কাঁদতে দেখেছে। তাদের কাঁদতে দেখে নিজেরাও কেঁদেছে। তারপর স্টিমারটা তারপাশা, ভাগ্যকুল, রাজাবাড়ি—নানা ঘাটে ভিড়ে আরো অনেক মানুষ তুলে গোয়ালন্দ রওনা হয়েছিল। যত বারই লোক উঠেছিল ততবারই স্টিমারে নতুন করে কান্নার শোর পড়ে গিয়েছিল।

উজানী বুড়ি হঠাৎ ডেকে উঠেছে, 'হারান—'

'কী ক'স?' হাঁটুর ওপর থেকে মাথা না তুলেই হারান সাড়া দিয়েছে।

'কী আর কমু ভাই, হেই পুরান কথা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উজানী বুড়ি বলেছিল, 'এই যে অচিনা দ্যাশে যাইতে আছি, আমাগো কী হইব রে দাদা?'

'হগলের যা হইব, আমাগোও হেয়াই হইব।'

'ঠিকই। কিন্তুক—'

'কিন্তুক আবার কী?' মাথা তুলেছিল হারান। চোখদু'টো টকটকে লাল, যেন দু'পিন্ড রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সে বলেছে, 'কিন্তুকের আবার কী হইল?'

'বাপ হউরের (শ্বশুরের) ভিটায় আবার ফিরা আইতে পারুম তো?'

হারান জবাব দেয় নি। জানালার বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

উজানী বুড়ি খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'ড্যাকরা, কথা ক'স না ক্যান? এই যাওনই কি আমাগো শ্যাষ যাওন?'

'কী জানি—?'

'আর কি আমরা ফিরুম না?' হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করেছিল উজানী বুড়ি। কেঁদেছে আর বলেছে, 'ড্যাকরারা, যমের অরুচিরা, যারা আমাগো ভিটামাটি থিকা খেদালি, পাতা সোংসার ভাইঙ্গা দিলি, তরা কুনোদিন সুখ পাবি না। তোগো ভরা ভোগে ছাই পড়ব? তোগো সোমসার ছারেখারে যাইব। আমাগো লাখান তরাও বুক থাপড়াবি, কানবি: তরা মর, গুষ্টিসুদ্ধা নিঃবংশ হ।'

উজানী বুড়ি জানে না, কে তাদের সাজানো সংসার ভেঙে দিল, কে তাদের সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করল, কে তাদের বড় সুখের বড় সাধের জীবনটাকে এমন তছনছ করে দিল। না জেনেও সে শাপশাপান্ত করে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদে।

মানুষগুলো কেঁদে কেঁদে একসময় ঝিমিয়ে পড়েছে। গাড়ির দোলানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চোখে তাদের ঢুলুনি এসেছিল। উজানী বুড়ির কান্নার শব্দ শুনে সবাই চোখ মেলে তাকিয়েছে এবং আরো বিমর্ষ হয়ে পড়েছে।

মধ্যরাতে বর্ডারগামী ট্রেনটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খুব সম্ভব লাইন ক্লিয়ার নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে গাড়িটা। ইঞ্জিনের ক্লান্ত হৃৎপিন্ডটা ধক ধক আওয়াজ করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাইরের গাঢ় অন্ধকার আর সীমাহীন মাঠকে ভয়ানক চমকে দিয়ে শব্দ উঠল। সেই হাসির শব্দ। শব্দটা পাশের কামরা থেকে আসছে।

হারানের কাঁধে মাথা রেখে উজানী বুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হাসির আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসল। বলেছিল, 'সেই হাসনি ঢলানি মাগীটা, বুঝলি হারাইনা? মাগীর হাসন ঘোচে না। কুন চুলায় যাইতে আছি, জানি না। বাচুম না মরুম, তার দিশা নাই। মাগী তভু হাসে।'

অনেকেই সায় দিয়েছে, 'হ হ, অ্যামন বেতরিবত মাইয়ামানুষ বাপের বয়েসে দেখি নাই।'

'ডাকাবুকা মাগী।'

'ডাকাবুকা না ডাকাবুকা! মাগী যত অমঙ্গলের হাসন হাসে!' উজানী বুড়ি গজ গজ করে যাচ্ছিল।

হারান বলেছে, 'থাম দেখি ঠাউরমা। হাসে হাসুক, কান্দে কান্দুক, পরাণে যা চায় করুক। তর আমার কী?'

উজানী বুড়ি ঘোলা ঘোলা চোখে একবার হারানের মুখের দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে বলেছিল, 'হাসনি মাগীর লেইগা বড় যে টান!'

'হ, টান। তুই এইবার থাম বুড়ি।' হারান ধমকে উঠেছিল।

ভোরের দিকে বর্ডারের ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে।

বানপুর, দর্শনা—নানা স্টেশনে ঠেক খেতে খেতে বর্ডার পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা রাণাঘাট এল।

হারানের মাথার মধ্যে সেই তীব্র অবুঝ অস্বাভাবিক হাসিটা বিঁধেই ছিল। কিন্তু রাণাঘাটে এসে হাসনি মেয়েটাকে কোথাও খুঁজে পেল না সে।

অসংখ্য, অজস্র মানুষ।

কামরা, পা-দানি—শুধু কি তাই, ট্রেনের মাথায় উঠে ঝুলতে ঝুলতে এসেছে মানুষগুলো। প্রাণ বাঁচাবার একটা অন্ধ তাগিদ ঝাপটা মারতে মারতে সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাদের উৎখাত করে এনেছে।

বউ-বাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, যতদূর তাকানো যায়, অগণিত জীবাণুর মতো মানুষ কিলবিল করছে। এর মধ্যে কাপাসীকে কোথায় খুঁজে পাবে হারান!

বর্ডারে স্লিপ নেওয়ার পর হারানরা শুনল, রাণাঘাটের রিফুজি ক্যাম্পে জায়গা নেই। পরেব ট্রেনেই তাদের কলকাতা যেতে হবে।

কলকাতার ট্রেন যখন শিয়ালদা এসে পৌঁছল তখন সন্ধে।

দিনটা মরে মরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। স্টেশনে হাজারটা আলো জ্বলে উঠেছে।

গাড়ির ঘসঘস, ইঞ্জিনের কান-ফাটা আকস্মিক হুইসিল, গিজগিজে ভিড়, ট্রেনেব শব্দ, মানুষের হাঁকাহাকি, চিল্লাচিল্লি, ছোটাছুটি, সারি সারি চোখ ধাঁধানো আলো—চারদিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল হারান। কোনোদিন এত আলো, এত শব্দ, এত মানুষ দেখে নি সে। কখন যে ভিড়েব মধ্যে ভাসতে ভাসতে উজানী বুড়ির একটা হাত ধরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসেছিল, খেযাল নেই।

ভয়ে ভয়ে উজানী বুড়ি ডেকেছে, 'হারাইনা রে—'

'কী ঠাউরমা?'

'এই আমরা আইলাম কুন খানে?'

হারানও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় সে বলেছিল, 'এই বুঝিন কইলকাতা ঠাউরমা।'

'এইখানে আমরা থাকুম কুনখানে?'

'হগলে যেইখানে থাকব।'

হারানের কথা শেষ হওয়ার আগেই কে যেন পেছন থেকে ডেকেছে, 'এই যে বাবা, এইদিকে...একখান কথা শুনবা?'

উজানী বুড়ি আর হারান ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছে, তাদের ঠিক মুখোমুখি সেই মধ্যবয়সী লোকটা কাপাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

হারান বলেছে, 'আমারে কিছু কইলেন?'

'হ, বাবা।'

'কী?'

লোকটা বলেছে, 'তোমাগো লাখান আমরাও রিফুজি।'

লোকটা কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থেকেছে হারান।

লোকটা ফের বলেছে, 'ভালই হইল। বিদ্যাশ জাগা। চিনা পরিচয় কইরা রাখন ভাল। কহন কুন বিপদ আহে, কে কইব! আমাগো তো অহন কথায় কথায় বিপদ, উঠতে বইতে বিপদ। কপাল ভাঙল, দ্যাশ ছাইড়া আইলাম। কুনো দিন যে আবার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগব, এমুন ভরসা নাই।'

একটানা বকে যায় লোকটা। খানিকক্ষণ হাঁপায়। টেনে টেনে দম নেয়। আবার শুরু করে, 'আমার নাম নিত্য ঢালী, এই হইল আমার মাইয়া কাপাসী। তোমার নামখান কি বাবা?'

'হারান।'

উজানী বুড়িকে দেখিয়ে নিত্য ঢালী বলল, 'এনি তোমার কে?'

'ঠাউরমা।'

'ভালই হইল। মাথায় উপুর একজন বুড়া মানুষ থাকলে বুকে বল পাওন যায়।'

উজানী বুড়ি কিছুই বলছিল না, কিছুই শুনছিল না, একদৃষ্টে শুধু কাপাসীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিত্য ঢালী বলল, 'অহন করন কি? যামু কুন খানে?' একটু থেমে কি যেন সে ভেবেছে। ফের বলেছে, 'ভাবনা তো লগে লগে আছেই। অহন লও যাই উই কোনায় গিয়া এট্টু থির হইয়া বহি। দুই দিন প্যাটে কিছু পড়ে নাই, এট্টু পা পাইতা বইতে পারি নাই।'

চারজনে প্ল্যাটফর্মের এক কোণে চলে গিয়েছিল।

সম্বলের মধ্যে খান দুই ছেঁড়া কাঁথা, একখানা চট, দু'খানা কাপড় আর খুচরো এবং নোটে মিলিয়ে সাতাশ টাকা কয়েক গন্ডা পয়সা। দেশ থেকে নিত্য ঢালী এইটুকু বিত্তই আনতে পেরেছে।

নিত্য ঢালী কাঁথা পেতে দিল। পুরো দু'দিন পর চারজনে পা ছড়িয়ে তার ওপর বসতে পেরেছে।

নিত্য ঢালী বলেছে, 'অহন কিছু খাইতে না পাবলে বাচুম না।'

'ঠিক কথা।' বাকি তিনজনে সায় দিয়েছে।

'লও যাই, কিছু চিড়ামুড়ি কিনা আনি।' হারানকে সঙ্গে নিয়ে নিত্য ঢালী উঠে পড়েছিল।

কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। শ্বাস যখন আছে বাঁচার আশাও আছে। অন্তত বাঁচার জন্য যোঝাযুঝিটা তো আছে।

সেই যে হারানরা শিয়ালদা স্টেশনে এসেছিল, তারপর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল। তবু প্ল্যাটফর্মের সেই কোণটি ছেড়ে তাদের কোথাও যাওয়া হল না। প্রথম প্রথম শুনেছিল, তাদের রিফুজি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু দিন যায়, মাস ফুরোয়, বছর ঘুরে আসে। প্রায় রোজই 'রিফুজি' অফিসে খোঁজ নেয় হারান। রোজই এক জবাব মেলে। ক্যাম্পে জায়গা নেই। ক্যাম্পে তাদের পাঠানো হবে না। একেবারে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। হারানরা মাটি পাবে, ঘর পাবে। পদ্মা-মেঘনার দেশে যা যা হারিয়ে এসেছে, সবই ফিরে পাবে।

রোজই আশায় আশায় 'রিফুজি' অফিসে যায় হারান। বেজার মুখে ফিরে আসে। কবে যে পুনর্বসতি হবে, আদৌ হবে কিনা, কে বলবে।

প্ল্যাটফর্মের ওপর হাত চার পাঁচেক জায়গা দখল করে এক একজন ইট দিয়ে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে। ওই নিরাবরণ নগ্ন জায়গাটুকুর মধ্যে বউ-ঝি মেয়ে-পুরুষ গাদাগাদি করে পড়ে থাকে। গোপনতা নেই, আব্রু নেই। ওখানেই যুবতী নারী গর্ভিণী হচ্ছে, মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে। ওখানেই ঘর-সংসার, জীবনমৃত্যু, সব কিছু।

হাজার হাজার যাত্রী দিনরাত পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে, তাদের সহানুভূতির ওপর করুণভাবে নিজেদের উলঙ্গ জীবনের সমস্ত লজ্জা সম্ভ্রম আর অসহায়তাকে সঁপে দিয়ে একদল ক্ষুধার্ত বাস্তুহীন জীব পড়ে থাকত।

হারানও হাত পাঁচেক জায়গা দখল করে ছিল। তার পাশের জায়গাটা নিত্য ঢালীর।

এই এক বছরে সুখে-দুঃখে আশায়-নিরাশায় পাশাপাশি থেকে হারানদের সঙ্গে নিত্য ঢালীদের যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল তা বড় ঘনিষ্ঠ।

বাঁচার কথা, ভবিষ্যতের কথা, কি জীবনের হাজারটা সমস্যার কথা ভেবে যখন আর থই পায় না, তখন একজন আর একজনের কাছে এসে বসে, পরামর্শ করে। একজন যখন হতাশ হয়ে পড়ে, আরেকজন ভরসা দেয়।

স্টিমারে, গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটায় এবং মাঝরাত্রে বর্ডারের ট্রেনে যে তীব্র অবুঝ এবং অস্বাভাবিক হাসি হারান শুনেছিল, শিয়ালদা স্টেশনেও প্রায়ই তা শোনা যায়।

এমনিতে নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই কথা বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে স্টেশনটাকে চমকে দিয়ে কলকলিয়ে হেসে ওঠে। হাসির দাপটে গলার শিরাগুলি দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠে। চোখদু'টো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ে।

আর সব কিছুই সইতে পারে উজানী বুড়ি। কিন্তু এত বড় বিয়ের যোগ্য মেয়ের এমন হাসাহাসি মাতামাতি তার চোখের বিষ।

উজানী বুড়ি বলত, 'মাইয়ার হাসন সামলা নিত্য।'

নির্জীব গলায় নিত্য ঢালী বলত, 'কী করুম মাসি? আমি কী করতে পারি? তোমারে তো হগলই কইছি। যত দিন কাপাসী বাইচা আছে, অর হাসনও আছে। তুমি আমি, পিরথিমীর কেও অর হাসন থামাইতে পারব না।' নিত্যর বুকটা উথলপাথল করে দীর্ঘশ্বাস পড়ত।

উজানী বুড়ি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ত। গাঢ় গলায় বলত, 'হগলই বুঝি নিত্য। আমরা না হয় বুঝলাম, কিন্তুক মাইনষে তো হেয়া মানব না। মানুষের মন বড় কু।'

অসহায় মুখে নিত্য বলেছে, 'তুমিই কইয়া দাও, কী করুম।'

উজানী বুড়িদের সব কথাই জানিয়েছে নিত্য ঢালী। সেই হীরাকুপি গ্রামখানার কথা, দামিনী বউর কথা, নিশিরাতে যারা এসে বাপ-মায়ের বুক থেকে কাপাসীকে ছিনিয়ে নিযে গিয়েছিল, তাদের কথা, কিছুই বাদ দেয় নি।

নিত্য ঢালী আবার জিজ্ঞেস করেছে, 'কী করুম মাসি?'

জবাব দেওয়ার মতো একটা কথাও খুঁজে পায় নি উজানী বুড়ি।

মাঝে মাঝে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে কাপাসী। ঝিম দুপুরে অনেক উঁচুতে চিল ওড়ে। কিংবা সন্ধে হলে ধোঁয়াধুলোর শহরের মাথায় প্রথম তারাগুলি ফুটতে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবত মেয়েটা।

ঠিক সেই সময় হয়তো শিয়ালদা বাজারে ঘেয়ো আনাজ কি পচা মাছ কুড়োতে গেছে উজানী বুড়ি। কিংবা জলের কলের দখল নিয়ে চুলোচুলি বাধিয়েছে।

সুযোগ বুঝে কাপাসীর কাছে এসে বসত হারান। ফিস ফিস করে ডাকত, 'কাপাসী—'

আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে হারানের মুখের ওপর ফেলত কাপাসী। কিছ বলত না। তার চোখে অদ্ভুত একটা ঘোর লেগে থাকত।

হারান আবার ডাকত, 'কাপাসী—'

'কও—' খুব আস্তে সাড়া দিত কাপাসী।

'কী ভাবতে আছ?'

'একখান কথা কি আর ভাবি! বুঝলা পুরুষ, চিন্তার আমার পারকূল নাই।'

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ হারান বলত, 'এট্টা কথা জিগামু কাপাসী?'

'একখান ক্যান, দশখান জিগাও—'

এক একদিন কাপাসীর মনটা খুবই ভাল থাকত, সহজভাবে কথা বলত। সব কথার ঠিক ঠিক জবাব দিত।

হারান বলত, 'অমুন হাসো ক্যান কাপাসী?'

'বড় সুখে হাসি পুরুষ। ক্যান যে হাসি, কেউ বুঝব না। পিরথিমীর কেউ না।' দু'হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠত কাপাসী।

হারান অবাক হয়ে যেত। তবে কি তারা যা বুঝেছে সেটুকুই সত্যি নয়? কাপাসীর হাসির অনেক স্তর নিচে বুঝিবা অফুরন্ত দুঃখ জমা হয়ে আছে।

একটু একটু করে একদিন কাপাসীর সেই দুঃখটাকে ছুঁয়ে ফেলল হারান। সেই দুঃখ—উন্মাদ হাসির নিচে যা গোপন হয়ে আছে।

প্রায়ই হারান বলত, 'অমুন হাইসো না কাপাসী।'

'ক্যান?'

'মাইনষে মোন্দ কয়।'

কী একটু যেন ভেবে নিত কাপাসী। তারপর হঠাৎ বলত, 'মাইনষে মোন্দ কয়, হেয়াতে তোমার কী?'

'আমার যে কী, বোঝ না কাপাসী?' হারানের গলা করুণ শোনাত।

'না-না-না। একনাগাড়ে বলে যে, কাপাসী, 'কও পুরুষ, আমারে মোন্দ কইলে তোমার কী হয়?' অদ্ভুত জেদই ধরত সে।

বিব্রত মুখে কাপাসীর দিকে তাকিয়ে থাকত হারান। তারপর চোখ বুজে বলে ফেলত, 'তোমারে মোন্দ কইলে আমার যে মোন্দ লাগে।'

'মিছা কথা!' কাপাসী হঠাৎ যেন খেপে উঠত।

'মিছা না কাপাসী।' কথাটা বলতে হারানের গলা কাঁপত।

'সত্য কও পুরুষ?' কী ভেবে হারানের পাশে আরো একটু ঘন হয়ে আসত কাপাসী।

নরম গলায় হারান আবার বলত, 'সত্য কই।'

কাপাসী এরপর আর কিছু বলত না। কোনো দিন হারানের একটা হাত আঁকড়ে অঝোরে কেঁদে যেত; তবে বেশির ভাগ দিনই যখন তখন কলকলিয়ে হেসে উঠত।

ফাঁক বুঝে উজানী বুড়িকে লুকিয়ে চুবিয়ে কাপাসীর কাছে আসত হারান। কিন্তু হাজার লুকোলেও এক একদিন ধরা পড়ে যেত। বুড়ি বলত, 'তরে না কইছি, কাপাসীর কাছে যাবি না।'

'গেলে কী হয়?'

'লক্ষ্মী দাদা আমার, অবুঝ হইস না। শোন, উই কাপাসীর শরীলখান লষ্ট, মাথাখান খারাপ। তার উপুর বস্যের মাইয়া (যুবতী)। অর কাছে বেশি যাইতে নাই।'

অনেক বয়স হয়েছে উজানী বুড়ির। জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। আগে থেকেই অনেক কিছুর গন্ধ পায় সে।

কথায় বলে যুবতী মেয়ে হল আগুন আর পুরুষ হল ঘি। আগুনের কাছ থেকে ঘি'কে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল।

তা ছাড়া, কাপাসী যদি সুস্থ হত, স্বাভাবিক হত, তার শরীর যদি পবিত্র থাকত, তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু এই কাপাসী, যার শরীর নষ্ট, মাথা খারাপ, সে সমাজ সংসারের কোনো কাজেই আসবে না। তাই আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল। কাপাসী আর হাবানের মধ্যে যাতে মাখামাখি না হয়, সে জন্য সব সময় নজর রাখত উজানী বুড়ি। হারানকে আগলে আগলে রাখতে চাইত। কাপাসী সম্পর্কে তার সহানুভূতি আছে, মমতা আছে, কিন্তু সব জেনেশুনে তাকে নাতির বউ করে আনা যায় না।

উজানী বুড়ির এত পাহারাদারি সত্ত্বেও হারানকে এবং তার বয়সের ধর্মকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

এইভাবে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পুরো একটা বছর কেটে গেল।

আগে আগে লঙ্গরখানা থেকে খিচুড়ি দিত। একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে সরকারি খয়রাত, অর্থাৎ মাথা পিছু ক্যাশ ডোল দেওয়া শুরু হল।

নিত্য ঢালী বলত, 'এই কয়খান ট্যাকায় প্যাটের ভাত, পাছার কাপড় যোগান যাইব না। কী করন যায়!'

হারানও সায় দিত, 'ঠিক কথা তালুই। চাউলের দর তিরিশ ট্যাকা, একখান মোটা কাপড় ছয় সাত ট্যাকা। বাচুম ক্যামনে আমরা?'

'হেই তো—' নিত্য ঢালীর মুখেচোখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটত।

উজানী বুড়ি, নিত্য ঢালী, হারান আর কাপাসী, চারজন প্রায় মুখোমুখি বসে ছিল একদিন। হারান আর নিত্য ঢালী কথা বলছিল। উজানী বুড়ি ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করছিল। কাপাসী দুই হাঁটুর মধ্যে থুতনি ঢুকিয়ে প্ল্যাটফর্মে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছিল।

হঠাৎ ঘুরে বসেছে কাপাসী। বলেছে, 'উই ডোলের ট্যাকা তো আছেই, আরো কিছু কামাই কর। তাইলেই সোংসার চলব।'

হারান বলেছে, 'কামাই করনের পথ নাই। কুলির কাম করতে গেছিলাম। পশ্চিমা কুলিরা মাইর দিয়া হটাইয়া দিল। এই দ্যাশের কিছুই জানি না। কেউ আমাগো চিনে না। কে কাম দিব!'

'বাচনের চ্যাষ্টা করতে হইব না? কাম দিব না, এই কথা ভাবো ক্যান? মহাজনগো গদিতে বার বার যাও। দুয়ারে দুয়ারে ঘোর। চিনাশুনা হউক। জানাশুনা হইতে হইতেই কাম পাইবা।'

অবাক হয়ে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে হারান। এ যেন আর এক কাপাসী। যে কাপাসী অবুঝ অস্বাভাবিক হাসিতে মেতে থাকে, এ যেন সে নয়। এই কাপাসী দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, দুশ্চিন্তার দিনে পাশে এসে দাঁড়ায়। পরামর্শ দেয়। দুর্ভাগোর সঙ্গে যোঝার উপায় বলে দেয়।

কাপাসীর কথামতো ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত হারান আর নিত্য ঢালী কাজ জুটিয়ে ফেলেছিল। বিড়ি বাঁধার কাজ।

প্রথম দিন কাজ সেরে কাপাসীর কাছে এসে বসেছিল হারান। বলেছিল, 'তোমার লেইগাই কামটা পাইলাম।'

কাপাসী কিছু বলে নি।

হারান ফের বলেছে, 'কথা কও না ক্যান কাপাসী?'

এবারও কিছু বলে নি কাপাসী। উদাস বিষণ্ণ মুখটা তুলে ধরেছে। কী যেন ভাবছিল সে।

হারান আবার বলেছে, 'দিন-রাইত অত কী ভাব কাপাসী?'

'কী ভাবি শুনতে চাও?'

'হ।'

'ভাবি তমস্ত জনম কি এমুন কইরা কাটামু? কুত্তা বিড়ালের লাখান কত কাল কাটান যায়?'

এ প্রশ্নের জবাব হারানের জানা নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে সে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

কাপাসী বলেই যাচ্ছিল, 'আর কি আমরা মাটি পামু না? আর কি আমরা ঘর দুয়ার সোংসার পাততে পারুম না?'

'কী জানি!' অস্ফুট গলায় হারান জবাব দিয়েছে।

'কুনোখানে যদি থিতু হইয়া বইতে পারি, বড় ভাল হয়। তোমরা আমরা পাশাপাশি থাকুম। পাশাপাশি ক্যান, এক লগেই থাকুম।' হারানের একটা হাত ধরে কাপাসী নিজের খুশিতে বলে যেত, আর হারানের বুকের ভিতরটা বিচিত্র সুখে কাঁপতে থাকত।

এমন করেই দিন যায়, মাস যায়, ঋতুর চাকায় সময় পাক খায়।

কাপাসী কখনও আশার কথা শোনায়। কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হেসে নিরাশ করে। এই আশা, এই নিরাশা।

আশায় নিরাশায় দোল খেতে খেতে আরো একটা বছর পার হল।

দু'বছর পর খবর এল, কালাপানি অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে আন্দামান দ্বীপে গেলে পুনর্বাসন মিলবে। জমি-জিরেত, হাল-হালুটি, বাস্তু—বর্ডারের ওপারে তারা যা যা হারিয়ে এসেছে, সব ফিরে পাবে।

খবরটা নিয়ে এসেছিল নিত্য ঢালী।

সেদিন বিড়ি বাঁধার কাজে যায় নি সে। 'রিফুজি' অফিসে ক্যাশ ডোল আনতে গিয়ে এই খবরটা শুনেছে। আর শুনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসেছে।

নিত্য ঢালী বলেছিল, 'আন্ধারমান দ্বীপে গেলে হগল মিলব। বাস্তু, চাষের জমিন, বেবাক। অহন কী করন?'

উজানী বুড়ি শুধিয়েছিল, 'আন্ধারমান দ্বীপ কুন খানে?'

'হেই কালাপানি। সমুন্দুর পাড়ি দিয়া যাইতে হয়। জাহাজে ইস্টিমারে পাচ দিন লাগে।'

'ক'স কী নিত্যা?'

'ঠিকই কই। যা শুইনা আইলাম হেয়া মিথ্যা না।'

'জানি না, শুনি না, এমুন জাগায় যাওন কি ঠিক হইব নিত্যা?'

'হেই কথাখানই তো ভাবি।' নিত্য ঢালী বলেছিল, 'এক দিন দুই দিনের পথ না। জলের উপুর দিয়া পুরা পাচ দিনের পথ। হে কি এইহানে মাসি!'

দু'জনেই কথা বলছিল। কাপাসী স্টেশনের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। হারান তখনো কাজ থেকে ফেরে নি।

উজানী বুড়ি বলেছে, 'না বে নিত্যা, অতদূরে যাওনের কাম নাই। এই বেশ আছি।'

এই দু'বছর ইট দিয়ে ঘেরা চার পাঁচ হাত বে-আব্রু খোলা জায়গায় আর সামান্য কয়েক টাকা ক্যাশ ডোলের মাপে জীবনটাকে আশ্চর্য ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে উজানী বুড়িরা। প্রথম প্রথম ভারী অসুবিধা হত, পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই পাঁচ হাত জায়গার ওপর বড় মায়া তখন তাদের।

আশ্চর্য মানুষের জীবন! আশ্চর্য তার খাপ খাওয়াবার ক্ষমতা।

আগে আগে বাপ-শ্বশুরের বাস্তুর জন্য উজানী বুড়ি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত। দু'বছরের মধ্যেই শিয়ালদা স্টেশনের সেই পাঁচ হাত জায়গার জন্য তার বড় টান দেখা গিয়েছিল। এ জায়গা ছেড়ে আন্দামান দ্বীপের অনিশ্চিত জীবনে সে ঝাঁপ দিতে চায় নি।

অনেক রাতে সেদিন কাজ থেকে হারান ফিরে এসেছিল।

উজানী বুড়ি শিয়ালদা বাজারে প্যাকিং বাক্সের টুকরা টাকরা কাঠের খোঁজে বেরিয়েছিল। জ্বালানির কাজে লাগবে। নিত্য ঢালীও ছিল না, সে কোথায় যেন গিয়েছিল।

কাপাসী একা একা বসে ছিল প্ল্যাটফর্মে তাদের নির্দিষ্ট সীমানায়।

কোনোদিন নিজে থেকে যেচে কথা বলত না কাপাসী। সেদিন কিন্তু বলেছিল।

উজানী বুড়িকে না দেখে চলে যাচ্ছিল। কাপাসী ডেকেছে 'শোন—'

একটুক্ষণ অবাক দাঁড়িয়ে থেকেছে হারান। তারপর আস্তে আস্তে কাপাসীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কী কও?'

'বসো, কামের কথা আছে।'

হারান বসে পড়েছে।

কাপাসী বলেছিল, 'একখান নয়া খবর আছে।'

'কী খবর?' উৎসুক চোখে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়েছে হারান।

'বাপে খবর আনছে, পাচ দিন সমুন্দর পাড়ি দিয়া যাইতে পারলে আন্ধারমান দ্বীপ মিলে। হেইখানে গেলে ঘরদুয়ার, জমিন, হালহালুটি মিলব।'

খবরটা হারানও শুনেছে।

শিয়ালদা স্টেশনে তো তারা আর কাপাসীরা, এই দু'ঘর রিফিউজিই নেই। আরো অনেক বাস্তুহারা দুর্ভাগা মানুষ গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে পড়ে আছে। এর মধ্যেই আন্দামান দ্বীপের খবরটা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কাজ থেকে ফেরার পথে হারান সবই শুনে এসেছে। সে বলেছিল, 'আন্ধারমান দ্বীপের কথা আমি শুনছি।'

কাপাসী বলেছিল, 'বাপে আর তোমার ঠাউরমায় তো যাইতে চায় না।'

'ক্যান?'

'ডরে।' কাপাসী বলেছে, 'জলের উপুর দিয়া পাচ দিনের পথ। তার উপুর অচিন দ্যাশ। ডর তো লাগেই।'

হারান কিছু বলে নি, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েছে।

কাপাসী থামে নি, 'কিন্তুক ডর লাগলে তো চলব না। এমুন কইরা এই পাচ হাত জাগায় কত কাল থাকন যায়! দুই দিন, দশ দিন। বড় জোর দুই এক বচ্ছর। তমস্ত জনম কী চলে!'

প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছে হারান। কাপাসীর কাছ থেকে এ জাতীয় কথা সে আশা করে নি। পরক্ষণে সায় দিয়ে বলেছে, 'ঠিকই তো।'

'যদি বোঝ ঠিক, তা হইলে বাপেরে আর ঠাউরমায়েরে বুঝাও। এমুনভাবে বাচনের থিকা মরণ ভাল। ঘর গেছে, বাস্তু গেছে, আন্ধারমানে গেলে যদি বেবাক ফিরা পাই, যাইতে দোষ কী?'

'ঠিক—' হারান মাথা নেড়েছে, 'মইরাই তো আছি। আন্ধারমান দ্বীপে যদিন জমিজিরাত পাই, বাচনের চেষ্টা তো করতে পারি।'

'তা হইলে হেই ব্যবোস্থাই কর।' কী যেন একটু ভেবে কাপাসী বলেছিল, 'আমার বাপ আর তোমার ঠাউরমা কয়দিন বাচব? তাগো দিন তো ফুরাইয়া আইছে। কিন্তু তুমি আমি আরো অনেক বচ্ছর বাচুম। এই পাচ হাত জমিনে আমাগো তমস্ত জনম চলব না।'

'ঠিকই—'

কাপাসীর গলা এবার গাঢ় শুনিয়েছে, 'কম কইরা একখান ঘর চাই। চাইর পাশে চাইর খান বেড়া আর উপুরে চালের আবডাল থাকব। হেই ঘরে তুমি আমি সোংসার পাতুম। এত মাইনষের মইদ্যে এই আ-ঢাকা, বে-আবডাল জায়গায় কী সোংসার পাতা যায়! তুমিই কও পুরুষ?'

'ঠিকই—' অস্ফুট গলায় হারান বলেছে।

তাকে নিয়ে কাপাসী সংসার পাতবে। কথাটা শুনতে শুনতে বুকের ভিতর শিহরন খেলে গিয়েছিল হারানের।

কাপাসীকে যেন কথায় পেয়েছে সেদিন। সে থামে নি, 'সোংসারে কত কিছুই তো গুপন বাখতে হয়। কিন্তুক এইখানে কিছুই গুপন নাই। যা করবা, যা কইবা, হগলই মাইনষের চৌখে পড়ব, মাইনষেব কানে যাইব।'

কাপাসীর জেদের ফলেই হারানরা একদিন জাহাজে উঠল। পদ্মা মেঘনার দেশ কোথায় পড়ে রইল! মাটির আশায়, বাঁচার আশায়, হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে তারা আন্দামান দ্বীপে রওনা হল।....

বাইরে ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্না। চাঁদের আলোয় পাহাড়-জঙ্গল-টিলা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আবছা কুয়াশায় বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা কেমন যেন মায়াবী মনে হয়।

নাঃ, এখনও ঘুম আসছে না। ঘুম বুঝি আজ আর আসবে না। বুকের ভেতরটা খা খা করতে থাকে। কাপাসী আশা দিয়েছিল, তাকে নিয়ে সংসার পাতবে। সেই আশায় বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে হারান। কিন্তু সব বুঝি ভুলে গিয়েছে মেয়েটা। না হলে, তার সায় না থাকলে নিত্য ঢালী কি বিদেশি বিজাতিকে ঘরে এনে তুলতে পারত? কথাটা যতই ভাবল, মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠল। কপালে তামার তারের মতো সরু সরু অসংখ্য শিরা চিন চিন করছে। ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাস দিয়েছে। সেই বাতাসও হারানের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারল না।

শিয়রের জানালার বাইরে জোনাকিগুলো এখনো জ্বলছে, নিভছে। শূন্য চোখে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল হারান।

গলার কাছটা ভারী, ব্যথা ব্যথা। বুকের ভেতর থেকে একটা অসহ্য কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে গলার কাছে এসে আটকে ছিল। এতক্ষণে সেটা পথ পেয়েছে। মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে হতাশায় দুঃখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল হারান। কান্নার দমকে শরীরটা থরথর কাঁপতে লাগল।

তেতাল্লিশ

উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে কথা হয়েছিল, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পালসাহাব ফিরে এলে যা হোক একটা বিহিত করা হবে। কিন্তু হারানের তর সইল না। সকালে উঠেই মাথায় অসহ্য তাপ, বুকের ভেতর অফুরন্ত দুঃখ, উত্তেজনা আর ক্ষোভ নিয়ে নিত্য ঢালীর ঘরের দিকে ছুটল।

নিত্য ঢালীর ঘরে যেতে হলে উতরাই বেয়ে উঠতে হয়। উতরাইটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা আধপোড়া প্যাডক গাছ। ডালপালা আর ছাল পুড়ে গাছটা কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ওপরে উঠতে উঠতে আধপোড়া গাছটার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হারান। এখান থেকে নিত্য ঢালীর ঘর এবং উঠোন পরিষ্কার দেখা যায়।

সে যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। উঠোনে সেই পুরু-ঠোঁট, কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো-চুল লোকটা অর্থাৎ পানিকর ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হারানের ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে লোকটাকে থাপ্পড় মেরে আসে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর তা করা যায় না ।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হারান কী যেন ভাবল, তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

অনেক কথাই ভেবে এসেছিল হারান। ভেবেছিল, কাপাসীকে জিজ্ঞেস করবে, কেন সে বিদেশি বিজাতিকে ঘরে জায়গা দিল? জিজ্ঞেস করবে, শিয়ালদা স্টেশনে যে কথা কাপাসী বলেছিল, এই দ্বীপে এসে সে সব কি একেবারেই ভুলে গিয়েছে?

ভেবে এসেছিল অনেক কিছুই, কিন্তু বলা আব হল না। টলতে টলতে উতরাই বেয়ে নামতে লাগল সে।

হারান যখন ঘরে ফিরল, রোদ বেশ তেতে উঠেছে। জঙ্গলেব মাথা টপকে সূর্যটা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে।

উঠোনে পা দিয়েই হারান চমকে উঠল। একধাবে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে উজানী বুড়ি আর কুমী।

উজানী বুড়ি মেটে পাতিলে জাউ বসিয়েছে। উনুনের মুখে শুকনো পাতা গুঁজতে গুঁজতে গুজ গুজ করে সে কুমীর সঙ্গে কথা বলছে। কী বলছে, এত দূর থেকে হারান বুঝতে পারে না।

কুমীর চোখ দু'টো চরকির মতো ঘোরে। ইন্দ্রিয়গুলো তার খুবই প্রখব। বুড়ির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিভাবে যেন সে হারানের অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুবিয়ে তাকায়।

হারানকে দেখেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় কুমী। উজানী বুড়িকে বলে, 'অখন যাই গো মাসি। সুযুগ পাইলে আবার আসুম।' আজ মোহিনী সেজেছে কুমী।

হারান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়েই পথ। মোহিনী কুমী চিকন মাজা বাঁকাতে বাঁকাতে হারানের সামনে এসে একটু দাঁড়াল। সেই হাসিটা হাসল যাতে ধাব আছে, কিন্তু শব্দ নেই। তারপর সারা দেহে ঢেউ তুলে আবার চলতে শুরু করল।

কুমী যেই চোখের আড়াল হল, অমনি জাউ ফেলে ছুটে এল উজানী বুড়ি। হারানের হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

হারান অবাক। কাপাসীর ব্যাপার নিয়ে সেদিন ঝগড়া হয়েছিল। তারপর থেকে পারতপক্ষে উজানী বুড়ি তার সঙ্গে কথা বলে না। আজ তার কী হয়েছে কী জানে। হাত ধরে টানতে টানতে হারানকে জাউয়ের পাতিলটার কাছে এনে বসাল বুড়ি। হাউ হাউ করে খুব একচোট কাঁদল। শুকনো কোঁচকানো গাল বেয়ে টস টস করে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল ঝরতে লাগল তার।

হারানের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে উজানী বুড়ি বলতে লাগল, 'লক্ষ্মী, সুনা ভাই। আমার কাছে আয়, আমার বুকে আয়—'

বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কেটে গেলে হারান বলল, 'হইছে কী? অত সুহাগ ক্যান?'

'তরে সুহাগ করুম না তো করুম কারে?' দু'হাতে হারানের গলাটা জড়িয়ে ধরে উজানী বুড়ি বলে, 'আছে কে আমার? তুই ছাড়া পিরথিমীতে আমার কেও নাই রে হারাইনা। তুই ছাড়া আমার বেবাক আন্ধার। তুই আমার চৌখের মণি—' বলেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে।

'হগলই বুঝলাম। কিন্তুক—' বিরক্ত গলায় হারান বলে, 'অত সুহাগ এই কয়দিন আছিল কুন খানে? মতলবখান কী তর?'

'মতলব আবার কী রে হারাইনা? নিজের নাতিরে এট্টু সুহাগ আহ্লাদ করতে পারুম না?'

হারান জবাব দিল না।

উজানী বলতে থাকে, 'আপনজন কইতে তুই। বান্ধব কইতে তুই। তুই যদি অমুন বিবাগী হইয়া ঘুইরা বেড়াস, আমার ভাল লাগে? তুইই ক'?'

দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরেছে উজানী বুড়ি। আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে হারান উঠে পড়ল।

মনে সুখ নেই। সুখ না থাকলে হাজার মিঠে কথা, হাজার সোহাগ, কিছুই ভাল লাগে না।

উঠোনের এক কিনারে একটা প্যাডক গাছ। দুপুরে তার ছায়ায় খেতে বসেছিল হারান। তার পাতে জাউ আর মায়া মাছের ঝোল দিতে দিতে উজানী বুড়ি ডাকল, 'সুনা ভাই—'

হারান জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মতো জাউ নাড়াচাড়া করতে লাগল।

উজানী বুড়ি আবার ডাকল, 'লক্ষ্মী দাদা, আমার কথাখান শোন—'

হারান মুখ তুলল। চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'কী ক্যাচর ক্যাচর লাগালি ঠাউরমা?'

নির্দাঁত ফোকলা মুখে একটু হাসল উজানী বুড়ি। তারপর খুব উৎসাহের সুরে বলল, 'একখান খবর শুনছস ভাই?'

'কী খবর?'

'থাউক থাউক, মোন্দ কথা শুইনা তর কাম নাই।'একটু দম নিয়ে উজানী বুড়ি বলতে থাকে, 'বিহানে কুমী আছিল। হেই মাগীই কইয়া গেল। সত্য মিথ্যা ভগমান জানে।'

পাত থেকে হাত গুটিয়ে নিল হারান। চড়া গলায় বলল, 'কুমী মাগীরে তো দেখলাম। তরে কী কইতে আছিল?'

হারানের মারমুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে বুড়ি ভয় পেয়ে গেল। তবে ভয়টা বুঝতে দিল না। রুক্ষ কোঁচকানো মুখটাকে মধুর হাসিতে ভরিয়ে বলল, 'বড় মোন্দ কথা, তর শোননের কাম নাই। কুমী কইছে—'

'কী কইছে কুমী?' হারানকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখায়।

'উই নিত্যা নিকি বিদেশি বিজাতিরে ঘরে আইনা তুলছে। কুমী কইল—' বলতে বলতে থেমে গেল উজানী বুড়ি।

'এট্টু কইরা ক'স, বাকিটুক প্যাটের ভিত্‌রে রাখস! একলগে পুরাটা কইতে তর হয় কী?' হারান খেঁকিয়ে উঠল।

ভীরু গলায় উজানী বুড়ি এবার বলে, 'কুমী কয়, নিত্যা নিকি কাপাসীর লগে বিদ্যাশির বিয়া দিব।'

তীক্ষ্ণ গলায় হারান চেঁচিয়ে উঠল, 'মিছা—'

'সাচা হউক, মিছা ইউক, তর আমার কী?' হারানের একটা হাত ধরে উজানী বুড়ি বলে, 'তর খাওয়া তুই খা। নিজের মাইয়া হেয় অজাত-বিজাত-কুজাত, যার হাতে দেউক, তর আমার কী?'

হারান পাতে হাত দেয় না। ঘাড়টা গোঁজ করে বসে থাকে।

উজানী বুড়ি বোঝায়, 'পরের উপুর তো হাত নাই। নিজের মাইয়ারে যদি নিত্যা লুটাইয়া দ্যায়, পুড়াইয়া দ্যায়, কী করন?' দু'হাত ঘুরিয়ে বলে, 'কিছুই না। বুড়া বয়েসে নিত্যার মতিগতি খারাপ হইয়া গ্যাছে। নাইলে বিজাতিরে ঘরে আইনা তোলে, না তার লগে মাইয়ারে বিয়া দিতে চায়! হা ভগমান, কত নীলাই দেখাইলা।'

হারান জবাব দেয় না। ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে। উজানী বুড়ির দিকে একবারও তাকায় না।

উজানী বুড়ি নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'উই লষ্ট-শরীল, মাথা-খারাপ মাগীটার লেইগা মন খারাপ করিস না দাদা। উই মাইয়া নিয়া কী হইব? সোমাজ-সোংসারে কুনো কামেই আইব না। অরে যদি ঘরের বউ কইরা আনি হগলে গায়ে ছ্যাপ (থুতু) দিব। কাপাসীর চিন্তা তুই ছাড় হারাইনা।'

একসঙ্গে অনেকক্ষণ বকেছে। উত্তেজনায়, পরিশ্রমে হাঁপাতে থাকে উজানী বুড়ি। নাকের ডগায়, কপালে কণা কণা ঘাম দেখা দেয়। হাঁপানির তালে তালে শুকনো বুকটা কাঁপতে থাকে। টেনে টেনে দম নেয় সে। হাঁপানির দাপট একটু কমলে আবার শুরু করে, 'আমার সুনা ভাইর আবার বিয়ার চিন্তা! উই মাগী ছাড়া পিরথিমীতে য্যান আর মাইয়া নাই! ভগমান য্যান উই একখান মাইয়াই বানাইছে!'

গোয়ালন্দের স্টিমারে কাপাসীর হাসি শুনে মনটা বিরূপ হয়ে গিয়েছিল। এতদিনেও সেই মনোভাবটা কিছুতেই ঘুচল না উজানী বুড়ির। তার ওপর যেদিন শুনল, কাপাসীর শরীর নষ্ট, মাথাটা খারাপ, সেদিন থেকেই হারানকে তার সঙ্গে বেশি মিশতে দেয় নি। সব সময় আগলে আগলে রেখেছে।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যে মেয়ের শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছে সমাজে ধর্মে সে অচল। তার দাম কানাকড়িও নয়। তাকে নিয়ে কী করবে উজানী বুড়ি?

হঠাৎ হারান ডাকল, 'ঠাউরমা—'

'কী ক'স?'

'তুই সত্যই জানস নিত্য তালুই বিদ্যাশির লগে কাপাসীর বিয়া দিব?'

'কুমী তো হেই কথাই কইল।' উজানী বুড়ি বলে যায়, 'উই ভাবনা ছাড় দাদা। অঘ্ঘাণ মাসে ধান উঠলে আমিও তরে বিয়া দিমু। চন্দরের কাছে আমি আইজই যামু। তার মাইয়া পাখি বড় সোন্দর, বড় ভাল। তার পাশে তরে যা মানাইব! যুগল মিলন য্যান।' ফোকলা মুখে হাসে উজানী বুড়ি।

হঠাৎ পাতের সামনে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হারান। চেঁচাতে থাকে, 'থাম বুড়ি। পাখির লগে আমার বিয়ে দিতে চায়! আহ্লাদ কত!' চেঁচাতে চেঁচাতেই সে ঘরে চলে গেল।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল উজানী বুড়ি। একটু ধাতস্থ হয়ে চিলের মতো ধারাল গলায় চিল্লাতে শুরু করল, 'জানি জানি, উই মাগী তর মাথা খাইছে। অর মইদ্যে কী মধু পাইছস, তুই-ই জানস। উই পেত্নী ঘাড় থিকা না নামা ইস্তক তর মতিগতি কি ভাল হইব? উই মাগী তরেও সোয়াস্তি দিব না, আমারেও না। হা ভগমান—' চেঁচাতে চেঁচাতে নিজের শুকনো অস্থিসার বুকে দুম দুম করে কিল মারতে থাকে উজানী বুড়ি।

চুয়াল্লিশ

দিন তিনেকের মধ্যে মোটামুটি একখানা ঘর তুলে ফেলল নিত্য ঢালী। প্যাডক কাঠের খুঁটি, ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া আর বেতপাতার চাল। চালটা এখনো পুরোপুরি ছাওয়া হয় নি।

এখন সকাল।

উঠোনের এক পাশে কাঁচা বেতপাতা স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। নিত্য ঢালী চাল ছাইছে। পানিকর নিচে থেকে বেতপাতার গোছ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

উঠোনের আর এক পাশে একটা ঝাঁকড়া চুগলুম গাছ। তার ছায়ায় বসে সিপি সাফ করেছে লা তে। টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, নী-ক্লাম—নানা জাতের সমুদ্রচর কড়ি আর শামুক। তাদের শক্ত খোলের ওপর চুন আর সামুদ্রিক নুন জমাট বেঁধে আছে। লা তে সিপিগুলোর গায়ে অ্যাসিড ঢালে। সঙ্গে সঙ্গে নুন আর চুনের উগ্র উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

নিত্য ঢালীকে বেতপাতা যোগান দিতে দিতে ফুরসত বুঝে লা তে'র কাছে আসে পানিকর। তাকে তালিম দেয়, 'জ্যাদা অ্যাসিড ঢালবি না লা'তে। সমঝালি?'

'হাঁ—' ঘাড় কাত করে লা তে বলে।

'ইয়াদ রাখবি, জ্যাদা অ্যাসিড ঢাললে সিপি টুটাফাটা হয়ে যাবে।'

অল্পক্ষণ লা তে'র কাছে বসেই উঠে পড়ে পানিকর। অস্থির পায়ে উঠোনময় পায়চারি করে। চনমন করে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে।

ঘরের মাথা থেকে নিত্য ঢালী ডাকে, 'পানিকর বাবা—'

'হাঁ হাঁ—' পানিকর ছুটে আসে।

'পাতা দ্যান—'

একসঙ্গে পানিকর অনেকগুলো বেতপাতার গোছা ছুঁড়ে দেয়, যাতে নিত্য ঢালী বেশ কিছুক্ষণ তাকে ডাকতে না পারে।

বেতপাতা দিয়ে এসেই আবার ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় পানিকর। এদিক সেদিক কাকে যেন খোঁজে।

ঘাড় গুঁজে সিপি সাফ করছিল লা তে। হঠাৎ সে ফিস ফিস করে ডাকল, 'মালেক—'

'কী-কী-কী—' এক দৌড়ে লা তে'র কাছে চলে এল পানিকর। বলল, 'অত ডাকাডাকি করছিস কেন? হয়েছে কী?'

বর্মী লা তে'র চাপা কুতকুতে চোখে, থ্যাবড়া নাকে, পুরু তামাটে ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি খেলে বেড়ায়।

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'কুত্তা, হাসছিস কেন?'

নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে লা তে জবাব দেয়, 'হাসছি না তো মালেক—'

'ডাকছিলি কেন?'

পানিকরের কানে মুখটা গুঁজে খুব আস্তে লা তে বলে, 'কাকে খুঁজছেন?'

পানিকর খেপে উঠল, 'যাকেই খুঁজি, তোর তাতে কি রে হারামীর বাচ্চা?'

'কুছু না, কুছু না—' লা তে শব্দ করে হাসতে লাগল। একসময় হাসিটা থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না—'

পানিকর গর্জে উঠল, 'কী ভাল না রে শালে—'

লা তে জবাব দেবার আগেই ঘরের চাল থেকে নিত্য ঢালী ডাকল, 'পানিকর বাবা—'

'কী?' পানিকর ফের ওদিকে ছুটে গেল, 'এই তো বেতপাত্তি দিয়ে গেলাম। আবার ডাকছ কেন?'

'দড়ি দ্যান।'

এক লাছি নারকেল দড়ি ছুঁড়ে দিল পানিকর।

একদিকে নিত্য ঢালী, অন্যদিকে লা তে। তাঁতের মাকুর মতো দু'জনের মধ্যে পানিকর ছোটাছুটি করে। এরই ভেতর একসময় তার নজরে পড়ে যায়, চাল ধুতে কিলপঙ নদীতে গিয়েছিল কাপাসী, এইমাত্র ফিরছে। উতরাই বেয়ে বেয়ে সে ওপরে উঠে আসছে।

উঠোনের মাঝখানে এসে স্থির দাঁড়িয়ে পড়ে পানিকর। তার চোখ দু'টো ছুরির ফলার মতো ঝকমক করতে থাকে।

চালের হাঁড়ি নিয়ে পানিকরের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল কাপাসী। একটু পর ফাঁক বুঝে হুঁকো-কলকে, তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে কাপাসীর কাছে এল পানিকর।

উঠোনের শেষ মাথায় কাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে একটা দোচালা তুলে দিয়েছে নিত্য ঢালী। এটাই কাপাসীর রান্নাঘর। সেখানে এসে উবু হয়ে বসল পানিকর।

প্রথমে পানিকরকে দেখতে পায় নি কাপাসী। পেছন ফিরে বসে উনুনের মুখে শুকনো পাতা আর সরু ডাল গুঁজে দিচ্ছিল সে। মেটে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। সরার ফাঁক দিয়ে হালকা সাদা ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে যাচ্ছে।

উদাস চোখে হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের খেয়ালে কী যেন বিড় বিড় করে বকে যায় কাপাসী।

ফিস ফিস করে পানিকর ডাকল, 'কাপাসী—'

'কে?' চমকে ঘুরে বসল কাপাসী। হঠাৎ ডাকটা শুনে সে বুঝি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তার চোখমুখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে যায়। খুব নরম গলায় বলে, 'পানিকর ভাই—'

'হাঁ—'

'বসেন বসেন—' কাপাসী বলতে থাকে, 'তামুক খাইবেন? আগুন চাই?'

পানিকর মাথা নাড়ে, হাসে। এতক্ষণ সে উবু হয়ে বসে ছিল, এবার পা ছড়িয়ে জুত করে বসল।

তামাক-ভরা কলকেটা কাপাসীর হাতে এগিয়ে দেয় পানিকর। কাপাসী উনুনের ভেতর থেকে খানিকটা গনগনে অঙ্গার সেটাতে তুলে দেয়।

তামাক খাওয়ার অভ্যেস কোনোকালেই ছিল না পানিকরের। নিত্য ঢালীই তাকে এই নেশাটা ধরিয়েছে। নেশা ধরা সোজা, কিন্তু ছাড়া কঠিন। আজকাল তামাক ছাড়া পানিকরের চলে না। সময়মতো এক ছিলিম না পেলে গলাটা কেমন যেন খুচখুচ করে।

হুঁকো টানতে টানতে মৌতাত ধরে যায়। তামাকটা বেশ কড়া। যত কড়াই হোক, শুধু তামাকে পানিকরের শানায় না। তাতে খানিকটা গাঁজা মিশিয়ে নিয়েছে সে।

গাঁজা মেশানো তামাকের গুণ আছে। নেশাটা যখন চরমে ওঠে, মাথার সরু সরু রগগুলি চিন চিন করতে থাকে। তখন চোখের সামনের দুনিয়াটা আসল রং হারিয়ে ফেলে, ঘোর ঘোর নেশাময় এক রঙিন স্বপ্ন হয়ে ওঠে।

হুঁকো টানে আর ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ে পানিকর। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জড়ানো গলায় ডাকে, 'কাপাসী—'

'কী ক'ন পানিকর ভাই?'

'তুমি মাদ্রাজ শহরে গেছ?'

'না, গ্যালাম আর কই?'

'যাবে?'

'কে লইয়া যাইব?'

পানিকর এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কেন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

'সাচা ক'ন?' ঘাড়টা বাঁকিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকায় কাপাসী।

'হাঁ হাঁ, জরুর সচ।' পানিকর আরো একটু ঘন হয়ে বসে। আস্তে আস্তে বলে, 'মাদ্রাজ শহরে গেলে তোমার বহুত ভাল লাগবে।'

রান্নাঘরের সামনেটা জুড়ে বসে আছে পানিকর। তার মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে বাইরে, অনেক দূরে পাহাড়-টিলা-জঙ্গল পেরিয়ে কোথায় যেন পৌঁছে দেয় কাপাসী। আকাশটা আশ্চর্য নীল। মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। শুধু একঝাঁক কী যেন পাখি ডানা মেলে বাতাসে ভাসছে।

অনেক দূরে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে কী দেখছে কাপাসী? আকাশ? পাখি? টিলা-জঙ্গল-পাহাড়? কাপাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল পানিকর, পারল না। কাপাসীর চোখদু'টো বড় দুর্বোধ্য।

পানিকর ডাকল, 'কাপাসী—'

কাপাসী সাড়া দিল না।

পানিকর নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'দো মাহিনার অন্দর সিপি সাফ হয়ে যাবে। সিপিগুলো এজেন্টের কাছে বেচে তোমাকে আর নিত্য চাচাকে মাদ্রাজ নিয়ে যাব। হাঁ, জরুর—'

এবারও কিছু বলে না কাপাসী। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

পানিকর থতমত খায়। 'হাসছ কেন? তোমার বুঝি বিশোয়াস হচ্ছে না?'

আস্তে আস্তে হাসছিল কাপাসী। হঠাৎ হাসিটা কলকলিয়ে মেতে উঠল। বরাবর যেমন হয়, হাসির দাপটে তার শরীরটা বেঁকে দুমড়ে ডেলা পাকিয়ে যেতে থাকে।

কী বুঝল, পানিকরই জানে। বেজার মুখে উঠে পড়ল। মনে মনে কী একটা গূঢ় মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে উঠোনে চলে এল।

চুগলুম গাছটার মাথায় একটা ভীমরাজ পাখি ডেকে ডেকে খুন হচ্ছে। নিচে ঘাড় গুঁজে সিপি সাফ করছে লা তে। হঠাৎ সে মুখ তুলল। ডাকল, 'মালেক—'

কাছে এসে পানিকর বলল, 'কী বাত?'

'একটাই বাত।'

পানিকর দেখল, বর্মী লা তে'র কুতকুতে চোখদু'টো ঝিক ঝিক করছে। থ্যাবড়া নাকটা ফুলে উঠেছে। খাড়া চোয়াল এখন শক্ত। একটু যেন ভয়ই পেল পানিকর। কাঁপা গলায় বলল, 'কী বাত, জলদি বল।'

'বলব, জরুর বলব মালেক। থোড়া বসুন তো।'

অগত্যা কী ভেবে যেন পানিকর লা তে'র পাশে বসেই পড়ে। বলে, 'বল—'

কাপাসীর হাসি এখনো থামে নি। রান্নাঘরে তীব্র অস্বাভাবিক শব্দ করে সে হেসেই চলেছে।

লা তে ফিস ফিস করে বলে 'মালেক, নিত্য ঢালীর লেড়কী অ্যায়সা হাসছে কেন?'

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'হাসছে কেন, আমি তার কী জানি রে কুত্তা?'

গালাগালিটা গায়ে মাখে না লা তে। দাঁত বার করে টেনে টেনে কেমন করে যেন হাসে। পানিকরের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

লা তে বলে, 'সচ বলছেন, আপনি জানেন না?'

'না রে হারামী, না।' পানিকর খেঁকিয়ে ওঠে।

'তামাকের আগ আনতে গেলেন আর নিত্যর লেড়কী হাসতে লাগল। আমি সোচলাম, জরুর আপনি কুছ্ তামাশার কথা বলেছেন কাপাসীকে। না হলে হাসবে কেন?'

পানিকর আর কিছু বলে না। গজরাতে গজরাতে উঠে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে লা তে'ও উঠে দাঁড়ায়। পানিকরের কানে মুখটা গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না। বহুত বুরা (খারাপ) কাম।'

এমন করেই দিন যায়।

একদিন নিত্য ঢালী ঘর বানানো শেষ করে সিপি সাফের কাজে লাগে।

আজকাল চুগলুম গাছটার ছায়ায় বসে তিন জনে সিপি পরিষ্কার করে। লা তে, পানিকর আর নিত্য ঢালী।

সিপি পরিষ্কার করতে করতে ফুরসত পেলেই উঠে পড়ে পানিকর। কাপাসীর কাছে গিয়ে বসে। তাকে মাদ্রাজ শহরের গল্প শোনায়। বলে, 'কাঞ্জিভরম শাড়ি কিনে দেব। মাদ্রাজী কাঙনা আর হাঁসলি কিনে দেব।'

এ কথা সে কথা বলে আর হাজারটা লোভের ফাঁদ পাতে পানিকর। তার কথা শুনতে শুনতে কোনোদিন কাপাসীর চোখদু'টো চক চক করে। সে বলে, 'সত্যই আমাগো মাদ্রাজ নিয়া যাইবেন পানিকর ভাই? না, মিছা আশা দ্যান?'

পানিকর বলে 'না না, মিছা বাত আমি বলি না। আমি যখন আছি, নিত্য চাচাকে আর কাম করতে হবে না। বুড়ঢা মানুষ। কাম করতে কত তখলিফ হয়।' একটু থেমে বলে, 'মাদ্রাজ শহরে আমার কোঠি আছে। সিপিগুলো সাফ করে নিই। তারপরেই মাদ্রাজের জাহাজে উঠব।'

কোনোদিন বা পানিকরের কথা শুনে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে হেসে ওঠে কাপাসী।

কাপাসীর কাছ থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে লা তে পানিকরকে ডাকে। তার কানে মুখটা ঢুকিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না।'

এমন করেই দিন যায়।

পঁয়তাল্লিশ

পোর্ট ব্লেয়ারের কাজ চুকিয়ে দিন কয়েক পর পালসাহাব ফিরে এসেছে।

এখন বিকেল। নিজের ঝুপড়ির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পালসাহাব।

সামনে জঙ্গলের মাথায় এক ঝাঁক কাটোঁরা পাখি উড়ছে, কখনো পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। ছোট ছোট ডানায় ঘা মেরে বাতাস তোলপাড় করছে।

এই দ্বীপে এর আগে কোনোদিন কাটোঁরা পাখি দেখেছে কি? পালসাহাব মনে করতে পারল না। না পারার জন্য অবশ্য তার মাথাব্যথাও নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে পাখিদের নাচানাচি ওড়াওড়ি দেখতে থাকে সে।

এমন সময় তারা এসে পড়ল। তারা বলতে রসিক শীল, বুড়ি বাসিনী, হারান, যোগেন, উদ্ধব—ডিগলিপুর সেটেলমেন্টের প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন বাসিন্দা।

পালসাহাব খুশি গলায় বলল, 'আও, আও শালে লোগ—'

সকলে কাছে এসে দাঁড়াল।

পালসাহাব আবার বলল, 'তোরা ভাল আছিস তো? দিল-তবিয়ত আচ্ছা?'

'কই আর ভালা রইলাম সাহাব বাবা? ভালা থাকনের কি যো আছে?' বুড়ো রসিক শীলের গলাটা বেজার শোনাল।

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'আবার কী হল তোদের।'

পালসাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল রসিক শীল।

পালসাহাব চিল্লায়, 'কি রে, কথা কইছিস না কেন?'

ভয়ে ভয়ে রসিক শীল বলল, 'কী কমু সাহাব বাবা? আপনেরে কিছু কইতে ডর লাগে।'

এবার পালসাহাব হেসে ফেলে। নরম গলায় বলে, 'বল বল, ডর নেই।' হাত বাড়িয়ে রসিক শীলকে নিজের দিকে টেনে নিল সে।

সাহস পেয়ে রসিক শীল বলল, 'সাহাব বাবা, আপনে পুট বিলাস গেছিলেন, এই ফাকে নিত্য ঢালী বিদ্যাশি বিজাতি ঘরে আইনা তুলছে। ঘরে তার বিয়ার যুগ্য মাইয়া।'

পালসাহাব কয়েকদিন পোর্ট ব্লেয়ারে ছিল। এর মধ্যে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে কী ঘটেছে, কিছুই জানে না। আস্তে আস্তে সে বলল, 'নিত্য বুড্ঢা বিদেশি-বিজাতিকে ঘরে এনে তুলেছে!'

'তবে আর কী কই সাহাব বাবা—' নতুন উদ্যমে শুরু করে রসিক শীল, 'ডর নাই, নিত্যার পরাণখানে এতটুক ডর নাই।' বলে একটু থামে। কী ভেবে আবার বলে, 'ঘরে ডাকাবুকা পাগল মাইয়া, তার উপুর দুই দুইটা জুয়ান বিদ্যাশিরে ঘরে আইনা রাখছে। ভাবলেই তো বুক কাপে।'

অস্পষ্ট একটা শব্দ করে পালসাহাব।

ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল হারান। এবার কনুই দিয়ে সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'এইর একখান বিহিত করতে হইব পালসাহাব। কুলোনিতে এই হগল চলব না।'

'কোন সব?'

এই ক'দিন রাগ দুঃখ হতাশা এবং অসহ্য এক যন্ত্রণার মধ্যে কাটছে হারানের। ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না, কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না, সাত বার জিজ্ঞেস করলে একটা কথার হয়তো জবাব মেলে। মাথার চুল উড়ু উড়ু, রুক্ষ। চোখদু'টো টকটকে লাল। চোখের নিচের হনু ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

হারান বলল, 'বদ মতলব নিত্য তালুইর মনে। ক্যান উই বিদ্যাশিরে ঘরে জায়গা দিছে, আমরা বুঝি। কিন্তুক পালসাহাব, কুলোনিতে এই বদ কাম চলবে না। হ—সিধা কথা। আপনের কাছে এইর বিহিত চাই।

খানিকটা চুপচাপ। তারপর একসময় পালসাহাব বলল, 'সবই তো শুনলাম। লেকিন বিদ্যাশি-বিজাতি কারা?'

'উই পানিকর আর লা তে।'

'ও। আভি সমঝা।' পালসাহাব বলতে লাগল, 'যার কাছে নিত্য বুড্ঢা কাজ করত, সেই পানিকর?'

'হ।'

কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে রইল পালসাহাব। তারপর গাঢ়, নরম গলায় বলল, 'দ্যাখ হারান, নিত্য বুড্ঢা বড় দুঃখী। ওর জিন্দেগীতে সুখ নেই। এক রোজ আমাকে সব বলেছে নিত্য। ওর বিবি মরেছে, ওর লেড়কী পাগল বনে গেছে।' গলা ধরে যায় পালসাহাবের। কেশে কণ্ঠস্বর সাফ করে সে বলতে থাকে, 'বিদেশিকে ডেরায় রেখে ও যদি খুশি হয় তো হোক না। তব্ হাঁ, যদি বেচাল করে শালের বাচ্চার জান তুড়ব। হাঁ—জরুর।'

নিত্য ঢালী সম্পর্কে পালসাহাবের অদ্ভুত এক দুর্বলতা আছে।

সাত পুরুষের ভিটেমাটি খুইয়ে, হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলো উপনিবেশ গড়তে এসেছে। বাস্তু তো সবাই হারিয়েছে। কিন্তু নিত্য ঢালীর মতো বউ হারিয়েছে কে? মেয়ে পাগল হয়েছে কার? এখনো যে নিত্য ঢালীর মাথাটা ঠিক আছে, এই কথা ভেবে মাঝে মাঝে তাজ্জব বনে যায় পালসাহাব।

যে মানুষ বাস্তুভিটে এবং বউকে হাবিয়ে সর্বস্ব খোয়ানো একটা পাগল মেয়েকে নিয়ে বাঁচার আশায় এতদূরে, এই দ্বীপে আসতে পারে, তার জন্য পালসাহাবের অফুরন্ত মমতা।

পালসাহাব বলল, 'এখন তোরা যা, আমি নিত্য ঢালীর সাথ দেখা করে কথা বলব।'

সবাই চলে গেল।

বড় আশা নিয়ে পালসাহাবের কাছে এসেছিল হারান। ভেবেছিল, সুরাহা একটা কিছু হবে। তার বিশ্বাস ছিল, শোনামাত্রই পালসাহাব নিত্য ঢালীর ডেরায় ছুটবে। বিদেশি-বিজাতিদের কলোনি থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু না, কিছুই হল না। একা একা চড়াই আর উতরাই বেয়ে কখন যে সে কিলপঙ নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, নিজেরই হুঁশ নেই।

মধ্যঋতুর দিনটা এখন মরতে বসেছে। রোদের তাপ নেই, তেজ নেই, জেল্লা নেই। চারদিক কেমন যেন বিষণ্ণ, উদাস।

গাছের যে পাতাগুলো এতক্ষণ রোদের আসব শুষছিল, সেগুলো ঢলে পড়েছে। যে পাখিরা সমুদ্রে গিয়েছিল তারা দ্বীপে ফিরতে শুরু করেছে।

নদীর পাড়ে বাদামি রঙের ছোট ছোট নুড়ি। তার ওপর দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইল হারান।

পানিকররা নিত্য ঢালীর ডেরায় আসার পর কত বার যে কেঁদেছে হারান! যেই একটু নিরালায় গিয়ে বসে, শত দিক থেকে কাপাসীর চিন্তাটা তার মাথায় শেল বেঁধাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে আকণ্ঠ, অসহ্য একটা কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে।

চুপচাপ বসে বসে কাঁদছে হারান। কান্নার দমকে শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। টস টস করে চোখ থেকে নোনা জল ঝরতে থাকে তার।

কান্নার বুঝি শেষ নেই। চোখের জল হয়তো তার কোনোদিনই ফুরোবে না।

হাঁটুতে মাথা গুঁজে কতক্ষণ যে হারান বসে ছিল, খেয়াল নেই। জঙ্গলের মাথা থেকে মলিন আলোটুকু কখন মুছে গিয়েছে, কখন ধোঁয়া রঙের সন্ধে নেমেছে, আর আবছা সন্ধেটা কখন গাঢ় রাত্রি হয়ে গিয়েছে, কে জানে।

'হারাইনা রে—' সমস্ত সেটেলমেন্টে নাতিকে খুঁজতে খুঁজতে উজানী বুড়ি কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, হারান টের পায় নি।

তার প্রথম ডাকটা হারানের কানে যায় নি। ঘাড় গুঁজে যেমন ছিল, তেমনি বসে থাকে সে।

এবার হারানের কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল উজানী বুড়ি। ফের ডাকল, 'হারাইনা—'

আস্তে আস্তে মাথা তুলল হারান। নাতির মুখের চেহারা দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ি, 'আমার কী সর্বনাশ হইল রে! হা ভগমান, রাইক্ষসী ডাকিনী হারাইনার মাথা খাইল। আমার কী হইব!' কাঁদতে কাঁদতেই হারানকে টেনে তুলল উজানী বুড়ি। বলল, 'ঘরে চল সুনা ভাই, আমার লক্ষ্মী দাদা।'

হারান নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়।

আগে আগে চলেছে উজানী বুড়ি, পেছনে হারান।

উজানী বুড়ি হাঁটে আর বুক থাপড়ায়। বিড় বিড় করে বলে, 'সব্বনাশী, তর মনে এই আছিল! তর পরাণে এত প্যাচ! ভাল হইব না। আমি রাঢ়ী হইয়া কই, তর ভাল হইব না। জ্বইলা পুইড়া মরবি। আমার ভাল নাতিটারে তুই বিবাগী করলি! এই অধম্ম সইব না। ভগমান এইর বিচার করব লো কালসাপের ছাও—'

ছেচল্লিশ

খিলাফৎ পাঠান সেই যে এসেছিল, আর তার যাওয়া হল না। উত্তর আন্দামানের এই সেটেলমেন্টেই সে থেকে গেল।

মানুষের প্রতি চরম অবিশ্বাস নিয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরী সাজা খাটতে এসেছিল খিলাফৎ। তারপর পঞ্চাশ ষাটটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। এতগুলো বছরে মানুষের প্রতি খিলাফতের অবিশ্বাস, ঘৃণা, সন্দেহ একটু একটু করে বেড়েই চলেছিল। মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছিল।

আন্দামানের জঙ্গলে কত বছর যে কাটিয়ে দিয়েছে, সে হিসাব কি খিলাফৎ নিজেই জানে! শুধু এটুকু জানে, জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দিদু চুগলুম প্যাডক কি পপিতার মতো সেও একটা গাছ হয়ে গিয়েছে।

ফরেস্টের কুলি হয়ে খিলাফৎ দক্ষিণ আন্দামানের জঙ্গলে ঢুকেছিল। সেখান থেকে এল মধ্য আন্দামানের লং আইল্যান্ডে। লং আইল্যান্ড থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে ইদানীং এই ডিগলিপুরের জঙ্গলে।

আজকাল খিলাফৎ ফরেস্টের কুলি নয়, গার্ড। পঞ্চাশ ষাট বছরে একবার মাত্র পারমোশ বা প্রোমোশন হয়েছে। কুলি থেকে গার্ড । এ জন্য দুঃখ, আপসোস বা ক্ষোভ নেই তার।

ক্রমাগত দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে খিলাফৎ পাঠান। নিছক প্রয়োজনটুক ছাড়া মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। সম্পর্ক নেই। যখনই সে বোঝে মানুষ তার কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখনই জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে খিলাফৎ। জঙ্গলের মতো সহৃদয় বন্ধু তার আর নেই। মানুষকে এড়িয়ে এড়িয়ে প্রায় পুরো জীবনটা কাটিয়ে ফেলল খিলাফৎ।

দক্ষিণ আন্দামানের জঙ্গল কাটতে কাটতে একদিন সে দেখল, পেনাল কলোনি বসেছে। দিন দিন এখানে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার নিয়ে সে এল মধ্য আন্দামানে। জঙ্গল 'ফেলিং' হওয়ার পর সেখানেও মানুষ এল। খিলাফৎ ছুটল মায়াবন্দর। মায়াবন্দরেও মানুষ এল। খিলফৎ ছুটল ডিগলিপুর। ডিগলিপুরের জঙ্গল সাফ করে রিফিউজি সেটেলমেন্ট বসেছে।

মানুষের তাড়া খেতে খেতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছে খিলাফৎ পাঠান। ডিগলিপুরের নতুন বাসিন্দাদের দেখে সে ঠিক করেছিল উত্তরে, আরো উত্তরে যেখানে কোনোদিন কোনো মানুষ যাবে না, সেই ল্যান্ডফল দ্বীপে চলে যাবে।

তার শাদি-করা বিবি আর চাচাতো ভাই তাকে ঠকিয়েছে। জীবনে এই দু'জনের কাছে চরম মার খেয়ে মানুষ সম্বন্ধে খিলাফতের ধারণাটা হয়ে গিয়েছে একরোখা, ভয়ানক। তার বিশ্বাস, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই বিশ্বাসঘাতক। মানুষ সম্বন্ধে এই ধারণাটা খিলাফতের জীবনে একটা অন্ধ সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ল্যান্ডফল দ্বীপেই চলে যেত খিলাফৎ। কিন্তু তার আগেই রোগে কাবু হয়ে পড়ল।

খিলাফৎ খান তার সারা জীবনে মানুষের প্রীতি, ভালবাসা বা বন্ধুত্বের তাপ কোনোদিনই পায় নি। জীবনের বাকি দিনগুলি ল্যান্ডফল দ্বীপে প্রীতিহীন, নীরস, নিঃসঙ্গভাবেই কেটে যেত। কিন্তু রোগটা সব হিসেব গোলমাল করে দিল। জীবনটাকে যে ছকে খিলাফৎ বেঁধেছিল সেই ছকটাই একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পালসাহাব সেই যে তাকে রামকেশবের বউ ক্ষিরির কাছে রেখে গিয়েছিল, তারপর থেকেই মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলাতে শুরু করেছে।

রামকেশবের বউ ক্ষিরির মাথাটা একরকম খারাপই হয়ে গিয়েছে। সেটা ঠিক থাকাই তো অস্বাভাবিক। যার ছেলে মরে, দেশভাগ কারসাজি করে যার মেয়েকে মারে, তার মাথা ঠিক থাকে কেমন করে?

শুধু মাথাই খারাপ হয় নি, পরী আর সুবলকে হারিয়ে মানুষের প্রতি স্নেহ মমতা করুণা, জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ সে খুইয়ে ফেলেছিল। দিনরাত সে উকুন বাছত আর মানুষকে অভিসম্পাত দিত। নিজে ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার করতে পারে নি। অন্য কাউকে সংসার করতে দেখলে সে খেপে উঠত। আশ্চর্য! সেই ক্ষিরি খিলাফৎ পাঠানকে পেয়ে মেতে উঠল। তার উকুন বাছা ঘুচল। শাপাশাপি বন্ধ হল।

প্রথম প্রথম খুব একটা কাছে ঘেঁষত না ক্ষিরি। দূর থেকে খিলাফৎকে দেখত।

সত্তর না আশি, তার সঠিক বয়স যে কত, খিলাফৎ খান নিজেই জানে না। অনেক বছর আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে কখন যে দেহটা অশক্ত, জীর্ণ এবং পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, হুঁশ নেই।

রোগে বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে খিলাফৎ।

দিনরাত রামকেশবের ঘরের মাচানে শুয়ে থাকে সে। দুর্বল বুকটা শ্বাসটানার তালে তালে তোলপাড় হয়, ওঠানামা করে। চোখ দু'টো অর্ধেক বোজা, মুখটা অল্প হাঁ হয়ে আছে।

প্রথম দিকে দূরে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত ক্ষিরি।

শ্বাস টানতে বড় কষ্ট হত খিলাফতের। গলার ভেতর থেকে অনুচ্চ, ঘড়ঘড়ে হাঁপানির টানের মতো শব্দ বেরুত। কান খাড়া করে শুনত ক্ষিরি।

এই অসহায় বুড়ো মানুষটাকে দেখতে দেখতে পাগলী ক্ষিরি হঠাৎ একদিন এক কান্ড করে বসল। ছুটে গিয়ে দু'হাতে খিলাফতের মুখটা তুলে ধরে ককিয়ে উঠল, 'আমার সুবলা রে, তুই কই গেলি রে বাপ! আমার পরী লো, তুই কই গেলি মা! আমার বুক যে খা খা করে, আমার পুরী যে আন্ধার!'

ক্ষীণ গলায় খিলাফৎ বলে, 'বহুৎ তখলিফ মাঈ, বহুত তখলিফ। আমার শির ফেটে যাচ্ছে, বুক টুটে যাচ্ছে।'

মাথাটা টিপে, বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ক্ষিরি।

যন্ত্রণা একটু কমলে আস্তে আস্তে চোখ বুজল খিলাফৎ খান।

শুধু মাথাই টেপে না, বুকেই হাত বুলোয় না, এই পঙ্গু মানুষটাকে নিয়ে কী করবে, ভেবে পায় না ক্ষিরি। অসুস্থ বুড়ো মানুষটা তার সুবলের চেয়েও অসহায়। একে খাইয়ে না দিলে খেতে পারে না। হাত ধরে না ওঠালে উঠতে পারে না।

বুকে কি মাথায় যন্ত্রণা হলে কিংবা খিদে পেলে মানুষটা শিশুর মতো গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে।

কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে কখনো বিরক্ত হয় ক্ষিরি। কখনো সস্নেহে হাসে। বলে, 'কান্দে না বুড়া বাবা। অমুন অবুঝ হয় না।'

আস্তে আস্তে একদিন রোগ সারল। ক্ষিরির কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে এল খিলাফৎ খান। বলল, 'মাঈ, আমি তুমার কাছ থেকে যাব না।'

'এই শরীল নিয়া কই যাইবেন বুড়া বাবা?' ক্ষিরি বলতে থাকে, 'কুনোখানে যাইতে হইব না আপনের। এই বয়েসে এই শরীলে গিয়া কি মরবেন! তার থিকা আমার কাছেই থাকেন।'কথা ক'টা বলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ক্ষিরি। বিষণ্ণ চোখে অনেক দূরে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে থাকে, 'আমার সুবলা রে, আমার পরী রে, তরা কুনখানে গেলি? আমার বুক যে খা খা করে।'

খিলাফৎ খান বলে, 'কী বলছ মাঈ?'

'না বাবা, কিছু না। আপনেরে কিছু কই না। কই আমার অদ্দিষ্টের কথা।' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় ক্ষিরি।

এতকাল মানুষের কাছ থেকে ক্রমাগত পালাতে চেয়েছে খিলাফৎ। পালাতে পালাতে জীবনের সত্তর আশিটা বছর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই ফিরে এসেছে সে।

মানুষকে এতকাল সন্দেহ করেছে, ঘৃণা করেছে, অবিশ্বাস করেছে খিলাফৎ। কিন্তু ক্ষিরির সেবা, স্নেহ এবং প্রাণের উত্তাপ পেয়ে মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। মানুষের মধ্যে আবার বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে সে।

আরো খানিকটা সুস্থ হয়ে একদিন ফরেস্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এল খিলাফৎ। রামকেশবের ডেরাটার পাশে একটা ঝুপড়ি তুলে নিল।

একে বয়স হয়েছে। তার ওপর শরীরটা খুবই শীর্ণ এবং শক্তিহীন। এই শরীর নিয়ে ল্যান্ডফল দ্বীপের নির্জন বন্য জীবনে যেতে আজ আর তার সাহস হয় না।

ক্ষিরিও অনেক কিছুই ফিরে পেয়েছে।

পরী কি সুবলকে সে পায় নি। কিন্তু তাদের হারিয়ে যা সে খুইয়েছিল, সেগুলি ফিরে পেয়েছে। একটা অসহায় বুড়ো রুগ্‌ণ মানুষের সেবা করতে করতে স্নেহ মমতা করুণা, জীবনের খোয়ানো মহার্ঘ জিনিসগুলো আবার তার কাছে ফিরে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন পর রামকেশবদের কাছে এল পালসাহাব। অবাক হয়ে দেখল, উঠোনের এক কিনারে একটা নতুন ঝুপড়ি উঠেছে। সেটার সামনে বসে রয়েছে খিলাফৎ পাঠান আর ক্ষিরি।

পালসাহাবকে দেখে খিলাফৎ ডাকল, 'আ যা দোস্ত—'

পালসাহাব সামনে এগিয়ে এসে বলে, 'কী করছ খান সাহাব?'

'এই মাঈর সাথ থোড়া বাতচিত করছিলাম।'

'তোমার বুখার সেরেছে?'

'আরে হাঁ হাঁ—' খিলাফৎ বলতে লাগল, 'এই মাঈর জন্যেই তো এবার বেঁচে গেলাম। নইলে জরুর ফৌত হয়ে যেতাম।'

'বুখার সেরেছে। এবার ল্যান্ডফল জাজিরায় যাবে তো?'

'নেহী।' ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে খিলাফৎ খান।

'কিঁউ?'

'এই মাঈকে ছেড়ে যেতে পারব না। এই দ্যাখ না পালসাহাব, নয়া ঝোপড়ি তুলে নিয়েছি।'

পালসাহাব অল্প অল্প হাসে। বিচিত্র সুখে তার বুকের ভেতরটা কাঁপে। অস্থির গলায় সে বলে, 'তুমি না বলতে মানুষ বেইমান, দুশমন!'

'সব মানুষ না রে পালসাহাব।'

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে খিলাফৎ খান। পালসাহাব যতবার কথাটা ভাবল, অফুরাণ খুশিতে প্রাণটা ভরে যেতে লাগল তার।

সাতচল্লিশ

পালসাহাবের জীবন থেকে সেই কৃষাণ গ্রামের ঠিকানাটা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। কোথায় কবে যেন সেখানে দুপুরকে উদাস করে ঘুঘু ডাকত। তকতকে করে নিকানো উঠোনে বাতাবি গাছের ছায়া পড়ত। ঝকঝকে মাটির দেওয়াল, নাদুস নুদুস গোলগাল শিশু, কপালে মেটে সিঁদুর, পায়ে মল একটি বউ—কতকাল আগের সেই ছবিটা ধু ধু হয়ে গিয়েছে।

যখন কাছাকাছি কেউ থাকে না, সেই ছবিটা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই শিশু, সেই বউ, ঘুঘুর ডাক—কোথায় তারা বিলীন হয়ে গিয়েছে, কে তার হদিস দেবে! যতবার পালসাহাব তাদের কথা ভাবে, চোখ সজল হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরটা বোবা ব্যথায় টনটন করতে থাকে। নিজের মনেই খেঁকিয়ে ওঠে পালসাহাব, 'শালে, বেদর্দ কিসমত—'

আজ সকালে উঠেই দুলতে দুলতে ধানখেতের দিকে চলেছে পালসাহাব। এখনো ঠিকমতো রোদ ওঠে নি। পুব দিকের আকাশে আবছা আবছা, বড় নরম একটু আলো ফুটেছে। জঙ্গলের মাথায় ফিকে কুয়াশা ঝুলছে।

কোনো দিকেই খেয়াল নেই পালসাহাবের। সকালের প্রথম আলো, কুয়াশা, জঙ্গল, চড়াই-উতরাই, পাহাড়-টিলা—এই দ্বীপের কিছুই যেন সে দেখছে না। তার চোখের সামনে সেই ধুধু কৃষাণ গ্রাম, সেই মল-বাজানো বউ, সেই দুপুর, নাদুস নুদুস ছেলে, সব একাকার হয়ে অনেকদিন আগের হারিয়ে যাওয়া ছবিটা ভেসে উঠছে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলেছে পালসাহাব। একসময় ধানখেতে এসে পড়ল সে।

জঙ্গলের কাছ থেকে যে মাটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সবুজ সতেজ ধানগাছে তা ছেয়ে গিয়েছে।

প্রতিটি গাছ থেকে সবেমাত্র শিষ বেরুতে শুরু করেছে। দু'এক মাসের মধ্যেই ধানের শিষে শিষে খেত ভরে যাবে। সবুজ তুষের ভেতর দুধ জমবে। একদিন দুধ ঘন হয়ে পুষ্ট নিটোল শস্য হয়ে যাবে। সবুজ তুষে হলুদ রং ধরবে।

ধানবনের ওপর দিয়ে মৌসুমি বাতাস সির সির করে বয়ে যায়। খেতের দিকে তাকিয়ে থাকে পালসাহাব। ধান দেখতে দেখতে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই কৃষাণ গ্রামের স্বপ্ন তাকে যেন বিভোর করে রাখে।

'পালসাহাব—' কে যেন ফিস ফিস করে পেছন থেকে ডাকল।

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় পালসাহাব। চোখের সামনে থেকে কৃষাণ গ্রামের ছবিটা হারিয়ে যায় মুহূর্তে। ঠিক পেছনে কুমী এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সে যোগিনী সেজেছে।

কুমীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিলির স্বামী হরিপদ বারুই। দুর্বল দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বুকে একটা হাত চেপে টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে। অনেকখানি চড়াই উতরাই ভেঙে এসেছে হরিপদ। উত্তেজনায় ক্লান্তিতে বুকটা তোলপাড় করে শ্বাস পড়ছে। কপালে, নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

কুমী চতুর ঠোঁটে অস্ফুট শব্দ করে হাসে। তার ধূর্ত চোখ দু'টো ঝিক ঝিক করতে থাকে।

পালসাহাব বলল, 'কি রে মুহিনী-যুগিনী, মতলব কী? সকালে উঠেই হরিপদ কুত্তাটাকে নিয়ে এসেছিস যে?'

কুমীর ঠোঁটের হাসি মরে না। আস্তে আস্তে সে বলে, 'ক্যান আইছি, হরিপদ ভাইরে জিগান পালসাহাব।'

পালসাহাব বলল, 'কি রে হরিপদ, কী হয়েছে?'

বুকে হাত চেপে এতক্ষণ হাঁপাচ্ছিল হরিপদ। পালসাহাবের কথার জবাব না দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কান্নার দাপটে তার গলার শিরাগুলি দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠে। ঘোলা চোখ থেকে টস টস করে জল ঝরতে থাকে।

খুব জোরে কাঁদার মতো বুকের জোর নেই হরিপদর। গুঙিয়ে গুঙিয়ে দুর্বল শব্দ করে সে কাঁদে। যত না কাঁদে, তার চেয়ে অনেক বেশি হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আমার সব্বনাশ হইল সাহাব বাবা। কারো কাছে যে আমার মুখ দেখানের যো নাই। আমারে মারেন, শ্যাষ করেন। না মরা ইস্তক আমার শান্তি নাই।'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'কাঁদো মাত।'

অন্য দিন হলে থেমে যেত হরিপদ। কিন্তু আজ সে মরিয়া হয়ে কাঁদছে।

বিরক্ত গলায় পালসাহাব বলল, 'খালি খালি কাঁদবি, না আসল কথা বলবি?'

'কী আর কমু সাহাব বাবা! হগলই অদ্দিষ্ট—'

অস্থির, অবুঝ শব্দ করে কাঁদতেই থাকে হরিপদ। কপাল থাপড়ায়, চুল ছেঁড়ে, উন্মাদের মতো চিল্লায়, 'আমারে মারেন সাহাব বাবা। না মরলে এই জ্বালা আমার জুড়াইব না। হা ভগমান!'

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কুমী। হাসছিল। হরিপদর কান্নাটা যত বাড়ছিল, তার হাসি ততই সারা মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এবার সে মুখ খুলল, 'পালসাহাব, আমার কথা তো বাসি হইলে মিঠা হয়। হেই বার খবর দিতে আইছিলাম, আপনে বিশ্বাসই করলেন না।'

'কিসের খবর?'

চোখের তারা দু'টো নাচাতে নাচাতে কুমী বলে, 'আন্দাজ করেন দেখি, কিসের খবর?'

'শালী তামাশা করবি, না বলবি?'

'কই পালসাহাব। অত উচাটন হইলে চলে! রসের কথা রসাইয়া রসাইয়া কইতে হয়। রসাইয়া রসাইয়া শুনতে হয়।' বলে একটু চুপ করে কুমী। কেমন করে কথাটা পাড়বে, মনে মনে ভেঁজে নেয়। তারপর গলা নামিয়ে শুরু করে, 'হেই দিন আপনেরে তিলি আর জামাইর কথা কইছিলাম, মনে পড়ে?'

'হাঁ।'

'আপনে তহন আমারে খেদাইয়া দিলেন। কিন্তুক অহন—'

'এখন কী?'

কুমী বলে, 'হেই দিন কইছিলাম, যেদিন ফল ফলব, হেই দিন আপনেরে কাছে আসুম। অহন সত্যই ফল ফলছে গো পালসাহাব।'

'কী বলছিস কুত্তী?' কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না পালসাহাব। হরিপদর কান্না আর তিলির রকম সকম দেখে সে তাজ্জব বনে গিয়েছে।

কুমী বলল, 'তা হইলে সিধা কথাখান সিধা কইরাই কই। আপনে তো হেই দিন আমার কথায় গাও করলেন না। বিশ্বাস করলেন না। যদি বিশ্বাস কইরা বিহিত করতেন, তিলি পোয়াতি হইত না। তিলির প্যাটে ছাও আইত না।'

'কী বলছিস শালী! শাদি-হওয়া লেড়কির পেটে বাচ্চা আসবে না! এ তো দুনিয়ার কানুন।'

'ঠিক কথা পালসাহাব। তবে—'

'তবে আবার কী?'

'তিলির প্যাটের ছাও হরিপদ ভাইর না।'

'তবে কার?'

'জামাইর—উই যুগেনের।'

'ঝুট।' পালসাহাব গর্জে উঠল।

'মিছা আমি কই না পালসাহাব। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, হরিপদ ভাইরে জিগান।'

হরিপদর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল পালসাহাব, 'কি রে হারামী, কথাটা সচ না ঝুট?'

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল হরিপদ। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, 'হ বাবা, সত্যই।'

'তুই ঠিক জানিস, তিলির পেটের বাচ্চা তোর না?'

হরিপদ ককিয়ে উঠল, 'না-না-না, উই ছাও আমার না। আইজ পাচ মাস আমরা একঘরে থাকি না। হেয়া ছাড়া—' বলতে বলতে সে থেমে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'সাহেব বাবা, আমি ব্যারামী মানুষ। পোলার সাধ আমার আছে, কিন্তুক সাধখান মিটানের উপায় নাই।'

আগেই দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল হরিপদ, এবার বসে পড়ল। ফোঁপানির দমকে তার রুগ্ণ শরীরটা থরথর কাঁপতে লাগল।

কুমী বলল, 'এইবার বিশ্বাস হইল তো বাবা?'

'থাম বদ আওরত!' পালসাহাব চিৎকার করে উঠল। তার চোখের তারা দু'টো জ্বলতে থাকে। নাকের পাঁশুটে রোঁয়াগুলো নড়তে থাকে। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে একটা জখমী জানোয়ারের মতো সে ফোঁসে আর গজরায়, 'ওই কুত্তা আর কুত্তীর জান তুড়ব। জরুর।'

বেলা অনেকটা বেড়েছে। রোদ চড়ছে দ্রুত। নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটির দ্বীপ তেতে উঠতে শুরু করেছে।

ফুঁসতে ফুঁসতে একসময় হরিপদর দিকে তাকাল পালসাহাব। দু'হাতে তাকে টেনে তুলল। বলল, 'চল, শালীকে তুড়ে আসি।'

'না বাবা, আমি আর উই পুরীতে যামু না। আমি মরতেই চাই। মরণের লেইগাই আমি বাইর হইছি। যেইদিকে দুই চৌখ যায়, আমি চইলা যামু। উই নরকে আর ফিরুম না।' হরিপদর গলাটা হঠাৎ দৃঢ় শোনায়। এ ব্যাপারে সে যেন মনস্থির করে ফেলেছে।

পালসাহাব তার ওপর জোর খাটাল না। সস্নেহে কোমল গলায় বলল, 'ঠিক হ্যায়, তিলির কাছে তোর যেতে হবে না। আমিই যাব। তুই আমার ঝুপড়িতে চল, সেখানেই থাকবি।'

হরিপদ আর কুমীকে নিয়ে নিজের ঝুপড়িতে ফিরল পালসাহাব।

হরিপদকে মা-তিনের জিম্মায় রেখে কুমীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পালসাহাব।

কিন্তু সেটেলমেন্টের কোথাও যোগেনকে পাওয়া গেল না। উদ্ধব বৈরাগী বলল, যোগেন নাকি সকালে উঠে এরিয়াল উপসাগরে মাছ মারতে গিয়েছে।

যোগেনকে না পেয়ে তিলির কাছে এল পালসাহাব।

এখন দুপুর। সূর্যটা সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে।

তিলি উঠোনের এক পাশে চুপচাপ বসে ছিল। পালসাহাবকে দেখে খুব শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানতাম, আপনে আইবেন। আহেন আহেন।'

পালসাহাব সামনে এসে দাঁড়াল। পিছু পিছু কুমীও।

একদৃষ্টে তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে পালসাহাব। আশ্চর্য! সে মুখে ভয়-ডর, লজ্জা শরম, কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। একেবারেই নির্বিকার, কঠিন একটি মুখ।

পালসাহাব বলল, 'আমি কিসের জন্যে এসেছি, জানিস মাগী?'

'জানি।'

'শালী তোর ডর নেই?'

'কিসের ডর?' ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল তিলি।

'মাগী রেন্ডি—কিসের ডর, পুছতে শরম লাগে না?'

'না।' বেপরোয়া গলায় বলে তিলি, 'কোনো কিছুতে আমার ডর নাই, শরম নাই।'

পালসাহাব অবাক হয়ে যায়। স্বামী থাকতে পরের ছেলে নিজের পেটে ধরে এতখানি ডাকাবুকো হওয়ার সাহস কেমন করে পায় তিলি! সে বলে, 'জানিস, তুই যে কামটা করেছিস সেটা বহুত বুরা?'

'জানি।'

'সব জেনেশুনে অ্যায়সা কাম করলি!'

'করলাম।' তিলির কটা চোখের তারায় অদ্ভুত একটু হাসি চিক চিক করে। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে, 'করলাম তো।'

'শালী রেন্ডি, করলি তো!' পালসাহাব ফুঁসে উঠল। নাকের পাঁশুটে রোঁয়াগুলো জোরে জোরে নড়তে লাগল তার।

লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে করতে সে গজরায়, 'মাগী, এ হল ডিগলিপুর। আমার এলাকা। এখানে বদ কাম চলবে না। হাঁ—'

সোজাসুজি তিলির সামনে এসে দাঁড়ায় পালসাহাব। তার দিকে তাকিয়েই থাকে। কিন্তু তিলির এতটুকু অনুতাপ নেই। সে গার্ভিণী হয়েছে কিন্তু এই গার্ভিণী হওয়ায় গৌরব নেই, মহিমা নেই, তবু তার বুক কাঁপে না। তার গর্ভিণী হওয়ার খবর কুমীর মারফত ডিগলিপুরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তিলির।

পালসাহাবের গজরানি ফোঁসানি শাসানি, কিছুই পরোয়া করে না সে। লজ্জা নিন্দা ভয় ধিক্কার, সব কিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে মেয়েটা বসে আছে।

পালসাহাব তাজ্জব বনে যায়।

হোক নিন্দার, হোক লজ্জার, হোক ধিক্কারের, তবু তো গর্ভিণী হয়েছে তিলি। আর সেই গৌরবে পৃথিবীর কোনো কিছুকে, এমনকি পালসাহাবকে পর্যন্ত গ্রাহ্যই করছে না। মনের এতখানি জোর কোত্থেকে পেল তিলি?

একদৃষ্টে তিলির মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে পালসাহাব।

হঠাৎ তীব্র রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। বলল, 'কী দ্যাখেন পালসাহাব? সোয়ামী থাকতে পরের পুত প্যাটে ধরলে মাইয়া মানুষরে ক্যামন দেখায়?'

পালসাহাব থতমত খায়। কী করা উচিত, কী বলা উচিত, ঠিক করে উঠতে পারে না।

তিলি বলে, 'কথা ক'ন না ক্যান পালসাহাব? মুখে বুঝি কথা যোগায় না?'

একটু চুপ।

তারপর হঠাৎ বিষণ্ণ গলায় পালসাহাব বলল, 'তুই অ্যায়সা বদ কাম করলি কেন তিলি?'

তিলি হাসি থামিয়ে বলল, 'বহেন পালসাহাব, বহেন। আমি বেবাক কমু। কিছু লুকামু না।'

তিলির পাশে ঘন হয়ে বসল পালসাহাব। কুমী দাঁড়িয়ে ছিল। পালসাহাবের দেখাদেখি সেও বসে পড়ল।

তিলি বলতে লাগল, 'এক দিন না, দুই দিন না, পনের বচ্ছর আমাগো বিয়া হইছে। এতগুলান বচ্ছরে সোয়ামীর মুখ থিকা একখান মিঠা কথা শুনি নাই। সোয়ামী-সুখ কারে কয়, কুনো দিন বুঝলাম না। ভাবছিলাম, পুতের সুখ দিয়া সোয়ামীর দুঃখু ভুলুম। আশায় আশায় বুক বানছিলাম। কিন্তুক ভগমান সেই আশায় ছাই দিছে।' তিলির গলাটা ভাঙা-ভাঙা, কাঁপা-কাঁপা, আবেগে অস্থির। সে থামে না, 'পনর বচ্ছর ঘর কইরা সোয়ামীর মাইরই খালি খাইছি। একদিনের লেইগা না পাইছি সুখ, না এট্টা পোলা। দিনরাইত খালি সন্দ আর সন্দ। এইভাবে আর তার লগে থাকন যায় না পালসাহাব। তাই—'

বিড় বিড় করে পালসাহাব কী যেন বকে, বোঝা যায় না।

তিলি আবার শুরু করে, 'আমি জানি, সোমাজের কাছে, সোমসারের কাছে, পিরথমীর হগলের কাছে আমি যা করছি তা হইল মোন্দ। কিন্তুক এ ছাড়া আমার যে বাচনের পথ নাই।'

'কিঁউ?'

ধরা ধরা গলায় তিলি বলে, 'অহন না পালসাহাব, অন্য সময় কমু। অহন মন আমার বশে নাই।'

সূর্যটা দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে।

যতদূর তাকানো যায়, বিপুল আকাশের কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। শুধু নীল—অফুরন্ত, আদিগন্ত, সীমাহীন নীল। আকাশের নীল এখন আশ্চর্য ঝকমকে। কিন্তু বড় কোমল।

বিড় বিড় করে পালসাহাব বকে, 'দুনিয়ার সব শালের পিছনে এক কিস্‌সা। দুঃখের কিস্‌সা।'

আটচল্লিশ

পুরো দিনটা গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদল হরিপদ। টেনে টেনে নিজের চুল ছিঁড়ল। খেল না, শুল না, কারো কথা কানে তুলল না।

পালসাহাব অনেক বোঝাল, মা-তিন বোঝাল। কিন্তু যে জেদ ধরেছে কিছুই শুনবে না, বুঝবে না, তাকে বোঝানো, শোনানো সহজ কথা নয়।

পালসাহাব বলে, 'যা হবার তা হবে। আভী কুছ খেয়ে নে হরিপদ। নিজেকে তখলিফ দিয়ে কুছ ফায়দা নেই।'

'না, না—না পালসাহাব, আমার খাওনের সাধ নাই, শোওনের সাধ নাই, বাচনের সাধ নাই। আমি মরুম, মরা ছাড়া আমার গতি নাই। না মরলে আমার জ্বালা ঘুচব না।' হরিপদ যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। তার রুক্ষ ফেঁসোর মতো চুল উড়ছে। নিজেকে আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছে সে। সারা দেহে রক্ত জমাট হয়ে আছে। চোখ দু'টো ফোলা ফোলা, লালচে।

হরিপদ কপাল থাপড়ায় আর সরু দুর্বল গলায় চেঁচায়, 'হা ভগমান, আমার কী হইব? মাইনষের কাছে ক্যামনে বাইর হমু? ক্যামনে পিরথিমীরে মুখ দেখামু?'

পালসাহাবের ঝুপড়ির বারান্দায় সমস্ত দিন উথলপাথল হয়ে কাঁদল হরিপদ। তার অশক্ত, জিরজিরে শরীর নিঙড়ে গোঙানির মতো ক্ষীণ, অবুঝ এবং একটানা আওয়াজ বেরুতে লাগল।

অনেক বুঝিয়েও যখন কাজ হল না তখন হরিপদর পাশে চুপচাপ, বিমর্ষ মুখে বসে রইল মা-তিন আর পালসাহাব। হরিপদর মতো তাদেরও আজ খাওয়া হল না।

দিনটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে একসময় ফুরিয়ে গেল। রাত নামল। রাতও একসময় শেষ হয়।

সব কিছুর শেষ আছে, কিন্তু কান্নার নেই। কান্না কখনও ফুরোয় না।

দু'দিন কিছুই খেল না হরিপদ। পালসাহাবের ঝুপড়ির বারান্দায় বসে কখনো গলা ফাটিয়ে, কখনো বা নিঃশব্দে কেঁদে গেল। তার চোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরতেই লাগল।

আশ্চর্য! তৃতীয় দিন সকালে উঠে পালসাহাব দেখল, বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে হরিপদ। কাঁদছে না, ককাচ্ছে না। মুখেচোখে কোথায়ও তার একটুকু অস্থিরতা নেই।

পালসাহাবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অল্প হাসল হরিপদ। হাসিটা কেমন যেন।

আস্তে আস্তে হরিপদর পাশে এসে দাঁড়াল পালসাহাব। তার কাঁধে একটা হাত রেখে গাঢ় গলায় বলল, 'কুছ বলবি?'

'হ পালসাহাব—' হরিপদ মাথা নাড়ল, 'দুই দিন কিছু খাই নাই। বড় খিদা পাইছে।'

'খাবি?'

'খামু না? না খাইলে বাচুম ক্যামনে?' অদ্ভুত শব্দ করে সে হাসতে থাকে।

তীক্ষ্ণ চোখে পলকহীন কিছুক্ষণ হরিপদর দিকে তাকিয়ে থাকে পালসাহাব। যে হরিপদ এই দু'দিন সমানে মরতে চেয়েছে, সে-ই এখন বাঁচতে চায়। পালসাহাব ভাবতে চেষ্টা করল, লোকটার মাথা আদৌ ঠিক আছে তো!

হরিপদ বলল, 'কী দ্যাখেন পালসাহাব?'

'কুছু না, কুছু না। আভী তোর খানা আনছি।' পালসাহাব ঝুপড়িতে গিয়ে ঢুকল। একটু পর কাঠের থালায় খান কয়েক চাপাটি আর খানিকটা শুকনো ভাজি নিয়ে বেরিয়ে এল। হরিপদর সামনে থালাটা রেখে বলল, 'খা।'

খাওয়ার পর হরিপদ বলল, 'একখান কথা কমু পালসাহাব?'

'বল।' হরিপদর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল পালসাহাব।

কেশে গলা সাফ করে নেয় হরিপদ। তারপর শুরু করে, 'পালসাহাব, আমি অনেক ভাবলাম। এ ভালাই হইল। এই বুঝিন ভগমানের মাইর। এই তার বিচার।'

'কী বলছিস!' বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল পালসাহাব।

'পালসাহাব, কুনোদিন তিলিরে একখান মিঠা কথা কই না। এট্টু সুখ কি একখান পুত, কিছুই দিতে পারি নাই। হেয় আমারে খালি দিছে, আমি নিছি। বদলে তারে আমি সন্দ করছি, দিন রাইত খিচির খিচির করছি, গাইল দিছি, ঘর থিকা বাইর কইরা দিছি।'

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার ধকলে খুব একচোট হাঁপায় হরিপদ। ফের বলে, 'কিছুই তারে দিতে পারি নাই। না একখান ভালা মন, না একখান ভালা শরীল। ব্যারামই আমারে শ্যাষ করল। আমার শরীলে ব্যারাম, মনে ব্যারাম, ব্যারাম আমার সবখানে।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে পালসাহাব।

হরিপদর স্বরে আবেগ নেই, অস্থিরতা নেই, কাঁপুনি নেই। শান্ত, স্থির, উদাসীন গলায় সে বলে, যায়, 'এই ভালা হইল পালসাহাব, এই ভাল হইল।'

'কী ভাল হল রে হরিপদ?'

'আমি তো মইরাই আছি। আমার কুনো আশা নাই। যে কাল ব্যারাম শরীলে বাসা বানছে হেয়া কুনোদিনই সারব না। আমি মরুমই। কিন্তুক তিলি বাচুক। অর ভরা শরীল, ভরা যৈবন, ভরা মন। আমার লেইগা তিলি ক্যান মরব? না না, তিলি বাচুক। আপনে তার বিহিত কইরা দ্যান।'

'আমি কী করব?'

'তিলির লগে যুগেনের বিয়া দ্যান। অরা একজন আর একজনেরে ভালবাসে। ওগো অনেক কালের পিরীত, অনেক কালের জানাশুনা, অনেক কালের বুঝাপড়া। অরা বিয়া করলে সুখী হইব, অগো জীবন ভইরা উঠব।'

'লেকিন তুই?'

'আমি কী? আমি—' ঠোঁট দু'টো থরথর কাঁপে হরিপদর। ঘোলাটে চোখের কোলে বেয়ে নোনা জল টস টস করে ঝরতে থাকে। গলাটা বুজে আসে। ভাঙা কাঁপা স্বরে সে বলে, 'আমি কিছু না পালসাহাব, কেউ না। আমার লেইগা আপনে ভাইবেন না। আমি—আমি চিরটা কাল তিলির বুকে কাটার মত বিন্ধা (বিঁধে) আছি। আর না। এইবার আমি—' বলতে বলতে গলাটা ধরে যায়। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে হরিপদ। কান্নাভরা গলায় এরপর বিড় বিড় করে কী যে বলে, বোঝা যায় না।

হরিপদর পিঠে একটা হাত রেখে নীরবে বসে থাকে পালসাহাব। সকাল বেলাতেই আজ তার মনটা ভারি খারাপ হয়ে যায়।

বিকেলের দিকেও যোগেনের খোঁজে বেরিয়েছিল পালসাহাব। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। জঙ্গলের ভেতর অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। আর সেই অন্ধকার বিঁধে বিঁধে হাজারটা জোনাকি জ্বলছে, নিবছে। নিবছে, জ্বলছে।

ঝুপড়ির কাছের সেই ঢালু খাদটার সামনে এসে পালসাহাব ডাকতে শুরু করল, 'মা-তিন. এ মা-তিন--'

জবাব মিলল না।

পালসাহাব গলা চড়াল, 'এ মাগী, জলদি লালটিন (লণ্ঠন) নিয়ে আয়।'

এবারও জবাব নেই।

পালসাহাব গজ গজ করতে লাগল, 'মাগীর সব ভাল। লেকিন নিদটা বহুত খারাব। দিন যেই খতম হল, আন্ধার যেই নামল, অমনি কুত্তীটা বিস্তারায় (বিছানায়) গিয়ে পড়ল।'

আরো কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে খাদে নামল পালসাহাব। খাদ পেরিয়ে ঝুপড়িতে এসে দেখল, মা-তিন নেই. হরিপদও না।

পালসাহাব চিল্লাতে লাগল, 'এ মা-তিন কুত্তী এ হরিপদ কুত্তা—'

অনেকক্ষণ খুঁজেও আজ যোগেনকে পায় নি পালসাহাব। সেই যে দিন দুই আগে ডিগলিপুরের খালে মাছ মারতে বেরিয়েছিল, আজও সে ফেরে নি। ফলে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে পালসাহেবের। যোগেনকে না পেলে সমস্যার সমাধান হয় কী করে?

তিলি যোগেন আর হরিপদ, তিনটি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কটা জটিল এবং অস্বাভাবিক হয়ে রয়েছে, যোগেনকে পেলে তা সহজ এবং স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু তাকে পাওয়া না গেলে কী করা যায়? বিরক্ত গলায় পালসাহাব একা একা বিড় বিড় করতে থাকে।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার আরো ঘন হচ্ছে। জোনাকিরা সমানে জ্বলে আর নেবে। জ্বলা আর নেবায় তাদের ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই।

জঙ্গলের দিক থেকে গন্ধি আর বাড়িয়া পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসছে। চামড়ায় হুল ফুটিয়ে পালসাহাবকে অস্থির করে তুলছে।

জঙ্গলের মাথায় সিন্ধুসারসগুলো ডানা ঝাপটায়। মাঝে মাঝে কর্কশ শব্দ করে ডেকে ওঠে, 'ক্রক—ক্রক—ক্রক—'

হঠাৎ পালসাহাবের চোখে পড়ল, সামনের খাদ বেয়ে একটা মশাল উঠে আসছে। সে হাঁকে, 'কৌন রে?'

'আমি—' গলার স্বরেই চেনা গেল। মা-তিন।

একসময় মা-তিন আর মশালটা পালসাহাবের সামনে এসে পড়ল।

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

'হরিপদকে ঢুঁড়তে।'

'হরিপদকে ঢুঁড়তে!' পালসাহাব চমকে উঠল, 'হরিপদ কোথায়?'

'কোথায়, আমি কি জানি।' মা-তিন বলতে লাগল, 'বিকেলে তুই বেরুবার পর আমি নদীতে পানি আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, ও নেই। ইধর উধর জঙ্গলে বহুত ঢুঁড়লাম, লেকিন হারামীটাকে পেলাম না।' মা-তিনের কণ্ঠস্বর হতাশ শোনাল, 'কোথায় যে ভাগল হরিপদ!'

'চল—চল—' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পালসাহাব। মশালসুদ্ধ মা-তিনের একটা হাত ধরে টানতে টানতে সেটেলমেন্টে চলে আসে। হারান, চন্দ্র জয়ধর, উদ্ধব বৈরাগী, রসিক শীল—এমনি জন বিশেককে ডাকাডাকি করে বিশটা মশাল ধরিয়ে চারপাশের জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি শুরু করল।

বিশজন মানুষ সমস্ত রাত খুঁজল। কিন্তু হরিপদকে পাওয়া গেল না। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কোথাও তার চিহ্ন নেই।

অগত্যা ভোরের দিকে যে যার ঘরে ফিরল।

মা-তিনকে নিয়ে টলতে টলতে নিজের ঝুপড়িতে চলে এসেছে পালসাহাব। বারান্দার পাটাতনে ঝিম মেরে বসে রইল সে।

সমস্ত রাত জঙ্গলে জঙ্গলে কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে চামড়া ফেঁসে গিয়েছে। খাবলা খাবলা মাংস উঠেছে। পাথরে টক্কর খেয়ে পায়ের নখ থেঁতলে গিয়েছে। সারা দেহে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

চোখা চোখা দাড়িগোঁফে পালসাহাবের মুখটা কর্কশ দেখায়। লম্বা লম্বা তামাটে চুল তার কপাল চোখ এবং গালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ দু'টো টকটকে লাল। মনে হয় দু'পিন্ড তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এখনো ঠিকমতো সকাল হয় নি।

রোদ ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে আকাশ এখন আবছা আবছা, আলো-আঁধারিতে দুর্বোধ্য।

আকাশের দিকে তাকিয়ে গাঢ়, মন্থর দীর্ঘশ্বাস ফেলল পালসাহাব। হরিপদর জন্য অদ্ভুত এক দুঃখ তাকে অস্থির আর অভিভূত করে ফেলেছে।

রুগ্ণ দেহ আর রুগ্ণ মন নিয়ে জীবনকে আদৌ ভোগ করতে পারল না হরিপদ। সুস্থ জীবন তার আয়ত্তের বাইরেই থেকে গেল। রোগের জন্য এই পৃথিবীতে কেউ তার আপন নয়। এমনকি নিজের বিয়ে-করা বউ পর্যন্ত তাকে অগ্রাহ্য করে পরের ছেলে পেটে নিয়ে গর্ভিণী হয়ে বসেছে। তিলির কাছে চরম মার খেয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের ক্ষীণ, অসহায় অস্তিত্বকে সে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলেছে।

কোথায় হরিপদ চলে গিয়েছে, কে জানে। ডিগলিপুরের সেটেলমেন্ট থেকে এই প্রথম একটা মানুষ হারিয়ে গেল।

বারান্দার পাটাতনে ঝিম মেরে বসে থাকে পালসাহাব। হরিপদর জন্য কষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য, সব দুঃখ ছাপিয়ে বিচিত্র এক অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পালসাহাব ভাবছিল, এ বুঝি ভালই হল। হরিপদকে নিয়ে সে কী করবে? যে মানুষ এক পরল মাটি কোপাতে পারবে না, একটা ঘর ছাইতে পারবে না, উর্বরা নারীর গর্ভে সন্তান আনতে পারবে না, তাকে নিয়ে কী করবে পালসাহাব?

হরিপদ চলে গিয়েছে। এ একরকম ভালই হল।

বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়ার ব্যাপারে যার কোনো ভূমিকাই নেই তার চলে যাওয়াই হয়তো ভাল।

পালসাহাবের এই দ্বীপে সুস্থ, সবল, তাজা মানুষ ছাড়া আর কারো ভূমিকা নেই, প্রয়োজনও নেই।

উনপঞ্চাশ

হারান হন্যে হয়ে উঠেছে।

বর্ষার গোড়ায় গোড়ায় পানিকররা সেই যে ডিগলিপুর এসেছিল, এখনো যায় নি। নিত্য ঢালীর ঘরে তারা জাঁকিয়ে বসেছে।

আশ্বিন মাস যায় যায়। রোজই একবার নিত্য ঢালীর বাড়ি আসে হারান। ঠিক বাড়িতে ঢোকে না। দূরে, সেই ডালপালা-পোড়া কবন্ধ প্যাডক গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করে।

উঠোনে বসে সিপি সাফ করে তিন জন।

দিন পাঁচেক হল পালসাহাব সেটেলমেন্টে নেই। ফের কী একটা কাজে পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছে।

লা তে, নিত্য ঢালী আর পানিকর। কাজ করতে করতে ফাঁক বুঝে পানিকর উঠে পড়ে। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে বসে। রসের কথা রঙ্গের কথা বলে কাপাসীকে মজিয়ে রাখে। শুনতে শুনতে আচমকা তীব্র হাসিতে মেতে ওঠে কাপাসী।

দূর থেকে কাপাসীর হাসি আর মাতামাতি দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে হারানের। দুঃখ-যন্ত্রণা-কান্নায় মেশা অসহ্য এক অনুভূতি পাকিয়ে পাকিয়ে গলার গাছে এসে আটকে যায়। হাজার ঢোক গিলেও সেটা নামানো যায় না।

চোখ দু'টো জ্বালা জ্বালা করে। একসময় নিত্য ঢালীর উঠোন, ঘর, পানিকর, লা তে, কাপাসী—কিছুই যেন দেখতে পায় না হারান। চোখের সামনে থেকে সব যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কবন্ধ গাছটার আড়াল থেকে টলতে টলতে কোনোদিন নিজের ঘরে ফেরে, কোনোদিন বা যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যায় হারান।

রোজই তাকে তাকে থাকে হারান। কিন্তু না, ঠিক সুবিধামতো একদিনও কাপাসীকে ধরতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল সে।

কী একটা দরকারে আজ সকালে তিন জন, অর্থাৎ পানিকর লা তে আর নিত্য ঢালী মায়াবন্দর গিয়েছে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। সুযোগ বুঝে হারান এল।

উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করছিল কাপাসী। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল, 'তুমি!'

'হ, আমি। চিনতে অসুবিধা হয় নিকি?'

কাপাসী জবাব দিল না। মুখ নামিয়ে শাড়িতে ফোঁড় দিতে লাগল।

নীরস, কঠিন গলায় হারান বলল, 'শোন—'

মুখ না তুলেই কাপাসী বলল, 'কও—'

'মুখ তোল।'

'মুখ দিয়া তো শুনুম না, শুনুম কান দিয়া। তুমি কও—'

কাপাসীর মুখোমুখি বসে পড়ল হারান। বলল, 'তোমার লগে আমার বুঝাপড়া আছে।'

'কিসের বুঝাপড়া?' দাঁতে সুতো কাটতে কাটতে বার তিনেক একই কথা বলে কাপাসী, 'কিসের আবার বুঝাপড়া? তুমি আমাগো পিছে লাগছ। আমরা নিকি মোন্দ মতলবে পানিকর ভাইগো ঘরে আইনা তুলছি। কুলোনির বেবাক মাইনষের কাছে তুমি আমাগো নামে কুকথা রটাইয়া বেড়াও। হগলই কানে আসে।' বলতে বলতে একটু থেমে কী ভাবে কাপাসী। পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'তোমার লগে কিসের কথা! কুনো কথা নাই, কুনো বুঝাপড়া নাই।'

ভারী, থমথমে গলায় হারান বলল, 'কী দুঃখে যে তোমাগো পিছে লাগছি তা যদি বুঝতা কাপাসী! তা বোঝনের মন যদি তোমার থাকত!'

'কী কও তুমি বুঝি না।' অবাক হয়ে হারানের দিকে তাকায় কাপাসী।

'ঠিকই কই।' গাঢ় গলায় হারান বলতে থাকে, 'তুমি বেবাক ভুলছ কাপাসী। হেই দিনগুলানের কথা তোমার মনে নাই?'

ফিস ফিস করে কাপাসী বলে, 'কিছুই ভুলি নাই পুরুষ। হগল কথা মনে আছে।'

'ভুইলাই যদি না থাক তবে আমার উপুর এমুন বৈমুখ হইছ ক্যান? আমার লেইগা তোমার হেই টান নাই, হেই তাপ নাই।'

'আছে আছে।' মুখ নামিয়ে আধফোটা গলায় কাপাসী বলতে থাকে, 'তাপ আছে, টান আছে। তোমার লেইগা আমার হগল আছে।'

'হে তো মুখের কথা।'

'না গো, পরাণের কথা।'

'বিশ্বাস হয় না।'

'ক্যান?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারান বলে, 'আমার উপুর তোমাঁর টান যদি থাকতই, বিদ্যাশি বিজাতিরে ঘরে জাগা দিতা না। মন দিতা না।'

'বিদ্যাশি বিজাতি আবার কে আইল!'

'রঙ্গ কইরো না কাপাসী।' রুক্ষ গলায় হারান বলে, 'উই পানিকর আর লা তে বুঝি তোমাগো স্বজাতি! কুন কালের বান্ধব?'

সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছিল দু'জনে। হারান আর কাপাসী পরস্পরের প্রাণের তাপ পাচ্ছিল। একই আবেগ দু'জনের বুকের ভেতর তির তির করে কাঁপছিল যেন।

হঠাৎ তাল কাটল। ভুরু দু'টো কুঁচকে, চোখের তারা স্থির করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাপাসী। বলল, 'পানিকর ভাই স্বজাতির থিকা বড়। আত্মবান্ধবের থিকা বড়।'

হারান ভেংচে উঠল, 'তা হইলে যা শুনছি মিছা না?'

'কী শুনছ?'

'পানিকর নিকি আর তোমার ভাই থাকব না, অন্য কিছু হইব।'

'বাহারের কথাই তো শুনছ!' আচমকা হারানকে ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে মেতে মেতে, ঢলে ঢলে হেসে উঠল কাপাসী।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল হারান।

হাসতে হাসতে কাপাসী বলল, 'চললা?'

'হ, চললাম।' দুঃখে ক্ষোভে মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে হারানের। রূঢ় গলায় বলল, 'তোমার কাছে আর কুনোদিন আহুম না।' বলেই সামনের উতরাই বেয়ে তর তর করে নামতে লাগল।

হাসির দাপটে শরীরটা দুমড়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই কাপাসী বলল, 'যাইও না। আমি পাগল মানুষ, কী কইতে কী কইছি।'

হারান খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি যদি পাগল হও, দুনিয়ার বেবাক মানুষ পাগল।' সে চলে গেল।

উঠোনের নরম মাটিতে নখ দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে কাপাসী বিড় বিড় করে, 'বুঝলা না, আমারে বুঝলা না পুরুষ।'

পঞ্চাশ

যে মতলব নিয়ে পানিকর ডিগলিপুর সেটেলমেন্টে এসেছিল, পুরোপুরি তা হাসিল হল না। অথচ এখানে থাকার মেয়াদও তার ফুরিয়ে এসেছে।

বর্ষার মুখে বাক্স বাক্স সিপি আর লা তে'কে নিয়ে নিত্য ঢালীর ঘরে উঠেছিল পানিকর। এখন তৃতীয় ঋতু যায় যায়। এর মধ্যে সিপি সাফ হয়ে গিয়েছে।

সিপি সাফ করাটা ছিল অছিলা। এই করে যতদিন ডিগলিপুর থাকা যায়।

পানিকররা কম দিন রইল না সেটেলমেন্টে।

এখানে থাকার মেয়াদ ফুরোচ্ছে কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আসা তা সফল হচ্ছে না।

পানিকর অনেক বার বলেছে, 'নিত্য চাচা, কলোনির সবার সাথ আমার জান পয়চান করিয়ে দাও।'

নিত্য ঢালী বলেছে, 'উই কথা মুখেও আনবেন না পানিকর বাবা।'

'এ বাত বলছ কেন চাচা?'

'সাধে কি আর কই বাবা, বড় দুঃখে কই।' বেজার গলায় নিত্য ঢালী বলেছে, 'আপনে বিদ্যাশি বিজাতি, আপনেরে কেউ দুই চৌখে দেখতে পারে না।'

পানিকর জিজ্ঞেস করেছে, 'আমার কসুর কী?'

'তা জানি না বাবা। আপনেরে ঘরে আইনা তুলছি, হেইতেই কুলোনির মানুষ আমার উপুর খেইপা আছে।'

অস্ফুট শব্দ করে পানিকর কী বলেছে, বোঝা যায় নি।

নিত্য ঢালী থামে নি, 'কাম নাই পানিকর বাবা, কারো লগে আলাপ পরিচয় করনের কাম নাই। যারা আপনেরে চায় না, তাগো কাছে গিয়া কী লাভ? আপনে আমার কাছেই থাকেন।'

অগত্যা চুপ করে গিয়েছে পানিকর। ডিগলিপুর সেটেলমেন্টের কেউ যে তাকে পছন্দ করে না, এই সাদামাঠা সহজ কথাটা আঁচ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি তার।

নিত্য ঢালীর উঠোনে বসলে সামনের ঢালু পথটা দেখা যায়। পথটা দু'টো টিলার মাথায় পাক খেয়ে কিলপঙ নদীর দিকে চলে গিয়েছে। সকাল বিকেল ডিগলিপুরের যুবতী বৌ-ঝিরা সেই পথটা ধরে কিলপঙ নদীতে জল আনতে যায়। একদৃষ্টে তাদের দেখে পানিকর। চোখের তারা দু'টো সাপের চোখের মতো জ্বলতে থাকে।

ডিগলিপুরের বউ-ঝিদের দেখে আর হতাশায় আক্রোশে হাত-পা কামড়ায় পানিকর। তাদের কাছে ঘেঁষার যো নেই। হাত-পা কামড়ানো ছাড়া পানিকরের উপায়ই বা কী। নিত্য ঢালী যদি সবার সঙ্গে আলাপটা অন্তত করিয়ে দিত।

আধারকর বলেছিল, এক একটা জোয়ানী লেড়কী বাগিয়ে আনতে পারলে হাজার টাকা মিলবে। আধারকরের কথা ভাবতে ভাবতে উন্মাদের মতো হয়ে উঠেছে পানিকর।

এখন দুপুর।

আকাশে দু'চার টুকরো হানাদার মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। নৈর্ঋত কোণ থেকে মেঘগুলি উঠে এসে বায়ু কোণে চলেছে।

মেঘের সঙ্গে যুঝে যেটুকু রোদ এই দ্বীপে আসতে পেরেছে তাতে জেল্লা নেই, তাপ নেই। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে, নিস্তেজ। জঙ্গলের মাথায় কুক দিয়ে দিয়ে একটা কটৌরা পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে। দুপুরটা কেমন যেন উদাস হয়ে আছে। উঠোনের এক কিনারে সিপি গুছোচ্ছে লা তে। আর এক কিনারে ঘেঁষাঘেঁষি করে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে দুই মূর্তি। পানিকর এবং নিত্য ঢালী।

পানিকর বলল, 'সিপি তো বিলকুল সাফ হয়ে গেল।'

'হ, তা হইল।' নিত্য ঢালী কলকের খোলে মাখা তামাক ঠাসতে ঠাসতে বলল, 'এই কামে আর কয়দিন লাগে!'

পানিকর জবাব দিল না। অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

নিত্য ঢালীর তামাক সাজা হয়ে গিয়েছিল। হুঁকোটা পানিকরের হাতে দিতে দিতে বলল, 'ধরেন পানিকর বাবা, জুইত কইরা টানেন।'

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা ধরল পানিকর। ভুক ভুক করে টানতে টানতে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল, এখানে এসে লাভ হল না। ডিগলিপুরের বাসিন্দারা তাকে পছন্দ করে না। তা না করুক। কিন্তু এই যে ক'মাস সে নিত্য ঢালীর বাড়িতে রইল তাতে কম টাকা খরচ হয়েছে! মায়াবন্দর থেকে সিপি এনেছে, তার খরচ। সিপি নিয়ে যাবে, তার খরচ। নিত্য ঢালীর বাড়িতে একটা নতুন ঘর তুলেছে, তার খরচ। এই ক'মাসে নিত্য ঢালীরা দু'জন আর তারা দু'জন, মোট চারজনের খাই খরচ, সবই তো তার গাঁট থেকে গিয়েছে।

পানিকর ধূর্ত ব্যবসাদার মানুষ। দরাজ হাতে পয়সা ছড়াতে তার আপত্তি নেই, যদি সেই পয়সা দু'গুণ তিনগুণ হয়ে ফেরে। কিন্তু ডিগলিপুরে যে টাকা সে ছড়িয়েছে তা পুরো ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ। কথাটা যতই ভাবল, মাথা ততই গরম হয়ে উঠল পানিকরের।

অবশ্য তার মুঠোর ভিতর কাপাসী আছে।

কাপাসী! একটা আধা পাগল মেয়ের দাম কতটুকু? যতই হোক, আধারকরের হাতে তাকে তুলে দেবে পানিকর। লাভ না থাক, কাপাসীদের পেছনে যে টাকা সে ঢেলেছে, অন্তত তাও যদি উঠে আসে। ভাবতে ভাবতে যেন মরিয়া হয়ে উঠল পানিকর। ফিস ফিস করে ডাকল, 'নিত্য চাচা—'

পানিকরের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে টানছিল নিত্য ঢালী। আয়েস করে একমুখ গাঢ় ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কী ক'ন পানিকর বাবা?'

'সিপি সাফ হয়ে গেল। এবার তো আমাদের যেতে হবে।'

'হে তো যাইতেই হইব।' নিত্য ঢালী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

পানিকর বলে, 'লেকিন একটা বাত—'

'কী?'

'কাপাসীকে পাগলদের সিকমেনড়েরায় (হাসপাতালে) নিয়ে যাব।'

'কবে নিয়া যাইবেন?'

'দো'চার রোজের মধ্যে।'

'ভালই হইব। তা হইলে গোছগোছ আরম্ভ করি।'

পানিকর বলে, 'তুমিও যেতে চাও নাকি চাচা?'

'বাঃ, মাইয়া যাইব আর আমি যামু না! ক্যামন কথা ক'ন পানিকর বাবা! একে পাগল মানুষ, তার উপুর বস্যের (যুবতী) মাইয়া। তারে কি একা ছাড়তে পারি?'

কী একটু চিন্তা করে পানিকর। পরক্ষণে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওই দেখ, শিরটা আমার বিলকুল গড়বড় হয়ে গেছে। কী বলতে কী বলছি! তুমিও যাবে, জরুর যাবে। তুমি না গেলে চলবে না। আমি সোচলাম তুমি গেলে এই কোঠি কে দেখবে। তাই—'

একটু চুপ করে থেকে নিত্য ঢালী বলে, 'আইচ্ছা পানিকর বাবা, কাপাসী ভাল হইব? আগের লাখান হইব? পাগলামি ঘুচব?'

জবাব না দিয়ে বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠে পড়ে পানিকর। সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

আরো কিছুক্ষণ হুঁকো টানল নিত্য ঢালী। তারপর কলকেটা উপুড় করে পোড়া তামাক আর ছাই ঢেলে দিল।

উঠোনের আর এক কিনারে ঘাড় গুঁজে সিপি গুছোচ্ছে লা তে। হঠাৎ মুখ তুলে যে ডাকল, 'নিত্য চাচা—'

নিত্য ঢালী বলল, 'কী ক'স?'

'ইধর এস।'

হুঁকো কলকে রেখে লা তে'র পাশে গিয়ে বসল নিত্য ঢালী। লা তে বলল, 'মালেক তোমাকে কী বলল?'

'কী আর কইব? আমারে আর কাপাসীরে নিয়া পানিকর বাবায় পাগলগো হাসপাতলে যাইব।'

লা তে বলল, 'অ্যায়সা কাম করো না চাচা। বহুত মুশকিলে পড়ে যাবে।'

'কী ক'স তুই!'

'ঠিক কথাই বলি। তুমি মালেকের সাথ যেও না চাচা।'

নিত্য ঢালী ভেংচে উঠল, 'আমার ভাল হয়, পিরাথিমীর কেউ চায় না। কাপাসী ভাল হউক, কেউ চায় না। বেবাকে আমার শত্তুর। পানিকর বাবার লগে আমি যামু, একশত্ বার যামু। সিধা কথা।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নিত্য ঢালী।

একান্ন

হারান যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

সেদিন কাপাসীকে বলে এসেছিল, আর কোনোদিন তার কাছে যাবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। হঠাৎ একদিন ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের, অর্থাৎ রসিক শীল, বুড়ি বাসিনী, উদ্ধব বৈরাগী, এমনি দশ বারো জনকে জুটিয়ে, তাদের তাতিয়ে, নিত্য ঢালীর বাড়িতে এসে উঠল হারান।

দু' একদিনের মধ্যে নিত্য ঢালীরা পানিকরের সঙ্গে রওনা হবে। তাই বোঁচকা বুঁচকি বাঁধার কাজ চলছিল।

পানিকর আর লা তে উঠোনে বসে বিরাট বিরাট টিনের বাক্সে সিপি সাজিয়ে রাখছিল। লোকজন দেখে তারা নতুন ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

বুড়ী বাসিনী ডাকাডাকি শুরু করল, 'নিত্যা, নিত্যা রে—'

'কে?' বাঁধাছাঁদা স্থগিত রেখে বাইরে বেরিলে এল নিত্য ঢালী। এক সঙ্গে এতগুলো মানুষকে দেখে একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, 'তোমরা এতজনে!'

বাসিনী বলল, 'হ, এতজনেই আইলাম।'

'কী মনে কইরা?'

'আইলাম রঙ্গ দেখতে। তুই তো আর ডাইকা আনলি না। আমাগোই আসতে হইল।'

বুড়ি বাসিনী বলতে লাগল, 'শুনলাম বিজাতি বিদ্যাশির লগে কুটুম্বিতা পাতাবি।'

'কে কইল?'

'কে না কইল? ডিগলিপুরের হগলেই এই কথা জানে।'

এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে নিত্য ঢালী। করুণ গলায় সে বলল, 'তোমরা কি আমারে এট্টু শান্তিতেও থাকতে দিবা না! তোমাগো কী করছি আমি?'

'তরেই বা আমরা কী করছি?'

নিত্য ঢালী জবাব দিল না।

বুড়ি বাসিনী আবার বলল, 'তর লগে আমরা কী শত্তুরতা করলাম?'

নিত্য ঢালী এবারও উত্তর দেয় না।

'হ, নিচ্চয় আমরা তর শত্তুর হইছি। না হইলে স্বজাতির লগে কেউ সম্পক্ক ঘুচায়? তুই যে অ্যামুন হবি, আমরা কুনো কালে ভাবি নাই নিত্যা।' বুড়ি বাসিনীর গলায় দুঃখ এবং আক্ষেপ ফোটে, 'আমরা তর পর হইলাম, শত্তুর হইলাম, যত আপন হইল বিদ্যাশি বিজাতি।'

নিত্য ঢালী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সবাইকে ঠেলে সরিয়ে সামনে এগিয়ে এল হারান। বলল, 'কথা থাউক তালুই, তাগো দেখাও।'

'কাগো দেখামু?'

'কুটুম, তোমার সাধের কুটুমগো দেখাও। আমরা লয়ন ভইরা দেইখা যাই।' টেনে টেনে হাসে হারান। সে হাসিতে জ্বালা এবং ক্ষোভ মিশে আছে।

বুড়ি বাসিনী বলে, 'হ হ, তা-ই দেখা।'

রসিক শীল বলে, 'দেখা রে নিত্যা, দেখা।'

বাকি সকলে তাড়া দেয়, 'তরাতরি কর। কুটুমের মুখ দেইখা ঘরে ফিরি। এইদিকে বেলা হইয়া যায়।'

নিত্য ঢালীর মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে। গলা ফাটিয়ে সে চিল্লায়, 'কী কও তোমরা! কে কার কুটুম! কিসের কুটুম!'

হারান বলে, 'রঙ্গ কইরো না তালুই। ডিগলিপুরের হগলে জানে, কে কার কুটুম।'

'না না, আমার কুটুম নাই। তোমরা যাও।' নিত্য ঢালী সমানে চেঁচায়।

'যামু যামু, কুটুমের মুখ না দেইখা যাই ক্যামনে? বড় সাধ লইয়া তোমার কাছে আইছি।' হারান শব্দ করে হাসে। তার মুখটা নিষ্ঠুর দেখায়।

'তোগো পায়ে ধরি, তরা যা। তোগো কাছে কী অপরাধ করছি যে আমারে অমুন দুঃখু দ্যাস।'

হারান বলে, 'যামু যামু। তার আগে কুটুম দেখাও। চৌখের দেখা দেইখা চাইলা যামু। আর তোমারে জ্বালামু না।'

'কত বার কমু আমার কুটুম নাই।'

'কুটুম না থাউক, জামাই তো আছে। জামাই দেখাও।'

'জামাই!' নিত্য ঢালীর গলাটা কেঁপে গেল, 'কে জামাই!'

'হাসাইলা তালুই, হাসাইলা।' হারান বলতে লাগল, 'পিরথিমীর হগলে জানে। আর তুমিই নিজের জামাইরে জানো না?'

'না না, জানি না।' পাগলের মতো চিৎকার করে নিত্য ঢালী।

'জানো না যহন, তহন আমিই কই কে তোমার জামাই।' বলে একটু থামে হারান। রসিক শীল, বুড়ি বাসিনী, উদ্ধব বৈরাগী, সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখ দু'টো ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর খুব আস্তে, ফিস ফিস করে বলে, 'শোনলাম, পানিকরই নিকি তোমার জামাই হইব।'

হারানের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ এক কান্ড করে বসল নিত্য ঢালী। দৌড়ে নতুন ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। পানিকরের একটা হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর চেঁচাতে লাগল, 'দ্যাখ হারাইনা, দেখ তোমরা, হগলে দেখ, আমার কুটুম দেখ। লয়ন ভইরা দেখ। পরাণ ভইরা দেখ। খালি কুটুম না, আমার জামাই। দিমু, আমার কাপাসীরে পানিকর বাবার হাতেই দিমু।' একটু থেমে টেনে টেনে দম নেয়। পরক্ষণে চিলের মতো ধারাল গলায় ফের চিৎকার করে, 'হারাইনা, তর সাধ মিটছে তো?'

অবসন্ন গলায় হারান বলে, 'মিটছে।'

'জামাইর মুখ দেখলি, এইবার যা।'

'হ, যামু।' রসিক শীলদের নিয়ে হারান চলে গেল।

বাহান্ন

রাত থাকতে থাকতেই তারা রওনা হল। পানিকর, লা তে, নিত্য ঢালী এবং কাপাসী।

এখনো বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা গাঢ় ঘুম আর ঘন অন্ধকারে তলিয়ে আছে। একটা মানুষ কি একটা পাখিও জেগে ওঠেনি। এই দ্বীপ এই মুহূর্তে আশ্চর্য নিঝুম।

তারা চলেছে। বোঁচকা বুঁচকি মাথায় চাপিয়ে সবার আগে আগে যাচ্ছে লা তে। মাঝখানে কাপাসী। পেছনে নিত্য ঢালী আর পানিকর।

পায়ে ঠোক্কর, মাথায় টক্কর আর চারপাশ থেকে কাঁটা এবং গোঁজের খোঁচা লাগছে। জোঁক, বাড়িয়া পোকা আর গন্ধী পোকার উৎপাত তো আছেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তারা এগুচ্ছে।

ফিস ফিস করে নিত্য ঢালী ডাকে, 'পানিকর বাবা—'

পাশ থেকে পানিকর বলল, 'হাঁ- -'

'আমার বড় ডর লাগতে আছে।'

'কিসের ডর?'

'এই যে নিজের দ্যাশের মানুষজন ছাইড়া আইলাম। কারো এট্টা যুক্তি নিলাম না। কারো লগে পরামশ্য করলাম না।'

কলোনির বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙার আগেই তারা ডিগলিপুরের সেটেলমেন্ট ছেড়ে এসেছে। কারো সঙ্গে, এমনকি পালসাহাবের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করে আসে নি নিত্য ঢালী। পানিকরই তাকে এ ব্যাপারে দেখা করতে বা কথা বলতে দেয় নি।

কারো সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ না করে, ঝোঁকের মাথায় সেটেলমেন্ট ছেড়ে চলে আসার জন্য এখন আপসোস হচ্ছে নিত্য ঢালীর।

যতই উপকারী হোক, পানিকর তার স্বজাতি বা স্বদেশি নয়। মাত্র কয়েক মাস তার সঙ্গে জানাশোনা। তার কথায় ভরসা করে কাপাসীকে নিয়ে এভাবে বেরিয়ে পড়া বুঝি ঠিক হল না।

গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে এগুতে এগুতে নিত্য ঢালীর মন সংশয়ে ভরে যায়। মনে হল, চারপাশ থেকে অদ্ভুত এক ভয় একটু একটু করে তাকে ঘিরে ধরেছে।

কাঁপা গলায় নিত্য ঢালী বলল, 'কারোরে না কইয়া বাইর হইয়া পড়লাম। এইটা কি ভাল হইল?'

পানিকর কিছু বলল না।

নিত্য ঢালী ডাকল, 'পানিকর বাবা—

'হাঁ—'

'আপনে কিছু ক'ন না যে?'

'কী বলব?'

'এই যে ঘরদুয়ার, স্বজাতি স্বদেশিগো ছাইড়া আইলাম, এইটা কি ভাল হইল?'

অন্ধকারে পানিকরের মুখ দেখা যায় না। তার চোখের ভাষা পড়া যায় না। নিত্য টের পেল, কাঁধের ওপর একটা হাত এসে পড়েছে। পানিকরের হাত। তার কানের ভেতর মুখ গুঁজে পানিকর বলল, 'চাচা, ঘাবড়াও মাত—'

নিত্য ঢালী জবাব দিল না।

পানিকর আবার বলল, 'ডিগলিপুরের কলোনিতে পড়ে থাকলে তোমার লেড়কী কি ভাল হত?'

'না।' আবছা শব্দ করে মাথা নাড়ে নিত্য ঢালী।

জঙ্গল আর পাহাড় ফুঁড়ে ঠান্ডা জলো বাতাস উঠে আসছে। শরৎকাল শেষ হয়ে এল। বাতসে হিম মিশতে শুরু করেছে।

একসময় তারা এরিয়াল উপসাগরের কাছাকাছি এসে পড়ল।

হঠাৎ নিত্য ঢালী বলল, 'পানিকর বাবা, একখান কথা কমু। শুনবেন?'

'বল।'

'হেই দিন নিজের চৌখেই তো দেখলেন, আপনেরে ঘরে আইনা তুলছি, হেয়াতে ডিগলিপুরের কেও খুশি না।'

'হাঁ, ও তো দেখলাম।'

'উই দিন রাগের মাথায় ওগো কইছিলাম, আপনে আমার জামাই, কইছিলাম আপনেরে হাতেই কাপাসীরে দিমু। মনে আছে?'

'আছে। সব কুছ ইয়াদ আছে।' আস্তে আস্তে বলে পানিকর।

'আপনে গোসা হন নাই তো পানিকর বাবা?'

'আরে না না চাচা।' পানিকর বলে, 'গুস্‌সা করব কেন? এ নিয়ে তুমি ভেবো না।'

পানিকরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাকে ভীষণভাবে শিউরে দিয়ে কলকলিয়ে হেসে উঠল কাপাসী।

হাসিটা একটু একটু করে মেতে উঠতে লাগল।

তিপ্লাম্ন

নিত্য ঢালীরা এরিয়াল উপসাগরের পাড়ে এসে যখন পৌঁছুল, সবে সকাল হয়েছে। কিন্তু কুয়াশা ঘোচে নি। ফিকে সাদা একটা পর্দা উপসাগরের ওপর ঝুলছে। এখন কিছুই খুব স্পষ্ট নয়।

পেছনের স্যাডল পিক, সামনের ছোট ছোট নির্জন দ্বীপ, উপসাগরের নীল জল, পাড়ের ম্যানগ্রেভ বন, ক্ষয়িত পাথর, সব কিছু কুয়াশায় একাকার হয়ে আছে। অনেক উঁচুতে আকাশটা ঘষা ঘষা মস্ত নীল কাচের মতো দেখাচ্ছে।

দেখতে দেখতে পুব দিকটা ফরসা হয়ে গেল। কুয়াশা দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছে।

একসময় উপসাগরের মাথায় সাগরপাখি দেখা দিল। নীল জল ফুঁড়ে ফিনফিনে রুপোলি ডানায় দিনের প্রথম রোদ মেখে উড়ুক্কু মাছেরা উড়তে লাগল।

এরিয়াল উপসাগর এখন খুব শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তার নীল জলে মাতামাতি নেই, খ্যাপামি নেই।

'নটিলাস' বোটটা এক কিনারে একটা ম্যানগ্রোভ গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। মৃদু ঢেউয়ে অল্প অল্প সেটা দুলছে।

মালপত্র নিয়ে আগে উঠল লা তে। তারপর কাপাসী। কাপাসীর পর নিত্য ঢালী। সবার শেষে পানিকর।

বোটের মাঝখানে শেড। শেডের এপারে বসেছে লা তে। ওপারে পানিকর, নিত্য ঢালী আর কাপাসী।

স্টার্ট দিতে গিয়ে মোটর বোটটার ইঞ্জিনে কী যেন গোলমাল দেখা দিল। অগত্যা ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে কলকব্জা সারাতে বসল পানিকর। ঠক ঠক আওয়াজ হচ্ছে। ওধারে জলের দিকে ঝুঁকে ঝিম মেরে বসে আছে লা তে।

পাড়ের কাছটা অগভীর। এক বুক জল হবে। স্বচ্ছ জলের তলায় লাল নীল অসংখ্য ছোট ছোট পাথর ঝিকমিক করছে। দিনের প্রথম রোদ লেগে বাদামি রঙের বালুকণাগুলি জ্বলছে।

জলের নিচের বালিতে সিপি চলার সরু মোটা কত যে দাগ আঁকা রয়েছে, লেখাজোখা নেই।

জলের দিকে আরো ঝুঁকে একটা কথাই ভাবছে লা তে। অনেক, অনেক বার সে বারণ করেছিল, তবু পানিকরের সঙ্গে এল নিত্য ঢালী। সে আভাসে জানিয়ে দিয়েছিল, পানিকরের মতলব ভাল নয়। তার কথা কানেই তোলে নি নিত্য, তাকে গ্রাহ্য করে নি।

জলের দিকে তাকিয়ে ছিল লা তে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, বিরাট আকারের একটা সান ডায়াল উপসাগরের তলার বালিতে বুক টেনে টেনে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে চোখের ঈষৎ কটা তারা দু'টো নেচে উঠল তার।

এই মরশুমে সিপিরা বড় একটা উপসাগরে আসে না। বর্ষার আগে আগেই তারা সমুদ্রে নেমে যায়।

কুতকুতে চাপা চোখে সান ডায়ালটা দেখতে লাগল লা তে। সেটার চারপাশে বিরাট একটা হাঙর ঘুরছে। মাঝে মাঝে হাঙরটা হাঁ করে। সারি সারি হিংস্র দাঁতগুলো ঝকঝক করে। বিচিত্র উল্লাসে ডিগবাজি খায়।

চোখের তারা স্থির হয়ে গেল লা তে'র। সান ডায়াল তার খুব প্রিয় সিপি। অভ্যাসবশে কোমরের খাঁজে হাত দিল লা তে। খুঁজে খুঁজে ছোরার বাঁটে থাবা বসাল।

মোটর বোটের কলকব্জা সারানো হয়ে গিয়েছিল। ম্যানগ্রোভ গাছ থেকে কাছি খুলে ফেলল পানিকর। বোটটা জোরে দুলে উঠল।

পানিকর স্টার্ট দিতে যাবে, চাপা গলায় লা তে ডাকল, 'মালেক—

'কী বলছিস?'

'থোড়া সবুর।'

'কিঁউ?'

'একটা সান ডায়াল সিপি। সিপিটা আগে তুলে নিই। পরে বোট ছাড়বেন।'

বিরক্ত গলায় পানিকর গজ গজ করতে লাগল, 'শালে সিপি দেখলে পাগলা বনে যায়।'

পানিকর আর স্টার্ট দিল না। 'নটিলাস' বোট উপসাগরের নিস্তরঙ্গ জলে ভাসতে লাগল।

খানিকটা চুপচাপ।

ও পাশ থেকে পানিকর ফিসফিসিয়ে উঠল, 'সিপিটা উঠাচ্ছিস না যে লা তে? দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুপুরের আগে মায়াবন্দর পৌঁছুতে হবে।'

লা তে বলল, 'বহুত বড় একটা হাঙর সিপিটার চারপাশে ঘুরছে।'

শব্দ করে হাসল পানিকর। বলল, 'তোর আবার হাঙরের ডর! হাঙরই তো তোকে ডরায়।'

'হাঁ হাঁ, হাঙর আমাকে ডরায়।' লা তে'র গলায় অদ্ভুত স্বর ফুটল।

পানিকর আবার বলল, 'জলদি কর। হাঙরটাকে মেরে সান ডায়ালটা তোল।'

'তুলব তুলব। থোড়া সবুর।' কথা বলছে বটে, কিন্তু দুই খাড়া হাঁটুর ফাঁকে থ্যাবড়া থুতনি ঢুকিয়ে স্থির হয়ে বসেই আছে লা তে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, হাঙরটা চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে সান ডায়ালটাকে ঠুকরে ঠুকরে আদর করছে।

দূরে ধূসর রঙের স্যাডল পিক, এরিয়াল উপসাগরের অন্য সব দৃশ্য, ম্যানগ্রোভ বন, আকাশ, সামনের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, কিছুই দেখছিল না লা তে। তার চোখ, তার মন, তার সমস্ত চেতনা জুড়ে এখন রয়েছে একটা সান ডায়াল আর একটা হাঙর।

হাঙর। হ্যাঁ, বিশাল হিংস্র এক বিভীষিকা।

একদৃষ্টে জলের দিকে কাপাসীও তাকিয়ে ছিল। এখানে এই এরিয়াল উপসাগরের জল নীল। দূরে সমুদ্রের জল কালো। যতদূর তাকানো যায়, নোনা অফুরন্ত সীমাহীন জলরাশি। দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে কাপাসীর।

এতক্ষণ অল্প অল্প বাতাস ছিল। হঠাৎ বাতাসটা পড়ে গেল। উপসাগরের জলে আর কাঁপুনি নেই, মাতন নেই। পারের ম্যানগ্রোভ বনের মাথা নড়ে কি নড়ে না। 'নটিলাস' বোটটা স্থির হয়ে গিয়েছে। উড়ুক্কু মাছগুলি পাতলা রুপোলি ডানায় উড়ছিল। এখন তারা জলের তলায় চলে গিয়েছে। আকাশের কোথাও একটা সাগরপাখি নেই।

দিনের প্রথম রোদে এতক্ষণ উপসাগরটা জ্বলছিল। হঠাৎ কোত্থেকে এক টুকরো বড় মেঘ এসে সূর্যটাকে ছেয়ে ফেলল।

যতদূর চোখ যায়, কোথাও কোনো দিকে গতি নেই, শব্দ নেই, তাপ নেই, আলো নেই। সব কিছু স্তব্ধ, নিরালোক, জড়, মৃত।

চারদিক দেখতে দেখতে বিচিত্র এক ভয় কাপাসীকে ঘিরে ফেলতে লাগল যেন। তার মনে হল, ভয়টা বুকের মধ্যে ঠান্ডা স্রোতের মতো ওঠানামা করছে। কাঁপা, ফিস ফিস গলায় কাপাসী ডাকল, 'বাবা—'

পাশ থেকে নিত্য ঢালী বলল, 'কী?' তার গলাটা সহজ, স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনায়। কাপাসীর ভয়টা যেন নিত্যর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

কাপাসী বলল, 'আমরা কুনখানে যাইতে আছি?'

'আমি জানি না। পানিকর বাবায় জানে।'

একটু চুপ। কাপাসীর ভয়টা বাড়তেই লাগল।

এই ঋতুর মেজাজ বিচিত্র। এই হয়তো রোদ, পরমুহূর্তে মেঘ।

যে মেঘের টুকরোটা সূর্যটাকে ঢেকে দিয়েছিল, সেটা আরো ঘন হয়েছে। অন্য দিকের ছোট ছোট মেঘের ক'টা টুকরো সেটার সঙ্গে ক্রমশ মিলে গিয়ে ফুলে ফেঁপে পুবের আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

এরিয়াল উপসাগর দ্রুত ধূসর এবং আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

যে ভয়টা কাপাসীর বুকের ভেতর শির শির করছিল সেটা ক্রমশ আরো চেপে বসছে। শ্বাস টানতে,

ঢোক গিলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তালুতে একরাশ শুকনো ধারাল বালি যেন আটকে আছে। ঢোক গিলতে গেলেই সেগুলো বিঁধছে।

সামনের দ্বীপ উপসাগর পাহাড় দূরের সমুদ্র, সব ঝাপসা নিরাকার হয়ে যাচ্ছে যেন। কোথাও বুঝি আলো নেই। একটা নিরবচ্ছিন্ন কালো পর্দা সমস্ত কিছু ঢেকে ফেলছে।

অনেকদিন, ঠিক কতদিন আগে হুবহু মনে করতে পারল না কাপাসী। স্মৃতিশক্তি যেন হঠাৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এটুকু কাপাসী ভাবতে পারল, কোথায় একটা ছোট নদী ছিল, অন্ধকার ছিল। টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ছবি। কয়েকটা ঘটনা। সবগুলো সাজিয়ে নিলে যা দাঁড়ায় তা হল, সেই অন্ধকারে কারা যেন বাপ-মায়ের বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে মশাল জ্বালিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে ছিপ নৌকোয় তুলে নদী পাড়ি দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর?

কোথায় যেন একটা চর ছিল। সেখানে একটা দোচালা ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। একদিন, দু'দিন, দু'মাস নাকি এক বছর—, কতদিন যে সে সেখানে বন্দি হয়ে ছিল মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে, কারা যেন তার কাছে আসত। আর তারা এলেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।

এখন, এই মুহূর্তে পানিকরের মোটর বোটে বসে কেন যেন তার মনে হল, সেই সাঙঘাতিক রাত্রিটার মতো আজও তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কথাটা যতই ভাবল, হাতের পাতা দু'টো ঘামে নিভজে উঠল। ঠান্ডা কনকনে একটা স্রোত মেরুদাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। দম আটকে আসতে লাগল।

হঠাৎ সমস্ত উপসাগরকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাপাসী, 'যামু না, আমি যামু না।' চেঁচাল, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ঠোঁট দু'টো থর থর করে কাঁপল মাত্র।

মোটর বোটের শেডটা ধরে, শরীরের সব জোর গলায় এনে অনেকবার চিৎকার করল কাপাসী। একসময় শব্দটা বেরিয়ে এল, 'আমি যামু না, যামু না—'

যে স্তব্ধতা এরিয়াল উপসাগরটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা খান খান হয়ে গেল।

বোটের ইঞ্জিনটার পাশে বসে ছিল পানিকর। চমকে কাপাসীর মুখের দিকে তাকাল। তারপরেই ঘুরে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। মোটর বোটটা ভট ভট আওয়াজ করে উঠল।

শান্ত জলে ঢেউ উঠল, মাতন জাগল। উড়ুক্কু মাছেরা জলের নিচে চলে গিয়েছিল। রুপোর তীরের মতো আবার তারা উড়তে লাগল। আকাশে সাগরপাখি দেখা দিল।

এতক্ষণ এরিয়াল উপসাগরটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে বেগ এল, শব্দ এল, গতি এল, চাঞ্চল্য এল। নিঝুম উপসাগর প্রচন্ড বেগে জেগে উঠল যেন।

আর আচমকাই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'নটিলাস' বোটটা জল কেটে ছুটতে শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলুথালু হয়ে চিৎকার করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাপাসী, 'যামু না, যামু না, কিছুতেই যামু না।'

উপসাগরে ঝপাং করে শব্দ হল। জল ছিটকে এসে লাগল 'নটিলাস'-এর গায়ে।

অগত্যা পানিকর বোট থামিয়ে দিল। ইঞ্জিনটার সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচাতে লাগল, 'গেল গেল, সব কুছ বরবাদ হয়ে গেল। কাপাসী—কাপাসী—'

বুক থাপড়ায় আর হাউ হাউ করে কাঁদে নিত্য ঢালী, 'আমার সব্বনাশ হইয়া গেল। হা ভগমান।'

শেডের ওপাশে চুপচাপ বসে ছিল লা তে। হাঙর আর সিপিটাকে দেখছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে পড়েছিল। নিজের ওপর নিজের কোনো ইচ্ছাই কাজ করছিল না যেন।

লা তে দেখছে, উপসাগরের জলে কাপাসী ডুবে যাচ্ছে। তবুও নড়ল না সে, নড়তে পারল না। আড়ষ্টের মতো বসে রইল।

একেক বার ভেসে ওঠে কাপাসী। প্রাণফাটা চিৎকার করে, 'বাচাও, আমারে বাচাও—'

হঠাৎ লা তে দেখল, সান ডায়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঙরটা কাপাসীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে

আছে। তার বিরাট শরীরটা জলের নিচে স্থির হয়ে গিয়েছে। আন্দামান উপসাগরের ক্ষুধার্ত হাঙর শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওত পেতেছে।

কাপাসীর মাথা আবার ভেসে উঠল। আবার সে চেঁচাল, 'বাচাও—বাচাও—মরলাম— মরলাম—'

এবার তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে সব আড়ষ্টতা ঝরে গেল। কোমরের খাঁজ থেকে ছোরার ফলাটা চকিতে টেনে বার করল লা তে। পরক্ষণে উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাঙরটা একটু ঘুরে দাঁড়াল। হিংস্র চোখে দেখতে লাগল, আরো একটা শিকার একেবারে মুখের সামনে এসে পড়েছে। জন্তুটার লাল ঘের-দেওয়া চোখ দু'টো ঝকমক করছে।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাপাসীর শরীরটা জলের ওপর ভাসিয়ে রাখল লা তে। ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে ধরা।

একসঙ্গে একজোড়া শিকার বাগে পেয়ে হাঙরটা মেতে উঠেছে। ডিগবাজি খাচ্ছে। উলটে পালটে কত ধরনের কসরতই না দেখাচ্ছে। মুখ ভরে জল নিয়ে হুস করে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

একসময় মাতামাতি থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল হাঙরটা। তারপর তীব্রবেগে ছুটে এল। কাপাসীকে ভাসিয়ে রেখে একধারে সরে গেল লা তে। হাঙরটা ওপাশে বেরিয়ে গেল। দাঁত বার করে সঙ্গে সঙ্গে আবার তেড়ে এল। দরিয়ার যাবতীয় অন্ধিসন্ধি, হাঙরের স্বভাব, সবই লা তে'র জানা। চোখের পলকে একপাশে সরে হাঙরটার ঘাড়ের কাছে ছোরা বসিয়ে দিল সে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে উপসাগরের জলে মিশতে লাগল।

এদিকে ছোরার খোঁচা খেয়ে হাঙরটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

'নটিলাস' বোট থেকে সমানে চিল্লাচ্ছে পানিকর, 'হাঙরটাকে মার লা তে। বিশ রুপেয়া দেব। কাপাসীকে তুলে দে লা তে। বহুত বকশিস মিলবে।'

একটু দূরে গিয়ে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে হাঙরটা। শিকারটাকে যত সহজে বাগানো যাবে ভেবেছিল, আদপেই কাজটা তত সহজ নয়।

বাঁ হাতে কাপাসীর সমস্ত দেহের ভার উঁচুতে ঠেলে রেখেছে লা তে। একটা মানুষের ভার। যন্ত্রণায় হাতটা ছিঁড়ে পড়ছে যেন।

দম ছাড়ার জন্য একবার ভুস করে মাথা তুলেছিল লা তে। সেই সুযোগে হাঙরটা ধারাল দাঁতের কামড় বসিয়ে লা তে'র উরু থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

হাঙরের ঘাড় থেকে রক্ত ঝরছে। লা তে'র উরু থেকে রক্ত ঝরছে। মানুষ আর হাঙরের রক্তে উপসাগর লাল হয়ে উঠেছে।

নোনা জলে উরুর ক্ষতটা ভীষণ জ্বালা করছে। সেদিকে লা তে'র হুঁশ নেই। এখন একটু অসাবধান হলেই নির্ঘাত মৃত্যু। হাঙরের ধারাল দাঁত তাকে আর কাপাসীকে চিরে ফেলবে।

আবার ডুব দিল লা তে। সে জানে, জখমী হাঙর বড় মারাত্মক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জন্তুটার গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল সে।

এর মধ্যে আর এক বিপদ ঘটল। জল খেয়ে খেয়ে আর ভয়ে কাপাসী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। তার অসাড় দেহটা বাঁ হাতে আব ঠেলে রাখতে পারছে না লা তে। হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেল তার।

দুশ' হাত দূরে উপকূল। সেখানে ক্ষয়িত শিলা আর ম্যানগ্রোভ বন। উপকূলে উঠতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে। ডুব দিয়ে কাপাসীর অসাড় দেহটা ভাসিয়ে রেখে উপকূলের দিকে সরে যেতে লাগল লা তে।

হাঙরটা লা তে'র মতলব বুঝে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাঁ করে তার দিকে ছুটে এল। ছোরার ডগা দিয়ে পেটের কাছটা চিরে দিল লা তে। হাঙরটা পিছিয়ে গেল। হয়তো বুঝল, শিকারটা নেহাতই নিরীহ নয়, সাঙ্ঘাতিক। আদতে ওটা শিকার নয়, ভয়ানক এক প্রতিপক্ষ।

সমুদ্র আর হাঙরের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে উপকূলের অনেক কাছে এসে পড়ল লা তে। এখানে জল অনেক কম, বুক-সমান। কিন্তু নিচের ভাঙা ভাঙা, ক্ষয়িত পাথরে হাজার বছরের শ্যাওলা জমে রয়েছে। সেখানে পা রাখা যায় না।

জখমী হাঙরটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। শ্যাওলা-জমা পাথরে পা রাখতে গিয়ে পিছলে গিয়েছিল লা তে। সেই ফাঁকে পায়ের গোছা থেকে আরেক খণ্ড মাংস কেটে নিয়ে গেল হাঙরটা।

সামনে বিরাট হাঙর, বাঁ হাতে কাপাসীর অসাড় দেহ, পায়ের তলায় পিছল পাথর, এমন মারাত্মক অবস্থায় জীবনে পড়ে নি লা তে। পা থেকে, উরু থেকে রক্ত ঝরছে। নোনা জলে ক্ষতগুলো জ্বলে যাচ্ছে যেন। ভীষণ এক যন্ত্রণা শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, অত সহজে হার মানলে চলবে না। দরিয়ার অতল স্তরে হিংস্র জলচর জানোয়ারের মুখ থেকে সিপি কুড়োয় লা তে। কোনোদিন দরিয়ার লড়াইতে হার মানে নি সে। আজও মানবে না। লা তে মরিয়া হয়ে উঠল।

উপকূলের দিকে আরো অনেকটা সরে এসেছে লা তে। জল এখানে কোমর-সমান। কাছেই শ্যাওলাহীন একটা বড় পাথর মিলল। বাঁ হাতে কাপাসীকে জড়িয়ে ধরে, ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে রাখল সে।

'নটিলাস' বোট থেকে পানিকর সমানে উৎসাহ দেয়, 'বিশ রুপেয়া বকশিস দেব লা তে। ওপরে উঠে যা।'

নিত্য ঢালী কিছুই বলে না। গলার শিরা ছিঁড়ে শুধু উন্মাদের মতো কাঁদতে থাকে।

জখমী জানোয়ারটা কিছুক্ষণ প্রতিপক্ষের মতিগতি ঠাওর করে দেখল। তারপর সারি সারি ধারাল দাঁত বার করে সোজা ছুটে এল।

পায়ের তলায় কঠিন পাথরের আশ্রয়। পিছলে যাওয়ার বিপদ নেই। এক পাশে একটু কাত হয়ে দীর্ঘ ছোরাটা পুরোপুরি হাঙরের পেটে ঢুকিয়ে টেনে দিল লা তে। অন্তিম আক্রোশে লক্ষ্যহীন গতিতে খানিকটা ছুটে গেল হাঙরটা। জলের মধ্যে উলটে পালটে কিছুক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি খেল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

হাঙরের সঙ্গে লা তে'র যোঝাযুঝি দেখছিল পানিকর। দেখতে দেখতে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে হঠাৎ ভুলে গেল সে। বিচিত্র এক ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ হাঙরটাকে শেষই করে ফেলল লা তে!

মরা হাঙর, রক্তমাখা উপসাগর, লা তে'র ছোরা, সব মিলিয়ে পানিকরের বুকের ভেতর অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া ঘনিয়ে তুলল।

টলতে টলতে, ধুঁকতে ধুঁকতে কাপাসীকে নিয়ে খুব সাবধানে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে ম্যানগ্রোভ বনে উঠে গেল লা তে। উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর অবসাদে, হাঙরের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্লান্তিতে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল তার।

পানিকর ফিস ফিস করে বলল, 'দাঁড়া লা তে, আমি আসছি।'

'নটিলাস' বোটটা উপকূলের কিনারে এনে দাঁড় করাল পানিকর। তারপর হাঁটুখানেক জল ভেঙে সে কাপাসীদের কাছে চলে এল। তার পেছনে নিত্য ঢালীও এসেছে।

লা তে'র বুকে বেহুঁশ পড়ে রয়েছে কাপাসী।

পানিকর দেখল, লা তে'র ছোরার ফলায় এখনো হাঙরের রক্ত লেগে রয়েছে, টপ টপ করে সেই রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে। একবার লা তে'র চোখের দিকে তাকাল পানিকর। লা তে'র চাপা চোখদু'টোতে কী দেখল, পানিকরই জানে। একটা কথাও আর বলল না। উপসাগরের জল ভেঙে যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি 'নটিলাস' বোটে গিয়ে উঠল।

একটু পর এরিয়াল বে'র শান্ত জলে বড় বড় ঢেউ জাগিয়ে ভট ভট শব্দ তুলে 'নটিলাস' বোট খোলা দরিয়ায় পালিয়ে গেল।

এবার বেহুঁশ কাপাসীর দিকে তাকাল লা তে। কেন যেন তার মনে হল, আন্দামানের দরিয়ায় হাঙরের মুখ থেকে এমন সিপি সারা জীবনে আর একটাও তুলতে পারে নি।

নিত্য ঢালী সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে লা তে অল্প একটু হাসল। বলল, 'তোমার লেড়কী নাও চাচা—'

নিত্য ঢালী ডুকরে উঠল, 'লা তে'রে, তুই না থাকলে মাইয়ারে ফিরা পাইতাম না। আমি তর গুলাম হইয়া রইলাম।'

লা তে জবাব দিল না। নিত্য ঢালী কাঁদতেই লাগল।

খানিক পর কাপাসীর জ্ঞান ফিরে এল। আলুথালু হয়ে সে চেঁচায়, 'আমি যামু না, যামু না।'

নিত্য ঢালী মেয়ের একটা হাত ধরল। ভাঙা গলায় বলল, 'না মা, তরে কুনোখানে যাইতে হইব না। অহন আমরা কুলোনিতে ফিরুম।'

কাপাসীকে নিয়ে উঠে পড়ল নিত্য ডালী। লা তে'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল লা তে, আমাগো লগে চল।'

'না।' মাথা নাড়তে নাড়তে লা তে বলল, 'আমি মায়াবন্দর যাব।'

'যাবি ক্যামনে? পানিকর বাবায় তো বোট লইয়া গেল।'

'দেখি, যদি ফরেস্টের বোট পাই। ও তোমার ভাবতে হবে না চাচা।' বলেই উপকূলের পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল লা তে। খানিকটা গিয়ে কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল। ডাকল, 'শোন চাচা—'

নিত্য ঢালী এগিয়ে আসে।

লা তে বলল, 'এই জাজিরাতে তোমরা নয়া এসেছ। এখানকার হালচাল জানো না। তোমার লেড়কীকে একটা হাঙরের মুখ থেকে বাঁচালাম। এখানে আরো বহুত হাঙর আছে। হোঁশিয়ার।' বলে আর দাঁড়াল না লা তে, হাঁটতে শুরু করল।

উপসাগরের পাড় দিয়ে হেঁটে চলেছে লা তে। পাশেই সমুদ্র—কালো, নিঃসীম, দুর্জ্ঞেয়।

পনেরো বছর আন্দামানের সমুদ্র থেকে সিপি কুড়োচ্ছে সে। আশ্চর্য! এতদিনেও সমুদ্রকে, তার মেজাজকে, তার চরিত্রকে আদৌ বুঝে উঠতে পারে নি।

আজ, একটু আগে হাঙরের সঙ্গে যুঝে যুঝে কাপাসীকে বাঁচিয়েছে। লা তে ভাবল, সাধ্য কি তার কাপাসীকে বাঁচায়! সমুদ্রই করুণা করে কাপাসীকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আজ প্রথম যেন সমুদ্রের চরিত্র অল্প একটু বুঝতে পারল লা তে। অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল তার।

চুয়ান্ন

নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে একটা উতরাই। উতরাইটার দু'পাশে ধানখেত।

জঙ্গলের কাছ থেকে যে মাটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, লাঙলের ফলায় ফলায় তা চৌরস হয়েছিল। বর্ষায় যে মাটিতে বীজদানা পড়েছিল, সেই মাটিই বছরের চতুর্থ ঋতুতে ফসলবতী হয়ে উঠেছে।

যতদূর তাকানো যায়, শুধু ধান আর ধান। সোনালি লাবণ্যে খেতের ঝাঁপি ভরে আছে।

দু'জন মাত্র মানুষ। হোক দু'জন, তবু তো একটা সংসার।

সারাদিন সংসারের কাজ সারে কাপাসী। রাঁধে বাড়ে, ঘর পরিষ্কার করে। কিলপঙ নদী থেকে জল আনে। বাপকে খাওয়ায়, নিজে খায়। তারপর বিকেলে, সূর্যটা যখন জঙ্গলের ওপারে ঢলতে শুরু করে, ঠিক সেই সময় বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে। উদাস চোখে সামনের ধানখেতটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কখন যেন একসময় চোখদু'টো জলে ভরে যায়। টস টস করে গাল বেয়ে লবণাক্ত উষ্ণ জল ঝরতে থাকে।

আজকাল আর কাপাসী কলকলিয়ে হাসে না। যতক্ষণ কাজে মেতে থাকে, মোটামুটি একরকম কাটে। কিন্তু কাজ যখন থাকে না, যখনই একটু ফুরসত পায়, কাপাসী কাঁদতে বসে। আশ্চর্য! যে কাপাসী চারদিক তোলপাড় করে হাসত সে এখন কাঁদে, শুধুই কাঁদে। তার কান্নায় শব্দ নেই।

সেদিন এরিয়াল উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কাপাসী। হাঙর দেখে ভয়ে উত্তেজনায় তার ইন্দ্রিয়গুলোতে তীব্র ঝাঁকানি লেগেছিল। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল সে।

অনেক কাল আগে গাঢ় অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে কারা যেন জোর করে ছিনিয়ে তাকে ছিপ

নৌকোয় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই অবুঝ, অস্থির গলায় মেতে মেতে, ঢলে ঢলে হেসেছে কাপাসী। জীবনের সব সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছিল সে।

এরিয়াল উপসাগরে ঝাঁপ দেওয়ার পর হাঙর দেখে তার স্নায়ু আর ইন্দ্রিয়গুলো যে তীব্র ধাক্কা খেয়েছিল, সেটাই তাকে আবার সুস্থ, স্বাভাবিক করে তুলেছে।

সন্ধের ঠিক মুখে মুখে হারান আর পালসাহাব আসে।

যেদিন হাঙরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিত্য ঢালীর সঙ্গে তাকে ডিগলিপুর পাঠিয়ে দিয়েছিল লা তে, সেদিন থেকেই পালসাহাব আর হারান আসছে। আজও এল।

পালসাহাব বলল, 'আজও তুই কাঁদছিস?'

'হ, সাহাব বাবা।'

'তোকে না বলেছি কাঁদবি না।'

'পারি না বাবা, কিছুতেই কান্দনেরে ঠেকাইয়া রাখতে পারি না।' কাপাসী বলতে থাকে, 'যহন হাসতাম তহন কইতেন হাসবি না। অহন কান্দি। কানতেও দিবেন না?'

'না না—' গভীর স্নেহে পালসাহাব বলল, 'তুই যে হাসি হাসিস যে কান্না কাঁদিস, তা এই ডিগলিপুরে চলবে না। জরুর না।' বলে ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

কাপাসী বলে, 'তা হইলে কোন হাসন কোন কান্দন চলব?'

'যে হাসিতে যে কান্নায় দিল জুড়োবে তেমন হাসবি, তেমন কাঁদবি। যে হাসিতে যে কান্নায় দিল টুটা ফাটা হয়ে যায়, তেমন হেসে তেমন কেঁদে কোন ফায়দা?'

কাপাসী জবাব দেয় না। চুপচুপ বসে থাকে।

এবার হারানকে নিয়ে পড়ে পালসাহাব। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে, 'এ উল্লু—'

তটস্থ হয়ে হারান বলে, 'কী ক'ন পালসাহাব?'

'আরে নালায়েক হারামী, আপনা পেয়ারের লেড়কী অ্যায়সা কাঁদছে, আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস!'

'কী করুম?'

পালসারাব খেঁকিয়ে উঠল, 'শোন বুদ্ধু, আভী আমি যাচ্ছি। কাল আবার আসব। কাল এসে যদি দেখি কাপাসী কাঁদছে, তোর শির ছেঁচে দেব।'

পালসাহাব চলে গেল। আর কাপাসীর পাশে গিয়ে বসল হারান। বলল, 'কোন দুঃখুতে কান্দো কাপাসী?'

কাপাসী কিছু বলে না। ধানখেতের দিকে তাকিয়েই থাকে।

আবেগে গলাটা কাঁপতে থাকে হারানের, 'কাপাসী, কও—'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে কাপাসী। বলে, 'এতদিন পাগল আছিলাম, ভালই আছিলাম। ক্যান আমি ভাল হইলাম? ক্যান? ভাল হইয়াই তো আমার দুঃখু বাড়ল। পাগল হইয়া যা ভুলছিলাম, ভাল হইয়া হেই হগল মনে পইড়া যায়।'

'কী মনে পড়ে?'

'আমার শরীলখান লষ্ট হইয়া গেছে। হা ভগমান!' অসহ্য কান্নায় কাপাসীর গলা রুদ্ধ হয়ে গেল।

কাপাসীর পিঠে আলগোছে একখানা হাত রেখে হারান বলে, 'কিছুই লষ্ট হয় নাই কাপাসী। জীবনে কিছুই লষ্ট হয় না। ধৈয্য ধর, মনেরে বুঝ মানাও—'

হারানের হাতটা পিঠে থেকে সামনে নিয়ে এসে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে কাপাসী। বলে, 'সত্য কও পুরুষ, আমার কিছুই লষ্ট হয় নাই?'

'সত্য কই।' হারানের গলা পরম আশ্বাসের মতো শোনায়।

পঞ্চান্ন

এটা বছরের শেষ ঋতু।

একবছর আগে শীতের এক মধ্যদুপুরে একদল নির্ভূম, নিঃস্ব মানুষ মাটির আশায়, বাঁচার আশায়, জীবনের আশায় বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেছিল। ঝুপড়ির সামনে বসে বসে পালসাহাব তাদের কথাই ভাবছে।

এখন ঝিম দুপুর।

এই শেষ বা ষষ্ঠ ঋতুর দুপুরে কড়া রোদে পিঠটা পুড়ে যাচ্ছে। তবু হুঁশ নেই। বিভোর হয়ে ভাবছে পালসাহাব। এই দ্বীপে মানুষ এল। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সু এল, কু এল। ভাল এল, মন্দ এল। দুঃখ এল, যন্ত্রণা এল। আশা এল, আনন্দ এল। প্রথম যেদিন মানুষগুলো এই দ্বীপে এসেছিল, সেদিন তাদের সকলের চেহারা ছিল এক, অভিন্ন। সবাই মিলে একটা মানুষের পিন্ড। অদ্ভুত এক মৃত্যু তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ সেই মৃত্যু, যা মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। যত দিন যেতে লাগল, আস্তে আস্তে তাদের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুতে লাগল।

সাত পুরুষের বাস্তু ছেড়ে আসার পর তারা প্রতি মুহূর্তে যেন মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছে। এই দ্বীপে এসে পায়ের নিয়ে মাটি পেয়ে তারা সেই অনিবার্য মৃত্যুকে পেরিয়ে এল। নিশ্চিত বিনাশ থেকে তারা জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কত কী-ই না ঘটল এই দ্বীপে। জীবনের খোয়ানো মূল্যবোধগুলো ফিরে পেল ক্ষিরি। কাপাসী ভাল হয়ে গেল। অশুভ ছায়ার মতো পানিকর এসেছিল। সে পালিয়ে গেল। হরিপদ বারুই পৃথিবীর সবার চোখ থেকে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল, তিলি গর্ভিণী হল। প্রথম ফসল ফলল দ্বীপের জমিতে।

'পালসাহাব, পালসাহাব—' ডাকতে ডাকতে কে যেন উতরাই বেয়ে উঠে আসছে।

বিভোর ভাবটা কেটে গেল। চমকে ঘুরে বসল পালসাহাব। দেখা, গেল ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে উদ্ধব বৈরাগী এসেছে। উত্তেজনায়, তেজী রোদে, অনেকটা পথ ছুটে আসার ধকলে সারা দেহে ঘাম ছুটেছে।

পালসাহাব বলল, 'কী উস্তাদ, অ্যায়সা দৌড়তে দৌড়তে আসছ যে?'

'তরাতরি চলেন পালসাহাব, তিলির ব্যথা উঠছে।'

বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল পালসাহাব, 'কিসের ব্যথা?'

'বিয়ানের ব্যথা। তিলির পোলা হইব।'

লাফিয়ে উঠে পড়ল পালসাহাব। ঝুপড়ির ভেতর ঢুকে মা-তিনকে টানতে টানতে বার করে আনল। বলল, 'শিগগির চল মাগী।'

'কাঁহা?'

'যুগেনের ঝুপড়িতে। তিলির লেড়কা হবে। এই জাজিরাতে পয়লা মানুষ জন্মাচ্ছে। চল—চল—জলদি—'

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হরিপদকে পাওয়া যায় নি। অগত্যা গর্ভিণী তিলি যোগেনের ঘরে গিয়েই উঠেছিল। তিলি নিজে যায় নি। পালসাহাবই তাকে যোগেনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

হরিপদ তিলির ওপর সমস্ত দাবি ছেড়ে এই দ্বীপ থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। একটা পঙ্গু, রুগ্ণ, বিকলাঙ্গ মানুষের জন্য তো একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, সজীব মানুষ মূল্যহীন হয়ে যায় না।

একজনের জন্য আর একজনের জীবন নষ্ট হয় না। পালসাহাবের বোধবুদ্ধি এই কথাই বলে।

পালসাহাবরা এসে দেখল, মেলা বসে গিয়েছে।

রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর, হারান, নিত্য ঢালী, কাপাসী, উজানী বুড়ি—কেউ বাকি নেই। ডিগলিপুর সেটেলমেন্টের সবাই এসে যোগেনের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছে।

পালসাহাবকে দেখে সাড়া পড়ে গেল।

'পালসাহাব আইছে।'

'সাহাব বাবা আইছে।'

যোগেনের ঘরটা ভেতর থেকে আটকানো। বন্ধ ঝাঁপের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রসিক শীল আর যোগেন। যোগেনের মুখটা অপার আনন্দে চকচক করছে।

পালসাহাব বলল, 'কি রে হারামী, কী হল—লেড়কা না লেড়কী?'

যোগেন মুখ নামাল। কিছু বলল না। সীমাহীন লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলেছে।

পাশ থেকে রসিক শীল বলল, 'অহনও কিছু হয় নাই সাহাব বাবা, এট্টু খাড়ন। নাতি হউক, নাতনি হাউক—যা-ই হউক, মুখ দেইখা আশীর্বাদ কইরা যাইবেন।'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

মানুষগুলো আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে আছে। কখন তিলির বাচ্চা ভুমিষ্ঠ হবে, সেই আশায় তারা উন্মুখ। নবজাতক আসছে। এ উৎসব তো মানুষের চিরকালের।

পালসাহাবের কানে এল, কে যেন বলছে, 'পোলা হইব।'

আর একটা গলা শোনা গেল, 'না না, মাইয়া হইব।'

অন্য একজন দু'জনকেই সামাল দিতে দিতে বলে, 'কাইজা (ঝগড়া) করস ক্যান? মাইয়া হউক আর পোলা হউক, অহনই তো দেখতে পাবি।'

বিকেলের দিকে সূর্যটা যখন পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় সবার উৎকণ্ঠা ছাপিয়ে বন্ধ ঘরের ভেতর কচি গলার আওয়াজ উঠল, 'ট্যাঁ-ট্যা-ট্যাঁ—'

বাইরে শোর পড়ে গেল, 'বাচ্চা হইছে, বাচ্চা হইছে।'

শিশুটা জোরে জোরে কাঁদছে। গলায় অপরিসীম জোর নিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রথম মানুষের সন্তান জন্ম নিল।

খানিক পর ঘরের ঝাঁপ খুলে গেল। বুড়ি বাসিনী রক্তমাখা শিশুটাকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বাইরে এল। বলল, 'দ্যাখ—দ্যাখ তরা। কি সোন্দর হইছে।'

সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে সামনে এগিয়ে এল পালসাহাব। বলল, 'দেখি দেখি, কী হয়েছে মাঈ? লেড়কা না লেড়কী?'

বুড়ি বাসিনী বলল, 'পোলা হইছে বাবা।'

'দে দে মাঈ, আমার হাতে দে।' হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে ধরল পালসাহাব।

এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। সুখে-দুঃখে-প্রেমে আর প্রাণের তাপে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

অনেক, অনেকদিন আগে পালসাহাবের জীবন থেকে একটা কৃষাণ গ্রামের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন ধরে সেই ঠিকানাটা, সেই কৃষাণ গ্রামটা, সেই খোয়ানো পৃথিবীটা খুঁজে বেড়িয়েছে সে। এতদিনে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে সেই হারানো পৃথিবীটা খুঁজে পেয়েছে পালসাহাব।

পালসাহাব কে?

পালসাহাব শুধু একটা মানুষ না। সে হল জীবন—জীবনের প্রতীক। এই দ্বীপের আশা-হতাশা, পাপ-পুণ্য-আনন্দ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যু—সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে সে।

তিলির বাচ্চাটা এখন আর কাঁদছে না। চোখ বুজে হাত মুঠো করে একান্ত নির্ভয়ে পালসাহাবের হাতে শুয়ে রয়েছে।

ফুলের মতো নরম, উষ্ণ, ছোট্ট একটি মানুষ। পরম মমতায় তাকে বুকের ওপর তুলে নিল পালসাহাব। একদৃষ্টে এই দ্বীপের প্রথম শিশুটির মুখ দেখতে লাগল। দেখে দেখে আশ তার মেটে না।

অতি সুখে হাসে পালসাহাব।

পাগলা অতি সুখে কাঁদে।

এখানে পিঞ্জর

সেই দুপুর থেকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছিল। আর ছিল একটানা গোঙানির মতো ভিজে ভিজে পুবে বাতাস।

'নীলাকাশ' বলে একটা শব্দ অমলেশের জানা আছে। ওপর দিকে কিছুক্ষণ চোখও পেতে রেখেছিল সে। কিন্তু বৃথাই, কোথাও এক ফোঁটা নীল দেখতে পাওয়া যায় নি। সারা আকাশ জুড়ে তখন থেকেই গাঢ় সীসের রং। পুবে-পশ্চিমে-ঈশানে-নৈঋতে শুধু মেঘ আর মেঘ। সে মেঘ মন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো নয়, রীতিমত ভয়-ধরানো। ভারী গম্ভীর কালো কালো মেঘগুলো গর্ভিণী মহিষীর মতো হানা দিয়ে ফিরছিল; তাদের সঙ্গে ছিল বাজের গর্জন।

এ তো গেল দুপুরের কথা। হাওড়া থেকে অমলেশ যখন বীজপুরের লাস্ট ডাউন ট্রেনটা ধরেছিল তখন দুপুরও না বিকেলও না; বিকেল বেরিয়ে দিনটা সন্ধের দেউড়িতে থমকে ছিল। সেই মুহূর্তে সূর্যকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশ্য দুপুর থেকেই সূর্যটা আজ নিরুদ্দেশ।

সন্ধের মুখে এসেও চরাচরের একই অবস্থা—সেই মেঘ, সেই বাজ, বিদ্যুতের সেই নিদারুণ হানাহানি।

বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে অমলেশের যোগাযোগ নেই। এটা কী মাস, কত বঙ্গাব্দ, সে বলতে পারবে না। তবে মেঘ-বিদ্যুৎ-বাজ আর পুবে হাওয়া—আকাশময় এত আয়োজন দেখে মনে হচ্ছিল, আষাঢ় কি শ্রাবণ।

আগে-পিছে এবং মাথার ওপর এমন দুর্যোগ নিয়ে বীজপুরের ট্রেনে ওঠা অমলেশের উচিত হয় নি; কিন্তু না উঠেও পারা যায় নি। বিচিত্র সম্মোহের ঘোরে এখানে ছুটে এসেছে সে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা অথবা উচিত-অনুচিতের কথা আদৌ তার মনে পড়ে নি। বলা যায়, কোনো এক অলৌকিকের হাতের ঘুঁটি হয়ে বীজপুর-গামী এই ট্রেনের কামরার যাত্রী হয়ে বসেছে অমলেশ।

অথচ আজই দুপুরে বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। পরশু সন্ধেয় ভিক্টোরিয়া টারমিনাস থেকে ক্যালকাটা মেল ধরেছিল; পুরো দুটি দিনের ক্লান্তি তার গায়ে মাখা। অনায়াসেই এক-আধদিন কলকাতায় বিশ্রাম করে বীজপুর রওনা হতে পারত অমলেশ। তা ছাড়া এ দেশের কিছুই চেনে না সে, জানে না। দু পুরুষ ধরে তারা বোম্বাইয়ের বাসিন্দা; জীবনে বাংলাদেশে এই তার দ্বিতীয় বার আসা।

হাওড়া থেকে আগেই খবরটা পেয়েছিল অমলেশ; এই ডাউন লোকাল ট্রেনটা রাত এগারটায় বীজপুরে পৌঁছুবে। অত রাতে বাংলাদেশের সুদূর অভ্যন্তরে এক অচেনা শহরে নবেন্দুদের বাড়িটা আবিষ্কার করা সহজ হবে না। তা ছাড়া দ্বিতীয় ঋতুর আকাশ মেঘ-বিদ্যুৎ-বাজ আর জোরাল ঝড়ো হাওয়া, চতুরঙ্গে যেভাবে সেজে আছে তাতে কখন কী হবে কিছুই বলা যায় না; যে কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে। সব জেনেও, সব বুঝেও অমলেশ বীজপুরের ট্রেনে উঠে বসেছে।

আজকের মতো এটাই বীজপুরের লাস্ট ট্রেন; ফলে মানুষ আর মালপত্রে গাড়িটা বোঝাই। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভিড়ে জানালার ধার ঘেঁষে প্রায় বাহুবলেই একটুখানি জায়গা জোগাড় করতে পেরেছিল অমলেশ। সে উঠবার পর বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় নি; হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

ঘড়ির কাঁটায় এখন আটটা।

হাওড়া থেকে ট্রেনটা ক'টা স্টেশন পার হয়ে এসেছে অমলেশ গুনে রাখেনি। মনে পড়ছে, গাড়ি ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, পরে দুর্বার বেগে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। কাজেই অমলেশদের কামরায় তাবৎ দরজা-জানালা ভেতর থেকে টেনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অমলেশ অবশ্য জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে দূরমনস্কের মতো বাইরে তাকিয়ে ছিল। সেখানে কোনো বিস্ময়ই নেই; শুধু গাঢ় কালো আকারহীন অন্ধকার। টের পাওয়া যাচ্ছে, পুবে বাতাস আর

তীরের ফলার মতো অবিরাম বৃষ্টি জানালার কাচে রুদ্ধ আক্রোশে অনবরত আঘাত হেনে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ঋতুর এই রাতটার ওপর একটা সর্বনাশের আত্মা যেন ভর করে বসেছে।

বাতাসের মত্ততা, বৃষ্টির হানাহানি, বিদ্যুৎ চমক—অমলেশের চেতনায় কিছুই রেখাপাত করতে পারছিল না। অমলেশ শুধু ভাবছিল; গভীর নিরাকার ভাবনার ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল সে। মনে হচ্ছিল ট্রেনে করে এই যাওয়াটা সত্যি না, স্বপ্নের ঘোরে বুঝিবা বীজপুরের যাত্রী হয়ে বসেছে।

আশ্চর্য! কোনোদিন যে বাংলাদেশে আসতে হবে, অমলেশের সুদূর কল্পনাতেও এমন আকাঙক্ষা ছিল না। এ ছিল তার পক্ষে অভাবনীয়। ছেলেবেলায় একবার বাবার সঙ্গে অবশ্য এসেছিল; একবারই শুধু। এদেশের ধানের খেত, নদী, খাল, বিল, সবুজ বনানী, মাঠ এবং প্রান্তর—এসব অস্পষ্টভাবে অমলেশের মনে ছিল। এইটুকুই মাত্র। বাংলাদেশ অমলেশের স্মৃতিতে আছে, অনুভবে নেই।

দু পুরুষ বোম্বাইতে আছে তারা; বাংলাদেশ সম্বন্ধে সামান্য মোহটুকু পর্যন্ত অমলেশের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। মাত্র বাবশ মাইল দূরে এই দেশ; অমলেশের পিতৃভূমি। কিন্তু মনের দিক থেকে সে গ্রহান্তরের মানুষ। আরবসাগরের পাড়ের একটি শহর বঙ্গোপসাগরের কূলের এই দেশটাকে অমলেশের অনুভূতি থেকে প্রায় মুছে দিয়েছে।

বাংলাদেশের নামে তার প্রাণে তরঙ্গ ওঠে না; বুকের ভেতর আবেগের নদীটি বিন্দুমাত্র উথলায় না। এদেশের কোনো কিছুই অমলেশকে কোনোদিন মুগ্ধ বা অভিভূত করে নি; সত্তার কোনো তারে ঝঙ্কার তোলে নি। এদেশ নিয়ে বিস্ময় অহঙ্কার কিংবা গ্লানি, কিছুই তার নেই। পিতৃভূমি অমলেশের কাছে কথার কথা মাত্র।

বাংলাদেশে অমলেশ নিতান্তই অচেনা আগন্তুক। 'বিদেশি'ই তার সব চাইতে সার্থক বিশেষণ। তবু যে এখানে ছুটে এসেছে তা শুধু নবেন্দুর জন্য। অথচ নবেন্দু তার আত্মীয় না, স্বজন না, বন্ধু না, কেউ না। সামান্য কিছু পরিচয় ছাড়া তার সঙ্গে অমলেশের কোনো সম্পর্ক নেই।

অমলেশ এসেছে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে। অবশ্য একটা টেলিগ্রাম করে অনায়াসেই নবেন্দুর বাবা-মা'কে খবরটা জানিয়ে দিতে পারত। অমলেশ তা করেনি।

নবেন্দুর মৃত্যু ছাড়াও আর একটা ব্যাপার ঊর্ধ্বশ্বাসে অমলেশকে ভারতবর্ষের এ প্রান্তে ছুটিয়ে এনেছে। নিজেদের সংসার সম্বন্ধে নবেন্দু অমলেশকে কিছু কথা বলেছিল। অমলেশ তার সত্যতা যাচাই করতে এসেছে।

কতক্ষণ নিজের ভাবনার ভেতর তলিয়ে ছিল, খেয়াল নেই। একটা স্টেশনে এসে গাড়িটা থামল। এখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে, পৃথিবীকে রসাতলে না পাঠানো পর্যন্ত দ্বিতীয় ঋতুর এই রাতটা বোধহয় থামবে না।

একটা ব্যাপার অমলেশ লক্ষ করেছে। হাওড়া থেকে বেরুবার পরই এ কামরার দরজা-জানালাগুলো সেই যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারপর সহজে আর খুলতে চায় নি।

দরজার মুখ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স। তার ওপর যে বসে আছে বয়সে সে প্রৌঢ়, উৎসাহে তরুণ। এই কামরার সে-ই দুর্গরক্ষী তথা সেনাপতি। নেহাত যে সব যাত্রী নামতে চায় তাদের জন্য বাক্সটা একটু সরিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার সেটা টেনে দেয় সে। নামতে চাইলে নামা যাবে কিন্তু নতুন যাত্রীদের পক্ষে এ কামরা নিষিদ্ধ অঞ্চল। হাজার মাথা কুটলেও তাদের জন্য 'এখানকার দরজা ইঞ্চিখানেকও ফাঁক হবে না। ট্রাঙ্ক এবং সেনাপতি সেখানে অনড় বসে আছে।

প্রৌঢ়র হাতে নিজেদের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে এ কামরাটা বেশ নিশ্চিন্ত আছে। কিন্তু কিছু লোক নেমে গেলেও ভিড় যেমন ছিল প্রায় তেমনি রয়েছে। তেমনি আকণ্ঠ, তেমনি ঠাসবুনন। যতজন বসতে পেরেছে তার দশগুণ দাঁড়িয়ে। সবাই প্রায় কথা বলছে, ফলে মাছির ভনভনানির মতো একটা শব্দ অমলেশের কানের পর্দায় অবিরাম ঘা দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আছে বিড়ির ধোঁয়া, পানের পিক, বাদামের খোসা। সব মিলিয়ে বায়ুশূন্য শ্বাসরোধী এক জগতে কেউ অমলেশকে ছুঁড়ে দিয়েছে বুঝি।

গাড়িটা স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘা পড়ল, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—'

মেয়েমানুষের গলা, কিন্তু সেনাপতির হৃদয় দ্রবীভূত হবার লক্ষণ দেখা গেল না। চোখ আধাআধি বুজে আয়েস করে ফুক ফুক বিড়ি টেনে যাচ্ছে সে।

সেই গলাটা আবার শোনা গেল, 'দয়া করে খুলন, একদম ভিজে গেলাম—'

অমলেশ পুরোপুরি শুনতে পেল না; পুবে বাতাসের ঝাপটায় বাকি কথাগুলো অন্য দিকে উড়ে গেল।

এদিকে সেনাপতি অটল। বিড়ি টানায় কোনোরকম বিঘ্ন ঘটবে বলে মনে হল না। দরজায় ধাক্কা চলেছেই। সেই সঙ্গে সমানে ডাকাডাকি, 'কেউ দরজা খুলছে না। এ ট্রেনে যেতে না পারলে আজকের রাতটা বাইরে কাটাতে হবে আমাকে। একা মেয়েছেলে—' কণ্ঠস্বর এবার করুণ, ব্যাকুল, মিনতিপূর্ণ।

সেনাপতি এবারও অবিচলিত।

প্রৌঢ়র যে রণকৌশল এবং চাতুর্য অমলেশকে চমৎকৃত করেছিল, এখন তা নিদারুণ অমানুষিক মনে হল। তার অভিভাবকত্বে হাওড়া থেকে এতদূর পথ নিশ্চিন্তে পাড়ি জমাতে পেরেছে, সে কথা অমলেশের মনে থাকল না। এই দুর্যোগের রাতে একটি মেয়ে অথবা মহিলা একা একা কোথায় থাকবে, কী করবে, এই চিন্তাটা অমলেশের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিল। নিজের অজান্তেই বুঝিবা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে, তারপর প্রৌঢ়কে একটানে তুলে বাক্স সরিয়ে দরজা খুলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম থেকে যে উঠে এল, উপমা দিয়ে বলা যায় সে রাজহংসী।

মেয়ে যে, গলার স্বরে আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মুখোমুখি যে দাঁড়িয়ে সে অভাবনীয়া, অমলেশের সুদূর কল্পনায় তার ছায়ামাত্র ছিল না।

বৃষ্টির ছাটে প্রায় ভিজেই গেছে। গাল কপাল আর চুল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। তবু বুঝতে পারা যায়, তার বয়স খুব বেশি হলে তেইশ চব্বিশ। গায়ের রং রৌদ্র ঝলকের মতো। পরনে সাদা শাড়ি, সাদা জামা। বাঁ-হাতের কবজিতে সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা ঘড়ি, ডান হাতে এক গোছা কাচের চুড়ি, কানে পাথর বসানো ইয়ার রিং। এই সামান্য বেশে সামান্য সাজেও সে জাদুকরী।

মেয়েটা মোটামুটি সুবেশা, চেহারায় সুচারু একটি ছাঁদ আছে। কিন্তু তাকে সুকেশী বলা যায় কি না, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। চুলের রং তার কালোই; তবে তেল না দেবার জন্যই হয়তো রুক্ষ। নাক তীক্ষ্ণ, গলায় মরালীর মতো মসৃণ দীঘল টান। চোখের তারা দুটো তার কুচকুচে কালো উজ্জ্বল মণিখণ্ডের মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সে দুটো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চঞ্চল, শাণিত। কিন্তু লক্ষ করলে টের পাওয়া যাবে, চোখের ভেতর কোথায় খানিকটা ভয় বা অস্থিরতা মিশে আছে।

মেয়েটা গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল। দরজা খোলা পেয়ে পুবে বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাট হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সে অমলেশের দিকে ফিরল। তীক্ষ্ণ বিরক্ত গলায় বলল, 'এতক্ষণ ধরে ধাক্কা দিচ্ছি, ডাকছি, দরজা খুলছিলেন না কেন?'

উত্তরটা অমলেশের জানা ছিল, দিতে পারল না। চুপ করে থাকল।

মেয়েটি অমলেশের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'গাড়িটা আপনাদের সম্পত্তি বলে মনে হচ্ছে। নিজেরা ছাড়া কাউকে উঠতে দেবেন না?'

যদিও বিরক্তি ও তীব্রতা মেশানো তবু বোঝা যায় মেয়েটার কণ্ঠস্বর সুরেলা, আশ্চর্য ধ্বনিময়। যাই হোক, দরজা বন্ধ করে রাখাটা অমলেশেরই কারসাজি বলে সে হয়তো ধরে নিয়েছে।

অমলেশ বিড়বিড় করে কী বলল, নিজেই বুঝতে পারল না।

গলার স্বরে ধিক্কার মিশিয়ে মেয়েটা বলল, 'ছিঃ, আপনাদের সামান্য মনুষ্যত্বটুকু পর্যন্ত নেই। এটাই লাস্ট ট্রেন, এটা ধরতে না পারলে ঝড়-বৃষ্টিতে আমার কী অবস্থা হত বলুন তো?'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে আর সাহস হল না অমলেশের। নিঃশব্দে নিজের জায়গায় ফিরে এল সে। ফিরেও কিন্তু চোখ ফেরাতে পারল না। সজ্ঞানে নয়, অজ্ঞাতসারেই হয়তো বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। নাকি দুর্বার আকর্ষণে মেয়েটা অমলেশের চোখ দুটো নিজের দিকে টেনে রেখেছে?

অমলেশই শুধু না, এ কামরায় সব ক'টি যাত্রী স্থির নিষ্পলকে মেয়েটিকে দেখছিল। দৃষ্টি যদি বাণ হত, মেয়েটাকে অনেক আগেই ভীষ্মের শরশয্যা পাততে হত।

কামরাসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে। মেয়েটির কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই। দৃষ্টিটাকে সে কামরার চারধারে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। খুব সম্ভব বসবার মতো একটা জায়গা খুঁজে বার করা তার উদ্দেশ্য। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মেয়েটার নজরে পড়ল, অমলেশের কাছাকাছি একটা উঁচু বস্তা পড়ে আছে। অনায়াসেই সেটার ওপর বসা যায়। দেখামাত্র যাত্রীদের ভেতর দিয়ে পথ করে বস্তাটার কাছে চলে এল সে। সঙ্গে তার বিশেষ কিছুই নেই, চামড়ার ছোট একটা সুটকেস শুধু।

মেয়েটা বসে পড়েছে। তার পাশেই কাঠের দেওয়াল, সে দেওয়ালে হেলান দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল।

অমলেশ তাকিয়েই ছিল। ঘুমন্ত মেয়েটাকে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত কোমল এবং অসহায় মনে হচ্ছে। একটু আগে রুক্ষ কর্কশ স্বরে যে কথা বলছিল সে যেন এ নয়, অন্য কেউ।

তাকিয়ে তাকিয়ে অমলেশের বিস্ময় যেন আর কাটছে না। বিস্ময়টা একাধিক কারণে। প্রথমত, মেয়েটা আশ্চর্য সুরূপা, দ্বিতীয়ত অত্যন্ত সাবলীল। তৃতীয়ত, এত রাতে এই লাস্ট ডাউন ট্রেনে একা একা কোথায় চলেছে সে!

নিদারুণ এক কৌতূহল নিতান্ত অকারণে অমলেশকে একটু একটু করে বেষ্টন করতে লাগল।

মেয়েটা খুব কাছে বসে আছে। তার শরীর থেকে একটা গন্ধ আসছিল। স্নিগ্ধ, মৃদু গন্ধ। অমলেশের নাকের ভেতর দিয়ে সেটা ঢুকে স্নায়ুগুলোকে ক্রমশ অবশ আর বিহ্বল করে ফেলছে।

বোম্বাইতে পার্শি মেয়েদের অমলেশ দেখেছে, সিন্ধি এবং পাঞ্জাবিদের দেখেছে। তারা সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল। বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানত না; অবশ্য অনেক কিংবদন্তি শুনেছে। তারা হচ্ছে লজ্জা এবং সংকোচের জড়সড় এক একটি পুঁটুলি। ছুঁতে গেলে গুটিয়ে যায় কী যেন এক লতা আছে, তারা তা-ই। কিন্তু এই মেয়েটা অমলেশের এতদিনের ধারণার প্রতিবাদ।

ট্রেনটা আরো চারটে স্টেশন পার হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মেয়েটির দিক থেকে কখন চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অমলেশের মনে নেই।

প্রায় আড়াই দিনের মতো ট্রেনে ট্রেনে ঘুরছে অমলেশ। অসীম ক্লান্তিতে কখন যে ঝিমুনি এসেছিল, জানে না। কামরার লোকগুলোও বিমূঢ় বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে গাড়ির দোলানির তালে তালে ঢুলতে শুরু করেছে।

মেয়েটা এ কামরায় উঠবার পর চারটে স্টেশন অমলেশরা নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসেছে। কিন্তু পঞ্চম স্টেশন আসতেই বাইরে থেকে আবার ধাক্কা পড়ল। মেয়েটার মতো দুর্বল হাতে নয়, জোরে জোরে প্রচণ্ড শক্তিতে। শুধু ধাক্কাই না, সেই সঙ্গে বুটের লাথিও পড়ছে।

মেয়েটা ঢুকবার পর দরজার কাছের সেই প্রৌঢ় কাঠের বাক্সটা টেনে দিয়ে কামরাটাকে আবার দুর্ভেদ্য করে ফেলেছিল এবং টান হয়ে বাক্সটার ওপরেই শুয়ে পড়েছিল। খুব সম্ভব ঘুমটা তার পাকে নি। পরিপাটি হয়ে আসা তন্দ্রাটা ভেঙে যেতে খেঁকিয়ে উঠল, 'এ কামরায় মাছি গলবার জায়গা নেই। অন্য কোথাও দেখুন—'

ধাক্কা আর লাথিবর্ষণ থেমে গেল। তার বদলে মোটা সুরহীন গলায় কড়া নির্দেশ এল, 'তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন। পুলিশ—'

'ভাঁওতা মারবার জায়গা পাও না? ও সব তাল এখানে চলবে না। পুলিশের নাম করলেই উঠতে দেব, তেমন পাত্তর আমি না।'

'দরজা খুলে দাও বলছি। নইলে ভেঙে ঢুকব—' কণ্ঠস্বর এবার বেশ কঠোর, রূঢ়। প্রৌঢ়র কেমন যেন খটকা লাগল। ধীরে ধীরে উঠে দরজা খুলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের দু'জন কনস্টেবল নিয়ে একজন ইন্সপেক্টর বৃষ্টিতে প্রায় নেয়ে কামরায় ঢুকলেন।

পুলিশ নামের মহিমা আছে। যাত্রীদের চোখ থেকে বর্ষারাত্রির ঢুলুনি ছুটে গেল। কামরাময় সন্ত্রস্ত ভীত গুঞ্জন উঠেছে, 'পুলিশ কেন?'

অমলেশের ঝিমুনিও ছুটে গেল। লক্ষ করল, ইতিমধ্যে সেই মেয়েটির ঘুমও কখন ভেঙে গেছে। চোখমুখ দেখে অনুমান করা যায়, রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে তীক্ষ্ণ শিকারি চোখে কী যেন খুঁজছিলেন ইন্সপেক্টর। তাঁর চোখদুটো চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত অমলেশের পাশের সেই মেয়েটার ওপর স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো কী যেন খেলে গেল তাঁর চোখে মুখে।'

করায়ত্ত শিকারের দিকে বনের বাঘ যেমন সকৌতুক তৃপ্তির সঙ্গে তাকায়, ইন্সপেক্টরের চোখে অবিকল সেই দৃষ্টি। ভাবখানা এই, কোথায় যাবে চাঁদ, তুমি এখন আমার মুঠোর ভেতর।

কয়েক পলক নিশ্চল হয়ে থাকলেন ইন্সপেক্টর। তারপর উল্লসিত চাপা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হিয়ার ইউ আর' বলেই একে-ওকে-তাকে ডিঙিয়ে মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কনস্টেবল দুটোও তাঁর পিছু পিছু এসে পড়ল।

মেয়েটার চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে। চোয়াল কঠন, ঠোঁট শক্তবদ্ধ। কপালে কণা কণা ঘাম দেখা দিয়েছে। একটু আগের চাঞ্চল্য আর নেই। সমস্ত শরীর ঘিরে কেমন যেন বেপরোয়া, মরিয়া ভাব।

ইন্সপেক্টরই প্রথম কথা বললেন, 'সেই জংশন স্টেশন থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। খুঁজে খুঁজে মরি, ধরিতে না পারি। খুব লুকোচুরি খেললেন যা হোক।'

কাঁপা অস্ফুট সুরে মেয়েটা বলল, 'লুকোচুরি কিরকম?'

'রকম জানতে চাইছেন?' শব্দ করে ইন্সপেক্টর হেসে উঠলেন, 'সেটা আমার কাছ থেকে না-ই শুনলেন। নিজেই তো ভাল জানেন।'

মেয়েটা উত্তর দিল না। দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়াল। তার নির্নিমেষ স্থির দৃষ্টি ইন্সপেক্টরের মুখের ওপর। সে দৃষ্টিতে অটুট কাঠিন্য।

ইন্সপেক্টর বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন, 'তারপর ম্যাডাম—'

'কী?' ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল মেয়েটার।

'একেবারে খালি হাতে দেখছি যে? মাল পাচার করে ফেলেছেন নাকি?'

মেয়েটা নিশ্চুপ।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'জংশন স্টেশনে দেখলাম আপনার হাতে কী একটা ব্যাগ না সুটকেস—সেটা কোথায়?'

বীজপুরগামী লাস্ট ডাউন ট্রেনে বিচিত্র রহস্যময় এই নিশীথ-নাটকের দর্শক অমলেশ। আগাগোড়া একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে। দর্শক একা অমলেশই না, এ কামরার তাবৎ যাত্রী। মেয়েটা যখন এ কামরায় ওঠে তখনই অমলেশের অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ে কেউ যেন বার বার জানান দিয়ে যাচ্ছিল, সে সহজ নয়। যে মেয়ে দুর্যোগের রাতে একা একা লাস্ট ডাউন ট্রেনে ঘুরে বেড়ায় তাকে ঘিরে সর্বনাশা ইঙ্গিত রয়েছে।

চকিতে অমলেশের মনে পড়ে গেল, গাড়িতে উঠবার সময় মেয়েটার হাতে চামড়ার নতুন একটা সুটকেস ছিল। চারদিকে আতিপাঁতি করে খুঁজেও তার চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারল না অমলেশ। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর পোশাক ছাড়া মেয়েটির সঙ্গে আর কিছুই নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। সুটকেসটা কি তবে অমলেশ ভুল দেখেছিল?

চাপা, অনুচ্চ গলায় মেয়েটা বলল, 'আমার সঙ্গে কিছু নেই।' স্বরের মধ্যে দিয়ে একটা তরঙ্গ খেলে গেল।

ইন্সপেক্টরের চোখ কুঁচকে গেছে, দৃষ্টিটা সন্দিগ্ধ। জোরে জোরে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সংশয়ের সুরে তিনি বললেন, 'চোখ আমার এত খারাপ হয় নি—উঁহু। নিশ্চয়ই আপনার হাতে কিছু ছিল।

কোথায় সেটা বলুন।' একটু আগে তাঁর কথায়বার্তায় কৌতুকের কিছুটা আমেজ ছিল। এখন তাতে ভিন ভাবের রং ধরেছে। সুরটা এখন পুরোপুরি পুলিশসুলভ অর্থাৎ রসকষহীন এবং কর্কশ।

অমলেশ লক্ষ করল, বর্ষার এই শীতল রাত্রিতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে মেয়েটা। ঠোঁট দুটো আর হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক কাঁপছে। প্রাণপণে সেই কাঁপুনির বেগ সামলাতে চেষ্টা করল সে। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কাছে কিচ্ছু নেই। কেন শুধু শুধু পেছনে লেগেছেন?'

'কিচ্ছু নেই?'

'না।'

'শুধু শুধু পেছনে লেগেছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'চমৎকার।' ইন্সপেক্টরের চোখ ধীরে ধীরে উগ্র হয়ে উঠতে লাগল; সেই সঙ্গে মেয়েটির কাছে কিছু দেখতে না পেয়ে আশাভঙ্গের ছায়াও তাতে পড়েছে।

ইন্সপেক্টরের হতাশার ব্যাপারটা যেন আঁচ করে ফেলল মেয়েটা। কঠিন গলায় বলল, 'একজন ভদ্রমহিলাকে অকারণে হ্যারাস করছেন, এর ফলাফল কিন্তু আপনার পক্ষে খুব ভাল হবে না অফিসার।'

ইন্সপেক্টর কিছু বললেন না। তার মুখখানা শুধু সাঙঘাতিক হয়ে উঠল। সাঙঘাতিক এবং নির্মম। অকারণে উত্ত্যক্ত করার জন্য মেয়েটির অভিযোগ এবং সতর্কবাণী তাঁকে যেন ক্ষিপ্ত করে তুলল। সন্ধানী শিকারি চোখ চালিয়ে বেঞ্চির তলায় ডাঁই-করা মালপত্রের ফাঁকে ফাঁকে কী যেন খুঁজতে লাগলেন তিনি। খুব সম্ভব জংশন স্টেশনে মেয়েটির হাতে অস্পষ্টভাবে দেখা কোনো ব্যাগ অথবা ওই রকম কিছু।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ইন্সপেক্টরের চোখের তারা নেচে উঠল। নিষ্ঠুর উল্লাসের অব্যক্ত একটা ধ্বনি তাঁর গলার ভেতর থেকে যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'দেয়ার ইউ আর!' পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে এলেন তিনি।

ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি অনুসরণ করে অমলেশের চোখ তার নিজেরই পায়ের পেছন দিকে আটকে গেল। অমলেশ যে বেঞ্চিতে বসে আছে তার তলায় অন্ধকারে সেই চামড়ার সুটকেসটা। আশ্চর্য, ওটা ওখানে কিভাবে গেল, অমলেশ ভেবে পেল না।

ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে বললেন, 'কাইন্ডলি আপনার পা দুটো সরান তো—'

অমলেশ তৎক্ষণাৎ পা সরিয়ে নিল না। চকিতে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মেয়েটির মুখের ওপর। একটু আগের সেই অটুট কাঠিন্য এখন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি কেমন উদ্‌ভ্রান্ত এবং অসহায়। আতঙ্কের একটা ছায়া চারদিক থেকে তাকে একটু একটু করে ঘিরে ধরেছে। হাত-পা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ছে। মৃতের মতো স্তব্ধ ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে সে।

ভাবশূন্য, তবু অমলেশের মনে হল দৃষ্টির সেই শীতল জমাট স্তব্ধতা দিয়ে অনুনয়ের মতো কিছু একটা জানাতে চেষ্টা করছে মেয়েটা। কী জানাতে চাইছে? এই মুহূর্তে অমলেশ তা বুঝতে পারল না।

এদিকে ইন্সপেক্টর কাছে এসে গেছেন। বেঞ্চির দিকে ঝুঁকে বললেন, 'কী হল, পা সরান।'

পা না সরিয়ে এবার পারল না অমলেশ। পা সরাল ঠিকই কিন্তু চোখ দুটি বরাবর মেয়েটির মুখেই স্থির হয়ে আছে। মেয়েটার পাতলা রক্তাভ ঠোঁট কুঁকড়ে যাচ্ছে। সামলাবার জন্য বার বার সে দুটো কামড়ে কামড়ে ধরছে। হাত দুটো আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। এবার যেন মেয়েটার চোখের ভাষা খানিক পড়তে পারল অমলেশ। সঙ্গে সঙ্গে ধমনীতে রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়—নিদারুণ এক ভয় অমলেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ইন্সপেক্টর বেঞ্চির তলায় হাত ঢুকিয়ে সুটকেসটা বার করে এনেছিলেন। সুটকেস না, ওটা বুঝিবা তাঁর সারা জীবনের সারাৎসার—তাঁর ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ।

বাঞ্ছিত বস্তুটিকে ওপর দিকে তুলে ইন্সপেক্টর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তবে যে বললেন কিছু নেই আপনার সঙ্গে! এটা তা হলে কী?'

মেয়েটা উত্তর দিল না, খুব সম্ভব দিতে পারল না। অসহ্য স্নায়ুভীতিতে এখন তার কথা বলার শক্তি নেই।

সুটকেসটা দোলাতে দোলাতে ইন্সপেক্টর টেনে টেনে বলতে লাগলেন, 'আপনি না ভদ্রমহিলা! কেমন ভদ্রমহিলা, এবার আমি দেখব।'

'ভদ্রমহিলা' শব্দটির ওপর অস্বাভাবিক জোর দিলেন ইন্সপেক্টর। উচ্চারণের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ধিক্কার এবং শ্লেষ। হয়তো কিছুটা অশোভনতাও।

এতক্ষণ বিহ্বল দর্শকের মতো দেখছিল অমলেশ। অকস্মাৎ তার বুকের মধ্যে ধস নামল, সঠিক কী যে ঘটল বোঝানো যাবে না। নিজের অজান্তে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মতো চেঁচিয়ে উঠে অমলেশ বলল, 'ওটা আমার সুটকেস—দিন।' বলেই হাত বাড়াল। সম্ভবত এই কথাটাই দৃষ্টির আকুলতা দিয়ে অমলেশকে জানাতে চেয়েছিল মেয়েটা।

অমলেশ যা বলছে তাতে দু'জনের প্রতিক্রিয়া হল দু রকম। মেয়েটার শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আবার নিজের বশে ফিরে আসতে লাগল যেন। মুখের রেখায় রেখায় আগের সেই কাঠিন্য দেখা দিয়েছে আর ভাবলেশহীন চোখের তারায় অমলেশের আচরণে প্রথমটা বিস্ময় খেলে গিয়েছিল, তারপরেই সে দুটো জ্বলে উঠল। ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে কর্কশ সুরে বলল, 'ও সুটকেস আমার নয়।'

ইন্সপেক্টর থতিয়ে গেলেন এবার। এরকম একটা ব্যাপারের জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। বিমূঢ়ের মতো বললেন, 'এটা আপনার সুটকেস না?' স্বরটা তাঁর স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন তোতলামির রেশ তাতে মেশানো।

'না।' পরিষ্কার জবাব মেয়েটার।

অবাক হয়ে গেল অমলেশ। এতখানি জোর দিয়ে কত অনায়াসে মিথ্যে বলল মেয়েটা, গলা একটুও কাঁপল না।

ইন্সপেক্টর এবার অমলেশের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ধারাল, দূরভেদী। বললেন, 'এ সুটকেসটা আপনার? আর ইউ সিওর?'

মুহূর্তের জন্য ভেতরের শ্বাসটা আটকে গেল যেন, ধমনী একেবারে স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পর হৃৎপিণ্ডের আবদ্ধ বাতাস কোনোরকমে বার করে দিয়ে অমলেশ রুদ্ধস্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই, ওটা আমার সুটকেস।'

মিথ্যে বলেছে অমলেশ, নিদারুণ ভয়াবহ মিথ্যে। মিথ্যে বলার এই দুর্জয় সাহস কোত্থেকে থেকে যে পেল তা বলতে পারবে না সে। কেনই বা এমন বিপজ্জনক মিথ্যেটা উচ্চারণ করল তারও কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তবে কি রহস্যময়ী মেয়েটার আশ্চর্য রূপ আর চোখের ভীত করুণ চাহনি অমলেশের অবচেতনে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিয়েছে?

ইন্সপেক্টর তীব্র দৃষ্টিতে একটুক্ষণ অমলেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সুটকেসটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে মেয়েটির দিকে ফিরলেন। রুক্ষ সুরে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

মৃত্যুর মতো আড়ষ্ট স্তব্ধতা আগেই কেটে গিয়েছিল মেয়েটার। চোখমুখ রীতিমত উগ্র হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ গলায় মেয়েটি বলল, 'আবার বলছি, আপনি শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করছেন। এর ফলাফল আপনার পক্ষে খুব খারাপ হবে।'

'ফলাফলটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।' ইন্সপেক্টরের মুখে ধূর্ত হাসি খেলে গেল।

মেয়েটা চুপ।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'অনুগ্রহ করে এবার আমার সঙ্গে চলুন।'

'বলছি ও সুটকেস আমার না, তবু যেতে হবে?' মেয়েটা দাঁতে দাঁত চাপল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি করুন, গাড়ি এক্ষুনি ছেড়ে দেবে।'

'চলুন—' অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল মেয়েটা। খানিক আগে যে কাঠিন্য তার মধ্যে দেখেছিল, অমলেশের মনে হল তার ভিত যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মেয়েটা নেমে যাবার পর অনেকখানি সময় কেটে গেছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে ট্রেনটা বীজপুরের কাছাকাছি যত এসে পড়ছে, অমলেশের অস্বস্তি ততই বেড়ে চলেছে। অস্বস্তিই শুধু না, সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠাও। সুটকেসটা এখনও তার পায়ের কাছেই পড়ে আছে। মেয়েটা যদি আর নাই ফেরে, সুটকেসটা নিয়ে কী করবে অমলেশ?

শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা বীজপুর পৌঁছে গেল। এখনও মেয়েটা ফিরে আসেনি। বুকের ভেতর সীমাহীন অস্বস্তি পুরে সুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়ল অমলেশ। নামতে নামতে ঠিক করল, স্টেশন মাস্টারের কাছে এটা জমা দিয়ে যাবে। মেয়েটার নাম-ঠিকানা জানা থাকলে সময় করে না হয় দিয়ে আসত। কিন্তু তার তো উপায় নেই।

বীজপুরের কাঁকর-ঢালা সুবিস্তৃত স্টেশন শূন্যপ্রায়। লাস্ট ট্রেন থেকে অনেক লোক নামল ঠিকই কিন্তু নেমেই তারা নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কে বলবে। অমলেশের জন্য কেউ বসে রইল না।

প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় অ্যাসবেস্টসের সংক্ষিপ্ত ছাউনি। সেখানে মিট মিট করে আলো জ্বলছে। এ ছাড়া যেদিকে যতদূর তাকানো যায় গাঢ় অন্ধকার।

বৃষ্টিটা আগের মতো জোরাল নেই। কিন্তু সমানে ঝরেই যাচ্ছে। পুবে বাতাসের ছাটটাও রয়েছে। বিদ্যুতের ঝলক, আকাশ জুড়ে কালো কালো মেঘের চাংড়া, তাদের একটানা আওয়াজ—আয়োজনের কোথাও খুঁত নেই। যে কোনো মুহূর্তে আবার প্রবল বেগে শুরু হয়ে যেতে পারে।

অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় টিমটিমে আলো দেখে মনে হল ওটাই স্টেশন মাস্টারের ঘর টর হবে। ট্রেন থেকে নেমে জোরে জোরে সেদিকে পা চালিয়ে দিল অমলেশ। উদ্দেশ্য, প্রথমত সুটকেসটা জমা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, রাত কাটাবার মতো একটা আস্তানার সন্ধান। আজ এত রাতে এই ঝড়জল মাথায় নিয়ে নবেন্দুর বাড়ি যাবে না, যাওয়া ঠিক হবে না। এভাবে মৃত্যু-সংবাদ জানাতে যাওয়া চরম নিষ্ঠুরতা। কাল একটু বেলা হলে ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।

ছাউনিটার কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছে অমলেশ, ঠিক তখনই দেখতে পেল ট্রেনের সেই মেয়েটা যেন আকাশ থেকে নেমে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

থমকে গেল অমলেশ। সবিস্ময়ে বলল, 'আপনি!'

সামান্য হেসে মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'বাঁচা গেল।' অমলেশের বুকের ভেতর থেকে স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল, 'আপনার সুটকেসটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, স্টেশন মাস্টারের কাছে জমা করে দেব। নিন, নিজের জিনিস বুঝে নিন।'

হাত বাড়িয়ে মেয়েটা সুটকেস ধরল। আর সেই মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ে গেল অমলেশের। বলল, 'কিন্তু—'

'কী?' মেয়েটা উন্মুখ হল।

'আমি যে এই স্টেশনে নামব, আপনি নিশ্চয়ই জানতেন না। না জেনে আন্দাজে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি না-ও তো নামতে পারতাম।'

'আপনি কোথায় নামবেন তা জানতাম না ঠিকই।' মেয়েটা বলতে লাগল, 'তা ছাড়া পুলিশ ইন্সপেক্টর তখন অন্য কম্পার্টমেন্টে আমাকে নিয়ে তুলেছিল। তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যখন পরের স্টেশনে নামলাম, আপনার কামরাটা গুলিয়ে গেছে। কিছুতেই আর খুঁজে বার করতে পারলাম না। এদিকে গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, কাজেই সামনে যে কামরাটা পেলাম সেইটেতেই উঠে পড়লাম। তারপর এক একটা স্টেশন এসেছে, প্ল্যাটফরমে নেমে অপেক্ষা করেছি যদি আপনি নামেন। শেষ পর্যন্ত বীজপুরে এসে আপনার দেখা পাওয়া গেল।' বলতে বলতে একটু থামল সে, পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'আপনি আমার যা উপকার করলেন, বলে বোঝাতে পারব না। সামান্য ধন্যবাদে সে ঋণ শোধ হয় না।'

পুলিশের হাত থেকে সুটকেসটা রক্ষা করে এতটা পথ যখের মতো আগলে এনে তার হাতে তুলে দিয়েছে, মেয়েটার কৃতজ্ঞতা নিশ্চয়ই সেই কারণে। মৃদু হেসে অমলেশ বলল, 'ধন্যবাদের দরকার নেই। তবে—'

'কী?'

হঠাৎ অমলেশের ওপর দুষ্টুমি যেন ভর করল। বলল, 'একটা সুটকেস পেয়ে গেছি। তার ভেতর কী আছে জানি না, দামি কিছু থাকতেও পারে। ধরুন আমি যদি এই স্টেশনে না নামতাম?'

মেয়েটা তাকিয়ে ছিল। বলল, 'এখানে না নেমে উপায় কী, বীজপুর এ লাইনের লাস্ট স্টেশন।'

'তা জানি। ধরুন আমি নামলাম না, ওই ট্রেনেই আজ হোক কাল হোক যদি কলকাতায় ফিরে যেতাম, আপনিও কি সেই পর্যন্ত ছুটতেন?'

মেয়েটা বিচিত্র হাসল, 'অতগুলো 'যদি' একসঙ্গে ঘটানো সোজা কথা নয়। সত্যিই যদি ঘটত, নিশ্চয়ই কলকাতা পর্যন্ত ছুটে যেতাম। কলকাতা কেন, আপনি পৃথিবীর শেষ মাথায় গেলেও ছাড়তাম না। পিছু পিছু ধাওয়া করতাম। কেন জানেন?'

'কী করে জানব?'

মেয়েটি হঠাৎ ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ওই সুটকেসের ভেতর আমার প্রাণ-ভোমরা আছে।'

মেয়েটা কি প্রগলভ? হয়তো, হয়তো। অমলেশের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না; সে চুপ করে রইল।

অল্পক্ষণ নীরবতা। তারপর খুব সহজ স্বাভাবিক সুরে মেয়েটা বলল, 'আপনি কি বীজপুরেই থাকেন?'

সামান্য দ্বিধা, তারপর সজ্ঞানে মিথ্যেই বলল অমলেশ, 'হ্যাঁ।' কেননা যদি বলে এ শহরে সে অচেনা আগন্তুক তা হলে কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, এত রাতে কোথায় থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নের মুখে পড়বার সম্ভাবনা। এত রাতে অত জবাবদিহি অমলেশের পোষাবে না।

মেয়েটা বলল, 'আমি এখানেই থাকি। কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু সুরে অমলেশ বলল, 'কী?'

'আপনাকে এর আগে কোনোদিন তো দেখিনি।'

'বীজপুরের সব লোককেই আপনি চেনেন নাকি?'

'আলাপ টালাপ না হলেও মুখ চেনা আছে বৈকি। বিশেষ করে লাস্ট ট্রেনে যারা ফেরে তাদের সবাইকেই চিনি।' মেয়েটা হাসল।

সে যে অনায়াসগামিনী, সাবলীল, নিশুতি রাতে একা একা চলার অভ্যাস তার আছে—আগেই অমলেশ তা টের পেয়েছিল। বলার ইচ্ছা ছিল না তবু কখন যেন বলে ফেলেছে, 'আপনি বুঝি রোজই লাস্ট ট্রেনে ফেরেন?'

'রোজ না, তবে প্রায়ই। ওই ট্রেনটার আগে ফেরা আর হয়ে ওঠে না।' মেয়েটা বলল, 'স্টেশনে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? চলুন—'

'কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে যে।'

'এখন অল্প অল্প পড়ছে, এর চাইতে আর কমবে বলে মনে হয় না। কখন আবার যে বেড়ে যাবে! চলুন, চলুন—' মেয়েটা বলতে লাগল, 'আজ আবার সাইকেল রিকশাগুলোর পাত্তা নেই। বর্ষা দেখে পালিয়েছে। ভিজতে ভিজতে যেতে হবে দেখছি।'

অসঙ্কোচে মেয়েটা তার সঙ্গে যেতে বলছে। এটা ভদ্রতা। কিন্তু এত রাতে এই দুর্যোগের ভেতর বীজপুর নামে বাংলাদেশের এক অজানা শহরে তার সঙ্গী হয়ে কোথায় যাবে অমলেশ? বলল, 'আপনি যান, স্টেশনে আমার একটু দরকার আছে। আমি পরে যাব।'

'বেশ।' কেমন করে যেন হাসল মেয়েটা।

হাসির ভেতর এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যা নিমেষে অমলেশকে চকিত করে তুলল। সে বলল, 'সত্যি আমার এখানে দরকার আছে; আপনাকে এড়াবার জন্যে বলিনি।'

'আপনার কাছে কৈফিয়ত তো চাই নি।' মেয়েটা আগের মতোই হাসল, 'সে যাক। এত উপকার করলেন, আপনার নামটাই কিন্তু জানা হয়নি।'

'আমার নাম অমলেশ—অমলেশ বসু। আপনার?'

'আমার নাম? কী হবে শুনে? জীবনে আর হয়তো আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না। আচ্ছা চলি।' বলেই রাতের বিচিত্র রহস্যময়ী মেয়েটা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সামনের রাস্তায় নেমে গেল।

দুই

মেয়েটা চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল অমলেশ, তারপর পায়ে পায়ে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় স্টেশন মাস্টারের ঘরটার সামনে চলে এল।

বৃষ্টিটা কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে থাকার পর আবার নতুন উদ্যমে ঝরতে শুরু করেছে। পুবে বাতাসের একটানা গোঙানি ছিলই। দিগন্তের ওপর দিয়ে সাপের জিভের মতো বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। চিরদিনের চেনা সেই তারাদের অথবা চাঁদটার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশের গায়ে কারা যেন টিন টিন ঘন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে।

এই প্রলয়ে স্টেশন মাস্টারই একমাত্র ভরসা। আজকের রাতের মতো মাথা গোঁজার একটা আস্তানার হদিস তার কাছ থেকে আদায় করতেই হবে। অন্য কিছু জুটলে ভাল, নইলে ওয়েটিং রুমটার দখল নেবে অমলেশ। স্টেশন-কুলে বীজপুর নেহাতই অন্ত্যজ, ঘটা করে দেখাবার মতো ওয়েটিং রুম আদৌ আছে কিনা অমলেশের জানা নেই।

সামনের ঘরটার ভেতর ধুসো কোট গায়ে যে প্রৌঢ়টি ঘাড় গুঁজে ক্ষিপ্র হাতে কাগজপত্র গোছগাছ করছিলেন তিনিই যে এই স্টেশনের অভিভাবক তথা স্টেশন মাস্টার, বুঝতে অসুবিধে হল না অমলেশের।

খুক খুক কেশে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করলে অমলেশ। চমকে প্রৌঢ় মুখ তুলে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'কী চান?'

ভদ্রলোকের গালে তিন চারদিনের দাড়ি। মাথার চুল সাদায় কালোয় দাবার ছক, কতদিন যে সেগুলোতে কাঁচি এবং তেল পড়ে নি! মাঝারি মাপের শরীব, স্বাস্থ্য ঈষৎ ভারির দিকেই। অমলেশের দিকে তাকিয়ে আছেন ঠিকই; তবু মনে হয় চোখের দৃষ্টি কিছুটা অন্যমনস্ক।

অমলেশ কিছু বলবার আগেই প্রৌঢ় আবার বলে উঠলেন, 'আজ আর কোনো ট্রেন নেই। শেষ গাড়ি এসে গেছে, এখন আমার দোকান বন্ধ করার পালা।'

ভদ্রলোক হয়তো মনে করেছেন অমলেশ টিকিটের খদ্দের। এত রাতে ট্রেনে করে কোথাও পাড়ি জমাবে। তাড়াতাড়ি তার ভুল ভাঙিয়ে অমলেশ বলে উঠল, 'আমি এই লাস্ট ট্রেনেই কলকাতা থেকে এসেছি।'

বিমূঢ় মুখে প্রৌঢ় বললেন, 'তা হলে?'

'আপনি স্টেশন মাস্টার তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

খানিক ইতস্তত করে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভেতর গিয়ে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার দখল করতেই স্টেশন মাস্টার আবার বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার, বলুন—'

সংক্ষেপে অমলেশ জানালো, এই অচেনা শহরে আজই তার প্রথম আসা। রাত্রিবেলা থাকার জন্য একটা আস্তানা চাই।

আর্জি শুনে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'তাই তো, ভারি বিপদ হল। হোটেল টোটেল অবিশ্যি আছে, তবে সে সব শহরের মাঝখানে।'

আশান্বিত হল অমলেশ, 'কিভাবে যেতে হবে যদি বলে দ্যান—'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন! এখান থেকে হোটেল পাক্কা দু মাইল পথ। যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, যাবেন কী করে? তা ছাড়া এখানে আপনি নতুন লোক।'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'এই স্টেশনে নিশ্চয়ই ওয়েটিং রুম আছে?'

স্টেশন মাস্টার আঁতকে উঠলেন, 'তা অবশ্য একটা আছে। কিন্তু সেটা—'

'সেটা কী?'

'বছর দুয়েক তালা খোলা হয়নি। ছোট ছোট শুয়োরের মতো ধেড়ে ইঁদুর, চামচিকে, আরশোলা আর তেঁতুলে বিছের আখড়া হয়ে আছে। ওর ভেতর রাত কাটানো অসম্ভব ব্যাপার।'

'তা হলে কী করা যায় বলুন তো?'

চোখ কুঁচকে দূরমনস্কের মতো কী চিন্তা করলেন স্টেশন মাস্টার। তারপর তুড়ি মেবে সমস্ত দুর্ভাবনা উড়িয়ে দেবার মতো করে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই, চলুন আমার কোয়ার্টারে। আজকের রাতটা ওখানেই থাকবেন।'

দ্বিধান্বিত সুরে অমলেশ বলল, 'কিন্তু—'

অমলেশের মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন স্টেশন মাস্টার, 'কোনো কিন্তু নেই মশায়, চলুন দিকি।' বলে তাড়াতাড়ি জানালা-টানালা বন্ধ করে দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলিয়ে অমলেশকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

তবু আরেক বার চেষ্টা করল অমলেশ, 'এত রাত্তিরে নিয়ে চলেছেন। মিসেসদের অসুবিধে হবে—'

স্টেশন মাস্টার আগে আগে হাঁটছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অমলেশের দিকে ফিরে বললেন, 'মিসেসদের! আপনি কি আমার সংসারটাকে মোগল বাদশাদের হারেম ঠাওরেছেন নাকি?'

বিব্রত বোধ করল অমলেশ। 'মিসেসদের' বলতে অমলেশ স্ত্রী বাহিনী বোঝায় নি; বাড়ির সবার কথা বলেছে। শব্দটা এমন আক্ষরিক অর্থে যে ভদ্রলোক ধরবেন, কে জানত। অস্পষ্ট গলায় অমলেশ বলল, 'না, মানে—'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার সংসারে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। একেবারে কনফার্মড ব্যাচেলার—চিরকুমার।' বলে আবার চলতে শুরু করলেন।

বেশি দূর যেতে হল না। অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় তলায় খানিকটা গিয়ে গোটা কয়েক সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেই টালির টোপর দেওয়া লাল ইটের কোয়ার্টার পাওয়া গেল। দরজার তালা খুলে লাইট জ্বালিয়ে স্টেশন মাস্টার অমলেশকে ভেতরে ডাকলেন।

ঘরে পা দিয়েই চিরকুমারের আস্তানা কাকে বলে টের পাওয়া গেল। এখানে ওখানে জামা-কাপড় আর কালো কালো ঝুল। খুব সম্ভব তৈরি হবার পর থেকে এ ঘরের কলি ফেরানো হয় নি, মেঝে থেকে ভ্যাপসা ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ উঠে আসছে। কতকাল যে এখানে ঝাঁট-পাট পড়ে নি, কে বলবে।

এ ঘরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিছানাটা কালো কুচকুচে, বালিশ ফুটো হয়ে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। গোটা কয়েক নোংরা কাঁথা, একটা ধুসো কম্বল স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বালিশের ওপর কলাই-করা এঁটো বাসন চোখে পড়ল, একপাটি টায়ারের স্যান্ডেলও আবিষ্কার করা গেল। অর্থাৎ বিছানাটা গৌরবে যে খাবার টেবিলও তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না।

এরকম অবস্থায় একজন অতিথিকে ডেকে এনে খানিকটা যেন অপ্রতিভই হলেন স্টেশন মাস্টার। দ্রুত হাত চালিয়ে যতটা সম্ভব ঘরখানা পরিষ্কার এবং গোছগাছ করতে করতে বললেন, 'বনোয়ারী ব্যাটাকে বলি ঘরটা একটু সাফসুতরো করে রাখবি। কে কার কথা শোনে। অথচ মাস গেলে রেল-কোম্পানির মাইনে গুনবার বেলায় ঠিক আছে।'

অমলেশ অনুমান করল, বনোয়ারী স্টেশনের পোর্টার টোর্টার হবে।

ঘরখানা খানিক ভদ্রস্থ করে অমলেশকে বসালেন স্টেশন মাস্টার। বললেন, 'খাওয়ার ব্যাপারে

আপনার কিন্তু ভয়ানক অসুবিধে হবে। বনোয়ারী ব্যাটা আমার একার মতো রেঁধে রেখে যায়; যা ভাত তরকারি আছে দু' জনে ভাগ করে খেতে হবে।'

খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল অমলেশ, 'না না, খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা করবেন না। রাত্তির বেলা দয়া করে থাকতে দিচ্ছেন তা-ই যথেষ্ট। নইলে এই অচেনা জায়গায় কোথায় যে যেতাম, কী করতাম! তা ছাড়া কলকাতা থেকে আমি খেয়ে এসেছি।'

স্থির দৃষ্টিতে এবার অমলেশের দিকে তাকালেন স্টেশন মাস্টার। তারপর প্রায় ধমকেই উঠলেন, 'চালাকি করবার জায়গা পেলেন না!'

অমলেশ হকচকিয়ে গেল।

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'এই ট্রেনটা কলকাতা থেকে সন্ধের মুখে মুখে ছাড়ে, আপনি বলতে চান তার আগেই রাতের খাওয়া খেয়ে এসেছেন। দেখুন মশাই, আমার ঘরে যা খুদকুঁড়ো আছে যদি ভাগ-জোগ করে খেতে রাজি না থাকেন তা হলে রাত্তিরে থাকতে দিতে পারব না। আপনাকে পথ দেখতে হবে।'

ভদ্রলোকের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা মুগ্ধ করল অমলেশকে। অভিভূত স্বরে সে বলল, 'আপনি যখন আদর করে খাওয়াতে চাইছেন নিশ্চয়ই খাব।'

চক্ষের পলকে আসনের অভাবে খবরের কাগজ পেতে থালায় ভাত টাত বেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললেন স্টেশন মাস্টার। অমলেশকে ডেকে বসিয়ে খাওযা শুরু করলেন।

খেতে খেতে স্টেশন মাস্টার হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ভাল কথা, এতক্ষণ ধবে বক বক করছি অথচ আপনার নামটাই আমার জানা হয়নি।'

নাম বলল অমলেশ।

'আপনি তখন বলছিলেন এখানে প্রথম এলেন; এ জায়গাটা আপনাব অচেনা।'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় থাকেন আপনি?'

কোথায় থাকে অমলেশ জানাল।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'বোম্বাই থেকে টানা এখানে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপ। তারপর স্টেশন মাস্টারই আবার শুরু করলেন, 'এখানে কি কোনো দরকারে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' অমলেশ ঘাড় কাত করল।

'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। দরকারটা কী?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'অচেনা জায়গায় বর্ষা মাথায় নিয়ে এত রাত্তিরে আপনার আসা উচিত হয় নি; বেলাবেলি এলে ভাল করতেন। নেহাত আমার কাছে এসেছিলেন, নইলে আপনাকে মুশকিলে পড়তে হত।'

ভদ্রলোক যা বলেছেন তার ভেতর ফাঁক নেই। কৈফিয়তের সুরে অমলেশ বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। কী যে হল, ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম—'

'ইয়ং ম্যান, ঝোঁকের মাথায় বেরুনো আশ্চর্য নয়।' স্টেশন মাস্টার হাসলেন, 'সে যাক গে, বীজপুরে কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

নবেন্দুর ঠিকানা মনে ছিল, তার বাবার নামটাও। অমলেশ বলল, 'নতুন পাড়ায় মহীতোষ চ্যাটার্জির সঙ্গে।'

'মহীতোষ চ্যাটার্জি!' স্টেশন মাস্টারের গলার স্বর চমকে গেল, চোখের তারা দুটো কেমন যেন স্থির হয়ে গেল।

অমলেশের স্নায়ুগুলো ইতিমধ্যে চকিত হয়ে উঠেছে; একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে।

স্টেশন মাস্টার স্বর বদলে এবার আবহাওয়াটা যতটা সম্ভব সহজ করে তুলতে চেষ্টা করলেন, 'মহীতোষ চ্যাটার্জি আপনার কেউ হয় নাকি?'

চোখকান বুজে মিথ্যেই বলল অমলেশ, 'হ্যাঁ, আত্মীয়।'

'আত্মীয়!' স্টেশন মাস্টারের দৃষ্টি প্রখর হল, 'কিন্তু আপনারা তো বোস—কায়স্থ। আর মহীতোষ বাবুরা বামুন। আত্মীয় কিরকম?'

এরকম তোপের মুখে পড়তে হবে, কে ভেবেছিল! হকচকিয়ে তাড়াতাড়ি অমলেশ বলে উঠল, 'আত্মীয় ঠিক না, আত্মীয়ের মতো। এক দেশে বাড়ি—'

'আপনিও পাকিস্তানের লোক তাহলে—'

আদি নিবাস অবশ্য একদা পূর্ব বাংলাতেই ছিল। জেলাটাও মনে আছে—ঢাকা। গ্রাম-ট্রামের নাম কবেই ভুলে গেছে অমলেশ। জিন্না সাহেবের মাথায় পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হবার আগে আগেই তারা সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। দু পুরুষ বোম্বাইতে প্রবাসী, আসলে অমলেশরা পূর্ব-বাংলার মানুষ, পাকিস্তানের নয়।

গা থেকে ঢাকা জেলার গন্ধ কবেই ঘুচে গেছে। তবু তার ক্ষীণ রেশটুকু ধরে অমলেশ বলল, 'তা বলতে পারেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ ঘাড় গুঁজে এক দমে অনেকগুলো গ্রাস মুখে পুরলেন স্টেশন মাস্টার। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, 'বাড়ি একখানা বটে!'

স্টেশন মাস্টার কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অমলেশ।

অমলেশের মনের কথা বুঝিবা পড়তে পারলেন তিনি। বলে উঠলেন, 'ওই মহীতোষ চাটুজ্জেদের কথা বলছিলাম। বীজপুরের মার্কামারা বাড়ি মশাই।'

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্টেশন মাস্টার আবার বললেন, 'মহীতোষ চাটুজ্জের ছেলেমেয়েগুলো এক একটি রত্ন। হীরে-চুনি-পান্না—একটি তো আবার সাগর-ছেঁচা মুক্তো। সেটাকে পুলিশ এই জেলা থেকেই বার করে দিয়েছিল। বোম্বাই না কোনো চুলোয় গিয়ে আছে। আপনার দেশের লোক, আত্মীয়ের মতো। তবু বলব, ছেলেমেয়েগুলো বীজপুরের হাড় একেবারে ভাজা ভাজা করে দিচ্ছে।'

নিন্দা অথবা স্তুতি, স্টেশন মাস্টার কোন সুরে কথা বলছেন—অনায়াসেই টের পাওয়া যাচ্ছে। সাগর-ছেঁচা মুক্তো যার উপমা সে যে নবেন্দু, তাতে সন্দেহ নেই। এই জেলা যে তার পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা সেকথা অমলেশের অজানা নেই; কথায় কথায় নবেন্দু একদিন তা জানিয়েছিল।

একটু কী চিন্তা করে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'আপনি আত্মীয়ের মতো তো; তা কতকাল পর ওদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে?'

এক নবেন্দু ছাড়া আগে আর কাউকেই যে দেখে নি, এই রাত্রিবেলা মহীতোষ চাটুজ্জেদের যদি সারি সারি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় আদৌ চিনতে পারবে না অমলেশ—এত আত্মীয়তা ঘোষণার পর সে কথা বলতে বাধল। শিথিল সুরে সে জানালো, 'অনেকদিন পর।'

'কাল সকালবেলা উঠে ওখানে যাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'মন আগে থেকে খিঁচড়ে দিতে চাই না, তবু মশাই চোখকান একটু মেলে রাখবেন।'

অমলেশ বলল, 'সকালে ওদের সঙ্গে দেখা করেই আমি কলকাতা ফিরে যাব; সেখান থেকে বোম্বাই। একটা বিশেষ দরকারে এসেছি, সেটা মিটতে কতক্ষণ আর লাগবে? ঘন্টাখানেক, ঘন্টা-দুয়েকের বেশি আমি ওখানে থাকব না।'

স্টেশন মাস্টার একটু অবাক হলেন, 'মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে আপনি বোম্বাই থেকে এতদূরে ছুটে এসেছেন!'

'তা একরকম বলতে পারেন।'

স্টেশন মাস্টার একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অমলেশকে দেখলেন; এ প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

একসময় খাওয়ার পালা চুকল। একটা তক্তাপোষ ছিলই। সেটার তলা থেকে স্টেশন মাস্টার একখানা ভাঁজ-করা ক্যাম্পখাট বার করে পাতলেন। ক্ষিপ্র হাতে যতখানি সম্ভব পরিপাটি করে বিছানা বিছিয়ে দিলেন, মশারি টাঙালেন। টাঙানো ফাঙানো হয়ে গেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, 'ব্যাচেলার হিসেবে মোটামুটি মন্দ হয়নি, কী বলেন?'

'নিশ্চয়ই।' হেসে ফেলল অমলেশ, 'ম্যারেডরা এর চাইতে ভাল পারত কিনা সন্দেহ আছে।'

সকৌতুকে জোরে জোরে হেসে উঠলেন স্টেশন মাস্টার, 'সার্টিফিকেট দিচ্ছেন?'

'হাজার বার।'

'নিন, এবার শুয়ে পড়ুন। ঢের রাত হয়ে গেছে।'

সারাদেহে দিন তিনের অবসাদ মাখা। শোবার কথা শোনামাত্র আর দাঁড়াল না অমলেশ। মশারির ভেতর ঢুকে তক্ষুনি বিছানায় নিজেকে সঁপে দিল। আর স্টেশন মাস্টারও চটপট নিজের মশারি টাঙিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকারে টের পেল অমলেশ, তুড়ি দিয়ে হাই তুলছেন ভদ্রলোক। তুড়ি বাজানো ও হাই তোলা শেষ হলে বললেন, 'রাত্তিরে আর ডাকাডাকি করবেন না মশাই। সমস্ত দিন তো আর বিছানায় গা ঠেকাবার জো নেই। রাত বারটায় শোওয়া, আবার ভোরবেলা উঠেই বাসি মুখে কলকাতার ফার্স্ট ট্রেন পার করাতে হবে।' বলতে বলতে স্বরটা ক্রমশ শিথিল হয়ে হয়ে বুজে গেল। একটু পর নাকের ডাক শোনা গেল। অমলেশ বুঝল, স্টেশন মাস্টারের চেতনার শেষ অন্তরীপটিও অতল ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

বাইরে বৃষ্টি বোধহয় ধরে গেছে। কিংবা পড়লেও খুব জোরে না, টিপটিপিয়ে ফিসফিসিয়ে প্রায় নিঃশব্দেই ঝরছে। টালির চালে ঝমঝমানি নেই, কোথায় কোন ঝোপের আড়ালে ঝিঁঝি ডাকছে। একটানা, অক্লান্ত সেই ঝিল্লিস্বর যেন পৃথিবীর নিভৃত গুহায়িত বিলাপের মতো।

শরীরময় ক্লান্তি, বর্ষার রাত, অন্ধকার—আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। পরিপাটি একটি ঘুমই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ঘুমোতে পারল না অমলেশ। আজ সারাদিনের ঘটনাগুলিই ঘুরে ঘুরে মনে পড়ছে। বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসা, বীজপুরগামী ট্রেনের কামরায় সেই রহস্যময়ী মেয়েটি—যার নামধাম অজানা, পুলিশের হানা, স্টেশন মাস্টার, তাঁর আতিথেয়তা—নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল পড়ার মতো ছোট-বড় অনেকগুলো ঢেউ তুলে কিছুক্ষণ অমলেশকে দুলিয়ে গেল। তারপর তরঙ্গ যখন থামল সেই সময় নবেন্দুর কথা মনে পড়ে গেল অমলেশের।

নবেন্দু : এই ছেলেটির জন্যই আরব সাগরের তীর থেকে এতদূরে গঙ্গার পাড়ে অমলেশের ছুটে আসা। তার মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে এসেছে অমলেশ, আর এসেছে তার কয়েকটি কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে।

নবেন্দুর সঙ্গে কোনো কালে যোগাযোগ হবে, এমন সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। প্রথমত, দু পুরুষ অমলেশরা বোম্বাইতে আছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক কবেই ছিন্ন হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অথবা বাঙালি সম্বন্ধে এতটুকু মোহও আর অমলেশের প্রাণে অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া নবেন্দু এবং অমলেশের যে জীবন তার মাঝখানে উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব। জগতের আলোকিত রাজপথের পথিক অমলেশ। আর যেদিকে অন্ধকার পাতালের অলিগলি সেইখানে বুকে হেঁটে হেঁটে সরীসৃপের মতো নবেন্দুর চলাফেরা।

কোনো দিক থেকেই তার সঙ্গে অমলেশের মিল নেই। নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজকের যে সুশৃঙ্খল সভ্য ভদ্র জীবনের সৃষ্টি, অমলেশ তাকে ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সুবোধ বালকটি হয়ে পড়াশুনোর পালা শেষ করেছে, এখন ভাল চাকরি বাকরি করে, ভাল মাইনে পায়। পার্টি-টার্টিতে একটু আধটু ড্রিংক করে, কিন্তু মাতাল হয় না। সিগারেটের অভ্যেস আছে। নিখুঁত ব্যাকরণসম্মত ভদ্রলোক বলতে যা, অমলেশ তা-ই। মোটামুটি সুখী, সচ্ছল এবং পরিতৃপ্ত। বিয়েটা এখনও করে উঠতে পারে নি; ওটা চুকে গেলেই ষোলকলা পূর্ণ হত। আর নবেন্দু? অমলেশের স্বভাবে

যা যা আছে তার বিপরীত ধাতুতে নবেন্দুর স্বভাবটি তৈরি। পুলিশের খাতায় কত জায়গায় কত ভাবে যে তার নাম লেখা, হিসেব নেই। সে স্মাগলার, ওয়াগনব্রেকার। প্রায়ই মদে চুর চুর হয়ে নবেন্দু ভদ্রপল্লীর শান্তি নষ্ট করে যায়। নানা ব্যাপারে পুলিশ তার পেছনে নিয়ত লেগেই আছে। মাপজোপ-করা সুস্থ জীবনের পক্ষে সে অশুভ ঘৃণার মূর্তি। তার নাম উচ্চারণ করতে গেলে ঠোঁট এবং চোখ কুঁচকে যাবার কথা।

যে কক্ষপথে অমলেশের মতো শান্ত স্তিমিত ভদ্র মানুষের চলাফেরা সেখানে নবেন্দুর মতো উল্কারা আসে না। তবু তার সঙ্গে অমলেশের আলাপ হয়েছিল, এবং কিছুটা অন্তরঙ্গতাও।

আলাপটা খুবই আকস্মিক। বলা যায় অভাবিতই। বোম্বাইয়ের শহরতলিতে যেখানে অমলেশদের বাড়ি সেই জায়গাটার নাম যোগেশ্বরী। যোগেশ্বরী থানার অফিসার ইন-চার্জ বিজয় ফালকে অমলেশের প্রতিবেশী। ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে বড় হয়েছে, এক স্কুলে এক কলেজে পড়েছে। সে অমলেশের ছেলেবেলার বন্ধু, সহচর।

ছুটির দিনে তো বটেই, সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতেও থানায় গিয়ে বিজয়ের সঙ্গে গল্প টল্প করে অমলেশ। চা পকৌড়া আর ভেলপুরীতে আড্ডা জমে ওঠে।

সে দিনটা ছিল রবিবার। যথারীতি থানায় গেছে অমলেশ। বিজয়ের ঘরে পা দিয়েই টের পেল সে বেশ উত্তেজিত, থানার আবহাওয়া রীতিমত উত্তপ্ত।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অমলেশ বলেছিল, 'কী ব্যাপার রে?'

বিজয় বলেছিল, 'আর বলিস না, ব্যাটা মারাত্মক হয়রান করে শেষে ধরা দিয়েছে।'

'কার কথা বলছিস?'

'একটা ওয়াগনব্রেকার। হারামজাদা যেন ভেলকি জানে। চক্ষের পলকে বড় বড় বগিগুলো খুলে মাল লোপাট করে দেয়।' বিজয় বলে যাচ্ছিল, 'ওর অপারেশনের এরিয়া হচ্ছে আন্ধেরীর কাছে। রেল-পুলিশ আর কিছুতেই পেরে উঠছিল না, কখন যে চোখে ধুলো ছিটিয়ে কাজ হাসিল করে যেত টেরও পাওয়া যেত না। না পেরে রেল পুলিশ শেষ পর্যন্ত আমার হেল্প চেয়েছিল। কাল রাত থেকে ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, আজ ভোরে ধরেছি। ধরা পড়বার আগে তিনটে পুলিশকে জখম করেছে।'

অমলেশ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, কিছু বলে নি।

বিজয় আবার বলে উঠেছিল, 'গুণধর! বুঝলি, সারা ইন্ডিয়ায় এমন মহাপুরুষ দু চারটির বেশি পাওয়া যাবে না। ওয়াগন ভাঙায় সাফ হাত, মদ যা চোলাই করে তাতে বিদেশি ডিস্টিলারিগুলো ফেল পড়ে যাবে। তার ওপর আফিম স্মাগলার। বন্দুকবাজি, পিস্তলবাজিতে মহা ওস্তাদ—'

এতক্ষণে অমলেশের গলার স্বর ফুটেছিল, 'সত্যিই গুণধর—'

'এতদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল জ্বালিয়ে খেয়েছে, এখন বোম্বাইতে এসেছে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে।'

'ওয়েস্ট বেঙ্গল' জ্বালিয়ে খেয়েছে! মানে—'

মাথা দুলিয়ে অমলেশের কথার অনুচ্চারিত অংশটা পূরণ করে দিয়েছিল বিজয়, 'ইয়েস ব্রাদার, মহাপুরুষটি বাঙালি—তোমারই দেশোয়ালী—'

কিছুটা কৌতূহলী হয়েছিল অমলেশ, 'কী নাম?'

'নবেন্দু—নবেন্দু চ্যাটার্জি।'

নামটা যে সত্যিই বাঙালি, সন্দেহ কি। অমলেশ চুপ করে থেকেছে।

চোখের তারায় কেমন যেন নাচন দিয়ে বিজয় বলেছিল, 'তোর জাতভাই, মহাপুরুষটিকে একবার দেখবি নাকি?'

বাঙালির নামে অমলেশের প্রাণ উথলে ওঠে না। বাংলাদেশ অমলেশের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো। তবু কী এক প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল অমলেশের স্নায়ুতে। খুব আস্তে বলেছিল, 'দেখব। কিন্তু—'

'কী?'

'লোকটা কোথায়?'

'এখানেই আছে, লক আপে। আয়—

থানার একেবারে মাঝখানে সুরক্ষিত লোহার খাঁচাটার সামনে বিজয় অমলেশকে নিয়ে গেছে। ভেতরে চার পাঁচটি লোক বসে ছিল। এক পলকেই বোঝা গিয়েছিল, ওরা সমাজের পচনশীল গলিত অংশ, দাগ-ধরা অপরাধীর দল। একজন অবশ্য শুয়ে ছিল, মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কেননা তার দুই হাত মুখের ওপর আড়াআড়ি রয়েছে। যে শুয়েছিল বিজয় তাকেই ডেকেছিল, 'অ্যাই—এদিকে এস—'

ঘুমোয় নি, ডাকামাত্র সে উঠে পড়েছিল। তারপর পায়ে পায়ে গরাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দু চোখে প্রশ্ন, কিছুটা বা বিমূঢ়তা। স্বয়ং অফিসার-ইন-চার্জ কেন তার কাছে এসেছেন, বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিল না।

অন্য যে সব কয়েদী লক-আপের ভেতর বসে ছিল, তাদের সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যেই। নিখুঁত কামানো মুখ, চোখ দুটিতে কিশোর সুলভ সারল্য, চওড়া কপাল, গায়ের রং টকটকে ফর্সা। বেশ সুপুরুষ একটি যুবক।

চোখ দুটো অবশ্য আরক্ত। সম্ভবত বিনা ঘুমে রাত কাটাবার জন্য। কুচকুচে কালো চমৎকার চুল ধুলোয় ধূসর—ওটা হাজতের নোংরা মেঝেতে শুয়ে থাকার কারণে। বিজয় তার সম্বন্ধে যেসব কিংবদন্তি শুনিয়েছে সেগুলোর কোনোটাই এই ছেলেটির দিকে তাকালে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বরং তাকে ঘিরে নিষ্পাপ সারল্য রয়েছে।

বিজয় বলেছিল, 'এই সেই মহাত্মা, দেখে নয়ন ধন্য কর।'

অমলেশ উত্তর দেয় নি।

বিজয় আবার কী বলতে যাচ্ছিল সেই সময় একটা কনস্টেবল এসে খবর দিয়েছে, কে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিজয় বলেছিল, 'ইচ্ছে করলে তুই কথাবার্তা বলতে পারিস। দেখি কে আবার কোন ঝামেলা বাধিয়ে এসেছে।' সে চলে গিয়েছিল।

ছেলেটি অমলেশের চাইতে ছোটই হবে। বিজয় চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল অমলেশ। তারপর বলেছিল, 'তোমার নাম আমি জানি।'

বিজয়ের সঙ্গে অমলেশ মারাঠিতেই কথা বলেছিল। ছেলেটির সঙ্গে কিন্তু খাঁটি মাতৃভাষাতেই বলেছে। অমলেশ লক্ষ করেছে, তার দু চোখ চকচকিয়ে উঠেছে। গলার স্বরে খুশি এবং বিস্ময় মিশিয়ে সে বলে উঠেছিল, 'আপনি বাঙালি!'

'হ্যাঁ। তবে—'

'তবে কী?'

'বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা নেই। দুই জেনারেশন আমরা বোম্বাইতে আছি।'

ছেলেটি অর্থাৎ নবেন্দু বলেছিল, 'আপনার কথা শুনলে কিন্তু তা মনে হয় না। আমাদের মতোই পরিষ্কার বাংলা বলেন, একটুও জড়তা নেই।'

অমলেশ বলেছিল, 'বাড়িতে আমরা বাংলাতেই কথা বলি। ওই ভাষাটা ছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে আর সব সম্পর্কই প্রায় ঘুচে গেছে। সে যাক, এই থানার অফিসার-ইন-চার্জ আমার বিশেষ বন্ধু।'

'তাই মনে হল।' নবেন্দু হেসেছিল।

'তোমার সম্বন্ধে ও আমাকে বলছিল—'

'কী বলছিল?'

নবেন্দু সম্বন্ধে বিজয় যে সব ভয়াবহ তথ্য সরবরাহ করেছিল, মুখের ওপর তা বলে ফেলতে পারে নি অমলেশ। চেহারা যার চমৎকার, চোখ দুটি শিশুসুলভ সরলতা দিয়ে ঘেরা, তাকে ওসব কথা বলতে অমলেশের বেধেছে। শুধু বলছিল, 'নানারকম খারাপ কথা বলেছে।'

'আপনি দেখছি পারফেক্ট জেন্টলম্যান। অন্যে কষ্ট পায়, এরকম কথা উচ্চারণও করতে পারেন না।' নবেন্দুর মুখে হাসির আভাটি লেগেই ছিল।

এবার আর উত্তর দেয় নি অমলেশ।

নবেন্দু আবার বলেছিল, 'অফিসার যা বলেছেন তা তো আপনি বলতে পারলেন না। আমিই বলছি। নিশ্চয়ই উনি বলেছেন—আমি ওয়াগনব্রেকার, স্মাগলার, দাঙ্গাবাজ। তাই না?'

ঘাড় কাত করে অমলেশ জানিয়েছে, তা-ই।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর অমলেশ বলেছিল, 'কথাগুলো কি সত্যি?'

অমলেশের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নবেন্দু বলেছিল, 'মিথ্যে হবার কারণ নেই।'

'অনেক সময় পুলিশ ভুলও তো করে। রামকে ধরতে শ্যামকে ধরেছে, এমন বেশ কিছু ঘটনা আমার জানা আছে।'

হঠাৎ জোরে জোরে সকৌতুকে হেসে উঠেছিল নবেন্দু।

অমলেশ বিমূঢ়, 'হাসছ যে!'

হাসতে হাসতেই নবেন্দু বলেছিল, 'আমার বেলা পুলিশের ভুল হয় নি। আপনার বন্ধু আমার সম্বন্ধে যা যা বলেছেন সেগুলো ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা সত্যি। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন?'

সে ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল অমলেশ। নবেন্দু বলেছিল, 'আমাকে দেখে লোকে ভুল করে।'

অমলেশ তাকিয়েই ছিল।

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে নবেন্দু আবার বলেছে, 'আমার চেহারাটা খুব ডিসেপটিভ, মারাত্মক রকমের প্রতারক। আমাকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে কারো গায়ে সামান্য টোকাটুকু পর্যন্ত দিতে পারি। এই চেহারার জোরে কত অন্যায় করে কত বার যে পুলিশের চোখে ধুলো ছিটোতে পেরেছি, হিসেব নেই। তা ছাড়া—'

'কী?'

'বাংলাদেশের সঙ্গে আপনার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে বলছিলেন না? কথাটা কিন্তু ঠিক নয়।'

'কিরকম?'

'মনে মনে বাংলাদেশ আর বাঙালির জন্য আপনার রীতিমত টান আছে। নইলে অফিসার-ইন-চার্জ আপনার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি।'

হেসে ফেলেছিল অমলেশ, 'তা হবে।'

একটু চুপ। তারপর আবার অমলেশ বলেছিল, 'কতদূর পড়াশুনা করেছ?'

'বি. এ পর্যন্ত। ফাইনাল পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয় নি, তার আগেই আমাদের সর্বনাশ হল। আমার লেখাপড়ার পাটও চুকল।'

একটু ভেবে অমলেশ বলেছিল, 'লেখাপড়া জানো, দেখতে শুনতে চমৎকার, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ওই সব স্মাগলিং ওয়াগানব্রেকিংয়ের মতো নোংরা কাজ কর কেন?'

চোখের তারায় মুহূর্তের জন্য কী যেন ঝলকে গিয়েছিল নবেন্দুর। তারপর সে পালটা প্রশ্ন করেছে, 'কতকাল আপনি বাংলাদেশে যান নি?'

'অনেক কাল, নাইনটিন ফরটি ফাইভের শেষের দিকে লাস্ট গিয়েছিলাম। সেই লাস্ট, সেই ফার্স্ট। কেন?'

'তাহলে আপনি বুঝবেন না।'

'কী বুঝব না?'

বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক সুরে নবেন্দু বলেছিল, 'কেন আমি নরকের খাতায় নাম লিখিয়েছি। এখনকার বাংলাদেশ যারা দেখে নি তাদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব না।'

'এখনকার বাংলাদেশে কী আছে?'

নবেন্দু কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই একটা কনস্টেবল এসে হাজির। ব্যাপার কী?

না অফিস-ঘরে কফি আর পকৌড়া জুড়িয়ে যাচ্ছে। অফিসার-ইন-চার্জের জরুরি তলব, এখুনি যেতে হবে।

অমলেশ এবার নবেন্দুকে বলেছিল, 'চলি। পরে আবার দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

অফিস-ঘরে ফিরে আসতেই বিজয় হেসেছিল, 'খুব জমে গিয়েছিলি মনে হচ্ছে। দেশোয়ালী আর কি সাধে বলে।'

উত্তর না দিয়ে অমলেশ কফির কাপে চুমুক দিয়েছিল।

বিজয় জিজ্ঞেস করেছে, 'তারপর দেবশিশুটিকে কিরকম দেখলি?'

খুব আস্তে মৃদু গলায় অমলেশ উত্তর দিয়েছিল, 'মন্দ কী।'

চোখ পিট পিট করতে শুরু করেছিল বিজয়ের।

'লেখাপড়া জানা ছেলে, বি. এ পর্যন্ত পড়েছে, কথায়বার্তায় মার্জিত—'

অমলেশের বক্তব্য শেষ হবার আগেই বিজয় বলে উঠেছিল, 'ক' মিনিটের আলাপেই ভিজিয়ে ফেলেছে, দেখছি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ব্রাদার, পৃথিবীতে ওর চাইতে ঢের ঢের বেশি শিক্ষিত, ঢের ঢের ভাল চেহারার ক্রিমিনাল নানা দেশের ক্রাইম রিপোর্ট খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

খানিক দ্বিধান্বিত সুরে অমলেশ বলেছিল, 'তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ছেলেটার ব্যাপাবে আমার কী মনে হয় জানিস?'

'কী?'

'এ বর্ন ক্রিমিনাল নয়।'

চোখ কুঁচকে গিয়েছিল বিজয়ের, কিছু বলে নি।

অমলেশ বলেছিল, 'নানা রকম অ্যাডভার্স অবস্থা আর অভাব ওকে খারাপ কবে দিয়েছে।'

কণ্ঠস্বরে কাঁপন তুলে বিজয় বলেছিল, 'কিবকম কিরকম গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে! কিন্তু ব্রাদাব, অভাবে পড়লেই যদি মানুষ ক্রিমিনাল হয়ে যায় তবে দুনিয়ায় খুব বেশি সৎ লোকের অস্তিত্ব থাকবে না। ওটা কোনো যুক্তির কথা নয়।'

থতমত খেয়ে গিয়েছিল অমলেশ, 'না না, সে কথা আমি বলিনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ছেলেটাব ভেতর কোথায় যেন খানিকটা ভালত্ব এখনও আছে। সুযোগ সুবিধে পেলে হয়তো ও সুস্থ, ভদ্র জীবনে ফিরে আসতে পারে।'

ঠোঁট কামড়ে আবার হেসেছিল বিজয়, 'বুঝেছি—'

'কী?'

'জাত ভাইয়ের জন্যে প্রাণ কিঞ্চিৎ কেঁদে উঠেছে।'

অমলেশ বিরক্ত হয়েছিল। ঝাঁঝাল উষ্ণ গলায় বলেছিল, 'তুই একটা কথা তখন থেকে বার বার বলে যাচ্ছিস। জাতভাই—এর মানে কী?'

বিজয় বলেছিল, 'আহা চটিস কেন? একটু ঠাট্টা করছিলাম, তাতেই খেপে যাচ্ছিস যে।'

উত্তর না দিয়ে ঘাড় গোঁজ কবে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিল অমলেশ। কফি-পকৌড়ার পালা শেষ হলে বলেছিল, 'আচ্ছা বিজয়—'

'বল—'

'ওই ছেলেটা, মানে নবেন্দু যা করেছে তাতে ক'দিনের জেল টেল হতে পারে?'

নিঃশব্দে ইঙ্গিতময় হেসে বিজয় বলেছিল, 'তা বছর দুয়েক তো নির্ঘাত, তার বেশি হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ব্যাপার কী, ওর কথা যে ভুলতেই পারছিস না।'

বিজয়ের কথার শেষের দিকে মৃদু একটা খোঁচা ছিল, গায়ে মাখেনি অমলেশ। লক্ষ করেছে, এবার আর সে 'জাত ভাই' বা 'দেশোয়ালী'—কোনোটাই বলে নি, এতে অমলেশ খুশি হয়েছিল।

যাই হোক, সেদিন আড্ডা তেমন জমে নি। আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো অসংলগ্ন গল্প করে উঠে পড়েছিল অমলেশ।

তারপর দু তিনটে দিন কেটে গেছে। কিন্তু অমলেশ কিছুতেই নবেন্দুকে ভুলতে পারছিল না। বার বার ঘুরে ঘুরে সে অমলেশের স্মৃতিতে হানা দিয়ে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার আইন আদালত আর সভ্য ভদ্র মার্জিত জীবনের প্রতিষ্ঠা কবে, অতীতের কোন কুয়াশাবিলীন তারিখে, অমলেশের জানা নেই। তবে সেই প্রথম দিনটি থেকে হাজার হাজার মানুষ অপরাধী প্রমাণিত হয়েছে, হাজতবাস করেছে, জেল খেটেছে। আরো কতরকম শাস্তি যে পেয়েছে তার হিসেব নেই। অপরাধ ও শাস্তি সমান্তরাল রেখায় যুগ যুগান্ত ধরে রয়েছে। যতদিন মানুষ আছে ততদিন ও দুটো থাকবে।

পৃথিবীতে কত অপরাধীই তো আছে কিন্তু নবেন্দুকে ভুলতে পারছিল না কেন অমলেশ? সমাজের দাগ-ধরা গলিত অংশের একজনকে কেনই বা অমলেশের স্মৃতি প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছিল? তবে কি বারশ মাইল দূরে দু পুরুষ বাস করেও বাংলাদেশকে সত্যিই ভুলতে পারে নি অমলেশ? অমলেশ জানত না, কিন্তু দেশটা বুঝি ছিল অমলেশের সত্তার ভেতর, ছিল হৃৎপিণ্ডের কোনো নিভৃত প্রান্তে গোপন হয়ে। নবেন্দুকে দেখার পর ফোয়ারা হয়ে সেটা হয়তো ফুটে বেরিয়েছে।

দিন তিনেক পর থানায় গিয়ে অমলেশ বিজয়কে বলেছিল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।'

অমলেশের স্বরে এমন কিছু ছিল যে অবাক চোখে বিজয় তাকিয়েছিল, 'কী ব্যাপার অমল?'

'ছেলেটাকে তুই ছেড়ে দে।'

বিজয় হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবে। বলেছিল, 'কার কথা বলছিস?'

'নবেন্দুর।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তার বিরুদ্ধে মারাত্মক মারাত্মক অভিযোগ আছে। তা ছাড়া ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে চলে গেছে।'

'কিরকম?'

'হাজতে তো কাউকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখা যায় না, কোর্টে প্রডিউস করতে হয়। নবেন্দুর বিরুদ্ধে চার্জ তৈরি করে অলরেডি ওকে কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

অমলেশ বলেছিল, 'দ্যাখ, কেস টেস সাজানো সব নির্ভর করছে তোর ওপর। তুই ইচ্ছা করলে ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারিস।'

বিজয়কে চিন্তান্বিত দেখিয়েছিল। সে বলেছিল, 'কিন্তু এ তো বে-আইনি। যখন জানি ছেলেটা সত্যিকারের অপরাধী—'

নিজের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল, অমলেশ স্পষ্ট করে বলতে পারবে না। বিজয়ের দু হাত ধরে বলেছিল, 'কোনোদিন এ সব ব্যাপারে তোকে অনুরোধ করি নি, করবও না। কিন্তু এই ছেলেটাকে তোকে বাঁচিয়ে দিতে হবে।'

অমলেশের জেদ দেখে হয়তো বিস্মিত হয়েছিল বিজয়, হয়তো স্তম্ভিত। বলেছিল, 'দ্যাখ, আমি যতদূর আইন বুঝি শাস্তি ওর হবেই এবং হওয়া উচিত। আদালত ওকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'কী কথা?'

'নবেন্দু তোর আত্মীয় না, বন্ধু না, কেউ না। তার জন্য তোর এত মাথাব্যথা কেন?'

'সেদিন তোকে বলেছিলাম না, ছেলেটার ভেতর খানিকটা ভালত্ব এখনও রয়েছে। ওকে আমি নোংরা কদর্য জীবন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করব।'

'আই সী, আই সী—' বিজয় জোরে হেসে উঠেছিল, 'সমাজসেবা!'

অমলেশ উত্তর দেয় নি।

বিজয় আবার বলে উঠেছিল, 'কারা যেন চোর-গুণ্ডা-ডাকাতদের 'চেঞ্জ অফ হার্ট' 'চেঞ্জ অফ হার্ট' করে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে। 'হৃদয় পরিবর্তন'ওলারা আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে একেবারে বেকার বানাতে চায়। তুই কি সেই দলে নাম লিখিয়ে এসেছিস?'

'নো ব্রাদার—'

'তবে?'

'বললামই তো, ছেলেটাকে আমি ফেরাতে চেষ্টা করব।'

'করিস।' নাক কুঁচকে কেমন করে যেন বলেছিল বিজয়।

অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'নাক কোঁচকালি যে?'

'তোকে চিনি কিনা, তাই।' বিজয় হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তোর মাথায় মাঝে মাঝে পোকা নড়ে ওঠে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষ হিসেবে অমলেশ প্রায় পুরোটাই আবেগপ্রবণ। কোনো কিছু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার মতো পর্যাপ্ত ধৈর্য তার নেই। যে কোনো ব্যাপারে নিমেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সব সময় ঝাঁপ দেবার জন্য যেন উন্মুখ হয়েই আছে। যখন যে স্রোত এসে পড়ে তাতেই গা ভাসিয়ে দেয়।

অমলেশ বলেছিল, 'এবার পোকা নড়ে নি।'

বিজয় বলেছিল, 'তা হলে ব্যাপারটা সিরিয়াসলিই নিয়েছিস?'

'নিশ্চয়ই।'

'দেখা যাক।'

তার অনুরোধ এবং জেদে কতখানি কাজ হয়েছিল অমলেশ বলতে পারবে না। পুলিশের তরফ থেকে বিজয়ের কোনো কাবসাজি ছিল কি না, তাও অমলেশের আজনা। প্রথম দিন বিজয় যে বলেছিল, কম করে নবেন্দুর দু বছরের কারাবাস অবধাবিত, সেটা কিন্তু হয় নি। তার বদলে মোটে তিন মাস জেল হয়েছিল।

কোর্টে নবেন্দুর কেস যখন চলছিল তখন অমলেশ প্রায়ই যেত। কিন্তু কী আশ্চর্য, ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বেরুবার পর যখন সে জেলে চলে গেল, তার কথা আব মনে রইল না। পাতালের অন্ধকার থেকে নবেন্দুকে বার করে এনে তার হাতে সৎ শুদ্ধ জীবনের সনদ তুলে দেবে বলে একদা গলা ফাটিয়ে অমলেশ ঘোষণা করেছিল। সে কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। বোম্বাই শহরের হাজারটা স্রোত ততদিনে অমলেশকে আরো নানা দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

বিজয় যে বলেছিল, পোকা নড়ে ওঠা—কথাটা যোল আনার জায়গায় আঠার আনা সত্যি। এই হচ্ছে অমলেশের স্বভাব।

কিন্তু তিন মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে সোজা অমলেশের বাড়ি চলে এসেছিল নবেন্দু। সেটা ছুটির দিন নয়, তবে অমলেশ বাড়িতেই ছিল। ক্যাজুয়েল লিভের কয়েকটা দিন তামাদি হতে বসেছিল, অফিস কামাই করে সেগুলো উশুল কবে নিচ্ছিল অমলেশ।

মনে পড়ছে, সেদিন দুপুরবেলা ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে বিদেশি থ্রিলারে ধ্যান জ্ঞান সঁপে দিয়ে সে। মারাঠি চাকরটা এসে খবর দিয়েছিল, কে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অমলেশ বলেছিল, 'এখানে নিয়ে আয়।'

একটু পর চাকরটা যাকে নিয়ে এসেছিল, অমলেশের সুদূর কল্পনাতেও সেই মুহূর্তে তার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় খাড়া হয়ে বসেছিল অমলেশ, 'এ কি, তুমি!'

নবেন্দু আস্তে বলেছিল, 'হ্যাঁ। আজই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি; তারপর সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।'

মনে মনে খুবই বিব্রত বোধ করছিল অমলেশ, কিছুটা বা বিরক্তি, কেননা যত সহানুভূতিই থাক, নবেন্দু যে জেল-ফেরত আসামী, তার সমস্ত পরিচয়টাই যে অন্ধকারে লিপ্ত, সে কথা অমলেশ কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এ ছাড়া অমলেশদের ওই বাড়িতে যারা থাকে—অমলেশরা চার ভাই, বাবা মা বৌদিরা—তারা সবাই জীবনের আলোকিত গৌরবময় দিকের বাসিন্দা। অমলেশের বাবা ছিলেন সিদ্ধার্থ কলেজের প্রিন্সিপাল, বছর তিনেক আগে রিটায়ার করেছেন। বড়দা ওয়েস্টার্ন রেলের ক্লাস ওয়ান অফিসার। মেজদা অমলেশের বাবার কলেজেই অঙ্কের অধ্যাপক। ছোটদা প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি। বৌদিদের কেউ রিসার্চ করছেন, কেউ শিক্ষয়িত্রী। নবেন্দুর মতো নরকের পোকাদের ছায়া পড়লে অমলেশদের বাড়িব ভেতরটা দুলে ওঠার কথা।

নেহাত যখন এসেই পড়েছে কী আর করা। বিরক্তি এবং অস্বাচ্ছন্দ্য যতখানি সম্ভব গোপন করে অমলেশ বলেছিল, 'বসো।'

নবেন্দু নিঃশব্দে, সসঙ্কোচে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলে?'

'থানায়।'

'কে দিয়েছে?'

'অফিসার-ইন-চার্জ।'

অফিসার-ইন-চার্জ মানে বিজয়। কেন যে সে ঠিকানাটা দিতে গেল!

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর খানিক ভেবে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার কাছে কী মনে করে? কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ স্যার।' ঘাড় কাত করেছিল নবেন্দু, 'আমি এসেছি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।'

'কৃতজ্ঞতা!'

'হ্যাঁ।'

'কেন বল তো?' অমলেশ কিছুটা অবাকই হয়েছিল।

নবেন্দু বলেছিল, 'আমার যা অপরাধ তাতে কমপক্ষে দু তিন বছর জেল হবার কথা। খবর নিয়ে জেনেছি, আপনার চেষ্টার ফলে আমাব জেল খাটার মেযাদ কমে মোটে তিন মাস হয়েছে। তাতে আমার কী উপকার যে হয়েছে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

জেল-খাটা একজন আসামীর কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে অমলেশের প্রাণে বিন্দুমাত্র মোহ নেই। ব্যাপারটা আর যাই হোক, গৌরবজনক নয়। তা ছাড়া অমলেশের জন্যই যে তার কারাবাসের মেয়াদ কমেছে, এমন কোনো প্রমাণও নেই।

নবেন্দু আবার বলেছিল, 'দু তিন বছর জেলে পচলে আমাদের সংসারটা ভেসে যেত। আমি এখান থেকে টাকা না পাঠালে বাড়ির হাঁড়ি চড়া বন্ধ। তিন মাস তো জেলে ছিলাম—' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলে উঠেছিল অমলেশ, 'কে কে আছে তোমাদের সংসারে?'

'বাবা মা, দুটো ভাই, তিম বোন।'

'বাবা কিছু করেন?'

'কিছুই না।'

নবেন্দুর বাবার প্রসঙ্গে মুখ ফসকে আব একটা প্রশ্ন বেবিয়ে আসছিল, অমলেশ প্রাণপণে সামলে নিয়েছে।

অমলেশের মনের কথাটা যেন চট করে পড়ে নিতে পেরেছিল নবেন্দু। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠেছে, 'এখনই না হয় কিছু করেন না কিন্তু ঢাকায় পি. ডব্লু. ডি'তে চাকরি করতেন। বেশ বড় চাকরি—'

একদা কাজ করেছেন বলে এখন বসে থাকবেন, ব্যাপারটা অমলেশের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নি। পরক্ষণেই দ্বিতীয় একটি সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার বাবার বয়স কত?'

'ষাটের মতো হবে। কিন্তু বয়সটা বড় কথা নয়। ওই বয়েসেও অনেক লোক শক্ত সমর্থ থাকে। বাবা যদি সুস্থ সবল থাকতেন—' নবেন্দুর গলার স্বর বিষণ্ণ শুনিয়েছিল।

অমলেশ চকিত হয়েছিল, 'কী হয়েছে তোমার বাবার?'

'ইন্ডিয়ায় আসার পর প্যারালিসিসের লক্ষণ দেখা দিল। আজ ক'বছর ধরে উনি বিছানায় পড়ে আছেন।'

নবেন্দুর বিষাদ আর ক্লান্তি অমলেশের মধ্যে যেন সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। একটি শব্দই সে উচ্চারণ করতে পেরেছিল, 'ও—'

আবার কিছুক্ষণ চুপ। তারপর হঠাৎ একটা কথা অমলেশের মনে পড়ে গিয়েছিল এবং না বুঝে বিপজ্জনক এক ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল সে, 'ইন্ডিয়ায় আসার কথা বললে না?'

'হ্যাঁ—' নবেন্দু অমলেশের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল।

'তার আগে তোমরা কোথায় থাকতে? ঢাকায়?'

'হ্যাঁ।' নবেন্দু বলতে শুরু করেছিল, 'দেশ ভাগের পর অনেক লোক অপশন দিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিল। বাবা কিন্তু দেশেই থেকে গেলেন। বাবার ধারণা ছিল যে জন্যে পার্টিশান আর পাকিস্তান তা তো হয়েই গেছে, আর গোলমাল হবে না। কিন্তু স্বাধীনতার ধাক্কা কাটাতে না কাটাতেই টের পাওয়া গেল বাবার ধারণাটা কত ভুল, কত মিথ্যে। বোনেরা বড় হতে লাগল, পাকিস্তানে থাকা আর সম্ভব হল না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাবা আমাদের নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে এলেন। আসার পরই তো আমাদের সর্বনাশ হল, বাবা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।'

অমলেশ কী বলবে, ভেবে পায় নি।

নবেন্দু কিন্তু থামে নি। আপন মনেই সে বলে যাচ্ছিল, 'আমি বড় ছেলে। বুঝতেই পারছেন বাবার পর সব দায়িত্ব এসে পড়ল আমার কাঁধে। পাকিস্তানে থাকতে বি. এ পর্যন্ত পড়েছিলাম। ইন্ডিয়ায় এসে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিলাম। একটা চাকরি—বাঁচবার মতো একটা কিছুর আশায় পাগলের মতো ঘুরতে লাগলাম। কত লোককে যে ধরেছি, কত জায়গায় যে গেছি—কিন্তু না, যেখানে গেছি সেখানেই দরজা বন্ধ। রিফিউজিদের সুযোগ সুবিধে দিয়ে স্বর্গে চড়ানো হচ্ছে বলে যে ঢাক ঢোল পেটানো হয়, সে সব ডাহা মিথ্যে। অন্য কে কী পেয়েছে জানি না, আমি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো সাহায্যই পাই নি।'

রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ বলেছিল, 'তারপর?'

অমলেশের কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না নবেন্দু। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো বলে যাচ্ছিল, 'আপনি প্রথম যেদিন আমাকে হাজতে দেখতে গিয়েছিলেন সেদিন একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'কী কথা?'

'আপনি এখনকার বাংলাদেশকে জানেন না।'

'সত্যিই জানি না।' আমলেশ মাথা নেড়েছিল।

নবেন্দু বলেছিল, 'আমার ধারণা সৎভাবে বাঁচবার মতো একটা পথও সেখানে খোলা নেই। কোথায় যাব, কোনদিকে গেলে বাঁচার একটা নিশানা মিলবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। সাঁতার না-জানা মানুষের মতো হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমি যেন ডুবে যাচ্ছিলাম। আর সেই সময় খবর এসেছিল, আছে, বাঁচার একটা মাত্র পথই বাংলাদেশে খোলা রয়েছে।' একটু দম দিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল, 'সেই পথটা অবশ্য সোজা নরকের ঠিকানায় চলে গেছে। বাংলাদেশ যেন চারদিক থেকে ধাক্কা মারতে মারতে আমাকে সেই রাস্তাটার মুখে নিয়ে এসেছিল। তারপর কখন যে সেটা ধরে হুড়হুড়িয়ে নেমে গেছি, নামতে নামতে অন্ধকারে তলিয়ে গেছি, মনে নেই। রাতারাতি আমি হয়ে উঠলাম কুখ্যাত ওয়াগনব্রেকার, স্মাগলার, গুণ্ডা, আরো কত কী।'

আরব সাগরের এই কূলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে হাজারো কিংবদন্তি হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসে। ওখানে নাকি দিবারাত্রি বিক্ষোভ, মিছিল, অসন্তোষ। বাংলাদেশের স্নায়ু নাকি এক মুহূর্তের জন্যও জুড়োয় না, সর্বক্ষণ টগবগ করে ফুটছে। ধর্মঘটে, পিকেটিংয়ে, স্লোগানে এবং উত্তেজনায় জ্বলন্ত অশান্ত উচ্চকিত বাংলাদেশের খবর নিয়তই বোম্বাইকে দোলা দিয়ে যায়।

কিন্তু ক্ষোভ অশান্তি উত্তেজনা এক কথা আর নবেন্দু যে ভয়াবহ ছবি এঁকেছে তা আরেক কথা। সত্যিই কি বাংলাদেশে সৎ মানুষের জন্য একটা পথও খোলা নেই?

ভাবতে ভাবতে অমলেশের চমক লেগেছিল। নবেন্দু ছেলেটা কিরকম? ধূর্ত? ধড়িবাজ? উলটো পালটা নানা প্রসঙ্গ তুলে কৌশলে সে কি তার অন্ধকারে ডুব দেবার কৈফিয়ৎটা শুনিয়ে দিয়েছিল? অমলেশ বুঝতে পারে নি।

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নবেন্দু আবার বলে উঠেছে, 'বোনেরা বড় হয়েছে, তাদের বিয়ে দেওয়া দরকার। মায়ের চিঠিতে খবর পাই ভাইগুলো স্কুলে যায় না, দিন রাত আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, বদ সঙ্গে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কী যে আমি করব!'

সেই মুহূর্তে নবেন্দুকে দুর্দান্ত ওয়াগনব্রেকার অথবা ভদ্র সমাজের দুঃস্বপ্ন মনে হয় নি। মনে হচ্ছিল, সে যেন স্নেহময় দাদা, সে তার ছোট ভাইবোনদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাদের ভালমন্দের কথা সর্বক্ষণ ভাবে। যাই হোক, অমলেশ উত্তর দেয় নি।

খানিক ইতোস্তত করে নবেন্দু এবার বলেছিল, 'আমার খুব ইচ্ছে করে—'

'কী?' অমলেশ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল।

'ওই সব নোংরা কাজ আর করব না। সুস্থভাবে বাঁচবার মতো একটা চাকরি বাকরি যদি পেতাম—' বলে একটু থেমে চকচকে চোখে অমলেশের দিকে তাকিয়েছিল নবেন্দু, 'আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন?'

একদিন অমলেশ বিজয়ের কাছে ঘোষণা কবেছিল, নবেন্দুর হাতে সুস্থ ভদ্র জীবনের দুয়ার খোলার চাবিটা তুলে দেবে। সে খবর কি নবেন্দু পেয়ে গেছে? অমলেশ বলেছিল, 'আমার হাতে তো কোনো চাকরি নেই।'

'একটু যদি চেষ্টা করেন—' নবেন্দুর চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বর মিনতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল, 'ভদ্রলোকের ছেলে, কিছুটা লেখাপড়া শিখেছি। ওয়াগন ভাঙা, চোরাই চালান—এইসব করে জীবন ধারণ করতে হয়। অন্যে কে আর কী বলবে, নিজের কাছেই আমার লজ্জার শেষ নেই।'

নবেন্দুর কণ্ঠস্বরে এমন বিষাদ ছিল আর ছিল বেদনা যা অমলেশকে অভিভূত করে ফেলেছে। অমলেশ বলেছিল, 'তোমার চাকরির জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

নবেন্দু বলেছিল 'খারাপ পথে নামার পব সবাই আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, ঘেন্না করেছে, পারলে আমার মুখে তারা থুতু ছিটিয়ে দেয়। আপনিই একমাত্র মানুষ যিনি আমাকে ঘেন্না করেন নি। তার বদলে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে—'

'বল।'

'চাকবিব খোঁজ নেওয়া ছাড়াও মাঝে মাঝে এসে আপনাকে বিরক্ত করে যাব।'

নবেন্দুর উদ্দেশ্য কী, অমলেশ বুঝতে পারছিল না। মুখের ওপর কি করে আর 'না' বলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হয়েছিল, 'আচ্ছা, এস।'

'আজ তা হলে চলি—'

'আচ্ছা—'

তারপর থেকে প্রায়ই আসত নবেন্দু। অপছন্দ করলেও তার ব্যবহারে এমন কোনো ফাঁক পাওয়া যায় নি যাতে অমলেশ বলতে পারে, 'আর এস না।' জেল খাটার কালিটুকু বাদ দিলে তার স্বভাব নিখুঁত। আর দশজনের মতোই সে ভদ্র, শোভন, মার্জিত।

মাঝখানে কিছুদিন (নবেন্দু যখন জেলে) তার সম্বন্ধে অমলেশের আবেগের রং ফিকে হয়ে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরুবার পর সে যখন নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল তখন তার সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠল অমলেশ। কযেক জায়গায় তার চাকরির জন্য চেষ্টাও সে করেছিল কিন্তু যার নামের সঙ্গে চোরাই চালান, ওয়াগন ভাঙা আর জেল খাটার অভিযোগ জড়ানো, তাকে কাজ জুটিয়ে দেওয়া প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার।

নবেন্দু বলত, 'অমলেশদা, আমার চাকরির কী হল?'

তার সম্বন্ধে অমলেশের যে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, নিশ্চয়ই তা টের পেয়ে থাকবে নবেন্দু। কবে থেকে সে 'অমলেশদা' বলছে, কবে থেকে তার সম্বোধনে আত্মীয়তার রং ধরেছে কে জানে। তার ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই লোভনীয় এবং মূল্যবান বস্তু নয়। তবু অমলেশ তাকে বাধা দেয় নি।

অমলেশ বলত, 'এখনও কিছু জোগাড় করতে পারি নি।'

'একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।'

'চেষ্টা করে যাচ্ছি, দেখি—'

কোনোদিন এসে নবেন্দু বলত, 'আর পারছি না অমলেশদা, জেলে যাবার পর থেকে বাড়িতে একটা পয়সাও পাঠাই নি। মা ঘন ঘন চিঠি লিখছেন। টাকা পাঠাতে গেলে আমাকে আবার পুরনো পথেই ফিরে যেতে হয়।'

কী উত্তর দেবে, অমলেশ ভেবে পায় নি।

শুধু চাকরির জন্য তাগাদা দিতেই আসত না নবেন্দু, মাঝে মাঝে এসে অন্য কথাও বলত। তাদের সংসারের কথা, বাবা-মা ভাই-বোনদের কথা। একদিন এসে সে বলেছিল, 'জানেন অমলেশদা, মা চিঠি লিখেছেন, বাংলাদেশে যেখানে আমরা থাকি সেখানে টিকবার উপায় নেই।'

'কোথায় থাক তোমরা?'

'কলকাতা থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে একটা মফস্বল শহরে। বীজপুর জায়গাটার নাম।'

অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল 'টিকবার উপায় নেই কেন?'

'বাবা শয্যাশায়ী, তিনি তো ধর্তব্যের ভেতর নন। ভাইগুলো ছোট ছোট।' নবেন্দু বলেছিল, 'বোনেরা বড় হয়েছে। জানে মাথার ওপর অভিভাবক নেই, তারা রাস্তায় বেরুলে নানারকম ইঙ্গিত দেয়। কুৎসিত উড়ো চিঠি আসে। একদিন নাকি মদ খেয়ে একটা লোক আমাদের বাড়ি ঢুকে পড়েছিল।'

চমকে উঠেছিল অমলেশ, 'বল কী!'

'ঠিকই বলছি অমলেশদা—'

একদিন এসে নবেন্দু বলেছিল, 'আর চাকরির দরকার নেই দাদা—'

'কেন?'

সেদিন খুবই অস্থির আর উত্তেজিত দেখিয়েছিল নবেন্দুকে, 'সৎ, সুস্থ জীবন আমার জন্যে না।'

'তার মানে?'

অমলেশের কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না নবেন্দু। আপন মনেই সে বলে যাচ্ছিল, 'আমি জানি আপনি খুবই চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার মতো লোকের চাকরি হওয়া সম্ভব নয়। যার ব্যাকগ্রাউন্ডে এত অন্ধকার তাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। সে যাক গে, এদিকে কী হয়েছে জানেন?'

'কী?'

'ক' মাস টাকা পাঠাতে পারি নি, সংসার অচল হয়ে যাবার কথাই। মায়ের চিঠিতে জানতে পারলাম সোনা-টোনা একটু-আধটু যা ছিল বিক্রি হয়ে গেছে। তাতে আর ক'দিনই বা চলেছে। মা আরো লিখেছেন, বড় বোনটা সংসারের অবস্থা দেখে একটা কাজ নিয়েছে। কী ধরনের কাজ খুলে জানান নি। তবে এটুকু লিখেছেন, কাজটা ভাল না। মায়ের ধারণা যে কোনোদিন একটা বিপদ ঘটে যাবে। মায়ের চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়েছি। লিখেছি, বোন যেন আমার চিঠি পাওয়া মাত্র কাজ ছেড়ে দেয়।'

অস্থির বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত নবেন্দুর দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছিল অমলেশ; বলার মতো কিছু খুঁজে পায় নি।

নবেন্দু বলেছিল, 'আমি তো সারা গায়ে পাঁক মেখেছি। একজনই যথেষ্ট, ওরা অন্তত ভালভাবে বাঁচুক। অমলেশদা, সুস্থভাবে বাঁচবার জন্য একটু লোভ হয়েছিল। আপনাকে সে জন্যে বার বার এসে বিরক্ত করেছি, কিছু মনে করবেন না।'

অমলেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'না না, বিরক্ত কিসের। যখন ইচ্ছে হবে এস।' অসম্ভব জেনেও বলেছিল, 'চাকরি তোমায় একটা জোগাড় করে দেবই, হয়তো খানিকটা দেরি হবে।'

অমলেশের শেষের কথাগুলো যে শুধু কথার কথা, নিতান্তই তার মৌখিক প্রতিশ্রুতি তা কি বুঝতে পেরেছিল নবেন্দু? সে নিঃশব্দে অদ্ভুত একটু হেসেছিল।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গিয়েছিল নবেন্দু। জীবন্ত অবস্থায় নবেন্দুকে সেই অমলেশের শেষ দেখা।

সেই যে নবেন্দু চলে গিয়েছিল, তারপর মাস খানেক আর দেখা নেই। অমলেশ নবেন্দুকে পছন্দও করত না, আবার অপছন্দও না। তাকে ঘিরে তার মন পছন্দ আর অপছন্দের মাঝখানে থমকানো।

তবে সে যে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছিল, তাতে খুব সম্ভব অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল অমলেশ। মনে মনে কবে থেকে যে তার সঙ্গে কামনা করতে শুরু করেছিল, বলা দুরূহ।

একমাস না দেখার ফল হয়েছিল এই, নবেন্দুর শূন্যতা বড় বেশি করে অমলেশের চোখে পড়ছিল, খানিকটা চিন্তিতও হয়ে পড়েছিল সে। নবেন্দুর খোঁজ করা দরকার কিনা যখন ভাবছে ঠিক সেই সময় বিজয় একদিন অমলেশদের বাড়িতে হানা দিল। চোখের তারা নাচিয়ে, গলায় স্বরে ঢেউ দিয়ে বলেছিল, 'তারপর হৃদয়পরিবর্তনওলা, খবর কী?'

বিজয়ের হঠাৎ করে আসাটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। অমলেশের অদৃশ্য কোনো ইন্দ্রিয়ের ভেতর থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলছিল, এ ভাল না, এর ভেতর খারাপ কোনো ইঙ্গিত আছে। চোখ কুঁচকে অমলেশ বলেছিল, 'খবর আবার কী, ভালই।'

'উঁহু—উঁহু—'

'কী হল?'

'তোর খবর আমি জানতে চাই না।'

'তবে কার?'

'তোর গড-চাইল্ডটির।'

গড-চাইল্ড অর্থাৎ নবেন্দু। নবেন্দু যে প্রায়ই অমলেশদের বাড়ি আসত বিজয়ের তা অজানা ছিল না। অমলেশ নিজেই তাকে বলেছে। ঠাট্টা করে নবেন্দুকে অমলেশের গড-চাইল্ড বলত বিজয়।

অমলেশ বলেছিল, 'তার খবরও যতদূর জানি, ভালই।'

'না ব্রাদার, নো—' বিজয় জোরে জোরে মাথা নেড়েছিল, 'শ্রীমান আবার ফাটকে যাবার তোড়জোড় শুরু করেছেন।'

নবেন্দু যে তার পুরনো পথে ফিরে যাবে, আগেই মোটামুটি আন্দাজ করেছিল অমলেশ। তবু চমক লাগার মতো খাড়া হয়ে বসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে?'

'আবার তিনি ওয়াগন ভাঙার ব্রত নিয়েছেন।' দু হাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বিজয় বলেছিল, 'চেঞ্জ অফ হার্ট তা হলে করা গেল না!'

অমলেশ চুপ।

বিজয় আবার বলেছিল, 'এবার যদি ধরা পড়ে তিন মাস হবে না, চুল দাড়ি পাকিয়ে জেল থেকে বেরুতে হবে।'

অমলেশ উত্তর দেয় নি। নবেন্দু সম্বন্ধে বিপজ্জনক খবরটি দিয়ে বিজয় চলে গিয়েছিল।

নবেন্দুর ঠিকানা অমলেশের জানা ছিল না। আন্ধেরীর কাছাকাছি কোথাও থাকত বলে একবার শুনেছিল। কিন্তু আন্ধেরী তো ছোটখাট পাড়া না, বিশাল জন সমুদ্রের ভেতর থেকে ঠিকানাহীন একটি মানুষকে খুঁজে বার করা দুরূহ ব্যাপার। অথচ নবেন্দুকে পাওয়া দরকার, তাকে পেলে সতর্ক করে দিতে হবে।

আরো মাসখানেক, মাসদেড়েক কাটল। ইতিমধ্যে নবেন্দু সম্বন্ধে অমলেশের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা অনেকখানি জুড়িয়ে এসেছে। স্মৃতির যে অংশে সবাই উপেক্ষিত অনাবশ্যক অতীতকে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে দেয়, নবেন্দু ধীরে ধীরে সেখানে সরে যাচ্ছিল।

আরো হাজারটা স্রোতে ভেসে গিয়ে নবেন্দুকে হয়তো ভুলে যেত অমলেশ কিন্তু নবেন্দুই ভুলতে দিল না। একদিন অফিস থেকে সবে ফিরেছে, থানা থেকে বিজয় ডেকে পাঠাল। সে যেন তক্ষুনি সেখানে যায়।

থানায় পা দিতেই বিজয় বলেছিল, 'বোস—'

একটা চেয়ারে নিজেকে সঁপে দিতে দিতে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী ব্যাপার? এমন জরুরি তলব যে?'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলে নি বিজয়। তার হাতে একটা কাঠের ব্যাটন ছিল, সেটা হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করেছিল। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তোর পক্ষে একটা স্যাড নিউজ আছে।'

মুহূর্তের জন্য হৃৎপিণ্ডর উত্থান পতন যেন থমকে গিয়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী?'

'সেই ছেলেটা কাল ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।'

দুঃসংবাদটা যে নবেন্দুর দিক থেকে আসবে, এ ছিল অভাবনীয়। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল অমলেশ, ঠাট্টার সুরেও অন্তত বিজয় গড-চাইল্ড বা অন্য কোনো মজাদার বিশেষণ জুড়ে দেয় নি। নবেন্দু অমলেশের কেউ না, তবু এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর কয়েক মুহূর্ত যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ের মতো প্রতিধ্বনি করেছিল সে, 'নবেন্দু মারা গেছে!'

'হ্যাঁ, ওই ক্রিমিনালদের মৃত্যু এই ভাবেই হয়।' বিজয় বলেছিল, 'ডেড বডিটা রেল-পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। চল, দেখে আসবি।'

নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনো কিছুই অমলেশের ওপর ক্রিয়া করছিল না। জাদুকর যেভাবে সম্মোহিত করে অন্যকে ওঠায়-বসায়-চলায়-ফেরায়, বিজয়ও যেন সেইভাবে রেল পুলিশের দপ্তরে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

একটা না, দুটো গুলি নবেন্দুর বুক ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারা সারা শরীর ঘিরে থোকায় থোকায় রক্ত জমাট বেঁধে ছিল, আর উড়ছিল মাছি। ভনভনে অজস্র মাছি। ওরা টের পায়, কিভাবে যে পায়, কে জানে।

এক পলকের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারে নি অমলেশ, তার মাথা ঘুরছিল। ক্লান্ত ডুবন্ত স্বরে বলেছিল, 'চল, ফিরে যাই।'

ফিরতে ফিরতে বিজয় বলেছিল, 'কোথায় দেশ, আব কোথায় এসে মরল। হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান। চাকরি বাকরি করে ভালভাবে জীবন কাটিয়ে দিলেই পারত। তা না—'

সৎ, সুস্থ জীবনের তৃষ্ণা যে নবেন্দুর ছিল, অমলেশের চাইতে কে আর তা ভাল জানে। একটা চাকরির জন্য কতবার সে তার কাছে গেছে। কিন্তু এসব নিয়ে সেই মুহূর্তে অমলেশের কিছুই বলতে ইচ্ছা করছিল না।

একটু চুপ। তারপর বিজয় আবার বলে উঠেছিল, 'ভাল কথা—'

চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল অমলেশ।

বিজয় বলেছিল, 'নবেন্দুর বাড়িতে একটা খবর পাঠানো দরকার। কিন্তু ও বাঙালি, এইটুকুই শুধু জানা গেছে। তোর কাছে তো যাতায়াত ছিল, ওর বাড়ির ঠিকানা জানিস?'

'জানি।'

'একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিস তো। হিউম্যান গ্রাউন্ডেই জানানো দরকার, না কি বলিস?'

নিঃশব্দে মাথা নেড়েছিল অমলেশ।

বীজপুরে নবেন্দুর মা-বাবার ঠিকানায় চিঠি লিখি লিখি করেও একটা মাস কেটে গেছে। মৃত্যুর মতো নিদারুণ দুঃসংবাদ জানিয়ে আগে আর কখনও কাউকে চিঠি দেয় নি অমলেশ। কী ভাষায় তা লিখতে হয়, সে জানে না।

নবেন্দুই ছিল তাদের সংসারের একমাত্র রোজগেরে। যে পথেই আসুক, তার উপার্জনের সঙ্গেই গোটা সংসারটার বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়ানো। নবেন্দুর মৃত্যুর খবরটা বীজপুরের একটা বাড়িতে কী ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দেবে, ভাবতেই অমলেশের সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে এসেছে। তার স্নায়ুমণ্ডলী স্টিলের তার দিয়ে তৈরি নয়।

একটা মাস অমলেশ শুধু ভেবেছে, ভেবেছে আর ভেবেছে। যত ভেবেছে ততই যেন বিচিত্র এক আচ্ছন্নতা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, চিঠি না লিখে সে নিজেই বীজপুরে যাবে। অতর্কিত আঘাত নয়, ছেলের মৃত্যু-সংবাদ যাতে নবেন্দুর বাবা-মা মোটামুটি সহজভাবেই গ্রহণ করতে পারেন, সে জন্য আগে থেকে কথায় কথায় তাদের মনকে প্রস্তুত হবার সুযোগ করে দেবে।

তা ছাড়া, অতদূর পাড়ি জমানোর দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। খুব ছেলেবেলায় একবার পিতৃভূমিতে এসেছিল অমলেশ। যে বাংলাদেশ আবছাভাবে তার স্মৃতিতে আছে সেখানে নাকি সৎভাবে বাঁচবার একটা পথও খোলা নেই। নবেন্দুর কথা কতখানি সত্যি তা যাচাই করার ইচ্ছা অমলেশের মনের অবচেতনে কোথাও হয়তো ছিল। দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ পার্টিশনে রক্তাক্ত জর্জরিত ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত বাংলাদেশ যেন অমোঘ নিয়তির মতো তাকে হাতছানি দিচ্ছিল আর ঘোরের মধ্যে অমলেশ বঙ্গোপসাগরের এই কূলে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

উজান টানে অমলেশ যেন কয়েক মাস আগের সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিল। কতক্ষণ নবেন্দুর ভাবনার মধ্যে সে ডুবে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ বৃষ্টির ঝমঝমানিতে চকিত হল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার সেটা প্রবলবেগে ঝরতে শুরু করেছে।

এখন কত রাত, কে বলবে। পাশের বিছানায় স্টেশন মাস্টারের নাকের ডাকে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অমলেশ অনুভব করল, তারও ঘুম পাচ্ছে। দেখতে দেখতে সমস্ত চেতনা গাঢ় গভীর অথৈ ঘুমের ভেতর হারিয়ে যেতে লাগল।

তিন

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ল, সারা ঘর জুড়ে টলটলে সোনালি আলোর ঢল নেমেছে। দিনের বয়স যে অনেকখানি বেড়ে গেছে, রোদের রং দেখে তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরের কোণে ঝুল, ঘুলঘুলিতে চড়াইদের বসতি, কালচে দেওয়ালে আরশোলা আর টিকটিকিদের ঘোরাফেরা, নোংরা দুর্গন্ধ বিছানা, ভাঙাচোরা মেঝে—সব মিলিয়ে অমলেশের প্রথমটা মনে হল, ঘুমের ঘোরে কেউ বুঝি তাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে। পরক্ষণেই কাল রাতের ঘটনাগুলো একে একে মনে পড়ে গেল।

ধড়মড় করে উঠে বসল অমলেশ। কিন্তু না, পাশের বিছানায় স্টেশন মাস্টার নেই। খুব সম্ভব ফার্স্ট ট্রেন ছাড়তে স্টেশনে চলে গেছেন।

এক রাতের আশ্রয় পেয়েছিল অমলেশ। ঘর দখল করে বসে থাকা শোভন মনে হল না। তা ছাড়া এক্ষুনি তাকে নতুন পাড়ায় ছুটতে হবে। দুপুরের ভেতর ওখানকার কাজ চুকিয়ে কলকাতায় ফিরবে। সঙ্গে কিছুই নেই। বোম্বাই থেকে ছোটখাট একটা বিছানা আর সুটকেস নিয়ে এসেছিল অমলেশ। কাল কলকাতার একটা হোটেলে সেগুলো রেখে এসেছে। নতুন পাড়া থেকে সোজা সেখানেই চলে যাবে। কাজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া উচিত।

ঘরের বাইরে এসে প্রথমে শেকল তুলে দরজা বন্ধ করে দিল অমলেশ। ফিরে দাঁড়াতেই সংক্ষিপ্ত উঠোনের এক কোণে একটা কুয়ো চোখে পড়ল। দ্রুত সেখানে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নিল। তারপর এল স্টেশনে।

স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুম হল?'

'হ্যাঁ।' কৃতজ্ঞ সুরে অমলেশ জানাল, কাল রাতে আশ্রয় দিয়ে মাস্টার মশাই যথেষ্ট উপকার করেছেন। সেজন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্টেশন মাস্টার প্রবলবেগে মাথা এবং হাত নেড়ে বললেন, 'কিছু না, কিছু না। উপকার আবার কি? ভদ্রলোকের জন্য ভদ্রলোক ওটুকু করেই থাকে। তার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ করে অস্থির হবেন না।'

কথাটা মিথ্যে বলেন নি স্টেশন মাস্টার। কিন্তু তিনি না হয়ে আর কেউ হলে অচেনা এক আগন্তুককে সত্যি আশ্রয় দিতেন কিনা সে সম্বন্ধে অমলেশের যথেষ্ট সংশয় আছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে গেলে স্টেশন মাস্টার হাজার মুখে প্রতিবাদ জানাবেন। কাজেই চুপ করে রইল সে।

একটু পর অমলেশ বলল, 'আমি এখন যাচ্ছি—'

'এখনই? তা একটু চা-টা খেয়ে যান।'

হাতজোড় করে অমলেশ বলল, 'না না, এখন আর ও-সব ঝামেলা করবেন না। নতুন পাড়ার কাজটা চুকিয়ে আজই আমাকে কলকাতায় ফিরতে হবে।'

স্টেশন মাস্টার খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, 'সকালবেলা একেবারে খালি পেটে—'

অমলেশ যেন তার কথা শুনতে পায় নি। বলল, 'আপনার কোয়ার্টারটা শেকল লাগিয়ে এসেছি। একটা তালা টালা—'

'দিন রাতই ওটা খোলাই থাকে।' তবু তো আপনি শেকল লাগিয়েছেন।

'যদি একবার দেখে আসতেন—'

অমলেশের মনোভাব খানিকটা বুঝিবা আন্দাজ করতে পারলেন স্টেশন মাস্টার। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু হাসলেন, 'আমি লোক চিনি মশায়। তা ছাড়া আমার কোয়ার্টারে সোনা-দানা, হীরে-মুক্তো নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওখানে যা আছে তা নিলে চোরের মজুরি পোষাবে না।'

অমলেশ হাসতে লাগল।

স্টেশন মাস্টার আবার বললেন, 'নতুন পাড়ায় যাবেন, কিন্তু আপনি তো নতুন এসেছেন। কাউকে সঙ্গে দেব?'

'না। আমিই খুঁজে বার করে নিতে পারব।'

'এক কাজ করুন, সাইকেল-রিকশায় চলে যান। আনা দশেক নেবে। একেবারে সোজা নতুন পাড়ায় পৌঁছে যাবেন।'

'সেই ভাল। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

স্টেশনের ঠিক বাইরে ঝাঁকড়া-মাথা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় সাইকেল-রিকশার জটলা। একটা রিকশা ঠিক করে অমলেশ উঠে বসতেই সেটা চলতে শুরু করল।

কাল যে অত দুর্যোগ গেছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আজ সকালবেলা তা কে বলবে। কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। যতদূর চোখ যায় চারদিক ধোয়ামোছা, ঝকঝকে। নির্মেঘ নীলাকাশ জুড়ে গলানো গিনির মতো টলটলে তরল রোদের ছড়াছড়ি। আর আছে পাখি। কাল যারা বেরুতে পারে নি আজ আকাশের অগাধ অথৈ নীলে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। দিনটা যেন বর্ষার শাসন না মেনে একলাফে মধ্যঋতু শরতের ঠিক মাঝখানটিতে এসে হাজির হয়েছে।

কালকের দুর্যোগের কিছু কিছু স্মৃতি চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কাঁচা, খোলা নর্দমাগুলোতে ঢল বয়ে যাচ্ছে। গাছের পাতা ডালপালা রাস্তায় ইতস্তত ছড়ানো। এখানে ওখানে জল জমে আছে।

অমলেশের বাহনটি বেশ জোরেই ছুটছে। দু ধারে বাড়িঘর। বীজপুর যেন একালের শহর না। সবই তার পুরনো। বাড়ি-ঘর-ইমারত-মন্দির, সব কিছুরই দেওয়াল খসা, আস্তর খসা। বাঁকে বাঁকে পাক-খাওয়া সরু গলি, প্রচীর-ঘেরা বাড়ি বাগান পুকুর—সমস্ত কিছুরই গায়ে প্রাচীনত্বের শীলমোহর মারা। মনে হয়, বীজপুর যেন জীবন্ত মানুষ সমেত মাটির অতল থেকে আবিষ্কৃত কোনো সুদূর অতীতের নগরী।

দু ধারে পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িগুলো একাকার হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একটা স্রোতের মতো রিকশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে দৃশ্যপট বদলের জন্য এক-আধ ছটাক জমি, কিছু ফাঁকা মাঠ, কচুরিপানার ঠাসবুননের তলায় মজা খাল, বাঁশের সাঁকো।

পুরনো বীজপুর শহর তার ধসে-পড়া বাড়িঘর কিংবা এই বর্ষায় হঠাৎ পাওয়া শরতের একটি দিন—কিছুই অমলেশের ওপর রেখাপাত করতে পারছিল না। রিকশাটা নতুন পাড়ার দিকে যত এগুচ্ছে বুকের ভেতর সেই দুন্দুভিটা ততই যেন হাজার কাঠিতে বাজতে শুরু করেছে।

সামনের দিকে চোখ রেখে রিকশাওলা হঠাৎ শুধলো, 'নতুন পাড়ায় কার বাড়ি যাবেন বাবু?'

'ওখানকার সবাইকে চেন নাকি?' পালটা প্রশ্ন করল অমলেশ।

'চিনি বৈকি। এ শহরে ক'জন আর লোক। অবিশ্যি রিফুজিরা আসায় ভিড় বেড়েছে। আমাদেরও দু-পয়সা হচ্ছে।'

অমলেশ বলল, 'মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি যাব।'

চমকে রিকশাওলা ঘাড় ফেরাল, 'কোন মহীতোষ চাটুজ্জে, যার ছেলে নবেন্দু?'

অমলেশ লক্ষ করল, মহীতোষ চাটুজ্জে অথবা নবেন্দুর ব্যাপারে এ শহরটা রীতিমত স্পর্শকাতর। এখানকার যে দুটি মানুষের সঙ্গে এখন পর্যন্ত দেখা হয়েছে, তারা—স্টেশন মাস্টার আর রিকশাওলা—দু'জনেই ওই নামটা শুনে চমকে উঠেছে।

অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ, কেন বল তো?'

কী বলতে গিয়ে থমকে গেল রিকশাওলা। মহীতোষ চাটুজ্জের সঙ্গে অমলেশের সম্পর্ক কী, তার সম্বন্ধে কী জাতীয় মন্তব্য করলে সে সন্তুষ্ট হবে অথবা বিরক্ত, বুঝতে না পেরে ঠোঁটে চাবি আঁটাই সে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। চট করে মুখটা আবার সামনের দিকে ঘুরিয়ে জোরে জোরে প্যাডল করতে আরম্ভ করল রিকশাওলা।

অমলেশও আর কোনো প্রশ্ন করল না।

একসময় নতুন পাড়ায় পৌঁছে গেল অমলেশ। পুরনো শহর যেখানে শেষ, ইতির পর পুনশ্চর মতো নতুন পাড়ার সেখানে শুরু। অধিকাংশ বাড়িই এখানে টালির চালা আর বাঁশের দেওয়াল নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছন্দ পতনের মতো এক আধটা নতুন পাকা বাড়ি চোখে পড়ে।

নবেন্দুর মুখেই অমলেশ শুনেছিল, তারা উদ্বাস্তুরা জমি জবরদখল করে কলোনি বসিয়েছে। রিফিউজি কলোনি—উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ। নাম একটা দিতে হয় বলেই দেওয়া হয় নি। নতুন পাড়ার নামকরণ মোটামুটি সার্থক। এখানকার মানুষজন, বাড়িঘর—সবই নতুন, আনকোরা।

ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে রিকশাওলা রাস্তা থেকে একটু দূরে একখানা টিনের বাড়ি দেখিয়ে দিল, 'ওটা মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি।'

বেল বাজিয়ে রিকশাওলা চলে গেল। তারপরও অমলেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অনুভব করছে, হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা দ্রুততর হয়ে উঠেছে। একসময় সে হাঁটতে শুরু করল। যে আচ্ছন্নতা আরব সাগরের পার থেকে তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে সেইটেই তাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কখন যে বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, অমলেশের খেয়াল নেই। নতুন পাড়াব আর সব বাড়ির মতোই এর চার ধারে ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া, নতুনত্বের ভেতর টালির বদলে টিনের চাল। সামনের দিকে সংক্ষিপ্ত উঠোন। দু চারটে দিশি ফুলের গাছ, একটা তুলসীমঞ্চ, একটা পাতাবিহীন পেয়ারাগাছও চোখে পড়ল।

অমলেশ আস্তে আস্তে ডাকল, 'মহীতোষবাবু—' ডেকেই টের পেল গলায় স্বর ফোটে নি। কণ্ঠস্বরটাকে ভেতর থেকে মুক্ত করে আবার ডাকল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমলেশের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, 'কাকে চাইছেন?'

ষোল সতেরর মতন বয়েস। উদ্দাম স্বাস্থ্য।. পরনে যে খাটো ফ্রকটা রয়েছে, শরীর তা থেকে উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখ-মুখ-নাকের ধারাল টানে খুব চেনা চেনা আদল বসানো; নবেন্দুর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। মেয়েটা নবেন্দুর বোনই হবে। এইরকম যার স্বাস্থ্য তাকে ওইরকম খাটো জামা পরিয়ে রাখা অশোভন, দৃষ্টিকটু।

মেয়েটা অমলেশের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। মুখ নামিয়ে সে উসখুস করছে, আর ফ্রকটা টেনে টেনে হাঁটুর দিকে নামাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বৃথাই।

রিকশাওলা চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তবু আরো নিশ্চিত হবার জন্য অমলেশ বলল, 'এটা মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি?'

অস্ফুট গলায় মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'আসুন—' কুণ্ঠিত, জড়সড় মেয়েটা নিজেকে গুটিয়ে এতটুকু করে ফেলতে পারলে যেন বেঁচে যায়। নুয়ে বেঁকে আগে আগে চলতে লাগল সে, অমলেশ তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

উঠোনে এসে কাঁপা গলায় মেয়েটা ডাকল, 'মা, বড়দি, মেজদি শিগগির এস। এক ভদ্রলোক এসেছেন, বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান।' বলেই এক ছুটে সামনের ঘরটায় অদৃশ্য হল।

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে অমলেশ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মেয়েটি ডাকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন মধ্যবয়সিনী আরেক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু পিছু আঠার-উনিশ বছরের একটি মেয়ে। এর পরনে অবশ্য ফ্রক নেই—যা আছে তা সস্তা আধময়লা রঙিন শাড়ি। যে অমলেশকে রাস্তা থেকে ভেতরে ডেকে এনেছে তার মুখ-চোখ-ভুরু এই মেয়েটির মধ্যেও বসানো। অর্থাৎ এ-ও নবেন্দুরই বোন হবে। নবেন্দু বলেছিল, তার তিন বোন। দুই বোনকে মোটামুটি দেখা হয়ে গেল অমলেশেব।

বর্ষীয়সী মহিলাটির বয়েস কত, বলা দুরূহ। ভাঙাচোরা শরীর, নীল নীল শিরা বার-করা হাত, জ্বলে যাওয়া গায়ের রং—এসব সত্ত্বেও বোঝা যায় একদা তিনি সুরূপাই ছিলেন। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠ হয়ে গেছে, মুখ বেখাময়, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। তবু কোথায় যেন অস্তগামী সূর্যের মতো লাব্যণ্যের ক্ষীণ একটু আভা এখনও লেগে আছে। দু হাতে শাঁখা আর দু গাছি লোহা ছাড়া সর্বাঙ্গে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। পরনে সেলাই-করা লাল-পাড় শাড়ি। 'জীবনযুদ্ধ' বলে একটা শব্দ জানা ছিল, মহিলাকে দেখতে দেখতে তা মনে পড়ে গেল অমলেশের।

সব চাইতে আশ্চর্য তাঁর চোখ। সে দুটি যেন জগতের কোনো কিছুকে বিশ্বাস করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না—বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে দৃষ্টিটা থমকানো।

ঘোমটা ছিলই, সেটা কপালের দিকে আরেকটু টেনে দিয়ে ভদ্রমহিলা অমলেশের চোখে চোখ রাখলেন।

সেই একই কথা আবার বলতে হল, অমলেশ মহীতোষ চাটুজ্জের দর্শনার্থী।

মৃদু গলায় মহিলা বললেন, 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না বাবা—'

তাঁর বলার ভঙ্গি কিছুটা সন্দিগ্ধ, হয়তো বা সতর্ক। অমলেশ বলল, 'আমার নাম অমলেশ—অমলেশ বসু।'

মহিলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

অমলেশ বুঝল, তিনি তাকে চিনতে পারেন নি। নাম শুনলেই চিনে ফেলবেন, এতখানি স্বনামধন্য নিশ্চয়ই সে নয়। তাকে আরো বিস্তৃতভাবে নিজের পরিচয় দিতে হবে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি বোম্বাই থেকে আসছি—'

এবার কাজ হল। অমলেশের কথা শেষ হবার আগেই চোখের তারা দুটো মুহূর্তের জন্য যেন আলোকিত হয়ে উঠল মহিলার, 'তুমিই অমলেশ—আমার নবুর বন্ধু।'

'নবু?'

'নবেন্দু—'

অমলেশ লক্ষ করল, তাঁর পাশে যে আঠার উনিশ বছরের মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তার চোখেও আলোর ছটা খেলে যাচ্ছে। নবেন্দুর মতো মানুষের বন্ধুত্ব কোনোদিনই কাম্য নয়—অন্তত তার পক্ষে। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখের ওপর তা বলে ফেলতে এই মুহূর্তে অমলেশের বাধল। বলল, 'হ্যাঁ, নবেন্দু আমার বন্ধু।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি নবেন্দুর মা—'

অমলেশ আগেই তা অনুমান করেছিল। নিজের বাবা-মা ছাড়া পারতপক্ষে আর কাউকে সে প্রণাম

করে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল বলতে পারবে না, অমলেশ ঝুঁকে ভদ্রমহিলার পা ছুঁল।

অমলেশের চিবুকে হাত ঠেকিয়ে নবেন্দুর মা চুমু খেলেন, 'থাক বাবা, থাক। একশ বছর বেঁচে থাকো।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'নবুর চিঠিতেই জেনেছি, তুমি বোম্বাইতে থাক।'

'ও—'

'ইদানীং নবু যত চিঠি লিখেছে তার সবগুলো তোমার কথায় ভর্তি। সে যে কী চোখে তোমায় দেখে বলে বোঝাতে পারব না। বাপ-মা ছাড়া আর কাউকে সে এত ভক্তি করে না।'

অমলেশ আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

নবেন্দুর মা আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ভাঙা ভাঙা জড়িত গলায় ডান দিকের ঘরটা থেকে কে যেন বলে উঠল 'কে, কে এসেছে? আবার কী হল?'

এতক্ষণে নবেন্দুর মা যেন সচেতন হলেন, 'ওই দ্যাখো, তোমাকে দাঁড় করিয়েই রেখেছি। কী বেভুলো মন যে আমার; চল কত্তার ঘরে যাই—'

সেই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল. 'কই, কে এসেছে—নিয়ে এস।'

'চল বাবা—' নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'ওই এক মানুষ, একটুতেই অস্থির। কেউ যে এসেছে সেটা টের পেয়েছে। যতক্ষণ না তোমাকে দেখছে, স্বস্তি নেই। সমানে বলে যাবে, 'নিয়ে এস, নিয়ে এস—' বিছানায় পড়বার পর ধৈর্যটৈর্য বলতে সব গেছে।'

নবেন্দুর কাছে আগেই খবর পেয়েছিল অমলেশ, তার বাবার পক্ষাঘাত। যাই হোক, ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে ডান দিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। সেই মেয়েটাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

জানালাগুলো বন্ধ, সামনের দিকের দরজাটা বাদ দিলে আলো আসার কোনো পথই খোলা নেই। দরজা দিয়েও যে কুণ্ঠিত আলোটুকু এসেছে, ঘরটাকে উজ্জ্বল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলে ভেতরটা যেন চির প্রদোষের রাজ্য।

অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেল না অমলেশ। চোখ সয়ে এলে নজরে পড়ল, একধারে তক্তপোষের ওপর অনন্তশয্যা পাতা, তার ওপর বৃদ্ধও না, প্রৌঢ়ও না—দুইয়ের মাঝামাঝি একটি মানুষ শুয়ে আছে। তার শরীরের আধখানা অর্থাৎ ডানদিকটা চমৎকার সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যপূর্ণ। বাকি অর্ধেক শীর্ণ, অসাড়। নীরস অনাবশ্যক শুকনো ডালের মতো দেহের সঙ্গে কোনোরকমে আটকে আছে। মুখের বাঁ দিকটা বেঁকে গেছে, বাঁ চোখটাও বোধহয় নষ্ট—অন্তত চাউনি দেখে তা-ই মনে হয়।

মাথার কাছে একটা সস্তা কাঠের টেবিলে কিছু শিশি বোতল, ওষুধ পত্তর, দু একটা ফল।

না, নবেন্দু মিথ্যে বলে নি, তার বাবা সত্যিই পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

মহীতোষ চাটুজ্জের যে চোখটা ভাল সেটা অমলেশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আগের মতো ভাঙা জড়িত উদ্বিগ্ন সুরে তিনি বললেন, 'কী হয়েছে? কী ব্যাপার?'

ঈষৎ বিরক্ত গলায় নবেন্দুর মা বললেন, 'কী আবার হবে? সব সময় এক কথা—কী হয়েছে—'

'আমার কী মনে হয় জানো, চারদিকে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে চলেছে, তোমরা আমাকে জানতে দিচ্ছ না।'

'ও তোমার মনের বাই।'

অমলেশ পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। মনে হল, বিছানায় বন্দি মহীতোষ চাটুজ্জে সর্বক্ষণ যেন শঙ্কিত হয়ে আছেন।

আরো কী বলতে গিয়ে অমলেশ সম্বন্ধে সচেতন হলেন মহীতোষ। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এ কে?'

নবেন্দুর মা অমলেশের পরিচয় দিলেন। অমলেশ এগিয়ে গিয়ে মহীতোষ চাটুজ্জের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

শয্যাশায়ী পঙ্গু মানুষটি অমলেশকে নিয়ে কী করবেন, ভেবে পেলেন না। আকাশের চাঁদই বুঝি হাতে পেয়ে গেছেন। তাঁর শরীরের সুস্থ জীবন্ত দিকটায় ঢেউ খেলে গেল। হাতের ভর দিয়ে উঠে

বসতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। ব্যস্তভাবে শুধু বলতে লাগলেন, 'ওকে বসতে দাও—' আঠার উনিশ বছরের সেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা চেয়ার নিয়ে আয় মীনা—'

মেয়েটির নাম জানা গেল—মীনা। সে একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার এনে অমলেশের কাছে রাখল। অমলেশ বসল।

মহীতোষ চাটুজ্জে বললেন, 'তারপর অমলেশ—'

অমলেশ তক্ষুনি সাড়া দিল।

'এখন তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'বোম্বাই থেকে। কাল রাতে লাস্ট ট্রেনে এখানে পৌঁছেছি।'

'রাত্রিবেলা ছিলে কোথায়?'

কোথায় কিভাবে রাত কাটিয়েছে, অমলেশ বলল।

মহীতোষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'দ্যাখো দিকি কাণ্ড! কত কষ্ট হয়েছে তোমার।'

বুঝিয়ে সুঝিয়ে অসুস্থ, পঙ্গু মানুষটিকে শান্ত করল অমলেশ। জানালো, তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি বরং রাতটা মোটামুটি ভালই কাটিয়েছে।

খানিক নীরবতা। তারপর মহীতোষ চাটুজ্জে বললেন, 'বীজপুরে কি আমাদের এখানেই এসেছ, না আর কোথাও—'

ভেতরে ভেতরে থমকে গেল অমলেশ। একটু ভেবে ধীরে ধীরে বলল, 'কলকাতায় দরকার আছে। আপনাদের ঠিকানাটা সঙ্গে ছিল; ভাবলাম আগে এখানে এসে একবার দেখা করে যাই—'

'এসেছ, বেশ করেছ। খুব আনন্দ পেয়েছি বাবা। যদি জানতে পেতাম কলকাতা পর্যন্ত এসে আমাদের এখানে আসো নি, খুব দুঃখ হত।'

অমলেশ চুপ।

মহীতোষ চাটুজ্জে আবার বললেন, 'নবুর চিঠিতে জানতে পেরেছি, তোমরা দু পুরুষ ওখানেই আছ। একরকম ওখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেছ; বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই চলে।'

অস্ফুট গলায় অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'নিজেদের দেশের দিকে তেমন আসো টাসোও তো না?'

'না। তেমন দরকার হয় না। আমাদের আত্মীয় স্বজনরা দিল্লি-কানপুর-নাগপুরের দিকে থাকে; গেলে ওই সব দিকেই যাই।'

রসিকতার সুরে মহীতোষ বললেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলেছ একেবারে।'

অমলেশ হাসল, 'তা বলতে পারেন। খুব ছেলেবেলায় একবার এখানে এসেছিলাম; তারপর এই এলাম।'

'কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অমলেশ।

মহীতোষ চাটুজ্জে বললেন, 'তা এতদিন পর হঠাৎ এদিকে এলে?'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গেল। বহু বছর পর কেন অমলেশের বাংলাদেশে আসা, এই সুযোগে কি বলে ফেলবে? সেই নিদারুণ খবরটা—নবেন্দুর মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ জানাবার এই কি উপযুক্ত সময়? কিন্তু না, এই মুহূর্তে কিছুতেই তা বলতে পারল না অমলেশ। আবছা, শিথিল সুরে শুধু জানালো, 'বিশেষ একটা কাজে এসেছি।'

মহীতোষ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাইরে একটা মেয়ে-গলা শুনতে পাওয়া গেল, 'মা, কে নাকি এসেছে, ঝুনু বলছিল।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কাছে যে এসে দাঁড়াল তাকে যে এখানে নবেন্দুর বোন হিসেবে আবার আবিষ্কার করতে হবে, সে কথা কে ভেবেছিল! ট্রেনের সেই নিশীথ নাটকের রহস্যময়ী মেয়েটা—যার নাম অমলেশের অজানা। তার সমস্ত সত্তার ভেতর দিয়ে নিমেষে বিদ্যুৎগতিতে কী যেন বয়ে গেল।

ওদিকে ঘরের ভেতর পা দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মেয়েটা। কালকের সেই মোহময়ী বেশে নয়, এই সকালবেলা তার পরনে নিতান্ত আটপৌরে ঢিলেঢালা একখানা শাড়ি আর আধময়লা জামা। চোখ ঈষৎ আরক্ত, ফোলা ফোলা। এলোমেলো রুক্ষ চুল গালে গলায় এবং মুখের ওপর উড়ছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে। তাকে ঘিরে অনেকখানি আলস্য ঘন হয়ে আছে।

মেয়েটির দৃষ্টি কিন্তু স্থির; নিষ্পলকে অমলেশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। অমলেশও চোখ ফেরাতে পারছে না, কী এক ফাঁদে সে দুটো আটকে গেছে।

এই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাদের বাড়িতে অমলেশকে বসে থাকতে দেখবে, এটা সে যেন কল্পনাই করতে পারে নি। জ্বলন্ত প্রমাণের মতো অমলেশ তার মুখোমুখি, দেখেও বুঝিবা বিশ্বাস করতে পারছে না মেয়েটা।

বিমূঢ় বিস্ময়ে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল, অমলেশের খেয়াল নেই। একসময় নবেন্দুর মায়ের গলা কানে এল, 'অমলেশ রে, এ আমাদের অমলেশ। বোম্বাই থেকে প্রত্যেক চিঠিতে নবু যার কথা লেখে—'

এ বাড়িতে তার আসনখানি কোনখানে পাতা, এখানে পা দিয়েই টের পেয়ে গিয়েছিল অমলেশ। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটাকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেল না। জীবনে এই প্রথম যেন অমলেশের নাম শুনল; তার চোখমুখ দেখে অন্তত তাই মনে হয়।

অমলেশের দিকে তাকিয়ে নবেন্দুর মা বললেন, 'ও আমার বড় মেয়ে নীলা। নবুর দেড় বছরের ছোট।'

নামটা জানা গেল। অমলেশ বলতে যাচ্ছিল, 'কাল রাতেই একে বীজপুরের লাস্ট ডাউন ট্রেনে দেখেছি। অল্প আলাপও হয়েছে।' বলতে গিয়েও থতিয়ে যেতে হল। তার নজরে পড়ল, চোখ টিপে আস্তে করে একবার মাথা নাড়ল নীলা। ইঙ্গিতটা মোটামুটি আন্দাজ করল অমলেশ। সে যে তাকে চেনে, আগেই দেখেছে—তা যেন বলে না ফেলে সেই জন্যই চোখ টেপা, মাথা নাড়া। অমলেশ চুপ করে রইল।

এই যেন প্রথম আলাপ হচ্ছে, এভাবে প্রায় ভাবলেশশূন্য মুখে দু হাত জোড়া করে নমস্কার করল নীলা। ভদ্রতা অমলেশও জানে, নিঃশব্দে দু হাত একত্র করে বুক পর্যন্ত তুলল।

হঠাৎ মহীতোষ চাটুজ্জে তাঁর সেই অস্বাভাবিক গলায় ডেকে উঠলেন, 'অমলেশ—'

অমলেশ চোখ ফেরাল। মহীতোষ আবার বললেন, 'ওই দেখ, কী ভুলো মন, আসল খবরই এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নি।'

'কী খবর?'

'আসার সময় তোমার সঙ্গে নবুর কি দেখা হয়েছিল?'

মুহূর্তে অমলেশের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। মৃত্যু-সংবাদ জানাতে এসে এরকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল? কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে নিজের অজান্তেই যেন সে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ।' আর বলেই মনে হল, কী এক অজানা ফাঁসে জড়িয়ে পড়লাম। সেখান থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথই বুঝি খোলা নেই।

সুস্থ, ভাল চোখটা চকচকিয়ে উঠল মহীতোষ চাটুজ্জের, 'কেমন আছে নবু?'

ফাঁসটা ক্রমশ নিবিড় হয়ে বসে যাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকাতে লাগল অমলেশ। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই মেয়েটা—নবেন্দুর বোন নীলা, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথম থেকেই ওইভাবে তাকিয়ে আছে নাকি সে? কে জানে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আবছা ঝাপসা গলায়, রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ বলল, 'ভাল—ভালই আছে।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একমাস নবুটার চিঠি পাই না, বড় ভাবনায় ছিলাম।'

মনে পড়ে গেল অমলেশের, ঠিক একমাস আগে নবেন্দু পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

মহীতোষ চাটুজ্জের হঠাৎ যেন খেয়াল হল, অমলেশ অনেকক্ষণ এ ঘরে বসে আছে। স্ত্রীর উদ্দেশে

বললেন, 'রুগীর ঘরে আর থাকতে হবে না, অমলেশকে নিয়ে যাও। ছেলেটা দু দিন ট্রেন জার্নি করে এসেছে। চান টানের ব্যবস্থা করে দাও, চা-টা খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিক। উঠে ভাত খাবে।'

'না না, সে কি—' অমলেশ চমকে উঠল, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, দেখা হল। এখনই আমি চলে যাব।' মুখোমুখি বসে মৃত্যুর খবর দেবার সাধ তার ইতিমধ্যেই মিটে গেছে। পৃথিবীতে এর চাইতে ভয়াবহ দুরূহ কাজ আর আছে কিনা, কে জানে। অথচ বোম্বাই থেকে ক্যালকাটা মেলে যখন উঠেছিল, ব্যাপারটা খুব সহজ না হলেও একেবারে অসাধ্য মনে হয় নি।

আজই, এখনই এখান থেকে চলে যেতে চায় অমলেশ। কলকাতায় গিয়ে চিঠিতেই নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে বোম্বাই ফিরে যাবে।

কিন্তু যে ফাঁস ইচ্ছে করে গলায় পরেছে, তার হাত থেকে মুক্তি নেই অমলেশের।

যুগপৎ নবেন্দুর মা এবং বাবা চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, 'তাই কখনও হয়! তুমি আমাদের নবুর বন্ধু; যখন এসেই পড়েছ দুটো দিন আমাদের কাছে থেকে না গেলে খুব খারাপ লাগবে।'

সাঁতার না-জানা মানুষের মতো অমলেশ বুঝি ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা কুটো ধরে সে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করল, 'কলকাতায় আমার জরুরি একটা কাজ—' কথা শেষ হবার আগেই মহীতোষ এবং তাঁর স্ত্রী একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'সে সব পরে দেখা যাবে। এখন গিয়ে চান টান কর তো—'

নবেন্দুর মা ডাকলেন, 'এস বাবা—'

যদিও কাল রাতে ঘন্টাকয়েক ঘুমোতে পেরেছে অমলেশ, তবু তিন দিনের ক্লান্তি মুছে দেবাব পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এই মুহূর্তে স্নায়ুর ওপর যে নিদারুণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো কিছুই সঠিকভাবে গুছিয়ে ভাবতে পারছে না সে। এলোমেলো বিশৃঙ্খল স্নায়ুগুলোকে জুড়িয়ে নেওয়া দরকার, তারপর কী করা উচিত ভাবা যাবে।

ওঁদের ইচ্ছায় নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল অমলেশ। আর তখনই আরেকবার নীলার চোখাচোখি হয়ে গেল; এখনও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল অমলেশ।

বাইরে এসে নবেন্দুর মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো কিছুই নেই দেখছি। জামাকাপড় আনো নি?'

জড়ানো গলায় অমলেশ বলল, 'এনেছি। কলকাতায় হোটেলে রেখে এসেছি।'

'কলকাতার হোটেলে?'

'হ্যাঁ। বোম্বাই থেকে কাল কলকাতায় এসে একটা হোটেলে উঠেছিলাম। তাই—'

'উঁহু উঁহু, হোটেলে থাকা চলবে না। আজ থাক, কাল গিয়ে সুটকেস টুটকেস নিয়ে আসবে। ক'দিন বাংলাদেশে তোমাকে থাকতে হচ্ছে?'

'ঠিক কিছু নেই। তবে এক সপ্তাহের বেশি থাকার উপায় নেই।'

'ওই ক'টা দিন আমাদের বাড়ি থেকে গেলে বড় আনন্দ পেতাম।'

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে নবেন্দুর মা বলে উঠলেন, 'এখন ওসব কথা থাক। এস—'

অমলেশ উত্তর দিল না। নবেন্দুর মায়ের সঙ্গে যেতে যেতে না তাকিয়েও অনুভব করল, একজোড়া নির্নিমেষ চোখ তার পিছু নিয়েছে।

চার

স্নান টান সেরে নবেন্দুর মায়ের দেওয়া একখানা ফরসা ধুতি পরেছে অমলেশ। দক্ষিণদুয়ারী সব চাইতে বড় ঘরখানা তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গোটা তিন চারেক বেতের মোড়া, তার ওপর হাতে সেলাই করা গদি, খেলো কাঠের খান দুই চেয়ার, একটা সস্তা টেবিল, বাঁশের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি, একটা পারিবারিক গ্রুপ ফটো—তাতে মহীতোষবাবু, নবেন্দুর মা, নবেন্দু আর নীলা। এককোণে আলনায় পরিপাটি করে কুঁচনো সামান্য ক'টি ধুতি, শাড়ি, মেয়েদের জামা—এ সবের ভেতর এই পরিবারটির রুচি এবং আর্থিক অবস্থা মুদ্রিত হয়ে আছে।

দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে একখানা বড় তক্তপোষ। তার ওপর ধবধবে পরিচ্ছন্ন বিছানায় এই মুহূর্তে শুয়ে আছে অমলেশ। মাথার দিকে বাঁখারির জানালা, তার ফ্রেমে শরতের আমেজ-লাগা বর্ষার এক টুকরো নীলাকাশ আটকে আছে। সেখানে গলানো গিনির মতো রোদ, পাখি। আর আছে ঝিরঝিরে বাতাস।

স্নানের পর শরীর জুড়িয়ে গিয়েছিল। এখন ঘুম পাচ্ছে অমলেশেব।

নিমকি সিঙাড়ার একটা প্লেট আর গরম চা নিয়ে সেই মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। রাস্তা থেকে এ-ই অমলেশকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। অমলেশ লক্ষ করল, এবার আর তার পরনে ফ্রক নেই, একটা শাড়ি। আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়ল, মেয়েটা মুখ তুলছে না।

টেবিল টেনে এনে তার ওপর চা-খাবার রাখল মেয়েটা। অমলেশ বলল, 'চা হলেই তো হত, অত খাবার কেন?'

জড়সড় হয়ে মেয়েটা দাঁড়িযে ছিল। অস্ফুট গলায় বলল, 'মা পাঠিয়ে দিলে।'

এ ব্যাপারে আর কী বলা যায়। একটু চুপ করে থেকে অমলেশ জিজ্ঞস করল, 'নাম কী তোমার?'

'ঝুনু।'

'কোন ক্লাসে পড়?'

ঝুনু উত্তর দিল না; বরং মুখটা আরো নিচু করে নখ খুঁটতে লাগল। অমলেশ আবার বলল, 'কী, চুপ করে কেন?'

এবার ফিসফিস করল ঝুনু, 'আমি স্কুলে পড়ি না।'

'কেন?' প্রশ্নটা করেই অমলেশ টের পেল, শব্দটা খট করে কানে লেগেছে।

ঝুনু বলল, 'স্কুলে পড়তাম, ক্লাস এইটে। মাইনে বাকি পড়েছিল বলে নাম কেটে দিয়েছে।' একটু থেমে উজ্জ্বল উৎসাহিত মুখে আবার বলল, 'দাদা ক'দিন আগে বোম্বে থেকে লিখেছিল, শিগগির অনেক টাকা পাঠাবে। তখন আবার স্কুলে ভর্তি হব।'

চমকে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল অমলেশ। একটু নীরবতা। তারপর ঝুনুই বলল, 'খবরের কাগজ পড়বেন?'

'আছে?'

'আমাদের নেই। পাশের বাড়ির বুলাদের আছে।'

অন্যের কাগজ, অমলেশ ইতস্তত করতে লাগল। ঝুনু বোধহয় তার মনের কথাটা পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওরা খুব ভাল, কাগজ আনলে কিছু মনে করে না। রোজ তো বাবাকে এনে দিই।'

ঝুনুর আগ্রহ এত বেশি যে 'না' বলতে পারল না অমলেশ, 'আচ্ছা আনো—'

ঝুনু চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে অমলেশ বলল, 'আমি এত খেতে পারব না। এস ভাগাভাগি করে খাওয়া যাক।'

ঝুনু মুহূর্তে গুটিয়ে গেল যেন, কুণ্ঠিত সুরে বলল, 'না—'

'নাও বলছি। লজ্জা করতে নেই।'

'উঁহু—'

'কী বোকা মেয়ে রে! খাবার জিনিস পেলে টপ করে যে মুখে পুরতে হয় তাও জান না। নাও নাও—দাদারা বললে নিতে হয়।'

কোনোরকমে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে আর দাঁড়াল না ঝুনু, দৌড় লাগাল। কিছুক্ষণ পর খবরের কাগজ নিয়ে ফিরে এল সে।

চা, খাবার এবং খবরেব কাগজ অন্যমনস্ক করে ফেলল অমলেশকে। কতক্ষণ পর মনে নেই, কাগজ থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পেল, ঝুনু দাঁড়িয়ে আছে। একটু অবাক হয়ে অমলেশ বলল, 'এ কি, দাঁড়িয়ে কেন? বসো না।'

অমলেশের মনে হল, ঝুনু কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞেস করল, 'আমায় কিছু বলবে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ঝুনু। ফিসফিসিয়ে বলল, 'অনেকদিন দাদাকে দেখি না। বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে।'

ঝুনু কার কথা বলছে, অমলেশ বুঝতে পারল। কে জানত, এ বাড়িতে যার সঙ্গে যে বিষয়েই কথা হোক, নবেন্দুর প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। বুকের ভেতর শ্বাস আটকে চুপ করে থাকল সে।

ঝুনু আবার বলল, 'আপনি বোম্বেতে ফিরে দাদাকে একবার আসতে বলবেন। বলবেন তো?'

আড়ষ্ট গলায় কী উত্তর দিল, অমলেশের নিজের কাছেই তা পরিষ্কার নয়।

ঝুনু এবার উঠে পড়ল, 'এখন যাই।' বলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়াল। বিষণ্ণ সুরে বলল, 'থাক, দাদাকে আসতে বলবেন না।'

অমলেশ বিমূঢ়, হতবাক। বলল, 'কেন?'

ঝুনু বলতে লাগল, 'মনে ছিল না, এখানে আসা দাদার বারণ। এলেই পুলিশ ধরবে।' বলে আস্তে আস্তে চলে গেল।

অমলেশ কার কাছে যেন শুনেছিল নবেন্দুকে এই জেলা থেকে 'এক্সটার্ন' করা হয়েছে। এই মুহূর্তে তার নাম মনে করতে পারল না। শুধু বিভ্রান্ত, পীড়িত স্নায়ুর ভেতর থেকে কেউ ফিসফিসিয়ে অবিরত বলতে লাগল, 'পালাও, পালাও—'

পাঁচ

চা আর খাবার খেয়ে কাগজ পড়ার পর চোখের পাতা কখন ভারি হয়ে এসেছিল, মনে নেই। অমলেশ টান টান হয়ে শুয়েও পড়েছিল। হঠাৎ বারান্দা থেকে ফিসফিসানি কানে এল। কণ্ঠস্বরে চিনতে পারল নীলা আর নবেন্দুর মা।

নবেন্দুর মা বলছেন, 'গোটা পাঁচেক টাকা দে নীলি—'

নীলা বলল, 'টাকা কোথায়?'

'কিছু বাজার টাজার করা তো দরকার। ঘরে কিছু নেই, ছেলেটা এল। একটু মাছ, একটু তরকারি তার সামনে ধরে দিতে না পারলে কেমন দেখায়!'

'সত্যি বলছি মা, আমার কাছে একটা টাকা আর অল্প কিছু রেজগি ছাড়া কিচ্ছু নেই। ওটা যদি তোমাকে দিয়ে দিই, আজ বেরুব কী করে? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'সেদিন অতগুলো টাকা তোমায় দিলাম, এর ভেতর খরচ হয়ে গেল?'

'অতগুলো মানে? মোটে তো ষাটটা টাকা। সংসারটা কত বড় খেয়াল আছে। চার বেলা এই গুষ্টির হাঁ বুজোতে কী লাগে, টের পাস? তোর তো ধারণা মায়ের পেটটা জালার মতো। দিন রাত চার হাতে সেই জালা বুজোচ্ছে।' নবেন্দুর মায়ের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তিক্ত।

নীলা করুণ গলায় বলল, 'তুমি শুধু শুধু সব কিছু নিজের ওপর টেনে নিচ্ছ মা। আমি কি বলেছি তোমার পেটটা জালার মতো, দিনরাত সেটা তুমি বুজিয়ে যাচ্ছ? সংসার বাঁচবার জন্যে চেষ্টা কি আমি কম করছি?'

'রাগ করিস না মা। নানান জ্বালায় আমার মাথার ঠিক নেই। এক মাস হল নবু টাকা পাঠাচ্ছে না। তার আগেও ক'মাস পাঠায় নি। সংসার কিভাবে চলছে তা শুধু আমিই জানি।'

নীলা বলল, 'ওসব কথা থাক এখন। বুলাদের বাড়ি থেকে পাঁচটা টাকা ধার করে আনো।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'ওদের কাছে আর হাত পাতা যায় না। কাল দেব পরশু দেব করে কতবার যে টাকা এনেছি, ফেরত আর দেওয়া হয় নি।'

'তবু আরেকবার যাও। পরশু ঠিক দিয়ে দেব।'

'কী করে যে গিয়ে হাত পাতব!'

নীলা বলল, 'দোষ তো তোমারই। তোমার জন্যই তো এই ঝঞ্ঝাট বাধল।'

ঈষৎ রুক্ষ গলায় নবেন্দুর মা শুধোলেন, 'কেন, কী করেছি আমি?'

'ভদ্রলোক নিজে থেকে চলে যেতে চেয়েছিলেন; তুমি তাঁকে আটকালে। নিজেদের এই অবস্থা, এর ভেতর ওঁকে না রাখলে চলত না?'

'না, চলত না। নবুর সঙ্গে ওর যা সম্পর্ক তাতে চলে যেতে দেওয়া যায় না।'

নীলা আর বিশেষ কিছু বলল না, নিচু গলায় গজ গজ করতে লাগল।

অমলেশের জন্যই যে এরা বিব্রত বিপন্ন, বলে না দিলেও চলে। সব জেনেও সব বুঝেও এই মুহূর্তে আর পালানো যায় না। হঠাৎ অমলেশের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। আচ্ছন্ন ঘুমের ভাবটা আগেই ছুটে গিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে নিজের পকেট থেকে কিছু টাকা নিয়ে বাইরে এল সে। ডাকল, 'মাসিমা—'

নবেন্দুর মা আর নীলা এখনও যায় নি; বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকটা কানে যেতে দু'জনেই চোখ ফেরাল। নবেন্দুর মা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন, 'কি বাবা, এখনও ঘুমোও নি?'

'ঘুম আসছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে উঠে এলাম।'

'কী কথা?'

'আসার সময় নবেন্দু আমার হাতে শ'দেড়েক টাকা দিয়েছিল। আপনাদের দিতে বলেছে। নানা কথায় একদম ভুলে গিয়েছিলাম—এই নিন।' টাকাটা এগিয়ে দিল অমলেশ।

হাত পেতে নিতে নিতে নবেন্দুর মায়ের চোখ আলো হয়ে উঠল, 'তাই তো বলি, এখনও টাকা আসে না কেন? সংসার সম্বন্ধে অত দায়িত্ব যে ছেলের, অত মমতা, সে কেন এখনও টাকা পাঠাচ্ছে না? দাঁড়াও বাবা, তোমার মেসোমশাইকে খবরটা দিয়ে আসি।' বলে উত্তরের জানালা-বন্ধ ঘরটার দিকে ছুটলেন।

আবেগের বশে টাকাটা দিয়েই অমলেশ বুঝতে পারল, অদৃশ্য সেই ফাঁসটা নিজের গলায় বেশ ভাল করেই বেঁধেছে। এ কী কবল সে? অবচেতনে কিছু টাকা সাহায্য করার লোভটা হঠাৎ মাথায় চাড়া দিয়েছিল কিনা বলতে পারবে না। কিন্তু দেড়শ টাকা দিয়ে এ কোন নিদারুণ বিপদ ডেকে আনল? নবেন্দু পাঠিয়েছে বলে তো দাতাকর্ণ সাজল; কিন্তু তারপর? তারপর কেমন করে মৃত্যুর খবরটা দেবে? অমলেশের চার ধারে পৃথিবী যেন দুলতে লাগল। মনে হতে লাগল, ফুসফুসে টানার মতো পর্যাপ্ত বাতাস এখানে নেই।

এলোমেলো স্খলিত পায়ে দক্ষিণদুয়ারী সেই ঘরটার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ অমলেশের চোখে পড়ল সেই মেয়েটা, নীলা, পলকহীন তাকিয়ে আছে। এ বাড়িতে দেখা হবার পর থেকে কেন নীলা ওই ভাবে তাকিয়ে থাকছে? তার চোখ কেন এত তীব্র, এত তীক্ষ্ণ এবং দূরভেদী? অমলেশ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিজের সেই ঘরখানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ অশান্ত, অস্থির ইন্দ্রিয়ে ঝড় বইতে লাগল। তারপর কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল, জানে না।

ঘুম ভাঙল ঝুনুর ডাকে। চোখ মেলে অমলেশ দেখল, কোথায় সেই গলানো গিনির মতো রোদ, কোথায় পাখি, আর কোথায়ই বা ঝিরঝিরে বাতাস। কোনো এক জাদুকরের ইঙ্গিতে সে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকাশ জুড়ে এখন সাজ সাজ রব। টুকরো টুকরো কালো মেঘ ইতস্তত ছড়ানো, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে, ভিজে ভিজে পুবে বাতাস দিগ্বিদিকে ছুটছে। বর্ষার দিনটা সকাল থেকে ঘন্টা কয়েক চুপিসারে শরৎকালের মজা লুট করে আবার তার আপন স্বভাবে ফিরে যেতে শুরু করেছে।

ঝুনু বলল, 'খেতে চলুন। মা ডাকছে—'

নিঃশব্দে উঠে তার পিছু পিছু পুবদিকের একটা ঘরে চলে এল অমলেশ। মাঝখানে পাড়ের সুতো দিয়ে ফুল-লতা-পাতার নকশা-করা একটা সুদৃশ্য আসন; সেটার সামনে ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত বেগুন আর আলু ভাজা। থালাটা ঘিরে জলের গেলাস, বাটিতে বাটিতে তরকারি মাছ ডাল। একটা কাচের প্লেটে দই এবং বড় একখানা সন্দেশও চোখে পড়ল। থালার অদূরে নবেন্দুর মা বসে আছেন। ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন, চুলগুলো এলোমেলো খোঁপায় আবদ্ধ, চওড়া কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। তাঁর ডান পাশে মীনা দাঁড়িয়ে। ঝুনু অমলেশকে ঘর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে চলে গেছে।

নবেন্দুর মা বললেন, 'বসো বাবা, বসো। অনেক বেলা হয়ে গেল। এত বেলায় নিশ্চয়ই তোমার খাবার অভ্যেস নেই।'

অভ্যাস সত্যিই নেই। সপ্তাহের আর সব দিনে তো বটেই, ছুটির দিনেও সাড়ে ন'টার ভেতর খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ফেলে অমলেশ। তাদের বাড়িতে তাই নিয়ম। এখন প্রায় একটা বাজতে চলেছে। ভদ্রতার খাতিরে বলতেই হল, 'অভ্যেস টভ্যেসের বালাই আমার নেই। যখন হোক খেলেই হল।'

আসনে বসতে বসতে আঁতকে ওঠার মতো করল অমলেশ, 'আমি কিন্তু এত খেতে পারব না মাসিমা। সব বাটি থেকে অর্ধেক অর্ধেক তুলুন—'

বিষণ্ণ হাসলেন নবেন্দুর মা, 'তোমাদের কথা নবু আমাদের জানিয়েছে। তোমরা কী খাও, মোটমুটি আন্দাজ করতে পারি। তোমার পাতে কী সাজিয়ে দিয়েছি আমি তো জানি। একে যদি 'অনেক' বল, 'বেশি' বল, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।' একটু থেমে আবার বললেন, 'এমন দিনে আমাদের বাড়ি এলে যখন আমরা পথের ভিখিরি। সুদিনে যদি আসতে বাবা—' বলতে বলতে তাঁর স্বর ভারি বিষাদে বুজে এল।

এ ব্যাপারে অমলেশের মুখে কোনো উত্তর জোগাল না। সুদূর বোম্বাই থেকে সে এদের কাছে মৃত্যুর খবর বয়ে এনেছে, সে নিদারুণ এক বার্তাবহ। অথচ তারই সামনে এঁরা সযত্নে নানা সুখাদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন। এত আদর, এত আপ্যায়ন, এত আতিথেয়তা—সব যেন দুঃসহ মনে হতে লাগল।

অথচ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এমন এক জায়গায় সে পৌঁছে গেছে যেখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর কথা বলা যায় না। জোর করে অন্যমনস্ক হবার জন্য অমলেশ বলল, 'আমি একাই খাব নাকি? সবাই একসঙ্গে বসলে হত না? খাবার টাবারগুলো মাঝখানে রেখে আসুন সকলে বসি, আপনিও বসুন।'

'পাগল ছেলে—' সস্নেহে নবেন্দুর মা হাসলেন, 'ছেলেদের খাওয়া না হলে বাড়ির মেয়েরা কি বসতে পারে বাবা? ভাল কথা—' মীনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হীরু আর নিতু কোথায় রে? সেই সকাল থেকে যমের অরুচি দুটোকে দেখছি না। ওরা থাকলে না হয় অমলেশের সঙ্গে বসতে পারত। পড়াশোনা ছেড়ে দুটো বাঁদর তৈরি হচ্ছে—' হীরু আর নিতু খুব সম্ভব নবেন্দুর ভাই, তার মুখে দুই ভাইয়ের কথা শুনেছিল অমলেশ। এ বাড়িতে আসার পর অবশ্য তাদের দেখেনি।

মীনা বলল, 'হীরু তো ভোরবেলা কলকাতায় গেল। ওদের ক্লাবে ফাংশন আছে—কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আনবে। নিতু কোথায় জানি না।'

বিরক্ত স্বরে নবেন্দুর মা অমলেশকে বললেন, 'হাড় একেবারে ভাজা ভাজা করে দিল। তুমি বোম্বাইতে গিয়ে নবুকে বলো তো, ওরা একদণ্ড বাড়ি থাকে না। দিনরাত বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছে।'

আবার সেই নবেন্দুর কথা, রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ জানালো, 'বলব।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'কত্তাকেই বসতে বলতাম কিন্তু ওঁর অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখেছ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তুমি একাই খাও বাবা। ও বেলা হীরু নিতু এলে একসঙ্গে বসো।'

এ বাড়ি কি পুরনো চালে চলছে? অর্থাৎ মেয়েপুরুষের এক সঙ্গে বসে খাওয়ার রেওয়াজ চালু হয় নি? অমলেশ বলতে যাচ্ছিল, 'মীনা আর ঝুনু তো ছেলেমানুষ, ওরা আমার সঙ্গে বসতে পারে।' কিন্তু তার আগেই একখানা আসন হাতে করে ব্যস্তভাবে এ ঘরে এসে ঢুকল নীলা। তাড়াতাড়ি আসনটা পেতে বসতে বসতে বলল, 'কাউকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমিই ওঁর সঙ্গে বসছি। ভাত দাও মা, দুটোর ট্রেনটা ধরব। চারটের ভেতর কলকাতায় পৌঁছতে না পারলে মুশকিল হবে।' বলতে বলতে জানালার বাইরে তাকাল, 'ইস, কী মেঘটাই না করেছে! বৃষ্টি নামলে বেরুতে পারব না। তাড়াতাড়ি দাও মা, খেয়েই বেরিয়ে পড়ি। স্টেশনে গিয়ে না হয় খানিকক্ষণ বসে থাকব।'

দুটো ব্যাপার লক্ষ করল অমলেশ। নীলা ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে। চোখের কোলে কাজল টানা, মুখে হালকা পাউডার বুলনো, পরিপাটি করে চুল বাঁধা, ইত্যাদি ইত্যাদি টুকিটাকি প্রসাধন শেষ। এখন শুধু শাড়ি জামা বদলে নিলেই সাজটা সম্পূর্ণ হয়।

আরেকটা ব্যাপার, নীলার বেরুবার কথা শুনেই নবেন্দুর মায়ের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি স্থির। মেয়ের জন্য ভাত বাড়তে বাড়তে বললেন, 'এখন তো বেরুচ্ছ, ফিরবে কখন?'

নীলা বলল, 'লাস্ট ট্রেনের আগে ফিরতে পারব বলে মনে হয় না।'

'রোজ রোজ লাস্ট ট্রেনে ফেরা, কী যে তোমার অভ্যেস হচ্ছে!' নবেন্দুর মায়ের গলা চাপা এবং তীব্র শোনাল।

'কী করব বল, চাকরি—' বলেই অমলেশের দিকে তাকাল নীলা।

নীলার সামনে ভাতের থালা দিয়ে নবেন্দুর মা বললেন 'ওই একটা কথা তো আছেই। তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করো।'

মুখ নামিয়ে আস্তে করে নীলা বলল, 'আচ্ছা—'

অমলেশ চুপ করে বসে ছিল। নবেন্দুর মা এবার তার সম্বন্ধে সচেতন হলেন বুঝি। বললেন, 'এ কি, তুমি এখনও হাত গুটিয়ে বসে আছ! নাও—নাও, শুরু কর—' নিয়ম অনুযায়ী খিদে পাওয়া নিশ্চয়ই উচিত, নানারকম লোভনীয় খাদ্যও চারদিকে সাজানো কিন্তু খাবার মতো বিন্দুমাত্র উৎসাহ নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না অমলেশ। বাংলাদেশের মায়েদের চোখে ধুলো ছিটানো সহজ নয়। নবেন্দুর মা, 'এটা খাও, ওটা খাও, পটলেব তরকারিটা ফেলে গেলে হবে না' ইত্যাদি হাজার রকম বলে কত যে খাওয়ালেন, হিসেব নেই। মীনা রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝে ভাত মাছ এনে তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। খাওয়া যে সব সময় আনন্দময় অভিজ্ঞতা নয়, কখনও কখনও তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক আর ভয়াবহ—এমন কথা আগে অমলেশের জানা ছিল না। খেয়ে যাচ্ছে ঠিকই, প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছে, কিন্তু অসাড় জিভ স্বাদ বা গন্ধ কিছুই বুঝতে পারছে না।

শুধু খাওয়ানোই না, ফাঁকে ফাঁকে অন্য গল্পও হতে লাগল। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই একতরফা। নবেন্দুর মা মহিলাসুলভ কৌতূহলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের সংসারের যাবতীয় খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন। অমলেশের ভাইরা কে কী করে, বৌদিরা কে কতদূর পড়াশুনো করেছেন, বাবার রিটায়ারমেন্টের পর ক'বছর কাটল, বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ফেরার ইচ্ছা আছে কিনা, বিয়ে করেছে কিনা, যখন শুনলেন করে নি তখন শুধোলেন কেন করে নি, করবার ইচ্ছে আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি কত প্রশ্ন যে করলেন আর অমলেশও একের পর এক উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

কথায় কথায় কখন যে অনিবার্যভাবে নবেন্দুর প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল, টের পায় নি অমলেশ। ব্যাপারটা অমোঘ নিয়তির মতো, ঘুরে ফিরে অজ্ঞাতসারেই হোক আর আগে থেকে জানান দিয়েই হোক, সেটা এ বাড়িতে এসে পড়বেই।

নবেন্দুর মা বললেন, 'আচ্ছা অমলেশ—'

থালা থেকে মুখ তুলে তাকাল অমলেশ। নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'নবু তো আন্ধেরীতে থাকে। বোম্বাইতে তোমরা যেখানে থাকো সেখান থেকে ওই জায়গাটা কতদূর?'

'বেশি দূর না, কাছেই। মাইল তিন চারেক হবে।'

'তুমি নবুর ওখানে যাও?'

অমলেশের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই পুরনো শ্বাসরুদ্ধ ভাবটা বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগল সে। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক ছটফট করছে, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, খাওয়া থামিয়ে নীলা তার দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, সকালবেলা তার এ বাড়িতে পা দেবার পর থেকে যখনই নবেন্দুর কথা উঠেছে তখনই অদৃশ্য কিছুর ইঙ্গিতে নীলা কাছাকাছি থাকে। শুধু থাকেই না, দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। বিচিত্র এক অস্থিরতা অমলেশকে পেয়ে বসল যেন।

নীলা তাকিয়েই আছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে ঝাপসা সুরে অমলেশ বলল, 'মাঝে মাঝে যাই—' অথচ নবেন্দুর মৃত্যুর পর একবারই মাত্র আন্ধেরী গিয়েছিল; তার ঠিকানা খুঁজে পায় নি।

নবেন্দুর মা বললেন, 'নবু একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কত বড় ঘরটা?'

চোখ কান বুজে সাগরে ঝাঁপ দেবার মতো করে অমলেশ বলল, 'মাঝারি—'

'আলো বাতাস খেলে?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়া দাওয়া কোথায় করে? নিজের হাতে রাঁধে, না হোটেলে খায়? খুব কম চিঠি লেখে নবু। দরকারি সব কথাই তাতে থাকে। শুধু খাবার কথাটাই থাকে না।'

অমলেশের নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। মরিয়ার মতো বলল, 'নিজেই রাঁধে।'

'সে একরকম ভাল।' নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'হোটেলের খাওয়া তো পাপের শাস্তি, বাসি পচা যা ইচ্ছে দেয়। নবু আমার পেটরোগা ছেলে, ঝাল বাসি-টাসি একেবারে সহ্য করতে পারে না।'

অমলেশ উত্তর দিল না।

নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'বড্ড খেয়ালি, খাওয়া দাওয়ার কথা মনে থাকে না। ইচ্ছে হল্ল, দু দিন না খেয়েই রইল। চোখের আড়ালে অতদূরে থাকে, আমার তো কিছু করবার নেই। তুমি বাবা ওকে সময়মতো চান খাওয়া করতে বলো।'

অমলেশ ফিসফিসিয়ে জানায়, 'বলব।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে নবুর আলাপ হয়েছে, এতে একদিকে থেকে আমি নিশ্চিন্ত। নবু জানিয়েছে, তুমি ওকে ছোট ভাইয়ের মতো দ্যাখো। দরকার হলে বকবে, শাসন করবে।'

অবরুদ্ধ গলায় অমলেশকে বলতে হল, 'করব।'

একটু চুপ। তারপর নবেন্দুর মা নীরবতা ভাঙলেন। আচ্ছন্ন, বিষাদময় সুরে বললেন, 'নবুকে নিয়ে আমার বড্ড ভাবনা অমলেশ। চোখের সামনে তো নেই, প্রাণটা তাই সব সময় অস্থির হয়ে থাকে। তুমি তো ওর সব কিছুই জানো বাবা—'

অমলেশ আস্তে করে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ জানে।

'পাকিস্তান হবার কয়েক বছব পর চলে এলাম। এমনই অদৃষ্ট, এখানে এসে উনি পক্ষাঘাত হয়ে বিছানায় পড়লেন। আর সারা সংসারটার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল নবুর ওপর। চাকরি টাকরি না পেয়ে খারাপ পথে ওকে যেতে হল। অথচ—'

এ সব কথা অমলেশের জানা। কী বলবে ভেবে পেল না।

নবেন্দুর মা সমানে বলে যাচ্ছেন, 'অথচ কত ভাল ছাত্র ছিল আমার নবু। ম্যাট্রিক, আই. এ'তে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিল, দুটো করে লেটার পেয়েছিল। কিন্তু কী হল তাতে, কিছুই না। আচ্ছা—'

'বলুন—'

'বোম্বাইতে ও কী করে বল তো? কিছুই জানায় না।'

খানিকক্ষণ থতিয়ে থেকে অমলেশ বলল, 'অফিসে অফিসে ছোটখাট জিনিস সাপ্লাই করে।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'নবু লিখেছিল তুমি ওর জন্যে চাকরির চেষ্টা করছ। একটা কাজ জুটিয়ে দিয়ে আমাদের বাঁচাও অমলেশ।'

কী একটা বলতে চেষ্টা করল অমলেশ কিন্তু গলার ভেতব দিয়ে চাপা গোঙানির মতো আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরিয়ে এল না। খাওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাত শুকিয়ে কড়কড়ে। একসময় উঠে পড়ল অমলেশ। আর উঠেই নীলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সেই চোখ তেমনই তীক্ষ্ণ, তেমনই দূরভেদী। এই মুহূর্তে তাতে কিসের ছায়া যেন ঘন হয়েছে।

ছয়

আঁচিয়ে দক্ষিণদুয়ারী সেই ঘরখানায় এসে শুয়ে পড়ল অমলেশ। সকালবেলা টানা কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছে, তবু তিন দিনের ক্লান্তির বেশ খানিকটাই শরীরময় ছড়িয়ে রয়েছে। বিছানায় নিজেকে সঁপে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসার কথা, কিন্তু এল না। চোখের পাতায় হাজার কাঁটা বিঁধছে। রক্তের দ্রুতগামী ঢল হৃৎপিণ্ডে অবিরাম ঘা দিয়ে যাচ্ছে।

অমলেশকে পালাতে হবে। এখনই, এই মুহূর্তে। নবেন্দু যা বলেছিল তার সত্যাসত্য যাচাই করার সাধ তার কেন যে হয়েছিল? এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে সে উন্মাদ হয়ে যাবে।

আজকের বর্ষাটা যেন বহুরূপী। খেতে যাবার আগে আকাশ জুড়ে যার আয়োজন দেখেছিল অমলেশ, এখন তাব চিহ্ন নেই। হঠাৎ উত্তুরে বাতাস এসে মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু সুযোগ পেলেই অমলেশ পালাবে। নিজের হাতে গলায় যে ফাঁস পরেছে তা তাকে কাটাতেই হবে। এলোমেলো নানা ভাবনা ঝড়ের মতো তার ওপর দিয়ে বইতে লাগল।

দু চোখের ওপর হাত রেখে শুয়ে ছিল অমলেশ। হালকা পায়ের শব্দে হাত সরিয়ে তাকাল, নীলা এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন জানে না, মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত নেমে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসল অমলেশ।

নীলা বলল, 'ঘুমুচ্ছিলেন?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল অমলেশ।

একটু চুপ করে থেকে নীলা বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। মেঘ কেটে যাচ্ছে, একটু দেরি করে বেরুলেও ট্রেন ধরতে পারব। তাই—'

বুকের ভেতরকার অসহ্য কাঁপুনি গোপন রেখে অমলেশ বলল, 'বেশ তো, বসুন না—'

একটা মোড়া টেনে অমলেশের বিছানার অদূরে বসল নীলা। বলল, 'আলাপ অবশ্য কালই হয়েছে। কেউ কারো নাম ধাম কিংবা পরিচয় জানতাম না।'

'হ্যাঁ।'

'আমার পরিচয় জানবার পর কিরকম লাগল?'

সঠিক উত্তরটা জানা ছিল, বলতে গিয়ে থমকে গেল অমলেশ।

নীলা বিচিত্র হাসল, 'আমাকে এ বাড়িতে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন।'

'তা একটু হয়েছি।'

'অবাক হবার কিন্তু কিছু ছিল না।'

বিমূঢ়ের মতো অমলেশ বলল, 'কেন?'

'আপনি আমার দাদার কথা কতটুকু জানেন?' নীলা সোজাসুজি অমলেশের চোখের ভেতর তাকাল।

মেয়েটা কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল অমলেশ।

কণ্ঠস্বর অতলে নামিয়ে নীলা এবার ফিসফিস করল, 'আপনি কি জানেন, আমার দাদা নাম-করা ওয়াগনব্রেকার, এই ডিস্ট্রিক্ট থেকে তাকে বার করে করে দেওয়া হয়েছে?'

'শুনেছি।'

'যার ভাইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড এইরকম তার বোন আর কী হতে পারে? কাল রাত্তির ট্রেনে যা দেখেছেন—'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। অমলেশ বলল, 'আচ্ছা—'

'কী?'

'কালকের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ওভাবে পুলিশ লেগেছিল কেন আপনার পেছনে?'

'বুঝতে পারেন নি!' দু চোখে অপার বিস্ময় ফুটিয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল নীলা। পরক্ষণেই তীব্র রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠল। অল্পক্ষণ, তারপর হাসিটা থামিয়ে দিয়ে সেই আগের মতো ফিসফিস গলায় বলল, 'আপনি দেখছি একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু।'

নীলার ধিক্কার তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে গেল অমলেশকে।

নীলা গলা আরো নামায়, 'আমার মতো মেয়ের পেছনে পুলিশই লাগে। রাজপুত্তুর ঘুরঘুর করে না। বুঝলেন?'

অমলেশ স্তম্ভিত, হতবাক।

নীলা স্বর পালটে বলল, 'সে যাক গে, আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে এসেছি—জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট।'

অমলেশ চমকে গেল, 'কিসের চুক্তি?'

'কাল ট্রেনে যা দেখেছিলেন, আমার মা-বাবাকে দয়া করে বলবেন না।'

'বলা যে বারণ তা আগেই বুঝেছি।'

'কখন বুঝলেন?'

'ওই যে তখন ইশারা করলেন।'

এই সময় ঝুনু ঘরে এল। বলল, 'দিদি তুমি বেরুবে না আজ? মা জিজ্ঞেস করল। এখন একটা বেজে কুড়ি—'

চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল নীলা। বলল, 'ইস, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। এক্ষুনি আমাকে বেরুতে হবে।'

কথা ক'টা বলেই ঝুনু চলে গিয়েছিল। নীলা বলল, 'আপনার সঙ্গে আরেকটা কথা আছে।'

'কী?' অমলেশ চোখ তুলে তাকাল।

'দাদার সম্বন্ধে।'

রুদ্ধস্বরে অমলেশ বলল, 'নবেন্দুর?'

অস্তে মাথা হেলাল নীলা, 'হ্যাঁ।'

'কী কথা?'

'ফিরে এসে বলব। তার আগে চলে যাবেন না যেন।' নীলা বেরিয়ে গেল।

সাত

অমলেশ যেখানটায় বসে আছে তার মুখোমুখি বাঁশের চৌকো খোপ-কাটা একটা জানালা। তার বাইরে সেই রাস্তাটা; সোজা যেটা স্টেশনের দিকে চলে গেছে। খানিক আগে ওই পথটা ধরেই সে এখানে এসেছে।

বুকের ভেতর অসীম উদ্বেগ নিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল অমলেশ। কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীলা ওই রাস্তাটায় গিয়ে উঠল, তারপর অলস মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগল। হাতে এখনও অঢেল সময়—প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো। কাজেই ছোটাছুটির প্রয়োজন কী? আয়েশ করে নিশ্চিন্তে এই পথটুকু পাড়ি দিলেই চলবে।

অমলেশ লক্ষ করল, অতি সাধারণ বেশবাস নীলার। একটা ফর্সা হলুদ শাড়ি আর লাল জামা পরেছে। প্রসাধনের নমুনা তো খেতে বসেই দেখেছে। সেদিনকার ট্রেনে দেখা রাজেন্দ্রাণীর মতো সাজসজ্জার চিহ্নমাত্র তার ভেতর খুঁজে পাওয়া গেল না।

দেখতে দেখতে বাড়িঘর আর গাছপালার আড়ালে নীলা মিলিয়ে গেল। তারপরও অনেকক্ষণ বসে থাকল অমলেশ। আর অনুভব করতে লাগল, দেহের প্রতিটি রক্তকণা চিৎকার করে বলছে, 'পালা—পালা—'

পালাতে তাকে হবেই। ওই মেয়েটা—নীলা—নীলা চ্যাটার্জি ফিরে আসার আগেই বীজপুরের চৌহদ্দি পেরিয়ে বহু, বহু দূরে চলে যাবে অমলেশ।

আরো খানিক ঘুমিয়ে নিতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যেত। সারা গায়ে এখনও অনেকখানি ক্লান্তি মাখা। কিন্তু এবার আর শুতে পারল না অমলেশ। ক্লান্ত শরীরকে বিশ্বাস নেই, শুলে কতক্ষণ ঘুমোবে কে বলবে। হয়তো বিকেল পেরিয়ে যাবে, হয়তো সন্ধে নেমে যাবে। ঘুমোতে গিয়ে অতখানি ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না তার।

বসে বসে ভাবতে লাগল অমলেশ, কোন ছুতোয় এ বাড়ি থেকে বেরুনো যায়। তার ডান ধারে সেই সস্তা টেবিলটা; তার ওপর চিনেমাটির ফুলদানি, টাইমপিস, খানকতক গল্পের বই। বুলাদের বাড়ি থেকে ঝুনু যে খবরের কাগজখানা এনেছিল, সেটা আর দিয়ে আসা হয় নি। টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে। এ সবের ফাঁকে একটা পুরনো অ্যালবাম অমলেশের চোখে পড়ল। মলাটটা কোনো একসময় সোনালি ছিল, রং জ্বলে গিয়ে সেটা এখন ধূসর।

অন্যমনস্কের মতো অ্যালবামটা তুলে নিয়ে ওলটাতে লাগল অমলেশ। তার চোখের সামনে দিয়ে

ছবির পর ছবি চলে যাচ্ছে। নীলা, নবেন্দু, মহীতোষ কিংবা তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য সব মুখ তার অচেনা। দেখেই বোঝা যায় ছবিগুলো অনেক কাল আগের তোলা; সাদা অংশগুলো হাতে হাতে নোংরা হয়ে গেছে। যে সময়ে এগুলো তোলা হয়েছে তখন নবেন্দুদের সংসার বেশ সচ্ছলই ছিল অনুমান করা যায়। প্রাণে শখের অবকাশ ছিল।

ছবি দেখছে ঠিকই কিন্তু অমলেশের মনে কিংবা ভাবনায় সেগুলো বিন্দুমাত্র রেখাপাত করছে না। মাথার ভেতর পালানোর চিন্তাটাই চরকির মতো সমানে ঘূরপাক খাচ্ছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলল অমলেশ। দরজার কাছে মীনা দাঁড়িয়ে আছে; চোখাচোখি হতে হাসল। বলল, 'এখান দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ঘুমোন নি। তাই দাঁড়িয়ে পড়লাম।'

পালানোর চিন্তাটা আপাতত মুলতুবি রেখে অমলেশও হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, ঘুম আসছে না।'

'চান করে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন। তাই হয়তো—'

'হ্যাঁ, তাই হবে।

'জলটল কিছু দরকার আছে?'

'না।'

'না' বলা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকল মীনা। অমলেশের মনে হল, আরো কিছু বলতে চায় সে। বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস না—'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মীনা, টেবিলের ওধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অমলেশ বলল, 'ওখানে কেন, কাছে এসে বসো—'

লাজুক চোখে একবার অমলেশকে দেখে নিয়ে তক্তপোষের দূর প্রান্তে বসল মীনা। আর তখনই তার কোলের ওপর অ্যালবামটা দেখতে পেল সে। উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করল, 'ছবি দেখছেন?'

'হ্যাঁ।' অমলেশ ঘাড় কাত করল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'দু একজন ছাড়া আর কাউকেই চিনতে পারছি না।'

'কেমন করে চিনবেন? আমাদের আত্মীয়স্বজনদের তো আপনি কখনও দ্যাখেন নি।'

'তা বটে।'

'চিনিয়ে দিচ্ছি।' নিজের অজন্তেই বুঝিবা কাছে এগিয়ে এল মীনা। তারপর কে তার মাসিমা, কে তার পিসিমা, কে দাদার বন্ধু, কে মেসোমশাই, কে কাকা ইত্যাদি ইত্যাদি চেনাতে লাগল। চেনাতে চেনাতে মীনা বলল, 'এ সবই পুরনো ছবি। মা বাবাকে দেখেছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর এই দেখুন ওঁদের ছবি। কী চেহারা ছিল আর কী দাঁড়িয়েছে!'

বিচিত্র এক বিষাদ আলতোভাবে অমলেশকে ছুঁয়ে গেল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে একেবারে নতুন একখানা ফটো বেরিয়ে গেল। সেটা মীনার। মাইকের সামনের বসে গান গাইছে সে—এইরকম ভঙ্গিতে ফটোটা তোলা। দু রকমের বিস্ময় দু দিকে থেকে অমলেশকে ঘিরে ধরল। প্রথমত, নতুন ফটো তোলার শখ এ বাড়িতে এখনও আছে। দ্বিতীয়ত, মীনা গায়িকা। মীনার চোখের দিকে তাকিয়ে অমলেশ বলল, 'তুমি যে গাইতে পার তা তো জানতাম না। নবেন্দু তোমাদের সংসারের সব কথা বলত, এই কথাটাই বলে নি।'

মীনা চোখ নামিয়ে লাজুক সুরে বলল, 'ছাই গাইতে পারি।'

'ছাই-ই যদি হবে, মাইকের সামনে কেউ গাইতে বসে? কোথায় গেয়েছিলে?'

'এখানকারই একটা ফাংশানে। ওরাই ফটোটা তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ফাংশানে গেয়েছ! তবে তো দারুণ আর্টিস্ট। তোমার গান না শুনলে চলছে না।' অমলেশ মাথা নাড়তে লাগল।

মীনা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি আর কী গাইতে পারি; আমার চাইতে ঢের ভাল গায় দিদি।'

দিদি বলতে নীলা। অমলেশ চকিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে অবাকও। বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠা মেশানো গলায় দূরমনস্কের মতো বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় হেলিয়ে দিল মীনা।

'জানা থাকল।' আবার পাতা ওলটাতে ওলটাতে অ্যালবামের ভেতর থেকে ছোট একটা ফোটো ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তাতে সুদর্শন একটি তরুণের ছবি; কোমল কচি ভাবের সঙ্গে মুখখানিতে মনোরম লাবণ্য মাখানো।

অমলেশ ঝুঁকবার আগেই প্রায় ছোঁ মেরে ফটোটা কুড়িয়ে নিল মীনা, নিমেষে আঁচলের তলায় চালান করে দিল।

প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল অমলেশ। সেই ভাবটা খানিক কাটলে বলল, 'ওটা কার ফোটো?'

মীনার মুখ লাল হয়ে উঠল, মাথাটা অনেকখানি নামিয়ে সলজ্জ বিব্রতভাবে ফিস ফিস করল, 'কারো না।'

'কারো না মানে? পরিষ্কার এক নবীন যুবাকে দেখলাম।'

অগের মতোই না না করতে লাগল মীনা।

ব্যাপরটা খানিক অন্দাজ করে মনে মনে কৌতুক বোধ করল অমলেশ। হেসে হেসে বলল, 'কারো যখন না তখন লুকোচ্ছ কেন? দাও দেখি—'

'উঁহু—উঁহু—'

'দাও না—'

'আমি কিন্তু তা হলে চলে যাব।' মীনা উঠে পড়ল।

অমলেশ আর মজা করল না। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাক, ওটা দেখাতে হবে না। তুমি বসো।'

মীনা কুণ্ঠিতভাবে আবার বসল। এলোমেলো, অসংসগ্ন দু চারটে কথার পর আবার ছবি দেখা শুরু হল। এক্কেকটা ফোটো বেরুচ্ছে; অমলেশ জিজ্ঞাসা করছে, 'কে?' মীনা কখনও বলছে, 'খুড়তুতো ভাই,' কখনও 'দাদামশাই', ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে চলতে চলতে একবার অমলেশ বলল, 'এটা কার ছবি?'

মীনা উত্তর দিল না।

আবার জিজ্ঞেস করল অমলেশ। এবারও মীনা চুপ।

অমলেশের চোখ ছিল অ্যালবামে নিবদ্ধ। মুখ তুলতেই দেখতে পেল, মীনা গলা উঁচু করে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। তার মুখে গভীর উৎকণ্ঠা আর ভীত চকিত একটা ভাব। শুধু তাকিয়েই নেই, চোখ এবং হাতের ইশারায় কাকে যেন চলে যেতে বলছে।

বাইরে তাকাতেই অমলেশ দেখতে পেল, নীলাদের বাড়ির সীমানা উঁচু বাঁশেব বেড়া দিয়ে ঘেরা; তার ওধারে একটা মাথা চট করে নেমে গেল।

অমলেশ শুধোল, 'ও কে?'

মীনা চমকে উঠল, 'কই, কেউ না তো।'

'আমার যেন মনে হল—'

শ্বাসরুদ্ধের মতো মীনা বলল, 'কী, কী?'

'কে যেন নেমে গেল।'

মীনা বলল, 'বাঁদর-টাদর হবে।'

'এখানে বুঝি বাঁদরের খুব উৎপাত?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, খুব।'

অমলেশের খুব হাসি পাচ্ছিল। মুখটা দেখতে পায় নি। কিন্তু পরিপাটি টেরি-কাটা কুচকুচে কালো চুলে ভর্তি একটা মাথা নিমেষের জন্য হলেও তার চোখে পড়েছে। সেটা মনুষ্যজাতিরই কোনো একজনের; তার আদি পুরুষদের কারো নায়। মীনার আরক্ত বিব্রত মুখ, তার ত্রস্ত চমকিত ভাবভঙ্গি, বেড়ার ওপারের অদৃশ্য কাউকে নিয়ে লুকোচুরি অমলেশেব প্রাণের ভেতরকার সব চাইতে কৌতুকময়

অংশটিকে উসকে দিল। সে অবশ্য আর কিছু বলল না। তবে মধুর মনোরম কিছু কল্পনা করে হাসতে লাগল।

মীনা বলল, 'হাসছেন যে?'

অমলেশ বলল, 'ইচ্ছে হল।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল মীনা। বলল, 'আচ্ছা অমলেশদা—'

'বল—' অমলেশ তার দিকে তাকাল।

'বোম্বাইতে রোজ আপনার সঙ্গে তো দাদার দেখা হয় না—'

আবার সেই নবেন্দুর কথা। অ্যালবামের ছবি, মীনার লুকোচুরি—এসব কিছুক্ষণের জন্য অমলেশকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল। নবেন্দুর নাম শুনতেই চঞ্চল হল। নাঃ, এ বাড়িতে সে যতক্ষণ আছে ঘুরে ফিরে নবেন্দুর কথা আসবেই। কাঁপা গলায় বলল, 'রোজ হয় না, তবে মাঝে মাঝে হয়।'

মীনা বলল, 'দাদাকে একটা কথা বলবেন?'

'কী?'

'আমি গানবাজনা ভালবাসি বলে দাদা একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবে বলেছিল। যদি—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করল মীনা।

তার মনের কথা পড়তে পারল অমলেশ। বলল, 'একটা হারমোনিয়াম চাই, এই তো?'

আট

ছবি দেখে, গল্প টল্প করে এবং হারমোনিয়ামের কথা বলে কখন মীনা চলে গিয়েছিল আর কখন ভাদ্র মাসের দিনটা বিকেলের দেউড়িতে এসে থেমেছে, অমলেশের খেয়াল নেই। এই মুহূর্তে বিছানায় গা এলিয়ে জানালার বাইরে আকাশের ক'টা চৌকো নীল টুকরোর দিকে তাকিয়ে আছে অমলেশ। এতক্ষণ সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছিল, কখন নিঃশব্দে সেটা পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে চোখের আড়ালে নেমে গেছে, কে বলবে। সেটাকে দেখতে না পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল অমলেশ। এ বাড়িতে আর বেশিক্ষণ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; সন্ধের আগে আগেই পালানো উচিত। ঘড়ির কাঁটার ফাঁক দিয়ে একেকটি মুহূর্ত টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে নীলার ফিরে আসার সময়ও এগিয়ে আসছে। এখনই, এখনই অমলেশের বেরিয়ে পড়া উচিত। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে জামাকাপড় পরে ফেলল অমলেশ। দেওয়ালে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে যাবে সেই সময় ঝুনু এল। অমলেশ বলল, 'কী ব্যাপার, সারা দুপুর তোমার যে পাত্তাই নেই।'

ঝুনু বলল, 'বা রে, কী করে আসি।'

'কেন?'

'কতবার আপনার ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছি। আপনি তাকানই নি।' ঠোঁট প্রায় উলটে দিল ঝুনু।

অমলেশ অবাক, 'তুমি আবার কখন এখান দিয়ে ঘোরাঘুরি করলে!'

'আপনার কি তখন হুঁশ ছিল! মেজদির সঙ্গে ছবি দেখছিলেন। আর—'

'আর কী?'

'অজয়দার ছবি নিয়ে মেজদিকে কী সব বলছিলেন—'

'অজয়দার ছবি কোনটা?'

'ওই যেটা পড়ে গেল; আর মেজদি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেলল।'

এ বাড়িতে ঢোকার পর ঝুনুকে লাজুক আর জড়সড় মনে হয়েছিল অমলেশের। এখন দেখছে বেশ উচ্ছল আর টগবগে।

অমলেশ বলল, 'আচ্ছা ঝুনু—'

'কী বলছেন?'

'অজয়দাটা কে?'

'মেজদির—' বলতে বলতে থেমে গেল ঝুনু।

অমলেশ বলল, 'মেজদির কী?'

'জানি না, যান—'

'জানো জানো। আহা বলই না—'

চোখ নামিয়ে ফিস ফিস করল ঝুনু; 'মেজদির সঙ্গে অজয়দার খুব ভাব।' বলেই ফিক করে হেসে ফেলল।

অমলেশও চোখ বড় বড় করে বলল, 'খুবই সুখবর।'

কী মনে পড়তে ব্যস্তভাবে ভয়ে ভয়ে ঝুনু বলে উঠল, 'একথা কিন্তু বাবা মাকে বলবেন না।'

'কেন?'

'কেন আবার। চাকরি নেই বাকরি নেই, তার কিনা—'

'তার কী?'

'জানি না, যান—' বিচিত্র ভ্রুভঙ্গ করে ফিক করে আবার হাসল ঝুনু। তারপর বলল, 'চলুন—'

'কোথায়?'

'বাবা আপনাকে ডাকছে।'

'কেন?'

'তা কী করে বলব। এমনিই হয়তো, গল্প-টল্প কববে—'

একটু ইতস্তত করল অমলেশ। শেষ পর্যন্ত চুল আঁচড়ে বলল, 'চল—'

মহীতোষের ঘরে এসে নবেন্দুর মাকেও দেখতে পেল অমলেশ। মহীতোষ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বসো বাবা, বসো। সে বসলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন। তার খাওয়া হয়েছে কিনা, পেট ভরেছে কিনা, দুপুরবেলা বিশ্রাম করেছে কিনা, কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন। নিজে তার খাওয়া দাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ রাখতে পারছেন না বলে দুঃখ করলেন। বললেন, 'ভগবান আমাকে মেরে রেখেছে, বুঝলে অমলেশ।' যথারীতি নবেন্দুর কথাও কিছু হল। তারপর মহীতোষ স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'বিকেল হয়ে গেল, অমলেশকে চা দিয়েছ?'

'না।' নবেন্দুর মা বললেন, 'এই করে আনছি।' তিনি চলে গেলেন।

একটু পর চা এল। খেতে খেতে অমলেশ ভাবল, এ বাড়িতে এই তার শেষ চা খাওয়া। পেয়ালাটি শেষ করে বেড়াতে যাবার অছিলায় বেরিয়ে পড়বে। তারপর পায়ে পায়ে সোজা স্টেশন; সেখান থেকে কলকাতার একখানা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসবে। কলকাতায় পৌঁছে—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই মহীতোষ ডাকলেন।

শয্যাশায়ী পঙ্গু মানুষটির দিকে তাকাল অমলেশ।

মহীতোষ বললেন, 'এই অন্ধকারে রুগীর ঘরে বসে থাকতে হবে না। বেশিক্ষণ বসলে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। যাও, বেড়িয়ে টেড়িয়ে এস—'

সুযোগটা এভাবে এসে যাবে, অমলেশের পক্ষে ছিল তা অকল্পনীয়। উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যাব।' এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল অমলেশ।

'কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি তো এখানকার কিছুই চেন না।' বলেই গলা তুলে মহীতোষ ডাকাতে লাগলেন, 'মীনা মীনা, ঝুনু—'

মীনা আর ঝুনু কাছাকাছিই ছিল, ডাকামাত্র ছুটে এল। মহীতোষ বললেন, 'অমলেশকে ঘুরিয়ে টুরিয়ে আমাদের এই জায়গাটা একটু দেখিয়ে নিয়ে আয়। ও তো এখানকার কিছুই চেনে না।'

যতখানি উল্লসিত হয়েছিল, ঠিক ততখানিই চুপসে গেল অমলেশ। সন্ত্রস্তভাবে বলল, 'না না, ওরা আবার কষ্ট করবে কেন? আমি একাই যেতে পারব।'

মহীতোষ বললেন, 'কষ্ট আবার কী! পায়ে হেঁটে তো একটু যাবে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'ওরাও বিশেষ বেরোয় টেরোয় না। কার সঙ্গেই বা বেরুবে? দুটো পাজির পাঝাড়া অবশ্য আছে। কিন্তু সে দুটো কি একদণ্ড বাড়ি থাকে?' বলতে বলতে স্ত্রীর দিকে ফিরে উত্তেজিত সুরে বললেন, 'হীরু আর নিতু কোথায়?'

অমলেশ আগেই জেনেছিল, হীরু নিতু নবেন্দুর দুই ছোট ভাই। অবশ্য তাদের চেহারা এখনও দেখে নি। অমলেশ লক্ষ করল, নবেন্দুর মা খুবই বিব্রত বোধ করছেন। বললেন, 'খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে একটু আগে কোথায় যেন বেরুল।' বলে তার দিকে ফিরে চোখের ইশারা করলেন। ইঙ্গিতটা বুঝল অমলেশ। হীরু নিতু যে এখনও আসে নি সেটা তিনি স্বামীর কাছে গোপন রাখতে চান এবং অমলেশও যেন তা না বলে দেয়। ভেবে অবাক হল সে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভদ্রমহিলাকে মহীতোষের সঙ্গে সারাক্ষণ কী লুকোচুরিটাই না খেলতে হয়!

ছেলেদের সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না মহীতোষ। তবে মীনা এবং ঝুনুকে অমলেশের হাজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্গী হিসেবে জুড়ে দিলেন। পালাবার যে আশা ছিল, এক ফুঁয়ে তা নিবে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে দুরমনস্কের মতো নিঃশব্দে হাঁটছিল অমলেশ। তার মুখটা নিচের দিকে নামানো।

ঝুনু ডাকল, 'অমলেশদা—'

অমলেশ তাকাল।

ঝুনু বলল, 'মনে মনে খুব রেগে গেছেন তো?'

'কেন?'

'আপনার ইচ্ছে ছিল না, তবু বাবা জোর করে আপনার সঙ্গে আমাদের দিয়ে দিল—'

মেয়েটা কি অন্তর্যামী? তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে অমলেশ বলে উঠল, 'আরে কী আশ্চর্য, ইচ্ছে ছিল না এমন কথা কি বলেছি?'

'বলেন নি, তবে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল ঝুনু।

'তবে কী?'

'আপনার মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছেন না।'

জোর করে হাসল অমলেশ, 'আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী কথা?'

অমলেশ উত্তর দিল না।

ঝুনু বলল, 'বলতে মানা বুঝি?'

অমলেশ মৃদু হাসল।

বীজপুরের নতুন পাড়া পেছনে ফেলে স্টেশনের দিকে অমলেশরা অনেকখানি এসে পড়েছিল। এদিকটা পুরনো অঞ্চল। ভাঙাচোরা বাড়িঘর, মাঝে মাঝে মজা পুকুর, গাছগাছালি। পথের দু ধারের এ দৃশ্য আজ সকাল বেলাতেই দেখেছে অমলেশ।

শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্য স্টেশনে গেল না। মীনারা অমলেশকে নিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল। খুব বেশি দূর যেতে হল না, তার আগেই কী আশ্চর্য, পুরনো প্রাচীন বীজপুরের মাঝখানে এক বিস্ময়ের খেলা দেখা গেল। কোন এক জাদুকরের ছোঁয়ায় এ জায়গাটা যেন ইন্দ্রলোক। এখানকার সব বাড়িই নতুন, সেগুলোর গায়ে আধুনিক স্থাপত্যরীতির ছাপ, কলকাতার ধাঁচে সারি সারি দোকানপসার, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, লন্ড্রি। কাচের শো-উইন্ডোতে লোভনীয় নানা জিনিসের প্রদর্শনী, নিয়ত সেগুলো হাতছানি দিয়ে চলেছে। চারদিকে স্থবিরতার দুর্গ খাড়া করে বীজপুর তার প্রাণের মধ্যিখানে এই রকম একটা মনোরম অংশ আড়াল করে রেখেছিল, কে তা জানত। ভাদ্রমাসের এই শেষ বিকেলে আকাশে যখন নিরীহ লঘু মেঘের খেলা, চারদিক ছায়াচ্ছন্ন, বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই, তখন এই জায়গাটা জমজমাট। মানুষের ভিড় আছে, দুটো মাইকের দোকান পাল্লা দিয়ে হিন্দি ফিল্মের রেকর্ড বাজাচ্ছে। একটা সিনেমা হলে এই বুঝি ইন্টারভ্যাল হল, কাজেই মাঝের ফাঁকটা হিন্দি গান দিয়েই ভরিয়ে রাখা হচ্ছে।

অবাক বিস্ময়ে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল অমলেশ। তার ডান পাশে ঝুনু, তারপর মীনা। হঠাৎ ঝুনুর গলা কানে এল। ফিসফিসিয়ে সে মীনাকে বলছে, 'দ্যাখ মেজদি, দ্যাখ—পেছন দিকে—'

কিছু না বলে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল অমলেশ। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ফুট দূরে সেই ছেলেটা—যার ফোটো চকিতের জন্য তখন চোখে পড়েছিল; তারপরেই অবশ্য সেটা লুকিয়ে ফেলেছিল মীনা।

অমলেশ লক্ষ করল, ছেলেটি তাকে দেখছে। তার দৃষ্টি কেমন যেন ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট, তীব্র এবং সন্দিগ্ধও। অমলেশের খুব হাসি পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিপাট ভালমানুষটি সেজে গভীর মনোযোগে দু ধারের সৌন্দর্য দেখতে লাগল সে। কিন্তু কান দুটো রইল ঝুনুদের দিকে।

ঝুনু বলছিল, 'অজয়দাটা কী রে—'

মীনা কী বলল, অমলেশ বুঝতে পারল না।

ঝুনু আবার বলল, 'তুই বেরুলেই পিছু নেয়। ভারি হ্যাংলা—'

মীনার উত্তর এবারও অবোধ্য।

ঘাড় নিচু করে হেসে ঝুনু বলল, 'ডাকব?'

ঠিক এইসময় অমলেশ বলে উঠল, 'এই জায়গাটার নাম কী মীনা?'

মীনা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেছে এমন ভাবে বলল, 'রানীবাজার।'

আরেকবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল অমলেশ। হ্যাঁ, অজয় ঠিক পিছু পিছু আসছে। চোখে সেই দৃষ্টি। ছোকরা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাওরাল নাকি?

যা-ই ভাবুক, মুখ ফিরিয়ে অমলেশ বলল, 'জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর।'

ঝুনু বলল, 'একেবারে কলকাতার মতো।'

'তুমি কলকাতায় গেছ?'

'গেছি দু'চারবার।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর আবার ঝুনুর ফিসফিসানি শুনতে পেল অমলেশ, 'মেজদি—'

মীনা বলল, 'কী বলছিস?'

'অজয়দাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল?'

'যেখানে ইচ্ছে যাক। তুই বকবক করিস না তো। অমলেশদা শুনতে পাবে।'

ঝুনু ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে জিভটি সরু করে মীনাকে একবার ভেংচে দিল। তারপর ভেঙিয়ে ভেঙিয়েই বলল, 'যেখানে ইচ্ছে যাক! আহা রে, মরে যাই রে—'

আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ঝুনু অমলেশকে বলল, 'জানেন অমলেশদা—'

'বল—' অমলেশ তাকাল।

'অনেকদিন পর আমরা এখানে এলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। দাদা মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে আসত। দাদা বোম্বাই চলে যাবার পর আর কে আনবে বলুন—'

আবার সেই নবেন্দুর প্রসঙ্গ। অমলেশ চুপ করে থাকল।

ঝুনু বলল, 'এখানে দাদার সঙ্গে যেদিনই আসতাম সেদিনই রেস্টুরেন্টে যেতাম, না রে মেজদি?' সমর্থনের আশায় মীনার দিকে তাকাল সে।

মীনা মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে লাগল।

ঝুনুর মনের কথাটা পড়তে পারল অমলেশ। আরো একটু ঘুরে টুরে বলল, 'তোমাদের এখানে সব চাইতে ভাল রেস্তোরাঁ কোনটা?'

বিপুল উৎসাহে ঝুনু বলল, 'ওই যে পান্থপাদপ—'

পান্থপাদপ। বেশ কাব্য কাব্য গন্ধ আছে তো নামটায়। ঝুনুর আঙুল অনুসরণ করে ঝকঝকে একটা রেস্তোরাঁ দেখতে পেল অমলেশ। বলল, 'চল, একটু চা খেয়ে আসি—'

এবার ঝুনু লজ্জা পেয়ে গেল, 'না না, আমি খাবার কথা বলেছি নাকি?' মীনাও তার সঙ্গে সুর মেলাল।

'দাদারা বললে 'না' বলতে নেই। এস—'

জোর করেই মীনাদের নিয়ে 'পান্থপাদপ'-এ এল অমলেশ। একধারে লাইন দিয়ে পর্দা ঢাকা ছোট ছোট কেবিনের ব্যবস্থা। একটা কেবিনে ঢুকে বসতেই পর্দার ফাঁকে বয়ের মুখ দেখা গেল। সে বলল, 'কী আনব বাবু?'

অমলেশ মীনাদের দিকে তাকাল, 'কী খাবে বল।'

মীনা ঝুনু, দু'জনেই চুপ।

অমলেশ বলল, 'কী হল, বল। খাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা করলে নিজেদেরই কিন্তু ঠকতে হয়।'

এবারও ওরা উত্তর দিল না।

অমলেশ বলল, 'যাক গে, তোমরা যখন বলবেই না, আমিই বলছি।' বয়টাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী কী পাওয়া যাবে?'

গড় গড় করে নামতা পড়ার মতো একগাদা নাম বলে গেল ছোকরা। সব শুনে অমলেশ বলল, 'আগে তিনটে ফিশ ফ্রাই নিয়ে এস। বেশ গরম গরম আনবে—' পর্দার ওপাশে বয়ের মুখ অদৃশ্য হল। মীনাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে বলতে পকেটে হাত পুরল অমলেশ। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয় নি। পকেট হাতড়ে একটা প্যাকেট বেরুল বটে, কিন্তু সেটা একেবারে ফাঁকা। কখন যে প্যাকেটটা শূন্য করে ফেলেছে, নিজেই জানে না। বয়কে ডাকিয়ে অবশ্য সিগারেট আনিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তা করল না অমলেশ। নিজেই উঠে পড়ল। মীনাদের বলল, 'তোমরা একটু বসো, আমি চট করে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসি।'

'পান্থপাদপ'-এর ঠিক গা ঘেঁষেই একটা পান-বিড়ি-সিগারেট এবং সোডা-লেমনেডের দোকান। সিগারেট কিনে ঘুরে দাঁড়াতেই একটু দূরে সেই ছোকরাকে আবার দেখতে পেল অমলেশ—অর্থাৎ অজয়কে। ব্যাকুলভাবে চারদিকে তাকিয়ে সে যেন কাউকে খুঁজছে। খুব সম্ভব মীনাদের। অজয় তাকে দেখতে পায় নি। আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার ব্যাকুলতা উপভোগ করতে লাগল অমলেশ। কিছুক্ষণ পর পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে তার কাঁধে আলতো করে টোকা দিল।

চমকে তার দিকে ফিরল অজয়। অনেকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকল। এখানে এভাবে অমলেশকে দেখবে, সে যেন কল্পনাই করে নি। বিমূঢ়তা কাটলে তার চোখে সেই পুরনো তীব্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফিরে এল। চোখ কুঁচকে সতর্কভাবে বলল, 'আপনি—আপনি—'

হেসে অমলেশ বলল, 'আমি কী?'

'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।'

'চেনেন!'

'ইয়েস—' ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিল অমলেশ।

অমলেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার ভাল করে দেখে নিয়ে অজয় বলল, 'আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আমি কিন্তু দেখেছি। আপনার নামও জানি—'

'কী নাম আমার?'

অমলেশের মাথায় রাজ্যের দুষ্টুমি ভর করেছে। বলল, 'আপনার নাম শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মিত্র।' পদবিটা জানত না, আন্দাজে জুড়ে দিল।

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকল অজয়। অমলেশের মতো অচেনা মানুষের মুখ থেকে নিজের নাম শুনবে, তা যেন ভাবতেও পারে নি। আস্তে আস্তে সে বলল, 'আমি মিত্র না, মুখোপাধ্যায়।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।'

একটু চুপ। তারপর অমলেশ বলল, 'সিগারেট চলে?' প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

চোখ আবার আগের মতো বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠল অজয়ের, 'না, ধন্যবাদ।'

ভুরু কুঁচকে ঈষৎ ভাবার ভান করে অমলেশ বলল, 'আপনি তো বীজপুরের ছেলে—'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

'আমার সঙ্গে আবার আপনার কী দরকার থাকতে পারে!'

অমলেশ লক্ষ করেছে, তার কথার উত্তর অজয় ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তভাবে; নিদারুণ অনিচ্ছায়। অমলেশের সঙ্গ যে তার অসহ্য তা অনুমান করতে পারছে। আর সেই জন্যই প্রাণে কৌতুক উথলে উথলে উঠছে তার। বলল, 'আছে, আছে—'

'কী কথা?'

'মহীতোষ চাটজ্জেদের চেনেন?'

একটু চুপ করে থেকে অজয় বলল, 'চিনি। কেন?'

'ফ্যামিলিটা কেমন?

'ভালই।'

'মহীতোষবাবুর মেয়েরা?'

'ভাল।'

'আচ্ছা, বিশেষ করে ওই মেয়েটা, যার নাম মীনা?'

চকিতে অমলেশের দিকে একবার তাকিয়ে অজয় বলল, 'হঠাৎ ওই মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে অমলেশ বলল, 'বিশেষ দরকার। আসুন না, চা খেতে খেতে কথা বলা যাক।'

অমলেশের সঙ্গে আসার ঘোরতর অনিচ্ছা, আবার দুর্বার আকর্ষণও রয়েছে। কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল অজয়। তাকে নিয়ে সোজা মীনারা যে কেবিনে বসে ছিল সেখানে চলে এল অমলেশ। পর্দা ফাঁক করে মীনাকে বলল, 'দেখ দিকি, একে চিনতে পার কিনা—' অজয়ের হাত ধরে সামনে এনে দাঁড় করাল সে।

মীনা তাকিয়েই চোখ নামাল। ঝুনু ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

অমলেশ বলল, 'কী মীনা, চুপ করে আছ যে?'

মানার ঘাড় আরো নিচু হল; পারলে মাটির সঙ্গে সে মিশে যায়।

অমলেশ আবার বলল, 'দুপুরবেলা যে বাঁদরটা তোমাদের বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল তার সঙ্গে এর চেহারার মিল আছে বলে মনে হচ্ছে?'

মীনা এবারও নিরুত্তর।

এইসময় বয়টা প্লেটে ফিশ ফ্রাই কাঁটা-চামচ সাজিয়ে এসে হাজির। অমলেশ বলল, 'আরেকটা ফ্রাই আনবে। দুটো এই কেবিনে দাও। আর দুটো পাশের কেবিনে দেবে—' বলে ঝুনুকে ডাকল, 'ঝুনু উঠে এস। আমরা পাশের কেবিনে বসে খাব। তোমার আমার পক্ষে এ কামরা নিষিদ্ধ এলাকা।'

হাসতে হাসতে ঝুনু উঠে এল।

এরকম একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়বে, অজয় কল্পনা করে নি। বিস্ময়, বিমূঢ়তা, হঠাৎ পাওয়ার আনন্দ—সব মিলিয়ে তার মুখখানা এই মুহূর্তে অবর্ণনীয়। চোখের ইশারায় তাকে মীনার মুখোমুখি বসতে বলল অমলেশ। বাধ্য ছেলের মতো গিয়ে বসল অজয়। একবার অমলেশের দিকে তাকাল। এবার আর দৃষ্টিতে বিদ্বেষ বা শত্রুতা নেই। যা আছে তার নাম কৃতজ্ঞতা।

ফিস ফিস করে অমলেশ বলল, 'চিয়ার আপ লাকি বয়। চালাও পানসি। কিন্তু বেশিক্ষণ না, হাফ অ্যান আওয়ার।' ঝুনুকে নিয়ে পাশের কেবিনে চলে গেল অমলেশ। খাওয়া দাওয়ার পর মীনাদের

কেবিনের বাইরে এসে গলায় খাঁকারি দিল, 'আধ ঘণ্টার জায়গায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে কিন্তু। আর নয়।'

ওরা বেরিয়ে এল। অজয়ের মুখে লাজুক হাসি, মীনার চোখ মেঝেতে নিবদ্ধ।

বিল টিল মিটিয়ে বাইরে আসতেই টিপ করে একটা প্রণাম করে বসল অজয়। চমকে অমলেশ বলল, 'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার!'

হাত কচলাতে কচলাতে অজয় বলল, 'আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। তারপর মীনার কাছে সব শুনলাম।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি এখন যাব দাদা—একটা টিউশনি আছে।'

'এস—' এবার অজয়কে তুমি করেই বলল অমলেশ।

মীনার দিকে আরেকবার তাকিয়ে অজয় চলে গেল। যেতে যে খুব অনিচ্ছা তা টের পাওয়া যাচ্ছে। অপ্রত্যাশিত এই সঙ্গলাভের আয়ু এত কম বলে মনঃকষ্টের শেষ নেই তার।

ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছিল। অমলেশ বলল, 'এবার বাড়ি ফিরবে তো?'

ঝুনুর আরেকটু বেড়াবার ইচ্ছে ছিল। সে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কী হবে?'

মীনা বলল, 'না না, মা একা রাতের রান্নাবান্না, সংসারের কাজ সামলাতে পারবে না। এখুনি ফিরব।'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে অমলেশ মীনাকে বলল, 'ছেলেটা কদ্দূর পড়াশুনা করেছে?'

মীনা অমলেশের দিকে তাকাতে পারছিল না। মাটিতে চোখ রেখেই বলল, 'বি. এ পাশ—'

'চাকরি বাকরি তো নেই?'

'না। টিউশনি করে।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'দাদা বৌদি আর তাদের ছেলেমেয়েরা।'

'দাদা, বৌদি কেমন?'

'খুব ভাল।'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'অজয়কে কতদিন ধরে দেখছ?'

মীনা বলল, 'অনেক দিন। দাদার বন্ধু—'

'ভবিষ্যতে ঠকবে না তো?'

মীনা চুপ।

অমলেশ বুঝল, অজয় সম্বন্ধে সে মনস্থির করে ফেলেছে।

নয়

এতক্ষণ বিচিত্র এক খেলায় মেতে ছিল অমলেশ। তার স্বভাবই এই—এক কথায় যার নাম রঙ্গপ্রিয়তা। কৌতুক বা পরিহাসের কোনো ব্যাপার হাতের কাছে পেয়ে গেলে আর কোনো দিকে খেয়াল থাকে না।

মীনাদের পাশাপাশি হেঁটে বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল অমলেশের—পালাতে হবে। অজয়কে পেয়ে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, পালাবার কথা ভাবার অবকাশ ছিল না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অমলেশ। ও বাড়ি সে আর ফিরছে না। ফেরা মানেই তো নীলার মুখে গিয়ে পড়া। নীলার মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো এতটুকু সাহসও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

সন্ধে নেমে গেছে। চারদিক দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। খানিক পরেই গাঢ় অন্ধকারে সব নিরাকার হয়ে যাবে। এখন কলকাতার ট্রেন আছে কিনা, কে জানে। থাক না-থাক, ও বাড়ি অমলেশ আর ফিরছে না।

অমলেশকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মীনারাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঝুনু শুধলো, 'কী হল, দাঁড়ালেন যে?'

অমলেশ বলল, 'আচ্ছা তোমাদের যদি একটা রিকশা করে দিই, বাড়ি যেতে পারবে?'

ঝুনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কেন, আপনি যাবেন না?'

'যাব বৈকি। তবে একটু দেরি হবে। আমি একবার স্টেশনে যাব।'

'স্টেশনে কেন?'

'শুনেছ তো, কাল রাত্তিরবেলাটা আমি স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে কাটিয়ে গেছি?'

'শুনেছি।'

'ওখানে একটা জিনিস ফেলে এসেছি; আনতে হবে।'

'ও—'

'তা হলে একটা রিকশা ডাকি?'

'ডাকুন।'

মীনা আর ঝুনুকে রিকশায় তুলে আগেভাগেই রিকশাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে দিল অমলেশ। গাড়ি চলতে শুরু করল। মুখ ফিরিয়ে ঝুনু বলল, 'তাড়াতাড়ি আসবেন অমলেশদা—'

অমলেশ বলল, 'আসব।'

মেয়ে দুটির সঙ্গে কপটতা করতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু এ ছাড়া নিজেকে বাঁচাতে হলে আর কী-ই বা করা যায়। মনের ওপর চকিতে একটু ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। একটা রিকশা ডেকে অমলেশও উঠে বসল। বলল, 'স্টেশন—'

স্টেশনে এসে দেখল, অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। চায়ের স্টলে এবং স্টেশন মাস্টারের ঘরে আলো জ্বলছে। প্ল্যাটফর্মের একধারে এটা ট্রেন দাঁড়িয়ে, কামরায় কামরায় আলো। কিছু যাত্রীকেও তাতে বসে থাকতে দেখা গেল।

স্টেশন মাস্টার তাকে দেখে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সারাদিন তা হলে মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি কাটিয়ে এলেন?'

অমলেশ হাসল, 'হ্যাঁ।'

নিজের নানারকম কাজ সারতে সারতে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন স্টেশন মাস্টার। অমলেশ কোনো ঝামেলায় পড়েছিল কিনা, সাগর ছেঁচা মুক্তোগুলোকে কিরকম দেখল, মহীতোষ চাটুজ্জের ছেলেমেয়েরা তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন। অমলেশ পর পর উত্তর দিয়ে গেল। তারপর বলল, 'এখন কলকাতার কোনো ট্রেন আছে?'

প্ল্যাটফমের ওধারে সেই গাড়িটা দেখিয়ে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'ওই তো রথ প্রস্তুত। আজকের মতো ওটাই লাস্ট ট্রেন। তা আজই চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যে দরকারে এসেছিলেন তা মিটে গেল?'

'হ্যাঁ।' অমলেশ বলল, 'ক'টায় ট্রেনটা ছাড়বে?'

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'কলকাতা থেকে মিনিট পনেরর ভেতর একটা ট্রেন এসে পড়বে। ওটা এলেই দশ মিনিট পর এটা ছেড়ে দেব।'

'আমাকে একখানা টিকিট দিন।'

'তাড়া কি, ছাড়বার আগে আগে নেবেন।'

অমলেশরা গল্প করতে লাগল। তার ফাঁকে চা এল, সিগারেট এল, পান এল।

দেখতে দেখতে হুড়মুড় করে কলকাতার ট্রেন এসে পড়ল। জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো যাত্রী নামতে লাগল কামরাগুলো থেকে।

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'টিকিট কাউন্টারটা ওধার দিয়ে। অনুগ্রহ করে আপনি যদি বাইরে গিয়ে টিকিটটা নেন—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

বাইরে এসে টিকিট কেটে রেজগিগুলো গুনে নিচ্ছিল অমলেশ। সেই সময় ফিস ফিস করে কে যেন ডাকল, 'অমলেশবাবু—'

চমকে পেছন ফিরতেই যাকে দেখা গেল এই মুহূর্তে সে ছিল অভাবনীয়। যাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে

বলে অমলেশের এত লুকোচুরি, এত চাতুরি, তার হাতেই ধরা পড়ে গেল। তার সামনে যে দাঁড়িয়ে সে নীলা—নীলা চ্যাটার্জি। কিছুক্ষণের জন্য অমলেশের হৃৎপিণ্ড যেন থমকে রইল। তারপর হাসতে চেষ্টা করল সে। হাসিটা ফুটল কিনা বুঝতে পারল না।

নীলা বলল, 'এখানে কী করছিলেন?'

তো তো করে রুদ্ধস্বরে কী উত্তর দিল, অমলেশের নিজের কাছেই তা স্পষ্ট নয়।

নীলাই তাকে বাঁচিয়ে দিল, 'টাকা ভাঙাচ্ছিলেন বুঝি?'

এত জায়গা থাকতে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে স্টেশনে টাকা ভাঙাতে এসেছে, ব্যাপারটা নিজের কানেই কেমন অদ্ভুত ঠেকল অমলেশের। চোখকান বুজে সে বলল, 'হ্যাঁ, মানে—'

নীলা এবার বলল, 'এখানে আপনার আর কাজ নেই তো? থাকলে সেরে নিন, আমি দাঁড়াচ্ছি।'

রুদ্ধস্বরে অমলেশ বলল, 'না, কী আর কাজ—'

'আসুন তাহলে—'

নীলার পাশাপাশি যন্ত্রচালিতের মতো হাঁটতে লাগল অমলেশ। ভয় হতে লাগল, পাছে স্টেশন মাস্টার দেখে ফেলে ডাকাডাকি শুরু করে দেন। না, সে ফাঁড়াটা কাটল। স্টেশন মাস্টার তাঁর কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে আছেন যে তাদের দিকে তাঁর তাকাবার অবকাশ নেই।

স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেই রিকশা-স্ট্যান্ড। সেদিকে যেতে যেতে নীলা বলল, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, ফিরে এসে স্টেশনেই আপনার দেখা পাব; নিশ্চয়ই পাব।'

অবরুদ্ধ গলায় অমলেশ বলল, 'হঠাৎ আপনার এরকম মনে হল!'

'তা বলতে পারব না। তবে—'

'তবে কী?'

ইতিমধ্যে অমলেশরা রিকশা-স্ট্যান্ডে চলে এসেছিল। কাল রাত্তিরে অশ্রান্ত বর্ষণের ভেতর পৃথিবী যখন ভেসে যাচ্ছিল তখন একটা রিকশারও দেখা মেলে নি। আজ অমলেশ দেখল, রিকশার মেলা বসে গেছে। সবাই ডাকাডাকি করছে, 'আসুন বাবু, আসুন—'

নীলা বলল, 'একটা রিকশা নিয়ে নিই, কী বলেন?'

'হ্যাঁ, এতখানি পথ—'

রিকশা ঠিক করে অমলেশরা উঠে বসল। যেতে যেতে নীলা বলল, 'যা বলছিলাম। আজ কলকাতায় যাবার জন্যে আমি দুটোর টেন ধরেছিলাম। তারপর এখান থেকে কলকাতার ট্রেন সাড়ে সাতটায়; তার মানে এখন। ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, স্টেশনে আপনার দেখা পাব। কেন এমন মনে হল বলতে পারব না। ভাবনাটা কিন্তু সত্যি হল।'

অমলেশ চুপ। একটা ব্যাপার লক্ষ করল, কাল রাত্রে ট্রেনে যে রাজেন্দ্রাণী বেশে নীলাকে দেখেছিল, তার সর্বাঙ্গে এখন সেই সাজপোশাক। অথচ দুপুবেলা সে বেরিয়েছিল অতি সাধারণ বেশবাসে। এর ভেতর কোথায় যে জামাকাপড় পালটাল, কোথায় প্রসাধন সারল, কে বলবে।

নীলাও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা অমলেশবাবু, আপনি একটা কবিতা জানেন?'

'কী কবিতা?'

নীলা গুন গুন করে আবৃত্তি করতে লাগল :

'বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিব বাজিতে
এ কঠিন প্রাণ চিরশৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে।
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে?'

আবৃত্তি শেষ করে নীলা বলল, 'কার কবিতা বলুন তো?'

অমলেশ চকিত হয়ে উঠেছিল। নাম কিছুতেই মনে করতে পারল না। তবে কবিতাটির মধ্যে এবং নীলার কণ্ঠস্বরে যে ইঙ্গিতটা রয়েছে তা তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দিতে লাগল।

নীলা ঈষৎ ঝুঁকে বলল, 'কবিতাটা বেশ, না?'

অমলেশ নিরুত্তর।

বীজপুরের রাস্তার ওপর দিয়ে রিকশার চাকা দুরন্ত গতিতে ঘুরে যাচ্ছিল। অমলেশের মাথার ভেতরও ওই রকম কিছু একটা ঘুরছিল। ভাবছিল, নীলা তখন তার মাকে বলে গিয়েছিল, ফিরতে দেরি হবে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় সে ফিরে এল কেন? অমলেশ পালাবে, তা কি টের পেয়ে গেছে মেয়েটা?

আচমকা নীলার গলা শুনতে পেল অমলেশ। রিকশাওলাকে সে বলছে, 'এই—এই দিকের রাস্তায় একটু যাও তো—'

অমলেশের ভাবনায় ঝাঁকুনি লাগল যেন। মুখ তুলে বলল, 'ওখানে কী?'

'চলুন না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

হঠাৎ এই রাত্রিবেলা বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কী এমন জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়ল নীলার, বুঝতে পারল না অমলেশ। সীমাহীন আশঙ্কা নিয়ে সে তার গা ঘেঁষে বসে থাকল।

দশ

নীলার নির্দেশমত রিকশাটা ঘুরে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকল। দু ধারে মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে আলো। কোনোটা জ্বলছে, কোনোটা আবার একেবারেই অন্ধ। দুপুরবেলা আকাশ জুড়ে মেঘেদের যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল, বিকেলে তাদের চিহ্ন ছিল না; উত্তুরে বাতাসের মুখে কে কোথায় উড়ে গিয়েছিল। এখন আবার দিগন্তের ওধার থেকে তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে।

আকাশ মেঘমলিন রাস্তার আলোগুলোও নিষ্প্রভ—কাজেই গাঢ় অন্ধকারে চারদিক নিরাকার।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর নীলা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'আপনি খুব রাগ করেছেন—'

অমলেশ চকিত হল, 'না না, রাগ করব কেন?'

'আপনার ওপর জুলুম করেছি বলে।'

'কিসের জুলুম?'

'এই যে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে অমলেশ বলল, 'জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন!'

অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। তবু অমলেশের মনে হল, স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে নীলা। সে বলল, 'নয়তো কী। আমার বন্ধুর বাড়ি যাবার ইচ্ছা তো আপনার ছিল না।'

যাক, অমলেশ যে কলকাতায় পালিয়ে যাচ্ছিল সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় নি নীলা। বন্ধুর বাড়ি ধরে নিয়ে যাবার কথাই বলেছে। বুকের আবদ্ধ বাতাস সহজ নিঃশ্বাসে বার করে দিয়ে অমলেশ বলল, 'আপনার বন্ধুকে তো চিনি না। তাই—'

অমলেশের কথার উত্তর না দিয়ে নীলা রিকশাওলাকে বলল, 'এই এই, ডানদিকে ওই জায়গাটায় থামাও।'

আরেকটু এগিয়ে চাকার ঘ্যাস্-স্ শব্দ তুলে রিকশাটা থেমে গেল। যেখানে থামল তার গা ঘেঁষে একটা পুরনো একতলা বাড়ি। বাড়িটা রাস্তার ঠিক ওপরে না, খানিকটা ভেতরে। তার চারদিকে নোনা-ধরা ইটের দেওয়াল; অনেক জায়গায় ভেঙে চুরে গেছে। সামনের দিকে একদা শৌখিন বাগান টাগান ছিল, এখন ঝুপসি জঙ্গল। তার ওধারে বাড়িটা।

বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে মৃদু আলোর রেখা আসছে। নীলা রিকশা থেকে নেমে পড়ল। বলল, 'আসুন—' বলেই পরক্ষণে কী ভেবে বলল, 'আচ্ছা থাক, আপনার যখন অনিচ্ছা—'

সত্যিই অনিচ্ছা ছিল। তবু একেবারে বাড়ির সামনে এসে যাবে না, তা তো আর হয় না। ভদ্রতার খাতিরে অমলেশ বলল, 'না না,অনিচ্ছা কিসের—'

কথা না বাড়িয়ে নীলা বলল, 'ট্রেন জার্নি করে এসেছি, খুব ক্লান্ত লাগছে। বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারব না। নেহাত খুব জরুরি দরকার আছে বলে এসেছি। আজ থাক, পরে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব'খন।'

'আচ্ছা—'

'আপনি রিকশায় বসে থাকুন। আমি যাব আর আসব।'

অমলেশ উত্তর দিল না। আলাপ করিয়ে দেবে বলে নিয়ে এসে হঠাৎ মত বদলে ফেলল কেন নীলা, বুঝতে পারল না।

বেশিক্ষণ বসতে হল না। মিনিট দশেক পরই ফিরে এল নীলা। রিকশায় উঠে অমলেশের পাশে বসতে বসতে বলল, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম—'

'না, কষ্ট আবার কী—'

'একা একা বসে থাকতে হল।'

'ও কিছু না।'

নীলা উঠবার পরই রিকশা চলতে শুরু করেছিল। ওদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা ল্যাম্প পোস্টের তলায় এসে সে রিকশাটা থামাল। অমলেশের উদ্দেশে বলল, 'আপনি গাড়িটা নিয়ে বাড়ি চলে যান; আমি হেঁটে যাচ্ছি।'

অমলেশ হতবাক, 'কেন?'

নীলা হাসল, 'দু'জনকে এক রিকশা থেকে নামতে দেখলে সবাই কী ভাববে? সাতসতের অনেক জবাবদিহি করতে হবে। অত হাঙ্গামায় কী দরকার।'

ঠিকই বলেছে নীলা। অমলেশও হাসল, 'আচ্ছা।' তারপরেই একটা কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি বরং হেঁটে যাচ্ছি, আপনি গাড়িতে যান।'

'উঁহু উঁহু—' নীলা যেন চমকে উঠল, 'তাই কখনও হয়; আপনি আমাদের অতিথি। এই রিকশাওলা, চালাও—'

এতক্ষণ খেয়াল করে নি, চলন্ত রিকশা থেকে হঠাৎ একটা ব্যাপার নজরে পড়তেই অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল অমলেশ। দুপুরে সাধারণ সাজে নীলাকে বেরুতে দেখেছিল। পরনে ছিল হলুদ রঙের ছাপা শাড়ি আর ফুলপাতা-আঁকা জংলা ছিটের জামা। সন্ধেবেলা ট্রেন থেকে যখন নামল তখন তার রাজেন্দ্রাণীর বেশ; কাল বীজপুর আসার সময় যেমনটি দেখেছিল অবিকল তেমনি। আবার এখন ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দুপুর বেলার সাধারণ বেশবাস দেখছে। এর ভেতর কখন যে নীলা পোশাক বদলাল, কে বলবে। নাকি স্টেশনে খানিক আগে রাজেন্দ্রাণী বেশে তাকে যে দেখেছিল, সেটা সত্যি নয়। কাল রাতের দেখাটাই অমলেশের চোখে আটকে ছিল? স্টেশন বা ট্রেনের কাছাকাছি নীলাকে দেখেই, ওই সাজসজ্জার ছবিটা তার ওপর বসিয়ে দিয়েছে? কিন্তু অমলেশের পরিষ্কার মনে পড়ছে, রিকশায় পাশাপাশি বসে সেই ভাঙা বাড়িটায় যাবার সময়ও নীলার সর্বাঙ্গে ছিল চোখধাঁধানো সাজ। কখন তার পোশাক বদলে গিয়েছিল লক্ষ করেনি অমলেশ। মেয়েটাকে আশ্চর্য এক জাদুকরী মনে হতে লাগল তার। বেশিক্ষণ নীলাকে দেখতে পেল না অমলেশ; তাকে পেছনে ফেলে রিকশা অনেকদূর এগিয়ে গেল।

এগার

বাড়ি ফিরে মুখ টুখ ধুয়ে প্যান্ট শার্ট বদলাতে বদলাতে অমলেশ দেখল, নীলা এসে গেছে। তার সঙ্গে একটি কথাও না বলে নিতান্ত অপরিচিতার মতো দক্ষিণ দিকের একেবারে শেষ ঘরখানায় গিয়ে ঢুকল।

এ বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো আছে; তবে সেগুলোর জোর কম।

পোশাক বদলানো হয়ে গিয়েছিল। অমলেশ তক্তপোষে বসতে যাবে, নবেন্দুর মা এলেন। বললেন, 'ঘুরে-টুরে এলে। একটু চা খাবে?'

অমলেশ বলল, 'না। আমি খুব বেশি চা খাই না। বেরুবার সময় খেয়ে গেছি, বাইরেও খেয়েছি।'

'হ্যাঁ, ঝুনু মীনা বলছিল।' একটু থেমে নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'তুমি ওদের অনেক খাইয়েছ।'

'অনেক কোথায়, এই সামান্য। ওরা বড্ড লাজুক, খেতেই চায় না।'

অন্যমনস্কের মতো নবেন্দুর মা বললেন, 'অনেকদিন পর ওরা আজ বেরুল। খুব আনন্দ করেছে। ফিরে এসে সারাক্ষণ তোমার কথাই বলছিল।'

অমলেশ চুপ।

নবেন্দুর মা আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'সারাদিন তো বাড়িতেই থাকে। বড় বড় সব মেয়ে, একা একা বেরুতে দিই না। মাঝে মাঝে বেরুলে, বাইরের পাঁচটা দেখলে শুনলে মন ভাল থাকে। তুমি আজ বেড়িয়ে আনলে, খুব খুশি হয়েছি বাবা।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'ঝুনু মীনাকে বেরুতে দিই না। তুমি হয়তো ভাবতে পার, নীলা তো বেরোয়। কী করব বল, চাকরি। ঘরে বসিয়ে রাখলে চাকরি কী করে করবে? ভগবান আমাদের মেরে রেখেছে অমল। মেয়ের রোজগারে খেতে হচ্ছে।'

আলতো ভাবে বিচিত্র এক বিষাদ অমলেশকে ছুঁয়ে গেল; উত্তর না দিয়ে সে বসে থাকল।

নবেন্দুর মা বললেন, 'তা হলে আর চা বসাচ্ছি না?'

'না। বেশি চা খেলে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। মাথার শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে।'

'যাই। রান্না চাপিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে দু দণ্ড বসে যে কথা বলব তার উপায় নেই। ঝুনু মীনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নীলাও ফিরেছে—ওকেও আসতে বলেছি।'

নবেন্দুর মা চলে গেলেন। একটু পর ঝুনু এসে বলল, 'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

অগত্যা কী আর করা, মহীতোষের ঘরে গেল অমলেশ। তিনি শুধোলেন, 'আমাদের বীজপুর শহরটা দেখলে?'

'হ্যাঁ—' অমলেশ মাথা নাড়ল।

'কেমন লাগল?'

'ভালই।'

'ভাল আর কী লাগবে? কী আছে এখানে? তোমরা বোম্বাইয়ের বাসিন্দা। অত বড় শহর থেকে এসে বীজপুরের মত জায়গা আর কতটা ভাল লাগতে পারে!'

অমলেশ চুপ।

নবেন্দুর মায়ের মতো মহীতোষও ঝুনু মীনাকে বেড়িয়ে আনার জন্য খুশি হয়েছেন, জানালেন। তারপর নানা প্রসঙ্গে কথা হতে লাগল। দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-বাজারদর-আজকালকার ছেলেমেয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার দেশভাগের কথাও বললেন। পার্টিশনের ফলে কী বিপুল ক্ষতি তাঁর হয়ে গেছে, দিনের পর দিন কিভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পথের ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছেন—সে কথাও। এর ভেতর দুই ছেলে, হীরু-নিতুর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাল। মেয়েদের কিভাবে বিয়ে দেবেন, নীলার চাকরিবাকরি, নবেন্দুর কথা—নানা বিষয়ে কখনও তাঁকে উত্তেজিত, কখনও বিষাদগ্রস্ত, কখনও করুণ, আবার কখনও বা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাতে লাগল।

হঠাৎ একসময় সব আলোচনা থামিয়ে দিয়ে মহীতোষ বিষণ্ণ হাসলেন, 'দ্যাখো কি কাণ্ড, তুমি দু দিনের জন্যে এসেছ; কোথায় একটু আনন্দ দেব, তা নয়। দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে যাচ্ছি। যাও বাবা, যাও। ওদের সঙ্গে গল্প টল্প কর গিয়ে। রুগীর ঘরে বসে থাকতে হবে না।'

মহীতোষের কথা শুনতে শুনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মুক্তি পেয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ল অমলেশ।

বার

নিজের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল অমলেশ। খানিকটা সময় কেটে গেল। নবেন্দুর মা বলে গিয়েছিলেন, ঝুনু-মীনা-নীলাকে গল্প করার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। ঝুনু অবশ্য একবার এসেছিল। মহীতোষ ডাকছেন—এই খবরটা দিয়েই চলে গেছে। তা ছাড়া আর কেউ আসে নি। মেয়েদের পাঠিয়ে দিতে হয়তো ভুলে গেছেন নবেন্দুর মা।

ঝুনুরা আসবে, সে জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল অমলেশ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন তারা এল না, ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সেই ভাবনাটা যেন কোত্থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল—পালাতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

বিকেলে ঝুনুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পালাবার নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিল অমলেশ। ট্রেনের টিকিটটা পর্যন্ত কাটা হয়ে গিয়েছিল। এক মিনিট, মাত্র একটা মিনিট সময় পেলেই সে ট্রেনে উঠে পড়তে পারত কিন্তু তার আগেই নীলার হাতে ধরা পড়ে গেল। অমলেশের কেন জানি মনে হতে লাগল, হাজারটা অদৃশ্য চোখ মেলে নীলা তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে এড়িয়ে কোথাও পালাবার পথ নেই। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হল অমলেশের।

ঘরের আলোটার জোর যদিও কম, তবু চোখে বিঁধছিল। বিছানায় এলিয়ে ছিল অমলেশ; এবার চোখের ওপর আড়াআড়ি দুই হাত রেখে টান টান শুয়ে পড়ল। একটু পর হঠাৎ কানে এল, টিনের চালে টুপটাপ শব্দ। সেই দুপুর থেকে যার আয়োজন চলছিল এতক্ষণে তা শুরু হয়ে গেল।

হাত চাপা দিয়ে আলো ঠেকানো গেছে কিন্তু ভাবনা আটকাবে কী দিয়ে? প্রতিটি রোমকূপের ফাঁক দিয়ে অসংখ্য চোরা পথে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তা ভেতরে ঢুকতে লাগল। অমলেশের মনে হতে লাগল, নরম নিভাঁজ বিছানায় না, সে যেন লক্ষ লক্ষ ধারাল কাঁটার ওপর শুয়ে আছে।

কতক্ষণ এইভাবে কাটল, খেয়াল নেই। হঠাৎ পায়ের আওয়াজ এবং চাপা গানের শব্দে চমকে উঠল অমলেশ। চোখ থেকে হাত অবশ্য সরাল না। ঈষৎ ফাঁক করে দেখল, চোদ্দ পনের বছরের একটি ছোকরা ঘরে এসে ঢুকেছে; মুখের আদল দেখে নীলাদের ভাই বলেই মনে হল। পরনে চাপা ছুঁচলো প্যান্ট এবং চিত্রবিচিত্র টি শার্ট। উলটে-দেওয়া ঢেউখেলানো চুল। হিন্দি গানের একটা কলি সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছিল, 'বড়ে মিয়া দিওয়ানে—'

হঠাৎ অমলেশের দিকে চোখ পড়তেই ছোকরার গান থেমে গেল। একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর কাছে এগিয়ে এসে চারদিক থেকে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল।

উঠে বসে অনায়াসেই তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারত অমলেশ। কিন্তু কী এক দুষ্টুমি অমলেশের ওপর ভর করল যেন। যেমন ছিল তেমনি চোখ ঢেকে চুপচাপ পড়ে রইল।

ছোকরা আরো কিছুক্ষণ একদৃষ্টে অমলকে লক্ষ করে বেরিয়ে গেল। একটু পর বাইরে দুটো গলা শোনা গেল। একটা ঝুনুর, আরেকটা নিশ্চয়ই এই ছেলেটার।

ছেলেটা বলছে, 'কে রে?'

ঝুনু বলল, 'অমলেশদা—'

'অমলেশদা আবার কোন মাস্তান?'

'চাষার মতো ভাষা! মাস্তান আবার কি রে উল্লুক!'

ছোকরা হাসল, 'ওই হল, অমলেশদাটা কে বলবি তো—'

ঝুনু বলল 'দাদার বন্ধু।'

'বুঝেছি বুঝেছি, সেই বোম্বাইকা বাবু—'

ঝুনু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আবার বাঁদরামি! শুনতে পাবে না?'

'আরে না না, ঘুমুচ্ছে।'

'তোকে বলেছে!'

'হ্যাঁ রে, আমি ভাল করে দেখে এসেছি।'

ঝুনু দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে একবার অমলেশকে দেখে গেল। তারপর আবার তাদের গলা ভেসে এল।

ছোকরা বলল, 'কখন এসেছে রে?'

'সকালে।'

'থাকবে?'

'হ্যাঁ'

'ক'দিন?'

'দু-চার দিন।'

আর কোনো কথা শুনতে পেল না অমলেশ। ওরা কি চলে গেল? ওদিকে বৃষ্টিটা প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছিল; এখন বেশ জোরেই পড়ছে। টিনের চালে তার একটানা ঝমঝমানি চলছে।

একটু পর আবার পায়ের শব্দ। হাত অল্প ফাঁক করতেই অমলেশ দেখতে পেল, ছোকরা আবার এসেছে। নাচের ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরে চাপা গলায় সুর ভাঁজতে লাগল, 'লা-লা-লা, আজনবী, মেরে আজনবী—' গাইতে গাইতে চনমন করে একবার অমলেশের দিকে, পরক্ষণে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল।

তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেওয়ালে অমলেশের জামাটার দিকে ছোকরার নজর পড়ল। তৎক্ষণাৎ নৃত্য এবং সংগীত থেমে গেল। তারপর চকিতে অমলেশের দিকে একবার ফিরল; কাছে এসে খুব ভাল করে দেখল অমলেশ ঘুমিয়েছে কিনা, পরখ করবার জন্য পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল, নাকের কাছে আঙুল বুলোল। অমলেশ দাঁত চেপে পড়ে থাকল। তার সম্বন্ধে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে ছোকরা জামার কাছে চলে গেল এবং ঘুরে অমলেশের দিকে চোখ রেখে নিমেষে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। যথাসর্বস্ব বুক পকেটেই আছে। অমলেশ দেখতে পেল, ম্যানিব্যাগ খুলে এক গোছা নোট বার করে ফেলেছে ছোকরা।

সেই দুষ্টুমিটা অমলেশের মাথার ভেতর কুট কুট করে উঠল। একটা হাত চোখের ওপর রেখে আরেকটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দুটো আঙুল দেখিয়ে ইশারা করল।

নোটগুলো তুলতে তুলতে থমকে গেল ছোকরা। বিভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে আবার সব পকেটে রেখে ইঙ্গিতমতো দুটো পাঁচ টাকার নোট নিয়েই ছুট লাগাল।

কেন যে নবেন্দু বারশ মাইল দূরে বসে তার ভাইবোনদের জন্য অস্থির হয়ে থাকত, কেন তার মায়ের শরীর এমন ধ্বংসস্তূপ, কেন তাঁর পঙ্গু স্বামী সব সময় উদ্‌ভ্রান্ত—তার কিঞ্চিৎ নমুনা নিজের চোখেই দেখতে পেল অমলেশ।

তের

এক সময় খাবার ডাক পড়ল।

এ বেলা আর একা নয়। রান্নাঘরে এসে অমলেশ দেখতে পেল, সারি সারি আসন পাতা। নীলা-ঝুনু-মীনা এবং সেই ছোকরা আগেই বসে পড়েছে; তারই জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

অমলেশ বসতেই নবেন্দুর মা থালায় থালায় ভাত বেড়ে প্রত্যেকের সামনে সাজিয়ে দিতে লাগলেন। অমলেশ লক্ষ করল, নীলা এবং সেই ছেলেটা অনেক দূরে, ঘরের শেষ মাথায় বসেছে। নিস্পৃহ উদাসীন ভঙ্গি তাদের, অমলেশের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। ঝুনু মীনা কাছেই বসেছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

খাওয়া শুরু হল।

খেতে খেতে ঝুনু অমলেশের দিকে তাকাল। বলল, 'আচ্ছা অমলেশদা—'

'কী বলছ?' অমলেশও তাকাল।

'সেই জিনিসটা এনেছেন?'

'কোনটা বল তো?'

'ওই যে মেজদি আর আমাকে রিকশায় তুলে দিয়ে তখন বললেন, স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে কাল রাত্তিরে কী ফেলে এসেছেন। সেটা আনতেই তো স্টেশনে গেলেন—'

নবেন্দুর মাও এই সময় বলে উঠলেন, 'ঝুনু মীনা ফিরে এসে তখন বলল, তুমি স্টেশনে কী আনতে গেছ। এনেছ?'

চমকে উঠে কী বলতে যাচ্ছিল অমলেশ, আর তখনই নীলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। এতক্ষণ মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছিল সে; এখন তীক্ষ্ণ দূরভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

নবেন্দুর মা অমলেশকে আর কিছু বললেন না। একটু চুপ করে থেকে সেই ছেলেটিকে নিয়ে পড়লেন, 'এই নিতু—'

এরই নাম তা হলে নিতু। ছেলেটি পাত থেকে চোখ তুলল, 'কী বলছ?'

'সারাদিন ছিলি কোথায়? দুপুরে এলি না যে?'

'কাজ ছিল।'

'কী এমন রাজকার্য যে বাড়িতে থাকতে পার না?'

নিতুর চোখমুখ উদ্ধত হয়ে উঠল। নেহাত বাইরের একজন লোক রয়েছে বলে সে কিছু বলল না। অমলেশ অনুমান করল, সে না থাকলে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যেত।

নবেন্দুর মা রুক্ষ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এ বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে খালি খাওয়ার। গেলার সময় ছাড়া ওই পোড়া মুখ একবারও যদি দেখা যায়! এদিকে ওই বুড়ো তো হীরু কোথায় নিতু কোথায় করে আমার মাথা খেয়ে ফেললে। তোদের জন্যে রোগা অসুস্থ লোকটাকে যে দিনরাত কত মিথ্যে বলছি! পারব না, আর ছলচাতুরি করতে কিছুতেই পারব না।' একটু থেমে বললেন, 'কাল থেকে বাড়ি ছেড়ে আর বেরুবে না।'

উগ্রস্বরে নিতু বলল, 'বাড়িতে থেকে কী রাজকার্য করব শুনি?'

'কেন বইটইগুলো একটু নাড়াচাড়া করলেও তো পারিস। মহাভারত তাতে অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'বই নাড়াচাড়া করব! পড়ব!' নিতু কুৎসিত মুখভঙ্গি করে ভেংচে উঠল, 'মাসের পর মাস স্কুলে মাইনে বাকি ফেলবে! নাম কেটে আমাকে তাড়িয়ে দিলে। পড়ব!'

আহত সুরে নবেন্দুর মা বললেন, 'কেন, গরিব সংসারের ছেলেরা পড়ে না? বাড়িতে পড়ে প্রাইভেটেও তো ম্যাট্রিকটা দিতে পারিস। কত ছেলে কত কষ্ট করে পড়ে।'

'জ্ঞান দিও না, জ্ঞান দিও না—'

নবেন্দুর মা রেগে গিয়ে আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় নীলা বলল, 'চুপ কর মা, চুপ কর। ওসব কথা এখন থাক।'

অমলেশ যে এখানে আছে, তা বুঝিবা খেয়াল ছিল না। মুহূর্তে সচেতন হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলেন নবেন্দুর মা। একটু নীরব থেকে এবার অমলেশের উদ্দেশে বললেন, 'ভাল কথা—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অমলেশ।

নবেন্দুর মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো টাকাপয়সা আছে।'

'আছে।'

'কোথায় রেখেছ?'

'জামার পকেটে। কেন?'

'খেয়ে উঠে টাকাটা আমার কাছে দিও; সকালবেলা দিয়ে দেব'খন।'

'কেন?' খানিক অবাক হয়ে অমলেশ শুধলো।

নবেন্দুর মা বললেন, 'চুরি টুরি হয়ে যেতে পারে। দু দিনের জন্য এসেছ; এ বাড়ি থেকে যদি তোমার টাকা খোয়া যায়, আমার মাথা কাটা যাবে।'

'টাকা খোয়া যাবে, ভাবছেন কেন?' বলতে বলতে নিতুর দিকে তাকাল অমলেশ। চোখাচোখি হতেই দ্রুত থালার দিকে ঝুঁকে পড়ল নিতু।

এদিকে বিব্রতভাবে নবেন্দুর মা বললেন, 'না, এমনি—'

অমলেশ বলল, 'ভয়ের কিচ্ছু নেই। নিতুর মতো পালোয়ান যখন এ বাড়িতে আছে তখন টাকা চুরি যাবে না। কী বল নিতু?'

নিতু চোখ তুলতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে তার আর অমলেশের যে অদৃশ্য গোপন খেলাটা চলছে তা তো আর কেউ জানে না।

নবেন্দুর মা বললেন, 'নিতুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?'

ঠোঁট টিপে ঘাড় হেলিয়ে দিল অমলেশ, 'হুঁ—'

'কখন?'

'একটু আগে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না—'

চোদ্দ

রাত্রিবেলা অমলেশের জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানায় দু'জনের শোবার ব্যবস্থা হল। তার এবং নিতুর। অমলেশের বিছানা তক্তপোষে, নিতুরটা তলায়। মীনাই মশারি টশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। বলেছিল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন অমলেশদা, আমি মশারি ফেলে গুঁজে দিয়ে যাই।'

অমলেশ তক্ষুনি শোয় নি। মীনাকে বলেছে, 'শোবার সময় আমি গুঁজে নেব'খন। তোমার চিন্তা নেই।'

মীনা বলেছে, 'মনে করে গুঁজে নেবেন কিন্তু। এখানে যা মশা!'

'একেবারে জেট প্লেনের ভায়রাভাই, কি বল—'

'তা-ই। আমাদের একেবাবে ছিঁড়ে খায়।'

মীনা চলে গিয়েছিল।

খেয়েদেয়ে আসার পর মীনাকেই শুধু এ ঘরে দেখা গেছে। ঝুনু বা নীলা আসে নি। নিতুও আসে নি।

এই মুহূর্তে অমলেশ বিছানায় বসে আছে। বলা যায়, নিতুব জন্যই অপেক্ষা করছে। ছোকবাব সঙ্গে আলাপটা ভাল করে জমিয়ে নেবার খুব ইচ্ছে তার।

অনেকক্ষণ পর দরজায় নিতুর ছায়া পড়ল। তার হয়তো ধারণা ছিল, এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে অমলেশ। তাকে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠল নিতু। অদৃশ্য কোনো ফাঁদে তার পা দুটো যেন আটকে গেছে।

একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল অমলেশ। তাবপর ডান চোখটা ঈষৎ ছোট করে সকৌতুকে ডাকল, 'আসুন, আসুন ইওর এক্সেলেন্সি; আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।'

নিতু হকচকিয়ে গেল, কিছু বলতে পারল না।

অমলেশ আবার বলল, 'এস—'

কুণ্ঠিতভাবে পায়ে পায়ে ভেতরে এসে ঢুকল নিতু।

অমলেশ বলল, 'কিচ্ছু লজ্জা নেই। টাকার সেই ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছি।'

মাথা নিচু করে নিতু দাঁড়িয়ে থাকল।

অমলেশ ডাকল, 'এখানে এসে বসো—'

চোখ মাটিতে রেখেই অমলেশের কাছে এসে বসল নিতু। এতক্ষণে তার গলায় স্বর ফুটল. 'আপনি যে ওই কথাটা মাকে বলে দ্যান নি—'

'কোন কথাটা?'

'টাকার—'

'পাগল! ওসব কখনও বলতে আছে? তা ছাড়া আমি তো ভুলেই গেছি —'

চোখ তুলে চকিতে অমলেশকে একবার দেখে নিল নিতু। বুঝতে চেষ্টা করল, অমলেশ বিদ্রূপ করছে কিনা। তারপর ঘাড় নিচু করে বলল, 'মানে আমার ক'টা টাকার দরকার হয়েছিল—'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—' মাথা নেড়ে সহানুভূতির সুরে অমলেশ বলল, 'ক্যাশের দরকার কার না থাকে?'

একটু চুপ। তারপর অমলেশই আবার শুরু করল, 'সারাদিন ছিলে কোথায়?'

নিতু বলল, 'আমাদের একটা ফাংশান আছে কিনা—'

'কিসের ফাংশান?'

'এই গানটান হবে।'

'মানে জলসা?'

'হ্যাঁ, তাই—'

'তাই কী?'

'একবার মাইকের দোকানে, একবার ডেকরেটরের ওখানে ছোটাছুটি করতে হয়েছে।'

মুখ গম্ভীর করে অমলেশ বলল, 'ব্যাপারটা সত্যিই খুব জরুরি।'

নিতু বলল, 'কলকাতা থেকে বড় বড় আর্টিস্ট আসছে। অ্যায়সা ফাংশান এখানকার কোনো শ্লাকে করতে হবে না। দেখবেন, চারদিকের টাউনগুলোর নাকে একেবারে ঝামা ঘষে দেব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'আচ্ছা অমলেশদা—'

'বলে ফেল—'

'আপনারা বোম্বাইতে যে জায়গায় থাকেন তার নাম কী?'

'খার।'

'ওখান থেকে বান্দ্রা আর পালি হিল কত দূর?'

'কাছেই। কেন?'

নিতুর চোখ চকচক করে উঠল, 'ওখানেই তো ফিল্ম আর্টিস্টরা থাকে। দিলীপকুমার, আশা পারেখ, সায়রাবানু, দেব আনন্দ—'

অমলেশ অবাক, 'তুমি জানলে কেমন করে?'

'সিনেমার কাগজে পড়েছি। বলুন না, ওরা ওখানে থাকে কিনা?'

'থাকে বলেই শুনেছি।'

'দেখেন নি?'

'দু চার বার দেখেছি হয়তো।'

'ওঃ! লাক একখানা করেছিলেন দাদা!' বলে একটু থামল নিতু। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'ওই যে দিলীপকুমার—গুরু, গুরু, গুরু—' স্বরে সবটুকু আবেগ এবং ভক্তি ঢেলে 'গুরু' শব্দটা উচ্চারণ করল।

অমলেশ স্তম্ভিত, 'কার গুরু হে!'

'কার না! সব শ্লার, সারে দুনিয়ার।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অমলেশ।

নিতু বলতে লাগল, 'গুরুকে একবার দেখিয়ে দেবেন দাদা?'

'দেখে কী হবে?'

এমন অদ্ভুত কথা আগে আর কখনও বুঝি শোনে নি নিতু। অপার বিস্ময়ে বলল, 'আরে ব্যস, এ কী বলছেন! গুরুকে রাত্তিরে আমি স্বপ্ন দেখি। চোখে দেখতে না পেলে লাইফ একেবারে পটাসিয়াম হয়ে যাবে।' একটু থেমে, 'আমি হিন্দি শিখছি দাদা, বোম্বাইতে যাবই। ফিল্মে নামবার বড্ড ইচ্ছে। আমায় একটু হেল্প করবেন?'

'কোথায় হিন্দি শিখছ?'

'সিনেমা দেখে। একটা হিন্দি ফিল্মও আমি বাদ দিই না।'

নিতুর চোখের দিকে তাকিয়ে অমলেশ এবার বলল, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়া যাক।'

'না না, খুব বেশি রাত হয় নি।' নিতু বলতে লাগল, 'একেক দিন এর চাইতেও রাত করে আমরা শুই। আচ্ছা অমলেশদা—রাজ কাপুর কোথায় থাকে?'

অমলেশ বলল, 'শুয়ে পড়।'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠে পড়ল নিতু। দ্রুত মশারি ফেলে শুয়ে পড়ল। অমলেশও লাইট নিবিয়ে মশারির ভেতর ঢুকল।

কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে নিতু ডাকল, 'অমলেশদা—'

ইচ্ছে করেই অমলেশ সাড়া দিল না। ফিল্মস্টারের ব্যাপারে ছোকরার যেরকম উৎসাহ তাতে সারা রাত আর ঘুমোতে দেবে না।

একটু পরেই নিতুর নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে এল; সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পনের

অমলেশ কিন্তু ঘুমোতে পারল না। সেই দুশ্চিন্তাটা সরীসৃপের মতো চারদিক থেকে নিঃশব্দে তাকে আবার ঘিরে ধরল—পালাতে হবে, পালাতে হবে।

পালাবে তো, কিন্তু কেমন করে? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা অমলেশের ভাবনায় ঝলকে গেল। এই রাত্রিবেলাতেই তো পালাবার সব চাইতে বড় সুয়োগ। সবাই যখন গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবে, চুপচাপ চোরের মতো পা টিপে টিপে চলে যাবে সে। তার জন্য অমলেশকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্রথমত, এখনও বৃষ্টি পড়ছে; ওটা থামুক। দ্বিতীয়ত, এ বাড়ি আরেকটু নিঝুম হোক। চোখ টান টান করে অমলেশ শুয়ে থাকল। যেভাবেই হোক, অন্ধকারের এই সুযোগটা তাকে নিতেই হবে। কোনোমতেই হাতের মুঠো থেকে সেটা বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টিনের চালে জল পড়ার শব্দ শুনতে লাগল অমলেশ। ঝমঝমিয়ে অনেকক্ষণ পড়বার পর বৃষ্টিটা একসময় ধরে এল। বিছানা থেকে সে নামতে যাবে, বারান্দায় নবেন্দুর মায়ের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বল, কোথায় চাকরি করিস তুই?'

নীলা উত্তর দিল, 'তুমি তো জানোই। কলকাতায়—'

'কলকাতায় তো সবাই কাজ করে। তোর অফিসের নাম কী?'

'অফিসের নাম দিয়ে তুমি কী করবে?'

'দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

'আমি যাব।'

'তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে?'

নবেন্দুর মা বললেন, 'গিয়ে দেখব সত্যিই তুই চাকরি করিস কিনা—'

নীলা বলল, 'চাকরি না করলে মাসে মাসে তোমাকে টাকা দিচ্ছি কী করে?'

'কী করে দিচ্ছিস তুই জানিস।'

নীলা এবার বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তুমি অত সব ভেবো না মা। মাসে মাসে টাকা পেলেই তো তোমার হল।'

'না।' তীক্ষ্ণ আর্তস্বরে মা বললেন, 'তা হয় না, তা হয় না।'

'কেন?'

'আমি যে মা রে নীলি। দেখাতে তো পারি না। দেখালে বুঝতে পারতিস সবসময় তোর চিন্তায় আমার বুক কাঁপে। মাসে ক'টা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চাস না। বল কী করিস তুই?'

'তোমাকে তো কতবার বলেছি চাকরি করি।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কেন?'

'বুলার বাবা তোকে অনেকদিন অনেক জায়গায় ঘুরতে দেখেছে। ঘুরলে চাকরি করিস কী করে?'

'আমার তো ঘুরবারই কাজ।'

একটু চুপ করে থেকে নবেন্দুর মা এবার বললেন, 'ফিরতে এত দেরি হয় কেন?'

নীলা বলল, 'কই, আজ তো তাড়াতাড়ি ফিরেছি।'

'আজ মোট একদিন। অন্যদিন রাত বারটার আগে ফেরার কথা মনে পড়ে তোর? এদিকে ওই বুড়ো অসুস্থ মানুষটাকে তোর জন্যে মিথ্যে বলে বলে আর পারি না। নবুটার তো ওই অবস্থা, সব সময় লোকটা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। তুই আবার কী সর্বনাশ যে ঘটিয়ে বসিস—'

'কী করব বল মা, ওভার টাইম থাকলে ফিরতে দেরি তো হবেই।'

'রোজ তোর ওভার টাইম!'

'আমার ইচ্ছায় তো কিছু হবে না; অফিসের কর্তারা বললে রোজই ওভার টাইম না দিয়ে উপায় কী?'

'তোর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমাকে তোদের অফিসে কবে নিয়ে যাবি?'

'যাব যাব। এখন শোবে চল তো। অনেক রাত হয়ে গেল।'

নীলাদের গলা আর শোনা গেল না। তারা বোধহয় শুতে চলে গেছে।

দেখতে দেখতে চারদিক নিশুতি হয়ে এল। নীলারা চলে যাবার পর কতক্ষণ কেটেছে, রাতের আয়ু কতটা ক্ষয়েছে, কে জানে। রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িটা অবশ্য হাতেই বাঁধা আছে, ছোট বড় কাঁটাদুটো অনায়াসেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওটার দিকে তাকানোই বৃথা। কেননা ঘড়িটার গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, আজ দম দিতে ভুলে গিয়েছিল অমলেশ।

সময়টা ঠিক বলতে না পারলেও অমলেশ বুঝতে পারছে রাতটা তৃতীয় প্রহরের দেউড়িতে এসে থেমেছে। বৃষ্টি বেশ কিছুক্ষণ থমকে আছে। ব্যাঙেদের একটানা কণ্ঠসাধনা শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁদের অবিশ্রান্ত বিলাপও কানে ভেসে আসছে। সব মেঘ গলে গলে ঝরে গেছে হয়তো। জানালার ফাঁক দিয়ে অমলেশ দেখতে পাচ্ছে, তারায় তারায় আকাশ ভরে গেছে। রাত্রিটা যেন কালো জামদানি শাড়ি; তারাগুলো তার গায়ে জরির ফুল।

এ বাড়িতে এখন আর কেউ জেগে নেই। চারপাশ নিঝুম, স্তব্ধ। ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁদের তরজা ছাড়া বীজপুর অতল ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

এর চাইতে চমৎকার সুযোগ আর আসবে না। দিনের বেলায় এদের চোখের সামনে দিয়ে পালানো সহজ নয়। ওই মেয়েটা—নীলা—নবেন্দুর বোন নীলা, তাকে ফাঁকি হয়তো দিতে পারে নি; অমলেশের লুকোচুরির খেলা হয়তো সে ধরে ফেলেছে; এখান থেকে স্বাভাবিকভাবে বিদায় নিতে হলে তাকে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ দিতেই হবে। না বলে এক পা-ও যাওয়া অসম্ভব। সব দিকের সব পথ জুড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

কাজেই এই হচ্ছে সময়। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে প্যান্টটা ঠিক করে গুছিয়ে পরে নিল অমলেশ, শার্টটা পরল। তারপর জুতোটা পরে নিঃশব্দে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, ঘাড় ফিরিয়ে সতর্ক চোখে এদিক-ওদিক দেখে নিল অমলেশ। তারপর যেই উঠোনের দিকে পা বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলার ডাক শুনতে পেল, 'অমলেশবাবু—'

চমকে ভাল করে ডান দিকে তাকাতেই অমলেশের চোখে পড়ল, বারান্দায় আবছা অন্ধকারে নীলা প্রায় অলৌকিক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে হাত খানেক ওপরে উঠে এল বুঝি; রক্তস্রোত ধমনীতে কি প্রচণ্ডবেগেই না ঘা মারতে লাগল!

পায়ে পায়ে অমলেশের কাছে এসে দাঁড়াল নীলা। বলল, 'কী ব্যাপার, এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে—'

আড়ষ্ট, অস্পষ্ট গলায় কী উত্তর দিল, নিজেই বুঝতে পারল না অমলেশ।

নীলা বলল, 'আমার ঘুম আসছিল না, বাইরে এসেছিলাম পায়চারি করতে। দেখি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুমটা কি আপনাকেও এড়িয়ে গেছে?'

সত্যিই কি ঘুম আসছিল না নীলার? নাকি রাত জেগে সে অমলেশকে পাহারা দিয়ে চলেছে?

আজ সন্ধেবেলা স্টেশন থেকে অমলেশকে ধরে এনে রিকশায় তুলেছিল নীলা। তার বন্ধুর বাড়ির দিকে যেতে যেতে একটা কবিতাও আবৃত্তি করেছিল। কবিতাটি যে এত ইঙ্গিতবহ এবং অর্থময় তা কে জানত!

অমলেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ঘুম আসছিল না। তাই বেরিয়েছি—' বলেই নিজের দিকে তাকিয়ে থতিয়ে গেল। যে পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে সেটা ঘুমোবারই পোশাক বটে।

এক পলক অমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকল নীলা। সাজসজ্জা বেশবাস কিছুই যেন লক্ষ করে নি এমন একটা উদাসীন মুখভঙ্গি তার। খুব আন্তরিক সুরে বলল, 'ভাবছি এটা ঘুমের বড়ি খাব। আপনি খাবেন নাকি?'

শিথিল সুরে অমলেশ বলল, 'দিন।'

ঘর থেকে পিল এনে দিল নীলা। সেটা খেয়ে শ্লথ পায়ে আবার দক্ষিণদুয়ারী ঘরে গিয়ে ঢুকল অমলেশ। নাঃ, এখান থেকে তার মুক্তি নেই।

ঘুমের বড়িটা কতখানি তেজী, বলতে পারবে না অমলেশ। পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত সেটা তাকে বেহুঁশ করে রাখল।

ষোল

ঘুম ভাঙতেই অমলেশের চোখে পড়ল, কালকের মতো টলটলে সোনালি রোদে চারদিক ভরে আছে। মেঘবৃষ্টির চিহ্নটুকু কোথাও নেই।

বাংলাদেশে পা দেবার পর দু রাত কাটল। দু দিনই অমলেশ দেখল, সকালবেলাটা শরৎকালের দখলে। কাল দুপুরের পর থেকে বাকি দিনটা ছিল বর্ষার, আজ দুপুরের কথা অবশ্য এখনও বলতে পারছে না সে।

ঘুম ভাঙার পরও অনেকখানি আলস্য অমলেশকে জড়িয়ে থাকল। উঠতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা অমলেশের কপালে নেই। বাইরের বারান্দায় প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে উঠে পড়তে হল। কান খাড়া করতেই টের পেল, ঝুনু আর নিতু গলার স্বর উঁচুতে তুলে ঝগড়া করছে। কী বলছে, অমলেশ বুঝতে পারছে না। এর মধ্যে নবেন্দুর মা আর মীনার গলাও কানে আসছে। ওধারের ঘর থেকে মহীতোষের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল অমলেশ।

মীনা বলছে, 'ছাড় বাঁদর, ছেড়ে দে বলছি—'

নবেন্দুর মা চেঁচাচ্ছেন, 'বদমাশ উল্লুক ছেলে, আস্পর্ধা তোমার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভাল চাস তো ছেড়ে দে, নইলে তোকে আজ খুনই করে ফেলব।'

ওধারের ঘর থেকে মহীতোষ জড়িত গলায় গেঙিয়ে গেঙিয়ে কী বলছেন, বোঝে কার সাধ্য।

অতএব আর শুয়ে থাকা গেল না। তাড়াতাড়ি বাইরে আসতেই অমলেশ দেখতে পেল, নিতু আর ঝুনুতে খণ্ডযুদ্ধ চলছে। মুঠি পাকিয়ে নিতু ঝুনুর চুল ধরেছে। তার এক হাতে একটা পাউডারের কৌটো। ঝুনুও ছাড়ে নি, কৌটোটা একহাতে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

মারামারি করতে করতে নিতু ঝুনু এদিকে ওদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। নবেন্দুর মায়ের হাতে একটা পেতলের হাতা; খুব সম্ভব রান্না করতে করতে উঠে এসেছেন। ঝুনুরা ঘুরছিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘুরছিলেন আর সুযোগ পেলেই নিতুকে একটা করে হাতার বাড়ি কষাচ্ছিলেন। নীলাকে অবশ্য অমলেশ দেখতে পেল না।

অমলেশ বাইরে এসে দাঁড়াতেই নিতু থমকে গেল। এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে কড়া সুরে অমলেশ তাকে বলল, 'কী হচ্ছে? ছেড়ে দাও ঝুনুকে।'

অমলেশের কণ্ঠস্বরে কী ছিল, ঝুনুর চুলের ঝুঁটি এবং পাউডারের কৌটোটা ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল নিতু।

মুক্তি পেয়ে ঝুনু চেঁচাতে লাগল, 'চোর, গুণ্ডা। পুলিশ দিয়ে তোকে জেল খাটাব।'

কুৎসিত ভেংচি কেটে নিতু বলল, 'যা যা, সব করবি।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'দেখ অমলেশ, দেখ কী সুখে আছি। পেটে কী আপদ ধরেছি দেখ। এর চাইতে জন্ম জন্ম বাঁজা হয়ে থাকা ভাল।'

অমলেশ জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

নবেন্দুর মা সংক্ষেপে যা বললেন তা এইরকম। ঝুনু দুটো চারটে পয়সা যা পায়, পাউডারের খালি একটা কৌটোয় জমিয়ে রাখে। বছর খানেক ধরে পয়সা জমাচ্ছে সে। কৌটোটা খোয়া যাবার ভয়ে সারাক্ষণই প্রায় চোখে চোখে রাখে। হীরু নিতুও তাকে তাকে থাকে। যা গুণধর দুই ভাই। আজ সুযোগ বুঝে কৌটোটা সরিয়ে ফেলেছিল নিতু কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি। তার আগেই ধরা পড়ে গেছে। আর তাই নিয়েই এই খণ্ডযুদ্ধ।

নবেন্দুর মা বললেন, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না অমলেশ। এই যমের অরুচিগুলো আমার হাড় কালি করে দিল।'

অমলেশ এবার নিতুর দিকে তাকল, 'ছি ছি—'

নিতু কিছু বলল না। দুর্বিনীত ভঙ্গিতে অমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অমলেশের যেন হঠাৎ কী হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ কঠিন সুরে বলল, 'এসব করতে তোমার লজ্জা করে না! পড়া নেই, শোনা নেই—'

অমলেশের কথা শেষ হবার আগেই উদ্ধত স্বরে নিতু বলল, 'আমাকে ধমকাবেন না স্যার। আপনি আমার গার্জেন নন।'

অমলেশ খানিকটা থতিয়ে গেল। নবেন্দুর মা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, জানো না! যাও, বেরোও। এ বাড়িতে তোমার আর জায়গা নেই। যা যা, চোখের সামনে থেকে দূর হ্ আপদ—'

খানিকটা সামলে নিয়ে অমলেশ বলল, 'ধমকাব কি মারব, সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। কালকের রাত্রির ব্যাপারটা ভেবেছিলাম, ভুলে যাব। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলতে দেবে না দেখছি।'

অমলেশ লক্ষ করল, নিতুর চোখে মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। চকিতে সে অমলেশ এবং তার মাকে দেখে নিয়ে ছুট লাগাল। অমলেশ বুঝল, মাকে এখনও খানিকটা ভয় করে ছোকরা।

উদ্বিগ্ন নবেন্দুর মা শুধোলেন, 'কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল, অমলেশ?'

'না, কিছু না। সে কথা আপনাকে শুনতে হবে না।'

নবেন্দুর মা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তাঁকে দেখে মনে হল, উদ্বেগটা কাটে নি।

ওদিকের ঘর থেকে মহীতোষের একটানা চিৎকার ভেসে আসছিল।

ধীরে ধীরে উত্তেজনা কেটে গেল। মহীতোষের চিৎকারও থামল।

মীনা দাঁড়িয়ে থাকল আর ঝুনু উত্তর দিকের একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকল। এত চেঁচামেচি এত ঝগড়া হয়ে গেল, তবু নীলার দেখা নেই। সে কি তবে বাড়ি নেই?

নবেন্দুর মা অমলেশকে বললেন, 'মুখটুখ ধুয়ে নাও বাবা; চা খাবে।' মীনাকে বললেন, 'যা, মশারি খুলে অমলেশদার বিছানা টিছানা ঠিক করে দিয়ে আয়।'

মীনা চলে গেল।

মুখ ধুয়ে একটু পর ঘরে এসে অমলেশ দেখল, বিছানাটা ফিটফাট। মশারি খুলে বালিশ টালিশ সাজিয়ে চাদরটা টান টান নিভাঁজ করে রেখে গেছে মীনা। অমলেশ বিছানায় বসল।

বেশিক্ষণ একা একা বসে থাকার সুযোগ হল না। চা-খাবার নিয়ে যে এ ঘরে এসে ঢুকল এই মুহূর্তে অমলেশের কাছে সে ছিল অভাবনীয়। অর্থাৎ নীলা এসেছে। অমলেশ চকিত হয়ে উঠল।

টেবিলের ওপর কাপ প্লেট রেখে নীলা বলল, 'খান।' বলে একটা মোড়া টেনে এনে কালকের মতো অদূরে অমলেশের মুখোমুখি বসল।

অমলেশ লক্ষ করল, এরই মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে সে। পরনে হলুদ রঙের একটা শাড়ি আর জংলা ছিটের জামা। মেঘের মতো একরাশ ভিজে নরম চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে।

নীলা শুধলো, 'কাল কিরকম ঘুম হল?'

তার দিকে চোখ রেখেই অমলেশ বলল, 'বেশ ভাল। এই তো একটু আগে উঠলাম।'

'আমার বড়িটায় তা হলে বেশ কাজ হয়েছে বলুন।'

অন্যমনস্কের মতো অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ, তা হয়েছে। আচ্ছা—'

'বলুন—' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমলেশের দিকে তাকাল নীলা।

'আপনি এতক্ষণ বাড়িতেই ছিলেন?'

'ছিলাম বৈকি। হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'না, মানে ঝুনু নিতু ঝগড়া করছিল। আপনাকে তো তখন দেখলাম না।'

নীলা বলল, 'আমাদের বাড়িতে এরকম ঝগড়া দিনে দশবার হচ্ছে। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই আর ঘর থেকে বেরুই নি। আপনি নতুন দেখছেন কিনা, অবাক হয়ে গেছেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'খুনোখুনি করে একটা মরলে আমি শান্তি পাই।'

অমলেশ উত্তর দিল না।

নীলা হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, 'আপনার চা কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

অমলেশ তাড়াতাড়ি কাপটা হাতে তুলে নিল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর নীলাই শুরু করল। বিচিত্র চাপা গলায় বলল, 'আজ বেরুতে আমার দেরি হবে। হাতে অনেকটা সময় আছে। আসুন সেই কথাটা সেরে নিই।' বলে পরিপূর্ণ দূরভেদী চোখে অমলেশের দিকে তাকাল।

অমলেশের অস্তিত্বের ভিত দুলে উঠল যেন। খানিক আন্দাজ করে স্খলিত সুরে অমলেশ বলল, 'কী কথা বলুন তো?'

'ওই যে কথাটা কাল দুপুরে শেষ করতে পারলাম না। আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেল।'

বুকের ভেতরকার অস্থির কাঁপুনি গোপন রেখে চুপ করে থাকল অমলেশ।

নীলা তাকিয়ে ছিল। বলল, 'ক'টা প্রশ্ন করব। তার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে?'

'কী?'

'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সবগুলো প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?'

মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে নীলার মুখে নিদারুণ কিছু উচ্চারিত হবে। নিদারুণ এবং ভয়ানক অস্বস্তিকর। বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যতটা সম্ভব সহজ থাকতে চেষ্টা করল অমলেশ। বলল, 'বেঠিক উত্তর দিই, আমাকে এমন মনে হয় কী?'

'যাচাই না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না।'

'যাচাই কিভাবে করবেন?'

'আমার কথার কী জবাব দেন তাই শুনে। মিথ্যে বলে আমার কাছে কেউ পার পায় না।'

ভয় যে পেয়েছে, সে সম্বন্ধে অমলেশ নিজেই নিঃসংশয়। ভেতরকার দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থাটাকে প্রাণপণে গোপন রাখতে চাইছে সে। সামান্য হেসে বলল, 'আপনার কী কথা বলুন না—'

নীলা অমলেশের চোখে চোখ রাখল, 'দাদার কথা জানতে চাইছি।'

সে কি পুরোপুরি ধরা পড়ে গেছে? অমলেশ অনুভব করল, মুহূর্তে তার জিভ শুকিয়ে একরাশ খরখরে ধারাল বালির মতো হয়ে উঠেছে। সে ঢোক গিলতে পারছে না। অস্ফুট ক্ষীণ গলায় শুধলো, 'দাদা, মানে নবেন্দু?'

'হ্যাঁ। সে ছাড়া আমার আর কোনো দাদা নেই।'

'নবেন্দুর কথা তো সবই বলেছি।'

'কী বলেছেন?'

'সে বেশ আছে, ভাল আছে।' বলেই অমলেশের মনে হল এ কণ্ঠস্বর তার নিজের নয়। তার ওপর কেউ ভর করে খাপছাড়া অলৌকিক গলায় ওই কথাগুলো যেন বলে উঠল।

'দাদা ভাল নেই।' নিস্তরঙ্গ স্বরে নীলা বলল।

ঘরের ভেতর বাজ পড়ল যেন। বিমূঢ়ের মতো নীলার উচ্চরিত শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি শোনা গেল অমলেশের গলায়,' নবেন্দু ভাল নেই!'

'না। আমার মনে হয়—'

'কী মনে হয়?'

'দাদার কোনো বিপদ হয়েছে।'

দু হাত দিয়ে অমলেশ যা আড়াল করতে চায় ঠিক সেইখানটাতে লক্ষ্যভেদ করে বসেছে নীলা। আর শরবিদ্ধ রক্তাক্ত জন্তুর মতো অমলেশ বোধহয় আর্তনাদ করে উঠল, 'কেমন করে বুঝলেন নবেন্দুর বিপদ হয়েছে? সে কথা কি আমি একবারও বলেছি?'

'বলেন নি। তবে—'

'কী?'

'বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'আমি?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনি।' নীলার চোখের তারা দপ দপ করতে লাগল, 'যখনই দাদার কথা উঠেছে, লক্ষ করেছি, আপনি শিউরে উঠেছেন, হকচকিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, ভয় পেয়ে গেছেন। আর—'

'আর কী?' রুদ্ধস্বরে জানতে চাইল অমলেশ।

'আর মনে হয়েছে দাদার ব্যাপারে সবসময় আপনি কিছু লুকোতে চাইছেন। বলুন সত্যি কিনা—'

কী উত্তর দেবে অমলেশ? ফাঁদে পড়া পশুর মতো যখন ছটফট করছে, সেইসময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে নবেন্দুর মা ঘরে এসে ঢুকলেন। সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, 'নীলি, নীলি—সর্বনাশ হয়ে গেছে। অবিনাশ পালধি এসেছে—'

নীলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে শরৎকালের মেজাজ মুছে গিয়ে দিনটার গায়ে বর্ষার রং ধরেছে, খেয়াল করে নি অমলেশ। কখন থেকে আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, কে বলবে।

এদিকে নীলার ঠোঁটে তীব্র ধারাল রেখায় বিচিত্র হাসি খেলে গেল, 'সর্বনাশের কী আছে মা? অবিনাশবাবুকে ক'দিন আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? আদর করে ঘরে এনে বসাও—'

'তোর বাবার ঘরে বসিয়েছি।'

'বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ।'

'তুই একবার চল—'

'চল—' নীলা উঠে দাঁড়াল। অমলেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও চলুন না, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

কোনো প্রয়োজন নেই। তবু কিসের এক আকর্ষণে নীলাদের সঙ্গী হল অমলেশ। মহীতোষ চাটুজ্জের ঘরে আসতেই ভদ্রলোককে দেখা গেল।

ময়দার স্তূপের মতো থসথসে ফর্সা চেহারা। বয়েস পঞ্চাশোর্ধ্বে। মাথার চুল তামাটে, সৌখিন প্রজাপতি-মার্কা গোঁফ কিন্তু ভ্রমরকৃষ্ণ। ওগুলো দামি কলপের বিজ্ঞাপন। পরনে ফিনফিনে গিলে-করা পাঞ্জাবি। পাম্প শুতে এত পালিশ যে মুখ দেখা যায়, তার ওপর কুঁচনো মিহি ধুতি জুঁই ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে। দু হাতের পাঁচ ছ'টা আংটি থেকে হীরে মুক্তোর আলো ঝলকাচ্ছে। গলায় সোনার সরু বিছে হার। ভদ্রলোক সারা গায়ে তিন চার শিশি এসেন্স নিশ্চয় ঢেলে এসেছেন। উগ্র গন্ধে বর্ষার ভিজে ভিজে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

অমলেশরা গিয়ে ঢুকতেই ভদ্রলোক নীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছ নীলা?'

'ভাল—' ঘাড় হেলিয়ে নীলা বলল, 'খুব ভাল। আপনি?'

'ওই একরকম। অনেকদিন পর তোমাদের বাড়ি এলাম।'

'রোজ এলেই বা আপনাকে অটকাচ্ছে কে অবিনাশবাবু?'

খুব একটা রসিকতার কথা যেন হয়েছে, ভদ্রলোক থলথলে শরীর দুলিয়ে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠলেন, 'যা বলেছ—' হাসবার সময় মুখের বিশাল গহ্বরটি দেখা গেল আর দেখা গেল, গোটা আট-দশেক দাঁত তাঁর সোনা-বাঁধানো।

নীলা বলল, 'আসুন, আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।' অমলেশের সঙ্গে অবিনাশ পালধির পরিচয় করিয়ে দিল সে।

পরিচয়ের সূত্রে অমলেশ জানতে পারল, এ শহরে অবিনাশ পালধির খান দশেক বাড়ি, সাত আটটা লরি, ব্রিক ফিল্ড, ধানকল, তেলকল ইত্যাদি আছে। তা ছাড়া, বীজপুর মিউনিসিপ্যালিটির তিনি ভাইস চেয়ারম্যান। আসছে ইলেকশানে বিধানসভায় যাতে এ অঞ্চলের প্রতিনিধি হতে পারেন, মনে মনে সেরকম বাসনা রয়েছে। সেজন্য তোড়জোড়ও শুরু করেছেন।

পরিচয় পর্বের পর নিঃশব্দে হাতজোড় করল অমলেশ। অবিনাশবাবুও অবিকল তাই করে অপরিষ্কার লালচে চোখে কিছুক্ষণ অমলেশের দিকে তাকিয়ে থেকে নীলাকে বললেন, 'এঁকে তো চিনতে পারলাম না—'

নীলা অমলেশের নামটাই শুধু বলেছিল। বিশদ পরিচয় দেয়নি। এবার বলল, 'উনি দাদার বন্ধু।'

'নবেন্দুর?'

'হ্যাঁ।'

'আগে আর কখনও এঁকে তোমাদের বাড়ি দেখেছি বলে তা মনে পড়ছে না।'

'কোত্থেকে দেখবেন? উনি আমাদের বাড়ি এই প্রথম এলেন।'

'অ, নবেন্দুর বন্ধু। তা উনি থাকেন কোথায়?'

'বোম্বাইতে—'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আরেকবার অমলেশকে দেখে নিয়ে অবিনাশ পালধি একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'আমি আসবার পর তোমার বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মহীতোষবাবু বড় কষ্ট পাচ্ছেন।'

'তা পাচ্ছেন—' নীলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

'কী চিকিৎসা করাচ্ছ?'

'আমাদের মতো মানুষের পক্ষে কতটা চিকিৎসা করাই বা সম্ভব?'

'বেশ তো—' অবিনাশ পালধি বললেন, 'ও ভারটা আমার ওপর দাও। আজকাল কতরকম ওষুধ-বিষুধ বেরিয়েছে; মহীতোষবাবু ঠিক সেরে উঠবেন—

'তা হয়তো উঠবেন, কিন্তু—'

'বল—'

'আমার বাবার রোগ সারাবার জন্যে আপনার এত গরজ কেন?'

'হে হে, এটা কী বললে নীলা! এটা কী বললে!' টেনে টেনে কাষ্ঠহাসি হেসে অবিনাশ বলতে লাগলেন, 'এক জায়গায় থাকি। তোমাদের সঙ্গে আলাপ সালাপ হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। প্রতিবেশী হয়ে এটুকু যদি না করি, মানে গিয়ে এ তো আমাদের কর্তব্য—'

'আপনার কর্তব্যবোধটা বেশ টনটনে।' ধারাল গলায় নীলা বলতে লাগল, 'সেজন্যে ধন্যবাদ। তবে বাবার ভারটা এখুনি আপনার হাতে দেবার ইচ্ছা নেই। যদি তেমন দিন আসে, আমরাই আপনার কাছে ছুটে যাব। আপনাকে যেচে উপকার করতে আসতে হবে না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নীলাই আবার শুরু করল, 'আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো অবিনাশবাবু?'

অবিনাশ নড়েচড়ে বসলেন, 'আসল ব্যাপারটা আবার কী?'

বাইরে আঙুল বাড়িয়ে নীলা বলল, 'দেখছেন?'

বিমূঢ়ের মতো অবিনাশ বললেন, 'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে।'

'এ বৃষ্টিতে কুকুর বেড়াল বেরুতে পারে না, আর আপনি কিনা হাজার কাজ ফেলে আমার বাবার চিকিৎসার জন্য উতলা হয়ে ছুটে এসেছেন—একথা বিশ্বাস করব, আমি কি এমনই খুকি!'

টেনে টেনে হাসতে লাগলেন অবিনাশ, 'হেঁ-হেঁ-হেঁ। তোমার কথাগুলো বড্ড চাঁছাছোলা, একটুও রসকষ নেই। মাইরি বলছি, তোমার বাবার খবরই নিতে এসেছিলাম। তবে—'

'কী?'

'কিছু দরকারও আছে।'

'বলে ফেলুন।'

একটু ভেবে অবিনাশ পালধি শুরু করলেন, 'আমার তেলকলের আজ পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। রজত জয়ন্তী উৎসব হবে।'

'বেশ।'

'তাই একটু গান বাজনা আর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছি।'

'বেশ।'

'মীনা তো ভাল গাইতে পারে। আমার খুব ইচ্ছা ও গিয়ে ক'টা গান গাইবে। সেই জন্যেই ওকে নিতে এসেছি। তোমরা কিন্তু না বলতে পারবে না।'

অমলেশ লক্ষ করল, সমস্ত ঘরখানায় ইঙ্গিতময় স্তব্ধতা নেমে এসেছে। মহীতোষ চাটুজ্জের যে দিকটা সুস্থ সেটা থরথরিয়ে কাঁপছে। নবেন্দুর মায়ের চোখের তারা স্থির, চোয়াল শক্তবদ্ধ। হাতদুটো মুঠি পাকানো।

কিছুক্ষণ পর নীলা খুব আস্তে বলল, 'আচ্ছা অবিনাশবাবু—'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে ছিলেন অবিনাশ। বললেন, 'কী?'

'মীনাকে নিয়ে যাবার জন্যে কতদিন ধরে চেষ্টা করছেন বলুন তো!'

অবিনাশ হকচকিয়ে গেলেন, 'হেঁ-হেঁ-হেঁ, কী যে বল! তোমাদের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে হেঁ-হেঁ-হেঁ—তা ছাড়া গানবাজনাটা আমি বড্ড ভালবাসি—'

নীলা বলল, 'আপনার রজত জয়ন্তী উৎসব কখন?'

'সন্ধেবেলা—'

'তবে এখন নিতে এসেছেন?'

'মানে একটু আগে যাবে। আমাদের ওখানে দুপুরবেলা খাবে। তারপর গানটান গেয়ে একেবারে রাত্তিরের খাওয়া সেরে ফিরবে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব, আবার সঙ্গে করে দিয়ে যাব।'

চাপা গলায় নীলা বলল, 'আর কারো হাত দিয়ে যে পাঠাবেন না তা আমি জানি।'

'তা আর জানবে না। হেঁ-হেঁ, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

নীলা বলল, 'আপনার বিবেচনাটা কেমন বলুন দিকি?'

'কেন, কেন?' অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অবিনাশ।

'একা মীনাই যাবে? আমাদের নেমন্তন্ন করলেন না?'

অবিনাশ পালধি কী করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। বিব্রত অপ্রতিভ ভাবটা অবশ্য মুহূর্তে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আহা, আমার কথা তো শেষ হয় নি। নেমন্তন্ন, তোমাদের সব্বাইয়ের নেমন্তন্ন বৈকি। সব্বাই যাবে তোমরা।'

'আমি বললাম বলে তো—'

দু হাত আর মাথা একসঙ্গে প্রচণ্ডবেগে নেড়ে অবিনাশ বললেন, 'তুমি না বললেও নেমন্তন্ন করতাম। সে খেয়াল আমার ছিল।'

'থাকলেই ভাল।'

'তা আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। মীনাকে তৈরি হয়ে নিতে বল।'

'কিন্তু—' একটু চিন্তিতভাবে নীলা বলল।

'কী?'

'আমি বললে তো হবে না। যাকে নিতে এসেছেন তার মতামতটা একবার নেওয়া দরকার।'

'তার আবার কী মতামত?'

'বা রে, সে বড় হয়েছে। ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। আপনার সঙ্গে যাবে কি যাবে না, সেটা জানতে হবে না?'

অবিনাশের চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। খুব ধীরে ধীর তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তাই জেনে এস।'

নীলা বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন নবেন্দুর মাও গেলেন। ঘরের ভেতর এখন মহীতোষ, অবিনাশ আর অমলেশ।

একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অবিনাশ পালধি শুরু করলেন। মহীতোষের উদ্দেশে একটানা একতরফা কথা। মহীতোষ একটা কথারও উত্তর দিলেন না।

অবিনাশ যা বললেন তার একটা বর্ণও অমলেশ বুঝতে পারছে না; শুনতেও বোধহয় পাচ্ছে না। তিনি যে এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত এবং নিদারুণ ভীতিকর সেটা টের পাচ্ছে অমলেশ। ভয়ের কারণটা যে কী, অমলেশের অজানা। আকণ্ঠ অস্বস্তি নিয়ে সে বিভ্রান্তের মতো বসে থাকল।

এদিকে মহীতোষ চাটুজ্জে কথা তো বলছেনই না, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বুঝিবা দম বন্ধ করে আছেন। তাঁর সুস্থ সবল দিকটা আগে থেকে কাঁপছিলই, অসাড় অংশটায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে মনে হল।

অমলেশ আর বসে থাকতে পারছিল না। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়ল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

এক লাইনে পরপর চারখানা ঘর। উত্তর দিকের শেষ ঘরখানা মহীতোষের। তারপর দু খানা। শেষেরটা অমলেশের। উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয় ঘরখানায় নীলা আর তার মা চাপা গলায় কথা বলছিল।

নবেন্দুর মা বলছেন, 'অবিনাশ পালধিকে তুই চলে যেতে বল নীলা। মীনা যাবে না—'

নীলা বলল, 'এ কথাটা তুমি বললে তো পারতে।'

নবেন্দুর মা চুপ করে থাকলেন।

নীলা আবার বলল, 'অত সহজে ওকে বিদায় করা যাবে না মা। এক বছর ধরে অবিনাশ পালধি আসছে; যতবার এসেছে ততবারই ওকে বিদায় করেছি। খুব বেশিদিন ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।'

'কিন্তু—'

'কী বলছ?'

'ও কিরকম মানুষ, জানিস না?'

'জানি বৈকি মা। জানি বলেই তো বলছি, দু দিন আগে হোক আর পরে হোক, মীনাকে ওর সঙ্গে পাঠাতে হবেই।'

নবেন্দুর মা কী বললেন, অমলেশ বুঝতে পারল না।

নীলা আবার বলল, 'তুমি ভেবো না মা, মীনার কানে আমি মন্ত্র দিয়ে দেব। ও ঠিক অবিনাশের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে। আর যদি না পারে কী আর করা যাবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাদের মতো সংসারের মেয়েরা কতক্ষণ ঘরে থাকবে? কতক্ষণ তুমি আগলে রাখতে পারবে?'

নবেন্দুর মা উত্তর দিলেন না। শুধু বলতে লাগলেন, 'তোরা সবাই মিলে আমাকে মেরে ফ্যাল, মেরে ফ্যাল—'

অমলেশ আর দাঁড়াল না। সন্তর্পণে নীলাদের চোখ এড়িয়ে নিজের ঘরে চলে এল। ভেতরে পা দিয়ে অমলেশ চমকে উঠল। তার বিছানার এককোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে মীনা। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, ভীত চোখের মণিতে পড়েছে মৃত্যুর ছায়া, ঠোঁটদুটো নীল হয়ে গেছে। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার আগে পশুকে যেমন দেখায় অবিকল সেই রকম দেখাচ্ছে মীনাকে।

অমলেশকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মীনা। তারপর দু হাতে মুখ ঢাকল।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্নার অস্থির শব্দ শুনল অমলেশ। তারপর কী একটা অদৃশ্য স্রোত একটানে তাকে মীনার কাছে টেনে নিয়ে গেল। মেয়েটার পিঠে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বলল, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

মীনা উত্তর দিল না। তার কান্নাটা স্নেহের সামান্য একটু ছোঁয়ায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

অমলেশ আবার বলল, 'কেঁদো না মীনা, কেঁদো না। কী হয়েছে, আমাকে বল।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে অমলেশের দিকে তাকাল মীনা। এই মুহূর্তে তার চোখ ভেজা ভেজা, আরক্ত। কান্নাভাঙা জড়ানো স্বরে সে বলতে লাগল, 'ওই লোকটা এসেছে—'

'কার কথা বলছ?'

'অবিনাশ পালধির। পাঁচ সাত দিন পর পর এসে আমাকে নিয়ে যেতে চায়।'

'কেন?'

'বলে তো গান শুনবে। আসলে—'

'কী?'

মীনা উত্তর দিল না। তার নীরবতা অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল। ভেতরে ভেতরে অমলেশ শিউরে উঠল।

একটু ভেবে অমলেশ জিজ্ঞেস করল, 'বীজপুরে নিশ্চয়ই তুমি একলা গান জানো না। আরো অনেক মেয়ে জানে।'

'জানে তো।'

'এত গাইয়ে মেয়ে থাকতে তোমার গান শুনবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কেন?'

ভাঙা গলায় মীনা বলল, 'কি জানি, আমরা গরিব বলে হয়তো।'

একটু চুপ করে থেকে অমলেশ বলল, 'অবিনাশ পালধি তোমাকে চিনল কেমন করে? মানে আলাপ-টালাপ কী করে হয়েছে?'

মীনা বলল, 'বছর খানেক আগে বীজপুরে একটা ফাংশান হয়েছিল। আমি তাতে গান গেয়েছিলাম; ফাংশানের প্রেসিডেন্ট ছিল অবিনাশ পালধি। আমার গান শুনে যেচে আলাপ করেছিল। কোথায় থাকি, কে কে আমার আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল। তারপর একদিন আমাদের বাড়ি এসে হাজির। সেই থেকে প্রায়ই আসছে।

অমলেশ চুপ।

মীনা থামে নি। অস্থিরভাবে বলতে লাগল, 'আমি ওর সঙ্গে যাব না, কিছুতেই না। মরে গেলেও না। অজয় যদি জানতে পারে ওর সঙ্গে গেছি—' বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেল। তারপর অমলেশের একখানা হাত দু হাতে আঁকড়ে ধরে করুণ মিনতির সুরে বলল, 'আমাকে আপনি বাঁচান অমলেশদা, বাঁচান—'

গভীর আশ্বাসের সুরে অমলেশ বলল, 'ভয় নেই। দেখি আমি কী করতে পারি।'

মীনা কী বলতে যাচ্ছিল, এইসময় নীলা এসে ঘরে ঢুকল। বোনের উদ্দেশে বলল, 'তুই এখানে বসে আছিস? আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

মীনা চুপ।

নীলা আবার বলল, 'তা হ্যাঁ রে, অবিনাশের সঙ্গে যাবি নাকি?'

দাঁতে দাঁতে চেপে মীনা বলল, 'না।'

'যাবি না কেন? এত আদর করে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি তো ভাবছি অবিনাশকে আমাদের ভগ্নিপতি করে নেব।'

বুকফাটানো চিৎকার করে উঠল মীনা, 'দিদি!' তারপরেই আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নীলা হাসছিল। এমন অবস্থায় কেউ যে হাসতে পারে, রসিকতা করতে পারে—অমলেশের পক্ষে এ একেবারে অকল্পনীয়।

হাসতে হাসতে নীলা বলল, 'এমন একটা ভাল কথা বললাম আর তুই কিনা কেঁদে একেবারে নদী বইয়ে দিলি!'

মীনা আরেকবার চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'দিদি!' বলেই উঠে দাঁড়াল।

নীলা বলল, 'তুই যখন চাস না তখন আজ ওকে বিদায় করে আসি। কিন্তু মনে রাখিস বোন, একদিন না একদিন তোকে অবিনাশের সঙ্গে বেরুতেই হবে।'

মীনা আর কিছু বলল না, ছুটে পালাল। তার পিছু পিছু নীলাও বেরিয়ে গেল।

একসময় খোপ-কাটা জানালার ফাঁক দিয়ে অমলেশ দেখতে পেল, ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির ভেতর বড় রাস্তার দিকে চলে গেলেন অবিনাশ। একটু পর রাস্তায় মোটরের স্টার্ট দেবার আওয়াজ শোনা গেল। অমলেশ বুঝল, তাকে বিদায় করেছে নীলা। অমলেশ বিমূঢ়ের মতো বসে রইল।

নীলা আবার এ ঘরে এল। অমলেশের মুখোমুখি বসে বলল, 'কী ভাবছেন?'

অমলেশ চকিত হয়ে বলল, 'কিছুই না।'

একটু চিন্তা করে নীলা আবার শুধলো, 'নটবরটিকে কেমন দেখলেন?'

'কে নটবর?'

'ওই যে মনোহরণ বেশে বাবার ঘরে বসে ছিল। মানে অবিনাশ পালধি।'

'বুঝেছি। কিন্তু—'

'কী?'

'আমি লোকটাকে ভাল করে লক্ষ করিনি। তবে—'

'কী?'

'আপনাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

'আমাদের দেখছিলেন!'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল আপনার বাবা, আপনি আর আপনার মা অবিনাশকে পছন্দ করেন না। সাঙ্ঘাতিক ঘৃণা করেন।'

'বাবা মায়ের কথা বলতে পারব না। তবে আমি অপছন্দ করি কে বললে? কে বললে, আমি ঘৃণা করি? ঘৃণাই যদি করব, অপছন্দই যদি করব, তাহলে ওই লোকটাকে ভগ্নিপতি করতে চাই?'

'ও তো ঠাট্টা।'

'নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' অমলেশ বলল, 'বলুন না, লোকটা কেমন?'

চোখ কুঁচকে নীলা বলল, 'চমৎকার। একেবারে আদর্শ ব্রহ্মচারী—'

তার স্বরে ধারাল ফলার মতো এমন ঝকমকানি ছিল যাতে চমকে উঠল অমলেশ, 'মানে?'

'মানে বিয়ে টিয়ে করে নি, একেবারে চিরকুমার। তবে বীজপুরের অনেক মেয়ের, বিশেষ করে রিফিউজি মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। দু চারটে রক্ষিতা আছে। সন্ধের পর মদের সাগরে নাকি সাঁতার কাটে।'

'এইরকম একটা লোকের সঙ্গে মীনাকে একদিন না একদিন যেতে হবে বলছেন!'

'বলছি—' অক্লেশে ঘাড় হেলিয়ে দিল নীলা।

অমলেশ হতবাক।

নীলা গলার স্বর গভীরে নামিয়ে বলতে লাগল, 'আপনি আমাদের সংসারের অবস্থা কতখানি জানেন, জানি না। যদি জানতেন বুঝতে পারতেন কেন অবিনাশের মতো লোকের সঙ্গে ওকে যেতে হবে।'

অমলেশ এবারও নিরুত্তর।

নীলা আবার বলল, 'তবে ভয় নেই।'

'ভয় নেই!' অমলেশ প্রতিধ্বনি করল।

'না।' নীলা কেমন করে অমলেশের দিকে যেন তাকাল। চাপা শিসের মতো আওয়াজ করে বলল,

'দেখতেই ঢুসকো, আসলে ঢোঁড়া সাপ, বিষ নেই। আমার কাছে খবর আছে, অত্যাচার করে করে ওর দাঁত-নখের ধার পড়ে গেছে। বড়জোর একটু আদর, একটু গা-চাটা—এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা ওর নেই। মীনার গায়ে তেমন আঁচড় লাগবে না।'

এমন অনায়াসে এবং স্বচ্ছন্দে একজন অনাত্মীয় প্রায়-অপরিচিত যুবকের সঙ্গে কোনো মেয়ে—যে মেয়ে রূপসী, তরুণী—এ জাতীয় আলোচনা করতে পারে তা ছিল অমলেশের পক্ষে অকল্পনীয়। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে বোবা হয়ে থাকল।

বাইরে বৃষ্টিটা মাঝে মাঝে প্রবল বেগে ঝরে যায়, কিছুক্ষণ তোড় কমে আসে, আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। বঙ্গোপসাগরকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে তার সবটুকু জল না ঢালা পর্যন্ত বর্ষার মেঘগুলো থামবে, এমন মনে হয় না।

এখন বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছে। জানালার বাইরে উদাস চোখে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অঝোর বর্ষণ দেখতে লাগল নীলা। আর সত্তার অতল স্তরে জগতের সমস্তটুকু কাঁপুনি জড়ো করে অমলেশ অপেক্ষা করতে লাগল।

সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে বৃষ্টি পড়ছেই, পড়ছেই। সৌরলোকের এই গ্রহটি জুড়ে বৃষ্টির অবিরাম ধারা এবং তার একটানা ঝমঝমানি ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই।

নীলা হঠাৎ বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে আনল, 'তারপর—'

উৎকণ্ঠিত অমলেশ বলল, 'কী বলছেন?'

'আপনার সঙ্গে সেই বোঝাপড়াটা সেরে নিই আসুন। তখন কথার মাঝখানে অবিনাশ পালধি এসে হাজির হল।'

নীলার ইঙ্গিত অমলেশ বুঝতে পেরেছে। তবু শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করল, 'কোন বোঝাপড়াটা বলুন তো?'

'আপনার স্মৃতিশক্তি দেখছি খুবই দুর্বল।' নীলা বিচিত্র হাসল, 'নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন?'

অমলেশ যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে ফেরা সম্ভব নয়। সে কপটতার আশ্রয়ই নিল। বলল, 'ভান করব কেন?'

নীলা এ ব্যাপারে অমলেশকে আর বিব্রত করল না। সোজা নবেন্দুর প্রসঙ্গে চলে গেল, 'আমি দাদার কথা জানতে চাই। সে কোথায় আছে, কেমন আছে, তার কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, সব স্পষ্ট করে বলুন—'

গভীর সমুদ্রে নীলা যেন অমলেশকে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে দিল।

'মা-বাবার চোখে ধুলো ছিটোতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু আমাকে যা হোক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া অত সহজ নয়। আমার চোখে আপনি ধরা পড়ে গেছেন।'

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বাধা পড়ল। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে মেয়ে-গলা ভেসে এল, 'নীলা—নীলা—'

ঘাড় ফিরিয়ে অনেকটা আপন মনে নীলা বলল, 'আবার কে এল?'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় এসে যে দাঁড়াল তার সারা গা ওয়াটার প্রুফ দিয়ে মোড়া। ভিজে বর্ষাতিটা একেবারে জবজবে হয়ে আছে। সেটা দিয়ে জলের স্রোত নামছে।

বর্ষাতি খুলতেই যে বেরিয়ে পড়ল সে নীলারই প্রায় সমবয়সিনী। গোল চাকার মতো মুখ, গায়ের রংখানি শ্যামলা, প্রচুর চুল, ভাষাময় উজ্জ্বল চোখ। মেয়েটা সুদেহিনী। তার মাঝারি গড়নের সুন্দর শরীরখানি স্নিগ্ধ লাবণ্যে মাখা।

নীলা খানিক অবাক হয়ে বলল, 'এই বৃষ্টিতে তুই!'

'হ্যাঁ, আমিই।' মেয়েটি ব্যস্তভাবে বলল, 'তুই এখনও বসে আছিস! বেরুবি কখন? এগারটার ট্রেনে আমাদের বেরুবার কথা ছিল না? তোর জন্য অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত আসতে হল।'

'আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম রে। আমার ধারণা ছিল আজও দুটোর ট্রেনে গেলে চলবে।'

'নে নে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। খেয়েছিস?'

'না।'

'আর বসে থাকিস না—' বলতে বলতে হঠাৎ অমলেশের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল মেয়েটা। আস্তে করে বলল, 'ইনি?'

নীলা পরিচয় করিয়ে দিল, 'অমলেশ বসু—দাদার বন্ধু। বোম্বাইতে থাকেন। পরশু আমাদের বাড়ি এসেছেন।'

'কই, এঁর কথা তো আমায় বলিস নি! আজকাল খুব চেপে যেতে শিখেছিস।'

উত্তর না দিয়ে নীলা অমলেশের উদ্দেশে বলল, 'আর এ হল নূপুর—নূপুর সান্যাল। আমার বন্ধু। কাল রাত্তিরে এদের বাড়ির গেট পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে অমলেশ নূপুরের দিকে তাকাল। প্রথম পরিচয়কে চিহ্নিত করার জন্য হাতজোড় করে নমস্কার করল। নূপুরও তাই করল এবং নীলাকে বলল, 'গেট পর্যন্ত গিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলি না যে?'

'অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই আর নিই নি। অবশ্য ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

চকিত অর্থপূর্ণ চাউনি হেনে নূপুর বলল, 'অনেক রাত হল কী করে?'

নূপুরের কল্পনাকে উসকে দেবার জন্যই হয়তো নীলা বলল, 'এই একটু এদিক সেদিক বেড়াচ্ছিলাম। তাই—'

'উনি আছেন তো ক'দিন?'

'আছেন।'

'বেড়িয়ে টেড়িয়ে সময় পেলে আরেক দিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাস।'

'যাব।' বলে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল নীলা, 'বেরুতে তো বলছিস মুখপুড়ি, কিন্তু যা বৃষ্টি। আমার আবার ছাতা টাতা নেই।'

'তোর জন্যে একটা ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে এসেছি।'

'তাই নাকি? তবে আর বসে আছি কেন?' বলেই উঠে পড়ল নীলা, 'তোরা একটু গল্প টল্প কর। আমি চট করে খেয়ে আসছি। জাস্ট ফাইভ মিনিটস।'

'উঁহু—' নূপুরও উঠে পড়ল, 'বাড়ির দরজায় গিয়ে ভেতরে ঢোকাস নি। আমি ওঁর সঙ্গে এখানে কথাই বলব না। আমাদের বাড়ি যেদিন নিয়ে যাবি সেদিন গল্প করব। তার আগে না।'

'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা?'

'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।'

নীলারা হাসতে হাসতে চলে গেল। অমলেশ বসে থাকল।

মিনিট দশেক পর আবার ফিরে এল নীলা; ভেতরে ঢুকল না। দরজার বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'এখনও হল না। রাত্তিরে ফিরে আমার সেই প্রশ্নটার জবাব কিন্তু চাই।'

আরো খানিক পরে জানালার চৌকো চৌকো ফাঁক দিয়ে অমলেশ দেখতে পেল দুই বন্ধু সারা গা বর্ষাতিতে ঢেকে বড় রাস্তায় চলে গেল।

সতের

খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরখানায় এসে শুয়ে পড়ল অমলেশ। ঘুম আসছে না। জানালার ফাঁকে বাইরের যে অংশটুকু চোখে পড়ছে সেখানে শুধু নিবিড় কালো মেঘ আর বৃষ্টি। কিছুক্ষণ আগের মতো বৃষ্টিটা অবশ্য অঝোরে ঝরছে, মাঝ মাঝে থামছে, পরক্ষণেই শুরু হয়ে যাচ্ছে।

আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটে গেছে সব হুড়মুড় করে অমলেশের ভাবনার ভেতর ভিড় করে আসছে। ঝুনু আর নিতুর খণ্ডযুদ্ধ, অবিনাশ পালধি, মীনাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব, নীলার

রসকষহীন নিদারুণ রসিকতা, নূপুর—নানা কথা, নানা ঘটনা আর অনেকগুলো মুখ চোখের সামনে দিয়ে মিছিল করে যেতে লাগল।

হঠাৎ সব ভাবনা আর ঘটনা একপাশে ঠেলে দিয়ে সেই কথাটা অমলেশের মনে পড়ে গেল। কালকের মতো আজও বেরুবার সময় নীলা বলে গেছে, রাত্তিরে ফিরে এসে নবেন্দুর ব্যাপারে বোঝাপড়া করে নেবে। তার আগেই অমলেশের পালানো উচিত। কেননা যে অস্পষ্টতা ছিল এখন আর তা নেই। তার লুকোচুরি আর কপটতা সবার চোখে ধুলো ছিটোতে পেরেছে, শুধু একজন বাদ। সে নীলা। তার কাছে ধরা পড়ে গেছে সে।

চিন্তাটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগে দরজার বাইরে কার আবছা গলা শুনতে পেল অমলেশ, 'অমলেশদা—'

হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতেই অমলেশ দেখতে পেল, দরজার কাছে মীনা দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, 'ওখানে কেন, ভেতরে এস।'

মীনা এসে অমলেশের কাছে বসল। লক্ষ করল, তার চোখ ফোলা ফোলা, ভেজা এবং আরক্ত। দেখেই অমলেশ টের পেল খুব কেঁদেছে মেয়েটা।

খেতে বসে মীনাকে দেখে নি অমলেশ। সেই যে নীলার মারাত্মক রসিকতা শুনে সে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার তাকে এই দেখল।

ভীরু চোখে অমলেশের দিকে একপলক তাকিয়ে কাঁপা গলায় মীনা বলল, 'আমার কী হবে অমলেশদা?'

মীনার প্রশ্নটার ভেতর কী আছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না অমলেশের। সে বলল, 'অত ভয় পাচ্ছে কেন?'

'ওই অবিনাশের হাতে আমার মৃত্যু—' বলে দু হাতে মুখ ঢেকে কান্না শুরু করল মীনা।

অমলেশের সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর এই মুহূর্তে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল। জগতের সবটুকু আশ্বাস গলায় ঢেলে সে বলল, 'ভয় নেই। অজয়ের ঠিকানাটা আমাকে দাও। দেখি তোমার জন্যে কী করতে পারি।'

মীনার চোখে শঙ্কার ছায়া পড়ল, 'অজয়ের ঠিকানা দিয়ে কী হবে?'

'সে চিন্তা তোমার নয়। ওটা আমাকেই ভাবতে দাও।'

কয়েক পলক চুপ করে থেকে মীনা ঠিকানাটা বলল, 'চ্যাটার্জি পাড়ায় ওরা থাকে। কাল যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তার কাছেই জায়গাটা। ওর দাদার নাম বিজয় গাঙ্গুলি। ওখানে গিয়ে কাউকে নাম জিজ্ঞেস করলে বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে।'

বৃষ্টিটা মোটামুটি ধরে এলে অজয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল অমলেশ। বেরুবার মুখে নবেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা। তিনি শুধোলেন, 'কোথায় যাচ্ছ বাবা?'

অমলেশ বলল, 'সারাদিন তো বাড়িতে বসে আছি। যাই একটু ঘুরে টুরে আসি।'

'হ্যাঁ, যা বৃষ্টি। ঘরে আটকে থাকা ছাড়া উপায় কি। তা একাই যাবে, না ঝুনু মীনা সঙ্গে যাবে?'

'না না, ওদের আর কষ্ট দিয়ে দরকার নেই। আমি যাব আর আসব।'

নবেন্দুর মা কী বুঝলেন তিনিই জানেন। কোনো প্রশ্ন করলেন না। অমলেশও তাঁকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল।

বাইরের রাস্তায় এসে নিজের মূঢ়তায় অমলেশ নিজেই স্তম্ভিত। নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে দিতে অমলেশ ভাবতে লাগল, এক নবেন্দুর ব্যাপারই উন্মাদ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার সঙ্গে কেন যে মীনার সমস্যাটা জুড়তে গেল!

এই সুযোগে অমলেশ অবশ্য অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারে। পালাবার কথা ভাবতে গিয়ে মীনার ভীত সজল রক্তাভ চোখ দুটির কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, হাজারটা অদৃশ্য শৃঙ্খল

বীজপুরের নানা দিক থেকে তাকে যেন বেঁধে ফেলেছে। অন্তত মীনার একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বীজপুর থেকে অমলেশে যেতে পারবে না।

গভীর অন্যমনস্কতার ভেতর কখন যে রিফিউজি কলোনির সরু কাঁচা পথ থেকে বড় রাস্তায় এসে পড়েছিল, অমলেশের খেয়াল নেই। সাইকেল রিকশার ঘন্টির শব্দে চমকে উঠল সে। পিছন ফিরতেই দেখে গাড়িটা খালি।

অমলেশকে তাকাতে দেখে রিকশাওলা গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। বলল, 'যাবেন বাবু?'

রিকশায় উঠে অমলেশ বলল, 'রানীবাজার চল।'

রিকশা চলতে লাগল। দু ধারে সেই পরিচিত দৃশ্য—পুরনো ভাঙা বাড়ি, বর্ষায় ভরে যাওয়া পুকুর, ছোট ছোট খাল, সাঁকো, কচুরি পানা, ইত্যাদি। হঠাৎ রাস্তার পাশ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা—দাদা—'

চমকে তাকাতেই অমলেশ দেখে, কুড়ি একুশ বছরের একটা ছোকরা রিকশার গা ঘেঁষে ছুটছে। চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'এক মিনিট বড়দা, এক মিনিট। প্লিজ গাড়িটা একটু থামান।'

অমলেশ গাড়ি থামাতে বলল। থামলে, ছোকরা ছুটে এসে বলল, 'কোনদিকে যাবেন বড়দা?'

চোখ কুঁচকে ছোকরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল অমলেশ। পরনে সরু ড্রেন পাইপ প্যান্ট আর চক্কর বক্কর টি-শার্ট। প্যান্টটা কোমরের তলার দিকে চিত্র-বিচিত্র একটা বেল্ট দিয়ে বাঁধা। পায়ে ছুঁচলো জুতো, গলায় লাল রুমাল বাঁধা, ডান হাতে লোহার বালা। টেরি-কাটা চুল মাথায় পেখম মেলে আছে। সব মিলিয়ে লক্কা মার্কা চেহারা। দেখেই মেজাজটা তিক্ত হয়ে উঠল। বিরক্ত গলায় অমলেশ বলল, 'কেন?'

'দরকার আছে।'

অমলেশ একবার ভাবল, উত্তর না দিয়ে রিকশা চালিয়ে দিতে বলে। পরক্ষণে বিরক্তি গোপন করে সংক্ষেপে বলল, 'রানীবাজার যাব।'

ছোকরা দাঁত বার করে হাসল। চোখের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'বাঁচালেন দাদা, আমিও ওখানেই যাব। অতখানি রাস্তা পায়দল মারতে হলে টেংরি শ্লা পাংচার হয়ে যাবে। খুদা বড়ে মেহেরবান, আপনাকে মিলিয়ে দিলে—' বলে অমলেশের সম্মতির অপেক্ষা না রেখে পাশে উঠে বসল। বসতে বসতে বলল, 'রানীবাজারের মুখে স্রেফ আমাকে একটু ড্রপ করে দিয়ে যাবেন দাদা—'

অমলেশ উত্তর দিল না। ছেলেটাকে দেখেই সেই যে তার মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল আর প্রসন্ন হল না। অমলেশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। রিকশা আবার চলতে লাগল।

খানিক যাবার পর অমলেশ ছোকরার ডাক শুনকে পেল, 'বড়দা—'

অমলেশ মুখ ফেরাল।

সে বলল, 'শ্লা, ভারি গাড্ডায় পড়ে গেলাম যে—'

নিস্তরঙ্গ নীরস সুরে অমলেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?' পকেট থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে ছোকরা বলল, 'এই দেখুন ইঞ্জিন আছে, ডিজেল নেই। মাচিস হবে?'

অমলেশের ইচ্ছে হল, টেনে এক চড় কষায়। নেহাত এ শহরে সে অচেনা আগন্তুক, আর দু-একদিন থেকে চলে যাবে। তাই অতি কষ্টে সদিচ্ছাটা দমন করে গম্ভীর স্বরে বলল, 'না।'

ছোকরা বলল, 'অনেকক্ষণ দম দিই নি, জান শ্লা পটাসিয়াম হয়ে যাচ্ছে। একটু কষ্ট করে পকেটে হাত চালিয়ে দিন। কর্নারের দিকে দেখবেন একটা মাচিস পড়ে আছে।'

কথা না বাড়িয়ে অমলেশ পকেট থেকে দেশলাই বার করে ছোকরার হাতে দিল। একটা ধরিয়ে কায়দা করে ধোঁয়ার গোল্লা ছাড়তে ছাড়তে সে দেশলাইটা ফেরত দিল। তারপর সিগারেটের প্যাকেটখানা অমলেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'একটা নিন।'

'না।'

'না কেন? একটা ধরান না। আপনার রিকশায় চড়লাম, একটা দেশলাইয়ের কাঠি খসিয়ে দিলাম, আমার একটা সিগারেট না নিলে হার্টে বড় ব্যথা পাব দাদা। নিন—নিন—'

অমলেশ আবারও বলল, 'না।'

'ঠিক আছে। একটা সিগারেট শ্লা বেঁচে গেল। আরেক বার দম মারা যাবে।' বলে সিগারেটের প্যাকেট পকেটে পুরল।

একসময় অমলেশরা রানীবাজারের মুখে এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতর আঙুল পুরে ছোকরা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ সিটি দিয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ আরো অনেকগুলো সিটির শব্দ শোনা গেল। অমলেশ লক্ষ করল, দূরে একটা চায়ের দোকানের সামনে তার পাশের ছোকরাটির সমবয়সী ক'টি ছেলে বসে আছে। তারাই সিটি দিচ্ছে।

মুখ থেকে হাত বার করে ছোকরা বলল, 'দাদা গাড়িটা একটু থামুন। আমার স্টেশন এসে গেছে।'

গাড়ি থামলে চায়ের দোকানের ছোকরাদের মধ্যে উল্লাস দেখা দিল। এক পাক ঘুরে নিয়ে তারা বলে উঠল, 'রাজ্জা আ গিয়া, মেরে রাজ্জা—আয় শ্লা, আয়—'

আর এই ছোকরা রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ঝাঁকের ভেতর মিশে গেল। অমলেশের দিকে ফিরেও তাকাল না।

অমলেশ রিকশাওলাকে বলল, 'চল—'

রানীবাজারের মাঝখানে এসে অমলেশ রিকশাওলাকে শুধলো, 'আচ্ছা, চ্যাটার্জি পাড়াটা কোন দিকে বলতে পার?'

'ওই তো, ডানদিকের রাস্তায় গেলেই পাবেন।'

তাড়াতাড়ি মিটিয়ে রিকশা ছেড়ে দিল অমলেশ। তারপর পায়ে পায়ে ডানদিকের রাস্তায় চলে এল।

অজয়দের ঠিকানা খুঁজে বার করতে অমলেশের বেশি সময় লাগল না। রাস্তায় দু একজনকে জিজ্ঞেস করতে তারা বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

হলুদ রঙের একতলা ছোট বাড়ি। সামনের দিকে সামান্য বাগান। কড়া নাড়তেই যিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে তাকিয়ে অমলেশের চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে গেল। মহিলার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে। বড় বড় চোখ ঘন পালকে ঘেরা। খুব ফর্সা নন, শ্যামাঙ্গিনী। এই বয়সেও কচি পাতার কোমল আভার মতো লাবণ্য তাঁকে ঘিরে আছে। কোঁচকানো কোঁচকানো অজস্র অবাধ্য চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে। পানপাতার মতো সরু চিবুক। কপালে সিঁদুরের মস্ত টিপ, নাকটি লম্বা ছাঁদের, পাতলা ঠোঁট। পরনে কমলা রঙের শাড়ি আর সবুজ জামা। মহিলাকে ঘিরে কোথায় যেন অপার্থিব কিছু আছে। মনে হয়, দুপুরের ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। এখনও চোখে মুখে তার রেশটুকু মাখানো।

মহিলা জিজ্ঞাসু চোখে অমলেশের দিকে তাকালেন। অমলেশ তাড়াতাড়ি বলল, 'অজয় আছে?'

মীনা বলেছিল, অজয় তার দাদার কাছে থাকে। দাদা, বৌদি আর সে নিজে—এই নিয়ে তাদের সংসার। মহিলা খুব সম্ভব তার বৌদিই হবেন। বললেন, 'না। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনি?'

'নাম বললে তো চিনবেন না। আমি এখানকার লোক নই।' অমলেশ বলল, 'বিশেষ দরকারে অজয়ের কাছে এসেছিলাম। আচ্ছা ও কখন ফিরবে বলতে পারেন?'

'ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে চারটে তো হবেই।'

চিন্তিত মুখে অমলেশ বলল, 'তাই তো, ভারি মুশকিল হল।'

এক পলক অমলেশকে দেখে নিয়ে মহিলা বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে বসতে পারেন। এখন দুটো বাজে। অবশ্য ঘণ্টা দু-আড়াই অপেক্ষা করতে হবে।'

খানিক ইতস্তত: করে অমলেশ বলল, 'তার চাইতে আমি বরং ঘুরে আসি। অজয়কে বলবেন, অমলেশ বসু এসেছিল। ও যদি আগে ফেরে, যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যায়।'

'আচ্ছা।'

পায়ে পায়ে চ্যাটার্জি পাড়া থেকে বেরিয়ে এল অমলেশ। অজয়ের সঙ্গে এখনই দেখা হয়ে গেলে ভাল হত। অমলেশের ইচ্ছা ছিল, মীনার কথা তাকে বলে লাস্ট ট্রেনে কলকাতার দিকে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তা হল না। কলকাতার লাস্ট ট্রেন সাড়ে ছ'টা নাগাদ। সাড়ে চারটেয় যদি অজয়ের সঙ্গে দেখা হয়, কথাবার্তা সারতে ঘণ্টাখানেক অন্তত লাগবে। তারপরেও একটা ঘণ্টা অমলেশের হাতে

থেকে যাবে। ট্রেন ধরার পক্ষে তা যথেষ্ট। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, কালকের মতো আজও যদি স্টেশনে নীলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! চকিত হয়ে অমলেশ ভাবল, ট্রেন ছাড়া কলকাতায় আর কোনো ভাবে যাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ নিতে হবে।

ঘুরতে ঘুরতে বীজপুরের ঝকঝকে আধুনিক পাড়া পার হয়ে অচেনা একটা রাস্তায় এসে পড়েছিল সে। একদিকে পালাবার ভাবনা, আরেক দিকে মীনার চিন্তা—এই দুই মেরুর মাঝখানে তার মনটা দোল খাচ্ছিল। অমলেশ অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে থাকে।

হঠাৎ উত্তেজিত চেঁচামেচির শব্দে অমলেশ চমকে উঠল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখে কুড়ি একুশ বছরের ক'টি ছোকরা একটু পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোকরাদের পরনে ড্রেন-পাইপ প্যান্ট, টি-শার্ট। কারো পায়ে চটি, কারো বা ছুঁচলো জুতো। সব চাইতে দর্শনীয় তাদের দাড়ি। কারো পরিষ্কার চাঁছা মুখে শুধু থুতনির কাছটায় একগোছা, কারো বা জুলপি থেকে সরু করে চিবুক পর্যন্ত দাড়ি নেমে এসেছে। কারো আবার দাড়ি গোঁফের বলাই নেই।

বাড়িটার সামনের দিকে একফালি রক। তার ওপর গোলাকার এক ভদ্রলোক যাঁর গলা বলতে কিছু নেই, ধড়ের ওপর মুণ্ডুটা সরাসরি বসানো, তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠে চিৎকার করছিলেন। কী বলছিলেন, দূর থেকে বুঝতে পারছিল না অমলেশ। কৌতূহল হতে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল।

কাছে আসতে অমলেশ শুনতে পেল ভদ্রলোক উত্তেজিত ভাবে বলছেন, 'কুড়ি টাকা চাঁদা? মগের মুল্লুক পেয়েছ!'

ছোকরাদের ভেতর থেকে একজন বোঝাতে চেষ্টা করল, 'চাঁদা কেন ভাবছেন? চাঁদা ভাবলেই শ্লা যত গোলমাল। ভাবুন দেশের একটা ভাল কাজে ক'টা টাকা ছাড়লেন।'

ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'ভাল কাজ! এর নাম ভাল কাজ!'

'নয়? ভাবুন তো প্রেসটিজ কতখানি বেড়ে যাবে বীজপুরের।'

'প্রেসটিজ ধুয়ে আমি জল খাব? অ্যাঁ, জল খাব?'

ছোকরা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আবদার করে একবার এসেছি—'

'একবার! দু চারদিন পর পরই তো একটা তাল তুলে চাঁদা নিতে আসছ। গভর্নমেন্টকেও তো এত বার ট্যাক্স দিতে হয় না।'

'আপনাদের কাছে ছাড়া আর কার কাছে যাব জ্যাঠামশাই। আপনারা না দেখলে বীজপুরের প্রেসটিজ একেবারে পাংচার হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক চিড়বিড়িয়ে উঠলেন 'জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই কি হে! ইয়ার্কি পেয়েছ! তোমাদের মতো ভাইপো আমার দরকার নেই।'

'জ্যাঠামাশাই তো বলতে দেবেন না, তবে কী বলব?'

'কিছু বলবে না।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন আস্তে করে বলল, 'জামাইবাবু বলব?'

ভদ্রলোক স্পষ্ট শুনতে পাননি। বললেন, 'কী, কী বললে?'

ছোকরাদের কেউ উত্তর দিল না; ঠোঁট টিপে চোখে চোখে হাসতে লাগল।

সেই ছোকরাটা আবার বলল, 'দশ টাকার দু খানা পাত্তি আপনার কাছে কিচ্ছু না। স্রেফ হাত ঝেড়ে দিলে অমন পাত্তি কত উড়ে যায়।'

ভদ্রলোক আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ অমলেশের দিকে তাঁর নজর পড়ল। সমর্থনের আশায় বললেন, 'দেখুন দিকি মশায় কী ঝামেলা!'

অমলেশ শুধলো, 'কী হয়েছে?'

'আরে মশাই, এরা জলসা করবে, আর টাকা দিতে হবে আমাকে! এক আধ টাকা নয়, কুড়ি টাকা!' ভদ্রলোকের গলা ক্রমশ চড়তে লাগল, 'আজ দুগ্‌গা পুজো, কাল কালী পুজো, পরশু বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল রেস, তার পরের দিন মদ খাওয়া—সব কিছুর জন্য আমাদের টাকা দিতে হবে। বলুন দিকি, কী জুলুম!'

ভিড়ের ভেতর থেকে আরেকটা ছেলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল। অমলেশ লক্ষ করল, সেই ছোকরা, কিছুক্ষণ আগে যে তার রিকশায় করে খানিকটা পথ এসেছিল। সে বলল, 'আপনার রোয়াবি অনেক সয়েছি, আর না। বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। মাল খাবার জন্য কোনো শ্লার কাছে একটা পয়সা নিই না।'

ভদ্রলোক ভেংচে উঠলেন, 'চাঁদা তুলে কী কর শুনি?'

ছোকরা বলল, 'ঝুট ঝামেলা ছেড়ে দু খানা পাত্তি ছেড়ে দিন। জলসার দিন আপনাকে একেবারে প্রধান অতিথি করে ডায়াসে বসিয়ে দেব। মালা পাবেন, হাততালি পাবেন।'

ভদ্রলোক চেঁচালেন, 'এক পয়সা দেব না।'

'দেবেন না?'

'না।'

'পেটো চেনেন?'

হকচকিয়ে ভদ্রলোক বললেন। 'পেটো কী? অ্যাঁ, পেটো কী?'

ছোকরা হাতের বিশেষ মুদ্রা দেখিয়ে বলল, 'গোয়া, তার মাথায় পলতে থাকে। স্রেফ একখানা দেশলাইর কাঠি জ্বেলে পলতেটায় ধরিয়ে দিলেই আর দেখতে হবে না। আপনার ওই দেওয়ালখানা ফর্সা হয়ে যাবে।'

'তার মানে বোমা! তুমি বোমা মারতে চাও!'

'কে বললে মারতে চাই। কুড়িটা টাকা ছুঁড়ে দিন, চলে যাই।'

ভদ্রলোক এবার অমলেশের দিকে তাকালেন, 'শুনলেন মশাই, শুনলেন? বোমার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চাইছে। শুনলেন?'

হঠাৎ অমলেশের কী হয়ে গেল। বলল, 'কী হচ্ছে ভাই, উনি যখন দিতে চাইছেন না তখন ছেড়েই দাও না—'

ছোকরা এবার অমলেশের দিকে তাকাল এবং দেখেই চিনতে পারল, 'আরে বড়দা, আপনি যে!'

'হ্যাঁ, আমি। যা বললাম, শোন। ওঁকে ছেড়ে দাও—'

'ছেড়ে তো দিতে বলছেন, ফাংশানটা হবে কী করে শুনি? কলকাতা থেকে বড় বড় আর্টিস্ট আসবে। সে সব খরচা কে দেবে?'

'তাই বলে লোকের ওপর জবরদস্তি করবে?'

'জবরদস্তি কোথায়, উনি ভালবেসেই দেবেন।'

'তবে যে বোমার কথা বললে?'

'মাজাকি করছিলাম বড়দা, বুঝতে পারেন নি?'

'পেরেছি। পেরেছি বলেই বলছি চলে যাও।'

অমলেশের গলায় কী ছিল, ছোকরা তার দিকে স্থির চোখে তাকাল। এবার তার গলার স্বরই গেল বদলে। বলল, 'অর্ডার দিচ্ছেন?'

অমলেশের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। বলল, 'হ্যাঁ, দিচ্ছি।'

'রুস্তমি করছেন? ও সব এখানে চলবে না।' দাঁতে দাঁত চেপে ছোকরা বলল।

'ভদ্রভাবে কথা বল।'

'আপনার কাছে ভদ্রতা শিখতে হবে! রুস্তমি তোমার ছাড়িয়ে দিচ্ছি শ্লা—' ছোকরা মারমুখি হয়ে এল।

অমলেশের মাথার আর ঠিক থাকল না। টেনে একটি চড় কষিয়ে দিল ছোকরাকে। চড়টা বেশ জোরেই হয়েছিল, ছোকরা প্রায় হাত দশেক দূরে ছিটকে পড়ল। জলে কাদায় তার গা মাখামাখি হয়ে গেল। বাকি ছোকরারা চিৎকার করে উঠল। তারা আক্রমণই করত হয়তো। অমলেশ হাতের কাছে একখানা বড় বাঁশের টুকরো পেয়ে যেতে থমকে দাঁড়াল। তারপর কাদামাখা সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে শাসাল, 'জানের মায়া ছেড়ে দিও শ্লা। আমরা আসছি—'

সেই গোলাকার ভদ্রলোক ভীত সুরে বললেন, 'এ কী করলেন মশাই! ওরা বীজপুরের মার্কামারা ছেলে। ছুরি চালায়, বোমা মারে—'

অমলেশ উত্তর দিল না।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় অজয়দের বাড়ি এসে পৌঁছুল অমলেশ। এবার অজয়ই দরজা খুলে দিল। অমলেশকে দেখে সে অবাক। বলল, 'দাদা, আপনি!'

হেসে অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ, আমি। আরেকবার এসেছিলাম।'

'বৌদির কাছে শুনেছি। আপনার নাম তো জানতাম না। ভেবেই পাচ্ছিলাম না, অমলেশ বসু কে।' একটু থেমে অজয় সাদরে বলল, 'আসুন দাদা, আসুন—' অমলেশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে বলল, 'সত্যি সত্যি আপনি যে আমাদের বাড়ি আসবেন, ভাবতেই পারি নি। কী খুশি যে হয়েছি!'

'হ্যাঁ, আসতে হল।'

'ঠিকানা পেলেন কার কাছে?'

হাসিমুখে রহস্যের সুরে অমলেশ বলল, 'কার কাছে পেতে পারি, তুমিই বল না—'

চোখ নামিয়ে অজয়ও হাসল, কিছু বলল না।

অমলেশ এবার বলল, 'দুপুরবেলা কোথায় বেরিয়েছিলে?'

'টাইপ করতে।' অজয় বলতে লাগল, 'পাঁচ বছর ধরে টাইপ করে যাচ্ছি। চাকরি আর হয় না। প্রায়ই ভাবি ছেড়ে দেব। তারপরই মনে হয়, ছেড়ে দিলেই তো স্পিড কমে যাবে।'

বিচিত্র একটু বিষাদ অমলেশকে ছুঁয়ে গেল যেন।

ভেতরে এসে একটা ঘরে অমলেশকে নিয়ে এল অজয়। ঘরটার একধারে তক্তপোষে পরিষ্কার বিছানা পাতা। আরেক ধারে কাঠের পুরনো আলমারি, মাঝখানে বড় একটা টেবিল ঘিরে বেতের ক'টি চেয়ার। জানালায় এবং দরজায় পুরনো কাপড়ে সুতোর নকশা করে পর্দা টাঙানো হয়েছে। রুচি এবং পরিচ্ছন্নতার ছাপ।

অজয় বলল, 'বসুন দাদা।' অমলেশ বসলে বলল, 'এই ঘরটা আমার বেডরুম-কাম-বৈঠকখানা।'

অমলেশ হাসল।

টেবলে দু-একটা ম্যাগাজিন রয়েছে। সেগুলো দেখিয়ে অজয় বলল, 'আপনি ওগুলো দেখুন। আমি আসছি।'

ব্যস্তভাবে অমলেশ বাধা দিল, 'না না, ভেতরে গিয়ে এখন আর ঝামেলা করতে হবে না। আমি কিচ্ছু খাব না কিন্তু। তুমি বসো। বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

অজয় বলল, 'বসব তো নিশ্চয়ই। তার আগে বৌদিকে খবর দিয়ে আসি।'

'কিন্তু যে ব্যাপারে এসেছি সেটা খুব প্রাইভেট। একমাত্র তোমাকেই বলতে চাই।'

'বৌদির কাছে প্রাইভেট বলে আমার কিছু নেই অমলেশদা।'

'তোমার সঙ্গে কথাটা সেরেই আমি চলে যাব। আমার খুব তাড়া আছে।'

'বৌদিকে নিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি। এক মিনিটও লাগবে না।' অমলেশকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে অজয় বাড়ির ভেতর চলে গেল। একটু পর সেই মহিলাটিকে নিয়ে ফিরে এল সে। অমলেশ যা আন্দাজ করেছিল, ইনিই অজয়ের বৌদি। মহিলা বেশ সাবলীল, কোনোরকম জড়তা নেই। নমস্কার করে বললেন, 'আপনাকে তখন চিনতে পারি নি—'

অমলেশ হাসল, 'চেনার কথা নয়। আগে কখনও তো আমাকে দেখেন নি।'

'ঠাকুরপোও কিন্তু আপনার নাম শুনে চিনতে পারে নি।'

অজয় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আহা, তখন বুঝি আমি অমলেশদার নাম জানতাম!'

'জানেন—' অজয়ের বৌদি দেওরের দিকে ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, 'নাম জানে না, একদিন মাত্র দেখেছে। অথচ আপনার ওপর ঠাকুরপোর ভীষণ ভক্তি।'

'আমাকে তো চিনতেই পারে নি; ভক্তি কী করে বুঝলেন?'

'আজকের কথা বলছি না।'

'তবে?'

'কালকের। মীনা বলে একটি মেয়েকে চেনেন কী?'

'আমি তাদের বাড়িতেই আছি।'

দেওরকে দেখিয়ে মহিলা বললেন, 'কাল এই ওসমান রানীবাজারে গিয়ে দেখে শ্রীমতী মীনার পাশে এক জগৎ সিং জুটে গেছে। পারলে তলোয়ার বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। কিন্তু যাকে জগৎ সিং ভেবেছিল, দেখা গেল সে স্বয়ং স্বর্গের দেবতা। বর দেবার মতো রেস্টুরেন্টের কেবিনে মীনাকে সে তার হাতে তুলে দিয়েছে।'

অমলেশ অবাক, 'আপনাকে এসব বলল কে?'

'ওই শ্রীমান। কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে, রাস্তায় গিয়ে কী দেখল, কী শুনল—রাত্তিরে খেতে বসে আমাকে না বললে ওর সেদিন ঘুম হবে!' অজয়ের বৌদি বলতে লাগলেন, 'কাল ফিরে এসে খালি আপনার কথা। এমন মানুষ জীবনে কখনও দেখে নি, তুমি যদি তাঁকে দেখতে বৌদি, ইত্যাদি—'

অমলেশ চুপ করে থাকল।

মহিলা হঠাৎ বললেন, 'আপনারা একটু গল্প টল্প করুন, আমি চা নিয়ে আসছি---'

অমলেশ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, চায়ের দরকার নেই। আমি অজয়কে বলেছি, এক্ষুনি আমাকে উঠতে হবে।'

'প্রথম দিন এসেছেন, এক কাপ চা যদি আপনার হাতে তুলে দিতে না পারি, আমাদের খুব খারাপ লাগবে—'

মহিলার মনের কথাটা পড়তে পারল অমলেশ। বলল, 'বেশ, এক কাপ চা-ই কিন্তু, তার বেশি কিচ্ছু না।'

হেসে মহিলা চলে গেলেন।

অমলেশ অজয়ের দিকে তাকাল, 'এবার তোমার সঙ্গে দরকারি কথা সেরে নিই।'

অজয় বলল, 'চা'টা খেয়ে নিন। তারপর বলবেন।'

'কথাটা আমি তোমার কাছেই বলতে চাই। তোমার বৌদি থাকলে—'

অমলেশের মনোভাব বুঝতে পারল অজয়। বলল, 'বৌদির সামনে আপনি যা খুশি বলতে পারেন। আপনাকে তো বলেছি বৌদির কাছে আমার কিছুই গোপন নেই।'

অমলেশ বলল, 'কথাটা যদি মীনাকে নিয়ে হয়?'

অজয় হাসল, 'মীনাকে নিয়েই যে হবে তা বুঝেছি। বৌদির সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।'

অজয়ের বৌদি একটু পর ফিরে এলেন। চা-ই না, তার সঙ্গে বেশ কিছু খাবারও এনেছেন। সেগুলো দেখিয়ে অমলেশ বলল, 'শুধু চায়ের কথা ছিল, আবার এ সব কেন?'

মহিলা বললেন, 'শুধু চা খেতে নেই। নিন, শুরু করুন—'

ইতিমধ্যেই পনের কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। অনাবশ্যক কথা বাড়াতে গেলে আরো সময় নষ্ট হবে। তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ সেরে অমলেশকে বীজপুর থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে খাবারের প্লেটটা টেনে নিল অমলেশ। খেতে খেতে মহিলাকে বলল, 'অজয়ের সঙ্গে খুব জরুরি একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম। ওর ইচ্ছা আপনার সামনেই সেটা বলি—'

মহিলা উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

অমলেশ বলল, 'মীনার সম্বন্ধে আপনি কতটা জানেন?'

'অনেকটা—' চোখের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ করে মহিলা হাসলেন। তারপর অজয়ের দিকে একটি আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'সে এই যুবকটির হৃদয় হরণ করেছে।'

অজয় মাথা নিচু করল।

অমলেশও হেসে ফেলল, 'ও কথা বীজপুরের বোধহয় সবাই জানে। যেভাবে অজয়কুমার রাস্তায় মীনার পিছু নেয়, যেভাবে ওদের বাড়ি উঁকিঝুঁকি দেয়—'

অজয় তাড়াতাড়ি মুখ তুলে বিব্রতভাবে বলল, 'দাদা—'

'আচ্ছা থাক, তুমি যখন লজ্জা পাচ্ছ—'বলতে বলতে কণ্ঠস্বর থেকে সব তরলতা মুছে ফেলে অমলেশ গম্ভীর হল, মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু এ সব কথা বলতে আসি নি।'

'তবে?'

'অবিনাশ পালধিকে আপনারা চেনেন?'

মহিলা চমকে উঠলেন। চকিত হয়ে অজয় মুখ তুলল। তারপর দু'জনে একই সঙ্গে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'চিনি। কেন?'

'লোকটা কেমন?'

অজয় চেঁচিয়ে উঠল, 'পাজির পা-ঝাড়া।'

মহিলা বললেন, 'শুনেছি অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে লোকটা।'

একটু চুপ করে থেকে অমলেশ বলল, 'মীনার ওপর অবিনাশ পালধির নজর পড়েছে।'

কিছুক্ষণ শ্বাসবন্ধ-করা নীরবতা। তারপর স্খলিত সুরে অজয় বলল, 'ওদের বাড়ি মাঝে মাঝে অবিনাশ আসে শুনেছি।'

অমলেশ বলল, 'মীনার জন্যেই আসে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'মীনা তো এ সব আমাকে বলেনি।'

'হয়তো লজ্জায়।'

আবার খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর অমলেশ আস্তে করে ডাকল, 'অজয়—'

অজয় চোখ তুলে তাকাল, তার দৃষ্টিতে ভয়, উত্তেজনা, শঙ্কা। তার বৌদিরও চোখমুখের একই ভাব।

অমলেশ বলল, 'তুমি মীনাকে কতটা ভালবাস, এবার তার পরীক্ষার সময় এসেছে।'

অজয় বলল, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না অমলেশদা—'

'বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' অমলেশ বলতে লাগল, 'তুমি ওদের সংসারের অবস্থা নিশ্চয় জানো?'

'শুনেছি, ভাল না।'

'খুব খারাপ। এত খারাপ যে দু এক মাসের ভেতর মীনার একটা কিছু ব্যবস্থা না হলে অবিনাশের হাতে ও বলি হয়ে যাবে। আশা করি আমি যা বলতে চাই, বুঝতে পেরেছ।'

আবছা গলায় অজয় বলল, 'পেরেছি, কিন্তু—'

'বল—'

'আমি কী ব্যবস্থা করব?'

'কী করবে ভেবে পাচ্ছ না?'

'না।' দিশেহারার মতো বলল অজয়।

অমলেশ রহস্যচ্ছলে বলল, 'মধ্যযুগে কোনো যুবক এই রকম খবর পেলে কিন্তু সোর্ড হাতে ছুটে যেত।'

মহিলা মৃদু হেসে বললেন, 'এটা তো মধ্যযুগ না।'

অমলেশ হাসল, 'তা বটে।' একটু থেমে অজয়কে বলল, 'সমস্ত অবস্থাটা তোমাকে বললাম। ক' দিনের জন্যে আমি এখানে এসেছি। খুব শিগ্‌গিরই চলে যাব। মীনার সম্বন্ধে তোমার যদি কোনো কর্তব্য থাকে এখনই তা করবার সময়।'

অজয়কে বিভ্রান্ত দেখাল। জলে ডোবা মানুষের মতো সে বলল, 'আমি কী করব অমলেশদা?'

অমলেশ হাসল, 'তুমি কী করবে জানি না। তবে আমি হলে কী করতাম সেটা জানি।'

অজয় কী বলতে যাচ্ছিল, সেই মহিলাটি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মীনাকে বাঁচাবার একটি পথই খোলা আছে।'

অমলেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। অজয় তার বৌদির দিকে ফিরে কাঁপা গলায় শুধলো, 'কী পথ?'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মহিলা অজয়ের চোখের দিকে তাকালেন, 'তোমার উচিত মীনাকে বিয়ে করে ফেলা।'

অবরুদ্ধ গলায় অজয় বলল, 'কিন্তু আমার যে চাকরি বাকরি নেই বৌদি।'

মহিলা কিছু বললেন না, বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলেন।

দু হাতে মুখ ঢেকে অসহায়ের মতো ফিসফিসিয়ে অজয় বলতে লাগল, 'একটা চাকরি—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলল, 'আজই—এখনই যদি একটা চাকরি পেতাম—'

মহিলাটিও করুণ গলায় বললেন, 'তোমার দাদাও তো ছোট চাকরি করেন। মাইনে টাইনে যদি একটু ভাল হত, তোমার বিয়ে দিয়ে দিতাম।'

অজয় এবং তার বৌদির বেদনা গভীরভাবে অমলেশকে স্পর্শ করেছিল। কী নিদারুণ এই সময়! সামান্য একটা চাকরি, মাসের শেষে কয়েকটা মাত্র টাকা, তার জন্য একটি মেয়ের বলিদান হতে চলেছে; একটি ছেলে তার যৌবনের সমস্ত সাধআহ্লাদ আর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকছে। সুধার পাত্রটি তার নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

বিষাদগ্রস্তের মতো কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে অমলেশ উঠে দাঁড়াল। অজয়ের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'দু এক মাসের মধ্যে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না?'

'দু এক মাস!' অজয় বিচিত্র হাসল, 'বাংলাদেশের খবর আপনি জানেন না অমলেশদা। পাঁচ বছর ধরে চাকরির চেষ্টা করছি। চারশ সাড়ে চারশ দরখাস্ত পাঠিয়েছি। দু বার মোটে ইন্টারভিউর ডাক এসেছিল। এখানে মামা-টামা না থাকলে চাকরি পাওয়া অসম্ভব। আমার তো সে রকম কেউ নেই। চাকরি হবে কোত্থেকে?'

অমলেশ বলল, 'চাকরির বাজার যখন এইরকম, তখন অন্য কিছু করা উচিত।'

'টিউশনি অবশ্য করি, কিন্তু তাতে আর ক'টা টাকা পাওয়া যায়!'

'টিউশনি-ফিউশনি তো সাময়িক ব্যাপার, ঠেকা দেওয়া আর কি। কিন্তু পার্মানেন্ট ইনকামের ব্যবস্থা না হলে—'

'কিভাবে সেটা করা যায় বলুন—'

'ধর ব্যবসা ট্যাবসা—'

'তার জন্য তো অনেক মূলধনের দরকার। দাদার মাইনেটাই আমাদের ভরসা; এক মাস মাইনে না এলে না খেয়ে থাকতে হবে। কোত্থেকে ব্যবসার ক্যাপিটাল আসবে বলুন? তবে—'

'কী?'

'খুব কম ক্যাপিটালে একটা ব্যবসার কথা জানি—'

'কী?'

'ছোটোখাট জিনিস সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। অনেকগুলো জায়গায় আমার জানাশোনা আছে। করতে পারলে মাস গেলে আপাতত দুশ আড়াই শ টাকা আয় হবে। যদি কিছু ক্যাপিটাল পেতাম—'

এই সময় মহিলা বলে উঠলেন, 'আমি তো তোমাকে দিতেই চেয়েছিলাম ঠাকুরপো।'

জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে অজয় বলল, 'ও আমি নিতে পারব না।'

হঠাৎ অমলেশের মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কী নিতে পারবে না?'

অজয় বলল, 'বৌদির সামান্য কিছু গয়নাগাটি আছে, বৌদি সেটা নিতে বলছে।'

অমলেশ চুপ করে থাকল।

মহিলা বললেন, 'গয়নাগুলো তো এমনিই পড়ে আছে; যদি মীনাটাকে বাঁচানো যায়—'

'না না—' অজয় বলতে লাগল, 'আমাকে লোভ দেখিও না বৌদি। ও আমি কিছুতেই নিতে পারব

না। কোনো কারণে ব্যবসায় যদি লোকসান যায়, তোমার দিকে কোনোদিন মুখ তুলে তাকাতে পারব না।'

'একটা মেয়ের ভবিষ্যতের চাইতে তোমার মুখ তোলাটা বড় হল ঠাকুরপো?'

অমলেশের মনে হল, এখানে এলে বেঁচে যাবে মীনা। এই তার আসল জায়গা।

অজয় বলল, 'কিন্তু বৌদি ওই গয়নাগুলো বেচে তিন হাজার টাকার মতো টাকা পাওয়া যাবে। তাতে যে কিছুই হবে না।'

মহিলার মুখে বেদনার ছায়া পড়ল; কিছু বললেন না তিনি।

সমস্ত পরিবেশটা চারদিক থেকে অমলেশকে যেন ঘিরে ধরছিল; তার ওপর তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী এক মহানুভবতা অমলেশের ওপর ভর করল যেন। আচ্ছন্নের মতো সে বলল, 'কত টাকা হলে সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা শুরু করতে পার?'

অজয় বলল, 'অন্তত হাজার ছয়েক।'

'ধর, আমি যদি ওই অ্যামাউন্টটা তোমাকে দিই।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অজয় বলল, 'আপনি—আপনি দেবেন!'

'হ্যাঁ।'

সঙ্কুচিতভাবে অজয় বলল, 'কিন্তু—'

'তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। তুমি তো আমাকে দাদা বলেছ। ধর ওই টাকাটা তোমাদের বিয়েতে যৌতুক দিলাম।'

মুখ নিচু করে অজয় আস্তে আস্তে বলল, 'ওভাবে যৌতুক আমি নিতে পারব না।'

অমলেশ বলল, 'তা হলে ধর ঋণই নিলে, বিজনেস লোন। যখন তোমার সুবিধে হবে ফেরত দিও।'

অজয় চুপ করে থাকল। মনে হল এতে সে রাজি হয়েছে।

এই সময় মহিলাটি বলে উঠলেন, 'না, এত টাকা একলা আপনাকে দিতে হবে না। আপনি তিন হাজার টাকা দেবেন। বাকিটার ব্যবস্থা হবে আমার গয়না বিক্রি করে। ঠাকুরপো না বললে শুনছি না।'

অজয় এবারও চুপ।

অমলেশ বলল, 'তুমি তা হলে রেডি হতে থেকো। বোম্বাইতে গিয়েই আমি টাকাটা পাঠিয়ে দেব। খুব দেরি হলে দিন পনেরর ভেতর পেয়ে যাবে।'

অজয় হঠাৎ বলল, 'কিন্তু অমলেশদা—'

'কী?'

'আপনি তো আমার জন্যে এত করতে চাইছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এর কোনো দরকার নেই।'

'কেন?'

'মীনার মা আমাকে পছন্দ করেন না।'

'সে সম্বন্ধে তোমাকে ভাবতে হবে না। ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।' বলতে বলতে অমলেশ হাত উলটে ঘড়িটা দেখে নিল, ছ'টা বাজে। প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়ল অমলেশ, 'আজ চলি ভাই।' 'মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মন বলছে, আপনার কাছে আসতে পারলে মীনা শুধু বেঁচে যাবে না, সুখীও হবে। আচ্ছা চললাম।' বলে 'হাতজোড় করে নমস্কার করল।

মহিলা বললেন, 'নমস্কার। আবার আসবেন।'

অমলেশ হাসল। মনে মনে ভাবল, আর এসেছে। বীজপুর থেকে চলে যেতে পারলে সে এখন বাঁচে। কলকাতায় গিয়ে নরেন্দুর মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে আরো একটা কথা তাকে নীলাদের লিখতে হবে। অজয়ের সঙ্গে যেন মীনাকে বিয়ে দেওয়া হয়।

অজয়রা গেট পর্যন্ত অমলেশের সঙ্গে সঙ্গে এল। বাইরের রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ অমলেশ বলল, 'আচ্ছা অজয়, বীজপুর থেকে ট্রেন ছাড়া আর কিভাবে কলকাতায় যাওয়া যায়?'

অজয় একটু অবাক হল, 'বাসেও যাওয়া যায়। কেন বলুন তো?'

'এমনি। হঠাৎ মনে হল তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

অজয় অমলেশকে আরো এগিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাকে নিরস্ত করে রানীবাজারে এসে একটা রিকশা নিল অমলেশ। বলল, 'বাস স্ট্যান্ডে চল—'

'কোন বাস স্ট্যান্ড বাবু?'

'যেখান থেকে কলকাতার বাস ছাড়ে। একটু জোরে যাবে ভাই—'

বাস টারমিনাসটা স্টেশনের কাছেই। সেখানে গিয়ে অমলেশ জানতে পারল কলকাতার লাস্ট বাসটা মিনিট দশেক আগে ছেড়ে গেছে। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অমলেশ দেখল, ছ'টা আটাশ। কলকাতার লাস্ট ট্রেন ছ'টা কুড়িতে। কাজেই রেল স্টেশনে যাওয়া বৃথা। কেন যে মীনার দায়িত্বটা নিতে গেল!

আজ আর কলকাতায় যাওয়া হল না। জগতের সবটুকু দুর্ভাবনা নিয়ে সেই রিকশাতেই অমলেশকে নীলাদের বাড়ি ফিরে আসতে হল।

আঠার

বাড়ি ফিরে অমলেশ দেখল, বারান্দায় একা মীনা বসে আছে। ঝুনু কিংবা নবেন্দুর মাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

বারান্দায় এসে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে চোখের ইশারায় মীনাকে ডাকল অমলেশ। সে উঠে অমলেশের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

ঘরে ঢুকে জামা খুলতে খুলতে অমলেশ বলল, 'ঝুনু আর মাসিমাকে তো দেখছি না।'

'মা বাবার ঘরে, আর ঝুনু মাঝের ঘরে বই নিয়ে বসেছে।'

'পড়ছে?'

'লেখাপড়ায় ওর খুব মাথা। স্কুলে তো যেতে পারে না। মাঝে মাঝে বইটই নিয়ে বসে।'

অমলেশ চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমার দিদি কলকাতা থেকে ফেরে নি?'

'না।'

জামা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। অমলেশ বিছানায় এসে বসল। মীনা বলল, 'কোথায় গিয়েছিলেন অমলেশদা?'

রহস্যময় হেসে অমলেশ বলল, 'বল তো কোথায় গিয়েছিলাম?'

'আমি কী করে বলব? আমি কি হাত গুনতে জানি?'

'জানো না?'

'না। বলুন না—'

চোখ কুঁচকে আগের মতো হাসতে হাসতে অমলেশ বলল, 'অজয়দের বাড়ি—'

'যাঃ! ভাল হবে না বলছি।' বলতে বলতে চোখ নামাল মীনা।

গভীর স্বরে অমলেশ বলল, 'সত্যিই গিয়েছিলাম।'

একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল মীনা, কিছু বলল না। অমলেশ বুঝল, তার কথা শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মেয়েটা।

হঠাৎ দুষ্টুমি ভর করে বসল অমলেশের ওপর। ফিসফিসিয়ে সে শুরু করল, 'অজয়কে বললাম, যত তাড়াতাড়ি পারে তোমায় যেন তার কাছে নিয়ে যায়। নইলে সীতাহরণ হয়ে যাবে। কিন্তু—'

মীনা মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। অমলেশ লক্ষ করল, মীনার চোখেমুখে অস্থিরতা ফুটে ওঠে।

অমলেশ বলল, 'এত করে বোঝালাম কিন্তু অজয় বিয়ে করতে রাজি না।'

চকিতে মুখ তুলল মীনা। তার চোখেমুখে বিদ্যুৎ চমকের মতো ভয় আশাভঙ্গ উত্তেজনা এবং যন্ত্রণার ছায়া পড়ল। নিমেষে মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত নেমে যেতে লাগল। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো শীতের পাতার মতো থরথর করতে লাগল।

অমলেশের বড় মায়া হল। মীনার পিঠে একখানা হাতরেখে সস্নেহে, কোমল গলায় বলল, 'বোকা মেয়ে। অজয়কে এতদিন ধরে দেখেছ; সে কী বলতে পারে জানো না? তার ওপর এতটুকু বিশ্বাস নেই?'

আগের মতোই ঠোঁট কাঁপতে লাগল মীনার। চোখ দুটো জলে ভরে যেতে লাগল। অমলেশ তাড়াতাড়ি বলল, 'ভয় নেই। বিয়ের কথা বলতেই ছোকরা এক পায়ে খাড়া; টোপর কিনতে ছোটে আর কি। কত কষ্টে যে তাকে আটকেছি। সে যাক গে, তুমি গায়ে হলুদ মাখবার জন্য তৈরি হও।'

সজল চোখে সূর্যোদয় ঘটল যেন; কালো তারায় ঝিকমিকিয়ে ঝলমলিয়ে আলোর ছটা নাচতে লাগল। অনেকক্ষণ অমলেশের দিকে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে মীনা বলল, 'কিন্তু ওর যে চাকরি নেই অমলেশদা—'

'তার একটা ব্যবস্থা হয়েছে।'

উৎসুক সুরে মীনা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'সব কথার জবাব আমার মুখে নাই বা শুনলে। অজয়ের কাছে জেনে নিও।'

রাত্রি দশটা নাগাদ অমলেশ খেতে বসল। ঝুনু, মীনা আর সে। নীলা এখনও ফেরে নি; নিতুও না। অমলেশ দু দিন এসেছে, মীনার আর এক ভাই হীরুকে এখন পর্যন্ত চোখে দেখে নি। সে কখন ফিরবে এ বাড়ির কেউ জানে না। মাঝে মাঝেই সে নাকি ডুব দেয়, ফেরে পাঁচ সাত দিন, কখনও কখনও আবার মাসখানেক বাইরে কাটিয়ে।

এখনই খেতে বসতে অমলেশের আপত্তি ছিল। সে বলেছিল, 'নীলা দেবী ফিরলে খাব'খন।'

নবেন্দুর মা বলেছেন, 'ওর ফিরতে ফিরতে এগারটা সাড়ে এগারটা। অত রাত পর্যন্ত বসে থাকতে হবে না। ভাত তরকারি সব জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে। গবম গরম খেয়ে নাও বাবা।'

অমলেশ আর কিছু বলল না।

খেতে খেতে এক সময় অমলেশ বলল, 'মাসিমা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।' আজ যখন কলকাতা যাওয়া হল না তখন মীনার বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করে নিতে চায় সে।

নবেন্দুর মা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী কথা অমলেশ?'

ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে খানিক ইতস্তত করে অমলেশ বলল, 'মীনা কদ্দূব পড়াশোনা করেছে?'

'ক্লাস নাইন পর্যন্ত।কেন?'

'ওকে আর পড়াবার ইচ্ছে আছে?'

'ইচ্ছে তো ছিল বাবা কিন্তু ওব মাথা নেই। তা ছাড়া আমাদের যা অবস্থা—' একটু থেমে বললেন, 'তার চাইতে ভাল একটি ছেলে যদি পেতাম; দাবি-দাওয়া নেই এমন ছেলে। তা হলে ওর বিয়ে দিযে দিতাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কি তা আছে?'

অমলেশ লক্ষ করল, মীনার মাথা থালার ওপর নুয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে সে বলল, 'বীজপুবের একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। ছেলেটিকে বেশ ভাল লাগল। যদি বলেন তো মীনার জন্য চেষ্টা করতে পারি।'

তীক্ষ্ণ চোখে অমলেশের দিকে তাকালেন নবেন্দুর মা। সন্দিগ্ধ সুরে বললেন, 'কবে আলাপ হয়েছে?'

'কাল।'

'কাল তো ঝুনু-মীনাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলে। আলাপ কি তখনই হয়েছে?' বলে মীনার দিকে তাকালেন নবেন্দুর মা।

মীনার অবস্থা অবর্ণনীয়। অমলেশ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিব্রত সুরে বলল, 'হ্যাঁ, মানে—'

'ছেলেটির নাম কি অজয়?'

'হ্যাঁ।'

'আলাপ কি ওই বাঁদর মেয়েটা করিয়ে দিয়েছে?'

অমলেশ চমকে উঠল, 'না—না—'

ভদ্রমহিলা কী বুঝলেন তিনিই জানেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু বললেন, 'অজয় ভাল ছেলে, তোমাকে কে বলল? চাকরি বাকরি করে না, মেয়েরা রাস্তায় বেরুলে পিছু নেয়। অতি বাজে ছেলে।'

অমলেশ তাঁকে বুঝিয়ে বলল, অজয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ঠিক নয়। সব মেয়ে নয়, একমাত্র মীনারই পিছু নেয় সে। চাকরি নেই, কেননা হাজার চেষ্টা করেও সে পাচ্ছে না। ওদের বাড়িতে যে আজ গিয়েছিল, সে কথাও বলল। অজয়দের সংসারে মীনা যেতে পারলে সুখীই হবে।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন নবেন্দুর মা। তারপর বললেন, 'ওর সঙ্গেই মীনার বিয়ে দিতে বলছ?'

অমলেশ হাসল, 'সেটা আপনারা ভেবে দেখুন। তবে—'

'কী?'

'আমার মতামত যদি নেন তা হলে বলতে পারি এ বিয়েতে ভালই হবে।'

'কিন্তু—' দ্বিধান্বিত সুরে নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'চাকরি নেই, ওই ছেলে বিয়ে করে খাওয়াবে কী?'

অমলেশ বলল, 'এক্ষুনি বিয়ে দিতে বলছি না। আগে অজয়ের রোজগারের ব্যবস্থা হোক, তারপর। আমি—'

'তুমি কী?'

'আমাদের কলকাতার অফিসে ওর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করব। আপাতত অজয় একটা ব্যবসা ট্যাবসা শুরু করছে।'

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন নবেন্দুর মা। ভেতরে ভেতরে অমলেশ যে এতদূর এগিয়েছে, তাঁর কাছে তা যেন অকল্পনীয়। বললেন, 'তোমার মেসোমশায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু কথা বলে নিই। পঙ্গু হোক, অথর্ব হোক, উনিই তো এ সংসারের কর্তা। তাঁর মত ছাড়া কিছু হবে না।'

অমলেশ ব্যস্তভাবে বলল, 'তা তো বটেই—' বলতে বলতে হঠাৎ দেখতে পেল, খাওয়া বন্ধ করে কৃতজ্ঞ চোখে মীনা তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই চকিতে থালার ওপর ঝুঁকে পড়ল মেয়েটা।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ওধারের ঘর থেকে মহীতোষের ভাঙা ভাঙা, জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যাঁ গো, নীলা ফিরেছে কলকাতা থেকে?'

দাঁতে দাঁত চেপে একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন নবেন্দুর মা। পরে বললেন, 'ফিরেছে।'

'হীরু নিতু এসেছে?'

'এসেছে।'

অমলেশ লক্ষ করেছে, কাল এবং পরশুও এই সময় মহীতোষ ছেলেমেয়েদের খোঁজ নিয়েছিলেন। দু দিনই নবেন্দুর মা মিথ্যে বলেছেন।

স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আস্তে করে অমলেশের উদ্দেশে নবেন্দুর মা বললেন, 'এখন যদি বলি ফেরে নি, চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলবে।'

উনিশ

খাওয়া দাওয়া সেরে দক্ষিণের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল অমলেশ। শুলেই তো আর ঘুম আসে না। সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে টানতে লাগল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

অমলেশকে একা পেয়ে নানা দিক থেকে অসংখ্য ভাবনা ভিড় করে এল। একের পর এক সিগারেট জ্বালিয়ে রাতের কতটা সময় সে কাটিয়ে দিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় তার মনে হল, সামনের বারান্দায় অস্থির পায়ে কেউ হাঁটছে। অন্ধকারে হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালটা জ্বলছিল, অমলেশ দেখল সাড়ে বারোটা বাজে।

নিত্ত আজ এ ঘরে আসে নি। বাড়িই ফেরে নি তো শোবে কি! এ ঘরে অমলেশ আজ একা। মাথার দিকের দরজাটা হাট করে খোলা রয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা বন্ধ করতে যাবে, বাইরের বারান্দায় নবেন্দুর মাকে দেখতে পেল অমলেশ।

সারা বাড়িটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। মীনা ঝুনু অথবা মহীতোষ—কেউ জেগে আছে বলে মনে হয় না। চারদিক নিঝুম নিশুতিপুর। শুধু অশ্রান্ত অধীর বিলাপের মতো একটানা ঝিঁঝিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টির আওয়াজ আর ঝিঁঝিদের কনসার্ট এ ছাড়া সমস্ত বীজপুরে আর কোনো শব্দ নেই বুঝি।

অমলেশ লক্ষ করল, নবেন্দুর মা অধীরভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখ দুটো রাস্তার দিকে ফেরানো। এত রাতে বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ওভাবে হাঁটছিলেনই বা কেন মহিলা? এখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছেনই বা কী?

অপার কৌতূহলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অমলেশ। কাছে গিয়ে আস্তে করে ডাকল, 'মাসিমা—'

নবেন্দুর মা চমকে অমলেশের দিকে ফিরলেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'ও, তুমি! এখনও ঘুমোও নি?'

'না, ঠিক ঘুম আসছিল না। কিন্তু আপনি?'

'আমি কী?'

'এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন! শুতে যাননি?'

একটু চুপ করে থেকে আচমকা ভেঙে পড়লেন নবেন্দুর মা, 'নীলা এখনও ফেরে নি অমলেশ।'

অমলেশ চকিত হল, 'সে কী!'

'রোজই সাড়ে এগারটার ভেতর ফিরে আসে। এখন ক'টা বাজে?'

'সাড়ে বারটা।'

একটুক্ষণ নীরব থেকে চিন্তিত অমলেশ বলতে লাগল, 'লাস্ট ট্রেন এসে গেল। এরপর তো ফেরার কোনো উপায় নেই।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো নবেন্দুর মা বললেন, 'না।'

'তা হলে বোধহয় উনি আজ ফিরবেন না।'

অমলেশের একখানা হাত ধরে শিথিল সুরে নবেন্দুর মা বললেন, 'কী হবে বাবা?'

ভরসা দেবার মতো একটা কথাও খুঁজে পেল না অমলেশ। কিছুক্ষণ পর বলল, 'যতটা ভাবছেন হয়তো ততটা ভাবনার কারণ নেই। কোনো ব্যাপারে আটকে টাটকে গেছেন নীলাদেবী। লাস্ট ট্রেনটা ধরতে পারেন নি।'

কাঁপা গলায় নবেন্দুর মা বললেন, 'মন বড় কু গাইছে, বার বার বলছে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে।'

নবেন্দুর মায়ের দুর্ভাবনাটা খুবই সঙ্গত। সান্ত্বনা দেবার জন্য অমলেশ বলল, 'উনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী; নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জানেন।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো নবেন্দুর মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তুমি জানো না অমলেশ—'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠল অমলেশ। বিমূঢ়ের মতো বলল, 'কী জানি না?'

'ও যে কী চাকরি করে, কোথায় ওর অফিস, ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত ডিউটি—কিছুই আমাকে বলে না। সব সময় মেয়ে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।'

অমলেশ চুপ। সেদিন রাত্রিবেলা এ সব কথা সে শুনেছে।

নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'সব সময় ওই মেয়ের চিন্তায় আমার বুকের ভেতরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে।'

এবারও অমলেশ নিরুত্তর।

নবেন্দুর মা বললেন, 'আমার একটা উপকার করবে বাবা?'

'কী?' এতক্ষণে অমলেশের গলায় স্বর ফুটল।

'নীলা কী কাজ টাজ করে, একটু খোঁজ নিয়ে আমাকে বলবে?'

প্রথম দিন ট্রেনে নীলার পেছনে পুলিশ ঘুরতে দেখেছিল অমলেশ। সে কী করে, জানবার জন্য তার অবচেতনে কৌতূহল যে ছিল না তা নয়। বলল, 'বলব।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর নবেন্দুর মা অসহায় সুরে বললেন, 'রাত একটা বাজতে চলল, এখনও তো এল না মেয়েটা। কী যে করি!'

খানিক ভেবে অমলেশ বলল, 'আচ্ছা, বীজপুরে এমন কেউ আছে যার কাছে গেলে নীলাদেবীর খবর পাওয়া যেতে পারে?'

'নূপুর বলে একটা মেয়ে আছে; ওর সঙ্গে কাজ করে। সে হয়তো বলতে পারে। নূপুরকে কি তুমি চেন?'

'চিনি। আজই দুপুরবেলা এসেছিলেন। নীলাদেবী আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।'

'ওদের বাড়ি কি তুমি চেন?'

'চিনি।' বলতে গিয়েও থমকে গেল অমলেশ। কিভাবে চেন, কে চিনিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারটা প্রশ্ন তা হলে এসে পড়বে। সে সব এড়াতে বলল, 'ঠিকানাটা বললে যেতে পারব।'

একটু ভেবে নবেন্দুর মা বললেন, 'এত রাতে আজ আর যেতে হবে না। কাল ভোরবেলা উঠেই যেও।'

নিজের ঘরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল অমলেশ। অসীম অন্তহীন এক দুর্ভাবনা মাকড়সার মতো তার চারধারে দ্রুত জাল বুনে চলল। আজ কোথায় রাত কাটাবে নীলা? লাস্ট ট্রেনে কেন আজ ফিরল না সে? আকাশ-পাতাল ভেবেও কিছুই বুঝে উঠতে পারল না অমলেশ। চকিতে ট্রেনের সেই দৃশ্যটি তার চোখে ভেসে উঠল। দুর্যোগের সেই রাতটা—পুলিশ—চামড়ার ছোট্ট সুটকেস। তবে কি, তবে কি—

সব মিলিয়ে একটা নিদারুণ শঙ্কা যখন অমলেশকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে সেই সময় বাইরে থেকে চাপা গলায় নবেন্দুর মা ডাকলেন, 'অমল—'

অমলেশ বেরিয়ে এল, 'কী বলছেন?'

'ঘুমোতে পারছি না বাবা।'

আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে অমলেশ তাকিয়ে থাকল। নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'মন একেবারেই মানছে না। দু দিনের জন্য তুমি এসেছ। বলতেও সাহস হচ্ছে না। এদিকে—'

মহিলার মনোভাব অনুমান করে অমলেশ বলল, 'আমি বরং নূপুর দেবীদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি।'

'তাই যাও বাবা, নইলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কিছু মনে করো না, তোমার ওপর বড্ড জুলুম করছি।'

'ও কিছু না, আপনি আমায় একটা ছাতা দিন।'

ওধারের একটা ঘর থেকে ছুটে গিয়ে ছাতা নিয়ে এলেন নবেন্দুর মা। অমলেশের হাতে দিতে দিতে নূপুরদের ঠিকানা এবং সেখানে কিভাবে যেতে হয় বলে দিলেন। নূপুরদের ঠিকানার দরকার ছিল না। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল অমলেশ। তারপর ছাতা খুলে উঠোনে নেমে পড়ল। একটু পর উঠোন থেকে সরু পথ ধরে অন্ধকার বড় রাস্তায়।

নূপুরদের বাড়ির সামনে গিয়ে অমলেশ যখন দাঁড়াল, বৃষ্টি থেমে গেছে। চারধারের ঝোপঝাপ আর কচুবনের ভেতর ব্যাঙ ডাকছে। ঝিঁঝিদের একটানা ক্লান্ত বিলাপ চলছে। রাস্তায় আজ আলো জ্বলে নি, একটা লোকও চোখে পড়ছে না। ব্যাঙের ডাক আর ঝিল্লিস্বর বীজপুরের অন্ধকার নির্জনতাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে যেন।

সেদিনই দেখে গিয়েছিল, নূপুরদের বাড়িটা একতলা। সামনের দিকে ঝুপসি বাগান। সেদিন তবু আলো টালো ছিল; আজ কিছুই নেই। অন্ধকার এত ঘন যে দশ হাত দূরেও দৃষ্টি যায় না।

বাইরের রাস্তা থেকে অমলেশ ডাকল, 'নূপুর দেবী, নূপুর দেবী—'

কেউ সাড়া দিল না।

অগত্যা বাগানের পিছল মাটির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে একতলা ভাঙা পুরনো বাড়িটার বারান্দায় এসে থামল অমলেশ।

ভেতরে আলো জ্বলছে না; কেউ জেগে আছে কিনা তাও টের পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে অমলেশ আবার নূপুরকে ডাকল।

একটু পরে দরজা খুলে গেল। হেরিকেন হাতে করে একটি প্রৌঢ় বেরিয়ে এলেন। দড়িপাকানো রুগ্ন শরীর সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে আছে। বুকের হাড়গুলো আলাদা আলাদা গুনে নেওয়া যায়। মুখময় কাঁচায়-পাকায় মেশানো দাড়ি-গোঁফ, মাথাটা ঝুপসি মতো। ঘাড় বেয়ে, কনের ওপর দিয়ে চুল ঝুলছে। দেখেই বোঝা যায়, বহুকাল ক্ষুর কাঁচির সঙ্গে সম্পর্ক নেই; পরনে ময়লা খাটো ধুতি ছাড়া কিচ্ছু নেই। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি পৈতে; তেলে জলে চিটচিটে হয়ে আছে।

গাল বসে গেছে। শরীরময় মোটা মোটা জটপাকানো শিরা। দৃষ্টি ভাবলেশহীন, ধূসর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মরা মানুষের চোখ।

কণ্ঠস্বরও অদ্ভুত, অলৌকিক বলাই বোধহয় উচিত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নয়, মনে হচ্ছে অনেকদূর থেকে তাঁর গলা ভেসে আসছে। প্রৌঢ় বললেন, 'কাকে চান?'

অমলেশ বলল, 'নূপুর দেবী আছেন?' বলেই খেয়াল হল, এ কী করেছে? এত রাতে প্রায় অচেনা একটি তরুণীর কাছে ছুটে এসেছে সে। প্রৌঢ় যদি নূপুরের সঙ্গে দেখা করতে না দেন? যদি জিজ্ঞেস করেন, নূপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? কোথায় কিভাবে তার পরিচয়? এত রাতে নূপুরের সঙ্গে দেখা করতে আসার সাহস কোত্থেকে হল? যদি অপমান করে বাড়ির বার করে দেন? অমলেশ প্রায় ঘামতে শুরু করল।

প্রৌঢ় কিন্তু কিছুই করলেন না। এমনকি একটি প্রশ্নও শুধোলেন না। অসীম ক্লান্ত গলায় শুধু বললেন, 'আছে। আসুন আমার সঙ্গে।'

ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, একটা লম্বা হল-ঘরের মতো জায়গা চোখে পড়ল। মেঝে জুড়ে বিছানা পড়েছে। সারি সারি বালিশ পাতা। ছয় থেকে ষোল বছরের ন'দশটি ছেলেমেয়ে সেখানে ঘুমোচ্ছে। সবারই মুখচোখের আদল এক। একই রকম ছাঁচে গড়া কুমোরবাড়ির ছোট বড় ক'টি পুতুল যেন।

বিছানার ধার দিয়ে অমলেশকে একটা বন্ধ দরজার কাছে নিয়ে এলেন প্রৌঢ়। আস্তে আস্তে ডাকলেন, 'নূপুর—নূপুর—'

ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কী বলছ বাবা?'

প্রৌঢ় লোকটি তা হলে নূপুরের বাবা। তিনি বললেন, 'এক ভদ্রলোক এসেছেন। তোর সঙ্গে কী কথা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নূপুর চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল। এত রাতে অমলেশকে নিজেদের বাড়িতে দেখবে, তা বোধহয় ভাবতেও পারে নি। অবাক বিস্ময় বলল, 'আপনি, অমলেশবাবু!'

অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

নূপুরের গায়ে সস্তা রঙিন শাড়ি; আটপৌরে ধরনে পরা। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। খুব সম্ভব ঘুমোতে যাচ্ছিল সে।

নূপুর বলল, 'এত রাত্তিরে!'

'বিশেষ দরকারে আপনার কাছে আসতে হল।'

এক পলক অমলেশের দিকে তাকিয়ে থেকে নূপুর বলল, 'আসুন—'

যে ঘর থেকে নূপুর বেরিয়েছিল, অমলেশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকল। এককোণে একটা হেরিকেন নিবু নিবু হয়ে ছিল; চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোটাকে উসকে দিল। ছোট ঘর। একধারে তক্তপোষ পাতা; তার ওপর বিছানা। আরেক ধারে বাক্স-টাক্স, আলনা, জলের কুঁজো। দেওয়ালে দেশনেতা এবং মহাপুরুষদের ছবি। একটা টেবিলকে ঘিরে দুটো ভাঙা চেয়ার চোখে পড়ল।

চেয়ার দেখিয়ে নূপুর বলল, 'বসুন।'

বসতে বসতে অমলেশ বলল, 'উনি আপনার বাবা?' জেনেশুনেই প্রশ্নটা করল সে।

নূপুর মাথা নাড়ল।

অমলেশ বলল, 'আপনাদের বাড়ি এসে আমার খুব ভয় করছিল।'

জিজ্ঞাসু চোখে নূপুর তাকাল, 'কেন?'

'এত রাত্তিরে আপনার কাছে এসেছি। উনি কী জিজ্ঞেস করবেন, কী ভাববেন, বুঝতে পারছিলাম না।'

নূপুর অদ্ভুত গলায় বলল, 'যেদিন থেকে চাকরিতে ঢুকেছি বাবা আমার সম্বন্ধে ভাবনা ছেড়ে দিয়েছে। যখন খুশি আসি, যখন খুশি বেরুই; বাবা কিছুই জিজ্ঞেস করে না। এমনকি এই যে আপনি এসেছেন, সারারাতও যদি আমার সঙ্গে গল্প করে যান, বাবা কিছুই জানতে চাইবে না।'

নূপুরের বলার ধরনটা এমন যাতে শিউরে উঠল অমলেশ।

নূপুর আবার বলল, 'যাক গে, কী দরকারে যেন এসেছিলেন—'

অমলেশ সচেতন হল। বলল, 'নীলাদেবীর জন্যে এত রাতে আসতে হল।'

নূপুর চকিত হল। পলকহীন তাকিয়ে আস্তে আস্তে শ্বাসটানার মতো শব্দ করে শুধলো, 'কী ব্যাপার বলুন তো—'

'নীলাদেবী এখনও বাড়ি ফেরেন নি।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ।'

'লাস্ট ট্রেন তো অনেকক্ষণ এসে গেছে।'

'হ্যাঁ।' অমলেশ বলতে লাগল, 'লাস্ট ট্রেনের পরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে আসছি। নীলাদেবীর মা অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

চিন্তিত মুখে নূপুর বলল, 'অস্থির হবারই কথা।'

অমলেশ বলল, 'শুনেছি নীলাদেবী আর আপনি একই অফিসে চাকরি করেন—'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তাঁর খবর দিতে পারেন বলেই ছুটে এসেছি। ওঁর মা-ই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

একটু ভেবে নূপুর বলল, 'না ফেরার কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না। রোজ লাস্ট ট্রেনে ও বাড়ি ফেরে; এক-আধদিন অবশ্য এদিক ওদিক হয়ে যায়। আমি আজ ঠিক সময়েই এসেছি। আসার সময় ওর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। নীলা ফিরবে না, এমন কিছু তো আমায় বলে নি।' একটু থেমে নূপুর আবার বলল, 'না ফেরার কারণ কী থাকতে পারে আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

'আচ্ছা—'

'কী?'

'এখান থেকে আপনাদের অফিসে ফোন টোন করে খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে?'

'না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'এত রাত্তিরে ফোন করলেও ধরছে কে?'

'তা বটে। আপনাদের অফিসের নাম আর ঠিকানা লিখে দিন। কাল একবার সেখানে যাব।'

'না না, অফিসে গিয়ে কী করবেন?' নূপুর চমকে উঠল, 'নীলা কি আর সেখানে আছে? আজ আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিল সে। তারপর কোথায় গেছে, কে জানে। বাইরে কে কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, অফিসের লোকেরা কেমন করে বলবে? তবু যখন নীলা আসে নি, ভোর হলেই আমি ফার্স্ট ট্রেন ধরে অফিসে গিয়ে খোঁজ নেব। আপনি বাড়ি ফিরে নীলার মাকে একটু সামলান।'

অফিসের নামটা নীলাও তার মাকে বলে না; নূপুরও অমলেশকে এড়িয়ে গেল।

বাকি রাতটা নীলার মা বা অমলেশ কেউ ঘুমোতে পারল না।

এক সময় সকাল হল, রোদ উঠল। বেলা যত বাড়তে লাগল ততই উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাতে লাগল নবেন্দুর মাকে। নীলা যে ফেরেনি, সে কথা তিনি এবং অমলেশ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাঁদের দু'জনকে ঘিরে চাপা অস্বস্তি আর ভয় ক্রমশ ঘন হতে লাগল।

সূর্য যখন গাছপালার মাথায় উঠে এল সেই সময় পাগলের মতো নবেন্দুর মা অমলেশকে বারান্দার এক কোণে নিয়ে বললেন, 'কী করা যায় বল তো বাবা—'

সীমাহীন দুশ্চিন্তা অমলেশকেও পেয়ে বসেছিল। সত্যিই তো, মেয়েটা গেল কোথায়? কোথায় যেতে পারে সে? নীলাকে ঘিরে বিপজ্জনক রহস্যময়তা যে ঘন হয়ে আছে, প্রথম দেখার পর থেকেই টের পেয়েছিল অমলেশ। তার কী কোনো ক্ষতি হল? যে মেয়ে রোজ লাস্ট ট্রেনের টিকেট কাটে তার যে কোনো দিন বিপদ ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। অমলেশ বলল, 'আরেকটু দেখে না হয় নূপুরদের বাড়ি আরেকবার যাব। নূপুরের তো ভোরবেলা কলকাতায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবার কথা আছে।'

নবেন্দুর মা কী বলতে যাচ্ছিলেন, উঠোনে নীলার গলা শোনা গেল, 'এই ছেলেটা, ওই—ওখানে ঝাঁকাটা রাখ—'

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরতেই অমলেশরা দেখতে পেল নীলা এবং একটি কুলিজাতীয় ছোকরা আসছে। ছোকরার মাথায় ঝাঁকাভর্তি আনাজ, মাছ, কলটল, সন্দেশের একটা বাক্স— ইত্যাদি ইত্যাদি—

ছোকরা ঝাঁকাটা নিয়ে সোজা বারান্দায় এল। আনাজপাতি সেখানেই ঢেলে নীলার কাছ থেকে ভাড়া গুনে নিয়ে চলে গেল।

সমস্ত বাড়িটাকে ঘিরে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে। হঠাৎ নবেন্দুর মায়ের কী যেন হয়ে গেল। চিৎকার করে ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে উন্মত্তের মতো আলু-পটল-মাছ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন, 'চাই না এসব ছাইপাঁশ, চাই না। আমাকে ঘুষ দিতে নিয়ে এসেছিস! এত বড় আস্পর্ধা তোর! কী ভেবেছিস নীলি, ভেবেছিস কী তুই!'

ওধারের ঘর থেকে মহীতোষের চিৎকার ভেসে এল, 'কী হল, অ্যাঁ, সকালবেলায় হল কী তোমাদের?'

কেউ সে কথার উত্তর দিল না।

উঠোন থেকে ঘরের দিকে আসতে আসতে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল নীলা। আচমকা আনাজ টানাজ ছোঁড়া বন্ধ করে দৌড়ে এসে ছোঁ মেরে তার হাত ধরলেন নবেন্দুর মা। টানতে টানতে অমলেশ যে ঘরটায় থাকে সেখানে নিয়ে গেলেন, 'আয়, তোর একদিন কি আমার একদিন।'

অমলেশকে কেউ ডাকে নি। যন্ত্রচালিতের মতো পায়ে পায়ে সেও তাদের সঙ্গে ঘরের ভেতর গেল।

নবেন্দুর মা বললেন, 'বল, সারারাত কোথায় কাটিয়ে এলি?' বলে সোজা মেয়ের চোখের দিকে তাকালেন।

'বলছি, বলছি—' যেন কিছুই হয় নি এমন সহজভাবে নীলা বলতে লাগল, 'আমার হাতটা ছেড়ে দাও মা। বড্ড লাগছে।'

'ছাড়ব না, আগে বল—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না নীলা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কলকাতায় গাড়িঘোড়ার কী অবস্থা তা তো জানো না মা। সবসময় জ্যাম হয়ে আছে। কাল আসবার সময় বড়বাজারের কাছে জ্যাম হল। এক ঘণ্টা আটকে রইলাম। তারপর যখন স্টেশনে এলাম, বীজপুরের লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। তখন কী আর করব। আমাদের অফিসের একটা মেয়ের বাড়ি চলে গেলাম।' একটু থেমে বলল, 'সমস্ত রাত ঘুমোতে পারি নি। ভোর হতেই ছুটে এসে ট্রেন ধরেছি।'

চাপা গলায় নবেন্দুর মা বললেন, 'সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ মা, সত্যি।'

'আমাকে ছুঁয়ে বল—' একটা হাতে মেয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নবেন্দুর মা। আরেকটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল অমলেশ। লক্ষ করল, নীলার চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। দ্বিধান্বিতের মত সে বলল, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?'

'বিশ্বাস আমি কাউকেই করি না।'

নীলা চুপ।

নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'কেমন করে করব? তোমরা ভাইবোনেরা বিশ্বাস করার মতো কাজ কর কী?'

নীলা নিরুত্তর।

নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'আমার গা ছুঁয়ে বল—'

অস্থিরভাবে ঠোঁট কামড়াল নীলা, অসহায়ের মতো চারদিক একবার দেখে নিল। তারপর মরিয়া হয়ে তার মায়ের হাতে আঙুল ঠেকাল, 'এই তো ছুঁয়ে বলছি। এবার বিশ্বাস হল তো?'

নবেন্দুর মা মেয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে বললেন, 'জানি না।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

অমলেশ একদৃষ্টে নীলার দিকে তাকিয়ে ছিল। যতক্ষণ মাকে দেখা যায়, নীলা দেখল। তারপর অমলেশের চোখে চোখ পড়তেই কী বুঝল কে জানে। চকিতে চোখ সরিয়ে নিয়ে এক মুহূর্তে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্যদিন নীলাকে বাড়ির কোনো কাজ করতে দেখা যায় না; হাত দিয়ে কুটোগাছটি নাড়ে না সে। আজ অমলেশ লক্ষ করল, মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরছে নীলা। তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কাজ টাজ করছে। এই হয়তো আনাজ কেটে দিল, এই মাছ কুটে দিল, এমনকি একবার বাটনাও বাটতে বসল।

এর ভেতরেই নবেন্দুর মায়ের গলা শোনা গেল, 'আজ হল কী তোর?'

নীলা বলল, 'কী হবে!'

'কোনোদিন তো এক গেলাস জল গড়িয়ে খাও না।'

'অন্যদিন অফিসের তাড়া থাকে তাই। আজ আর বেরুচ্ছি না।'

নবেন্দুর মা ঈষৎ উদ্বেগের সুরে বললেন, 'অফিসে না গেলে ক্ষতি হবে না তো?'

অমলেশ অবাক হল এই ভেবে, অফিস নিয়ে নবেন্দুর মায়ের এত ভয়, এত সংশয়, আবার সেখানে পাঠাবার জন্য ব্যগ্রতাও কম নয়।

নীলা বলল, 'আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছি।'

ছুটি! শোনামাত্র অমলেশের বুকের ভেতর চমক লাগল। ছুটি মানেই তো সারাদিন নীলার বাড়ি থাকা। বাড়ি থাকলেই সেই নিদারুণ ভয়াবহ প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

একসময় ঘরের ভেতর থেকে অমলেশ শুনতে পেল, নীলা ঝুনু আর মীনাকে বলছে, 'সিনেমা দেখবি?'

দুই বোন লাফিয়ে উঠল, 'দেখাবি দিদি, দেখাবি? রূপমহল টকিজে যা একখানা বই এসেছে না!'

নীলা বলল, 'দেখাব বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম—'

'তুই কী ভাল দিদি, তুই কী ভাল! কত দিন যে সিনেমা দেখি না।'

এরই ভেতর উত্তরের ঘর থেকে মহীতোষের গলা ভেসে এল, 'হ্যাঁ গো, ঝুনু বলে গেল নীলা নাকি গলদা চিংড়ি এনেছে!'

রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নবেন্দুর মা বললেন, 'হ্যাঁ।'

'মাথাগুলো ভাজো আর ঘি-গরম মশলা দিয়ে মাছটা রাঁধো।'

'আচ্ছা।'

'ঝুনু বলছিল, রুই মাছও নাকি এনেছে—'

'হ্যাঁ।'

'রুইটা কালিয়া কর।'

'আচ্ছা।'

'বেশ যত্ন করে রেঁধো। অনেকদিন তো ভালোমন্দ রাঁধার অভ্যেস নেই। দেখো জিনিসগুলো নষ্ট না হয়।'

'তোমাকে ভাবতে হবে না; যত্ন করেই রাঁধব।'

কাল সমস্ত রাত এবং আজ সকাল বেলাতেও যে দমবন্ধ-করা থমথমে ভাব ছিল, এমন কি নীলা ফিরে আসার পরও যে উত্তেজনার স্রোত বইছিল, এখন আর তা নেই। সারা বাড়ি ঘিরে মধুর আবহাওয়া নেমে এসেছে।

অমলেশের কিন্তু মনে হচ্ছিল, নীলা মেয়েটা অত্যন্ত চতুর। শ দেড় দুই টাকা খরচ আর মায়েব কাজে সামান্য একটু সাহায্য করে নিমেষে সবাইকে জয় করে নিয়েছে সে।

মাত্র দেড় দু'শ'টা টাকা!

কুড়ি

কাজের ফাঁকে একবার দু কাপ চা নিয়ে অমলেশের ঘরে এল নীলা। এক কাপ তার জন্য, আরেক কাপ অমলেশের।

টেবিলে কাপ রেখে মোড়া টেনে অদূরে বসল নীলা। প্রথম দিনটি থেকেই অমলেশ লক্ষ করেছে, নীলা ওভাবে মোড়া টেনে নিচে বসে।

চোখাচোখি হতেই নীলা হাসল, 'আমি কিরকম অন্তর্যামী বলুন তো—'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল অমলেশ।

নীলা বলল, 'আপনার কি মনে হচ্ছিল না, এই মুহূর্তে এক কাপ চা পেলে ভাল হয়?'

অমলেশ বলল, 'তা হচ্ছিল।'

'আজ রান্না হতে দেরি হবে। তাই চা করে নিয়ে, এক মিনিট,—দাঁড়ান, মাছের তেলের বড়া ভাজছে মা, ক'টা নিয়ে আসি।'

'না না, বড়া লাগবে না। শুধু চায়েই চলবে।'

'লজ্জা করছেন কেন? চায়ের সঙ্গে গরম গরম ভালই লাগবে।'

অমলেশ কিছুটা অবাকই হচ্ছিল। নীলাকে এভাবে হাসতে বা এমন হালকা সুরে কথা বলতে আগে কখনও শোনে নি।

নীলা বড়া নিয়ে এল। খেতে খেতে বলল, 'জানেন, আজ আর অফিস যাচ্ছি না।' আগেই শুনেছিল অমলেশ; উত্তর দিল না।

নীলা আবার বলল, 'আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয় নি। ভাবছি আজ জমিয়ে গল্প করব।'

আড়ষ্ট সুরে অমলেশ বলল, 'বেশ তো।'

অমলেশের মুখের ভাব লক্ষ করে নীলা বলল, 'আপনার যেন আপত্তি আছে মনে হচ্ছে।'

'না না, আপত্তি কিসের—' চমকে উঠে তাড়াতাড়ি হাসতে চেষ্টা করল অমলেশ।

একটু চুপচাপ।

তারপর নীলা বলল, 'দুপুর নাগাদ বেরিয়ে যাই। ফিরি মাঝরাতে। এসে সেই যে শুয়ে পড়ি, উঠতে উঠতে দশটা। তক্ষুনি চান করে খেয়ে দেয়ে আবার ছোটার তাড়া। আপনি এসেছেন, একটু গল্প যে করব, আপনার সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর দেব, তার উপায় নেই।'

অমলেশ বলল, 'সে জন্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না। মাসিমা-ঝুনু-মীনা, সবাই আমার দিকে নজর রেখেছে।'

'তা হলে তো সুখেই আছেন।'

'নিশ্চয়ই।'

কিছুক্ষণ ভেবে নীলা বলল, 'আমাদের বীজপুর শহরটা ঘুরেটুরে দেখেছেন?'

'একটু আধটু দেখেছি। সেদিন ঝুনু মীনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম; ওরা যা দেখিয়েছে—'

'আমি বাড়ি থাকি না; থাকলে দেখাতে পারতাম। ওবেলা যদি বৃষ্টি টৃষ্টি না হয়, বেরুবেন নাকি?'

অমলেশকে নিয়ে কোথায় যেতে চায় নীলা? উদ্দেশ্য কী মেয়েটার? যা-ই থাক, একটা ব্যাপারে অমলেশ বেশ নিশ্চিন্ত হতে পারছিল, অনেকখানি দুর্ভাবনাশূন্য। নবেন্দুর কথা নীলা তুলছে না।

অমলেশ কিছু বলবার আগেই নীলা আবার শুরু করল, 'ওবেলার কথা ওবেলা হবে। এখন সেই কথাটা সেরে নিই—'

কী কথা বুঝতে পেরেছে অমলেশ। নাঃ, নীলার হাত থেকে রেহাই নেই। অনিবার্য নিয়তির মতো নবেন্দুর প্রসঙ্গ যেখানে থেকেই হোক সে টেনে আনবেই। একটু আগে যা ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল অমলেশ সেই দুশ্চিন্তাটাই তাকে আবার নিদারুণভাবে পেয়ে বসল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে অমলেশ মরিয়ার মতো বলল, 'আমার একটা কথা বলার আছে।'

'কী?'

'ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?'

'আপনার কি ধারণা আমি মিথ্যে বলি?'

নীলার চোখে চোখ রেখে অমলেশ বলল, 'আমার সঙ্গে এখনও বলেন নি। তবে—'

'কী?'

'কারো কারো সঙ্গে বলেন—'

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে গেল নীলার।

অমলেশ বলল, 'ধরুন, মাসিমার সঙ্গে—'

'মায়ের সঙ্গে আমি মিথ্যে বলি!'

'বলেন বৈকি।'

'কখন বলেছি?'

'আজই। কলকাতা থেকে ফিরে এসে—'

দাঁত বসিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে রক্তাক্ত করতে করতে নীলা বলল, 'কিরকম?'

অমলেশ বলল, 'কাল রাত্তিরে না ফেরার যে কৈফিয়তটা মাসিমাকে দিয়েছেন সেটা ঠিক নয়।'

'আপনি কি বলতে চান, কাল রাত্তিরে আমি আমার বন্ধুর বাড়ি থাকি নি?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল অমলেশ। অর্থাৎ তা-ই।

তীক্ষ্ণ গলায় নীলা বলল, 'আপনাকে এ খবরটা কে দিলে?'

'আপনি নিজে।'

'আমি!'

'হ্যাঁ, আপনি—' 'অমলেশ বলতে লাগল, 'আপনার চোখমুখ, আপনার গলার স্বর, এসব বুঝিয়ে দিয়েছে আপনি ঠিক বলছেন না।'

অমলেশ টের পেল, মেয়েটা ফাঁদে পড়ে গেছে। তার চোখমুখের চেহারাই গেছে বদলে। কিছু বলতে চেষ্টা করল নীলা, গলায় স্বর ফুটল না, ঠোঁট দুটো থর থর করল মাত্র।

গলা নামিয়ে অমলেশ ফিসফিস করল, 'কোথায় ছিলেন কাল?'

নীলা হঠাৎ উঠে পড়ল। অস্থিরভাবে পা ফেলে চৌকো চৌকো ঘর-কাটা সেই জানালাটার কাছে গিয়ে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

হাতে একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে অমলেশ। নবেন্দুর প্রসঙ্গ এটা দিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পায়ে পায়ে নীলার কাছে গেল অমলেশ। আগের সুরেই আবার বলল, 'কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলেন?'

নীলা উত্তর দেবার আগেই বাইরে থেকে নবেন্দুর মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নীলা অমলেশকে চান করে নিতে বল। তোরাও চান টান কর নে। আমার রান্না শেষ হয়ে এসেছে।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল নীলা। নিচু গলায় বলল, 'চান করে নিন।' বলে আর দাঁড়াল না; খানিক ঝুঁকে বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

খেতে বসে অমলেশ লক্ষ করল, তার দিকে একেবারেই তাকাচ্ছে না নীলা। এ ক'দিন অমলেশও তার দিকে তাকাতে পারে নি। নবেন্দুর ব্যাপারে তার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

অমলেশের দিকে তাকাচ্ছে না কিন্তু বোনেদের সঙ্গে খুনসুটি চালিয়ে যাচ্ছে নীলা। ঝুনু এবং মীনাকে কথায় কথায় অন্যমনস্ক করে তাদের পাত থেকে ছোঁ মেরে মাছ টাছ তুলে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, কান্নাকাটি, মাকে সালিশি মানা—

নবেন্দুর মা হেসে হেসে বলেন, 'দে না বাপু, দিয়ে দে। কেন ওদের খ্যাপাচ্ছিস?' তারপর অমলেশের দিকে ফিরে বললেন, 'ছেলেবেলা থেকে ওর এই স্বভাব, ছোট ভাইবোনদের পেছনে লাগা—'

হঠাৎ কী মনে পড়তে নবেন্দুর মা বিষণ্ণ সুরে বলে ওঠেন, 'এত রান্নাটান্না হল, অথচ সেই বাঁদর দুটো বাড়ি নেই।'

অমলেশের মনে পড়ল, নিতু সেই যে চলে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। হীরুর দেখা তো আজও পায় নি সে।

একটু নীরবতা।

তারপরই ঝুনুই বলে উঠল, 'দিদি, সেই কথাটা মনে আছে?'

নীলা বলল, 'কোন কথাটা রে?'

'আমাদের সিনেমা দেখাবি বলেছিলি—'

'নিশ্চয়ই মনে আছে।'

হঠাৎ মীনা বলে উঠল, 'শুধু আমরা যাব? অমলদাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না—'

নবেন্দুর মা এই সময় বলে উঠলেন, 'সেই ভাল, ওদের সঙ্গে তোরাও যা। একলা তো ওদের কোথাও ছাড়ি না—'

নীলা কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল। বাইরের উঠোন থেকে তীক্ষ্ণ গলায় ডাক ভেসে এল, 'নীলাদি—মাসিমা—'

খাওয়া আধাআধির মতো হয়েছে। নীলা চমকে উঠল, 'কে?' বলেই তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেল। নবেন্দুর মা-ও তার পিছু পিছু ছুটলেন।

ঝুনু বলল, 'নিশ্চয়ই নন্টে—'

অমলেশ শুধলো, 'নন্টে কে?'

'মেজদার বন্ধু—'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অমলেশও উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। একটা বাইশ তেইশ বছরের ওস্তাদ ছোকরাকে ঘিরে নীলা আর নবেন্দুর মা দাঁড়িয়ে আছে। নীলা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করছে, 'বুকটা কি একেবারে পুড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ নীলাদি—' নন্টে বলল, 'বাঁ হাতের দুটো আঙুলও উড়ে গেছে।'

'হীরু এখন কোথায়?'

'লোটনদের গোয়াল ঘরে এনে রেখেছি। হাসপাতালে পাঠালে জানাজানি হয়ে যাবে; আবার পুলিশের ঝামেলা আছে। তাই আপনাকে ডাকতে ছুটে এলাম। যা হয় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।'

নবেন্দুর মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। অমলেশ লক্ষ করল, তাঁর চোখে দুটো ফেটে যেন রক্তের ফোয়ারা ছুটবে। ঠোঁট অসহ্য কষ্টে, আশঙ্কায় থরথর করছে।

ওদিকের ঘর থেকে বিকৃত ভাঙা গলায় মহীতোষ সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'কী হয়েছে? অ্যাঁ, হয়েছে কী? কে যেন এল—আমার কাছে নিয়ে এস।'

নীলা চেঁচিয়ে বলল, 'কিছু হয় নি। আপনি রুগী মানুষ, চুপচাপ শুয়ে থাকুন না।'

'হয় নি বললেই হল, নিশ্চয়ই হয়েছে। তোরা আমাকে না জানিয়ে কত কী করছিস! কে এল, তাকে নিয়ে আয়—'

বিরক্ত সুরে নীলা বলল, 'যা-ই হোক, আপনাকে অস্থির হতে হবে না। চেঁচাবেন না। সব ব্যাপার আপনার জানবার দরকার নেই।'

মহীতোষের ভাঙা গলা কিন্তু থামল না, 'আমাকে জানাতে হবে না? বিছানায় পড়েছি বলে কি একেবারে বাতিল হয়ে গেছি? ভেবেছিস কি তোরা, অ্যাঁ, কী ভেবেছিস?'

নীলা সেদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না। সেই ছেলেটাকে বলল, 'তুই একটু দাঁড়া নন্টে, আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে।' মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও তো—'

এতক্ষণে কথা বললেন নবেন্দুর মা, 'টাকা কোথায়?'

'কেন, অমলেশবাবুর হাত দিয়ে দাদা অতগুলো টাকা পাঠাল।' বলে কেমন করে অমলেশের দিকে তাকাল নীলা।

'মোটে দেড়শ টাকা। ধার দেনা কিছু কিছু দিয়ে আর এক মাসের চাল কিনেই তো শেষ হয়ে গেছে। পনের কুড়িটা টাকা পড়ে আছে।'

'তা হলে উপায়?'

হঠাৎ রেগে উঠলেন নবেন্দুর মা, 'বড় মানষি চাল দেখিয়ে অতগুলো বাজার করে তো আনলি। ওই টাকাগুলো থাকলেও এই সময় কাজে লাগত। মরুক, আপদ মরুক।'

নীলা অসহায় সুরে বলল, 'এখন আমি কী করি?'

'মরবে মরবে, এই যমের অরুচিগুলো নিজেরাও মরবে। আমাকেও মারবে। কী অদৃষ্ট নিয়ে যে পৃথিবীতে এসেছিলাম!'

হঠাৎ অমলেশের কী হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ভাববেন না। চলুন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি—'

'কিন্তু—' বলেই নীলা থমকে গেল।

'কী?'

'টাকা—

'বললাম তো চিন্তার কিছু নেই।'

এঁটো হাত ধুয়ে নীলা এবং অমলেশ দু'জনে নন্টের সঙ্গে ছুটল। যেতে যেতে অমলেশ বলল, 'কার হাতের আঙুল উড়ে গেছে?'

'হীরুর। আমার মেজ ভাই।'

'উড়ল কী করে?'

নন্টেই এবার জবাব দিল, 'বোমা বাঁধতে গিয়ে।'

'বোমা!'

'হ্যাঁ। দিনকয়েক পর জলসা আছে। বিবিবাজারের ছোঁড়ারা সেদিন রোয়াব দেখিয়ে গেছে, জলসা করতে দেবে না। তাই আমরা তৈরি হচ্ছিলাম—'

নীলা বলল, 'দাদাকেই যা একটু ভয় করত হীরুটা। দাদা বোম্বাই যাবার পর আর কাউকে গ্রাহ্য করে না। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। এখানে গুণ্ডামি, ওখানে ছেনতাই, সেখানে বোমাবাজি—'

লোটনদের গোয়াল ঘরে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় যে ছোকরা পড়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে চমক লাগল অমলেশের। এই তবে হীরু! এই ছোকরাই তার রিকশায় চড়ে সেদিন বাজারের দিকে গিয়েছিল। একেই চাঁদার ব্যাপারে চড় কষিয়েছিল অমলেশ।

ছোকরার জ্ঞান ছিল, নীলার সঙ্গে অমলেশকে দেখে চকিত হল। নীলাকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভদ্রলোক কে রে দিদি?'

'অমলেশ বসু; দাদার বন্ধু।' নীলা বলল।

তারপর হীরুর ব্যবস্থা করা হল। বোমা বাঁধতে গিয়ে আঙুল উড়িয়েছে। কাজেই পুলিশে যাতে জানাজানি না হয়, সে জন্য এখানে ওখানে নগদ কিছু গুঁজে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সব চুকিয়ে অমলেশরা যখন বাড়ি ফিরল, বেশ রাত হয়েছে। আজও তার পালানো হল না।

বাড়িতে পা দিয়েই শুনতে পাওয়া গেল মহীতোষ চেঁচাচ্ছেন, 'এ বাড়িতে আমাকে আবর্জনার মতো এককোণে ফেলে রেখেছে। যেদিন থেকে বিছানায় পড়েছি, কেউ কেয়ার করে না। আসলে পয়সার সঙ্গেই সব সম্পর্ক। ছেলেমেয়েগুলো কী করছে জানি না। আমার মন বলে সাংঘাতিক কিছু করছে।' বলতে বলতে গলার স্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগল, 'ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের মতো আমি পড়ে আছি—'

সেই দুপুর থেকেই ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছেন নাকি?

একুশ

রাত্রিবেলা ফিরে এসে কারো সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা হল না। নবেন্দুর মা শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে ছিলেন। হীরুর কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাঁকে সংক্ষেপে জানালো অমলেশ। তারপর রাত আরেকটু বাড়লে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা রান্নাবান্না এবং সংসারের নানা কাজের ফাঁকে নবেন্দুর মা একবার এসে অমলেশকে বললেন, 'সেই কথাটা মনে আছে তো বাবা?'

অমলেশ জানতে চাইল, 'কোনটা মাসিমা?'

'সেই যে কাল বলেছিলাম—'

এবার মনে পড়ে গেল অমলেশের, 'নীলাদেবীর অফিস সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে হবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই মনে আছে। আজই খোঁজ নেব।'

সকালবেলায় চা খাওয়া, খবরের কাগজ পড়া (অমলেশ আসার পর রোজ একখানা খবরের কাগজ কিনে আনা হয়। সে আপত্তি করেছিল, নবেন্দুর মা শোনেন নি)—এ সবের মধ্যে ঝুনু মীনার সঙ্গে সাধারণ দু একটা কথা হয়েছে। এক সময় কানে এল সেই ছোকরার গলা। অর্থাৎ নিতু। আজ দিন দুই পর সে বাড়ি ফিরল। কান খাড়া করল অমলেশ।

নিতু চাপা গলা বলছে, 'বোম্বাইকা বাবু এখনও আছে রে?'

ঝুনু বলল, 'আছে।'

'আর কদ্দিন থাকবে?'

'যে ক'দিন খুশি, তাতে তোর কি রে গুণ্ডা?'

'মনে হচ্ছে, বেশ চেপে বসেছে। সহজে স্টেশন ছাড়বে না।'

এবার আর ঝুনুর কথা শুনতে পাওয়া গেল না। তার আগেই নবেন্দুর মায়ের চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'দু দিন কোথায় ছিলি বাঁদর?'

নিতু বলল, 'আমার এক বন্ধুর বাড়ি।'

'যা, জামাকাপড় যা আছে সব নিয়ে বন্ধুর বাড়িই থাক গিয়ে। এখানে আর আসতে হবে না।'

নিতু উত্তর দিল না।

নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'বন্ধুর বাড়িতে আর গিলতে দিলে না?'

এবার নিতু চিৎকার করে বলল, 'কেন দেবে না? যে ক'দিন ইচ্ছে আমি ওখানে থাকতে পারি।'

'তাই থাক গিয়ে। আমার হাড় জুড়োক।'

ঘরের মাঝখান থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অমলেশ।

নিতু বলল, 'তাই যাব। এ বাড়িতে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। এটা একটা খোঁয়াড়—' বলল বটে যাবে কিন্তু যাবার লক্ষণ দেখা গেল না।

নবেন্দুর মা আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, অমলেশ ডাকল, 'নিতু—'

তার দিকে তাকিয়ে যুগপৎ চকিত এবং বিরক্ত হল নিতু। দুর্বিনীত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

নরম গলায় অমলেশ বলল, 'শোন—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাছে এল নীতু।

তার কাঁধে একখানা হাত রেখে ভেতরে এনে বসাল অমলেশ। ঘাড় গোঁজ করে থাকল নিতু। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে অমলেশ বলল, 'এটা কিন্তু ঠিক না—'

অমলেশের দিকে না তাকিয়েই নিতু বলল, 'কোনটা?'

ছেলেটাকে সেদিন বকেছে অমলেশ, তার ইচ্ছা হল, সন্ধি করে নেবে। বলল, 'এই বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া কর, মায়ের সঙ্গে তর্ক কর, দু তিন দিন বাড়িতেই থাকলে না—'.

বাধা দিয়ে উত্তপ্ত কটু গলায় নিতু বলল, 'দেখুন স্যার, জ্ঞান দেওয়া আমার ভাল লাগে না। দুটো টাকা সেদিন দিয়েছিলেন বলে এত অ্যাডভাইস ঝাড়বেন, তা চলবে না। আমি আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেব—'

অমলেশ টের পাচ্ছে, তার কান লাল হয়ে উঠেছে। অপমানটা খানিক হজম করে বলল, 'বেশ, ঝগড়া-টগড়া-বখামি যা তোমার ইচ্ছে করো। আজ হোক, কাল হোক, আমি চলে যাব। তোমার ভালর জন্যই ওই কথাগুলো বলছিলাম।'

'ভাল ভাল বাত সব্বাই ঝাড়তে পারে।'

'যা বলেছ।' রাগ এবং অপমানের ভাবটা ঝেড়ে ফেলে কৌতুকের সুরে অমলেশ বলল, 'কিন্তু ভাই, একটা কথা শুনেছ?'

ঝাঁঝাল গলায় নিতু বলল, 'কী?'

'হীরু অ্যাকসিডেন্ট করে আঙুল উড়িয়েছে।'

'মোয়া বাঁধতে গেল ওই রকম আঙুল টাঙুল ওড়েই। কত লোকের হাত পর্যন্ত উড়ে যায়।' তাচ্ছিল্যের গলায় নিতু বলল।

অমলেশ বলল, 'রাইট রাইট। ভাল কাজে এক আধটা হাত-পা উড়ে গেলে কী এমন হয়।' তারপরেই গলাটা খাদে নামিয়ে দিল, 'তবে—'

'কী'

'পুলিশ বড্ড খোঁজাখুঁজি করছে—'

এবার চমকে গেল নিতু, 'কাকে, কাকে?'

'হীরুকে। আর—'

'আর কাকে?'

'তোমাকে।'

নিতুর অবস্থা অবর্ণনীয়। খুব ভয় পেয়ে গেছে সে। বলল, 'আমাকে—আমাকে কেন? আমি তো বোমা বাঁধিনি।'

অমলেশ বলল, 'বাঁধতে বসেছিলে কিনা, আমি কেমন করে জানব। সে কথা পুলিশকে বলো—' একটু থেমে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলল, 'হীরুকে যাতে পুলিশ না ধরে তার ব্যবস্থা করেছি। তবে তোমাকে বোধহয় ওরা ছাড়বে না।'

নিতু শ্বাসরুদ্ধের মতো শুধলো, 'মেজদার কী ব্যবস্থা করেছেন?'

চোখের তারায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ফুটিয়ে আঙুল দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করল অমলেশ, 'এই দিয়ে মুখ চাপা দিয়েছি।'

মুখ থেকে সব রক্ত যেন পরতে পরতে নেমে গেল নিতুর। আগেই অমলেশ বুঝেছে, ছেলেটা এখনও বাঁদরামির ব্যাপারে পাকা হয় নি। পুলিশ সম্বন্ধে এখনও তার খুবই ভয়। সে বলল, 'আমার কী হবে?'

'কী আবার হবে, পুলিশ এল বলে। শুনেছি থানায় নিয়ে খুব মারে।'

'খুব?'

'হুঁ—' অমলেশ ঘাড় কাত করল, 'ডাণ্ডা দিয়ে ঠেঙায়, সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে লোটা দিয়ে পেটে, বোতলে জল পুরে গাঁটে গাঁটে দুরমুশ করে। নাকের ভেতর ফুটন্ত জল ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দ্যায়—'

শুনতে শুনতে নিতুর চোখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগল।

তার দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে অমলেশ আবার বলল, 'আমি তোমাকে বাঁচিয়েও দিতে পারি। তবে—'

'কী?'

'আমার কথামতো তোমাকে চলতে হবে।'

আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে করুণ চোখে তাকাল ছোকরা। অর্থাৎ অমলেশ যা বলবে সেইভাবেই চলতে সে রাজি।

অমলেশ বলল, 'দরকার না হলে বাড়ি থেকে একদম বেরুবে না। বাজে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারা ছাড়তে হবে। তিন নম্বর হল, আবার পড়াশোনা করতে হবে।'

'কিন্তু—'

'বল—'

'মাইনে অনেক বাকি। আমি আর স্কুলে যেতে পারব না।'

'স্কুলে না-ই গেলে, প্রাইভেটে পরীক্ষা দাও।'

নিতু উত্তর দিল না।

অমলেশ বুঝল, সে ভাবছে। এখন বেশি চাপ দিলে ফল খুব ভাল না-ও হতে পারে। বলল, 'এক্ষুনি কিচ্ছু বলতে হবে না। আজকের দিনটা ভাল করে ভাবো।'

খানিক পর নিতু চলে গেলে দরজার কাছে দাঁড়াল নীলা। ইতিমধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছে সে। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আমাকে আজ তাড়াতাড়ি বেরুতে হচ্ছে। ফিরে এসে বলব, পরশু রাতটা কোথায় কাটিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তরটাও কিন্তু তখন চাই।' বলেই সরে গেল সে।

নীলা চলে যাবার পর নবেন্দুর মা এলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'ও কিন্তু এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে।'

ইঙ্গিতটা বুঝল অমলেশ। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল সে। নবেন্দুর মা বললেন 'ভাত দিই?'

অমলেশ দেখল, ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে পোশাক পালটে ফেলেছে নীলা। খেতে বসলে আর তাকে ধরা যাবে না। বলল, 'এখন ওসব থাক মাসিমা। আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।'

'চান টান করে একেবারে শুধু মুখে যাবে বাবা?'

'খেতে বসলে নীলাদেবীকে আর ধরতে পারব ন। ওর পিছু পিছু না গেলে অফিসের খোঁজ পাব কী করে?'

'তবে একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে যাও। 'নবেন্দুর মা ছুটে গিয়ে পেতলের রেকাবে চিনি আর এক গেলাস জল নিয়ে এলেন। খেতে খেতে অমলেশ চোখ রাখল জানালার বাইরে।

একটু পর নীলার গলা পাওয়া গেল, 'যাচ্ছি মা।'

নবেন্দুর মা প্রতিদিনের মতো বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করো।'

নীলা চলে গেল। খানিক পরে জানালার বাইরে তাকে দেখতে পেল অমলেশ। সামনের সরু পথটা দিয়ে একসময় বড় রাস্তার দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অমলেশ আর দেরি করল না। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বড় রাস্তায় এসে দেখল, বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে নীলা। তার দিকে চোখ রেখে মাঝখানে দূরত্ব রেখে ধীরে ধীরে অনুসরণ করতে লাগল।

নবেন্দুর মায়ের কথাতেই না, নীলার সম্বন্ধে অমলেশের নিজেরও দুর্বার কৌতূহল ছিল। দুপুরবেলা মেয়েটা কোথায় বেরিয়ে যায়, সারাদিন কী করে, মাঝরাতে কোত্থেকে ফেরে, কেনই বা তার পেছনে পুলিশ লাগে—এ সব প্রশ্নের একটাও উত্তর পাওয়া যায় নি।

অমোঘ নিয়তির মতো আগে আগে চলছে নীলা; অমলেশ তার পেছন পেছন যাচ্ছে। ওর সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে কী দেখবে, কে জানে।

নীলা সোজা স্টেশনের দিকে গেল না। বাঁদিকে বেঁকে নূপুরদের বাড়ি গিয়ে ঢুকল। মাঝখানের সেই দূরত্বটা বজায় রেখে অমলেশ একটা বাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট কুড়ি পর নীলা আর নূপুর বেরিয়ে এল। অমলেশ অবাক হয়ে দেখল, নীলার গায়ে সেই সাধারণ আটপৌরে পোশাক নেই। তার বদলে প্রথম দিনের দেখা সেই দামি শাড়ি, ব্লাউজ। গালে রুজ, ঠোঁটে চড়া রং, কপালে টিপ।

এতদিনে রহস্যটা পরিষ্কার হল। বাড়ি থেকে সামান্য বেশবাসে বেরিয়ে নূপুরদের বাড়ি গিয়ে তা বদলে নেয় নীলা।

নূপুর নীলা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। অমলেশ আরেকটু আড়ালে সরে গেল। তারপর ওরা অনেকখানি চলে গেলে, বেরিয়ে এল।

নীলাদের পিছু পিছু এবার স্টেশনে। খুব সম্ভব, ওদের মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা আছে। নীলারা সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

বটতলায় রিকশা স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। তারপর দ্বিতীয় ঘণ্টিটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল, 'একটা কলকাতার টিকিট দিন—'

টিকিট আর খুচরো পয়সা নিতে নিতে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি এখনও আছেন নাকি?'

'আছি—'

'কী ব্যাপার, সেদিনই না চলে যাবেন বলেছিলেন—'

'যাওয়া হল না।'

'কেন?'

'পরে বলব। এখন সময় নেই।'

'আরে মশাই, থার্ড বেল পড়তে এখনও দেরি আছে। দেখলাম সেই ছুঁড়িটা তার এক বন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।'

'কার কথা বলছেন?'

'মহীতোষ চাটুজ্জের মেয়ে—নীলা। যাদের বড়ি আপনি আছেন।' বলতে বলতে গলা নিচু করলেন স্টেশন মাস্টার, 'এক গাড়িতেই কলকাতা চললেন। ব্যাপারখানা কী মশাই—'

'পরে বলব—' ছুটতে ছুটতে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় গিয়ে উঠল অমলেশ। একটু পর ট্রেন ছেড়ে দিল।

এক একটা স্টেশন আসে। জানালার বাইরে গলা বাড়িয়ে অমলেশ লক্ষ রাখে, নূপুরেরা কেউ নেমে গেল কিনা। কিন্তু না, কেউ নামছে না।

একসময় একটা বড় জংশন স্টেশনে গাড়িটা থামল। ওধারের প্লাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল।

চোখের পাতা টান করে অমলেশ বাইরে তাকিয়ে আছে। প্লাটফর্মে ঘন্টির পর ঘন্টি বেজে যাচ্ছিল। কোন ট্রেনের ঘন্টি কে জানে।

হঠাৎ অমলেশ দেখতে পেল, এই ট্রেনটা থেকে নেমে নীলা ওধারের ট্রেনটায় গিয়ে উঠল।

অমলেশ কী করবে, প্রথমটা ঠিক করে উঠতে পারল না। বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ বসে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শ্বাসরোধী এক কৌতূহল নাকে বঁড়শি আটকে তাকে যেন টানতে লাগল। এতদূর এসে নীলাকে হারিয়ে ফেললে তার চাইতে বড় ব্যর্থতার কারণ আর কিছু হতে পারে না।

গাড়ির কামরায় দারুণ ভিড়। তাড়াতাড়ি যে অমলেশ নামবে, তার পথ বন্ধ। কোনোরকমে ভিড় ঠেলে যখন অমলেশ প্ল্যাটফর্মে নামল, ওধারের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। ছুটে গিয়েও সেটা ধরা গেল না।

হতাশ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার এধারের ট্রেনে ফিরে এল অমলেশ।

•

বীজপুর লোকাল যখন হাওড়ায় পৌঁছুল তখন বিকেল। গাড়ি থেকে নেমে জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে অমলেশ বাইরে বেরিয়ে এল।

এতক্ষণ নীলার কথাই ভেবেছে সে, হঠাৎ নূপুরের কথা মনে পড়ে গেল তার। নূপুর জংশন স্টেশনে নামে নি। হয়তো কলকাতা পর্যন্ত এসেছে। তার পিছু নিলেও নীলার ব্যাপারটা জানা যেতে পারে। কিন্তু এখন কোথায় তাকে পাওয়া যায়? ট্রাম-বাস লরি-ট্যাক্সি আর মানুষ, সব মিলিয়ে অরণ্যের মতো এই জটিল বিশাল মহানগরে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বাইরে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। ভাবল, কী হবে নীলাদের কথা ভেবে? কী হবে তাদের পিছু ছুটে? প্রয়োজনটাই বা কী? বাঞ্ছিত মুক্তি যখন হাতে চলে এসেছে, তখন পালানো যাক।

চারদিন হল, অমলেশ বাংলাদেশে এসেছে। মধ্য কলকাতার এক হোটেলে বাক্স-বিছানা রেখে সেই যে বীজপুরে ছুটেছিল, আর সেদিকে যেতে পারে নি। একবার সেখানে যাওয়া উচিত।

যে হোটেলে অমলেশ উঠেছিল সেটা মাঝারি গোছের। সেখানে এসে পৌঁছুতেই ম্যানেজার বলল, 'একদিনের নাম করে গেলেন। দেখতে দেখতে চারদিন কেটে গেল। আমি কিন্তু খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

অমলেশ অল্প হাসল, 'বিশেষ একটা দরকারে আটকে গিয়েছিলাম। তাই—'

'যাক গে, চান-খাওয়া হয়ে গেছে?'

'চান হয়েছে। খাওয়া হয় নি।'

'আপনি নিজের ঘরে যান। ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

খাওয়া দাওয়া সেরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসল অমলেশ। একটা চিঠিই বরং লেখা যাক। নবেন্দুর মায়ের নামে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদটা লিখেও ফেলল সে। তারপর সুটকেসটা হাতড়াতে লাগল। না, এনভেলপ নেই। ম্যানেজারের কাছেও পাওয়া গেল না। অগত্যা পকেটেই ভাঁজ করে চিঠিটা রেখে দিল অমলেশ। পরে সুবিধেমতো পোর্স্ট করে দেবে।

চিঠি লিখবার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাইরে আকাশের দিকে এখন তাকিয়ে আছে অমলেশ। আজ তেমন মেঘ নেই। মাজা মাজা নীল রঙে ডুব দিয়ে ক'টা পাখি উড়ছিল।

বিকেলের রোদ ঘন হয়ে এসেছে। পাখি আর আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ অমলেশের মনে পড়ে গেল, সন্ধে নাগাদ বোম্বাইয়ের ট্রেন। কলকাতায় পড়ে থেকে আর কী হবে?

মনে পড়া মাত্র তাড়াতাড়ি উঠে জামা টামা পরে নিচে ম্যানেজারের ঘরে এল অমলেশ। বলল, 'আপনার কাছে টাইমটেবল আছে?'

ম্যানেজার বলল, 'আছে।'

'দেখুন তো বম্বে মেল ক'টায়?'

টাইম টেবল দেখে ম্যানেজার বলল, 'সাড়ে ছ'টায়।'

'আমার বিলটা করে দিন।'

'আজই চলে যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু টিকিট কাটা হয়েছে?'

'না।'

'রিজার্ভেশান ছাড়া যেতে পারবেন?'

'দেখি ঠেলে ঠুলে যেতে পারি কিনা।' অমলেশ হাসল।

ম্যানেজারও হাসল, 'দেখুন।'

সন্ধের খানিক আগে বিল মিটিয়ে ট্যাক্সি করে হাওড়া চলে এল অমলেশ। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে মালপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে বোম্বাইয়ের টিকিট কাউন্টারের কাছে আসতেই হঠাৎ মাইকে ঘোষিকার কণ্ঠ ভেসে এল, 'বীজপুর লোকাল আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছ'টা বেজে দশ মিনিটে ছাড়বে।' তারপর হিন্দি এবং ইংরেজিতে সেই ঘোষণা চলতে লাগল।

অমলেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বীজপুর—বীজপুর—বীজপুর! চকিতের জন্য মনে পড়ে গেল—সেই টিনের বাড়িটা, একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে পক্ষাঘাতে পঙ্গু একটি মানুষ পড়ে আছেন, হীরু—নিতু—মীনা—ঝুনু আর নিয়ত-অস্থির নিয়ত-উৎকণ্ঠ নবেন্দুর মা। নবেন্দুর মাকে কথা দিয়ে এসেছিল অমলেশ, তাঁর মেয়ের চাকরির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে জানাবে। কিন্তু তার আগেই পালিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। তারপর সব ভাবনা একধারে সরিয়ে টিকিট-কাউন্টারের দিকে আবার যখন পা বাড়াল তখন সেই ঘোষণা আবার কানে এল, 'বীজপুর লোকাল ছ'টা বেজে—'

ঘোষণাটা অমলেশের অস্তিত্বের ভেতর এবার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিল যেন। এই সময় কুলিটা তাড়া দিল, 'চলিয়ে সাব—'

অমলেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ভেতর থেকে কেউ যেন চাপা গলায় বলল, 'এখন আর তুমি পালাতে পার না, পার না।' তারপর সেই অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যেন ধাক্কা দিতে দিতে অমলেশকে বীজপুরের টিকিট কাউন্টারের দিকে নিয়ে গেল।

বোম্বাইয়ের বদলে কখন যে বীজপুরের টিকিট কিনে বসেছে অমলেশ, আর কখন গেট পেরিয়ে বীজপুরের ট্রেনটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, নিজেরই খেয়াল নেই।

কামরাগুলো ভর্তি। কুলিটাকে সঙ্গে নিয়ে ওরই ভেতর একটু ফাঁকা দেখে উঠবে বলে ছোটাছুটি করছে, হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'অমলেশবাবু—অমলেশবাবু—'

থমকে দাঁড়িয়ে এদিকে সেদিক তাকাতেই অমলেশের চোখে পড়ল, ট্রেনের কামরায় জানালার ধার ঘেঁষে নীলার বন্ধু নূপুর বসে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসল সে, তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কাছে আসতেই মেয়েটা বলল, 'বীজপুর যাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'উঠুন—উঠুন—'

এ কামরায় ভিড় থাকলেও দাঁড়াবার জায়গা আছে। চাই কি, প্যাসেঞ্জাররা সদয় হয়ে একটু চেপে বসলে, অমলেশেরও বসবার জায়গা হয়ে যেতে পারে।

নূপুর তাড়া লাগাল, 'কী হল, উঠে পড়ুন। গাড়ি ছাড়তে কিন্তু দেরি নেই।'

একরকম জোর করেই মেয়েটা অমলেশকে তার কামরায় তুলল। এমনকি খানিক সরে গিয়ে, পাশের ভদ্রলোককে একটু সরতে বলে তার পাশে বসাল। তারপর বলল, 'কলকাতায় এসেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

অমলেশের সুটকেস আর বিছানা বাঙ্কে তুলে দিয়ে কুলিটা চলে গেছে। সেগুলো দেখিয়ে নূপুর শুধলো, 'এগুলো?'

এগুলো কোথায় ছিল, অমলেশ জানালো।

নূপুর বলল, 'সুটকেস, হোল্ডঅল নিতে এসেছিলেন বুঝি?'

নিজের অজান্তেই যেন অমলেশ বলে ফেলল, 'হ্যাঁ।'

নূপুর অদ্ভুত হাসল, 'নীলাদের ওখানে তা হলে বেশ কিছুদিন থাকবেন?'

নূপুরের হাসিতে একটা ইঙ্গিত ছিল। অমলেশ বলল, 'সেইরকমই ইচ্ছে।'

নূপুরের কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু মনের ভেতর ভাবনার কাজ চলছিল অমলেশের। কোথায় বোম্বাই মেলে উঠবে, না বীজপুরের ট্রেনে চড়ে বসেছে। বার বার যে ফাঁদটা এড়াতে চাইছে, ঘুরে ফিরে আবার সেখানেই গিয়ে পড়ছে। নাঃ, বীজপুরের ওই পিঞ্জর থেকে তার মুক্তি নেই।

নূপুর বোধহয় লক্ষ করেছিল। বলল, 'কী ভাবছেন অত?'

চকিত হয়ে অমলেশ বলল, 'কই, কিছু না তো।'

ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে নূপুর বলল, 'নিশ্চয়ই ভাবছেন।'

অমলেশও হাসতে চেষ্টা করল, 'কী আবার ভাবব?'

'ভাবছেন আমার সঙ্গে যাবেন কিনা। ভয় নেই—'

'কিসের ভয়?'

গলাটা অতলে নামিয়ে নূপুর ফিস ফিস করল, 'নীলার কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে নেব না।'

অমলেশ অবাক। মেয়েটা কি ফাজিল? বলল, 'হঠাৎ কাড়াকাড়ির কথা আপনার মাথায় এল!'

রহস্যময় হেসে নূপুর বলতে লাগল, 'জানি মশাই, সবই জানি। নীলা সবসময় আপনার কথা বলে। দিনরাত তার ওই এক মন্ত্র—অমলেশ, অমলেশ, অমলেশ—'

বিব্রত এবং বিরক্ত হচ্ছিল অমলেশ। তবু বলল, 'আমি খুবই ভাগ্যবান, কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই। নীলার জন্যে কত ছেলে পাগল। ও ফিরেও তাদের দিকে তাকায় না।'

'বটে?'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, আপনার বন্ধুটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে মোটে চারদিন। এর ভেতর আমার নাম জপ করবার মতো কিছু হয়েছে বলে জানি না।'

'জানেন মশাই, জানেন। চেপে যাচ্ছেন।'

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অমলেশ বলল, 'আপনি একা একা ফিরছেন? আপনার বন্ধুটি কোথায়?'

'আমি রোজ এই ট্রেনে ফিরি, নীলা ফেরে এর পরের ট্রেনে।'

'মানে লাস্ট ট্রেনে?'

'হ্যাঁ।'

'আসেন একসঙ্গে, ফেরার সময় বুঝি আলাদা আলাদা?'

'হ্যাঁ।' বলেই খানিক চমকে গিয়ে নূপুর বলল, 'একসঙ্গে কলকাতায় আসি, আপনাকে কে বললে?'

'বা রে, সেদিন আপনার বন্ধুকে ওদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এলেন না?'

'সেই একদিন।'

'আজ একসঙ্গে আসেন নি?'

'না না, আজ আসব কেন? আমার ডিউটি আগে, আমাকে আগে আসতে হয়। ওর ডিউটি পরে, ও পরে আসে, পরেও তেমনি যায়।'

'আপনার বন্ধুকে ক'টা পর্যন্ত ডিউটি দিতে হয়?'

নূপুরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল অমলেশ। লক্ষ করল, মেয়েটা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। সে ভাবটা গোপন রেখে চোখ বড় বড় করে বলল, 'আপনি কী বলুন তো?'

'কী?'

'আপনার দেখছি মেয়েদের মতো কৌতূহল।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। একসঙ্গে যাই কিনা, ক'টা পর্যন্ত ডিউটি—সব জানা চাই।'

'জানতে চাইব না বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু যে মেয়ে সারাদিন আমার নাম জপ করছে তার খোঁজখবর একটু রাখার দরকার নেই?'

নূপুর বলল, 'ওসব থাক, আসল কথা বলুন—'

'যথা?'

'আপনাদের বোম্বাইয়ের খবর। খুব বড় শহর, না?'

'হ্যাঁ। তবে কলকাতার চাইতে ছোট।'

'মেরিন ড্রাইভটা খুব সুন্দর শুনেছি।'

'হ্যাঁ।'

এমনি নানা আজে বাজে প্রশ্নে আসল প্রসঙ্গটা ঢাকা দিয়ে রাখল নূপুর এবং সেটা অমলেশ বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারল।

নীলাদের বাড়ি ফিরে অমলেশ দেখল, বারান্দায় উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নবেন্দুর মা। বললেন, 'নীলার অফিসের খোঁজ পেয়েছ?'

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে এরকম প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে, কে ভেবেছিল? চিন্তার সময় নেই। অমলেশের মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ।' ভদ্রমহিলার শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই 'না' বলতে পারল না। আর 'হ্যাঁ' বলেই তার মনে হল, ফাঁসের আরেকটা পাক গলায় জড়িয়ে গেল।

'কী অফিস?'

'নানারকম ব্যবসা ওদের। মারোয়াড়ি ফার্ম।'

'ভয়ের কিছু নেই তো?'

'না না।'

'নীলা যা বলেছে তা হলে সত্যি?'

চোখ কান বুঝে অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

একটু নীরবতা। তারপর নবেন্দুর মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'সারাদিন নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া হয় নি? এস বাবা, এস। হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

সুটকেস আর হোল্ড-অলটা নিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে অমলেশ বলল, 'এগুলো হোটেল থেকে নিয়ে এলাম মাসিমা।'

'বেশ করেছ।'

'পরশু বোম্বে চলে যাব। ভাবছি হোটেল থেকে না, একেবারে আপনাদের এখান থেকেই রওনা হব।'

অমলেশ পরশুর কথা বলল এই ভেবে, কালকের দিনটাও সে দেখতে চায় নীলা সত্যি সত্যি কী কাজ করে।

নবেন্দুর মা বললেন, 'পরশুর কথা পরশু ভাবা যাবে। এখন খেয়ে দেয়ে সুস্থ হও।'

যথারীতি আজও লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরল নীলা।

আগেই খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল অমলেশের। ঘুম আসছিল না তার।

নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেতে খেতে সারাদিনের বাসি খবরের কাগজখানা আরেকবার দেখছিল।

দেখছিল শুধু, পড়া আর হচ্ছিল না। অমলেশের ধ্যানজ্ঞান সব কিছুই বাইরে পড়ে ছিল। শুয়ে শুয়েই সে টের পাচ্ছিল, বাড়ি ফিরে কাপড় চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুল নীলা, তারপর রান্নাঘরে খেতে চলে গেল।

একটু পর রান্নাঘর থেকে নিচু গলার ফিসফিসানি ভেসে আসতে লাগল। খুব সম্ভব মা এবং মেয়ের মধ্যে কোনো আলোচনা চলছিল। তবে ওরা কী বলাবলি করছে, বোঝা যাচ্ছে না।

একসময় ফিসফিসানি বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কুলকুচোর শব্দ পাওয়া গেল। অমলেশ বুঝতে পারল, নীলার খাওয়া হয়ে গেছে।

আরো কিছুক্ষণ পর দরজার কাছে ছায়া পড়ল। চোখ ফেরাতেই অমলেশ দেখতে পেল,—নীলা।

নীলা বলল, 'এখনও ঘুমোন নি?'

অমলেশ বলল, 'না, ঘুম আসছে না।'

'কেন, ইনসমনিয়া নাকি? হলে বলুন, সেদিনকার মতো বড়ি দিচ্ছি।'

'ইনসমনিয়া নয়। তবে—'

'কী?'

'আপনার জন্য জেগে আছি।'

'আমার জন্যে!' নীলার ভুরু কুঁচকে গেল।

অমলেশ আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

আজ নিতু এ ঘরে শোয় নি; ওধারের কোনো একটা ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। পায়ে পায়ে নীলা এগিয়ে এল। চাপা গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো—'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে অমলেশ বলে উঠল, 'মাসিমা কী করছেন?'

'খাচ্ছে।'

'এক্ষুনি এদিকে আসবেন না তো?'

'না না, খাওয়ার পর রান্নাঘর-টর ধুয়ে মুছে আসতে দেরি আছে।'

একটু নীরবতা।

তারপর নীলাই ফের বলল, 'কী বলবেন বলুন—'

সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে অমলেশ বলল, 'আজ আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি, কখন?'

'সাড়ে এগারটার ট্রেনে।'

নীলা চমকে উঠল। শ্বাসরুদ্ধের মতো বলল, 'আমিও তো ওই ট্রেনে গেছি, দেখতে পান নি?'

তক্ষুনি কিছু বলল না অমিলেশ। চোখে চোখ রেখেই খুব আস্তে দু ধারে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ দেখে নি।

নীলার বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। চাপা গলায় সে শুধলো, 'কলকাতায় গিয়েছিলেন কেন?'

'হোটেল থেকে বাক্স-বিছানা নিয়ে এলাম।'

'ফিরলেন কখন।'

'সন্ধের পর।'

'তার মানে হাওড়া থেকে ছ'টা দশের ট্রেনটা ধরেছিলেন—'

'হ্যাঁ। ট্রেনে আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল।'

একটু চুপ করে থেকে নীলা বলল, 'কার সঙ্গে?'

অমলেশ বলল, 'কার বলুন না—'

'বুঝতে পারছি না।'

অমলেশ এবার নূপুরের নামটা বলল।

নীলা বলল, 'ও—'

'দু'জনে একসঙ্গে এলাম। খুব গল্প টল্প হল।'

'কী গল্প?'

'এই আপনার সম্বন্ধে।'

সন্দিগ্ধ চোখে নীলা তাকাল, 'আমার সম্বন্ধে কী গল্প হতে পারে?'

অমলেশ বলল, 'আপনার বন্ধুর কাছ থেকে জেনে নেবেন।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর খুব চাপা গলায় অমলেশ বলল, 'মাসিমা আজ আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—'

নীলা চমকে উঠল, 'কী জিজ্ঞেস করছিল?'

'এই আপনি কী ধরনের কাজ করেন, আপনার অফিসের নাম কী—এই সব—'

নীলা দম বন্ধ করে থাকল; কিছু বলল না।

অমলেশ বলল, 'ওসব আমি কেমন করে জানব বলুন। আমি কি কোনোদিন আপনার অফিসে গেছি। সে কথা মাসিমাকে বললাম। মাসিমা বললেন—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেল।

নীলা বলল, 'মা কী বলল?'

'আপনার পিছু পিছু গিয়ে খোঁজখবর করতে। আমি—'

'আপনি কী?'

'না গিয়েই মাসিমাকে একটা কথা বলেছি—'

কণ্ঠার হাড় যেন খাড়া হয়ে উঠল নীলার; চোখের দৃষ্টি স্থির। শিথিল গলায় বলল, 'কী বলেছেন মাকে?'

অমলেশ তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'বলেছি, আপনি মারোয়াড়ি ফার্মে কাজ করেন। তাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস।' বলতে বলতে গলা অতল খাদে নামিয়ে দিল, 'বুদ্ধি করে ঠিক বলি নি?'

ঘাড় নেড়ে খুব আস্তে করে নীলা বলল, 'হ্যাঁ।' বলেই চোখ নামাল।

বাইশ

পরের দিনও নীলার অজান্তে পিছু নিল অমলেশ। আজ তার যেন জেদ চেপে গেছে, যেভাবেই হোক নীলার রহস্য জানবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজ আব নূপুরদের বাড়ি গেল না নীলা; সোজা স্টেশনে চলে এল।

কালকের মতো আজও টিকিট কাটবার সময় স্টেশন মাস্টার একই কথা শুধোলেন, 'কী মশাই, রোজই দেখছি ছুঁড়িটার সঙ্গে বেরুচ্ছেন। ব্যাপারখানা কী?'

অমলেশ কাল যা উত্তর দিয়েছিল, আজও তাই দিল, 'পরে বলব।' তারপর টিকিট নিয়ে নীলা যে কামরায় বসেছে, তার পাশের কামরায় গিয়ে বসল।

একেকটা স্টেশনে গাড়ি থামে, মুখ বাড়িয়ে লক্ষ রাখে অমলেশ, কোথাও আবার নীলা টুক করে নেমে পড়ে কিনা।

শেষ পর্যন্ত কালকের মতো সেই জংশন স্টেশনটায় এসে নামল নীলা। আজও উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। নীলা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওখানে গিয়ে উঠল। টিকিট কাটবার সময় নেই। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ার পরিণাম জানা সত্ত্বেও বিচিত্র ঘোরের মধ্যে ওধারের গাড়িতে গিয়ে উঠল অমলেশ।

বেশি দূর নয়; আধ ঘন্টার মতো চলবার পর গাড়িটা যেখানে এসে থামল সেটা বোধহয় এদিককাব শেষ স্টেশন।

নামেই স্টেশন। উঁচু জায়গায় টালির চালের টিকিট ঘর এবং চায়ের স্টল ছাড়া আর কিছুই নেই। প্ল্যাটফর্ম বলতে দু ধারে ফাঁকা ঢালু মাঠ।

স্টেশনটাকে ঘিরে ছোটখাট একটা লোকালয়। তারপর ধানের খেত। খেত পেরিয়ে জঙ্গল।

অমলেশ জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। দেখতে পেল, গাড়ি থেকে নেমে নীলা মাঠ পেরিয়ে ধানখেতের দিকে চলে যাচ্ছে।

নীলা অনেকদূর গেলে, অমলেশ কামরার বাইরে এল। না, টিকিটি নেবার জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়েব একজন প্রতিনিধিও স্টেশনের ধারে কাছে নেই।

ক'টি লোক চায়ের দোকানটায় আড্ডা দিচ্ছিল। নিশ্চিন্ত অমলেশ পায়ে পায়ে তাদের কাছে চলে এল। নীলা যেদিকে গেছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে শুধলো, 'ওই যে ধানখেত দেখা যাচ্ছে, তারপর কী আছে?'

একটা লোক বলল, 'তারপর জঙ্গল।'

'জঙ্গলের পর?'

লোকটা এবার বলল, 'জঙ্গলের পর বর্ডার।'

'কিসের বর্ডার?'

'ইন্ডিয়ার।'

'বর্ডারের ওপারে কী?'

'পাকিস্তান।'

'জঙ্গলেব দিকটায় লোকজন আছে?'

'আছে দু চারটে গ্রাম। তবে ছোট ছোট; লোকজন খুব কম।'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'বর্ডার পর্যন্ত রাস্তা গেছে?'

লোকটা বলল, 'না। ধানখেতের ভেতর দিয়ে খানিক দূর পর্যন্ত জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে; তারপর শুধুই গাছপালা, ঝোপঝাড়।'

অমলেশ আর কিছু বলল না। স্টেশন থেকে ঢালু মাঠে নেমে এল। এতক্ষণে নীলা ধানখেতের কাছে চলে গেছে।

লোকটা ঠিকই বলেছে। ধানখেতের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা মেটে সড়ক। রাস্তাটা উঁচু। তার দু ধারে নিচু ধানের জমি বর্ষার জলে ডুবে রয়েছে।

মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব রেখে হাঁটছিল অমলেশ। তার দৃষ্টি ছিল নীলার ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু জঙ্গলের কাছে এসে মেয়েটা ভোজবাজির মতো কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই ভেবে উঠতে পারল না। তারপর ঠিক করল, এতদূর এসে ফিরে যাবে না; জঙ্গলের ভেতরেই ঢুকবে।

ঘন গাছগাছালির ভেতর অনেকক্ষণ খুঁজল অমলেশ। কিন্তু নেই, নেই—কোথাও নেই নীলা।

ঘুরতে ঘুরতে বিকেল হয়ে গেল। জঙ্গলের ভেতর ছায়া ঘন হতে লাগল।

অমলেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হতাশভাবে ভাবল, আর না, এবার ফিরে যাবে। রাত হয়ে গেলে অরণ্যের এই গোলকধাঁধা থেকে বেরুনো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

সীমান্তের সেই নগণ্য প্রায়-নির্জন স্টেশনটির দিকে সবে পা বাড়াতে যাবে অমলেশ, সেই সময় চাপা ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। দুটি গলা। এটা নীলার, অন্যটা কোনো পুরুষের। নিঃশ্বাস বন্ধ করে গলা বাড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল অমলেশ। সত্যি সত্যি ওধারের ঘন ঝোপে নীলা এবং একটা লোক দাঁড়িয়ে কী বলাবলি করছে।

সমস্ত স্নায়ু কানের ভেতর জড়ো করে অমলেশ শুনতে চেষ্টা করল। টুকরো টুকরো, অস্পষ্ট কিছু শব্দ কানেও এল।

নীলা বলছে, 'কাল আর এখানে এস না—'

লোকটা বলল, 'কেন?'

'রোজ রোজ এদিক এলে পুলিশ সন্দেহ করবে।'

'তবে কবে আসব?'

'পনের দিন পর। জিনিসটা এনেছ?'

'এনেছি।'

'দাও। বিকেল হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি না ফিরলে সন্ধের ট্রেনটা ধরতে পারব না।'

লোকটা ছোট পুঁটুলির মতো কী একটা যেন নীলার হাতে দিল। চোখের পলকে সেটা পেটের কাছে কাপড়ের ভাঁজের ভেতর লুকিয়ে বেঁধে ফেলল নীলা। তারপর বলল, 'আমি এখন যাই।'

'আচ্ছা।'

নীলা স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আর সেই লোকটা গেল উলটোদিকে।

এতদিনে অমলেশ বুঝতে পারল, সংসার বাঁচাবার জন্য কী করছে নীলা।

নীলা খানিকদূর এগিয়ে গেলে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অমলেশ।

সেই ছোট্ট স্টেশনে এসে নীলা যখন গাড়িতে উঠল, সন্ধে নেমে গেছে। তার চোখে ফাঁকি দিয়ে অমলেশ অন্য কামরায় উঠল।

বর্ডারের কাছাকাছি স্টেশনটা থেকে একসময় সেই জংশন স্টেশনে এল নীলারা। সেখান থেকে বীজপুরগামী ট্রেন ধরল।

এবার পাশাপাশি কামরায় বসেছে দু'জনে। মাঝখানে কাঠের একটা দেওয়াল। তার ওপাশের জানালায় বসেছে নীলা, এধারের জানালায় অমলেশ। দু-দিন পিছু নেবার ফলে নীলা কী চাকরি করে মোটামুটি বুঝে ফেলেছে অমলেশ। বুঝে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এর পরিণাম অস্পষ্ট নয়।

অসীম দুশ্চিন্তার মধ্যে সাত আটটা স্টেশন পার হয়ে গেল।

ভাদ্রমাসের এখন শেষের দিক। সারাদিন বৃষ্টি ছিল না। সন্ধের পর শুরু হয়েছে। তবে খুব জোরাল না। ঝিরঝির করে খানিক ঝরে যায়, আবার থামে।

হঠাৎ একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে অমলেশের কামরায় পুলিশ উঠল। দরজার কাছে থেকে কামরার ভেতরটা একপলক দেখে নিয়ে চলে গেল পাশের কামরায় অর্থাৎ নীলা যেখানে আছে সেখানে।

কেন জানি অমলেশের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড অস্থির হয়ে উঠল। শ্বাসক্রিয়া ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল অমলেশ। হঠাৎ চোখে পড়ল, তর তর করে ট্রেনের এ পাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে নীলা।

এদিকে ট্রেন ছাড়ার সংকেত দিয়েছে। অমলেশ আর বসে থাকতে পারল না। ভেতর থেকে কেউ ধাক্কা মেরে তাকে তুলে দিল যেন। গাড়ি যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময় লাফ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সে-ও নেমে পড়ল।

স্টেশনটা মাঠের মাঝখানে এবং প্রায় জনশূন্য। লোকালয় কোথায় কতদূরে, কে জানে। যে ক'টি যাত্রী নামল, তারা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল তা-ই বা কে বলবে।

রেল লাইন থেকে ওপরে খোয়া-বিছানো প্ল্যাটফর্ম। সেখানে আলো টালো তেমন নেই; টিম টিম করে দূরে দূরে দু-একটা জ্বলছে।

ছোট্ট স্টেশন; খুব সম্ভব লোকাল ট্রেন ছাড়া আর কিছুই এখানে দাঁড়ায় না।

অমলেশ লক্ষ করল, অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় একধারে স্টেশন মাস্টারের ঘর তথা টিকিট-কাউন্টার, তারপর মিটমিটে আলো জ্বালিয়ে একটা চায়ের দোকান, অবশেষে ওয়েটিং রুম।

নীলাও প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়েছিল, অমলেশ অন্ধকারে অন্ধকারে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। দেখল, স্টেশনের দিক দিয়ে সে গেল না। প্ল্যাটফর্মটাকে ঘিরে সারি সারি লোহার খুঁটি পোঁতা আছে; অবশ্য সবগুলো নেই। জায়গায় জায়গায় খুঁটি তুলে বিনা টিকিটের যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা করে রাখা হয়েছে।

নীলা একটা ফাঁক দিয়ে গলে ওধারে চলে গেল; অমলেশও তাই করল।

খুঁটিগুলোর ওপারে মাঠ। নীলা মাঠ ধরে স্টেশনের দিকে গেল। তারপর সেই ওয়েটিং রুমটার ভাঙা জানালা গলে ভেতরে ঢুকল। অমলেশের মনে হল, এখানকার সব কিছুই নীলার জানা এবং এখানে রাত কাটাবার অভ্যাস তার আছে।

অমলেশ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এটা ওয়েটিং রুমের পেছন দিক। ভাঙা জানালা যেমন আছে এখানে, একটা ভাল দরজাও আছে।

কী করবে, ভেবে পেল না অমলেশ। এদিকে টিপটিপ করে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কাছে দূরে ঝিঁঝিরা একটানা ডেকে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকলে ভেজা ছাড়া উপায় নেই।

খানিক ইতস্তত করে স্টেশনের দিক দিয়ে দিয়ে অমলেশ এসে দেখল, ওয়েটিং রুমের সামনের দরজায় তালা। তাই আবার পেছনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘোরের মধ্যেই বুঝিবা আস্তে আস্তে টোকা দিল।

ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ, সচকিত, চাপা গলার চিৎকার ভেসে এল, 'কে?'

অমলেশ বলল, 'আমি।'

নীলা শুধলো, 'আমি কে?'

'দরজা খুলুন—'

একটু পর দরজা খুলে গেল।

অন্ধকারে অমলেশকে চিনতে পারেনি নীলা। কড়া গলায় বলল, 'কে আপনি?'

কিছু না বলে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে আলো জ্বালল অমলেশ। এবার তাকে দেখতে পেল নীলা, সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ চমকে উঠল, 'আপনি! আপনি এখানে!'

অমলেশও অবাক হবার ভান করে বলল, 'আমারও তো সে-ই কথা। আপনি কী করে এখানে?'

নিমেষে সামলে নিয়ে সহজ গলায় নীলা বলল, 'আর বলবেন না, আমার এক বন্ধু এখানে থাকে; এক সঙ্গে কাজ করি। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যখন স্টেশনে এলাম তখন বীজপুরের লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। কী আর করি, রাতটা এই ওয়েটিং রুমেই কাটাব ভেবেছিলাম।'

'আর আমার কী হয়েছে জানেন?'

'কী?'

তাড়াতাড়ি বানিয়ে বানিয়ে অমলেশ বলল, 'কলকাতা থেকে লাস্ট ট্রেনে ফিরছিলাম।'

'আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন!' নীলা চকিত হল।

'হ্যাঁ।' অমলেশ তার চোখে চোখ রাখল।

চাপা অস্থির গলায় নীলা শুধলো, 'লাস্ট ট্রেনে!'

'হ্যাঁ।' নীলার অস্থিরতা যেন লক্ষ করে নি, এমনভাবে অমলেশ বলল, 'জানালার ধারে বসে পার্সটা নিয়ে অন্যমনস্কের মতো লোফালুফি করছিলাম, আচমকা হাতে ফসকে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি নেমে দেখি প্ল্যাটফর্মে পড়ে নি, ফাঁকে গলে একেবারে গাড়ির তলায় চলে গেছে। বুঝতেই পারছেন, গাড়ি চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'এরপর আর ট্রেন নেই। বাকি রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। ভাবলাম, ওয়েটিং রুমেই যাই।'

নীলা এতক্ষণে কথা বলল, 'ওয়েটিং রুমের দরজা তো ওদিকে। এধারে এলেন?'

অমলেশ বলল, 'ওদিকের দরজায় তালা দেওয়া। তাই ভাবলাম, ভেতরে ঢোকার অন্য রাস্তা যদি পাওয়া যায়। স্টেশন মাস্টারকে দিয়ে দরজা খোলাতে অবশ্য পারতাম। রাত্রিবেলা আবার যদি থাকতে না দেয়। অত ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে ভেতরে ঢোকার একটা রাস্তা খুঁজছিলাম। মানে কাউকে না জানিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া আর কি।'

নীলা তার কথা বিশ্বাস করল কিনা, কে জানে। দেশলাইয়ের আলো নিভে গিয়েছিল, তার মুখ দেখতে পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অমলেশই আবার বলল, 'এভাবে তো রাত কাটানো যাবে না। এখান থেকে বীজপুর ফেরার কোনো উপায় নেই?'

নীলা বলল, 'মাঠের ওপর দিয়ে মাইলখানেক হাঁটলে বাস রাস্তা; সেখানে যেতে পারলে বীজপুরের লাস্ট বাস এখনও পাওয়া যেতে পারে। একা মেয়ে বলে আমি যেতে সাহস করিনি।'

'বেশ তো, আমার সঙ্গে চলুন—'

'চলুন—'

যেতে যেতে অনেকক্ষণ পর অমলেশ বলল, 'এভাবে রাত্তির বেলা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটানো আপনার উচিত নয়। বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

নীলা আবছা গলায় কী বলল, বোঝা গেল না।

মাইলখানেক হাঁটার পর সত্যিই বীজপুরের লাস্ট বাস পাওয়া গেল। বাসে করে যেতে যেতে অমলেশ বলল, 'কাল আমি বোম্বাই চলে যাচ্ছি।'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অমলেশের দিকে একবার তাকিয়ে নীলা চোখ নামাল, 'কালই?'

'হ্যাঁ। অনেকদিন তো কাটিয়ে গেলাম। ফিরে গিয়ে অফিস তো করতে হবে—'

নীলার সম্বন্ধে তার যা জানবার জানা হয়ে গেছে।

নীলা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অমলেশ আবার বলল, 'কাল সকালবেলা আপনার সময় হবে?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'এখনই বলুন না—'

'না, কালই বলতে চাই। আর—'

'কী?'

'আপনাদের বাড়িতে বসে না।'

'তা হলে?'

'অন্য কোথাও গিয়ে।'

'কাল আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় বলতে আপত্তি নেই তো?'

'না।'

'তা হলে একসঙ্গে আসা যাবে'খন।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরব থেকে অমলেশ বলল, 'তবে—'

নীলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'বলুন।'

'কালকের দিনটা অফিস থেকে ছুটি নিতে পারেন?'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে কথা সারতে অনেকটা সময় লাগবে। তারপর অফিসে গেলে—' এই পর্যন্ত বলে অমলেশ থামল।

খানিক ভেবে নীলা বলল, 'ঠিক আছে, কাল কলকাতায় গিয়ে অফিসে একটা ফোন করে দেব'খন।'

তেইশ

কাল রাত্তিরেই অমলেশ বলে রেখেছিল, আজ চলে যাবে। নবেন্দুর বাবা আরো ক'দিন থেকে যেতে বলেছিলেন। অমলেশ সবিনয়ে জানিয়েছে, আর থাকা সম্ভব নয়।

আজ সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে সবার কাছ থেকে বিদায় নিল অমলেশ। নবেন্দুর মা, ঝুনু, মীনা, এমনকি নিতুও সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত এল। হীরু বোমায় জখম হবার পর সেই যে নিতু বাড়ি এসে ঢুকেছিল, আর বেরোয় নি। ঝুনু মীনার চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। অমলেশ মীনাকে বলল, 'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ঝুনুকে বলল, 'নবেন্দুকে বলব, আরো কিছু টাকা যেন পাঠায়। এটা সেপ্টেম্বর মাস। অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর—তিনটে মাস বাড়িতে পড়। তারপর জানুয়ারিতে স্কুলে ভর্তি হয়ে যেও।' নিতুকে বলল প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে এবং মা-বাবা-দিদির বাধ্য হয়ে চলতে।

নবেন্দুর মা ভারি গলায় বললেন, 'ক'টা দিন আমাদের কাছে থেকে একেবারে ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছিলে। আজ যাচ্ছ, খুব খারাপ লাগছে।'

অমলেশ কিছু বলল না। তারও খুব খারাপ লাগছিল। বিষণ্ণ হেসে বিছানা বাক্স নিয়ে একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ল। নীলাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, সে অমলেশের পাশে বসল।

হাওড়া স্টেশনে এসে অমলেশ বলল, 'কোথায় বসে কথাটা বলা যায়, বলুন তো?'

নীলা বলল, 'এখানেও বলতে পারেন।'

চারধারের অসংখ্য মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অমলেশ বলল, 'এখানে নয়। এত হট্টগোলে আর ভিড়ে হবে না।'

'তবে কি নির্জনে বলতে চান?' গলার সুরে কাঁপন তুলে চোখের তারায় বিচিত্র হেসে অমলেশের দিকে তাকাল নীলা।

অমলেশ তার কণ্ঠস্বর বা চোখের দিকে তেমন লক্ষ করেনি। বুকের ভেতর নিদারুণ এক অস্থিরতা টগবগ করে ফুটছিল। বলল, 'হ্যাঁ, নির্জন হলে ভাল হত।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক, গড়ের মাঠেই যাই।'

'বেশ।'

নীলা আর অমলেশ ট্যাক্সি করে গড়ের মাঠে এল। গড়ের মাঠ আগেই চেনা হয়ে গিয়েছিল অমলেশের। কিন্তু জায়গাটা তার পছন্দ হল না। সে যা বলতে চায় তা যেন এই বিশাল বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। বলল, 'অন্য কোথাও চলুন—'

নীলা অর্থময় সুরে বলল, 'আরো নির্জনে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে লেকের পাড়ে চলুন।'

'সেটা কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবেন।'

লেকে এসেও জায়গাটা মনঃপূত হল না। অমলেশ যা বলতে চায় তার প্রতিক্রিয়া ঘটবেই এবং সেটা সাংঘাতিক। কাজেই তার জন্য সবার চোখের আড়ালে চারদিক ঘেরা কোনো জায়গা চাই।

নীলা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'এ জায়গাটা পছন্দ তো?'

অমলেশ মাথা নাড়ল।

নীলা কপট ক্লান্তির সুরে বলল, 'আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আর পারি না। এখানেই বলুন। আপনি—'

'আমি কী?'

স্থির চোখে একবার অমলেশকে দেখে নিয়ে খুব নিস্পৃহ সুরে নীলা বলল, 'আপনি যা বলবেন তা আমি জানি।'

'জানেন!'

'জানি বৈকি। ও সব শোনার অভ্যাস আমার আছে। আমার সঙ্গে যে ছেলে দু দিন মেশে সে-ই ও সব বলে। আপনি বলে যান—'

'এখানে নয়। চলুন, একটা ভাল জায়গার কথা মনে পড়েছে—'

ক্লান্তভাবে এবং খানিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন উঠে দাঁড়াল নীলা। বলল, 'চলুন—' একটু থেমে আবার বলল, 'যা-ই বলুন না কেন, আমি কিছুই মনে করব না।'

সেই হোটেলটার কথা ভেবেছে অমলেশ। বোম্বাই থেকে এসে ওখানেই প্রথম উঠেছিল সে। নীলাকে নিয়ে সোজা হোটেলে চলে গেল।

হোটেল ম্যানেজার অমলেশকে দেখে অবাক। বলল, 'বোম্বাই যান নি!'

'না, যাওয়া হয়নি।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে অমলেশ শুধলো, 'আমার সেই ঘরটা খালি আছে?'

'আছে।'

'খুলে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি আজকের দিনটা থাকব।'

ঘরটা হোটেলের দোতালায়। নীলাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে অমলেশ বিছানায় বসল।

নীলা বলল, 'বোম্বাই থেকে এসে এখানে উঠেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

খানিক চুপচাপ।

তারপর নীলা বলল, 'এবার বলুন—'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল না অমলেশ। মনের ভেতর বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে একসময় শিথিল সুরে বলল, 'কথাটা নবেন্দুকে নিয়ে। আপনি এতদিন যা জানতে চেয়েছিলেন—'

'দাদা!' নীলার স্বরটা কেঁপে গেল যেন।

অমলেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

সচকিত নীলা বলল, 'কী, কী কথা?'

অমলেশ তক্ষুনি কিছু বলতে পারল না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে রাস্তার দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অমলেশ। অনুভব করছে, নীলার চোখ দুটো তীরের মতো তার পিঠে বিঁধে যাচ্ছে।

অমলেশের উঠে আসার ভেতর সাংঘাতিক কোনো ইঙ্গিত ছিল। নীলা রুদ্ধ অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'দাদার কী হয়েছে বলুন—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে অমলেশ বলল, 'আপনি অত অস্থির হবেন না। ভেঙে পড়লে চলবে না।'

'না না, আমি ঠিক আছি। ভেঙে পড়ছি না। আপনি বলুন—'

মাসকয়েক আগে নবেন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় থেকে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত সব ঘটনা যেন ঘোরের ভেতর বলে গেল অমলেশ।

নিমেষে নীলার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। ঠোঁট এবং গলার কাছটা থরথর করতে লাগল। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ, ভাঙা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা মরে গেছে!' বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নীলা কাঁদছে। অমলেশ বাধা দিল না, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল না। মেয়েটা কাঁদুক, কেঁদে হালকা হোক।

অনেকক্ষণ কাঁদার পর শোকের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস স্তিমিত হলে নিষ্প্রাণ আচ্ছন্নের মতো মুখ ঢেকে বসে থাকল নীলা। মেয়েটার জন্য অসীম মমতায় অমলেশের মন ভরে গেছে। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে তার মাথায় একখানা হাত রেখে সে ডাকল, 'নীলা—'

নীলা মুখ তুলল। তার দু চোখ আরক্ত, ফোলা ফোলা গালের ওপর দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা গলায় সে বলল, 'আমি জানতাম, সর্বনাশ কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু দাদা যে পুলিশের গুলিতে মরবে, ভাবিনি। আমাদের সংসারের জন্যে ও মরল।'

অমলেশ চুপ করে রইল।

অসহ্য আবেগে নীলা বলতে লাগল, 'এখন আমি কী করি? কেমন করে এ খবর মা-বাবাকে দেব? আপনি বলে এসেছেন, সে ভাল আছে, টাকা পাঠিয়েছে। এরপর কী করে তার মৃত্যুর কথা বলব?'

অমলেশ বুঝল, অনিচ্ছায় যে অপরাধ করে ফেলেছে তার ক্ষমা নেই।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। এর ভেতরে শোকের আবেগটাকে অনেকখানি শান্ত করে নিল নীলা। বলল,

'এ কথা এখন বাড়িতে বলা যাবে না। এখন কেন, এ খবর বেশ কিছুদিন গোপন রাখতে হবে। দাদা মা-বাবার সব চাইতে প্রিয় সন্তান; তার মৃত্যুর খবর শুনলে ওরা বাচবে না।'

'কিন্তু—' বলেই থেমে গেল অমলেশ।

নীলা বলল, 'আপনি কী বলতে চান, বুঝেছি। কতকাল আর ব্যাপারটা গোপন রাখা সম্ভব, তাই তো?'

'হ্যাঁ।' অমলেশ মাথা নাড়ল।

'যতদিন পারা যায়।' বলতে বলতে হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল নীলার, 'আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন?'

'কিভাবে?'

'দাদা মাসে মাসে আমাদের টাকা পাঠাত। সে নেই, এখন আর কে পাঠাবে? ভাবছি প্রত্যেক মাসে আপনার নামে কিছু টাকা পাঠাব; আপনি সেই টাকাটা দাদার নাম করে আমাদের পাঠাবেন। আমাদের সব গেছে—মান-মর্যাদা-দেশ, সর্বস্ব। দাদা আছে—এই ছলনাটুকু দিয়ে অন্তত মা বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করি। কিছুতেই না বলতে পারবেন না।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পযন্ত রাজি হয়ে গেল অমলেশ।

নীলা আবার বলল 'একটা কথা—'

'কী?'

'আপনার কাছে আমাদের কিছু ঋণ আছে, সেটা এক্ষুনি শোধ করতে পারব না।'

'আমার কাছে আবার কিসের ঋণ?'

'বা রে, আপনি এসেই দাদার নাম কবে মাকে দেড়শ টাকা দিলেন না? যখন পারব, টাকাটা শোধ করব।'

'কিন্তু—'

অমলেশের কথা শেষ হবার আগেই নীলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি কী বলবেন জানি। এমনিতেই ওই টাকাটা পেয়ে এ সময়ে অমাদের খুব উপকার হয়েছে। তার ওপর যদি ফেরত দিতে না বলেন নিজেদের কাছেই সম্মান থাকে না।'

অমলেশ চুপ করে থাকল।

সেই দুপুরবেলা এসেছে দু'জনে। দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে গেল।

নীলা বলল, 'এবার যাই।'

নীলা উঠতে যাবে, সেই কথাটা মনে পড়ে গেল অমলেশের। বলল, 'আরেকটু বসো—' নিজের অজান্তেই নীলাকে তুমি করে বলতে শুরু করেছে সে।

নীলা বলল, 'দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।'

নীলা শুধলো, 'কী?'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'নবেন্দুর কথা সব বললাম। কিন্তু আমার সেই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু পাই নি।'

'কোনটার?'

'সেদিন রাত্রিটা তুমি কোথায় কাটিয়ে এসেছিলে?'

মুখ নামিয়ে নীলা চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ তাকে লক্ষ করল অমলেশ। তারপর খুব কাছে এসে বলল, 'ওই লোকটা কে?'

চোখ না তুলেই নীলা বলল, 'কোন লোকটা?'

'ওই যে বর্ডারের কাছে, জঙ্গলের ভেতর পরশু যার সঙ্গে কথা বলছিলে। তোমার হাতে কী যেন—'

অমলেশের কথা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল নীলা। চাপা ভীত গলায় বলল, 'আপনি—আপনি জানলেন কী করে?'

গম্ভীর গলায় অমলেশ বলল, 'আমি সবই জানি।'

কয়েক পলক চোখের তারা স্থির হয়ে রইল নীলার। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে আবার বসে পড়ল। তার ঘাড়, মাথা, হাত-পা—সব ভেঙেচুরে যেতে লাগল যেন। অমলেশ আবার বলল, 'ওই লোকটা স্মাগলার?'

সজ্ঞানে না, ঘোরের ভেতর বুঝি মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দিল নীলা।

অমলেশ বলতে লাগল, 'তুমি এর মধ্যে এলে কেন?'

ভাঙা ভাঙা ঝাপসা গলায় নীলা বলল, 'না এসে কী করি? ক'মাস হল দাদা টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে। সংসার চলে কেমন করে? তাই—'

'একটা চাকরি বাকরি করলেও তো পারতে—'

'ক্লাস নাইন টেন পর্যন্ত পড়েছি। ওই বিদ্যেয় বাংলাদেশে চাকরি হয় না। যা করছি তার বেশি কিছু জোটানোও সম্ভব নয়। অবশ্য আরেকটা পুরনো রাস্তা খোলা ছিল—'

'কী?'

'বুঝতে পারছেন না?'

এবার পারল অমলেশ, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল।

নীলা বলতে লাগল, 'কে বলতে পারে, একদিন হয়তো ওই পথেও গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে।'

তক্ষুনি কিছু বলল না অমলেশ। একটু ভেবে শুরু করল, 'তুমি যা করছ, তাতে ভীষণ বিপদ।'

'জানি।'

'পুলিশ পেছনে লেগেই আছে।'

'তা আছে।'

'এর পরিণাম কী জানো?'

'জানি।'

'নবেন্দু মারা গেছে। তোমার এসব ছেড়ে দেওয়া উচিত—'

'এসব ছাড়লে সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। কে দেবে আমাকে টাকা?'

এর উত্তর অমলেশের জানা নেই। সে বলল, 'পুলিশ পেছনে লাগলে সেদিনকার ওই ভাঙা ওয়েটিং রুমটার মতো জায়গায় বুঝি রাত কাটাও?'

নীলা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। ওই রকম জায়গা আমার অনেক জানা আছে।'

অসীম অপার মমতায় মন ভরে গিয়েছিল অমলেশের। কিন্তু মেয়েটাকে চারপাশের আগুন থেকে কিভাবে বাঁচানো যায়, ভেবে পেল না।

একসময় নীলা বলল, 'এবার আমি যাই।'

অমলেশ বলল, 'চল, তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।'

'আপনি আবার কষ্ট করে যাবেন?'

'কষ্টের আর কী—'

নীলা আর কিছু বলল না। বাধ্য মেয়ের মতো অমলেশের সঙ্গে হাওড়ায় এল।

তাকে বীজপুরের ট্রেনে তুলে দিয়ে বাইরে জানালার কাছে দাঁড়াল অমলেশ।

ধরা-ধরা ভাঙা গলায় নীলা শুধলো, 'কালই বোম্বাই যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। এখানে আর থাকার উপায় নেই।'

কী বলতে গিয়ে থেমে গেল নীলা।

অমলেশ বলল, 'কিছু বলবে?'

চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নীলা, অর্থাৎ বলবে না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা কথা বলবে বলবে ভাবছে অমলেশ; বলার সুযোগ পাচ্ছে না। ট্রেন ছাড়ার মুখে হঠাৎ বলেই ফেলল, 'সংসার ধ্বংস হয়ে যাবার কথা বলছিলে না?'

'হ্যাঁ—'

'তোমার এখন অনেক দায়িত্ব নীলা, অনেক দায়। নবেন্দু নেই। অতগুলো মানুষ তোমার মুখ চেয়ে আছে। তোমার যদি কোনো বিপদ আপদ ঘটে যায় তখন কেউ বাঁচবে না। সংসার ভেসে যাবে। তাই বলছিলাম, আমার কথাটা আরেকবার ভেবে দেখ—ওই পথটা ছাড়তে পার কিনা—'

বিষণ্ণ করুণ চোখে অমলেশের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করল নীলা; ঠিক সেই সময় হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল।

চব্বিশ

যে জন্য অমলেশের বাংলাদেশে আসা তা তো মিটেই গেছে। নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবার সে ঝাড়া হাত-পা; অনায়াসেই বোম্বাই পাড়ি দিতে পারে।

পরের দিন বোম্বাই রওনাও হল অমলেশ। যেতে যেতে প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনও এ দেশে ফিরবে না, এখানকার কথা ভাববে না। অকারণে নিজের মনকে, নিজের স্নায়ুকে পীড়িত করে কী লাভ?

নবেন্দুর কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে একদিন বাংলাদেশে ছুটে এসেছিল; সে সাধ তার মিটেছে।

ঠিক করেছিল, এখানকার কথা ভাববে না। কিন্তু বাংলাদেশ ক'দিনে তার সত্তায় এমন ঢেউ তুলে দিয়েছে যে সাধ্য কী না ভেবে পারে। বোম্বাইতে ফেরার পর একটু অন্যমনস্ক হলেই বাংলাদেশের দূর মফঃস্বলে রিফিউজি কলোনির একধারে একটা টিনের বাড়ি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঝুনু-মীনা-হীরু-নিতু, পক্ষাঘাতে অসাড় মহীতোষ চাটুজ্জে, নবেন্দুর মা—এই চালচিত্রের ওপর সেই মেয়েটা, নীলা যার নাম—ফুটে ওঠে। তাদের সবার কণ্ঠস্বর, চলাফেরার শব্দ যেন শুনতে পায় অমলেশ।

তা ছাড়া, না ভোলার আরেকটা ব্যবস্থা তো নিজেই করে এসেছে অমলেশ। সেই টাকা পাঠাবার ব্যাপারটা—

নিয়মিত প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে নীলা। নবেন্দুর নাম করে সেই টাকা আবার নীলাদের কাছেই ফেরত পাঠাচ্ছে অমলেশ। একদিন কোনো যাদুকরের হাতের ঘুঁটি হয়ে বীজপুর ছুটে গিয়েছিল; এখনও সেই ঘুঁটি হয়েই ঘুরছে।

শুধু টাকাই পাঠায় না নীলা, প্রায়ই চিঠি লেখে। সংসারের সব খবরই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানায়।

কলকাতা থেকে ফেরার পর দেখতে দেখতে মাস আষ্টেক কেটে গেল। ঝুনু দীপক বলে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। মহীতোষ চাটুজ্জের বাঁ দিকের পক্ষাঘাত ডান দিকেও সংক্রামিত হতে শুরু করেছে। তার মায়ের লো প্রেসার। হীরু আর নিতু ছেনতাইয়ের দলে নাম লিখিয়েছে। এর মধ্যে রুপোলি রেখার মতো একটু আশার খবর, অজয় মীনাকে বিয়ে করেছে।

অসংখ্য, অজস্র চিঠি। আট মাস ধরে অনবরত লিখতে লিখতে কবে যে চিঠিগুলোতে ভিনভাবের রং লেগেছে, অমলেশ টের পায় নি। নীলা এখন আর 'আপনি' করে লেখে না। সম্বোধনের ভাষাটা 'তুমি' হয়ে গেছে।

আট মাসের পর আরো মাসকয়েক কাটল। তারপর নীলার সেই চিঠিটা এল, মর্মান্তিক নিদারুণ চিঠি।

নীলা লিখেছে।

'প্রিয় অমলেশ,

কিভাবে আমি টাকা রোজগার করি, তোমার অজানা নেই। আমি স্মাগলার। সব চাইতে ঘৃণিত, সব চাইতে নিকৃষ্ট জীব। আমাদের মতো মেয়েরাই সুস্থ সমাজের গায়ে পচন ধরিয়ে দেয়। জীবনের

আলোকিত রাজপথটার উলটোদিকে যে অন্ধকার অলিগলি, সেখানে বুকে হেঁটে হেঁটে সরীসৃপের মতো আমাকে চলতে হয়। এ পথে আসার পরিণাম আমার অজানা ছিল না, তোমারও না।

যা অনিবার্য তাই ঘটে গেছে! তুমি তো জান, পুলিশ আমার পেছনে লেগে আছে। শেষ পর্যন্ত আমি ধরা পড়েছি। আপাতত জামিনে ছাড়া পেয়েছি, তবে জেলে আমাকে যেতেই হবে। কম করে ছ'মাসের ঘানি টানা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

জেলে যেতে আমার ভয় নেই। কিন্তু সে ক'টা মাস সংসার কিভাবে চলবে, ভেবে পাচ্ছি না। তুমি যদি এসময় একবার আমাদের এখানে আসতে অনেকখানি ভরসা পেতাম। আসবে না জানি, তবু দিন গুনতে দোষ কি? ইতি।

নীলা

চিঠিটা তিন চার বার পড়ল অমলেশ। তারপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। আর সেই স্তব্ধতার ভেতরেই কর্তব্য স্থির করে ফেলল। নীলার যদি জেল হয়, সেই ক'মাসের টাকা সে-ই পাঠাবে। আর বাংলাদেশে তাকে আরেকবার যেতেই হবে। নীলার পাশে এখন যদি না গিয়ে দাঁড়ায় কবে আর দাঁড়াবে?

জীবনের প্রথম তিরিশটা বছর বাংলাদেশ অমলেশের স্মৃতিতে ছিল, অনুভূতিতে ছিল না। তারপর একদিন খেয়ালের বশে নবেন্দুর কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে বীজপুর ছুটে গিয়েছিল; গিয়েই টের পেয়েছিল একটা পিঞ্জরে এসে পড়েছে। সাধ করে যে ফাঁস গলায় পরেছিল তা ছেঁড়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

বীজপুরের সেই পিঞ্জরটা থেকে বেরুবার কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই। নীলা যতবার হাতছানি দেবে, ঘুরে ঘুরে ততবার তাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

আমার নাম বকুল

আপনারা আমাকে চেনেন না। অথচ কি মজার ব্যাপার দেখুন, রোজই ঠেলাঠেলি করে আপনাদের সঙ্গে ভিড়ের বাসে উঠছি, রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছি, সিনেমা টিনেমাও দেখছি। এ শহরে আজকাল হঠাৎ হঠাৎ ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়। তেমন কিছু ঘটলে আট-দশ মাইল হেঁটে আপনাদের সঙ্গে আমাকেও বাড়ি ফিরতে হয়।

আপনারা যেখানে, আমিও ঠিক সেইখানেই। কলকাতা নামে সত্তর লক্ষ লোকের এই বিশাল শহর সব সময়. বারুদ হয়ে আছে ; যখন-তখন সেটা ফেটে পড়ে। আর সেই সময় ফুটন্ত দুধের মতো আপনাদের সঙ্গে আমিও টগবগ করি। যখন খবরের কাগজে দেখি আরেকটা কারখানার ক্লোজার হল কিংবা আরেকটা অফিস দিল্লিতে উঠে গেল, আপনাদের মতো আমারও বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাই. আরো কয়েক শ মানুষের ওপর মৃত্যুর ঠান্ডা হাত নেমে আসছে।

এত কাছাকাছি আছি, তবু আপনারা হয়তো চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে কোনোদিন তাকান নি; কিংবা তাকালেও মনে করে রাখেন নি। মনে রাখবার মতো কী-ই বা আছে আমার!

কিন্তু আমার ইচ্ছা, আপনারা আমার দিকে একটু তাকান, আমার কথা একটু শুনুন। আমার নিজস্ব কিছু দুঃখ আছে, কিছু সমস্যা। সেগুলো ফাঁদের মতো চারদিক থেকে আমাকে আটকে রেখেছে। সেখান থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছি না। সাঁতার না-জানা মানুষের মতো অথৈ জলে আমি ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি। জানি বলবেন, এসব শুনে আপনাদের কী লাভ? ক্ষতিও তো কিছুই নেই। মানুষ অনিচ্ছায় কত কী-ই তো করে। যে মেয়েটা সব সময় আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে তার একটা অনুরোধ না হয় রাখলেনই।

আমার নাম বকুল। নামটা আমার মায়ের দেওয়া। ফুলের নামে মা নাম রেখেছিল কেন? সে কি এই ভেবে, ফুলের গন্ধের মতো আমার সুঘ্রাণে চারদিক ভরে যাবে?

আমার মা নেই; সেই কোন ছেলেবেলায় তাঁকে হারিয়েছি; আমার বয়সে তখন পাঁচও হয়নি। মায়ের কথা আমার মনে পড়ে না। অনেকক্ষণ ভাবলে লালপাড় একটা শাড়ি, মস্ত সিঁদুরের টিপ, পানপাতার মতো একটা মুখ আবছাভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অবশ্য আমার বাক্সে মায়ের একটা ফোটো আছে; অনেককাল আগে পূর্ব বাংলার এক মফঃস্বল শহরে তোলা হয়েছিল। ফোটোটা এত বাজে যে ওটা থেকে মায়ের চোখমুখ কেমন ছিল কিছুই বোঝা যায় না। ওই অকেজো ছবিটা আর আমি, এ ছাড়া পৃথিবীতে মায়ের অন্য কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই।

মা বেঁচে থাকলে বলতে পারত, তার দেওয়া নামটা কতখানি সার্থক করতে পেরেছি। তবে আমাকে যারা চেনে তারা বলে আমি মেয়েটা নাকি খুব ধীর, নম্র, শান্ত। অন্যের জন্য স্যাক্রিফাইস করে করেই শেষ হয়ে যাচ্ছি।

যে যা-ই বলুক, নিজে কিন্তু জানি, আমি খুব দুর্বল। এবং ভীরুও। একটুতেই ভেঙে পড়ি, একটুতেই উচ্ছ্বসিতও হই। সুখ বা দুঃখ, যত তুচ্ছই হোক, ঢেউয়ের মাথায় মোচার খোলার মতো আমি দুলতে থাকি। বিজন বলে, 'ইচ্ছা করলে যে কেউ তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।' কিন্তু বিজনের কথা এখন না, পরে।

আমি থাকি শহরতলি ছাড়িয়ে আরো কিছুটা দূরে — সারি সারি যে রিফিউজি কলোনিগুলো রাস্তার ধারে জড়াজড়ি করে রয়েছে তার গা ঘেঁষে একটা সৃষ্টিছাড়া চেহারার একতলা বাড়িতে। এসপ্ল্যানেড থেকে প্রাইভেট বাসে উঠলে সেখানে পৌঁছুতে ঝাড়া দেড়টি ঘণ্টা লেগে যায়; ভাড়া তিরিশ পয়সা। ওই বাড়িটায় আর যারা থাকে তারা হল আমার বাবা, আমার সৎ-মা, তিন সৎ-ভাই এবং এক সৎ-বোন। আমার নিজের কোনো ভাইবোন নেই। সৎ-ভাইদের নাম হাবু, গণেশ আর বাচ্চু। একটা করে পোশাকী নামও তাদের আছে; কিন্তু সেগুলো কাজে লাগে না। যাদুঘরে মৃতদেহের মতো

স্কুল-কলেজের রেকর্ডে ওই নামগুলো সাজানো আছে মাত্র। সৎ-বোনের নাম নীলিমা। বছর চারেক আগে তার বিয়ে হয়েছিল। হলে কি হবে, মাসে পনের কুড়ি দিন অন্তত সে আমাদের বাড়িতেই থাকে। নীলিমা একাই না, সঙ্গে তার স্বামীও। এদের কথাও এখন না, পরে।

আমি ডালহৌসি স্কোয়ারের একটা বড় মার্চেন্ট অফিসের টাইপিস্ট। আমার বয়স এখন ঠিক তিরিশ। অতটা অবশ্য দেখায় না। আমার অফিসের বন্ধু কনক প্রায় রোজই গালে টুসকি মেরে বলে, 'বার বছর আগে যেদিন চাকরি করতে এলি সেদিন তোকে যেমন দেখেছি আজও তা-ই আছিস— সেই রকম অষ্টাদশী। তোর বয়েস আর বাড়ল না বকুল।' এটা কনকের বাড়াবড়ি। অষ্টাদশী না আর কিছু। তবে পাঁচ ছ বছর কমিয়ে যদি চব্বিশ পঁচিশ বলি কেউ অবিশ্বাস করবে না। আসল বয়সটা বললেই বরং চোখ-টোখ কুঁচকে বলবে, 'ওল্ড লেডি হবার এত শখ কেন? তোমার সব কিছুটা উলটো। লোকে বয়েস কমায়, তুমি বাড়াও।'

আরেক জন আছে যে আঠারোতেও খুশি না, পারলে আরো দু বছর কমিয়ে দেয়। সে বিজন। আবার বিজনের কথা এসে গেল। কিন্তু না, এখন শুধু আমার কথা।

পোশাক-টোশাক আমার খুবই সাদামাঠা। বেশি রঙচঙ কিংবা জবরজং সাজগোজ ভাল লাগে না; চোখে যেন বিঁধতে থাকে। সাদা শাড়িতে সামান্য কিছু কাজ থাকবে, নয়তো ছোটখাট দু-একটা ফুল-লতা-পাতার ছাপ—এটাই আমার সব চাইতে পছন্দ। সাদা না পেলে খুব হালকা মোলায়েম রঙের কাপড়ও চলতে পারে। একটু-আধটু যে না সাজি তা নয়। হাজার হোক, মেয়ে তো। চোখে সরু করে কাজল টানি; মুখে একটু আধটু পাউডার মাখি। কখনও-সখনও স্নো কি ক্রিম। খোঁপা-টোপা বাঁধি না; চুলগুলো এক বেণী করে পিঠে ঝুলিয়ে দিই। গয়না বলতে কানে একজোড়া সোনার দুল, ডান হাতের মধ্যমায় একটা আংটি, গলায় কড়ির মালা, বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ। ব্যস। বন্ধুরা এই নিয়ে দারুণ ঠাট্টা-টাট্টা করে, 'যৌবনে যোগিনী হতে চাস বকুল?' আমি কিছু বলি না, শুধু হাসি।

সেই মানুষটি, যার নাম বিজন—বিজন সান্যাল—সে-ও মাঝে মধ্যে খেপে ওঠে, 'এত সুন্দর গলা তোমার, তাতে কিনা কড়ি ঝুলিয়ে রেখেছ! চল, আজই একটা সোনার হার কিনে দেব।' ওই দেখুন, বার বার বিজন এসে যাচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে তার কথা আমি বলতে চাই না।

আমাকে দেখতে কেমন? এবার কিন্তু ভারি বিপদে ফেললেন। নিজের রূপলাবণ্যের বর্ণা দেবার মতো অস্বস্তিকর ব্যাপার আর কিছু নেই। অন্তত আমার মতো মেয়ের পক্ষে। আমার ঘরে একটা বড় আয়না আছে; রোজই একবার না একবার ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কাচের ওপর যে প্রতিবিম্ব পড়ে তা দেখে মুগ্ধ হবার দিন কবেই ফুরিয়ে গেছে; তবু এই তিরিশ বছরেও খুব একটা খারাপ লাগে না। ইচ্ছে হয়, অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আমার মুখ লম্বাটে, অনেকটা ডিমের মতো। ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখ। পাতলা নাকটা সোজা কপাল থেকে নেমে এসেছে। ফুলদানির মতো গোল গলা আমার, মসৃণ ঘাড়। কণ্ঠার হাড় পেরেকের মতো ফুটে বেরোয় নি। নিভাঁজ ত্বকে এখনও অনেকখানি সজীবতা আছে। গায়ের রং আশ্বিনের রোদের মতো। আর কেউ লক্ষ করুক বা না-ই করুক, আজকাল আমার মুখে ময়লার মতো কালচে ছোপ পড়ছে। ক্রিম বা পাউডার-টাউডার মাখলে ওটা চাপা পড়ে, কিন্তু আমি জানি এই ময়লাটা বয়েসের দাগ; খুব বেশিদিন ওটা ঢেকে রাখতে পারব না।

সে যা-ই হোক, ক'বছর আগেও রাস্তায় বেরুলে নানারকম মন্তব্য কানে আসত। চায়ের দোকান থেকে কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠত, 'মইরা যামু হালায়'। কেউ বা গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গাইত, 'প্রাণসজনি, যাইস না রে তুই পরানে ঢেউ দিয়া—' ট্রাম-বাসে উঠলে আমার চারপাশে মৌচাকের মতো ভিড় জমে যেত। তখন আমি চোখ তুলে কোনোদিকে তাকাতে পারতাম না। কান টান দিয়ে আগুন ছুটতে থাকত যেন। আজকাল এসব সহজ হয়ে গেছে। তবে এই তিরিশ বছর বয়সেও টের পাই, রাস্তায় নামলে দু ধারে গুঞ্জন ওঠে। খুব যে একটা খারাপ লাগে, তা নয়।

আমাকে নিয়ে সব ব্যাপারেই কনকের উচ্ছ্বাস। সে বলে, 'বিউটি কনটেস্টে একবার নাম দে বকুল। সিওর ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে যাবি।' কনকের কথা আমার এক কান দিয়ে ঢুকে তক্ষুনি আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বিজন অবশ্য কিছু বলে না; শুধু পলকহীন তাকিয়ে থাকে। সেই কবে থেকে এইভাবে সে আমাকে দেখে আসছে। ওই দেখুন, বিজনের কথা আবার এসে গেল। নাঃ, ওকে এড়িয়ে যাব, সাধ্য কি। বিজনকে বাদ দিয়ে আমার কোনো কথাই বুঝি হয় না। আমার জীবনের সঙ্গে কি আশ্চর্যভাবেই না জড়িয়ে গেছে সে। তাকে আলাদা করে নেবার উপায় নেই। আমার জীবনের যেদিকে দুঃখ যেদিকে সমস্যা তার ঠিক উলটোদিকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বিজন।

* * *

এতক্ষণ আমার কথা শুনলেন। আমি মেয়েটা কেমন, তার মোটামুটি একটা ছবি কাঁচা হাতে হলেও আপনাদের কাছে হয়তো এঁকে দিতে পেরেছি।

যে তিরিশটা বছর পেছনে ফেলে এসেছি তার সবগুলো দিন প্রায় একই রকম। ম্যাড়মেড়ে, গতানুগতিক। মাঝে মাঝে এক-আধটা বড় ঢেউ যে আসে নি তা নয়। কিন্তু সে আর কটা? আঙুল গুনেই বলে দেওয়া যায়।

ভেবেছিলম জীবনটা একভাবেই কেটে যাব। কিন্তু তা আর হল কই? সোজা রাস্তা ধরে চলতে চলতে আচমকা আজ আমি একটা বাঁকের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আজকের দিনটা আমার জীবনের একটা বিশেষ দিন।

আমার দিকে আপনারা তাকান। অন্য দিন বকুল নামে যে মেয়েটা কোনোরকমে নাকেমুখে গুঁজে কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় মোটামুটি সেজে পোশাকে ডালহৌসির বাস ধরে তাকে আজ আর চিনতে পারবেন না। আজ আমার দিকে তাকলে আপনাদের চমক লাগবে; চট করে চোখের পাতা ফেলতে পারবেন না।

আজ আমি অফিসে যাই নি; একদিনের ছুটি নিয়েছি।

এখন দুপুর; একটা দেড়টার মতো বাজে। নিজের ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে মেঝেতে ক্রিম-পাউডারের কৌটো, কাজললতা, আয়না-চিরুনি ছড়িয়ে আমি সাজতে বসেছি।

আমার এই ঘরটার কথা একটু বলে নিই। মেঝেটা লাল সিমেন্টের। দুটো দেওয়ালে প্ল্যাস্টার আছে; আর দুটোর ইট বার করা। বাড়ি করতে করতে বাবার টাকা ফুরিয়ে গেল, তাই ও দুটো আর ঢাকা হয় নি। তবে চারটে দেওয়ালেই চুনকাম করা হয়েছিল। তাও আজকাল না, বছর দশেক আগে। তারপর এ ঘরে আর হাত পড়ে নি। এখন জায়গায় জায়গায় চুন উঠে কালচে ছোপ ধরে গেছে; কোণে কোণে ঝুল।

এই ঘরেই দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে একটা তক্তপোষ পাতা। তার তলায় রাজ্যের হাঁড়ি-কুড়ি, বাক্স টাঙ্ক। একধারে একটা সস্তা টেবল, দুটো চেয়ার। পশ্চিম দিকের দেয়ালে ফিল্মস্টারের ছবিওলা চড়া রঙের ক্যাটকেটে একটা ক্যালন্ডার কোত্থেকে জুটিযে এনে বাচ্চু টাঙিয়ে রেখেছে।

এ ঘরে আমি একাই থাকি। তবে কেউ এলে মেঝেতে একটা বিছানা পড়ে; গণেশ তখন এখানেই শোয়।

আচ্ছা, এবার আমার দিকে আবার তাকান। যে মেয়ে সাজসজ্জায় বিমুখ, উগ্র রঙচঙে পোশাকে যার দারুণ বিতৃষ্ণা, সে আজ গাঢ় কমলালেবু রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। তার সঙ্গে রং মিলিয়ে ব্লাউজ। আজ আর বিনুনি করে বেণী ঝোলাই নি; উঁচু করে চমৎকার একখানা খোঁপা বেঁধেছি। চোখে কাজল তো টেনেছিই, কপালে চীনা সিঁদুরের একটা গোল টিপও পরেছি। যা কোনোদিন করি না, ঠোঁট আর নখও আজ রাঙিয়ে নিয়েছি। রংটং, তা যেমনই হোক, আজ খুব ভাল লাগছে। শুধু রংই কি মেখেছি, চার গাছা করে চুড়িও পরেছি হাতে; কড়ির মালাটা বদলে গলায় দিয়েছি বড় লকেটওলা সোনার হার। আংটি আর দুল তো আছেই। আরো কিছু গয়না-টয়না থাকলে তাও আজ পরতাম; কিন্তু ওইটুকু ছাড়া আমার বলতে আর কিছুই নেই। আজ আমাকে দেখলে কনকরা আর 'যৌবনে যোগিনী' বলে ঠাট্টা করবে না।

সাজা-টাজা শেষ হলে কবজি উলটে হাত-ঘড়ি দেখে নিলাম। দুটো বাজতে পাঁচ। ঠিক চারটেয়

নর্থ ক্যালকাটার একটা সরু গলির শেষ মাথায় সেই পুরনো দোতলা বাড়িটায় আমাকে পৌঁছুতেই হবে। সেখানে বিজন আর তার ক'টি বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

বড় আয়নাটা হাতের কাছেই আছে। শেষ বারের মতো নিজেকে দেখে নিলাম। উজ্জ্বল কাচে যার ছায়া পড়ল তার মুখ কিছুটা বিষণ্ণ, চোখের তারা সিক্ত, ঠোঁটের কোণ অল্প অল্প নড়ছিল। আজকের দিনেও নিজেকে সাজিয়ে নিতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল! এমন একটা দিন সব মেয়ের জীবনেই আসে। তাদের নিয়ে তখন কি কাণ্ডই না শুরু হয়ে যায়! বন্ধুরা, সমবয়সিনীরা এসে তাদের সাজাতে বসে। হাসি-ঠাট্টা-আনন্দ আতশবাজির মতো ফস ফস জ্বলতে থাকে। কিন্তু আমার বেলায়?

এই দেখুন না, দরজায় খিল লাগিয়ে চোরের মতো আমাকে সাজতে হল। আশেপাশে একটা বন্ধু নেই, কেউ হই-চই করছে না। এমন একটা দিন এত চুপচাপ, এত ম্যাড়মেড়ে, এত নিরুৎসব হবে, ভাবিনি।

কয়েক পলক আয়নার দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় উঠে পড়লাম। সাজের জিনিসগুলো টেবলে সাজিয়ে রেখে দরজা খুলে বেরুতে যাব, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। তক্ষুনি ফিরে এসে তক্তপোষের তলা থেকে একটা বড় বাক্স টেনে এনে খুলে ফেললাম। তারপর জামা-কাপড় হাঁটকে হাঁটকে মায়ের ফোটোটা বার করলাম।

আগেই আপনাদের বলেছি, মায়ের ফোটোটা খুব বাজে। তার ওপর উই লেগে অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে, বাকি যেটুকু আছে সব হলুদ। মাকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না, তবু তার দিকে তাকিয়েই আবছা আধফোটা গলায় বললাম, 'আমি যাচ্ছি মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।' আমার স্বর ক্রমশ জড়িয়ে এল। টের পাচ্ছি চোখ জলে ভরে যাচ্ছে।

তাড়াতড়ি মায়ের ফোটোটা বাক্সে রেখে ডালা বন্ধ করে ফেললাম। তারপর বাক্সটা তক্তপোষের তলায় ঠেলে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আমাদের বাড়িটার ছিরি-ছাঁদ নেই। একটানা তিনখানা ঘর—পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। ঘর থেকে বেরুলেই লম্বা বারান্দা। বারান্দাটা মাটির, রোদ-বৃষ্টি ঠেকাবার জন্য বাঁশের খুঁটি পুঁতে টালির শেড লাগানো হয়েছে। বারান্দার পুবদিকের খানিকটা অংশ আবার দরমা দিয়ে ঘেরা। ছাদে টিনের একটা চালা। ইঁট-কাঠ-বাঁশ-টিন-দরমা—এ বাড়িতে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা হয়েছে।

বাইরের দেওয়ালগুলোতে প্ল্যাস্টার বলতে কিছু নেই। বর্ষার পর বর্ষা শ্যাওলা জমে জমে সারা বাড়িটায় স্থায়ী কালচে দাগ ধরেছে। এখানে ওখানে ইটের ফাঁকে ফাঁকে অশ্বত্থ আর নানা জাতের বুনো গাছের চারা মুখ বাড়িয়ে আছে। বাড়িটার আয়ু খুব বেশিদিন নেই।

এই দুপুর বেলায় বাড়িটা নিঝুম। হাবু, বাচ্চু বা গণেশ, কেউ এ সময় থাকে না। সারাদিনে কতক্ষণই বা থাকে! খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া এ বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। বাবা এখন অফিসে। নীলিমা ক'দিন ধরে শ্বশুর বাড়িতেই আছে। এ সময় থাকার মধ্যে শুধু মা। সৎ-মাকে মা বলাই তো নিয়ম।

ডান দিকে দু পা এগুলেই মা-বাবার ঘর। দরজাটা হাট করে খোলা রয়েছে। বাইরে থেকেই চোখ পড়ল, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মা ঘুমোচ্ছে। ভালই হয়েছে। জেগে থাকলে আমার এত সাজসজ্জা দেখে মায়ের চোখের তারা নিশ্চয়ই কপালে উঠে যেত। হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ঘেমে উঠতাম। আস্তে করে ডাকলাম, 'মা—'

সাড়া নেই। ঘুমটা গাঢ়ই মনে হচ্ছে।

দু তিনবার ডাকাডাকির পর আবছা একটা শব্দ হল, 'উঁ—'

'আমি বেরুচ্ছি।'

ঘুমন্ত জড়ানো গলায় মা বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস; বেশি রাত-টাত করিস না।'

বাড়ির সবাইকে আগেই জানিয়ে রেখেছি, আজ আমার এক বন্ধুর বিয়ে; সেখানে যেতে হবে। কেউ তা অবিশ্বাস করে নি। বললাম, 'আচ্ছা—' তারপর আর দাঁড়ালাম না। বারান্দার গায়ে ইট সাজিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বাড়ির বাইরের খোয়া-ওঠা সরু রাস্তায় এসে

উঠলাম। এই রাস্তা ধরে উত্তরে মিনিট দশেক হাঁটলে ষাট ফুট চওড়া মেইন রোড। সেখান থেকে এসপ্ল্যানেডের বাস পাওয়া যায়।

সরু রাস্তাটার দু ধারে বাড়িঘর। বেশির ভাগই টালির, টিনের, পুব বাংলার ধাঁচে কঁ্যাচা বাঁশের। বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎ হঠাৎ এককেটা চমৎকার দোতলা কি তেতলা।

কুড়ি বাইশ বছর আগে যখন আমরা প্রথম এ জায়গাটায় আসি, চারদিকে শুধু ঝোপ-জঙ্গল, হোগলাবন, নিচু জলা। কচুরিপানায় বোঝাই খাল। কি অগাধ প্রশান্তি তখন এখানে। মাথার ওপর শঙ্খচিল আর হলদিবনা পাখিরা ডানা স্থির করে হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের ভেতর দিয়ে ঝন ঝন আওয়াজ তুলে সজারু ছুটে যেত। দিনদুপুরে ঝাঁক ঝাঁক শিয়াল চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াত। আর ছিল সাপ, শুয়োর আর প্রকান্ড প্রকান্ড মেঠো ইঁদুর।

তারপর হঠাৎ একদিন মানুষ এল। রাতারাতি ঝোপঝাড় বন-বাদাড় উধাও।চোখের পলক পড়তে না পড়তে বাড়িঘরে চারদিক ছেয়ে গেল। এ জায়গাটার নতুন নাম হল জবরদখল কলোনি। এখানকার সব বাসিন্দাই পূর্ব বাংলার মানুষ।

আমাদের দেশও পূর্ব বাংলাতেই। তবে সেখানকার কথা আমার বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার সেই গ্রামটা এতদিন পর পূর্বজন্মের স্মৃতি হয়ে গেছে। যাই হোক, দেশভাগের শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে একদিন সীমান্তের এপারে চলে এসেছিলাম। তবে জবরদখল কলোনিতে আমরা ঘর-টর তুলি নি। ওপার থেকে আসার সময় বর্ডার পুলিশের চোখে ধুলো ছিটিয়ে বাবা কিছু সোনা আনতে পেরেছিল। বাবার কৌশলটা ছিল অদ্ভুত। সুস্থ পায়ে ঢাউস ব্যান্ডেজ লাগিয়ে তার ভাঁজে ভাঁজে পাতলা পাতলা সোনার পাত সাজিয়ে নিয়েছিল। তারপর বর্ডারে এসে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এমন নিখুঁত অভিনয় করেছিল, পুলিশ কিছুই সন্দেহ করে নি।

ধোঁকা দিয়ে সোনা আনার ব্যাপারে বাবার ছিল দারুণ গর্ব। অনেক দিন পর্যন্ত লোক ডেকে ডেকে এ গল্প করেছে। বলবার মতো গল্পই বটে!

সেই সোনা বেচে জবরদখল কলোনির গা ঘেঁষে বাবা খানিকটা জমি কিনে বাড়ি তুলেছিল। এ সব সতের-আঠার বছর আগের কথা।

আমি কিন্তু এখন বাবার কথা ভাবছি না। শহরতলির শেষ মাথায় শান্ত নিরিবিলি জংলা জায়গাটা রাতারাতি কিভাবে জমজমাট উপনিবেশ হয়ে গেল তা নিয়েও আমার দুশ্চিন্তা নেই।

অন্যমনস্কের মতো আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। দু পাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাথার ওপর পাখি টাখি, কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আপনাদের তো বলছিই, আমি মেয়েটা কিরকম। যেমন ভীরু তেমনি দুর্বল। এই মুহূর্তে বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে। খুব ভয় লাগছে, আবার অসহ্য আনন্দও। সুখ আর ভীরুতা — যমজ স্রোতের মতো একবার আমাকে ঢেউয়ের মাথায় তুলছে, আবার তক্ষুনি নামিয়ে আনছে।

মেন রোডের মোড়ে এসে গেলাম। এখানে প্রচুর দোকানপাট, লন্ড্রি, টি-স্টল। অন্য সময় জায়গাটা সরগরম হয়ে থাকে, ভিড়ে পা ফেলা যায় না। কিন্তু এই দুপুরবেলায় অন্য দৃশ্য। বেশির ভাগ দোকানেরই দরজা আধভেজানো; লোকজন বিশেষ চোখে পড়ছে না। ঝিমুনির মতো একটা ভাব জায়গাটাকে জড়িয়ে আছে।

রাস্তা পেরিয়ে ওধারে চলে গেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস এসে গেল এবং আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুট লাগাল।

এখন বাসেও ভিড়-টিড় নেই। দু চারটে লোক এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জানালার ধার ঘেঁষে একটা সিটে বসে পড়লাম।

দুপুরবেলা রাস্তা ফাঁকা পেয়ে বাসটা দারুণ ছুটছিল। জানালার বাইরে সেই চেনা ছবি—রিফিউজি কলোনি, গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের অসংখ্য ফ্ল্যাট, মাঝে মধ্যে ফাঁকা মাঠ, ছোট খাল, বাঁশের সাঁকো, ন্যাড়া গাছের ডালে মাছরাঙা, তারপরেই আবার 'স' মিল, দু একটা ছোট কারখানা, গোরস্থান। বার

চোদ্দ বছর ধরে দু' বেলা নিয়মিত এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন চোখ বুজেও বসে দিতে পারি, বাসটা কোথায় এল, এখানে কী কী আছে।

বাসটা যত এগুচ্ছে,, বুকের ভেতরকার সেই কাঁপুনিটা ততই বাড়ছে। ঝড়ের মতো কিংবা প্রাকৃতিক অন্য কোনো বিপর্যয়ের মতো আমার মধ্যে কী যে চলছে, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না।

মনটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্য জানালার বাইরে তাকালাম।

এখন আশ্বিন মাস, শরৎকাল। গলানো গিনির মতো তাজা উজ্জ্বল রোদে চারদিক ভরে আছে। মাথার ওপর পেঁজা তুলোর মতো ভবঘুরে মেঘ। শরতের এই মেঘগুলোর মতি চঞ্চল, মন উড়ু-উড়ু, এক পলক তারা যদি কোথাও পা পেতে বসে! ফাঁকে ফাঁকে নীল নয়নের চকিত চাহনির মতো আশ্বিনের আকাশ।

কলকাতার আকাশ প্রায় সারা বছরই ধুলোমাখা, ধোঁয়ায় ঢাকা; ঘন বিষাদে সব সময় ঝাপসা হয়ে থাকে। শুধু এই আশ্বিনটা বাদ। এ সময় আকাশ যেন পালিশ-করা নীল কাচ।

আজ অনেক পাখি উড়ছে; আর আছে ঝরঝিরে এলোমেলো হাওয়া। মাঝে মাঝে চিনির গুঁড়োর মতো বৃষ্টি পড়ছিল। এত পাখি, এত হাওয়া, আকাশের এত অজস্র নীল—আশ্বিন মাসটা যেন চারদিকে জাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

শরৎকাল কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আমাকে মুগ্ধ করে রাখতে পারল না। আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। টের পাচ্ছি, নিয়তির মতো অদৃশ্য প্রবল একটা কিছু আমাকে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আমার নেই।

একসময় এসপ্ল্যানেড এসে গেলাম। এখান থেকে বাস বদলে শ্যামবাজারে যখন নামলাম, চারটে বাজতে মিনিট দশেক বাকি।

বাস স্টপেজের উলটো দিকের গলিটায় আমাকে যেতে হবে। বিজনের সঙ্গে দিন কুড়ি বাইশ আগে একবার মোটে এখানে এসেছিলাম; তাও বেশ রাত করে। তবু দেখেই চিনতে পারলাম। রাস্তাঘাট একবার দেখলেই আমার মনে থেকে যায়; কিছুতেই আর ভুলি না।

ট্রাম-বাসের রাস্তা পার হয়ে গলিটায় ঢুকে পড়লাম। এখন বুকের সেই অসহ্য কাঁপুনিটা সারা গায়ে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো রক্তের ভেতর কি যেন ভেঙে পড়ছে। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো হেঁটে চললাম।

সাপের মতো পাকানো গলিটার শেষ মাথায় সেই পুরনো দোতলা বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম, সামনের এক ফালি রকে বিজন দাঁড়িয়ে আছে। তার দু পাশে সুধীর সেন নিখিল বোস সুধাময় লাহিড়ী আর চিন্ময় রায়। ওরা বিজনের বন্ধু। সুধীর সেন নিখিল বোস বিজনের কলিগ; এক অফিসে কাজ করে। সুধাময় লাহিড়ী একটা ছোটখাট পাবলিসিটি ফার্মের ফি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। চিন্ময় রায় ব্যারাকপুরের কাছে একটা স্পনসর্ড কলেজে ইংরেজির লেকচারার।

বিজনরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ডানধারের দেওয়ালে কাঠের নেমপ্লেট আঁটা। তাতে লেখা আছে—শ্রীনরেশচন্দ্র নাগ এম এ বি এল। প্লিডার অ্যান্ড ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

এক পলক নেম-প্লেটটা দেখলাম। তার পরেই আমার চোখ বিজনের মুখের ওপর স্থির হল।

বিজনের বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশের মতো। পাতলা ধারল চেহারা। গায়ে এক গ্রাম বাড়তি মেদ নেই। নাকমুখ কাটা কাটা, জোড়া ঘন ভুরু। তীক্ষ্ণ চিবুক। হাত এত লম্বা যে হাঁটু ছুঁই ছুঁই করছে। গায়ের রং কালোও না, ফর্সাও না, দু-য়ের মাঝামাঝি। চিবুকের তলায় মুসুর ডালের মতো একটা বড় তিল। বয়স খুব কম হয় নি; তবে এখনও চকচকে তাজা ভাবটা আলতোভাবে সারা মুখে মাখানো। খানিকটা দূর থেকে দেখলে ছেলেছোকরা মনে হয়।

বিজনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ কুঁচকে যেতে লাগল। অল্প অল্প রাগও হল। নাঃ, বিজনকে নিয়ে আর পারা যায় না।

ক'দিন আগে পছন্দ-টছন্দ করে একটা নক্‌শাপাড় তাঁতের ধুতি আর খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে কেটের পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছিলাম। বারবার বলেছি, আজ যেন ওদুটো পরে। কিন্তু আপনারাই দেখুন,

একটা আধময়লা ধুতি আর স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট গায়ে দিয়ে হাজির হয়েছে। দাড়ি-টাড়ি অবশ্য কামিয়েছে, তবে চুল এলামেলা, ভাল করে আঁচড়ায়নি পর্যন্ত। মুখে না একটু পাউডার, না সারা গায়ে একটু সেন্ট-টেন্ট। এ যেন অনেকটা মোড়ের দোকানে এক কাপ চা খেতে যাওয়া কিংবা একটা সিগারেট ধরানোর মতো ব্যাপার।

আপনারাই ভেবে দেখুন, আজকের দিনে কেউ এভাবে আসে! তিরিশ বছর বয়স হলেও আমি তো একটা মেয়ে; আমার সাধটাধগুলো এখনও একবোরে মরে যায় নি। কিন্তু সেদিকে বিজনের খেয়ালই নেই। আপনারা ওকে চেনেন না কিন্তু চোদ্দ পনের বছর ধরে আমি তো দেখছি, কোনো কথাই বিজনের মনে থাকে না। কানের ভেতর যা-ই ঢুকিয়ে দিন না, তক্ষুনি ও ভুলে যাবে। এমন ভুলো মানুষ আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। এই পৃথিবীতে বিজন যেন খানিকটা অন্যমনস্কের মতো দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। সব জেনেও আমার রাগ কিন্তু যাচ্ছে না; আজকের দিনে একটু সেজে-টেজে এলে মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হয়ে যেত! এই দিনটা এ জীবনে আর তো আসবে না। অথচ দেখুন, ও যা বলেছে তাই করেছি; ওর পছন্দমতো চুল বেঁধেছি, নখে রং দিয়েছি, সোনার গয়না-টয়না পরেছি, সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়েছি। কমলালেবু রঙের সিল্কের শাড়িটা বিজনই কিনে দিয়েছিল। চড়া রংটং আমার ভাল লাগে না, তবু ও খুশি হবে বলে পরেছি। কিন্তু বিজন আমার কথা রাখে নি।

আচমকা সুধীর সেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ম্যাডাম, রাস্তায় দাঁড়িয়েই শুভদৃষ্টিটা সেরে ফেলবেন নাকি?'

সুধীর সেন চিরকালের ফাজিল। চমকে চোখ নামিয়ে নিলমা। টের পেলাম, আমার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে।

চিন্ময় রায় বলল, 'এখানে আর দাঁড়াতে হবে না। চলুন ভেতরে যাই।'

মুখ না তুলেই রকে উঠে এলাম। তারপর ওদের সঙ্গে বাঁ-হাতি দরজা দিয়ে সামনের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

ঘরটা প্রকান্ড। মাঝখানে বড় একটা টেবল। তার ওধারে সিংহাসনের মতো গদিওলা বড় চেয়ার। এধারেও ক'খানা ছোট ছোট কাঠের চেয়ার। মাথার ওপর দু ব্লেডওলা পুরনো আমলের ফ্যান।

এক পাশে দেয়ালের ধার ঘেঁষে তক্তপোশ; তার ওপর ছেঁড়া ময়লা ফরাস পাতা। অন্য তিনদিকের দেওয়ালের গায়ে দশ বারটা আলমারি। মোটা মোটা আইনের বই আর জার্নালে ঠাসা। আলমারিগুলো আর আস্ত নেই; কাচ টাচ ভেঙে ধুলোবালি জমে ওগুলোর গা-মাথা বোঝাই। দেখেই টের পাওয়া যায়, দু চার বছরের ভেতর আলমারিগুলো খোলা হয় নি। মোটা মোটা সব বই উই এবং আরশোলার খাদ্য হয়ে উঠেছে।

একেক জন এককেটা চেয়ারে বসে পড়লাম। প্লিডার-কাম-ম্যারেজ রেজিস্ট্রার রমেশচন্দ্র নাগকে এখন এ ঘরে দেখা যাচ্ছে না; তাঁর চেয়ারটা ফাঁকা, খুব সম্ভব ভেতরে আছেন।

নিখিল বোস থলথলে ভারী মানুষ, মাংস এবং হাড়-টাড়ের চাইতে তার গায়ে চর্বি বেশি। এই আশ্বিন মাসেও ভীষণ ঘামছিল। পাঞ্জাবিটা ফাঁক করে গলার কাছে বারকতক ফুঁ দিয়ে হাওয়া খাবার চেষ্টা করল সে। বলল, 'উহ্, কি গরম! একবোরে 'বয়েল্ড' হয়ে গেলাম।' বলেই দেওয়ালের গায়ে সুইচ খুঁজে বার করে ফ্যানটা চালিয়ে দিল। ঘড়াং ঘড়াং করে পাখা ঘুরতে লাগল।

সুধাময় লাহিড়ী বলল, 'ফ্যানটা দেখেছিস? নাইনটিন টেনের মডেল। যেন সুদর্শন চক্র রে. মাথার ওপর ভেঙে না পড়লে হয়।'

সবাই হাসল। তারপর সুধীর সেন হঠাৎ আমাকে বলল, 'আপনার জন্যে খুব চিন্তায় ছিলাম ম্যাডাম—'

নখ খুঁটতে খুঁটতে আধফোটা গলায় বললাম, 'কেন?'

'কেন বুঝতে পারছেন না?'

সত্যিই পারছিলাম না; মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লাম।

সুধীর সেন আবার বলল, 'এর আগে দু'বার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দিয়ে শেষ পর্যন্ত

আসেন নি। মনে পড়ে? কী ভোগান যে ভুগিয়েছিলেন! বিজন শালার মুখ শুকিয়ে আমসি। ভাবলে বকুলরানী বুঝি ভো-কাট্টা হয়ে গেল!'

দারুণ লজ্জা পেয়ে গেলাম। আপনা থেকেই আমার চোখ আবার মেঝের দিকে নামল। সুধীর সেন ঠিকই বলেছে। বছর চারেক আগে একবার আর মাস আটেক আগে একবার, মোট দু'বার বিয়ের সব ব্যবস্থা করেও আমি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে যাই নি। আমার দুর্বলতা আমার দ্বিধা আমার ভীরুতা যেতে দেয় নি। এরা যেন আঁচল ধরে আমাকে পেছনে দিকে টেনে রেখেছিল। আজ অবশ্য দুহাতে সব বাধা সরিয়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি। আমার মতো মেয়েরে মধ্যে যে এতখানি দুঃসাহস ছিল, সেটাই আশ্চর্য!

চিন্ময় রায় খুব বেশি কথা-টথা বলে না। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে, আর হাসে। মাঝে মধ্যে ফাঁক-টাক বুঝে এক-আধটা মন্তব্য করে। সে বলল, 'এবারটা লাস্ট। আজ যদি না আসতেন, বিজন আপনার সঙ্গে আর রিলেশান রাখত না।'

মুখ ফিরিয়ে বিজনকে একবার দেখে নিলাম, সে-ও আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল, চোখাচোখি হতে হাসল। আমি আবার মেঝের দিকে তাকালাম।

সুধীর সেন ওধার থেকে দুম করে বলে বসল, 'আজ আপনাকে টেরিফিক দেখাচ্ছে। যা সেজেছেন না!'

আমার ঘাড় ভেঙে মাথা আরো অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল।

সুধাময় লাহিড়ী বলল, 'ক্যামেরা এনেছি। যুগল মিলন হয়ে গেলে আজ গুনে গুনে সাঁইত্রিশখানা ছবি তুলব।'

বিজন কী বলতে যাচ্ছিল, বাড়ির ভেতর থেকে রমেশবাবু এ ঘরে এলেন! ভদ্রলোকের বয়স ষাটের ওপরে; মাথাটা এর মধ্যেই সাদা হয়ে গেছে। খুব শান্ত, সুদর্শন চেহারা। পরনে ধবধবে ধুতি আর হাফহাতা পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা চটি।

ওঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ব্যস্তভাবে রমেশবাবু বললেন, 'বসুন আপনারা, বসুন।' বলতে বলতে সেই গদিওলা প্রকাণ্ড ফাঁকা চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তারপর আমরাও বসলাম।

ভদ্রলোককে দেখে আমি কিন্তু ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছি। ঘাড়-গলা ঘামে ভিজে উঠেছে। টের পাচ্ছি, কপালে-গালে চিবুকে ঘামের দানা জমছে। অথচ আজ আমার জীবনে সব চাইতে সুখের দিন।

বিজনদের সঙ্গে মিনিট কয়েক গল্প-টল্প করে রমেশবাবু বললেন, 'এবার তা হলে আসল কাজটা সেরে নেওয়া যাক।'

সবার হয়ে সুধাময় তক্ষুনি সায় দিল, 'নিশ্চয়ই, দেরি কবার কী দরকার। আমাদেব একে জনকে একেক জায়গায় ফিরতে হবে। দিনকাল যা হয়েছে, কখন ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যাবে—'

আসল কাজটা সারতে আধঘণ্টাও লাগল না। রমেশবাবু কিছু প্রশ্ন করলেন, সম্মোহিতের মতো উত্তর দিয়ে গেলাম। আরো কী কী সব কথা হল। রমেশবাবু মন্ত্রের মতো, নাকি অঙ্গীকার জাতীয় কী একটা বলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিজন আর আমিও বললাম। তারপর বড় একটা বাঁধানো খাতায় বিজন আর আমি পাশাপাশি সই করলাম। সুধাময়রাও সাক্ষী হিসেবে সই করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি বকুল, ভীরু দুর্বল একটা মেয়ে, একজনের আইনসম্মত স্ত্রী হয়ে গেলাম।

এই দিনটাকে ঘিরে আট দশ বছর আগেও আমার কিছু স্বপ্ন ছিল; সেই স্বপ্নের রেশ এখনও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায় নি। এক দঙ্গল বরযাত্রী নিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে এই বয়সে যদি বিজন আমাদের বাড়ি যেত, খুবই লজ্জা পেতাম। তবে নিজেকে তো জানি, খুব একটা খারাপও লাগত না।

আমার এমন বিয়ে হবে, কে ভেবেছিল! একটা শাঁখ বাজল না, উলুর শব্দ শোনা গেল না। চালখেলা-জলখেলা-শুভদৃষ্টি, পুরুতের মন্ত্রপাঠ, বাড়িভর্তি লোকজন-আলোটালো, আমাকে ঘিরে আনন্দের বান ডাকল না। এমনকি আপনজন বলতে যারা, তাদের কেউ এ বিয়েতে আসে নি। আমিই তাদের আসতে বলি নি।

কেউ না দেখুক, কেউ না জানুক, শ্যামবাজারের অন্ধ গলিতে ধুলোবালি বোঝাই এক পুরনো বাড়িতে আমার বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল। আপনারাই বলুন, এমন বাহুল্যহীন, কাটছাঁট, মেড-ইজি-মার্কা বিয়েতে কোনো মেয়ের মন ভরে!

বিজনরা রমেশবাবুর ফী মিটিয়ে দিয়ে একসময় বলল, 'এবার আমরা উঠি।'

রমেশবাবু বললেন, 'আসুন—'

বিজনরা উঠে পড়ল। ওদের দেখাদেখি আমিও উঠলাম। হঠাৎ আমার কী হয়ে গেল; দু পা এগিয়ে রমেশবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। মনে মনে যে চাইছিলাম, আজকের দিনে কেউ আমাকে একটু আশীর্বাদ করুক।

বাবার বয়সী বৃদ্ধ মানুষটি পা সরিয়ে নিলেন না। আমার মাথায় একটা হাত রেখে প্রসন্ন মুখে বললেন, 'উকিল হিসেবে হিসেবে আমি ব্যর্থ, কিন্তু বিয়ের পুরুত হিসেবে খুবই সাকসেসফুল। আমার হাত দিয়ে কম করে পাঁচ সাতশ বিয়ে হয়েছে; সবগুলো হ্যাপি ইউনিয়ন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সুখী হোন।'

বৃদ্ধ সৌম্য মানুষটির শুভকামনা এবং আশীর্বাদ খুব ভাল লাগল।

একটু পর আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

* * *

যখন শ্যামবাজারের এই গলিটায় ঢুকেছিলাম তখনও সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছিল। গাঁদাফুলের রঙের মতো উজ্জ্বল টাটকা রোদ কলকাতার গায়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল।

এখন সূর্য নেই; পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ওধারে নেমে গেছে। আকাশে এক ধরনের মন্থর আলো। তবে এই আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। জলে কালি গুলবার মতো বাতাসে কালচে রং মিশতে শুরু করেছে। আশ্বিনের এই দিনটার আয়ু খুব বেশি হলে আর মিনিট পনের কুড়ি। তারপরেই ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে।

গলি পার হয়ে আমরা ট্রাম রাস্তায় এসে গেলাম। চারদিকের দোকানগুলোতে এর মধ্যেই আলো জ্বলে উঠেছে। কর্পোরেশনের আলোগুলোও এক এক করে জ্বলতে শুরু করেছে। এধারের কোন একটা সিনেমা হলে শো ভেঙেছে, গল গল করে লোক বেরিয়ে আসছিল।

ফুটপাতগুলো হকারদের দখলে; ইট আর কাঠের বাক্স-টাক্স সাজিয়ে ওরা দোকান সাজিয়ে বসেছে। তার ভেতর দিয়ে হাঁটাই মুশকিল।

ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে আমরা শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার দিকে এগুচ্ছিলাম। সন্ধে নামছে দেখে আমরা ভাবনা হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। আমাদের ওদিককার রাস্তায় আলোটালো জ্বলে না। একটু রাত হলেই চারদিক নির্জন হয়ে যায়। অন্ধকার ফাঁকা রসাতায় একা-একা হাঁটতে ভয় করে।

খুব আস্তে বিজনকে ডাকলাম, 'অ্যাই—'

বিজন মুখ ফেরাল, 'কী বলছ?'

'আমি এখন বাড়ি যাব।'

বিজন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমার ডান পাশ থেকে সুধাময় ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'বাড়ি যাবেন মানে? আমি যে তা হলে এত আয়োজন-টায়োজন করলাম, সেগুলো নষ্ট করবার জন্যে?'

আমি অবাক, 'কিসের আয়োজন?'

'গেলেই বুঝতে পারবেন।'

'কোথায় যাব?'

'আপাতত শ্যামবাজারের মোড়ে; সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে পাইকপাড়ায়।'

'পাকপাড়ায় কী?'

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে সুধাময় নাটকের হিরোর মতো বলল, 'এই অধমের বাড়ি।'

পাইকপাড়া হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'বেশি রাত হলে—'

আমাকে শেষ করতে দিল না সুধাময়, 'নতুন বউ কোথায় লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখ বুজে থাকবে, তা নয়, শুধু কথা।'

চিন্ময় গলা মোটা করে বলল, 'এখন আমরা বরকর্তা। যা বলব লক্ষ্মী মেয়ের মতো করতে হবে।'

আমাকে আর কোনো কথাই ওরা বলতে দিল না। একটু পর শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম। গাড়িটা সোজা টালা ব্রিজের দিকে ছুটল।

পেছনের সিটে বসে স্পষ্টভাবে কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। টুকরো টুকরো অসংলগ্ন নানারকম চিন্তা আমার মাথায় এলোমেলো ছায়া ফেলে যেতে লাগল।

হঠাৎ একসময় মনে পড়ল, এ বিয়েতে আমার মা-বাবা ভাই-বোনরা যেমন আসে নি তেমনি বিজনদের বাড়ি থেকেও কেউ আসে নি। ওদের ব্যারাকপুরের ভাড়া-বাড়িতে অনেকদিন আগে একবার নিয়ে গিয়েছিল বিজন। সেখানে আছে বিজনের বুড়ি বিধবা মা, এক বিধবা দিদি এবং তার এক গাদা কাচ্চাবাচ্চা। বাচ্চাগুলো পোকার মতো বাড়িময় কিলবিল করে বেড়ায়। আর আছে সধবাও না, বিধবাও না, কুমারীও না, এক ডিভোর্স হওয়া ছোট বোন। বিয়ের কথা তাদের বলে নি বিজন; বলা সম্ভবও ছিল না। আমি তো ওর বাড়ির লোকদের চিনি। যেমন স্বার্থপর তেমনি—

ভাবনার সুতোটা কট করে ছিঁড়ে গেল। সুধীরের গলা শুনতে পেলাম। সে বিজনকে বলছে, 'তোর বউকে কী বলে ডাকতে হবে রে?'

বিজন বলল, 'তোর চাইতে আমি ছ'মাসের বড়। বৌদি বলে ডাকবি।'

'ছ'মাসের বড় আবার বড় নাকি? বৌদি-টৌদি বলতে পারব না।'

চিন্ময় আচমকা বলে উঠল, 'তা হলে ছোট মাসিই বলিস।'

সবাই হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠল। অনুভব করলাম, আমার কানেব লতি লাল হয়ে উঠেছে।

সুধীর এবার আমার দিকে ফিরল, 'আপনিই বলে দিন, কী বলে ডাকব?'

আবছা গলায় বললাম' 'ইচ্ছে হলে নাম ধরে ডাকতে পারেন।'

বিজনের কানে টুসকি মেরে সুধীর বলল, 'শোন, শালা, তোর বউ কী বলছে—'

চিন্ময় বিজনকে বলল, 'বিয়ে করবার জন্যে তো দশ-সালা পরিকল্পনা নিয়েছিলি। এবার বউ নিয়ে সংসার করতে ক'বছর লাগাবি?'

চোখ অল্প তুলে বিজনকে দেখে নিলাম। ওর মুখটা এই মুহূর্তে ভীষণ করুণ দেখাচ্ছে, আর বড় দুঃখী। কয়েক, পলক। তারপরেই তুড়ি মেরে সব দুঃখ উড়িয়ে দেবার মতো করে হেসে হেসে বিজন বলল, 'দেখি ক'বছর লাগে। হয়তো আরেকটা টেন-ইয়ার মাস্টার প্ল্যান করতে হবে।'

'তোদের দেখছি দশ বছর ছাড়া কোনো প্ল্যান হয় না!'

'যা বলেছিস।'

চিন্ময়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নাইনটিন সিক্সটিতে আমরা ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব। সেই বিয়ে হল আজ নাইনটিন সেভেনটিতে এসে। বিজন আর আমার মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। এখন বিয়েটাই শুধু হবে; পরে দু'জনের সুবিধামতো আমরা সংসার পাতব। সেই সুযোগটা কবে আসবে তা অবশ্য এক্ষুনি বলা যাবে না।

ট্যাক্সিটা টালা ব্রিজ পার হয়ে আরো খানিকটা উত্তরে গিয়ে ডান দিকে ঘুরল। তারপর পলক পড়তে না পড়তেই হুস করে মণীন্দ্র রোডের একটা ছিমছাম একতলা বাড়ির দরজায় এসে থামল।

দরজাটা খোলা ছিল। ট্যাক্সি থেকেই দেখতে পেলাম, ক'টি উৎসুক মুখ সেখানে ভিড় করে আছে। একটি ফর্সা গোলগাল সুখী চেহারার বউ, আমারই বয়সী হবে—সবার সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে একটি কিশোরী, বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী এবং দু তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে।

আমাদের ট্যাক্সি থামতেই কিশোরী মেয়েটি গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজাতে লাগল। গোলগাল বউটি ছুটে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে আমাব একটা হাত ধবে বলল, 'আসুন ভাই, আসুন—' আমাকে নামিয়ে

এনে বিজনের দিকে ফিরে খুব রগড়ের গলায় বলল, 'চমৎকার বউ হয়েছে বিজন ঠাকুরপো; একটু সামলে সুমলে রাখবেন; নইলে দেখবেন অন্যের নজর লেগে যাবে।'

বিজন হেসে হেসে বলল, 'মন্তর দেওয়া আছে; নজরে কিছু হবে না।'

বউটি হেসে ঘাড়-টাড় বাঁকিয়ে বলল, 'খুব-খুব—'

'খুবই তো।'

কথা বলতে বলতে বিজন ট্যাক্সি থেকে নেমে এল; তার পেছন পেছন সুধাময় চিন্ময় সুধীর আর নিখিল। ওদের মধ্যে কেউ একজন ভাড়া মিটিয়ে দিতেই ট্যাক্সিটা চলে গেল।

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। শাঁখ বাজিয়ে রাস্তা থেকে ডেকে নেবার জন্য কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, এ ছিল অকল্পনীয়। সব ব্যাপারটাই যেন এক মনোরম ষড়যন্ত্রের মতো। আপনারাই বলুন, ষড়যন্ত্র ছাড়া একে আর কী বলতে পারি!

পকেট থেকে মোটা চুরুট বার করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিল সুধাময়। তারপর বউটিকে দেখিয়ে আমাকে বলল, 'আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

বউটির সঙ্গে সুধময়ের সম্পর্ক কী, মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সুধাময় আবার মুখ খুলবার আগেই কাচ ভাঙার শব্দের মতো মিষ্টি একটা ঝঙ্কার দিয়ে বউটি বলল, 'তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। পরিচয় টরিচয় যা করবার নিজেরাই করে নিচ্ছি।' বলে আমার দিকে ফিরল। বলল, 'আমার নাম বিজু, মানে বিজলী।' সুধাময়কে দেখিয়ে বলল, 'আর এই চুরুটমুঠো আমার প্রাণেশ্বর।' ওরা যে দারুণ সুখী, এক পলকেই টের পাওয়া গেল। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। আজকাল সুখের সংসার ক'টাই বা চোখে পড়ে! আমার সব চাইতে কাছে যারা, অর্থাৎ বাবা আর সৎ-মা, জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখে আসছি, ওদের সম্পর্কটা নিয়ত যুদ্ধের। শুধু কি ওরাই, ওই তিরিশ বছরের জীবনে কম সংসার তো দেখলাম না, কিন্তু সুখী স্বামী-স্ত্রী ক'টা আর চোখে পড়েছে। বাবা আর সৎ-মায়ের মতো হয় যুদ্ধ করে, নয়তো লোকদেখানো জোড়াতাড়া দিয়ে কোনোরকমে সবাই চালিয়ে যাচ্ছে।

সুধাময়দের বাড়ি আগে আর কখনও আসি নি। এলে বিজলীর সঙ্গে কবেই আলাপ-টালাপ হয়ে যেত। শুধু সুধাময়ই নাকি, বিজনের কোনো বন্ধুর বাড়িই যাই নি। বিজন অবশ্য অনেক বার নিয়ে যেতে চেয়েছে; ওর বন্ধুরা অনুরোধ করেছে; কিন্তু আমার ভীষণ লজ্জা করত।

বিজলীর পরিচয় জানা হয়ে গেছে। এবার নিজের নাম-টাম বলতে যাব, তখনই বাধা পড়ল। বিজলী তাড়তাড়ি বলে উঠল, 'কিছু বলতে হবে না; আপনার নাম আমি জানি। শুধু নামই না, নাড়ি-নক্ষত্র সব।' পাতলা ঠোঁটে দাঁত বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে সে হাসতে লাগল।

খুব নিচু গলায় বললাম, 'কার কাছে শুনেছেন?'

'কার কাছে আর নতে পারি বলুন!' আঙুল দিয়ে বিজনকে দেখিয়ে বিজলী বলল, 'ওই যে আসামী, ওর কাছে। ভদ্রলোক যখনই এ বাড়ি আসে, একটা নামই জপ করে যায়। শুধু বকুল, বকুল আর বকুল। যেন বকুল ছাড়া বাংলা ভাষার আর কোনো শব্দ নেই।'

হঠাৎ সুধীর সেনের ভারী মোটা গলা শোনা গেল, 'রাস্তার ওপরেই পর্লামেন্টের অধিবেশন বসে গেল! দুটো মেয়ে একসঙ্গে হলে আর রক্ষে নেই; জোড়া ইঞ্জিন চলতে থাকে। দয়া করে চারদিকে একবার দেখা হোক।'

চমকে মুখ তুলতেই দেখতে পেলাম, আশপাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালায় ভিড় জমে গেছে। অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ আমাদের ওপর স্থির, নিবদ্ধ।

বিজলী হাত মুঠো করে সুধীর সেনকে একটা কিল দেখাল। তারপর আমার হাত ধরে বলল, 'চলুন ভাই—'

সেই কিশোরী মেয়েটি এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজিয়ে যাচ্ছে। একুশ বাইশ বছরের তরুণীটি একদৃষ্টে আমাকে দেখতে দেখতে মুখ টিপে হাসছিল। বাচ্চাগুলো আশপাশের বাড়ির। বাচ্চাগুলোর চোখেও পলক পড়ছিল না।

বাড়ির ভেতর যেতে যেতে জেনে ফেললাম, কিশোরীটি বিজলীর মেয়ে, তরুণীটি বোন আর বাচ্চাগুলো আশপাশের বাড়ির। কিশোরীর নাম খুকু, তরুণীটি রুবি।

চমৎকার সাজানো একটা ঘরে এনে বিজলী আমাকে বসাল। বিজনরাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল; তারাও চারপাশের সোফা-টোফায় বসে পড়ল।

বিজলী ঘরের সবাইকে লক্ষ করে বলল, 'এখন কী খাবেন বলুন? চা না কফি?'

মাথার পেছন দিকে দু হাত ছড়িয়ে আর্মচেয়ার হতে হতে চিন্ময় বলল, 'এই গরমে চাও না, কফিও না। স্রেফ ঘোলের শরবত।'

বিজনরা গলা মিলিয়ে সায় দিল, 'গরমে শরবতই আদর্শ পানীয়!'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কি ভেবে বিজলী ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। বলল, 'এখানে এদের মধ্যে বসে থেকে কী হবে? আসুন আমার সঙ্গে—' বিজনকে বলল, 'নিয়ে যাচ্ছি মশাই, দেখবেন আবার হার্ট ফেল না হয়ে যায়—'

বিজন বলল, 'হার্ট আমার বেশ স্ট্রং আছে।'

নাকটাকে কুঁচকে রগড়ের সুরে বিজলী বলল, 'জানা রইল।' তারপর আমাকে নিয়ে চলে গেল।

এখান থেকে বেরিয়েই শরবত করতে বসল না বিজলী। প্রথমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিচের ঘর-সংসার দেখাতে লাগল। ওদের বাড়িটা ছোটখাট হলেও বেশ ছিমছাম আর ঝকঝকে। মোট চারখানা ঘর। তা ছাড়া কিচেন, বাথরুম।

একটা ঘর আগেই দেখেছি। আরো দু'খানা ঘর দেখলাম, কিচেন বাথরুম দেখলাম। কিন্তু দক্ষিণ দিকের ঘরটা কিছুতেই দেখাল না বিজলী। উঁকিঝুঁকি দিয়ে যে দেখে নেব, তার উপায় নেই। শেকল তুলে তালা লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

অভদ্রতা জেনেও ফস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ঘরটা দেখালেন না?'

বিজলী বলল, দেখাব, তবে এখন না।'

আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। বললাম, 'কী আছে ও ঘরটায়?'

চোখের তার, ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল বিজলী। রহস্যময় হেসে আচমকা আমার গাল টিপে দিয়ে চাপা নিচু গলায় বলল, 'বাব রে বাবা, মেয়ের আর তর সয় না।'

খুকু আর রুবি আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরছিল। লক্ষ করলাম, ওরাও হাসছে। চোখাচোখি হতেই হাসি চেপে গম্ভীর হবার চেষ্টা করল মেয়ে দুটো, কিন্তু বৃথাই। ঠোঁটে-চোখে-গালে-চিবুকে অবরুদ্ধ হাসি চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে আটকে যাচ্ছে।

কোথায় যেন একটা গভীর চক্রান্ত চলছে। আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

বাড়ি-গাড়ি দেখানো হলে আমাকে নিয়ে রান্নাঘরে এসে শরবত বানাতে বসল বিজলী। খুকু রুবি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। বাচ্চাগুলো সামনের প্যাসেজটায় ঘুরঘুর করতে লাগল।

বিজলী বলল, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে কখন এসেছিলেন?'

বিজলী সবই জানে, দেখা যাচ্ছে। আস্তে করে বললাম, 'চারটের সময়।'

'বিজন ঠাকুরপোদের সঙ্গে?'

'না। আমি একলাই এসেছি। ওরা আমার আগে এসে অপেক্ষা করছিল।'

বিজলী মুখ ফিরিয়ে খুকু রুবিকে বলল, 'তোরা এখান থেকে যা তো। বড়রা যখন কথা বলবে, ছোটদের সেখানে থাকতে নেই।' রুবিরা চলে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা থাকলে ফ্রি-লি গল্প করা যাবে না। আমার মুখ আবার দারুণ আলগা। কখন কী বেরিয়ে যাবে।'

আমি হাসলাম।

বিজলী আবার বলল, 'আপনারা অনেকদিন স্ট্রাগল করেছেন। বিয়েটা যে শেষ পর্যন্ত হবে, এ আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। বিজন ঠাকুরপো একেক দিন এসে মুখ কালো করে বসে থাকত। যাক, বিয়ে হয়ে গেছে। আমি যে কি খুশি হয়েছি!'

মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগলাম।

বিজলী বলতে লাগল, 'বিজন ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি, দশ বছর আগেই আপনাদের বিয়ে সেটেল্ড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দু'বার নোটিশ দিয়েও আপনি নাকি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে আসেন নি। কেন?'

আমি যে দুর্বল, আমি যে ভীরু, সে কথাটা আর জানালাম না। শুধু বললাম, 'এই নানারকম ঝঞ্ঝাট—'

বিজলী বলল, 'অথচ দেখুন, আপনাদের মতো আমাদের স্ট্রাগল্‌ও কম ছিল না। আমার বাবা খুব বড়লোক, বিরাট স্ট্যাটাস। আর সুধাময় গরিব ঘরের ছেলে। বছর পনের আগে, ও তখন সবে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে, রোজগার টোজগার কিছু নেই। বঝুতেই পারছেন আমার বাবার দিক থেকে কিরকম বাধা আসতে পারে। আমরা কিন্তু কিছুই মানি নি।'

এ গল্প আমার জানা। আমার সাহস উসকে দেবার জন্য বিজন প্রায়ই বিজলীদের উদারহণ দিত। কাছাকাছি এত বড় একটা দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আমার আজন্মের ভয়টা কিছুতেই কাটত না।

বিজলী থামে নি, 'আসল কথাটা কী জানেন?'

'কী?'

'চোখকান বুজে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়। আমার বিয়ের পর চার বছর বাবা-মা কোনো সম্পর্ক রাখে নি। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনাদেরও ঠিক হয়ে যেত। একটু সাহসের অভাবে দশটা বছর নষ্ট হল।'

অস্পষ্ট গলায় বললাম, 'সবাই কি ঝাঁপ দিতে পারে?'

একটু চুপ। মুখের সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলছিল বিজলীর। নকশা-করা কাচের গেলাসে শরবত ভর্তি করে ট্রে-তে দিতে দিতে ডাকল, 'রুবি—খুকু—'

রুবিরা এলে ওদের হাতে শরবতের ট্রে দিয়ে বাইরের ঘরে, যেখানে বিজনরা বসে আছে, পাঠিয়ে দিল বিজলী। আমাদের জন্যও শরবত রেখে দিয়েছিল সে। একটা গেলাস আমাকে দিয়ে আরেকটা নিল সে তারপর বলল, 'লতিকা মাধবী আর অরুণা আজ যদি থাকত, খুব আনন্দ হত। ওরা যা হুল্লোড় করতে পারে!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওঁরা কারা?'

'লতিকা হল সুধীর ঠাকুরপোর মিসেস। অরুণা নিখিল ঠাকুরপোর। মাধবী চিন্ময় ঠাকুরপোর।'

'কেন, কী হয়েছে ওঁদের?'

'অরুণা কাল অপারেশন করিয়েছে। অন্তত দিন পনের তার নড়াচড়া বারণ।'

'কিসের অপারেশন?'

'প্রচুর বাচ্চা হচ্ছিল ওর। আট বছরে—' বিজলী হাসতে লাগল, 'নিখিল ঠাকুরপোটার তো কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। সে যাকগে, অরুণা আর ফাঁসতে রাজি না। তাই কাটিয়ে কুটিয়ে নিল। আপনাকে আগেভাগেই বলে রাখছি ভাই, বিজন ঠাকুরপোকে একদম আশকারা দেবেন না। ম্যাক্সিমাম দুটো বাচ্চা—ব্যস—'

আমার কানটান ঝাঁঝাঁ করছে; নাকের ডগায় দানা দানা ঘাম জমতে লাগল।

বিজলী হয়তো আমাকে লক্ষ করে নি; আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'মাধবী হাজারিবাগে বাপের বাড়ি গেছে, লতিকার ছেলের খুব জ্বর। তাই কেউ আসতে পারে নি।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার কপালের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল বিজলী। বলল, 'এ কী!'

ওর বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠলাম, 'কী হয়েছে!'

'বিজন ঠাকুরপোটা কী!'

'কেন, কী করেছে?'

'কী করে নি, তাই বলুন! নতুন বউ; তাকে একটু সিঁদুর টিদুর পরায় নি পর্যন্ত! সিঁদুর না হলে বউ বলে মনে হয়! আসুন—' আমি উঠবার আগেই এক টানে আমাকে পাশের ঘরের একটা ড্রেসিং

টেবিলের সামনে নিয়ে বসিয়ে দিল বিজলী তারপর কিছু বুঝবার সময় না নিয়েই সিঁথিতে একগাদা সিঁদুর লাগিয়ে দিল, কপালে দিল ডগডগে মস্ত এক টিপ।

আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। নিজেকে চিনতে পারছিলাম না। একটুখানি সিঁদুর আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে আপনারা যে বকুলের কথা শুনেছেন সে কি এ-ই?

আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। বললাম, 'এ কী করলেন ভাই!'

আমার চিবুকের তলায় একটা আঙুল রেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখটা দেখতে লাগল বিজলী। মুগ্ধ গলায় বলল, 'কী সুন্দর দেখতে লাগছে এখন!'

আমি বাড়ির কথা ভাবছিলাম। এই সিঁদুর-টিঁদুর নিয়ে ফিরব কী করে? বাবা, সৎ-মা, হাবু-বাচ্চু-গণেশ বা পাড়ার লোকেদের চোখ যখন ছুঁচের মতো আমার মুখে বিঁধতে থকবে, কী কৈফিয়ত দেব? আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে হিম নামতে লাগল। ভীষণ দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। আবছা গলায় বললাম, 'আপনি আমাকে খুব বিপদে ফেললেন ভাই।'

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না বিজলী। বলল, 'এস তো ভাই আমার সঙ্গে।' বলেই জিভ কাটল, 'এই রে, 'তুমি' করে বলে ফেললাম যে—'

'তাতে কী হয়েছে। তুমি করেই বলবেন—'

'বলতে পারি। তবে এক শর্তে—'

'কী?'

'আমাকেও তুমি করে বল্‌তে হবে।'

বিজলীর আন্তরিকতা, তার সরল সুন্দর স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করছিল। প্রথম থেকেই সে এমনভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করছে যেন আমি তার কতকালের চেনা। তার জন্যই আজকের এই ম্যাড়মেড়ে ন্যাড়া দিনটা উৎসব উৎসব লাগছে। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা—'

আমার গালে টুসকি মেরে বিজলী খুশির গলায় বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ে। এখন এস তো আমার সঙ্গে —কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ না দিয়ে টানতে টানতে বিজলী আমাকে বাইরের ঘরে বিজনদের কাছে নিয়ে গেল।

ওরা জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। বিজলী বিজনকে ডাকল, 'ও মশাই, শুনছেন—'

বিজন ঘাড় ফেরাতেই বিজলী বলল, 'উঁহু উঁহু, আমার দিকে না। এদিকে তাকান; দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা—' বলেই আমাকে সামনে ঠেলে দিল।

বিজন আমার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। পলকহীন দেখতেই লাগল। বিজনের এই চোখ আমার কতকালের চেনা।

নিখিল বলল, 'আরে আরে, এ কে রে? চিনি চিনি করি, চিনতে না পারি—'

সুধাময় বলল, 'আমার থ্রম্বসিস হয়ে যাবে মাইরি।'

আচমকা সুধীর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই শালা বিজন; তোর চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেছে যে রে। মরে গেলি নাকি!'

সবাই হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠল।

বিজন প্রথমটা চমকে গিয়েছিল। তারপর বোকাটে মুখে হাসতে লাগল।

আমি কারো দিকেই তাকাতে পারছিলাম না। ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়ছিল। হাত-পায়ের জোড় আলগা-আলগা হয়ে আসছিল। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঘামতে শুরু করেছিলাম। এখন জামা-কাপড় ভিজে একাকার। শরীরে জলীয় পদার্থ আজ আর একটুও থাকবে না মনে হচ্ছে। সব বেরিয়ে যাবে।

বিজলী আমাকে একটা সোফায় বসিয়ে দিল। তারপর নানারকম ঠাট্টা-ফাট্টা এবং গল্প চলতে লাগল। আস্তে আস্তে আমার আড়ষ্টতা কেটে যেতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারলাম না, কপাল আর মাথাভর্তি জ্যাবজেবে সিঁদুর নিয়ে কেমন করে বাড়ি ফিরব?

একসময় সুধীর বলল, 'বিজন শালার বিয়েটা ঠিক বিয়ের মতো হল না। কোথায় সানাই বাজবে, পোলাও মাংসের গন্ধে চারদিক মাত হয়ে যাবে, কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন করব, তা না। শালা খাতায় সিগনেচার মেরে দিয়ে করিয়ে আনলাম।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কী?' সবাই সুধীরের দিকে তাকাল।

'বিজনের বিয়েটা ভাল করে সেলিব্রেট করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।' সবাই একসঙ্গে সায় দিল', 'প্রস্তাব পাশ।'

সুধাময় বলল, 'কোনো ছুটির দিনে স্টিমার পার্টি দিলে কেমন হয়? ভোরবেলা একটা লঞ্চটঞ্চ ম্যানেজ করে বেরিয়ে পড়া যাবে। সারাদিন হই-হুল্লোড় করব। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, যার যা খুশি চালিয়ে যাবে, তারপর সন্ধেবেলা ফিরে আসব।'

সুধাময় বলল, 'গ্র্যাণ্ড। পুজো এসে গেল। তার পুজোর মধ্যে একটা দিন ফিক্স কর।'

'ঠিক আছে। তবে একটা কথা—'

'কী?'

'বাজে ভেজাল নেওয়া হবে না। ওনলি আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াইভস্। অনেক বন্ধু আজ আসতে পারে নি, তাদেব বলতে হবে। কেউ কিন্তু বাচ্চা-কাচ্চা নিতে পারবে না; ট্যা-ভ্যাঁ জোটালে আনন্দের বারটা বেজে যাবে।' বলতে বলতে সুধীর নিখিলের দিক তাকাল, 'অ্যাই, তোর যেন ক'টা ছেলেমেয়ে?'

চোরের মতো মুখ করে লিখিল বলল, 'পাঁচটা—'

'পাঁচটা তো ছ'মাস আগে বলিছিলি রে : এর ভেতর আর প্রোডাকশন করিস নি? তোর যা কারবার।'

বিজনের কাছে শুনেছি, নিখিলের ছেলেপুলে বেশি বলে বন্ধুরা তার পেছনে দারুণ লাগে। দু চার মাস পর পরই জিজ্ঞেস করে, আর সংখ্যা বৃদ্ধি হল কিনা। নিখিল তাতে ভীষণ খেপে যায়।

ঘরের সবাই খুব হাসছিল। নিখিল ধাঁ করে পাশের টেবল থেকে একটা ফুলদানি তুলে সুধীরের দিকে তাক করল, 'শালা, তোকে খুন করে ফেলব।'

দু হাত জোড় করে সুধীর বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝলাম এর, ভেতর নতুন প্রজা সৃষ্টি হয় নি। না জেনে অবোধ বালক আমি, জিজ্ঞেস করে ফেলেছি।'

চিন্ময় ওধার থেকে বলল, 'তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই সুধীর।'

সুধীর বলল, 'কি রকম?'

'ছ'মাসে মানুষের বাচ্চা হয়?'

লক্ষ করলাম চিন্ময়ের মুখটা সরল ভালমানুষের মতো। কিন্তু চোখ আধবোজা এবং ঝকঝক করছে; ঠোঁট দুটো টেপা। টের পাওয়া গেল, সুধীরকে উসকে দেবার জন্যই ওই রকম একটা নিরীহ প্রশ্ন করছে চিন্ময়।

সুধীর বলল, 'আরে কী আশ্চর্য, তাই তো! এত ছেলেপুলে দেখে ভেবেছিলাম, নিখিলটা হয়তো সাব-হিউম্যান গ্রুপের—'

ফুলদানিটা উঁচুতে তুলে নিখিল গর্জে উঠল, 'আবাব শালা, আবার—'

হাতজোড় করাই ছিল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে মজার ভঙ্গি করে সুধীর একটানা বলে যেতে লাগল, 'ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা—'

নিখিল ফুলদানিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এক নম্বরের খচ্চর।'

মাথা তুলে সুধীর বলল, 'আমাকে যা খুশি বল। কিন্তু ছানাপোনাগুলোকে এবারটা অন্তত আনিস না ভাই। তোর তো আবার হোল ফ্যামিলি ছাড়া নড়ার অভ্যাস নেই। ফর গডস সেক, একদিনের জন্যে তোর বাহিনীকে ফাদার-ইন-ল'র বাড়ি চালান করে দিস।'

বিজলী বলল, 'বেশি বাহিনী বাহিনী করবেন না মশাই। অরুণা অপারেশন করিয়ে নিয়েছে। ফিউচারে আর ফাজলামো করার চান্স নেই।'

ব্যাপারটা কেউ জানত না। সুধীররা নিখিলের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'শালা পাষন্ড, এরকম একটা কান্ড করলি। আমাদের জানালি নি পর্যন্ত!'

নিখিল উত্তর দিল না। সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে ধোঁয়ার গোল গোল আংটি ছাড়তে লাগল।

চিন্ময় জিভের ডগায় আক্ষেপের শব্দ করে বলল, 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্র সম্ভাব্য এক ডজন ভোট থেকে বঞ্চিত হল।'

ঘরের সবাই হেসে উঠল। তার মধ্যেই হঠাৎ বিজলীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এ কি মশাই, এ কি!'

দেখলাম, বিজলী একদৃষ্টে বিজনের দিকে তাকিয়ে আছে। থাকতে থাকতে তার ভুরু টুরু কুঁচকে যেতে লাগল।

বুঝতে না পেরে বিজন বলল, 'কী হল?'

বিজনের জামা কাপড়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিজলী বলল, 'এই গাঁট-কাটার বেশে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন! আপনি তো অদ্ভুত লোক!'

বিজলী যা বলল তা আমারই মনের কথা। বিজনকে একলা পেলে আমিই বলতাম; হয়তো এভাবে না। তবু বিজলীর রগড় আর খোঁচা খুব ভাল লাগল।

বিজন ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে চট করে একবার আমাকে দেখে নিল। তারপর বলল, 'সেজেগুজে বরবেশে আসতে হলে এ জীবনে আমার আর বিয়ে করা হত না।'

'মানে?' বিজলীর কপালে গভীর রেখায় ভাঁজ পড়তে লাগল।

'আপনি তো আমাদের বাড়ির খবর জানেন। সেজে বেরুতে হলে হাজার রকম জবাবদিহি করতে হত। তার চাইতে এই ভাল।' বিজন বিজলীকে বলছিল ঠিকই কিন্তু লক্ষ্যটা আমি। সুযোগ পেয়েই সেই নতুন ধুতি-পাঞ্জাবিটা পরে না আসার কৈফিয়ত দিয়ে রাখল বিজন। কম চালাক সে।

বিজলী মাথা হেলিয়ে বলতে লাগল, 'ভাল তো বলবেনই। বেশ খেলেন দেলেন। গোঁফ মুছে বাড়ি চলে গেলেন, কেউ টেরটি পেল না।'

বিজন হাসতে লাগল, 'যা বলেছেন—'

'কিন্তু ওটি হবে না। বিয়ের দিনে এভাবে আপনাকে থাকতে দেব না।',

বিজন হাসিমুখে বলল, 'কী করতে হবে বলুন। বান্দা প্রস্তুত—'

বিজলী বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বিজন সুবোধ বালকের মতো উঠে পড়ল। কিছুক্ষণ পব যখন বিজলীর সঙ্গে ফিরে এল, তাকে আর চেনা যায় না। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবিতে বিজনকে দারুণ দেখাচ্ছে। বুঝতে পারলাম, এই পোশাকগুলো সুধাময়ের।

বিজলীর হাতে পড়ে আমার মতো বিজনও বদলে গেছে। খুব ভাল লাগছিল তাকে।

আমার পাশে বিজনকে বসিয়ে দিয়ে বিজলী সুধীরদের দিকে ফিরে বলল, 'দেখুন এবার কিরকম লাগছে।'

চিন্ময় বলল, 'ফাইন। গাঁটকাটাটাকে বেড়ে দেখাচ্ছে তো।'

'তা হলে বলুন, কেমন একখানা ম্যাজিক টাচ দিয়েছি!'

সুধীর সেন ঢাকার ছেলে। খাঁটি দেশের ভাষায় বলতে লাগল, 'কবে যে বিয়া করছিলাম, মনেও পড়ে না। দুই তিন সেঞ্চুরি হইয়া গেল বোধ হয়। বিজন হালারে দেইখা আরেকখান বিয়ার সাধ হইতে আছে।'

বিজলী চোখের তারায় সুধীরকে বিঁধতে বিঁধতে বলল, 'খুব লতিকাকে বলে সাধ মেটাবার ব্যবস্থা করছি।'

নিখিল কিছুই বলে নি। শুধু ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে ফ্ল্যাশলাইটে একের পর এক আমাদের ফোটো তুলে যেতে লাগল।

শেষ ফোটোটা যখন তোলা হয়েছে সেই সময় আমার চোখ সামনের দেওয়ার ঘড়িটায় আটকে গেল। এখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা। এতক্ষণ গল্পে গল্পে, ঠাট্টায় এবং রগড়ে বাড়ির কথা মনে ছিল না। আমি অঞ্চল হয়ে উঠলাম। বিজলীকে বললাম, 'অনেক রাত হয়ে গেল ; এবার চলি।'

এমন অদ্ভুত কথা আগে আর কখনও যেন শোনে নি বিজলী। অনেকক্ষণ অবাক তাকেয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'সে কী!'

'আমরা সেই এক্সট্রিম সাউথে থাকি। এখান থেকে যেতে কম করে দু আড়াই ঘণ্টা লেগে যাবে। তার মানে প্রায় সাড়ে ন'টা দশটা হবে। যা দিনকাল, একা একা অতটা রাস্তা যাওয়া-বুঝতেই পারছ—'

'বাড়ি ফিরতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আজ না ফিরলে হয় না?'

'না না ; কিছু বলে আসি নি। না ফিরলে সবই ভাববে।'

পলকহীন তাকিয়ে ছিল বিজলী। বলল, 'ঠিক আছে। আগে খেয়ে টেয়ে নাও তো। তারপর বাড়ি ফিরতে দেওয়া হবে কিনা, বিবেচনা করে দেখব।'

খেতে গেলে আরো আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যাবে। বললাম, 'আজ থাক, আরেক দিন এসে ঠিক খেয়ে যাব।'

'আরেক দিনের কথা আরেক দিন ভাবা যাবে। আজ সারা দুপুর উনুনের ধারে বসে বসে যে এত রান্না বান্না করলাম সেগুলোর কী হবে?'

বোঝা গেল, না খাইয়ে ছাড়বে না বিজলী। বাড়িতে বলা আছে বিয়েবাড়ি যাচ্ছি। তার মানে আমার জন্য খাবার দাবার কিছু থাকবে না। ওরা ধরেই নেবে আমি খেয়ে যাব। বিয়েবাড়ি থেকে কে আর না খেয়ে ফেরে! বিজন আর আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে একটা ভালো রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে নেব। কিন্তু বিজলীদের বাড়ি এসে সব গোলমাল হয়ে গেল।

এখন যদি না খেয়ে চলে যাই, আজকের রাতটা নির্ঘাত উপোস দিয়ে কাটাতে হবে।

বিজলী ডাকল, 'এস আমার সঙ্গে—' সুধীরের দিকে ফিরে বলল, 'আপনারাও আসুন।'

রান্নাঘরের পাশেই চমৎকার খাবার ঘর। প্রকাণ্ড একটা টেবলের দু'ধারে আট দশখানা গদিওলা চেয়ার সুন্দর করে সাজানো।

বিজলী আমার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। বিজনকে বলল, 'বকুলের পাশে বসুন।'

বিজন গাঁইগুঁই করতে যাচ্ছিল ; বিজলী ধমকে উঠল, 'বসুন তো। আজ বউয়ের পাশে বসে খেতে হয়।'

বিজন বলল, 'নিয়ম নাকি?'

বিজলী হেসে হেসে বলল, 'নিয়মই তো।'

'বেশ, নিয়মরক্ষাই তা হলে করা যাক—' দুম করে আমার পাশে বসে পড়ল বিজন। সুধাময়রাও বসে পড়েছিল।

এবার গাছকোমর বেঁধে পরিবেশন শুরু করল বিজলী। খুকু আর রুবি এটা-সেটা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে লাগল। প্রচুর আয়োজন করেছে বিজলী। চার রকমের মাছ, ফ্রায়েড রাইস, মটন-চিকেন দু'রকমের মাংস, আনারসের চাটনি, দই, সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা। হই-চই করে খাওয়া চলতে লাগল।

খেতে খেতে ভাবলাম, এখান থেকে আর বাস-টাস ধরব না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে চলে যাব। সেখান থেকে বাসে উঠব। যে সময়টা খাওয়ার পেছনে নষ্ট হবে ট্যাক্সি করে সেটা মেক-আপ করা যাবে। অবশ্য এই মাসের শেষে সাত-আট টাকা ট্যাক্সিভাড়া দেওয়া আমার মতো মেয়ের পক্ষে খুবই কষ্টের ব্যাপার, কিন্তু কী আর করা যাবে!

খাওয়ার পর বিজনরা বাইরের ঘরে চলে গেল। আমি খাবার ঘরেই থেকে গেলাম। বিজলীকে বললাম, 'এবার কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই—'

বিজলী চোখ কুঁচকে একটু হাসল শুধু ; কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'আমাকে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিন।'

বিজলী ঘাড় বাঁকিয়ে. বলল, 'এটা কিরকম হল? আমি তোমাকে 'তুমি' করে বলছি। আর তুমি কিনা 'আপনি' চালিয়ে যাচ্ছ! শর্ত ভঙ্গ হচ্ছে কিন্তু—'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি করেই বলছি। একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দাও ভাই।'

আমার গালটা জোরে টিপে দিয়ে বিজলী বলল, 'তুমি তো আচ্ছা মেয়ে—' তার বলার ধরনে এমন কিছু আছে যাতে অবাক হলাম, 'কেন, কী করেছি!'

'বিয়ের দিনে খালি পালাই পালাই—'

'আমার অবস্থা তো জানো না।'

'জানতে চাই না। আজ তোমাকে ছাড়া হবে না।'

চমকে উঠলাম, 'কিন্তু আমাদেব বাড়ি—'

বিজলী বলল, 'বাড়ির কথা আজ না ভাবলেও চলবে। রাতটা এখানেই বন্দি থাকবে। তোমাক নিয়ে কী করা যায়, কাল ভেবে দেখব।'

এ রকম একটা ফাঁদে পড়তে হবে জানলে কে এখানে আসত! করুণ মুখ কবে বলতে লাগলাম, 'আজ না ফিরলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।'

'কী?'

'বাড়িতে'

'চুপ—' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বিজলী বলল, 'আর একটা কথাও না।' বলেই আমাকে টানতে টানতে দক্ষিণ দিকে সেই বন্ধ ঘরটার সামনে নিয়ে এল। তারপর শেকল খুলে যেই বোতাম টিপে আলো জ্বালল অমনি আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে হাজাব ঢেউ উঠতে লাগল।

ঘরের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে ডাবল-বেড নতুন খাট; তাতে নরম নির্ভাজ বিছানা। হলুদ সিল্কেব চাদরের ওপর নানা রঙের চমৎকার চমৎকার নকশা। পাশাপাশি দুটো বালিশ পাতা ছিল; সেগুলোব ওয়াড়ে সুন্দর কাজ-করা। জোড়া পরী, প্রজাপতি—এমনি কত কী। ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিযে দেখবাব মতো এখন মনের অবস্থা নয়।

সব চাইতে যা বেশি করে চোখে পড়ে তা হল ফুল। গোটা বিছানা জুড়ে জুঁই, রজনীগন্ধা, বেল ছড়ানো রয়েছে। ছত্রিগুলো দেখা যায় না; ফুলের মালা দিয়ে সেগুলো জড়ানো।

সমস্ত ঘরটায় যেন ফুলের হায় বসানো। সুন্দর গন্ধে আমার মাথাব ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।

এই ঘরটা তখন আমাকে দেখায় নি বিজলী। কেন দেখায় নি, এখন যেন অল্প অল্প বুঝতে পারছি। বাতাসে একটা চক্রান্তের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। ঝাপসা গলায় বললাম, 'এখানে কী?'

আমার নাক ধরে নাড়তে নাড়তে ঠোঁট ছুঁচলো করে বিজলী বলল, 'ন্যাকা—'

আমি দ্রুত চোখ নামিয়ে নিলাম।

বিজলী চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, 'এ ঘরে আজ তোমার ফুলশয্যা। বরের কাছে শুতে হবে, বুঝলে?'

আমার গায়ে তক্ষুনি কাঁটা দিল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কী বলবার জন্য চোখ তুলে দেখি বিজলী নেই; কখন বেরিয়ে গেছে।

একটু পর বিজলী ফিরে এল। সঙ্গে বিজনরা।

বিজলী বিজনকে লক্ষ করে বলল, 'দেখুন, ঘরটা পছন্দ হয় কিনা—'

বিমূঢ়ের মতো মুখ করে বিজন বলল, 'মানে?'

'এরা দু'জনেই দেখছি ন্যাকা ; ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।' কৌতুকের গলায় বিজলী বলতে লাগল, 'নতুন বউ নিয়ে একটা রাত কাটাবার পক্ষে ঘরটা কি খুব খারাপ হবে?'

সুধীর সারা ঘরে এক চক্কর ঘুরে এসে বলল, 'এতক্ষণে হালায় বিয়া বিয়া মনে হইতে আছে। কিন্তু এইটা কিরকম হইল বৌদি?'

'কোনটা?' বিজলী সুধীরের তিকে তাকাল।

'এই একদিনেই বিয়া আর ফুলশয্যা—'

'কী আর করা যাবে। এই বিয়েতে এরকম ফুলশয্যাই হয়।'

'সব মেড-ইজি ব্যাপার।'

বিজন জলে-ডোবা মানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ফাঁক পেয়ে বলল, 'এর কোনো মানে হয়! আমাদের ফিরতে হবে—'

বিজলী প্রায় ধমকেই উঠল 'বেশি ওস্তাদি করবেন না মশাই—' বলেই সুধাময়দের নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং বাইরে থেকে তক্ষুনি দরজা বন্ধ করে দিল।

এখন এ ঘরে বিজন আর আমি ছাড়া কেউ নেই। বিজন একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছিল। আমি বিছানার এককোনে জড়সড় বসে আছি।

এই মুহূর্তটাকে নিয়ে সব মেয়েই মনে মনে স্বপ্ন দেখে ; আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু এত আচমকা বিজলী আমাকে আর বিজনকে যে ফুলের মেলায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে, ভাবতে পারি নি। এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ঝপ করে আমার পাশে বসে পড়ল বিজন। বলল, 'কী ঝামেলায় পড়া গেল বল তো! বাড়ি না ফিরলেই নয়। মা'র সেই সিম্পটমটা আজ আবার দেখা দিয়েছে।'

বিজনের বিধবা মা পাগল। মাঝে মাঝে বেশ ভাল থাকে; তারপর হঠাৎ একদিন গন্ডগোল দেখা দেয়। তখন তাকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়ে বিজনরা।

ভাল দিনেই আমাদের বিয়ে হল। বললাম, 'মাঝখানে তো অনেকদিন কোন সমস্যা ছিলনা।'

হ্যাঁ, বছর খানেকের মতো। একসঙ্গে এতদিন মা আর কখনও ভাল থাকে নি।'

আমি চুপ করে রইলাম।

বিজন বলল, 'ভেবেছিলাম, মা বোধহয় আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু—' তার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।

বললাম, 'হঠাৎ আবার এরকম হল যে?'

বিজন ক্লান্তভাবে হাসল, 'না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার। আমাদের সংসারটা কেমন, তুমি তো জানো। তার মধ্যে মা একটা বছর কী করে যে ভাল থাকল!'

বিজন তাদের বাড়ির সব কথাই আমাকে বলেছে! দু একবার সেখানে নিয়েও গেছে। ওদের সংসারে সবসময় যেন একটা অগ্নিকান্ড ঘটে আছে। বিজনের মা, বিধবা দিদি, ডিভোর্স-হওয়া বোন, ভাগনে-ভাগনীরা—যখনই ওদের বাড়ি যাওয়া যাক, দেখা যাবে, কেউ না কেউ গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে যাচ্ছে। বিজন বলে, 'আমাদের বাড়িটা একটা ব্যাটল-ফিল্ড। ওয়ার্ল্ডের সব লড়াই একদিন না একদিন থামে; কিন্তু এ লড়াই থামবার নয়।'

আমি কিছু বললাম না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বিজন দূরমনস্কের মতো সিগারেট খেতে লাগল। সেটা ফুরিয়ে এলে টোকা দিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হঠাৎ আমার কাঁধে একখানা হাত রাখল।

বিজন এর আগেও অনেকবার আমাকে ছুঁয়েছে, কাঁধে-ঘাড়ে-গলায় হাত রেখেছে। সুযোগ-টুযোগ পেলে দু একটা চুমুও খেয়েছে। তবু অসাবধানে ইলেকট্রিকের তারে ছোঁয়া লাগার মতো আমার রক্তের ভেতর ঝন ঝন করে কী যেন ভাঙতে লাগল। পরক্ষণেই শরীরটা দারুণ অবশ হয়ে গেল।

লক্ষ করলাম, বিজনের চোখ ধীরে ধীরে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন স্থির, মুগ্ধ। পাতলা কুয়াশার মতো সেখানে কী জমছে।

বিজন অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার আরেকটা হাতও কখন আমার কাঁধে উঠে এসেছিল। আমাকে বেষ্টন করে বিজন তার বুকের ভেতর টেনে নিল।

আইনত বিজন আমার স্বামী। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের খাতায় পাশাপাশি সই দিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়েছি। তবু বিজনের বুকের ভিতর আমার ভীষণ ভয় করছে। চুরি করে অন্যায় ভাবে আমরা যেন নিষিদ্ধ খেলায় মাততে চলেছি।

আমাদের এই বিয়েটা আইনের দিক থেকে নিখুঁত, তবু আমার দ্বিধা কিছুতেই কাটছে না। শাঁক-টাখ বাজিয়ে, পুরুত ডেকে, অগ্নিসাক্ষী করে আত্মীয় স্বজনদের সামনে যদি আমার বিয়ে হত, বিজনের সঙ্গে এক ঘরে ঢুকে অনায়াসেই দরজায় খিল লাগাতে পারতাম। লজ্জা নিশ্চয়ই করত কিন্তু এমন ভয় লাগত না। আমার মধ্যে সংস্কার-ভীরু একটা মেয়ে আছে; সে বড় অবুঝ।

বিজন চাপা গলায় বলল, 'বিজলী বৌদি যা কান্ড করল, আজ আর যাওয়া যাবে না বোধহয়।'

উত্তর দিলাম না।

বিজন আবার বলল, 'দশ বছর লাগল বিয়ে করতে। ফুলশয্যা হতে আরো ক'বছর লেগে যেত, কে জানে। এ একরকম ভালই হল। কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়।' বিজন হাসতে লাগল।

আমি হাসলাম না। খুব আস্তে বললাম, হয়তো আমার সেই ভয়টাই বলিয়ে দিল, 'বাড়ি ফিরব।'

বিজন ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। বলল, 'আজ না হয় না-ই গেলে। মোটে একটা তো রাত—'

'বাড়িতে খুব চিন্তা করবে—'

বিজন আর কিছু বলল না; আমাকে আরেকটু কাছে টানল। তার বুকের ভেতর মিশে যেতে যেতে অনুভব করলাম, আমার হৃৎপিন্ড ভীষণ লাফাচ্ছে। তার মধ্যেই বিজনের মুখ আমার ঠোঁটে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য আগুনের হালকা আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কে জানত, তিরিশ বছর বয়েসেও এ দেহ মশাল হয়ে উঠতে পারে। আমার ভয়, সংস্কার ক্রমশ মুছে যেতে লাগল। নিজের অজান্তেই দু'হাতে বিজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

আর ঠিক সেই সময় কাচের বাসন ভাঙার মতো শব্দ করে বাইরে বিজলী হেসে উঠল। হাসতে হাসতে জড়ানো স্বরে বলল, 'বিজন ঠাকুরপো, একটু রেখে ঢেকে। একদিনেই মেয়েটাকে খেয়ে ফেলবেন না।'

'শক' খাওয়ার মতো বিজন এবং আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে দু' দিকে ছিটকে গেলাম; আর তখনই সেই ভয়টা আবার আমাকে তার মুঠোর ভেতর পেয়ে গেল।

ওদিকে বিব্রতভাবে কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থাকল বিজন। তারপর গলা তুলে বিজলীকে ডাকল, 'বৌদি—'

কিচেনের ওধার থেকে বিজলীর গলা ভেসে এল, 'আমি চলে যাচ্ছি ভাই। আর আপনাদের ডিসটার্ব করব না। সুখের পানসি চালিয়ে যান।'

বিজনকে কিছুটা দ্বিধান্বিতের মতো দেখাল। তার পরেই সে আমার দিকে ফিরল। হেসে হেসে বলল, 'সুধাময়ের বউটা যাচ্ছেতাই।'

আমি যেন বিজনের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। ফস করে আবার বলে ফেললাম, 'আমি বাড়ি যাব।'

'তখন থেকে শুধু 'বাড়ি যাব' বাড়ি যাব করে যাচ্ছ। কী এমন কাজ বাড়িতে?'

'তখনই তো বললাম, না গেলে সবই ভাববে। তাছাড়া—'

'কী?'

'আমার খুব ভয় করছে।'

মুহূর্তে বিজনের মুখ কালো হয়ে গেল, 'ভয়! আমাকে?'

উত্তর দিলাম না; মুখ নিচু করে দাড়িয়ে থাকলাম।

বিজন একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ভারী, শিথিল গলায় বলল, 'চল তবে—'

চকিতে একবার মুখ তুললাম। বিজনকে অত্যন্ত হতাশ আর করুণ দেখাচ্ছে, আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু নিজের মধ্যেকার ভীরুতা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি কোথাও খুঁজে পেলাম না।

বিজলী এ ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিল; শেকল-টেকল কিছু দেয় নি। বিজন গিয়ে টানতেই দরজা খুলে গেল।

সাজানো ফুলের মেলা ছেড়ে একটু পর আমরা সুধাময়দের বাইরের ঘরে চলে এলাম। বিজলী, সুধাময়, রুবি আর খুকু চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছিল। সুধীরদের দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই চলে গেছে। যাবার আগে আমাদের আর বিরক্ত করে নি।

বিজন আর আমাকে দেখে বিজলীরা অবাক। অনেকক্ষণ তাদের চোখে পলক পড়ল না। তারপর বিজলীই প্রথম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'কী ব্যাপার, তোমরা!'

আমি উত্তর দেবার আগেই বিজন বলল, 'হ্যাঁ, আমরা!'

বিজলী বলল, 'চলে এলেন যে!'

'বারে, বাড়ি ফিরতে হবে না?'

'তার মানে!'

'মানে খুব সহজ। বাড়ি না গিয়ে উপায় নেই।' বিজন হাসতে লাগল!

বিজলী খুব দ্রুত একবার আমাকে, আরেকবার বিজনকে দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এই তো দু'জনকে ও ঘরে রেখে এলাম। এর মধ্যে কী এমন হল! ঝগড়া করেছেন নাকি?'

'কী আশ্চর্য, নতুন বউয়ের সঙ্গে কেউ বিয়ের দিনে ঝগড়া করে? বকুলকে জিজ্ঞেস করুন না।' বিজলীর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমার দিকে ফিরল বিজন, 'অ্যাই, তুমিই বল না।'

লক্ষ করলাম, একটু আগে ওঘরে যা হয়ে গেছে, বিজনের মুখে-চোখে তার এতটুকু ছাপ নেই। হেসে হেসে সে সব উড়িয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, আমি কিছু বললাম না।

বিজলী বলল, 'কী জানি বাবা, আপনাদের কিছুই বুঝি না।'

সুধাময় এতক্ষণে মুখ খুলল, 'সত্যি সত্যি যাবি?' বিজনের কথা সবটা সে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

বিজন বলল, 'হ্যাঁরে, যেতেই হবে।'

সুধাময় বলল, 'তোরা একেবারে থার্ড ক্লাস। এর কোনো মানে হয়!'

বিজলী বলল, 'শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল কেনা হল। অতগুলো টাকাই গচ্চা।' তাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে।

বিজন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'রাগ করবেন না বৌদি। ফুলে ফুলে ঘর সাজিয়ে আমাদের ঢুকিয়ে দিলে কী হবে, কপালে নেই।'

'আমাদের আনন্দ-টানন্দ বলে একটা কথা আছে। ইচ্ছে করলেই আজকের রাতটা থেকে যেতে পারতেন।'

বিজন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিজলী সদর দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল। সুধাময় এল রাস্তার মোড় পর্যন্ত। আমাদের একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে সে ফিরে গেল।

ট্যাক্সিয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

বিজন আমাকে বলল, 'তোমাকে কি বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে?'

মুখ নামিয়ে আধফোটা গলায় বললাম, 'না। এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গেলেই হবে। আমি ওখান থেকে বাস ধরব।'

বিজন ট্যাক্সিওলাকে বলল, 'এসপ্ল্যানেড তো চলুন, 'তারপর দেখা যাবে।'

· ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

আমরা পাশাপাশি বসে আছি ঠিকই কিন্তু কেউ যেন কাউকে চিনি না। বিজনের মুখ জানালার

বাইরে ফেরানো। আমি নতচোখে আঙুলে শাড়ির আঁচলটা একবার জড়াচ্ছি, জড়িয়েই তক্ষুনি খুলে ফেলছি। আবার জড়াচ্ছি। বিজনের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। ওর জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আজকের দিনে বিজনকে দুঃখ দিলাম, এই ভাবনাটা ঘুণপোকার মতো আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু কী করব? আমি যে বড় ভীরু, বড় দুর্বল।

দু'ধারের বাড়িঘর দোকানপাট, রাস্তার আলো, দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত মুখ তুলতে পারলাম। বিজন অন্যমনস্কের মতো এখনও বাইরে তাকিয়ে আছে।

এখন শরৎকাল। রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঁচু উঁচু বাড়ির মাথা ডিঙিয়ে আকাশের মাঝ-মধ্যিখানে উঠে এসেছে। অমল জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

দু তিনবার চেষ্টার পর আমার গলায় স্বর ফুটল। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, 'এই—'

বিজন মুখ ফেরাল না। বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে বলল, 'কী বলছ?'

সামনের আয়নায় ট্যাক্সিওলা হয়তো আমাকে দেখতে পাচ্ছে। তবু বিজনের দিকে অনেকখানি সরে গিয়ে বললাম, 'রাগ করেছ?'

'না, রাগ কিসের?'

'করেছ ; আবার বলছ কিসের। আমি যেন কিছু বুঝি না।'

'বোঝো নাকি!' বিজন এতক্ষণে আমার দিকে তাকাল, 'আজকের রাতটা থেকে গেলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যেত? সুধাময়রা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে।'

উত্তর দিলাম না।

বিজন আবার বলল, 'কি, চুপ করে আছ যে?'

'কী বলব? তুমি তো আমাকে জানো—'

এক পলক কি ভেবে বিজন চাপা ক্ষোভের গলায় বলল, 'শুধু ভয়, ভয় আর ভয়—'

তার একটা হাত ধরে বললাম, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—' আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল।

বিজন হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ওই দেখ, শুধু শুধু কাঁদছে!' আমাকে তার দিকে টেনে নিয়ে আদরের গলায় বলল, 'কী বোকা মেয়ে!' বলতে বলতে হেসে ফেলল।

বিজন যেন শরৎকালের মেঘ, বেশিক্ষণ মুখ ভার করে থাকতে পারে না। একটু পরেই উজ্জ্বল রোদের মতো ঝলমলিয়ে ওঠে।

একসময় আমরা এসপ্ল্যানেড এসে গেলাম। ট্যাক্সিওলা আবার পেছনে তাকাল, 'এখানেই নামবেন?'

হাতঘড়ি দেখে বিজন চমকে উঠল। আমাকে বলল, 'আরে বাবা, ন'টা বেজে গেছে। এখানে নেমে আর দরকার নেই। চল তোমাকে আরেকটু এগিয়ে দিয়ে আসি—' ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, 'রাসবিহারীর মোড় চলুন—'

যেতে যেতে বিজন বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। মনে থাকতে বলে নিই।

'কী কথা?'

'বিয়েটা যখন হয়েই গেল, বেশিদিন আলাদা থাকার মানে হয় না।'

আমি চুপ।

বিজন বলতে লাগল, 'লাইফের অর্ধেক পার করে ফেললাম। এবার নিজেদের কথাও একটু ভাবতে হবে। দু-একদিনের ভেতর বিয়ের খবরটা বাড়িতে জানাবো। তুমিও জানিও।'

ভয় পেয়ে গেলাম, 'বাড়িতে জানাবো!'

'না জানাবার কী আছে! আমরা কি চুরি করেছি?' বিজনকে উত্তেজিত মনে হল, 'অন্যের বোঝা বয়ে বয়ে কত দিন আর কাটাব?'

আমি জানি, বিজনের এই উত্তেজনা অল্পক্ষণের। সে বা আমি যেখানে আছি খুব সহজে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। বাইরে বিজনের সঙ্গে যখন দেখা হয়, আমরা অনেক কথা বলি,

অনেক রকম দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু যেই বাড়ি ফিরে আসি মনে হয় একটা ফাঁদে আটকে গেলাম। আমাদের নিজেদের মধ্যেই কোথায় যেন একটা পিঞ্জর আছে, সেটা ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারি না।

বিজনের উত্তেজনা আলতোভাবে আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'হ্যাঁ, বাড়িতে বলতে হবে।'

বিজন বলল, 'বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে ভাবছি গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের ফ্ল্যাট নেব। তুমি কী বল?'

এই পরিকল্পনাটা আমাদের অনেকদিনের। বিয়ের পর গভর্নমেন্ট স্কিমের ফ্ল্যাট নেব, কতবার এ নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখেছি। বললাম, 'খুব ভাল হবে।'

'বাড়িতে আলটমেটাম দাও। বোলো দুমাসের মধ্যে যে যার ব্যবস্থা করে নাও; তারপর একদিনও তুমি ওখানে থাকছ না।'

'আচ্ছা—'

ট্যাক্সির চাকার তলা দিয়ে অ্যাসফাল্ট-দেওয়া মসৃণ রাস্তা সট সট বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে বিব্রতভাবে বললাম, 'এই, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?'

'কী?'

'এই দেখ না, বিজলীদি এনতার সিঁদুর লাগিয়েছে। এ সব নিয়ে কী করে বাড়ি ফিরব!'

ভালমানুষের মতো মুখ করে বিজন বলল, 'কী করতে চাও?'

'তুমিই বল না কী করব?'

'আমি কী বলব? কী করলে তোমার সুবিধে হবে, তুমিই জানো—'

ট্যাক্সির ভেতরকার আবছা অন্ধকারে বিজনের চোখের ভেতর তাকিয়েই মুখ ফেরাতে হল। ও কী ভাববে, বুঝতে পারছি না। ভীরু, শিথিল স্বরে তবু বললাম, 'সিঁদুরটা না মুছে গেলে—'

বিজন প্রায় আঁতকে উঠল। চাপা গলায় বলল, 'কী সর্বনাশ!'

চমকে উঠলাম, 'কী হল!'

'সিঁদুর মুছলে আমার কী হবে? বিয়ের দিনেই চাও আমি দেহরক্ষা করি—'

মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে হিম নেমে গেল। বললাম, 'কী যা-তা বলছ!'

আমার নাকে আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে বিজন ঠোঁট ছুঁচলো করল। বলল, 'কুসংস্কারের ডিপো একটি। সিঁদুর মুছেই বাড়ি যেও—'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ।'

রুমাল বার করে ঘষে ঘষে সিঁদুর তুলতে লাগলাম। আরো খানিকক্ষণ পর রাসবিহারীর মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বিজন চলে গেল।

* * *

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে রাসবিহারীর মোড় থেকে শহরতলির বাসে উঠলাম। তারপর আধঘন্টাও লাগল না; বাসটা নির্দিষ্ট স্টপেজে আমাকে পৌঁছে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে আলো-টালো চোখে পড় না। চারদিকে অন্ধকার। আজও বোধ হয়ে ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে কোনো গন্ডগোল হয়েছে। ইদানীং আমাদের এদিকটায় প্রায়ই লাইট্ নিবে যাচ্ছে। তিনঘন্টা, চার ঘণ্টা, কোনো কোনো দিন সারারাতই অন্ধকারে থাকতে হয়। এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন।

মোড়ের দোকান-টোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন নেই। শুধু 'ভূপতি কেবিন' আর হরেনের পান-বিড়ির দোকানটা এখনও খোলা। ওরা টিমটিমে হেরিকেন ঝুলিয়ে রেখেছে সামনে। হরেনের দোকানে হরেন ছাড়া আর কেউ নেই।

হেরিকেনের আলোয় ঝুঁকে নোট আর রেজগি গুনে থাক থাক করে রাখছিল হরেন। খুব সম্ভব সারাদিনের বেচাকেনার হিসেব করছে। 'ভূপতি কেবিন'-এ কিন্তু কয়েকজনকে দেখা গেল। দূর থেকে হেরিকেনের আলোয় ওদের চিনতে অবশ্য পরলাম না। তবে জানি সারা রাত খোলা থাকলেও 'ভূপতি

কেবিন'-এ খদ্দেরের অভাব হবে না। চা-বিস্কুট-কেক-পোচ-অমলেট সামনের দিকে বিক্রি হয় কিন্তু পেছনে ছোট একটা ঘর আছে; সেকানে সারা দিনরাত জুয়ার আড্ডা চলে। পুলিশ কতবার যে হানা দিয়েছে, তার ঠিক নেই। 'ভূপতি কেবিন'-এর মালিক ভূপিত তালুকদারকে তিন চার বার থানায় ধরেও নিয়ে গেছে, কিন্তু জুয়া বন্ধ করা যায় নি।

এখান থেকে মিনিট কয়েক হাঁটলে তবে আমাদের বাড়ি। এই রাত্রিবেলা অন্ধকার ফাঁকা রাস্তায় একা একা যেতে সাহস হল না। ডান দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, বড় পাকুড় গাছটার তলায় রিক্‌শা-স্ট্যান্ড। এখনও দু-তিনটে সাইকেল রিকশা মিটমিটে বাতি জ্বালিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা রিকশা ডেকে উঠে পডলাম। বড় রাস্তা থেকে রিকশাটা যখন আমাদের খোয়া-ওঠা গলিতে ঢুকতে যাচ্ছে সেই সময় কে ডাকল, 'এই দিদি—এই—'

চমকে পেছনে ফিরতেই দেখি, বড় রাস্তার ওপার থেকে ছুটতে ছুটতে গণেশ আসছে।

কুড়ি একুশ বছর বয়স গণেশের। গায়ের রং কালো, গাঁট্টাগোট্টা পেটানো শরীর, লম্বা ধাঁচের মুখ, চওড়া শক্ত কাঁধ—সব মিলিয়ে একটা বেপরোয়া একরোখা ভাব আছে তার চেহারায়। কিন্তু ভাসা ভাসা চোখদুটো ভারি সরল। সমস্ত কিছুর মধ্যেও কোথায় যেন একটা ছেলেমানুষি তার মধ্যে থেকে গেছে।

এই মুহূর্তে তার পরনে চাপা ট্রাউজার্স আর বুকখোলা শার্ট, পায়ে চপ্পল। এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে।

একমুখ হেসে গণেশ বলল, 'দূর থেকে তোকে দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছি। নেমতন্ন খেয়ে এই ফিরলি বুঝি?'

আমার বিয়ে-বাড়ি যাবার খবর গণেশ জানে। জড়ানো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

'চল, তোর সঙ্গে বাড়ি যাই—' বলেই লাফ দিয়ে রিকশায় উঠে আমার পাশে বসে পড়ে গণেশ।

'এত রাত্তিরে এখানে কী করিছিলি?'

'ভূপতি কেবিন'-এ বসে—' বলেই আচমকা থেমে গিয়ে মুখ নিচু করে ঘাড় চুলকোতে লাগল গণেশ।

ও জানে চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া আমার দু'চোখের বিষ।

বললাম, 'তোকে না কতবার বারণ করেছি ওখানে যাবি না—'

'এই লাস্ট দিদি; তুই দেখে নিস। তোর পায়ে ধরে বলছি— ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সত্যি সত্যিই ঝুঁকে আমার পা ছুঁল গণেশ।

এত ছেলেমানুষ গণেশটা; ওর ওপর রাগ করে থাকবে কে? আমি হেসে ফেললাম, 'ঠিক বলছিস, এই লাস্ট তো?'

'তোর পা ছুঁয়ে আমি কি মিথ্যে বলছি!'

আমি জানি এই প্রতিজ্ঞা কাল সকালেই আর মনে থাকবে না ওর। আগেও অনেকবার কথা দিয়ে কথা রাখে নি গণেশ। 'ভূপতি কেবিন'-এর আকর্ষণ এমন যে তা ঠেকাবার সাধ্যও নেই।

রিকশা চলতে শুরু করেছিল। অন্য দিন দু'ধারের বাড়িগুলো থেকে একটু-আধটু আলো রাস্তায় এসে পড়ে; আজ কিছু নেই। শুধু শরতের জ্যোৎস্নায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বললাম, 'আজ কখন লাইট গেছে রে?'

গণেশ বলল, 'সন্ধেবেলা। রোজ রোজ এই এক ঝামেলা হয়েছে। ভাবছি পাড়ার লোক জুটিয়ে কাল একবার ইলেকট্রিক অফিসে যাব। এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।' তাকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে। একটু থেমে আবার বলল, 'ওরাই বা কী করবে? চারদিকে যা শালা তাব-ফার চুরি হচ্ছে! লাইফ পটাসিয়াম হয়ে গেল।' বলতে বলতেই আমার দিকে মুখ ফেরাল, 'কী সেন্ট মেখেছিস রে দিদি, ফাইন গন্ধ বেরুচ্ছে—'

বিজলী আমার গায়ে একটা সেন্টের শিশি ঢেলে দিয়েছিল। গন্ধটা উগ্র হলেও খুব সুন্দর। বললাম, 'নাম জানি না; বিয়ে-বাড়িতে আমার এক বন্ধু লাগিয়ে দিল।'

আমার কথা শেষ হল কি হল না, তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল গণেশ, 'এ কি রে দিদি—'

চমকে গেলাম, 'কী?'

একদৃষ্টে আমাকে দেখতে দেখতে গণেশ বলল, 'দারুণ মাঞ্জা চড়িয়েছিস তো—'

আজকালকার ছেলে ছোকরারা অদ্ভুত অদ্ভুত ইডিয়মে কথা বলে। মাঞ্জা চড়ানোর মানে আমি বুঝি। তাই গণেশের চোখে চোখ রাখতে পারছিলাম না। লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতে যেতে বললাম, 'কী যে বলিস—'

'ঠিকই বলছি রে দিদিভাই। যা সেজেছিস না, তাতে কী মনে হচ্ছে জানিস?'

'কী?'

'বিয়েটা বোধ হয় তোর বন্ধুর ছিল না।'

নিশ্বাস বন্ধ করে বললাম, 'তবে কার ছিল?'

গণেশ রগড় করে বলেছে বটে, তবু আমার বুকেয় ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানির মতো খুব দ্রুত কী খেলে গেল।

আমার সাজগোজ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না গণেশ। বলল, 'তোর কোন বন্ধুর বিয়ে ছিল রে দিদি?'

'অফিসের এক বন্ধুর।'

'কার? কনকদির?'

'না।'

'পূর্ণিমাদির?'

'না।'

'তবে কি সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েটা, স্টেলা না কী যেন নাম, তার?'

'আরে না—'

'তা হলে কার?'

যে কোনো ব্যাপারেই গণেশের কৌতূহল-টৌতূহল খুব কম। কিন্তু আজ সে একেবারে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো জেরা শুরু করে দিয়েছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, 'তুই আমার সব বন্ধুকে চিনিস?'

'বা রে, চিনি না! কতবার তোর অফিসে গেছি। কনকদি, পূর্ণিমাদি, স্টেলা, কবরীদি, মানসীদি—নাম বলে যাব?'

গণেশটা দারুণ ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। চট করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, 'হয়েছে, আর নাম করতে হবে না। তুই আমাদের সেকসানের মেয়েদের চিনিস। কিন্তু অতবড় অফিসটায় আরো কত সেকসান আছে। যার বিয়ে হল সে এস্টাব্লিশমেন্ট সেকসানের।'

গণেশ তক্ষুনি মেনে নিল, 'ও আচ্ছা—'

এতক্ষণে আমি সহজভাবে শ্বাস নিতে পারলাম।

গণেশের সঙ্গে টুকরো-টুকরো এলোমেলো কথা বলতে বলেত একসময় আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলাম। রিকশাওলাকে ভাডা মিটিয়ে ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল, রান্নাঘরে মোমবাতি জ্বলছে।

বাবা খেতে বসেছিল; একটু দূরে উঁচু ছোট একটা পিঁড়ির ওপর সৎ-মা বসে আছে।

বাবার বয়স চৌষট্টির মতো; তবে ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেটে বছর তিনেক কমানো আছে। অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা চেহারা; প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। সেই তুলনায় গায়ে মাংস-টাংস নেই। খুব রোগা বলে এ পাড়ার ছেলে-ছোকরার দল বলে 'লেংথ উইদাউট ব্রেডথ'—কেউ বলে, 'স্ট্রেট লাইন —' চৌকোনা মুখ, গোল চোখ দুটো কুয়োর ভেতর ঢোকানো। অপরিচ্ছন্ন মুখে গুচ্ছের কাঁচা পাকা দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে। বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকে একটা চেক-কাটা লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু পরে না। গেঞ্জিটেঞ্জির বালাই নেই। শীতকালে অবশ্য একটা ধুসো রোঁয়াওলা চাদর গায়ে জড়ানো থাকে।

সৎ-মার বয়স চুয়াল্লিশের কাছাকাছি। মুখখানা বয়সের তুলনায় ঢের কচি। শুধু মুখটা যদি কেউ

দেখে, বলবে বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু গায়ে প্রচুর চর্বি জমিয়ে এর মধ্যেই থলথলে হয়ে গেছে। মোটা বলে শীতকালটা ছাড়া অন্য সময় গায়ে জামা-টামা রাখতে পারে না। ভীষণ ঘামে, কোনোরকমে শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে রাখে।

টকটকে ফর্সা রং। বড় বড় চোখ, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে থাক থাক কোঁচকানো কোঁচকানো চুল। খোঁপা-টোপা খুলে চুল এলো করে দিলে এই বয়সেও কোমর ছাপিয়ে পড়ে। হাতে একগাছা করে সোনা বাঁধানো লোহা, কানে পাতলা, মাকড়ি, নাকে সুবজ পাথর-বসানো নাকছাবি। মোটা হয়ে দেহের রেখাগুলো চর্বির তলায় ঢাকা না পড়লে সৎ-মাকে এক কথায় রূপসী বলা যেত।

কুড়ি বছরের বড় স্বামীর ঘর করতে হচ্ছে বলে সৎ-মা খুব অসন্তুষ্ট। তার বুকের ভেতর সব সময় ফার্নেরসের মতো কিছু একটা জ্বলছে; কারণে অকারণে যে কোনো ছুতোয় সে অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে দেয়। সৎ-মার বিশ্বাস বাবার হাতে পড়ে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

পায়ের শব্দে বাবা মুখ ফেরাল, 'কে রে?'

সাড়া দিলাম। গণেশ পাশ থেকে বলল, 'আমিও এসেছি মা। খেতে দাও; হাত-পা ধুয়ে আসছি।'

সৎ-মা বলল, 'এস, শ্রাদ্ধের পিন্ডি বাড়াই আছে।' ছেলেদের সঙ্গে এইভাবেই কথা বলে থাকে সে।

বাবা গণেশকে বলল, 'কয়টা বাজে হুঁশ আছে?'

গণেশ উত্তর দিল না।

বাবা আবার বলল, 'এত রাইত তরি (পর্যন্ত) বাইরে বাইরে করস কী?'

গণেশ বলল, 'আমার কাজ ছিল।'

বাবা খেপে উঠল, 'কী রাজকার্য শুনি? একটা পয়সা রোজগার করনের ক্ষ্যামতা নাই, তার আবার কাম! চায়ের দোকানে আড্ডা আর মস্তানি কার ছাড়া আর কোন কম্ম আছে তর? হারামজাদারা বাড়িটারে ধর্মশালা বানাইয়া তুলল!'

এসব প্রতিদিনের ব্যাপার। শুনতে শুনতে চামড়া দু ইঞ্চি পুরু হয়ে গেছে গণেশের; আজকাল আর গায়ে বেঁধে না। ব্যাপারটা যেন খুবই মজার; গণেশ আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসতে হাসতে উঠোনের শেষ মাথায় টিউবওয়েলটার কাছে চলে গেল।

বাবা সৎ-মাকে জিজ্ঞেস করল, 'সেই দুইটা বাড়িতে ঢুকছে?'

সেই দুটো অর্থাৎ বাচ্চু ও হাবু। সৎ-মা বিস্বাদ গলায় বলল, 'না। বারটার আগে তারা বাড়িতে ঢোকে না।'

কথাটা ঠিকই। গণেশ তবু ন'টা দশটার ভেতর ফিরে আসে। কিন্তু মাঝরাত না হলে বাচ্চু হাবু ফেরার নাম করে না। ওদের খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। কখন ওরা আসে, কখন খায়, কেউ টেরও পায় না। কেননা তার আগেই এ বাড়ি ঘুমের আরকে ডুবে যায়।

বাবা গজ গজ করতে লাগল, 'জুতার বাড়ি মাইরা শুয়োরের পালেরে বাড়ির থনে বাইর কইরা দিমু।'

বেকার আড্ডাবাজ ছেলেদের তাড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞাটা রোজ রাত্তিরে একবার করে নেয় বাবা; পরের দিন সকালেই ভুলে যায়। কিন্তু রাত্তিরে গণেশদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখলে রক্ত মাথায় চড়ে যায় তার; নতুন করে শপথটা আবার মনে পড়ে।

গজ গজ করতে করতে বাবা আমার দিকে তাকাল। গলাটা নরম করে বলল, 'এত্ত রাইত করলি যে বকুল—'

বাবা পার্টিশানের পরই সীমান্তের এপারে চলে এসেছিল। কিন্তু এখনও তার কথায় ওপারের টান। বাবার বলার ধরন থেকে ঢাকা জেলার সেই গ্রাম্য গন্ধটা আর গেল না। আগে আগে বাবাকে বলতে শুনেছি, 'জমিজমা ভিটামাটি সগল গ্যাছে। দ্যাশ থিকা কিছুই আনতে পারি নাই। আনছি খালি মুখের এই ভাষাখান; এরে আমি ছাড়তে পারুম না।' মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে বলে মনে হয় না।

সৎ-মা কিন্তু পুরোপুরি দেশের ভাষাটা বলতে পারে না; তার কথায় এখানকার টান ঢুকে গেচে। আমি কিন্তু খাঁটি কলকাতার ভাষাতেই কথা বলি। হাবু গণেশ বাচ্চুও তা-ই। আমি খুব ছেলেবেলায়

কলকাতায় এসেছি। হাবুরা তো এখানেই জন্মেছে। মাঝে মধ্যে শখ করে যদি যদি ঢাকার ভাষায় কিছু বলি, নিজেদের কানেই বিশ্রী শোনায়।

কাঁচা উঠোন থেকে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললাম, 'সেই শ্যামবাজারের ওধার গিয়েছিলাম। খেয়ে উঠতে উঠতেই তো নটা বেজে গেল। তারপর ট্রাম-বাসে আসা—' ডাহা মিথ্যেগুলো আমার গলায় আটকে আসতে লাগল।

বাবা বলল, 'হ' অতখানি পথ আসা সোজা কথা না। তার উপুর ট্রাম বাসের যা হাল হইছে! কখন কোনটা বন্ধ হইয়া যায়—'

আমার ঘরে গিয়ে হাতড়ে মোমবাতি আর দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে নিলাম। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে হাত-আয়নাটা মুখের কাছে তুলে ধরলাম; তক্ষুনি চমকে উঠলাম। কপালে সিঁথিতে এখনও প্রচুর সিঁদুর লেগে আছে, ট্যাক্সিতে সবটা তুলতে পারি নি।

আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট আছে। ভাগ্যিস আজ সাপ্লাইতে গোলমাল হয়েছিল। নইলে সৎ-মার যা চোখ, নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতাম। তারপর তোপের মুখে সে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত। সেটা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিল।

কারো চোখে পড়বার আগেই সিঁদুরটা তুলে ফেলা দরকার। তাড়াতাড়ি আয়নাটা নামিয়ে গামছা আর সাবান-টাবান নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। লক্ষ করলাম, গণেশ রান্নাঘরে বাবার পাশে বসে খাচ্ছে।

আমার পায়ের শব্দে বাবা মুখ তুলল। বলল, 'বিয়া বাড়িতে কেমুন খাওয়াইল রে?'

নেমন্তন্ন খেয়ে যে-ই ফিরুক, বাবা তাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করবেই। আসলে মানুষটা ভালমন্দ খেতে খুব ভালবাসে; কিন্তু খেতে আর পায় কই? বললাম, 'ভালই।'

'আহা, ভাল তো খাওয়াইবই। কী কী খাওয়াইল তাই ক' (বল)।'

যা যা খেয়ে এসেছি, বললাম।

শুনতে শুনতে মোমের আলোয় বাবার চোখ চকচক করতে লাগল। মোটা মোটা গাঁটওলা আঙুলে রেশনের কালো কালো গমের আটার রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাবা বলল, 'চাইর রকমের মাছ খাওয়াইছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী কী মাছ?'

'রুই, চিতল, ভেটকি আর চিংড়ি—'

বাবার ওপাশ থেকে গণেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'আর বলিস না দিদি, গলায় কুমড়োর ঘ্যাঁট আর রুটি আটকে যাচ্ছে।'

একটু আগে বাবা গণেশের ওপর যে খেপে উঠেছিল, এখন আর তা মনে নেই। ভাল খাবার-দাবারের কথা উঠলে বাবা সব ভুলে যায়। আপন মনে বলতে লাগল, 'চিতল মাছ যে কতকাল খাই নাই। ঢাকায় যখন পড়াশুনা করতাম মাঝে মইধ্যে 'শান্তি বোর্ডিং'-এ গিয়া চিতলের পেটি খাইতাম। আধ হাতের উপরে একেকখান পেটি। সেই সস্তাগন্ডার দিনই দাম নিত ছয় আনা। মুখে তার সোয়াদ লাইগা আছে।'

আমি উঠোনে নেমে টিউবওয়েলের কাছে চলে গেলাম।

বাবা চেঁচিয়ে বলল, 'দুই রকমের মাংসের কথা ক'লি (বললি) ; নিশ্চয় পাঠা আর মুরগি?'

বালতিতে জল ভরতে ভরতে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ—'

বাবা বলতে লাগল, 'চাইর রকমের মাছ, দুই রকমের মাংস, দই, রাবড়ি, কাচাগোল্লা, পোলাও—বাঃ, বেশ খাওয়াইছে।' মুখের ভেতর সুস্বাদু খাবারের নামগুলো নানাভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল বাবা। আপাতত এতেই তার সুখ।

বাবা আবার বলল, 'প্যাট ভইরা খাইছস তো?'

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার ওপর এক ধরনের স্নেহ আছে বাবার।

ঠিকমতো খাই টাই কিনা, মেজাজ ভাল থাকলে মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়। আমি কিছু বলবার আগেই সৎ-মা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কথার কী ছিরি! খেত বসে কেউ পেট না ভরলে ওঠে।'

'না, তাই কইতে আছিলাম।'

একটু চুপ।

তারপর রুটির টুকরো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে জড়ানো গলায় বাবা আবার শুরু করল, 'নিমন্তন্নে গেলে যত পারবি মাছ-মাংস, রসগোল্লা-সন্দেশ খাবি। প্রোটিনটা খাওন দরকার। নিজেরা তো আর কিনা (কিনে) খাইতে পারি না।'

নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে প্রোটিন খেতে বাবা শুধু আমাকেই বলে না; এই পরামর্শটা ঢালাওভাবে পরিবারের সবাইকে তো বটেই, চেনা জানা প্রত্যেককে দিয়ে থাকে।

সৎ-মা ধমকে উঠল, 'বকবকানি থামাও তো।'

বাবা আর কিছু বলল না।

আমি প্রথমে ভাল করে সিঁদুর টিঁদুর তুলে ফেললাম। তারপর হাত-পা মুখ-টুখ ধুয়ে, ঘাড়ে-গলায় জল দিয়ে গামছায় মুছতে মুছতে ঘরে ফিরে এলাম।

এতক্ষণ আমার স্নায়ুগুলো চড়া তারে যেন বাঁধা ছিল। সেই দুপুর থেকে যা-যা করেছি, সব বোধহয় সজ্ঞানে নয়; অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে। এখন সেই ঘোরটা কেটে যাচ্ছে। রক্তের ভেতর যে উত্তেজনা এতক্ষণ উঁচু পর্দায় বাজছিল এখন সেটা থিতিয়ে আসছে।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। আজ সমস্ত দিন আমার ওপর দিয়ে নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু ঘটে গেছে। তিরিশ বছরের জীবন এমন ওলট পালট আর কখনও হয় নি। এখন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। ঘুম—একটানা ঘুম আমার দরকার।

ভিজে গামছাটা দড়িতে ঝুলিয়ে দ্রুত মশারি টাঙিয়ে নিলাম। দরজায় খিল লাগাতে যাব, সেই সময় রান্নাঘর থেকে সৎ-মা ডাকল, 'বকুল—'

দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, বাবা আর গণেশের খাওয়া হয়ে গেছে। বাবা আঁচিয়ে-টাচিয়ে বারান্দায় একটা জলচৌকিতে বসে এখন বিড়ি টানছে। গণেশ কলতলায় কুলকুচি করে মুখ ধুচ্ছিল। সৎ-মা এঁটো বাসন-কোসন একধারে সরিয়ে জায়গাটা মুছে নিচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাকছ কেন?'

সৎ-মা বলল, 'একটু খাবি নাকি?'

'এই তো বিয়েবাড়ি থেকে গলা পর্যন্ত ভর্তি করে এলাম। এখন আবার কিসের খাওয়া!'

'শ্যামবাজার থেকে আসছিস। বাসের ঝাঁকুনিতে আবার খিদে পেয়ে যাবার কথা।'

যেদিন থেকে চাকরি নিয়েছি, সৎ-মার কথাবার্তা, আমার সম্বন্ধে তার মনোভাব অন্যরকম হয়ে গেছে। তার চোখ মুখে কণ্ঠস্বরে এখন স্নেহের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ব্যবহারও অনেকটা বন্ধুর মতো হয়ে উঠেছে। বললাম, 'না না, আমার খিদে পায় নি।'

'না খাস না খাবি; ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? রান্নাঘরে আয় না—'

'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম যেন পালিয়ে যাচ্ছে। ক'টা আর বাজে। এগারটার বেশি হবে না।'

আনিচ্ছাসত্ত্বেও রান্নাঘরে গিয়ে বসতে হল।

সৎ-মা এনামেলের থালায় রুটি কুমড়োর তরকারি, ডাঁটি-ভাঙা কাপে একটু ডাল নিয়ে খেতে বসে গেল। বলল, 'এখনও দ্যাখ খাবি কিনা—'

'বললামই তো, খাব না।'

ডালে ভিজিয়ে রুটি মুখে পুরতে পুরতে সৎ-মা বলল, 'বিয়ে কেমন হল?'

আবার বিয়ের প্রসঙ্গ। হঠাৎ শীত-লাগার মতো আমার গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল।

আমার এই সৎ-মাটি লেখাপড়া শিখলে ক্রিমিনাল কোর্টের বাঘা উকিল হতে পারত। উলটোপালটা

জেরায় সে ওস্তাদ। জেরার মুখে ফস করে কী বলতে কী বলে ফেলব! ক্লান্ত শরীরেও চোখ-কান সজাগ করে রাখতে হল। বললাম, 'ভালই।'

'ছেলে কী করে?'

যা মুখে এল বলে ফেললাম, 'ব্যাঙ্কে চাকরি করে।'

'কী রকম মাইনে-টাইনে পায়?'

'হাজারদেড়েক।'

'দেড় হাজার!' সৎ-মার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ।'

'মেয়েকে কী দিলে-টিলে?'

আমার চোখ মুখ ঝাঁঝাঁ করছিল। সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মতো করে বললাম, 'কুড়ি ভরি সোনা, ফার্নিচার, ছেলের ঘড়ি, আংটি, বোতাম, রেডিও, সাইকেল, সেলাইকল—' কে যে আমার ভেতর থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলত লাগল, কে জানে।

'এত!' সৎ-মার চোখ জ্বলতে লাগল। কেউ কিছু পেয়েছে কিংবা সুখী হয়েছে শুনলে সে খেপে ওঠে।

পরের সুখে কাতর, পরের আনন্দে ক্ষুব্ধ, এমন মানুষ আমি আর দেখি নি। আসলে সৎ-মার মনোভাব আমি খানিকটা বুঝি। জীবনে কিছুই পায় নি সে, কোনো সাধই তার মেটে নি। ভাল খেতে পরতে কোনোদিনই তাকে দেখি নি। তাই অন্যের সৌভাগ্য তাকে উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ করে তোলে। যাই হোক, তাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সট করে উঠে পড়লাম, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে; আমি আর বসে থাকতে পারছি না।'

'বাবারে বাবা, কতকাল যেন ঘুমোস নি! বোস না আরেকটু। ছেলেদের বাড়ি-টাড়ি আছে? অত মাইনে যখন পায় তখন নিশ্চয়ই গাড়িও আছে।'

'কাল বলব।' প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে আমি অবাক। গণেশ এবড়ো খেবড়ো মেঝেতে মাদুর পেতে বিছানা করছে। নীলিমা আর তার বর অজয় এলে গণেশ এ ঘরে এসে বিছানা পাতে। কিন্তু আজ তো ওরা আসে নি।

আমাকে দেখে একমুখ হাসল গণেশ। বলল, 'আজ এখানেই শোব রে দিদি—'

'তোর ঘরে কী হল?'

'আর বলিস না, পেছন দিকের ড্রেনে কী একটা পচেছে। কালই গন্ধ ছেড়েছিল; আজ আর টিকতে পারছি না। তাই তোর ঘরে পালিয়ে এলাম।'

'বেশ করেছিস।'

'ভাবছি কাল একবার মিউনিসিপালিটিতে খবর দেব। ওটা না সরালে আমার ঘরে আর ঢোকা যাবে না।' বলতে বলতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল গণেশ, 'খবর দিয়ে কচু হবে। ট্যাক্স আদায় ছাড়া ওরা আর কিছু করে নাকি! যাক গে, কাল যা হয় করব।'

মশারি টাঙিয়ে টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল গণেশ। বলল, 'তুই দরজাটা দিয়ে দিস দিদি।'

আমি দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রান্নাঘরে বাসন নাড়াচাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। সৎ-মার খাওয়া বোধ হয় শেষ হল; এখন খুব সম্ভব থালা গেলাস-টেলাস গোছগাছ করে রাখছে।

হঠাৎ গণেশ ডাকল, 'দিদি—'

বললাম, 'তুই এখনও জেগে আছিস! সাড়াশব্দ নেই দেখে ভেবেছিলাম, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিস।'

'না রে। শুলেই আমার ঘুম আসে না।'

'ডাকলি কেন, কিছু বলবি?'

'না, তেমন কিছু না।' একটু চুপ করে থেকে গণেশ বলল, 'তোর বন্ধুর যে বিয়ে হল, সেটা কি লাভ ম্যারেজ?'

গণেশ আমার ভাই, তবু ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব সহজ। অনেকটা বন্ধুর মতো। একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, 'হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছিস!'

'না, এমনি মনে হল, বলে ফেললাম।'

'হ্যাঁ, লাভ ম্যারেজ।'

ওদিকে মুখ করে শুয়ে ছিল গণেশ। অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম সে আমার দিকে ফিরল। তারপর হালকা গলায় বলল, 'তুই এক নম্বরের বোকারাম।'

বললাম, 'তার মানে?'

তোর বন্ধুরা একেকটা লাভার জুটিয়ে সটাসট কেমন বিয়ে করে ফেলছে। আর তুই খালি নেমন্তন্ন খেয়েই যাচ্ছিস। সারা জীবন পরের বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে কাটালেই চলবে?'

আমি চুপ করে থাকলাম। বুকের ভেতর ছোটবড় কত ঢেউ যে খেলতে লাগল।

গণেশ আবার বলল, 'তুই দেখতে এত সুন্দর। ঘরে তো আর বসে থাকিস না। অফিস-টফিস যাস, রাস্তাঘাটে বেরোস, এখনও কেউ তোর কাছে ঘেঁষল না?'

আমার কান লাল হয়ে উঠেছিল। জড়ানো গলায় বললাম, 'ফাজলামো করবি না গণেশ। চড় খাবি কিন্তু।'

গণেশ হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই আচমকা বলল, 'তোর কত বয়েস হল রে দিদি?'

'আমার বয়েস দিয়ে কী হবে?'

'বল না—'

'তিরিশ। কেন?'

'চটপট একটা লাভার-টাভার জুটিয়ে ফ্যাল দিদি। এর পর আর কিন্তু পাবি না।'

বললাম, 'এবার সত্যিই তুই মার খাবি। পিঠ তোর শুলোচ্ছে।'

গণেশ বলতে লাগল, 'ইচ্ছে হলে মার। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস দিদি—'

সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

'তুই স্বপ্নেও ভাবিস না বাবা-মা তোর বিয়ে দেবে।'

আমি জানি, এ বাড়িতে একমাত্র গণেশই আমার কথা ভাবে। আমার সম্বন্ধে তার গভীর সহানুভূতি। একেক সময় আমার হয়ে সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায়। আমি চাকরি পাবার পর সৎ-মা আর বাবা যে স্নেহ-মমতাটুকু দেখাচ্ছে তার পেছনে আছে অন্য রকমের খেলা। কিন্তু সে কথা এখন না, পরে।

গণেশ আমাকে বলল, 'যা করার তোর নিজেকেই করতে হবে। যদি না পারিস, আমাকে বল, তোর হাজব্যান্ড জোগাড় করে দেব।'

ধমকের গলায় বললাম, 'আর বকবক করতে হবে না। এবার ঘুমো তো—' বলতে বলতেই বিজনের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বিজন বাড়িতে আলটিমেটাম দিতে বলেছে, তার ধনুর্ভাঙা পণ—দু'মাস পর যেভাবেই হোক আমাকে নিয়ে সংসার শুরু করবে। তার আগে বাড়িতে চরমপত্র দিতে হবে। বলতে হবে, যে যার ব্যবস্থা করে নাও। তখন নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো আমি এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছিলাম। বিজন যা বলছে তাতেই সায় দিয়েছি।

কিন্তু এখন ঘোর অনেকটা কেটে এসেছে। বুঝতে পারছি, বাড়িতে আলটিমেটাম দেওয়া কি এতই সহজ? তিনটে ভাই বেকার। বাবা বার সাতেক নানা জায়গায় চাকরি খুইয়ে কিছুদিন হল একটা ছোটখাট মারোয়াড়ি ফার্মে দেড়শ টাকা মাইনের কাজ করছে। ফার্মটার অবস্থা খুব ভাল না। যে কোনোদিন লালবাতি জ্বালাতে পারে। এ বাজারে দু আড়াই টাকা যখন চালের কিলো, মাছের কিলো সাত আট টাকা, তখন দেড়শ টাকায় কী হয়? সংসারের প্রায় সব ভারটাই আমার কাঁধে। কাঁধটা সরিয়ে নেবার আগে আমাকে একটু ভাবতে হবে বৈকি। তাছাড়া চলে যাওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। তার আগে

বিয়ে যে করেছি, সেই কথাটা জানাতে হবে। সেটা জানাতে কতদিন লেগে যাবে কে জানে। আমি যা মেয়ে, সহজে মুখই খুলতে পারি না। এ বাড়ি থেকে, যাবার আগে অন্তত ভাইদের কারো চাকরি বাকরি পাওয়া দরকার। হাবু বাচ্চুকে দিয়ে আশা নেই। সেভেন-এইট পর্যন্ত উঠেই ওরা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ওই বিদ্যায় এ বাজারে বেয়ারার চাকরিও হয় না। যা কিছু ভরসা গণেশের ওপর। ও কমার্স নিয়ে প্রি-ইউনিভার্সিটিটা পাশ করেছে। তারপর আর পড়ল না। আমি অবশ্য পড়াতে চেয়েছিলাম। গণেশ বলেছে, 'না, হোল ফ্যামিলি তুই টানছিস; তার ওপর আর বোঝা চাপাব না। যদি চাকরি-বাকরি পাই, নাইট ক্লাশে ভর্তি হয়ে যাব। আমার প্রতি গণেশের মমতাটা বিশুদ্ধ। কিন্তু লক্ষ করছি, ছেলেটা দ্রুত নৈরাশ্যের শিকার হয়ে যাচ্ছে। জীবনের ওপর ওর বিশ্বাস ক্রমশ কমে যেতে শুরু করেছে। আগে আগে, প্রি-ইউ পাশ করার পর চাকরি-বাকরির জন্য এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করত। সপ্তাহে দু'বার করে যেত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে। চার বছর ঘোরাঘুরি করবার পরও যখন একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত বার করতে পারল না, তখন দুম করে একদিন চাকরির চেষ্টা ছেড়ে দিল গণেশ। আজকাল সারাদিনই প্রায় 'ভূপতি কেবিন'-এ আড্ডা দেয় জুয়া টুয়ার আড্ডায় গিয়ে বসে কিনা জানি না। ওকে বাঁচাতে হলে এখনই একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া দরকার। তাছাড়া ওর রোজগারের একটা ব্যবস্থা না হলে চট করে এ বাড়ি থেকে আমার পক্ষে চলে যাওয়ার অনেক অসুবিধে। বাধা কেউ দিতে পারবে না। রোজই তো অফিসে যাই, একদিন আর না ফিরলেই হল। কিন্তু আমি জানি, বাধাটা আছে আমারই দুর্বল ভীরু মনের গভীরে।

গণেশের চাকরির জন্য এবার একটু চেষ্টা-টেষ্টা করতে হবে। চেনা শোনা সবাইকে আগেই বলে রেখেছি; আবার তাদের মনে করিয়ে দেব। ভাবছি একদিন আমাদের জেনারেল ম্যানেজার সেন সাহেবের ঘরে চোখ-কান বুজে ঢুকে পড়লে কেমন হয়? তাকে ধরলে একটা কিছু হবে না? তক্ষুনি অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল। অফিসের মেয়েরা অর্থাৎ কনক পূর্ণিমা আরতিরা বলে, সেনসাহেব লোকটা টেরিফিক পাজি। মেয়ে দেখলেই তার জিভ দিয়ে নাকি জল গড়াতে থাকে। স্টেলা তো পরিষ্কার বলে, 'হী ইজ আ শার্ক।' তবে ওকে দিয়ে কাজ হয়। ইয়াং, হ্যান্ডসাম মেয়ে কোনো রিকোয়েস্ট করলে সেন-সাহেব তা রাখে। কিন্তু তার বদলে কিছু দিতে হয়। সেন সাহেবের গাড়িতে চড়ে তাকে সঙ্গ দিয়ে দু'দুটো ভাইকে আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে স্টেলা। কথাটা মনে পড়তেই আমার উৎসাহ দ্রুত জুড়িয়ে আসতে লাগল।

গণেশ বলল, 'কি রে দিদি, চুপ করে আছিস কেন? ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

বললাম, 'না।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'এই গণেশ—'

মাসকয়েক আগে জোর-জার করে গণেশকে টাইপের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। ভর্তির টাকাটা আমিই দিতে চেয়েছিলাম; গণেশ নেয় নি। নিজেই যেন কোত্থেকে জোগাড় করে নিয়েছিল। তারপর আর এ ব্যাপারে বিশেষ খোঁজ-টোঁজ নিই নি। বললাম, 'হ্যাঁ রে, টাইপটা এখনও শিখছিস?'

'না।'

'কেন?'

খুব উদাসীন সুরে গণেশ বলল, 'ধুস, ওসব করে কী হবে—'

বললাম, 'চাকরির জন্যে ওটা দরকার।'

'চাকরি বাকরি আমার হবে না।'

'তোকে বলেছে।'

'দ্যাখ দিদি, শাঁসালো কারো শালা-টালা না হতে পারলে আজকাল আর চাকরি হয় না।' বলতে বলতে হঠাৎ গণেশের গলায় রগড়ের ছোঁয়া লাগল, 'তুই একটা কাজ করতে পারিস?'

'কী রে?'

'ভাল মক্কেল দেখে ঝুলে পড়। দেখবি তার পরদিনই আমার চাকরি হয়ে যাবে।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে, না? ফাজিল—'

গণেশ হাসতে লাগল।

আমি বোঝাতে চাইলাম, 'এত হাল ছেড়ে দেবার মতো কিছু হয় নি। কাল থেকে আবার টাইপের স্কুলে যাবি, বুঝলি?'

গণেশ বলল, 'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে রে দিদি—'

'পাক। টাইপ স্কুলে যাবি তো?'

ও পাশ ফিরে শুতে শুতে গণেশ বলল, 'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।'

'তার মানে যাবি না?'

গণেশ সাড়া দিল না। কেটু পর তার নিশ্বাস ভারী এবং গাঢ় হয়ে হয়ে এল। অর্থাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর ডাকাডাকি করলাম না।

আমার দেহে এবং মনে সারাদিনের ক্লান্তি মাখা। ভেবেছিলাম বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারব। কিন্তু ঘুম আসছে না। যতক্ষণ গণেশের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলাম। কিন্তু এখন ফাঁকা ঘরে ঝাঁক ঝাঁক পাখি আসার মতো সমস্ত দিনের সব ঘটনা হুড়মুড় করে আমার মনে ভিড় করতে লাগল।

রাত ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এখন ক'টা বাজে কে জানে।

মাথার দিকের জানালাটা খোলা রয়েছে। তার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। শরতের নীলাকাশ যেন অগাধ সমুদ্র; তার গায়ে রুপোর থালার মতো চাঁদটা ভাসছে। শান্ত কোমল জ্যোৎস্নায় চারদিক ডুবে আছে। দিনের বেলার কুশ্রী, নোংরা, আবর্জনা আর দুর্গন্ধে ভরা শহরতলিকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। চাঁদের আলোয় সব কিছু রহস্যময় আর অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

বাবা-মা অনেকক্ষণ আগে পাশের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপরও রান্নাঘরে দু দু'বার শব্দ হয়েছে। তার মানে হাবু আর বাচ্চু ফিরে এসেছে। ওরা আলো-টালো জ্বালে না; অন্য দিনের মতো অন্ধকারে বসেই খেয়ে টেয়ে শুতে চলে গেছে। রাত্রিবেলা ওরা কী করে যে দ্যাখে কে জানে! দুটোরই বেড়ালের চোখ।

চাঁদের আলো, শরতের শান্ত নরম নীলাকাশ, গণেশের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কিংবা আজকের গোটা দিনটার যত ঘটনা আর উত্তেজনা, কিছুই যেন এই মুহূর্তে দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারছি না। সব দৃশ্য, গন্ধ এবং শব্দ ঠেলে বার বার চোখের সামনে যে ভেসে উঠতে লাগল সে বিজন।

•

বিজনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল কবে? কিন্তু সে কথা এখন না; তার আগে আমাদের সংসারের আরো কিছু কথা আছে।

আগেই আপনাদের বলেছি, আমরা পূর্ব বাংলার মানুষ। পার্টিশানের বছরই সীমান্তের এপারে চলে এসেছি।

আমরা এসেছিলাম তিনজন। বাবা, সৎ-মা আর আমি। আমার নিজের মা তার তিন চার বছর আগে, দেশে থাকতেই মরে গেছে।

আমরা যখন এপারে চলে আসি তখন আমার বয়স মোটে সাত। সৎ-মার একুশের মতো; বাবার চল্লিশ বেয়াল্লিশ হবে। আরেকটা কথা, সৎ-মাকে বাবা তখনও বিয়ে করে নি।

আমাদের সঙ্গে আগে থেকেই লতায়-পাতায় সৎ-মাদের কিরকম একটা আত্মীয়তা ছিল। বাবার পিসতুতো বোনের ননদের কী যেন হত সৎ-মা।

পার্টিশানের পর পরই দেশ যেন নরক হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের পক্ষে। আর সেই যুবতী যদি রূপসি হয় তবে তো কথাই নেই; তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য হাজারটা অশ্লীল কদর্য হাত এগিয়ে আসত।

সৎ-মার যারা বাবা-মা, তাদের তখন এমন অবস্থা যে দেশ ছেড়ে আসতে পারছিল না; আবার মেয়েকে নিজের কাছে রাখতেও সাহস পাচ্ছিল না। এমন সময় আমরা কলকাতায় আসছি জেনে মেয়েকে বাবার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। মেয়ে যাতে বোঝা হয়ে না থাকে, সে জন্য কিছু টাকাও দিয়েছিল। বলেছিল, 'আমাগো যা হওনের হউক, মাইয়াটা তো বাচুক।'

কলকাতায় এসে হরিদাসপুর বর্ডারের রিফিউজি ক্যাম্পে আমরা ছিলাম দু'দিন; সেখানে থেকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে এক রাত্তির। তারপরই বাবা আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিল। এ শহর বাবার একেবারে অচেনা নয়; আগেও দু'চার বার এসেছে। সারাদিন খুঁজে খুজে শেষ পর্যন্ত কালিঘাটের এক বস্তিমতো বাড়িতে বত্রিশ টাকায় দু'খানা খুপরি ঘর ভাড়া করেছিল। খানকতক জামাকাপড় আর দু একটা বাসন-টাসন ছাড়া দেশ থেকে আর কিছুই আনতে পারি নি। বাবা অবশ্য পায়ের ব্যান্ডেজের ভাঁজে ভাঁজে নোট সাজিয়ে কয়েক হাজার টাকা এনেছিল।

বাড়ি ভাড়া করবার পর হাঁড়ি-কড়া-উনুন থেকে শুরু করে চাল-ডাল-তেল-নুন পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় দরকারি জিনিস কিনে আনতে হয়েছিল।

কালিঘাটের সেই ভাড়া বাড়িতে আমরা মাস দুয়েকের বেশি থাকি নি। তার মধ্যেই দক্ষিণ শহরতলির শেষ মাথায় এই জায়গাটায় সস্তা দরে জমি কিনে বাড়ি তুলে ফেলেছিল বাবা। বাড়ি হবার পর আমরা এখানে চলে এলাম। তারপর তেইশ বছর পার হয়ে গেছে।

দেশে থাকতে বাবা নারায়ণগঞ্জের এক জুট মিলে কাজ করত। এখানে এসে বাড়ি-টাড়ি করাবার পর হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। কাজেই বাবাকে চাকরির খোঁজে বেরুতে হয়েছে।

বাবার মতো চটপটে কাজের লোক খুব কমই দেখেছি। একে-তাকে ধরে এখানে-ওখানে কদিন ঘুরে সত্যিই একটা কারখানায় চাকরি জুটিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য সে চাকরিটা খুব বেশিদনি টেকে নি; কেন না দু'বছর যেতে না যেতেই কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর কত চাকরি ধরল বাবা, কত চাকরি গেল। কোথাও ক্লোজারের তালা ঝুলল, কোথাও ছাঁটাইয়ের কাঁচি কচাৎ করে বাবার নামটা কেটে নামিয়ে দিল। বাইশ বছরে গন্ডা গন্ডা চাকরি করেছে বাবা, কোনোটাই স্থায়ী হয় নি। কিন্তু এসব পরের কথা।

এদিকে আমাদের সংসারের তলায় তলায় আরেকটা খেলা চলছিল। খেলাটা সেই বয়সে আমার বোঝার কথা নয়; তবু অদ্ভুত মনে হত।

আমাদের বাড়িতে তিনখানা ঘর। রাত্তিতে এক ঘরে থাকত বাবা, এক ঘরে সৎ-মা আর আমি, আরেকটা ঘরে তালা আটকানো থাকত।

মনে পড়ছে, নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পর কোনো কোনো দিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেতাম, দরজায় আস্তে আস্তে টোকা পড়ছে। চাপা গলায় বাবা ডাকত, 'নিরু একটা কথা শুনেই যাও।' সৎ-মার নাম নিরুপমা।

লক্ষ করতাম, দরজায় টোকা পড়লেই সৎ-মা কাঠ হয়ে যেত; দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকত।

বাবা ডেকে ডেকে একসময় চলে যেত। রোজই দরজায় টোকা পড়ত কিনা, কিংবা বাবা ডাকত কিনা, জানি না। কেননা ছেলেবেলায় আমি ছিলাম ভীষণ ঘুমকাতুরে। সন্ধে হলেই আমার চোখ জুড়ে আসত; ঘাড়ের ওপর মাথাটা আর সোজা করে রাখতে পারতাম না।

সারাদিন সৎ-মা তো চোখের সামনে ঘুরত-ফিরত, যা বলবার তা কি আর অতখানি সময়ের মধ্যে বলা যে না! তরপারও বাবার কী এমন কথা থাকতে পারে যাতে ওভাবে রাত্রিবেলা চোরের মতো এসে দরজায় টোকা দিতে হবে। আমি ভেবে পেতাম না।

মনে আছে বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকত, সৎ-মা ভয়ে কেমন যেন হয়ে যেত। তার মুখে হাসি ছিল না; আতঙ্কের মতো কী একটা তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকত। মাঝে মাঝে হঠাৎ সে আমাকে বলত, 'তোমার এখানে ভাল লাগে না। একদম না। খুব ভয় করে। কোন দিন যে কী ঘটে যাবে!' কী ঘটতে পারে আমি বুঝতাম না। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

তারপর একদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি পাশে সৎ-মা নেই; দরজাটা হাট করে খোলা। রোজ রোজ দরজায় ধাক্কা দিয়ে আর ডেকে ডেকে ফিরে যায় বাবা, সেদিন আর তাকে ফেরাবার শক্তি সৎ-মার মধ্যে ছিল না।

ফাঁকা ঘরে কতক্ষণ জেগে ছিলাম, এখন আর মনে পড়ে না। কখন একসময় আবার ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম। পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখি, উঠোনের একধারে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সৎ-মা। খোঁপা-টোপা ভেঙে পিঠময় চুল ছড়িয়ে আছে, চোখ টকটকে লাল, চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে।

পাশে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো মুখ করে খুব নিচু গলায় বাবা তাকে কী যেন বোঝাচ্ছিল। সৎ-মা কিছুই শুনতে চাইছিল না; উন্মাদের মতো সমানে মাথা নাড়ছিল।

বাবা কী বলছিল, দূর থেকে বুঝতে পারছিলাম না। তবে মনে হচ্ছিল, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। আমি আবার ঘরে ফিরে এসে চুপ করে বসে ছিলাম, আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর বাবা হঠাৎ আমার ঘরে এসে বলেছিল, 'নিরু আর আমি এট্টু বাইর হমু, যামু আর আসুম। তরে নিশিবাবুগো বাড়িতে রাইখা যামু। দুষ্টামি করবি না, বুঝলি?'

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বোকাটে মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিয়েছিলাম।

নিশিবাবুদের বাড়িটা আমাদের পাশেই। আমাকে তাদের বাড়িতে রেখে একটু পর সৎ-মাকে নিয়ে বাবা বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল ঘন্টা দেড় দুই পর। আমি লক্ষ রেখেছিলাম। ওরা ফিরতেই এক ছুটে বাড়িতে গিয়ে হাজির। গিয়েই থমকে গিয়েছিলাম। সৎ-মার কপালে আর সিঁথিতে তখন সিঁদুর, হাতে নতুন শাঁখা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিস্ময়ে আমার চোখে পলক পড়ছিল না।

সৎ-মাও আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। তার মুখ মরা মানুষের মুখের মতো; সেখানে এক ফোঁটা রক্ত ছিল না যেন। স্তব্ধ একটা মূর্তির মতো নতচোখে সে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাবা চোরের মতো মুখ করে একবার হেসেছিল। তারপর গালে হাত বুলোতে বুলোতে বিব্রতভাবে বলেছিল, 'অখন থেইকা নিরুরে মা ক'বি (বলবি)।'

একবার বাবাকে, একবার সৎ-মাকে দেখতে দেখতে কখন আপনা থেকেই আমার মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গিয়েছিল। তখন জানতাম না, অনেক পরে শুনেছি, বাবা সেদিন সৎ-মাকে কালিঘাটে থেকে বিয়ে করে এনেছিল। ছেলেমেয়েদের বাপের বিয়ে দেখতে নেই, তাই বাবা আমাকে নিশিবাবুদের বাড়ি রেখে গিয়েছিল।

কালিঘাট থেকে ফেরার পর ঘন্টাকয়েক সারা গায়ে বিষাদ মেখে বসে ছিল সৎ-মা। তারপর সব ঝেড়ে-ঝুড়ে যেন অদৃশ্য চাবুক হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন থেকে বাবা যা বলত তার ঠিক উলটোটা করত সৎ-মা এবং চাবুক চালিয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বাবাকে চালাত। আর যখন তখন চাপা গলায় তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে গজরাত, 'ঠগ, জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক। বাবা বিশ্বাস করে হাতে তুলে দিয়েছিল; তার মর্যাদা এইভাবে দিলে!'

বাবা মিনমিনে গলায় কী উত্তর দিত, বোঝা যেতনা। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, বিয়ের আগে সৎ-মা বাবাকে ভয় করত। কিন্তু বিয়ের পর দান উলটে গিয়েছিল। তখন থেকে বাবাই তাকে ভয় পেতে শুরু করেছিল। সব সময় বাবা কুণ্ঠিত, বিব্রত, জড়সড় হয়ে থাকত। খুব দ্রুত পিঠ-টিঠ বেঁকে সে কোলকুঁজো হয়ে যাচ্ছিল।

মনে পড়ছে, বিয়ের আগে সৎ-মা আর আমি রাত্তিরে একঘরে থাকতাম, বাবা থাকত আরেক ঘরে। বিয়ের পর বাবা ঠিক করেছিল, আমরা সবাই একঘরে থাকব। বাবা সৎ-মা তক্তপোষে শোবে, আমার জন্য বিছানা হবে মেঝেতে। সৎ-মা বলেছিল, 'না। বকুল আলাদা ঘরে থাকবে।' বাবা ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'কিন্তু ও ছেলেমানুষ; একা একা শুলে ভয় পাবে।' সৎ-মা দাঁতে দাঁতে চেপে জেদী গলায় বলেছিল, 'আমি যা বলছি তা-ই হবে।'

সেদিন থেকে একলা ঘরে থাকতে শুরু করেছিলাম। ঘরে ঢুকেই সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতাম। তবু ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেত।

বিয়ের আগে সৎ-মা আমাকে বেশ স্নেহ করত। মা-মরা মেয়ে বলে আমার সম্বন্ধে তার ছিল গভীর মমতা। কিন্তু বিয়ের পর সে অত্যন্ত রূঢ় আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। একেক সময় তার ব্যবহারে আমার চোখে জল এসে যেত। লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন যে কেঁদেছি।

তখন দুর্বোধ্য মনে হত। পরে অবশ্য বুঝেছি বাবার প্রতি বিদ্বেষের জন্য আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত সৎ-মা। বাবার দিক থেকে যা কিছু তাদের সবার বিরুদ্ধে সৎ-মার দারুণ আক্রোশ আর ঘৃণা।

মনে আছে, আবার এই দু নম্বর বিয়ের মাস চয়েক পর একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সৎ-মার বাবা হঠাৎ দেশ থেকে কলকাতায় এসে হাজির। একাই আসে নি, স্ত্রী-ছেলে—সবাইকে নিয়ে এসেছিল। আসার সময় মারোয়াড়ীদের কাছে হুন্ডি করে প্রচুর টাকা এনেছিল। ওদের চলে আসার একটা বড় কারণ সৎ-মা। কেননা বিয়ের আগে বাবা তবু মাঝে মধ্যে ওদের এক-আধটা চিঠি দিত। কিন্তু বিয়ের পর এই যোগাযোগটুকুও রাখে নি। ওরা অবশ্য প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখে যেত। উত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সব বেচেটেচে চলে এসেছে। তা ছাড়া পাকিস্তানে থাকাও যাচ্ছিল না।

বাবা না হয় যোগাযোগ রাখে নি, কিন্তু সৎ-মা কেন যে তার বাবাকে চিঠি-চিঠি লিখত না, আমার কাছে এই ব্যাপারটা এখনও অদ্ভুত লাগে।

কলকাতায় পা দিয়েই সৎ-মার বাবা-মা খুঁজতে খুঁজতে আমাদের বাড়ি চলে এসেছিল। মেয়েকে এভাবে আমার বাবার ঘর করতে দেখে প্রথমটা ওরা একবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। তারপর সৎ-মার মা হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল। সৎ-মার বাবা নিদারুণ হতাশ গলায় বলেছিল, 'তোমার মনে এই আছিল রাসমোহন! রক্ষক হইয়া শ্যাষে ভক্ষক হইলা! দ্যাশ থনে কত টান্‌ঠাবাজি (কৌশল) কইরা টাকা আনছি। দশটা না, পাচটা না, আমার ওই একটা মোটে মাইয়া। ভাবছিলাম তার ভাল বিয়া দিমু। হা ঈশ্বর!'

বাবা একটা কথারও উত্তর দেয় নি। ঘাড় গুঁজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাত-পা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছিল যেন। মনে হচ্ছিল, তার গায়ের হাড়গুলো গলা মাংসের মতো নরম হয়ে গেছে; হুড়মুড় করে ধ্বংসস্তূপের মতো যে কোনো সময় সে ভেঙে পড়বে।

একধারে দাঁড়িয়ে ছিল সৎ-মা। আক্রোশে উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলছিল; বড় বড় নিশ্বাসে বুক দ্রুত ওঠানামা করছিল। বাবার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সে সমানে বলে গিয়েছিল, 'ইতর, নীচ,—'

তারপর আর কী কী কথা হয়েছিল, এতদিন পর আর মনে পড়ে না।

একসময় সৎ-মার মা-বাবা ভাইরা চলে গিয়েছিল। পরে শুনেছি, বেলগাছিয়ার দিকে বাড়ি-টাড়ি কিনে গেঞ্জির কল বসিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা করেছে।

অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ওদের কোনোরকম সম্পমর্ক ছিল না। ওরাও কেউ এখানে আসত না, আমদের দিক থেকেও কেউ যেত না। সৎ-মা কেন যেত না, সেটা আমার কাছে এখনও রহস্যময়! তারপর বছর কয়েক হল বরফ গলতে শুরু করেছে; সম্পর্কটা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মাঝে-মধ্যে সৎ-মা বাপের বাড়ি যায়, সৎ-মার মা এবং ভাইরা এ বাড়ি আসে। কিন্তু বাবা এবং তার নতুন শ্বশুর, কেউ কারো বাড়ি যায় না। তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

বাবার ওপর সৎ-মার এত যে ঘৃণা, এত আক্রোশ, তবু বিয়ের পর বছর বছর তার ছেলেপুলে হতে লাগল। প্রথম চার বছরেই হাবু, নীলিমা, গণেশ আর বাচ্চু হয়ে গেল। এভাবে চলতে থাকলে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, কে জানে! একদিন সৎ-মা সোজা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টারে গিয়ে অপারেশন করিয়ে এসে সংখ্যাটা চারেই ঠেকিয়ে দিল।

সংসারে জনবল যত বাড়ছিল, সেই অনুপাতে বাবার আয়-টায় বাড়ে নি। এদিকে পশ্চিম বাংলার অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ঝপাঝপ কলকারখানা এবং অফিসে তালা ঝুলতে শুরু করেছিল। বাবা একবছর হয়তো চাকরি করত, তারপর ছ'মাস বেকার বসে থাকত। ফল হয়েছিল এই, অভাব-অনটন পোষা বেড়ালের মতো আমাদের পায়ে পায়ে ফিরতে থাকত।

এ সংসারটার ওপর সৎ-মার বিদ্বেষ বরাবরের। তার ওপর নিয়ত অভাব তাকে আরো রুক্ষ আরো নির্দয় করে তুলেছিল। সব সময় সে চিৎকার করত, আমাকে আর বাবাকে দাঁতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইত।

বাবা বিয়ের পর থেকে ক্রমাগত মার খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত বাবা মুখ খুলতে শুরু করেছিল। চেঁচামেচি খুব একটা করত না; তবে মাঝে মধ্যে চাপা ষড়যন্ত্রভরা গলায় এমন একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিত,

যাতে সৎ-মার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত জ্বলে যেত। বাবার যুদ্ধের রীতি ছিল অন্যরকম। দামামা বাজিয়ে সে লড়াইয়ের ময়দানে নামত না; আচমকা একেকটা চোরগোপ্তা আঘাত হানত।

আর আমি সারাদিন মনমরার মতো চুপচাপ বসে থাকতাম। এ বাড়িটা যেন এক বায়ুশূন্য গ্রহ, আমার ছোট্ট একটু আশ্রয় ছিল। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালই ছিলাম। প্রতিবেশী নিশিবাবুর চেষ্টায় স্কুলে ফ্রি-শিপ পেয়েছিলাম। বই-টই অবশ্য বাবা কোনোদিনই কিনে দিতে পারত না। চেয়ে টেয়ে জোগাড়-যন্ত্র করে কিংবা টুকে এনে পড়তে হত। দেখিয়ে দেবার কেউ ছিল না! তা সত্ত্বেও রেজাল্টটা প্রতি বছরই ভাল হচ্ছিল; ফার্স্ট সেকেন্ড হতাম। কী করে হতাম কে জানে!

যখনই মন খারাপ হত, বই নিয়ে বসতাম। ওটাই ছিল আমার বেঁচে থাকার শেষ দুর্গ। সৎ-মা গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে থাকত, 'পড়ছেন! পড়ে পড়ে আমার চিতায় মঠ তুলবেন!' এ সংসারের সব কিছুর মতো আমার লেখাপড়ার ওপর ছিল সৎ-মার প্রচণ্ড রাগ। কিন্তু আমি তার কথায় কান দিতাম না।

নেহাত পয়সা খরচ করতে হয় না; নইলে ঢের আগেই আমার পড়া বন্ধ হয়ে যেত। স্কুলে ভাত ঠিকমতো পেতাম না; মাসের মধ্যে পনের দিন না খেয়ে ক্লাস করতে হত।

তা ছাড়া সৎ-মার পায়ে পায়ে ঘুরে সংসারের কত কাজ যে করতে হত! গণেশ আর বাচ্চু তখন খুব ছোট, জন্মের পর থেকেই ছিল ওরা দারুণ রিকেটি। যতক্ষণ ঘুমোত ততটুকু সময়ই শান্তি; যেই চোখ মেলত অমনি কান্না শুরু হয়ে হয়ে যেত। কোলে নিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওদের কান্না থামাতে হত আমাকেই। এত সবের পরও আমি পড়া ছাড়ি নি।

এইভাবে ক'টা বছর কেটে গেছে। দেখতে দেখতে আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা এসে গিয়েছিল। এতকাল নিজে নিজেই পড়ছি। কিন্তু ইংরেজি আর অঙ্কের এমন কিছু জটিল ব্যাপার আছে যেগুলো নিজে পড়ে ঠিক মাথায় ঢোকানো যায় না। টেস্টের পর বাবাকে বলেছিলাম, 'পরীক্ষার আর তিনমাস বাকি আছে, আমার জন্যে একজন মাস্টার রেখে দেবে?'

'কত লাগব?'

'চল্লিশ টাকার কমে কি আর পড়াবে?'

'আরে সর্বনাশ!'

সেই সময় মনে পড়ে গিয়েছিল, আমার ক্লাসের তিনটে মেয়ে কালিঘাটের কাছে একটা টিউটোরিয়াল হোমে পড়ে; তাতে মাইনে খুবই বেশি লাগে না। ইংরেজি অঙ্ক, দুটো সাবজেক্ট সপ্তাহে ছ'দিন পড়তে লাগে কুড়ি টাকা।

বলেছিলাম, 'তা হলে আমাকে টিউটোরিয়াল হোমে ভর্তি করে দাও—'

বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেইখানে কত লাগব?'

'কুড়ি টাকা।'

'আমারে কাইটা কুচি কুচি করলেও কুড়িখান পয়সা বাইর হইব না। নিজে নিজে যা পার হেই পইড়া পরীক্ষা দ্যাও।'

ফস করে আলো নিবে যাবার মতো আমার মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। বাবার কাছে আগে আর কখনও কিছু চাই নি। দারুণ অভিমানে আমার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। পেছন ফিরে চলে যাচ্ছি, বাবা ডেকেছিল, 'শোন—'

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, 'কী?'

'তিন মাসে লাগব ষাইট টাকা। কালিঘাট যাইতে আসতেও মাসে পাঁচ সাত টাকা। তার মানে হইল তিন মাসে আরো বিশ টাকা। আইচ্ছা দেখি কী করতে পারি—'

পরদিন বাবা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে চারদিক সতর্কভাবে দেখে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিল। খুব নিচু গলায় বলেছিল, 'এর বেশি আর জোগাড় করতে পারলাম না রে।'

'কোথায় পেলে?'

'ধার করছি।'

বাবা তখন একটা কন্ট্রাক্টরের কাছে পৌনে দুশ টাকা মাইনের চাকরি করে। ভয়ে বয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী করে শোধ করবে?'

বাবা আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলেছিল, 'সে তরে ভাবতে হইব না' একটু থেমে কী ভেবে বিষণ্ণভাবে বলেছিল, 'এই টাকায় তিন মাস চলব না রে; যদ্দিন চলে পড়। ধার করার কথা কারোরে ক'বি (বলবি) না কিন্তু।' কারোকে বলতে বাবা যে সৎ-মার কথাই বলেছে তা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি।

দ্বিতীয়বার বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল বাবা। পারতপক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলত না। সর্বক্ষণ দুই কাঁধে পাষাণভারের মতো অপরাধের বোঝা চাপিয়ে উদাসীন অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। কিন্তু তার অন্যমনস্কতা উদাসীনতার তলায় আমার জন্য দু-চার ফোঁটা স্নেহ তখনও যে থেকে গেছে, সেদিন টের পেয়েছিলাম।

পঞ্চাশ টাকায় দু'মাস তো চলবে। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, বাড়ি থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত বাসে যাবে; টালিগঞ্জ থেকে কালিঘাট হেঁটে। তাতে কিছু পয়সা নিশ্চয়ই বাঁচবে। দু'মাস পর বাবা যদি তার ওপর আর কিছু জোগাড় করে দিতে পারে, কোচিং ক্লাসটা একেবারে পরীক্ষা পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া যাবে।

আমি সেদিনই কালিঘাট গিয়ে টিউটোরিয়ালে ভর্তি হয়িছিলাম। আর সেদিনই ক্লাস করতে গিয়ে বিজনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

এই টিউটোরিয়ালটায় আমাদের স্কুলের তিনটে মেয়ে পড়ত। তাদের সঙ্গেই ক্লাস করতে ঢুকেছিলাম। ওরা বলেছিল, 'আজ প্রথম ক্লাসটা বিজন সান্যালের; দুর্দান্ত পড়ায়।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী পড়ায়?'

'ইংরেজি।'

আমাদের ক্লাসে সবসুদ্ধু চারটে মেয়ে, দুটো ছেলে। ক্লাসরুমে ঢুকে দেখি আমাদের আগেই ছেলেদুটো এসে বসে আছে। ওরা যেখানে বসেছে তার উলটোদিকের বেঞ্চে আমরা সবে বসতে যাচ্ছি, ছিপছিপে পাতলা চেহারার, কাটা কাটা মুখের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি যুবক এসে ঢুকল। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, এলোমেলো চুল, হাতে দু-একটা কী বই। প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, মানুষটি অন্যমনস্ক ধরনের।

আমার পাশেই ছিল কৃষ্ণা। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করেছিল, 'এই হল বিজন সান্যাল।'

আমরা দাঁড়িয়েই ছিলাম; বিজনকে দেখে সেই ছেলে দুটো উঠে দাঁড়িয়েছিল।

হাতের ইশারায় আমাদের বসতে বলে বিজন মাঝখানের চেয়ারে বসেছিল। বলেছিল, 'আজ কী পড়া আছে যেন?'

একটি ছেলে সারা ক্লাসের হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'ইংলিশ পোয়েট্রি স্যার—'

এক ঘণ্টার ক্লাসে তিনটে ছোট ছোট কবিতা পড়িয়ে সেগুলোর সবরকম প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে দিয়েছিল বিজন। তার পড়বার ধরন এত সুন্দর যে ওই কবিতাগুলো বই উলটো আর আমাকে দেকতে হয় নি।

ঘন্টাখানেক পড়াবার পর হঠাৎ বিজনের চোখ আমার ওপর স্থির হয়েছিল। এক পলক তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল, 'তোমাকে তো আগে দেখি নি—'

চার ফুট দূরে এক ঘন্টা বসে থাকবার পর তবে কিনা আমাকে দেখতে পেল! চোখ নিচু করে বলেছিলাম, 'আমি আজই ভর্তি হয়েছি।'

'তাই হবে।' আর কিছু না বলে বেরিয়ে গিয়েছিল বিজন।

তারপর জিওমেট্রি আর অ্যালজেব্রার দুটো ক্লাস করে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। বড় রাস্তায় এসে ওরা বাস ধরেছিল। 'একটা কাজ আছে' বলে আমি আর ওদের সঙ্গে যাই নি। আসলে আমি তো টালিগঞ্জ পর্যন্ত হেঁটে যাব।

রসা রোড ধরে হাঁটছিলাম। সবে সন্ধে হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর ভিড় আর আলো এবং গাড়ি। টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে আসতেই পাশ তেকে কে যেন ডেকেছিল, 'আরে তুমি!'

চমকে মুখ ফেরাতেই বিজনকে দেখতে পেয়েছিলাম। একমুখ হেসে সে বলেছিল, 'একটু আগে তোমাকে টিউটোরিয়াল হোমে দেখলাম না!'

'হ্যাঁ—'

'কোথায় থাক?'

'গড়িয়ার ওধারে।'

'সে তো অনেক দূর—' একটুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থেকে বিজন বলেছিল, 'অত দূর হেঁটে যাবে কী করে?'

'হেঁটে যাব না—'

'হাঁটছ তো—' বিজন হেসে ফেলেছিল।

বিব্রত মুখে বলেছিলাম, 'আমার এদিকে একটু দরকার আছে।'

'ও। তারপর বাসে উঠবে?'

'হ্যাঁ—'

'আচ্ছা, আমার একটু তাড়া আছে। চলি—' বড় বড় পা ফেলে খানিকটা এগিয়েই তক্ষুনি আবার ফিরে এসেছিল বিজন, 'ওই দেখ, আমার কিরকম ভুল—'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'তোমার নামটাই জানা হয় নি।'

'আমার নাম বকুল—বকুল গুহ।'

শুনে আর দাঁড়ায় নি বিজন। আগের মতোই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গিয়েছিল।

পরের দিনও ছুটির পর বিজনের সঙ্গে দেখা। হেসে হেসে সে বলছিল, 'আজও এদিকে কাজ আছে নাকি?'

জড়ানো গলায় উত্তর দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ—মানে—'

তার পরদিনও দেখা হয়েছিল। তারও পরের দিন। কী আশ্চর্য, রোজই ছুটির পর রসা রোডের ফুটপাতে নিয়মিত দেখা হতে লাগল। কোনোদিন আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে চারু অ্যাভেনিউ পর্যন্ত গিয়ে ডান দিকে ঢুকে যেত। কোনোদিন খুব তাড়াহুড়ো থাকলে কথা-টথা না বলে শুধু একটু হাসত; তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল, আমার সঙ্গে দেখা হবে বলেই বিজন ছুটির পর রসা রোডের এই ফুটপাত দিয়ে হাঁটে। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, আমার মধ্যে কী এমন আছে যাতে বিজনের মতো ভদ্র, শিক্ষিত যুবক পিছু নিতে পারে। এমন একটা বিশ্রী কথা কী করে যে ভাবতে পেরেছিলাম! সেদিন নিজের ওপরই আমার দারুণ রাগ হয়ে গিয়েছিল।

দশ পনের দিন এইরকম চলল। তারপর হঠাৎ বিজন একদিন বলেছিল, 'কী ব্যাপার বল তো?'

বিজন কী বলতে চায় বুঝতে পারি নি; তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'রোজই তোমার এদিকে কাজ থাকে নাকি?'

এরকম একটা প্রশ্ন বিজনের দিক থেকে আসতে পারে, ভাবি নি। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, 'না—মানে, ঠিক—'

'থাকো গড়িয়ার ওধারে। তবে এতটা রাস্তা শুধু হাঁটো কেন? কালিঘাট ট্রাম ডিপোর কাছ থেকেই তো বাস ধরতে পার।'

উত্তর দিই নি।

বিজন আবার বলেছিল, 'কী হল, বলতে আপত্তি আছে নাকি? তবে থাক।'

আধফোটা গলায় বলেছিলাম, 'আমার হাঁটতে খুব ভাল লাগে।'

'তাই বলে রোজ রোজ?'

এতখানি রাস্তা হেঁটে যাবার যে কারণটি বলেছি, নিজের কাছেই তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। বারকয়েক ঢোক গিলে এবার সত্যি কথাটাই বলে ফেলেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বিজনের মুখটা সহানুভূতিতে কোমল হয়ে গিয়েছিল। তক্ষুনি সে আর কিছু বলে নি। পাশাপাশি বেশ খানিকটা হাঁটবার পর গাঢ় গলায় একসময় বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে আমার আশ্চর্য মিল। পয়সা বাঁচাবার জন্যে আমিও টিউটোরিয়াল হোম থেকে রোজ চারু অ্যাভেনিউ পর্যন্ত হেঁটে আসি।'

চমকে বিজেনর দিকে তাকিয়েছিলাম। লোকটা কি চতুর ষড়যন্ত্রকারী? আমি হাঁটার যে কারণ বলি, সে-ও তাই বলে যে! কিন্তু বিজনকে খুঁটিয়ে দেখে কোনো চক্রান্তের আভাস পাওয়া যায় নি। বরং এমন সরল নিষ্পাপ পবিত্র মুখ আগে আর কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছিলাম না।

মেয়েদের মন এমন এক আয়না যেখানে গভীর গোপন যে কোনো ষড়যন্ত্রের ছায়া পড়বেই। কিন্তু প্রথম দিকে কিছুটা সংশয় থাকলেও পরে সব দ্রুত পরিস্কার হয়ে যাচ্ছিল। সঙ্কোচের গলায় বলেছিলাম, 'আপনি রোজ এদিকে আসেন। দরকার থাকে বুঝি?'

বিজন বলেছিল, 'আমরা এদিকেই থাকি।'

নিজের অজান্তেই যেন ফস করে বলে ফেলেছিলাম, 'কোথায়?'

'চারু অ্যাভেনিউর পিছন দিকে; টালিগঞ্জ সাকুলার রোডের কাছে।'

ক্রমশ ব্যাপারটা সহজ হয়ে এসেছিল। ছুটির পর রোজই আমরা গল্প করতে করতে একসঙ্গে হেঁটে যেতাম। তারপর চারু অ্যাভেনিউর মুখে এসে বিজন ডানদিকে ঘুরে চলে যেত আমি আরো অনেকটা এগিয়ে ট্রাম ডিপোর কাছে গিয়ে বাস ধরতাম। কোনো কোনো দিন হাতে সময় থাকলে বিজন টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এসে আমাকে বাসে তুলে দিত।

কথায় কথায় আমাদের বাড়ির সব কথা জেনে নিয়েছিল বিজন; ওদের বাড়ির কথাও আমাকে বলেছিল।

আমাদের মতো বিজনরাও পূর্ব বাংলার মানুষ। তবে ওরা দেশভাগের কিছু আগে কলকাতায় চলে এসেছিল। ওর বাবা নেই। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। এক বিধবা দিদি তার একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে তাদের বাড়িতে এসে আছে। ছোট একটা বোনের বিয়ে অবশ্য হয়ে গেছে কিন্তু সেটা সুখের বিয়ে নয়। শ্বশুরে-বাড়িতেই তখন থাকত সে, কিন্তু সেখানে বনিবনা ছিল না।

বিরাট সংসারের সব দায়িত্ব বিজনের। তখন সবে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছে সে। চাকরি-বাকরি কিছু ছিল না। অবশ্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে প্রায় রোজই একটা করে দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছিল; তাতে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ছাড়া আর কারো উপকার হচ্ছিল না।

চাকরি থাক বা না-ই থাক, সংসার সে কথা শুনবে না। আট-দশটা মানুষের মতো চাল-ডাল-তেল-নুন রোজ জোগান দিয়ে যেতেই হবে।

বিজন তখন সকাল-বিকেল দু বেলা টিউটোরিয়ালে পড়াত; গাদা গাদা টুইশনি করত। আট-দশটা মানুষকে বাঁচাবার জন্য সর্বক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল সে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার বড় মায়া হত।

কোনো কোনো দিন পকেটে পয়সা থাকলে বিজন বলত, 'চল, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।'

কুণ্ঠিতভাবে বলতাম, 'আপনি খান; আমি আজ যাই—'

বিজন চট করে আমার মনের কথাটা পড়ে নিত। বলত, 'আরে বাবা, এক কাপ চা তোমাকে খাওয়াতে পারব। তাতে আমাদের কাউকে উপোস দিতে হবে না।'

জোর করেই বিজন আমাকে কোনো রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেত। পর্দাঢাকা ছোট্ট কেবিনের ভেতর মুখোমুখি বসিয়ে বলত, 'কী খাবে বল—'

চোখ নামিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলতাম, 'চা—' খাওয়ার ব্যাপারে আমার বড় লজ্জা।

বিজন বলত, 'চা তো খাবেই; ওটা খাদ্য নাকি? আর কী খাবে?'

চোখ নামিয়ে আমি নখ খুঁটতে থাকতাম।

বিজন আবার বলত, 'কী বোকা মেয়ে; খাওয়ার সময় অত লজ্জা কিসের? আচ্ছা ঠিক আছে, টোস্ট আর অমলেট আনতে বলি।'

খেতে খেতে একেক দিন বিজনের মুখ বিষণ্ণ হয়ে যেত। বলত, 'বুঝলে বকুল, আর বোধহয় ফ্যামিলিটা বাঁচাতে পারব না। টুইশানি-ফুইশানি করে কি এত লোককে রক্ষা করা যায়!' ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিল সে।

আমি চুপ।

বিজন আবার বলত, 'আমার দম ফুরিয়ে আসছে। ছ্যাকরা গাড়ির রদ্দি ঘোড়ার মতো একদিন হাড়গোড় ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ব। আর উঠব না।'

একদিন কি দু'দিন বিজন আমাকে তাদের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন ওর মায়ের পাগলামিটা ভীষণ বেড়ে গেছে; পাগলামি বাড়লে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকত মহিলা।

যে দু একদিন গেছি, বিজনের মায়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। ওর বিধবা দিদি আর তার বাচ্চাগুলোকে অবশ্য দেখেছি। ওদের বাড়ি যাওয়াতে বিজনের দিদি যে খুব খুশি হয়েছে, এমন মনে হয় নি। আমার সঙ্গে দু-একটা কথা টথা নিশ্চয়ই বলেছে কিন্তু সারাক্ষণ কেমন যেন অপরিষ্কার সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থেকেছে।

দেখতে দেখতে দুটো মাস ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাবা যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিল তা থেকে দু'মাসে টিউটোরিয়ালের মাইনে চল্লিশ টাকা দিয়েছি; গাড়িভাড়া লেগেছে পাঁচ টাকা। কালিঘাট থেকে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত হেঁটে পাঁচটা টাকা বাঁচিয়েছি। ভেবেছিলাম ছ'মাস পর বাবা আরও কুড়িটা টাকা জোগাড় করে দিতে পারবে, কিন্তু তা আর সম্ভব হয় নি। তার মানে টিউটোরিয়ালে পড়তে যাওয়া ওখানেই শেষ। আরেকটা মাস কোচিং ক্লাস করতে পারলে খুব ভাল হত। কিন্তু তা অসম্ভব।

টিউটোরিয়ালে যেতে পারব না, সে জন্য দুঃখ তো ছিলই। হঠাৎ অন্য একটা কথা ভাবতে গিয়ে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কথাটা হল—বিজনের সঙ্গে আর দেখা হবে না। বিজন ছাড়া কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ আগে আর কখনও হয় নি। তার মতো অন্য কেউ আমার জীবনের কথা ওভাবে জানতেও চায় নি। বিজনের সহানুভূতি, বিজনের আন্তরিকতা এবং সরল ব্যবহার আমার মধ্যেকার ভীরু কুণ্ঠিত লাজুক একটি মেয়েকে ক্রমশ সহজ করে তুলেছিল। দুটো মাস কালিঘাট থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাশাপাশি হেঁটে বিজন যে আমার খুব কাছে চলে এসেছে, আগে বুঝতে পারি নি। ওর জীবনে এক ধরনের কষ্ট আছে, আমার জীবনে আরেক ধরনের। তবু পরস্পরের প্রতি অনুচ্চারিত এক সহানুভূতি আমাদের যেন একই বিন্দুতে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনে আছে, দ্বিতীয় মাসের শেষ দিনটায় বিজন আমার সঙ্গে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এসেছিল। সারাটা রাস্তা সে-ই কথা বলেছে; আমি হুঁ-হাঁ করে গেছি। বিজনের সঙ্গে আর দেখা হবে না, এই চিন্তাটাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল।

ট্রাম ডিপোর কাছে এসে হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে বিজনের। কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলেছে, 'কী ব্যাপার বল তো, আজ তুলি এত অন্যমনস্ক কেন? কী হয়েছে?'

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বার দুই তিন মুখ তুলে তক্ষুনি নামিয়ে নিয়েছিলাম।

বিজন আমার দিকে ঝুঁকে বলেছিল, 'কিছু বলবে?'

আস্তে মাথা নেড়েছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'কী?'

মুখ আরও নিচু করে আবছা গলায় বলেছিলাম, 'কাল থেকে আমি আর টিউটোরিয়ালে আসছি না।'

বিজন চমকে উঠেছিল, 'কেন?'

আমি চুপ।

বিজন আরেকটু ঝুঁকেছিল, 'কী হল, বল—'

'বাবা আর টাকা দিতে পারবে না।' আমার ঘাড় ভেঙে মাথাটা আরো ঝুলে পড়েছিল।

তক্ষুনি উত্তর দেয় নি বিজন। কিচুক্ষণ পর বলেছিল, 'যেমন ক্লাস করছিলে করে যাও—'

'কিন্তু—'

'কী?'

'টাকার কী হবে?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

আমি আবার কী বলতে যাচ্ছিলাম, এই সময় বাস এসে গিয়েছিল। একরকম তাড়া দিয়েই বিজন আমাকে বাসে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'কাল আসবে কিন্তু—'

বাড়ি ফিরে সারারাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, টিউটোরিয়ালে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। কিন্তু পরের দিন কখন যে ফর্সা শাড়ি পরে, চুল আঁচড়ে হাতে বই খাতা নিয়ে বাসে গিয়ে উঠেছি, নিজেই জানি না।

আরো একটা মাস যে টিউটোরিয়ালে পড়েছিলাম, তার টাকা বিজন দিয়েছিল, না টিউটোরিয়াল হোমের ম্যানেজমেন্টেকে বলে ফ্রি করিয়ে নিয়েছিল, সেসব কথা তাকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করতে পারি নি।

যাই হোক, একসময় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা এসে গিয়েছিল। কোথায় আমার সেন্টার পড়েছে কথায় কথায় জেনে নিয়েছিল বিজন। তারপর কী আশ্চর্য, প্রথম দিন ইংরেজি ফার্স্ট পেপার পরীক্ষার টিফিনের সময় দেখি, সে গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

পরীক্ষার সময় সব বাড়ি থেকেই লোক আসে। আমাদের বাড়ি থেকে কারো আসার সম্ভবনা ছিল না। বাবা ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে রাত। হাবু-গণেশরা তখন ছোট। বাকি সৎ-মা; চারটে ছেলেমেয়ে আর সংসারের জালে সবসময় সে আটকে আছে। তাছাড়া আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে তার দারুণ বিতৃষ্ণা। কাজেই আসবে কে?

বিজনকে দেখে অবাক হয়ে গিযেছিলাম। সত্যিই যে সে আসতে পারে ভাবি নি। বলেছিলাম, 'আপনি!'

বিজন একমুখ হেসেছিল, 'কিরকম পরীক্ষা দিচ্ছ দেখতে এলাম।' কোশ্চেন পেপার নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোন প্রশ্নের কী উত্তর লিখেছি, জিজ্ঞেস করেছিল। তারপর হঠাৎ কী লক্ষ করে বলেছিল, 'চোমাদে বাড়ি থেকে কেউ আসে নি?'

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, 'না।'

'আসবে?'

'না।'

'কিছু খেয়েছ?'

আমি চুপ। যাতায়াতের বাসভাড়া ছাড়া বাড়ি থেকে আর কিছুই দেয় নি. কিন্তু সে কথাটা বিজনকে বলা যায় নি।

প্রায় জোর করে সামনের একটা খাবারের দোকেন নিয়ে গিয়ে বিজন আমাকে মিষ্টি-টিষ্টি খাইয়ে এনেছিল।

পরীক্ষার ক'দিন রোজ টিফিনের সময় সে আসত; খাবার-দোকান থেকে আমাকে খাইয়ে আনত; প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করত। তারপর সেকেন্ড হাফের পরীক্ষার ঘন্টা পড়লে আমাকে হল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে যেত।

মনে আছে, শেষ পরীক্ষার দিন একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিন ছিল একবেলার পরীক্ষা; শেষ হয়ে গিয়েছিল। হল্ তেকে বেরিয়ে দেখি বিজন দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই তার মুখ হাসিতে ভরে গিয়েছিল। অন্য দিনও হাসত সে; কিন্তু এমন উজ্জ্বল ঝকমকে আনন্দময় হাসি আগে আর কখনও দেখি নি।

বিজন বলছিল, 'পরীক্ষা কিরকম হল?'

'মোটামুটি।'

অন্য দিন কোশ্চেন পেপারটা টেনে নিয়ে দেখে বিজন। সেদিন কিন্তু ওটার কথা তার মনেই ছিল না। প্রায় চেঁচিয়েই সে বলেছিল, 'জানো, একটা বিরাট সুখবর আছে।'

প্রচন্ড আবেগের মতো কী যেন তার চোখে মুখে টগবগ করে ফুটছিল। বিজনকে তখন যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, সে খুব শান্ত চাপা ধরনের মানুষ। আবেগ-টাবেগ যত প্রবলই হোক, বিজন ঢেকে রাখতে পারত। কখনই বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়তে দিত না।

বিস্ময়ের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম, 'কী সুখবর?'

'আমার চাকরি হয়েছে।'

'কোথায়?'

'খবরের-কাগজে?'

'কোন কাগজে?'

একটা বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার নাম করে বিজন বলেছিল, 'এতদিনে বাঁচলাম। এবার হয়তো ফ্যামিলিটা বাঁচাতে পারব।'

বিজনের চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আগের সেই নৈরাশ্য আর ছিল না। সব হতাশা কেটে গিয়ে তাকে আশ্চর্য উজ্জ্বল আর ঝলমলে দেখাচ্ছিল। একটা চাকরি যাদুকরের ছোঁয়ার মতো তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বিজনরে দিকে তাকিয়ে আমার দারুণ ভাল লাগছিল।

বিজন বলেছিল, 'চল, আজ তোমাকে খাওয়াব।'

মুখ নামিয়ে বলেছিলাম, 'রোজই তো খাওয়ান।'

'ধুর, ও আবার খাওয়া নাকি!' বিজন আমাকে চৌরঙ্গির ওধারে একটা ভাল রেস্টুরেন্টে খাইয়েছিল। তারপর নিয়ে গিয়েছিল এয়ারকন্ডিশনড সিনেমা হলে।

ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। বাড়িতে বকবে।

বিজন হেসেছিল, 'একটা দিন না হয় আমার জন্যে বকুনি খেলেই।'

আমি আর আপত্তি করি না। আসলে বিজনের কাছে থাকতে, তার সঙ্গে কথা বলতে সেদিন ভীষণ ভাল লাগছিল। ওর আনন্দ চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার মধ্যেও খানিকটা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

সিনেমা-টিনেমা দেখে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল বিজন। তখন আর রোদ টোদ নেই; সূর্যটাকেও দেখা যাচ্ছিল না। জলে কালি গুলে দিলে যেমন হয়, আবছা অন্ধকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। এরই মধ্যে চৌরঙ্গির উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় নানা রঙের নিওন জ্বলে উঠেছিল।

ঝকঝকে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যেতে যেতে এক সময় বিজন বলেছিল, 'চাকরি-বাকরি হল, কিন্তু একটা কথা ভেবে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'কী?'

'কাল থেকে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।'

আমার বুকের ভেতর দিয়ে উঁচুনিচু ঢেউয়ের মতো কি খেলে গিয়েছিল।

বিজন আবার বলেছিল, 'এতদিন কোচিং ক্লাস ছিল, পরীক্ষা ছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। রোজ রোজ দেখা হয়ে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন থেকে বিকেল হলেই তোমার কথা মনে পড়বে।'

আমি চুপ। বিষাদের মতো কিছু একটা আমার বুকের ভেতর ঘন হচ্ছিল।

বিজন বলে যাচ্ছিল, 'অবশ্য একটা কাজ করলে মাঝে মধ্যে দেখা হতে পারে।'

খুব আগ্রহ নিয়ে বিজনের দিকে তাকিয়েছিলাম, 'কী?'

'আমাদের বাড়ি তো তুমি চেনো; সেখানে চলে আসতে পার।' বলেই কী ভেবে তক্ষুনি আবার শুরু করেছিল বিজন, 'থাক, আমাদের বাড়ি যেতে হবে না। বরং আমাদের অফিসে ফোন করো। বলবে রিপোর্টার্স টেবলে দিতে। কোথায় দেখা হবে, ফোনেই কথা বলে ঠিক করে নেব।'

কোনোদিন কাউকে ফোন করিনি; কিভাবে করতে হয় তাও জানি না। তবু ফিসফিস গলায় বলেছিলাম, 'আচ্ছা—'

বিজন বলেছিল, 'আমি তোমাদের বাড়ি চলে যেতে পারি। কিন্তু কেউ কিছু ভাবতে পারে।'

এদিকটা ভাবি নি। কেননা, আমাদের বাড়িতে বিজনের যাবার কথা আগে কখনও হয় নি। সত্যিই তো, যদি হঠাৎ সে চলেই যায়, আমি ভীষণ বিপদে পড়ব। বিজন কে, কেন এসেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারটা প্রশ্ন করে সৎ-মা আমার আলজিভ বার করে ছাড়বে। যাই হোক, আমি চুপ করে ছিলাম।

একটু নীরবতা। তারপর বিজন আবার বলেছিল, 'পরীক্ষা-টরীক্ষা তো হয়ে গেল। এই তিনটে মাস কী করবে?'

'কিছু ভাবি নি।'

'তিন মাস চুপচাপ বসে না থেকে টাইপের স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও না। যা দিনকাল, টাইপটা শিখে রাখা ভাল; এটা একস্ট্রা কোয়ালিফিকেশন। তোমাদের ফ্যামিলির কথা তো শুনেছি; হয়তো তোমাকে চাকরি-বাকরি নিতেও হতে পারে।'

বিজন ভাল পরামর্শই দিয়েছিল। কিন্তু তক্ষুনি আবার মনে পড়ে গিয়েছিল, টাইপ স্কুলে ভর্তি হতে হলে টাকার দরকার। আমার পরীক্ষার ফী এবং টিউটোরিয়ালের মাইনে মিলিয়ে গুচ্ছের টাকা খরচ হয়েছে। তারপরও কি বাবা টাইপ স্কুলে ভর্তি করে দিতে রাজি হবে? দ্বিধার গলায় বলেছিলাম, 'দেখি—'

আমার মনোভাব চট করে বুঝে নিয়ে বিজন বলেছিল, 'টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে আমার এক বন্ধুর টাইপ স্কুল আছে। তোমাকে ওখানে ফ্রি শিখবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

একটু ভেবে বলেছিলাম, 'বাবাকে বলে দেখব।'

'তোমার বাবা রাজি হলে কাল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আমার অফিসে ফোন করো।'

বাড়ি ফিরে বাবাকে টাইপ শেখার কথা বলতেই বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, 'টইপ শিখা কী হইব?'

'যদি একটা চাকরি পাই—'

বাবা নড়ে-চড়ে বসেছিল, 'চাকরি! তা হইলে তো খুবই ভাল হয়; সংসারের যা অবস্থা!' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'কেউ আশা-টাশা দিছে নাকি?'

চোখ কান বুজে জলে ঝাঁপ দেবার মতো করে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

বিজনের সঙ্গে দেখা হবে; সেই জন্যই আমার টাইপ শিখতে যাওয়া। কিন্তু বাবা যদি জিজ্ঞেস করত কে আশা দিয়েছে, তার সঙ্গে কোথায় কিভাবে আলাপ হয়েছে, দারুণ বিপদে পড়ে যেতাম। কেননা একটা মিথ্যের মেরুদণ্ড শক্ত রাখতে আরো দশটা মিথ্যে বলতে হত। আমি আবার গুছিয়ে-টুছিয়ে মথ্যে বলতে পারি না, নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতাম।

বাবা কিন্তু তার ধার দিয়েই যায় নি। সংসারের চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি চাকরি পেলে সহজ্রভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারবে, এতেই সে খুশি। বলেছিল, 'টাইপ শিখতে মাসে কত কইরা লাগব?'

'কিচ্ছু লাগবে না। খালি টালিগঞ্জ রেল ব্রিজ পর্যন্ত যাতায়াতের ভাড়াটা যদি দাও—'

'ঠিক আছে, দিমু—'

সৎ-মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনে গিয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই আমার সম্বন্ধে সৎ-মার দারুণ বিদ্বেষ। লক্ষ করেছিলাম, চাকরির কথায় তার মুখে বিদ্বেষের সেই রেখাগুলি ধীরে ধীরে কেমন নরম হয়ে যাচ্ছে।

মনে আছে, সেই দিনই তিনটের সময় পোস্ট অফিসের একটা লোককে বিজনের ফোন নম্বর দিয়ে ধরে দিতে বলেছিলাম।

জীবনে সেই আমার প্রথম ফোন করা। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে বিজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে টের পাচ্ছিলাম, আমার হাত-পা ভীষণ কাঁপছে।

বিজন বলেছিল, 'এক কাজ করতে পারবে?'

'কী?'

'ছ'টার সময় চারু মার্কেটের উলটোদিকে ফুটপাতে থেকো। আমি আসছি।'

'আচ্ছা।'

সেই দিনই টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে একটা ফোন ছিল; রোজ দুপুরবেলা দুটোর সময় বিজন ওর অফিস থেকে আমার সঙ্গে কথা বলত। তখন ও সাধারণ একজন রিপোর্টার। যেদিন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কলকাতার বাইরে যেত সেদিন অবশ্য কথা বলা হত না। মাঝে মাঝে এক আধদিন টাইপ শেখার পর বিজন আমাকে নিয়ে কার্জন পার্কে চলে যেতে বলত। রাজভবনের উলটোদিকে যেখানে ক্যাকটাস ঝোপের তলায় গাদা গাদা ইঁদুর থাকে, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ওটাই ছিল আমাদের দেখা করবার জায়গা। বিজন অফিসে ম্যানেজ করে সোজা ওখানে চলে আসত।

কোনোদিন বিজন আমাকে নিয়ে যেত গঙ্গার ধারে; যেখানে জলচর বিরাট বিরাট জাহাজ নোঙর ফেলে আছে। আমরা ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসে আবোল-তাবোল গল্প করে যেতাম, মশলা মুড়ি কি আলুকাবলি খেতাম বা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে দাঁতে কাটতাম। কোনোদিন আমরা যেতাম দক্ষিণেশ্বর বা বটানিকসে। কোনোদিন সোজা এয়ারকন্ডিশনড সিনেমা হলে।

যেদিন বিজনের সঙ্গে দেখা করতাম, সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। সৎ-মা কি বাবা যদি জিজ্ঞেস করত, 'এতদেরি হল কেন?' মুখ নিচু করে বলতাম, 'চাকরির ব্যাপারে একটু যেতে হয়িছিল।' এই ডাহা মিথ্যেটা বিজনই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। বাবা কি সৎ-মা এর বেশি আর কিছু জানতে চাইত না।

জুলাই মাসের শেষে রেজাল্ট বেরুল। আমি সেকেন্ড ডিভিসনে পাশ করেছিলাম।

বিজন বলেছিল, 'এবার কী করবে? কলেজে ভর্তি হবে তো?'

বাড়ির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বলেছিলাম, 'না।'

'তবে কী করতে চাও?'

'একটা চাকরির ভীষণ দরকার। চাকরি হলে নাইট ক্লাস করার কথা ভাবব।

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলেছিল, 'চাকরির ব্যাপারে তুমি তা হলে খুব সিরিয়াস?'

'নিশ্চয়ই। বাবা যে কাজ করে তাঁর কোনো সিকিউরিটি নেই। সংসার রক্ষা করতে হলে আমাকে চাকরি করতেই হবে।'

'দেখ, খবরের কাগজের সোর্সে কিছু কিছু ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তা হলে চেষ্টা করে দেখি।'

'তিন মাস টাইপ করছ। কিরকম স্পিড হয়েছে?'

'পঁচিশ তিরিশের বেশি হবে না।'

'আরেকটু খেটে ওটা ফরটি-টরটির মতো করে ফেল। আর একটা কাজ করতে হবে।'

'কী?'

'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে একটা কার্ড করিয়ে নেবে। কালই করিয়ে নাও।'

'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কোথায়?'

রগড়ের গলায় বিজন বলেছিল 'নাঃ, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না দেখছি। বাংলাদেশের ইয়াং মেয়ে হয়ে এখনও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চেনো না! ঠিক আছে, আমি নিয়ে যাব।'

আরো ছমাস পর আমার টাইপের স্পিড পঁয়তাল্লিশ উঠলে চাকরি হয়েছিল। (সেই চাকরিই এখনও করে যাচ্ছি)। বিজনই অনেক ধরাধরি ছোটাছুটি করে ওখানে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

চাকরি হবার পর বিজন বলেছিল, 'এবার নাইট কলেজে ভর্তি হয়ে যাও।'

সাউথ ক্যালকাটার একটা কলেজে ভর্তি হয়েও ছিলাম। কিন্তু চাকরি করা, বাস জার্নি এবং কলেজ—একসঙ্গে নিটে চালাতে গিয়ে শরীর ভেঙে পড়ছিল। এক বছর কলেজ করে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলাম।

চাকরি হবার পর বিজনের সঙ্গে আবার আগের মতো রোজ দেখা হতে লাগল। টিফিনের সময়ে অফিস পালিয়ে টুক করে ও ডালহৌসি চলে আসত। এক-আধদিন আসতে না পারলে আমি এসপ্ল্যানেডের কাছে ওর অফিসে চলে যেতাম।

যাই হোক, আমি চাকরি পাবার পর বিজনরা টালিগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে ব্যারাকপুর চলে গিয়েছিল। এদিকে আমাদের সংসারের অবস্থাও কিছু ফিরেছে। সহজভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারছিলাম। সৎ-মার ব্যবহারও গিয়েছিল বদলে। আগে আগে আমাকে দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়ে নিত সে। চাকরি পাবার পর বেশি কিছু করতে দিত না। একটু আধটু যত্নও করতে শুরু করেছিল। ছুটির দিনে আমাকে কাছে বসিয়ে বলত, 'চুলগুলোর কী অবস্থা করেছিস বল তো; একেবারে জট পাকিয়ে গেছে।' চুল খুলে তালুতে ভাল করে তেল ঘষে, চিরুনি গিয়ে জট ছাড়িয়ে কোনোদিন খোঁপা বেঁধে দিত; কোনোদিন বা বেণী।

আমি চাকরি পাবার আগে হাবু-গণেশরা স্কুলে পড়ত ঠিকই, তবে মাইনে দিতে না পারার জন্য প্রায়ই নাম কাটা যেত। বছরে দু'মাসও ওরা ক্লাস করতে পারত কিনা সন্দেহ; বাকি সময়টা রাস্তায় ঘুরত। হাবুটা তো তখন থেকেই চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে আর সিগারেট টানতে শুরু করেছে।

আমি চাকরি পাবার পর স্কুলের মাইনে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ততদিনে না পড়ে পড়ে ওদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। গণেশটা তবু প্রি-ইউ পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু হাবু আর বাচ্চু ক্লাস সেভেন এইটে উঠেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। নীলিমাও তা-ই।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গিয়েছিল। তার মধ্যে জল-হাওয়া এবং আলোর মতো বিজন কখন যে আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, মনে নেই। ওকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বই যেন অর্থহীন। বিজন প্রথম থেকেই আমাকে 'তুমি' বলত। আমি কখন 'তুমি' বলত শুরু করেছিলাম, মনে পড়ে না। তেমনি মনে রড়ে না বিজন কবে বলেছিল, 'এভাবে আর চলে না—'

'কি ভাবে?' আমি তার চোখের ভেতর তাকিয়েছিলাম।

'এই দিনে একবার দেখা করে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে। এমন করে সারা জীবন চালানো যায় না, বুঝলে?'

হেসে ফেলেছিলাম, 'কিভাবে চালাতে চাও?'

বিজন বলেছিল, 'তুমি কি কিছুই 'ফিল' কর না?'

বিজন কী বলতে চেয়েছে তক্ষুনি বুঝেছি। মুখ নামিয়ে আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলেছিলাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

এক পলক বিজনের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম, 'না, কিছু না।'

বিজন এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, 'আসছে সপ্তাহে আমি কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশ দেব।'

একটু মজা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। ঠোঁট টিপে খুব আস্তে বলেছিলাম, 'বাব্বা, দারুণ তাড়া দেখছি।'

'হ্যাঁ, তাড়াই। বয়েস বাড়ছে তো। এবার লাইফে সেটেলড হওয়া দরকার।'

'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'তোমার আমার ফ্যামিলি।'

'ফ্যামিলি, ফ্যামিলি, ফ্যামিলি" বিজনকে ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত দেখিয়েছিল', ফ্যামিলির দিকে তাকিয়ে থাকলে এ জন্মে আর বিয়ে করা হবে না। নোটিশ দেবার কথাটা মনে রেখো।'

'আচ্ছা।'

কিন্তু সেবার নোটিশ দেওয়া হয়নি। কেননা সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি হুলস্থুল কান্ড। নীলিমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে পাশের কলোনির একটা ছেলেকেও; নির্মল তার নাম। দু'জনে উধাও হয়েছে।

থানা-পুলিশ-হাসপাতাল—সাতদিন সারা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলা হল। তারপর পুলিশই ভবানীপুরের এক বস্তি থেকে দু'জনকে খুঁজে বার করেছিল; আর পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে বাব ওদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। নীলিমার কপালে সিঁথিতে তখন সিঁদুর; ওদের বিয়ে হয়ে গেছে।

ওদের দেখে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিল সৎ-মা। সাত দিন ধরেই সমানে কেঁদেছে সে; কিন্তু সেদিনের কান্নাটা যেন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছিল। খুব সম্ভব মেয়ের বিয়েটা এমন কেলেঙ্কারির মধ্যে হবে সে ভাবতে পারে নি। বাবা কিন্তু কোনো রকম মন্তব্য করে নি; এভাবে বিনা খরচায় মেয়ে পার হয়ে যাওয়াতে হয়তো খুশিই হয়ে থাকবে। হাবু আর বাচ্চুও কিছু বলে নি। শুধু গণেশটাই চিমটি কাটার মতো করে নীলিমাকে বলেছিল, 'খুব খেল দেখালি!' নীলিমা উত্তর দেয় নি। গণেশ আবার বলেছিল, 'তোর একটু লজ্জাও করল না রে নীলি। দিদিটার এখনও বিয়ে হল না; আর তুই কিনা লটকে পড়লি! কপালে মার্কারি ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিদিটা এখন তোদের দিকে তাকিয়ে থাক।'

পুলিশের হাত থেকে সেই যে ছাড়িয়ে আনা হয়েছিল তারপর পুরো ছটা মাস নীলিমা আর নির্মল আমাদের এখানেই ছিল। কেননা নির্মলের বাবা এরকম একটা কেলেঙ্কারির পর ছেলে আর ছেলের বৌকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে নি। অবশ্য ছ'মাস পর ব্যাপারটা সহজ হয়ে এসেছিল; নির্মলের বাবা একদিন আমাদের বাড়ি এসে নীলিমাদের নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে শ্বশুরবাড়ি থাকা নীলিমার কপালে ছিল না। কারণ নির্মল ফ্যাক্টরিতে টেম্পোরারি কাজ করত। মাসে পনের দিনের মতো তার কাজ, বাকি পনের দিন সে বেকার। যে ক'দিন নির্মল মাইনে পেত, মাত্র সে কদিনই শ্বশুরবাড়ি থাকতে পেত নীলিমা। নির্মলের কাজ বন্ধ হলেই দু'জনে আমাদের বাড়ি চলে আসত। এখনও তাই চলছে।

নীলিমার ওই ঘটনাটার জন্য সেবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশ দেওয়া হয় নি। তার মাসকয়েক বাদে বিজন আবার খেপে উঠেছিল, 'এবার কিন্তু নোটিশ দিচ্ছি।'

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, 'আচ্ছা—'

নোটিশ দেবার দু সপ্তাহ পর বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন যাই নি। আমার ভীরুতা আমার দ্বিধাই যেতে দেয় নি। পরের দিন আমার অফিসে এসে বিজন জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, আমার সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু একটা মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছিল। এই দ্বিতীয় তারিখেও আমি যাই নি। বিজন আবার প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আমার মুখ দেখবে না। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের ওখানেই শেষ। কিন্তু তার মাসকয়েক পর আজ আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

এখন কত রাত, কে জানে। চাঁদটা আকাশের মাঝ-মধ্যিখান থেকে ডান ধারে হেলে গেছে। আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারছি না; চোখ দুটো দ্রুত জুড়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাঢ় গভীর ঘুমে ডুবে যেতে লাগলাম।

* * *

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। গণেশটা এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। দারুণ ঘুমোয় ছেলেটা; ন'টার আগে তাকে তোলে কার সাধ্য!

ঘুম ভাঙবার পরও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল আসার মতো কাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা চোখের সামনে এসে যেন জমা হতে লাগল। শ্যামবাজারের অন্ধ গলিতে সেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস, বিজন, সুধীর, নিখিল, চিন্ময়, পাইকপাড়ায় সুধাময়দের বাড়ি, বিজলী, হই-হল্লোড়, সুধাময়দের বাড়িতে ফুল দিয়ে সাজানো সেই ঘর—সব কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল। তবু আলতো সুখের মতো কালকের দিনটাকে সারা গায়ে জড়িয়ে রাখলাম।

কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে কতক্ষণ আর শুয়ে থাকা যায়? মশারি খুলে, বিছানা-টিছানা গুটিয়ে বাইরে এসে দেখি বেশ রোদ উঠে গেছে—শরতের নরম সোনালি রোদ।

সৎ-মা উনুনে আঁচ দিয়ে রান্নাঘরে আনাজ কাটছিল। বাবা বারান্দায় বসে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছে। আমি তাড়াতাড়ি কলতলা থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে এসে উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিলাম। সকালবেলার চা-টা আমিই করি।

চা হয়ে গেলে কাপে করে সৎ-মাকে দিলাম, বাবাকে দিলাম। আমার ঘরে গিয়ে গণেশকে দিয়ে এলাম; বালিশ থেকে কোনোরকমে মাথাটা তুলে এক চুমুকে চা শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল

গণেশ। তারপর বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে গেলাম ছাদে। ছাদের ঘরে বাচ্চু আর হাবু থাকে। বাচ্চুটা এখন নেই; সাকলে উঠেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। হাবু অবশ্য আছে। আমাকে দেখেই সে উঠে বসল; তুড়ি দিয়ে দিয়ে হাই তুলতে লাগল। হাইয়ের সঙ্গে তার মুখ থেকে ভক করে বোটকা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল।

এই গন্ধটা আমার চেনা; ওটা পচা দিশি মদের গন্ধ। সকালবেলা যে ওর ঘরে ঢুকবে সে-ই এই গন্ধটা পাবে। হাবুটা একেবারে গোল্লায় গেছে। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা বিছানার একধারে রেখে বেরিয়ে এলাম।

বাবা আটটায় বেরিয়ে যায়, আমি ন'টায়। নিচে নেমে দেখি, অফিসের ভাত দেবার জন্য সৎ-মা তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিয়েছে। যতটা পারি হাতে হাতে তাকে সাহায্য করতে লাগলাম।

একসময় নাকে-মুখে ভাত-ডাল গুঁজে বাবা বেরিয়ে গেল। তারও ঘন্টা খানেক বাদে আমিও বড় রাস্তায় গিয়ে ডালহৌসির বাস ধরলাম।

কিন্তু টালিগঞ্জ ট্রামডিপো পেরুতেই বাসটা জ্যামের মধ্যে পড়ে গেল। ঠেলা-রিকশা-প্রাইভেট কার ট্রাম-ট্যাক্সির জট ছাড়িয়ে বেরুতে বেরুতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। অফিসে যখন পৌঁছলাম, তখন এগারটা। তার মানে ঝাড়া এক ঘন্টা লেট।

সাততলা প্রকান্ড একটা বাড়ির থার্ড ফোর্থ এবং ফিফথ ফ্লোর নিয়ে আমাদের অফিস। আমি ফোর্থ ফ্লোরের কোনের দিকের একটা ঘরে কনক, পূর্ণিমা, স্টেলা—এমনি দশটা মেয়ের সঙ্গে বসি। এই ঘরটা আমাদের টাইপ সেকশান। স্টেলা এই সেকশানের ইন-চার্জ।

লিফটে ওপরে উঠে আমাদের সেকশানে যেতেই চোখে পড়ল স্টেলা তার সিটে নেই। খুব সম্ভব আজ অফিসে আসে নি কিংবা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে গেছে। পূর্ণিমারা মেরুদন্ড টান করে টাইপ করে যাচ্ছে। আর কনক কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে। আমাকে দেখে চোখে চোখে হাসল কনক; হাতের ইশারায় কাছে ডাকল।

কাছে যেতেই ফোনে মুখ রেখে অদৃশ্য শ্রোতাটির উদ্দেশে দারুণ মজা করে করে বলতে লাগল, 'যার জন্যে আপনার হার্টফেল হয়ে যাচ্ছিল সে এসে গেছে। তার সঙ্গে কথা বলুন—' তারপর টেলিফোনটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'তোর ফোন। কথা বল—'

মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি, বিজনই ফোন করেছে। কিন্তু এ সময় তো কখনও সে ফোন করে না। বিমূঢ়ে মতো কনককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে রে?'

কনক হেসে হেসে বলল, 'কে আবার, তিনিই। দশটা থেকে এগারটার মধ্যে এই নিয়ে বার চারেক ফোন করল।'

বিজনকে আমার বন্ধুরা সবাই চেনে। আমিও ওদের বন্ধুদের চিনি। এক ঘন্টায় চারবার ফোন করার কারণ কী? কিছুটা ভয়ে ভয়ে ফোনটা কানে তুলে বললাম, 'আমি বকুল—'

ওপার থেকে বিজনের গলা ভেসে এল, 'কী ব্যাপার, সেই দশটা থেকে ফোন করছি। তোমার পাত্তা নেই।'

'আমার আসতে লেট হয়েছে।'

'কেন?'

'রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম ছিল।'

এবার বিজনের কণ্ঠস্বর বিরক্ত শোনাল, 'কলকাতার এই এক ঝঞ্ঝাট। এখানে বাস করা ইম্পসিবল—'

বললাম, 'কী জন্যে ফোন করেছিলে?'

'কাল রাত্তিরে ঠিকমতো পৌঁছুতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে বিয়ের কথা জানিয়েছ?'

'সারারাত বুঝি আর ঘুমোও নি; শুধু এ-ই ভেবেছ—'

'জানিয়েছ কিনা, তা-ই বল না—'

'না।'

'কেন?'

'এটা কি কাটলেট খাওয়া, সিনেমা দেখার মতো ব্যাপার যে বললেই হয়ে গেল! সুযোগ-টুযোগটা করে জানাতে হবে।'

'দয়া করে সেই সুযোগটা একটু তাড়তাড়ি করে নাও।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, 'শুধু এইটুকু বলবার জন্যে এক ঘন্টায় চারবার ফোন করেছ?'

বিজন বলল, 'না। আজ দেড়টার ফ্লাইটে আমি বম্বে যাচ্ছি।'

'কই, কাল কিছু বল নি তো!' আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বিজন বলল, 'কাল যাবার ঠিক ছিল না। আজ অফিসে আসতেই নিউজ এডিটার প্লেনের টিকিট হাতে ধরিয়ে দিলেন—'

'হঠাৎ বম্বেতে?'

'ওখানে ট্রম্বে বলে একটা জায়গা আছে জানো তো?'

'যেখানে অ্যাটমিক প্ল্যান্ট আছে?'

'হ্যাঁ। অ্যাটমিক কমিশনের ইনভাইটেশনে একটা বিরাট কনফারেন্স হচ্ছে; আমাকে সেটা কভার করতে হবে।'

'ফিরবে কবে?'

'সাতদিন পর। আজ বুধবার; নেক্সট বুধবার আমাকে ক্যালকাটায় এক্সপেক্ট করতে পার।'

'ওখানে পৌঁছে একটা চিঠি দিও।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ।

তারপর বিজন আবার বলল, 'সাত সাতটা দিন হাতে পেলে। এর ভেতর বিয়ের কথাটা বাড়িতে জানাবে।'

'ঠিক আছে।'

বিজন লাইন কেটে দিল। ফোনটা রেখে আমি নিজের সিটে গিয়ে বসলাম। আমার পাশেই বসে কনক, তারপর পূর্ণিমা, তারপর মাধবী, স্বপ্না, মঞ্জু, অরুণা, ডরোথি। আমাদের এই টাইপ সেকশানটা বিশুদ্ধ প্রমীলা রাজ্য।

সিটে বসে প্রথমে এক গেলাস জল খেলাম; তারপর অ্যাটেনডান্সের খাতায় সই করে মুখ তুলতেই কনকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কনকের বয়স আমারই মতো। গোলগাল মুখ, ভাসা ভাসা বড় চোখ, সুন্দর সাজানো দাঁত—সব মিলিয়ে মেয়েটা ভারি সুশ্রী; তাকে ঘিরে আলগা একটু চটকও রয়েছে।

কনক হাসছিল। সব শুনে বলল, 'সাত দিন! বাবা, এ যে অনেক, অনেক দিনের বিরহ।'

উত্তর দিলাম না।

কনক আবার বলল, 'রোজ রোজ দেখা হওয়ার চাইতে মাঝে মাঝে ইন্টারভ্যাল দেওয়া ভাল। তাতে চার্ম বাড়ে। না কি বলিস?'

এবারও কিছু বললাম না। একটু হেসে টাইপ-রাইটারের ঢাকনা খুলে কাগজ আর কার্বন পর পর সাজাতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে খট খট আওয়াজে টাইপ সেকশানে ঝড় বয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ একসময় কনক ডাকল 'এই বকুল—'

তাকালাম।

চোখ আধবোজা করে ঠোঁট টিপে অদ্ভুত হাসল কনক।

আমার চোখ কুঁচকে গেল, 'হাসছিস যে?'

চট করে চারদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় কনক বলল, 'একটা দারুণ খবর আছে।'

'কী?'

'এখন না, পরে বলব। কখন তোর সময় হবে বল তো—'

'টিফিনে।'

'তখন আবার তোর 'লাভার' আসবে। সে এলে তোকে তো আর পাওয়া যায় না।'

আমাদের বিয়ের কথা কনককে জানাই নি। কনক যদি টের পেত শুধু কি 'লাভার' বলত? এতক্ষণে নানারকম রগড়ের কথা বলে, মজার মজার অশ্লীল ঠাট্টা করে আমাকে পাগল করে ছাড়ত।

বললাম, 'শুনলি তো সে বম্বে যাচ্ছে। আজ দেড়টায় তার প্লেন। এখন সাতদিন আমি স্বাধীন; যখন যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে যেতে পারিস।'

'ভেরি গুড।'

টিফিনের সময় আমাকে অফিসের ক্যানটিনে নিয়ে গেল কনক। নিরিবিলি একটা কোন দেখে দু'জনে মুখোমুখি বসলাম, কনক বলল, 'কী খাবি?

'তোর যা খুশি বলে দে না—'

একটু পর চা টোস্ট আর অমলেট এলে খেতে খেতে বললাম, 'এবার তোর দারুণ খবরটা বল—'

তক্ষুনি উত্তর দিল না কনক। চামচ দিয়ে অন্যমনস্কের যতো অমলেট কাটতে কাটতে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর হেসে হেসে নিচু গলায় বলল, 'আমি ভাই ফেঁসে গেছি।'

বোকাটে মুখে প্রতিধ্বনি করলাম, 'ফেঁসে গেছিস! তার মানে?'

'তার মানে আমার সেজদির পিসতুতো দেওরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোক এতদিন লন্ডনে ছিল, মাসখানেক হল দেশে ফিরেছে।'

'তোর সঙ্গে কবে আলাপ হল?'

'লন্ডনে থেকে ফেরার পরেই।'

'কই, বলিস নি তো!'

'তখন বলার মতো কিছু ছিল না।'

'এখন হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ—' কনক মাথা হেলিয়ে দিল। তার চোখে-মুখে খুব দ্রুত ঢেউয়ের মতো কী খেলে যেতে লাগল।

আমি ঝুঁকলাম, 'কদ্দুর এগিয়েছিস বল—'

'এই খানিকটা—'

'কতটা?'

'পাসপোর্ট পর্যন্ত।'

'সে আবার কী!'

'বা রে, লন্ডন যেতে হলে পাসপোর্ট-টাসপোর্ট করতে হবে না?'

চমকে উঠলাম, 'তা হলে কি—'

ঠোঁট টিপে আলতো করে হাসল কনক। বলল, 'ঠিক ধরেছিস; আমরা বিয়ে করছি। আজ হচ্ছে বার তারিখ; মাসের শেষ দিকে আমাদের বিয়ে। তার পনের দিন বাদে লন্ডন পাড়ি দিচ্ছি।'

'তার মানে আর মোটে একটা মাস কলকাতায় আছিস?'

'হ্যাঁ। অরুণের আর বেশি ছুটি নেই যে।'

'ভদ্রলোকের নাম বুঝি অরুণ?'

'হ্যাঁ।'

একটু ভেবে বললাম, 'এই সেদিন আলাপ হল; আলাপের দেড় মাসের মাথায় বিয়ে; বিয়ের পনের দিন্ পর প্লেনে উঠবি। তোর সবই দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে।'

হেসে হেসে কনক বলল, 'আমি কি তোর মতো? বার বছর ধরে ঝুলে থাকব! পাতে খাবার সাজিয়ে আমি বাপু হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।'

আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, বেশি ওস্তাদি করিস না কনক। আমিও বিয়ে করেছি, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না।

একটু চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় কনক বলল, 'অরুণ ছেলেটা ভারি সরল রে। মনে হচ্ছে, এবার আর ভুল করি নি।'

হকচকিয়ে গেলাম। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, কনকটা খুব হাসিখুশি আর হল্লোড়বাজ মেয়ে। কিন্তু ওর ভেতর দারুণ দুঃখের একটা জায়গা আছে। ক'বছর আগে আরেকবার বিয়ে হয়েছিল ওর। সেই প্রথম বিয়েটা সুখের হয় নি, দু'বছরের মধ্যেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল।

কনক আবার বলল, 'এবার আমি সুখী হব বকুল, তুই দেখিস।'

হঠাৎ সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গেল। কনকের কাঁধে একটা হাত রেখে গভীর গলায় বললাম, 'নিশ্চয়ই সুখী হবি।'

একটু কী ভেবে কনক বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বল না—'

খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কনক বলল, 'অনেকদিন হয়ে গেল; তোরা বিয়েটা করে ফেল!'

উত্তর দিলাম না। কনকের জন্য এক ধরনের সহানুভূতি আমার বরাবরই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার পাশাপাশি অদ্ভুত এক হিংসে আমার রক্ত-মাংস পুড়িয়ে দিতে লাগল। ও যদি স্বামী নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারে, আমিও পারব। নিশ্চয়ই পারব। কনক জানে না, তার দ্বিতীয় বিয়ের খবরটা দিয়ে আমার সাহস কতখানি উসকে দিয়েছে।

*　　　*　　　*

বিজন সাতদিন সময় দিয়ে গেছে; তার ভেতর বিয়ে কথাটা বাড়িতে জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কাকে জানাব? মরে গেলেও বাবাকে বলতে পারব নয়। সৎ-মাকে বলাও সম্ভব না। আমার ধারণা, ওদের বললে একটা তুমুল কান্ড ঘটে যাবে। তিরিশ বছর বয়েস হল, এর মধ্যে বাবা আমার বিয়ের চেষ্টা করে নি। চেষ্টা দূরের কথা, বিয়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনে নি। আমি জানি ওরা চায়, চিরকাল এই সংসার টেনে যাই। এখান থেকে বেরুতে চাইলে ওরা বাধা দেবেই।

বাবা আর সৎ-মাকে বাদ দিলে থাকে বাচ্চু, গণেশ আর হাবু। বাচ্চু আর হাবু যে ধরনের ছেলে, ওদের বলা যায় না। একমাত্র গণেশকেই বলতে পারি। আমার ওপর চিরদিনই ওর খুব টান। এ বাড়ির এতগুলো মানুষের মধ্যে ও-ই যা আমার কথা একটু ভাবে। মাঝে মাঝে আমার বিয়ের কথাও বলে, কিন্তু কেউ কানে তোলে না।

গণেশের কাছে বিয়ের কথাটা কিভাবে বলব, ভাবতে ভাবতে চারটে দিন পেরিয়ে গেল। হাতে আছে এখন শুধু তিনদিন—অর্থাৎ আজ, কাল আর পরশু। তারপর বিজন ফিরে আসবে। যেভাবেই হোক, আজকালের ভেতর খবরটা জানিয়ে দিতে হবে। গণেশকে বললেই পাঁচ মিনিটের ভেতর এ বাড়ির সবাই জেনে যাবে। তারপর যা একখানা হুলস্থূল ব্যাপার ঘটবে ভাবতে গিয়ে আমার মাথার ভেতর চাকা ঘুরতে থাকে। তবু আজ হোক কাল হোক, যখন বলতেই হবে তখন আগে-ভাগেই বলে ফেলা ভাল। তাতে ওরা হাতে খানিকটা সময় পাবে।

বিয়ের দিন থেকে গণেশটা আমার ঘরে শুচ্ছে। আজ অফিস থেকে ফিরে রাত্তিরে ওকে বলব।

কিভাবে কেমন করে গণেশের কাছে শুরু করব, সকাল থেকে ভাবতে ভাবতেই অফিসে চলে গেলাম। চোখ-কান বুজে একবার আরম্ভ করতে পারলে অবশ্য বলে ফেলতে পারব। কিন্তু আরম্ভটাই যে অসম্ভব ব্যাপার।

অন্যমনস্কের মতো সারাদিন অফিসে কাটিয়ে আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে এলাম। সবে সন্ধে হয়েছে। আকাশে এক ধরনের মন্থর পাতলা অন্ধকার।

সৎ-মা বারান্দায় বসে রেশনের চাল বাচছিল। বাচ্চু আর হাবু যতারীতি বাড়ি নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, গণেশ আছে। এ সময়টা কোনোদিনই তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। আমি প্রায় অবাকই হয়ে গেলাম, 'আজ যে দেখি খুব গুড বয়, সন্ধেবেলা বাড়ি বসে আছিস!'

গণেশ বলল, 'শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে রে; জ্বর জ্বর লাগছে।'

'তাই—' আমিও হাসলাম। তারপর ঘরে ঢুকে অফিসের শাড়ি-টাড়ি বদলে কলতলার দিকে চলে গেলাম। আর তখনই বাবা তার ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল।

বাবা আর আমাকে দেখে সৎ-মা চাল-টাল ফেলে উঠে পড়ল। রান্নাঘরে গিয়ে 'জনতা' স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়াতে চড়াতে আমাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'এখন চায়ের সঙ্গে কী খাবি? দু'খানা পাঁপড় ভেজে দেব?'

বাবা বলল, 'তার লগে ত্যাল মাইখা চাউরগা মুড়িও দিও। বড় খিদা পাইছে।'

তেলমাখা মুড়ি চা আর পাঁপড় নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। আসার সময় গণেশকেও ডেকে এনেছি। খেতে খেতে বললাম, 'অফিস থেকে আসবার সময় তোর কথা খুব ভাবছিলাম। বাড়ি এসে দেখি তুই বসে আছিস—'

গণেশ বলল, 'হঠাৎ আমার কথা ভাবছিলি?'

'তোর সঙ্গে একটা খুব দরকারি কথা আছে।'

'কী কথা?'

'বলছি। চা'টা খেয়ে নে না—'

'কেন, খেতে খেতে বলা যাবে না?'

'না।'

'বেশ।'

খাওয়া-টাওয়া হয়ে গেলে গণেশ বলল, 'এবার বলবি তো?'

ঘরের ভেতরে এক শ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। উজ্জ্বল আলোয় ছোট ভাইয়ের মুখোমুখি বসে নিজের বিয়ের কথা বলতে হিয়ে গলার স্বর আটকে আসতে লাগল। অস্বস্তিতে একবার এদিকে তাকালাম, একবার ওদিকে। তারপর উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালার কাছে একটু দাঁড়িয়ে তুক্ষনি আবার ফিরে এলাম।

গণেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'কি রে দিদি, অমন ছটফট করছিস কেন?'

'কই না তো—' স্বাভাবিক হবার জন্য আমি হাসতে চেষ্টা করলাম।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে গণেশ বলল, 'তোর কী হয়েছে বল তো—'

'কী হবে?'

'কিছু না?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে গণেশ বলল, 'ঠিক আছে। এখন কী বলবার আছে বল—'

বিয়ের কথা আজ আর বলতে পারব না। কিন্তু কিছু তো একটা বলতে হবে। না ভেবেই দুম করে বলে বসলাম, 'আচ্ছা আমি যদি হঠাৎ মরে যাই তোরা কী করবি?'

গণেশের চোখের মণি স্থির হয়ে গেল, 'এই কথাটা বলবার জন্যই এখানে ডেকে এনেছিস?'

হকচকিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলাম, বাইরে থেকে একটা গোলমালের শব্দ ভেসে এল। তারপরেই বাচ্চু আর বাবার উত্তেজিত চড়া গলা শুনতে পেলাম; সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট ফোঁপানির আওয়াজ।

বাবা চেঁচাচ্ছিল, 'বাইর হইয়া যা, বাইর হইয়া যা। জানোয়ার, শুয়োর—'

বাচ্চুও চিৎকার করছিল, 'না, যাব না।'

গণেশ আমার দিকে তাকিয়েই ছিল। বলল, 'কী ব্যাপার?'

বললাম, 'কি জানি—'

'চল তো দেখি—'

দু জনে ছুটে বাইরে গেলাম। গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বাবা আর বাচ্চু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে ষোল সতের বছরের একটা মেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে সমানে ফোঁপাচ্ছে। সৎ-মা রান্নাঘরের দরজায় মাথায় হাত দিয়ে মূর্তির মতো বসে আছে।

গণেশ বলল, 'কী হয়েছে?'

বাবা চেঁচিয়ে উঠল, 'হইছে আমার কপাল। দ্যাখ গণশা, দ্যাখ হারমাজাদা শুয়োরটা কারে বিয়া কইরা আইনা বাড়িতে তুলছে!'

আমি হতভম্ব। চোখের সামনে জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে, তবু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাচ্চুর কতই বা বয়স! আঠার-উনিশের বেশি হবে না। সে রোয়াকে বসে দিনরাত আড্ডা মারে, সিগারেট ফোঁকে, মেয়ে দেখলে অশ্লীল শিটি দেয়, মস্তানি করে, কথায় কথায় পেটো ছোঁড়ে। একবারে গোল্লায় গেছে। এ পাড়ায় ওর খুব বদনাম। সবাই ওকে ঘেন্না করে, আবার ভয়ও পায়। যতই বখে যাক, তাই বলে এভাবে হুট করে বিয়ে করে বসবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

বাবা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'শয়তানের ছাও, আমার নাক-কান কাটল! মাইনষেরে (মানুষকে) কেমুন কইরা যে মুখ দেখামু!'

বাচ্চু হঠাৎ ভেংচে উঠল, 'তুমি কেমন করে বিয়ে করেছিলে, মনে আছে! তারপরও তো মুখ দেখাচ্ছ; আমার বেলায়ও পারবে।'

চমকে একবার বাবাকে দেখে নিলাম। তারপরেই আমার দৃষ্টি সৎ-মায়ের দিকে ফিরল। দু'জনের মুখ থেকে খুব দ্রুত রক্ত নেমে যাচ্ছে।

বাজ-পড়া মানুষের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বাবা। তারপর গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করতে লাগল, 'যত বড় মুখ না তত বড় কথা। গণশা, জুতার বাড়ি মাইরা কুত্তার জাতেরে খেদা (তাড়িয়ে দে) অখনই—আমার বাড়িতে আনো (ওদের) জায়গা নাই। একখানা পয়সা কামাইতে পারে না, তার আবার বিয়া! বিয়া তুমার ঘুচাইতে আছি—' বলে দৌড়ে গিয়ে কলতলার ওধার তেকে একটা বাঁশের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে এল।

বাচ্চুও রুখে দাঁড়িয়েছে। এদিকে সৎ-মা আচমকা ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল; সেই মেয়েটার ফোঁপানিও বেড়ে গেছে।

গণেশ বিমূঢ়ের মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে যে কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছিল না।

আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আর দেরি করলে একটা বিশ্রী কান্ড ঘটে যাবে। ছুটে গিয়ে বাবা আর বাচ্চুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাবার হাত থেকে বাঁশের টুকরোটা কেড়ে নিয়ে উঠোনের একধারে ছুঁড়ে দিলাম। বললাম, 'বাবা, তুমি ঘরে যাও তো—' বাচ্চুকে বললাম, 'কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, জানিস না। যা এখান থেকে—'

বাচ্চু নড়ল না। বাবা বারান্দায় উঠে গিয়ে বলল, 'এই আপদ অখনই দূর কর বকুল; মোটে লাই দিস না।'

'এখন তুমি চুপ কর।'

বাবা স্পষ্ট করে এবার আর কিছু বলল না; গলার ভেতর গজ গজ করতে লাগল।

আমি এবার সেই মেয়েটির কাছে গেলাম। তার একটা হাত ধরে বললাম, 'ঘরে চল—'

মেয়েটা আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে ঝুলতে ঝুলতে বারান্দায় উঠল।

বাবা ওধার থেকে বলল, 'খুব তো সুহাগ কইরা ঘরে তুলতে আছস; এই রাবণের গুষ্টিরে খাওয়াইব কে?'

বাচ্চু সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল, 'তোমাকে খাওয়াতে হবে না। দেড় শ টাকা মাইনে পাও, খাইয়ে একেবারে উলটে দেবে! যা বুঝবার দিদি বুঝবে। তুমি মাথা ঘামিও না।' বলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা অপরিষ্কার গলায় গোঙানির মতো একটা শব্দ করল। তারপর অকথ্য একটা খিস্তি দিয়ে বলল, 'শালা', শুয়োরের জাত।'

আর মেয়েটাকে নিয়ে যেতে যেতে আমি থমকে গেলাম; বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেলে যেন। এ কী বলল বাচ্চু!

কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চলে এলাম।

এক শ পাওয়ারের বাল্বটা জ্বলছিলই। জোরাল আলোয় মেয়েটাকে এতক্ষণে ভালভাবে দেখতে পেলাম। খুব সাধারণ চেহারা। গায়ের রং শ্যামলা, লম্বাটে মুখ, পুরু ঠোঁট, ছোট্ট টোল-পড়া চিবুক, নাকটা একটু মোটা ধরনের। চোখদুটো কিন্তু ভারি সুন্দর। শান্ত, কোমল আর ভাসা-ভাসা। অনেকটা পাখির চোখের মতো। মোটামুটি চেহারার এই মেয়েটা কিন্তু ভীষণ রোগা; তাকে ঘিরে পেট ভরে খেতে না পাওয়ার ছাপ স্পষ্ট।

এই মুহূর্তে তার পরনে আধ-ময়লা একটা শাড়ি. কপাল-সিঁথি সিঁদুরে জেবড়ে আছে; চোখ জলে ভাসছে। গালেও চোখের জলের ভেজা দাগ।

তক্তপোষে নিজের পাশে তাকে বসিয়ে বললাম, 'তোমার নাম কী?'

'ভারতী।' জড়ানো গলায়, ভয়ে ভয়ে মেয়েটা নাম বলল।

'তোমরা থাকো কোথায়?'

'নবজীবন কলোনিতে।'

নবজীবন কলোনি এখান থেকে মাইল দেড় দুই দূরে; বাসে করে নরেন্দ্রপুরের দিকে যেতে রাস্তার ডান ধারে টিনের সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। পাশ দিয়ে অনেকবার গেছি, তবে নামা হয় নি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে যা জানা গেল. সংক্ষেপে এইরকম। ভারতীর বাবা-মা নেই; তেমন আপনজন বলতেও কেউ না। ছেলেবেলা থেকেই নবজীবন কলোনিতে এক দূর সম্পর্কের মামা-মামীর কাছে আছে। মামার অভাবের সংসার, একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা। কাজেই যা হয়ে থাকে, মামী কথায় কথায় তাকে বাড়ির বার করে দেয়। কিন্তু কোথায় যাবে সে? লেখাপড়াও জানে না যে ছোটখাট একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে নিজের পেটটা চালিয়ে নেবে।

দুঃখ-কষ্ট আর চোখের জলের মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাচ্চুর সঙ্গে ভারতীর আলাপ হয়ে গেল।

বাচ্চুটা নবজীবন কলোনিতে ওর এক বন্ধুর বাড়ি আড্ডা দিতে যেত। এই যাওয়া-আসার সময় আলাপটা হয়ে গিয়েছিল আর কি। আলাপের পর যা হয়, ভালোবাসাবাসি। তারপর আজ যখন মামাবাড়ির অত্যাচারটা চরমে উঠেছিল, আর সহ্য করতে না পেরে বাচ্চুকে খবর পাঠিয়েছিল। বাচ্চু ঝোঁকের মাথায় চার পয়সার সিঁদুর কিনে ভারতীর কপালে লাগিয়ে সোজা বাড়ি এনে তুলেছে।

শুনতে শুনতে আমার জীবনের ক'বছর আগেকার ছবিটাই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। এই কালো রোগা মেয়েটার দুঃখে কখন যে সমব্যথী হয়ে গেছি, জানি না। বিদ্যুৎ-চমকের মতো আরেকটা কথাও মনে পড়ে গেল। বাচ্চুটার বুকের পাটা আছে। চাকরি-বাকরি করে না, এক পয়সা রোজগার নেই, অথচ কত সহজে ভারতীকে বাড়ি এনে তুলেছে। আর আমার বেলায়? চোরের মতো সিঁদুর-টিঁদুর মুছে ফিরে এসেছিলাম। বিজন এমনই বীরপুরুষ যে নিজের বিয়ে করা বউকে তার বাড়ি নিয়ে তুলবার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই! হঠাৎ বিজনের ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল। সেই সঙ্গে ক্ষোভ এবং অভিমান। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অন্যমনস্কতা কিছুক্ষণ আমাকে ঘিরে থাকল।

ওদিকে নিজের কথা বলে মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে ছিল ভারতী। আচমকা ঝুঁকে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার খুব ভয় করছে।'

তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ থেকে তাকে তুলে বললাম, 'কিসের ভয়?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভারতী বলল, 'আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। এখানে থাকতে না দিলে আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে।' বলেই কাঁদতে শুরু করল।

ভারতীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বললাম, 'কী বোকা মেয়ে; শুধু শুধু তোমাকে তাড়াতে যাব কেন? তুমি এখানেই থাকবে। কেঁদো না—চোখ মুছে ফেল—' বলেই টের পেলাম, নিজের গলায় একটা ফাঁস আটকে ফেলেছি।

বাবা তো ভাগিয়েই দিতে চেয়েছিল। কেন যে মহানুভবতার অবতার হয়ে ভারতীকে ঘরে এনে ঢোকালাম। কোথায় এ বাড়ি তেকে চলে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করব তা নয়, নিজেই নিজের পথে দেওয়াল গাঁথছি। হা রে বকুল, এত বয়স হল তোর নিজের ভালমন্দ এখনও বুঝতে শিখলি না। কবে আর তোর বুদ্ধি হবে।

*　　　*　　　*

পরের দিন সবে টিফিন হয়েছে; কনক আর আমিই শুধু আমাদের সেকশানে আছি; বাকি সবাই ক্যানটিনে চলে গেছে। কাগজপত্র ফাইল-টাইল গুছিয়ে দু'জনে উঠব উঠব করছি, এমন সময় বিজন এসে হাজির।

বিয়ের দিন রাত্তিরে ট্যাক্সি করে বিজন আমাকে রাসবিহারীর মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। বিয়ের পর আজই তাকে প্রথম দেখলাম।

বার বছর ধরে বিজনকে কতবার দেখেছি। কিন্তু আজকের এই দেখাটা একেবারে নতুন। বিজন আমার স্বামী; তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। তিরিশ বছর বয়েসেও অদ্ভুত এক লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিতে হল। অনুভব করছি, বুকের ভেতর সিরসিরিয়ে কী বয়ে যাচ্ছে।

কনক বিজনের দিকে তাকিয়ে চোখ ভরে হাসল। বিজন আর আমাকে কত কাল ধরে দেখে আসছে সে। আমরা দু'জনে পরস্পরের কতটা কাছাকাছি এসেছি, কনক জানে। শুধু বিয়ের কথাটাই তাকে বলা হয় নি।

কনক বলল, 'আপনি না বম্বে গিয়েছিলেন—'

'হ্যাঁ—' বিজনও হাসল।

'কবে ফিরেছেন?'

'কাল রাত্তিরের ফ্লাইটে।'

'কনক বলছিল, 'আপনি সাত দিন বম্বে থাকবেন বলেছিলেন। সাতদিন তো হয় নি।'

'না, আজ ফিফথ ডে। কাজ হয়ে গেল; আর থেকে কী করব?'

'তা তো ঠিকই।'

কথা বলতে বলতে ফাইল-টাইল গোছাচ্ছিল কনক। আমিও গুছিয়ে ফেলছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে কনক বলল, 'এখানে বসে থেকে কী হবে। চলুন, একটা রেস্টুরেন্ট-টেস্টুরেন্ট গিয়ে বসা যাক। চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

'সেই ভাল।' বিজনও উঠে পড়ল। ওদের দেখাদেখি আমিও উঠলাম।

অফিস থেকে বেরিয়ে দু'পা গেলেই একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট। আজকাল এই অফিস পাড়া মাদ্রাজি রেস্টুরেন্টে ছেয়ে গেছে।

এই সময়টায় দারুণ ভিড়। কোথাও একটা সিট ফাঁকা নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জায়গা খালি হলে তিনজন এককোনে গিয়ে বসলাম। তক্ষুনি একটা 'বয়' ছুটে এল।

বিজন আমাদের দিকে তাকাল, 'কী খাবে?'

আবছা গলায় বললাম, 'যা হোক কিছু—'খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চিরদিনই আমার ভীষণ লজ্জা। কনকের অত সঙ্কোচ-টঙ্কোচ নেই। সে বলল, 'পকোড়া আর সাদা দোসা খাব। তারপর কফি।'

অর্ডার নিয়ে 'বয়টা' চলে গেল।

বিজন পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিল। কনক বলল, 'তারপর মশাই, বম্বে কিরকম এনজয় করলেন, বলুন—'

বিজন বলল, 'এনজয় করবার সময় কোথায়? আমাদের নিউজ পেপারের লোকদের মরবার সময় থাকে না ম্যাডাম। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খবরের খোঁজে ছোটাছুটি করেছি। রাত্রিবেলা হোটেলে ফিরে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। আবার ভোরবেলা উঠেই কোনোরকমে 'শেভ' করে স্নান সেরে দে ছুট। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া দেখেছেন, চোখের দু'ধারে যাদের ঠুলি আটকানো থাকে? সামনের রাস্তা ছাড়া ওরা আর কিছুই দেখতে পায় না।'

'দেখব না কেন?'

'আমাদের অবস্থা হয়েছে তাই। নিউজ এডিটর আমাদের চোখে ওই রকম ঠুলি আটকে দিয়েছে, খবর ছাড়া দু'পাশে আর কিছুই দেখতে পাই না।'

কনক হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই হঠাৎ রগড়ের গলায় বলল, 'ঠুলিটা খুলে এবার আমার এই বন্ধুটার দিকে একটু তাকান।' বলেই আঙুল দিয়ে আমার গালে আস্তে করে টোকা দিল।

বিজন প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর হাসল, 'ওর দিকে বার বছর ধরেই তাকিয়ে তো আছি।'

টের পেলাম আমার কানের লতি লাল হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে নখ দিয়েটেবলের ওপর আঁকিবুকি কাটতে লাগলাম।

কনক বলল, 'ওভাবে তাকাবার কথা বলছি না।'

'তবে?'

টেবলের ওপর দুই কনুই তুলে দুই হাতের মাঝখানে মুখটা রাখল কনক। তারপর বলল, 'বার বছর ধরে তো অনেক খেলা দেখালেন; এবার বিয়েটা সেরে ফেলুন। এভাবে আর চলে না মশাই।'

আমাদের বিয়ে যে হয়ে গেছে সে খবরটা কনককে জানাইনি। চমকে আমি মুখ তুললাম; আর তখনই বিজনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আমি ভুরু তুলে ইঙ্গিত করলাম; বিজন বুঝল। কনকের দিকে ফিরে হালকা গলায় সে বলল, 'এই ব্যাপার?' বিজনের ঠোঁট ঈষৎ টেপা; তার চোখে-মুখে, চিবুকের খাঁজে আলতো আভার মতো দুষ্টুমি খেলা করছে।

কনক বলল, 'হ্যাঁ, এই ব্যাপার।'

'সে দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে বললে চলবে না। কবে বিয়েটা করছেন তাই বলুন। দিনক্ষণ তারিখ দিন—'

'আপনারই দেখছি যত তাড়া। আপনার বন্ধুর কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে গরজ নেই।'

'গরজ নেই, আপনাকে বলেছে!'

'মুখ ফুটে কিছু বলে নি। হাবেভাবে তাই মনে হয়।' বলে চোখের কোনের দিকে মণিদুটো এনে আমাকে বিদ্ধ করতে লাগল বিজন। আমি মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলাম।

'বয়' খাবার নিয়ে এসেছিল। খেতে খেতে কনক বলতে লাগল, 'বকুলের গরজ আছে কি নেই, আমি বুঝব। আপনি এ মাসের মধ্যেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলুন। নইলে—'

'কী?'

'আপনাদের বিয়ে আমার আর দেখা হবে না।' বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে কনক বলতে লাগল, 'এই ইতরজন মিষ্টান্ন থেকে বঞ্চিত হবে।'

বিজন অবাক, 'তার মানে!'

'এই মাসটাই আমি কলকাতায় আছি। তারপর—'

'তারপর কী?'

চোখ বুজে খুব মজা করে কনক বলল, 'আমার দুটো ডানা গজাবে।'

'ডানা গজাবে!'

'ইয়েস স্যার।'

বিজন এবার আর কিছু বলল না। কনকের হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে একবার তার দিকে, আরেক বার আমার দিকে তাকাতে লাগল।

আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। আস্তে বললাম, 'কনকের বিয়ে হচ্ছে।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল বিজন। তারপর প্রায় লাফিয়েই উঠল, 'তাই নাকি। কবে? কার সঙ্গে?'

কার সঙ্গে কবে বিয়ে হচ্ছে, আমিই বললাম। কনক বিয়ের কথায় কিশোরী মেয়ের মতো মুখ লাল করে হাসতে লাগল।

আন্তরিক সুরে বিজন কনককে বলল, 'খুব খুশি হলাম ম্যাডাম। কিন্তু—'

কনক ভুরু তুলে বলল, 'কী?'

'কান্ডটি ঘটালেন কী করে?'

'ঘটে গেল। আপনাদের মতো দশ-সালা পরিকল্পনা আমাদের নেই। যা করবার আমরা চটপট সেরে ফেলি।'

'দারুণ করিৎকর্মা!' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বিজনের। ফস করে সে বলে বসল, 'আগেও আরেকবার আপনার বিয়ে হয়েছিল না?'

কনকের মুখে কালচে ছায়া পড়তে না পড়তেই মিলিয়ে গেল। হেসে হেসে সে বলল, 'শুনেছি লন্ডনের খবর কাগজে অদ্ভুত অদ্ভুত বিয়ের খবর বেরোয়। হী ফর সিক্সথ টাইম, শী ফর থার্ড টাইম। তার মানে বরের এটি ষষ্ঠ বিবাহ; আগের পাঁচটা তালাক হয়ে গেছে। আর কনের এটা তৃতীয় বিবাহ; আগের দু'বার তালাক হয়েছে। আমার বেলায় এটা সেকেন্ড হতে পাবে কিন্তু আমার বর এই প্রথম বিয়ে করছে। এই শুভকামনাটুকু করুন, আমি যেন ওকে সুখী করতে পারি।'

বিজন থতমত খেয়ে গেল। তারপর গভীর গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই সুখী হবেন। আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। মুখ ফসকে কী করে যে কথাটা বেরিয়ে গেল। আমি কিন্তু আপনাকে দুঃখ দেবার জন্যে বলি নি।'

আলোত করে বিজনের একটা হাত ছুঁয়ে কনক বলল, 'আরে না না; কিছুই মনে করি নি।'

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'বিয়ের পরই তা হলে উড়ছেন?'

'অরুণের সেরকমই তো ইচ্ছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর কনকই আবার বলল, 'চেষ্টা করুন যাতে আমাদের সঙ্গে আপনাদের বিয়েটাও হয়ে যায়। দারুণ হুল্লোড় করা যাবে তা হলে।'

'দেখি।' দ্রুত আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল বিজন।

পকোড়া-টকোড়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কফিও এসে গেছে। এক চুমুকে কফি শেষ করে আচমকা উঠে পড়ল কনক।

আমি বললাম, 'এ কি, উঠছিস যে!'

কনক বলল, 'হ্যাঁ, যাই। তোরা গল্পটল্প কর।' অর্থাৎ বিজনকে আর আমাকে কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকতে দিতে চায় সে।

বিজন বলল, 'আপনি বসুন তো।'

কনক বসল না। বলল, 'আরে বাবা, পাঁচ দিন পর দেখা হচ্ছে; এখন কি থার্ড পার্সনের থাকতে আছে। আমরা বিহারের বাঙালি; ছেলেবেলাটা ওখানেই কেটেছে। বিহারের একটা কথা আছে—কাবাবমে হাড্ডি। কাবাবের ভেতর হাড় হয়ে আমি এখানে বসে থাকতে চাই না।' কনক হাসতে হাসতে চলে গেল। তাকে কিছুতেই আটকে রাখা গেল না।

কনক যাবার পর চুপচাপ একটা সিগারেট খেল বিজন। তারপর বলল, 'কেমন কাজের মেয়ে দেখ। এক মাসের মধ্যে প্রেম বিয়ে টিয়ে সেরে চলে যাচ্ছে। আর তুমি?'

'আমি কী?'

'এক নম্বরের হাঁদারাম।'

টুকরো টুকরো এলোমেলো কথার ফাঁকে হঠাৎ একসময় দুম করে সে বলল, 'আমাদের বিয়ের কথাটা বাড়িতে জানিয়েছ?'

'না—' আমি মাথা নাড়লাম।

'কেন?'

'কী করে জানাব, বাড়িতে যা কান্ড হল!'

বিরক্ত মুখে বিজন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

ভারতী আর বাচ্চুর ব্যাপারটা আগাগোড়া বলে গেলাম।

সব শুনে বিজন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঃ বাঃ, চমৎকার! এবার প্রেমসে ধর্মশালা চালাও।'

ওর বলার ধরনে হেসে ফেললাম।

বিজন ধমকের গলায় বলল, 'হেসো না তো।'

'তবে কি কাঁদব?'

'ইয়ার্কি করতে হবে না। যা বলছি শোন—'

'বল।'

বিজন বলতে লাগল, 'বাড়িতে জানানো না-জানানো তোমার ইচ্ছে। দু'মাস সময় দিচ্ছি। তারপর কিন্তু আর একটা দিনও পাবে না, কোনোরকম টালবাহানাও শুনব না। তুমি যা মেয়ে; জোর করেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।'

তক্ষুনি উত্তর দিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, কেন যে বিজন জোর করে না। অনেকক্ষণ পর বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'অত তাড়াহুড়ো করছ কেন?'

ভুরু কুঁচকে গেল বিজনের, 'বিয়ে করতে লাগল দশ বছর। তোমার কি ইচ্ছে আরো দশ বছর ঝুলে থাকবার পর সংসার করি?'

আস্তে করে বললাম, 'না, তা নয়।'

'তবে?'

'আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; তোমারও তো অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। সে সবের ব্যবস্থা না করে—'

বিজন খেপে উঠল, 'তোমার কি ইচ্ছে, হোল লাইফ পরের বার্ডেন বয়ে বয়ে কাটিয়ে দিই?'

আমাদের পারিবারিক দায়িত্বের ব্যাপার নিয়ে এ জাতীয় কথা আগে অনেকবার হয়েছে। বিজনের সঙ্গে দেখা হলেই এ প্রসঙ্গ একবার আসবেই। থতমত খেয়ে গেলাম, 'না-না, তা কেন? কিন্তু—'

বিজন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না; মুখ ফিরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়টায় এখানে এই অফিস-পাড়ার রাস্তায় ভীষণ ভিড়। চারদিকের বড় বড় অফিসগুলো থেকে হুড় হুড় করে কেরানি-টাইপিস্ট-স্টেনোগ্রাফারের ঝাঁক বেরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া স্রোতের মতো গাড়ি ছুটছে। ওদিকে ফ্রি-পার্কিং জোনে একগাদা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যমনস্কর মতো কিছুক্ষণ গাড়ি দেখল বিজন, কেরানি দেখল, অ্যাসফাল্ট-মোড়া ঝকঝকে রাস্তার জেব্রা-লাইন দেখল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত ধীর গলায় বলল,'বাড়ির সবার ব্যবস্থার কথা ভেবেছি।'

'কী?'

'মাকে একটা মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেব। সব চাইতে বড় প্রবলেম যেটা তা হল দিদি আর তার ছেলেমেয়েরা। দিরি বড় ছেলেটা এবার বি. কম. পার্ট টু দিয়েছে। লেখাপড়ার ভাল; পাশ নিশ্চয়ই করে যাবে। ওর চাকরির জন্যে কয়েকজনকে ধরেছি। এই ছেলেটার চাকরি হয়ে গেলে দিদিকে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দেব। তারপর বাকি রইল ছোট বোনটা। আপাতত ও আমাদের কাছেই থাকবে। পরে সুবিধে টুবিধে হলে ওর বিয়ে দিয়ে দেব।'

এই পরিকল্পনার কথা আগেও বিস্তারিত শুনিয়েছে বিজন। ওর ভাগনের চাকরির কথায় গণেশের মুখটা চট করে মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তোমার তো অনেক জানাশোনা; আমার ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও না। ওর কিছু হলে আমার পক্ষে চলে আসা সহজ হবে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার ভাগনের জন্যে বলে রেখেছি। আগে ওরটা হোক, তারপর না হয় তোমার ভাইয়ের কথা বলব। দু'জনেরটা একসঙ্গে করতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে।'

'তা হলে পরেই চেষ্টা করো।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কী মনে পড়তে বিজন হঠাৎ বলে উঠল, 'আসছে রোববার তোমার কোনো জরুরি কাজ আছে?'

'না, তেমন কিছু নেই। কেন?'

'সুধীর আজ অফিসে ফোন করেছিল। তার খুব ইচ্ছে সেদিন তুমি আমি ওদের বাড়ি যাই। সারাদিন থেকে হই-হুল্লোড় করি।'

আমার খুব একটা আপত্তি ছিল না। ছুটির দিনে খুব দরকারি কাজ না থাকলে আমি বাড়ি থেকে বেরুই না। কিন্তু বাড়ি থাকা মানেই ঝগড়াঝাঁটি, চেঁচামেচি, তিক্ততা। আমার সঙ্গে কারো অবশ্য ঝগড়া হয় না। সৎ-মায়ের সঙ্গে বাবার, বাবার সঙ্গে বাচ্চু, কি হাবুর সঙ্গে সৎ-মায়ের যুদ্ধ লেগেই থাকে। বিশেষ করে ভারতী আসার পর আমাদের বাড়ির ছাদে কাক-চিল বসতে পারে না। তাতে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তার চাইতে বিজনের বন্ধুর বাড়ি গিয়ে হইচই করে দিনটা কাটিয়ে আসা মন্দ কি।

বললাম, 'ঠিক আছে, যাব।'

'তা হলে তুমি এক কাজ করো—'

'বল—'

'রোববার সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার ভেতর হাওড়া স্টেশনের এনকোয়ারি অফিসের সামনে ওয়েট কোরো। ওখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'সুধীর সেনরা থাকে কোথায়?'

'শ্রীরামপুর।'

* * *

দিন কেটে যাচ্ছে।

রোজই টিফিনের সময় বিজন আসে। কত বছর ধরেই আসছে অবশ্য যেদিন খবরের সন্ধানে তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় সেদিনটা বাদ।

ওর ভাগনের চাকরিটা এখনও হয় নি। সেজন্য খুবই দুশ্চিন্তায় আছে বিজন। তবে ওর আশা, শিগগিরই হয়ে যাবে।

বিজন রোজই বারকয়েক করে সেই কথাটা মনে করিয়ে দেয়—আমি যেন বিয়ের ব্যাপারটা বাড়িতে বলে রাখি। ভাগনের চাকরিটা একবার হয়ে গেলে সে একটা দিনও আর দেরি করবে না; আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। এই চরমপত্র শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে।

বিজন যতই তাড়া লাগাক, রাগ করুক কিংবা বিরক্ত হোক, বিয়ের কথাটা এখনও আমি বাড়িতে জানাতে পারি নি। আপনাদের আগেই বলেছি, বাচ্চু যেদিন দুম করে ভারতীকে এনে তুলল সেদিন থেকে আমাদের বাড়ির পরিবেশ দারুণ খারাপ হয়ে গেছে।

সৎ-মা মুখে বিশেষ কিছু বলে না। সারাদিন শুধু বিষাক্ত কুটিল চোখে ভারতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। অভাবের সংসারে নতুন এক ভাগীদারকে দেখে সে খুশি হতে পারে নি।

হাবু বা গণেশের মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না। ওরা কতক্ষণই বা বাড়ি থাকে! তবে ওরা যে সন্তুষ্ট হয় নি, এটা তাদের মুখচোখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।

ভারতী এ বাড়িতে আসার পর ড্রেনের ধারের ঘরটা গণেশ তাকে আর বাচ্চুকে ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল রাত্রিবেলা আমার ঘরের মেঝেতেই বিছানা পেতে ঘুমোয় গণেশ। একেক দিন শুয়ে শুয়ে গণেশ বলে, 'বাচ্চু উল্লুকটা এ কী করল!'

আমি হেসে বলি, 'ভালই তো করেছে।'

গণেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'ভাল করেছে মানে!'

তার উত্তেজনাকে উসকে দেবার জন্য রগড়ের গলায় বলি, 'ভালো না তো খারাপ নাকি? তোরা বড় হয়ে বিয়ে শাদি করছিস না; ও আর কদ্দিন বসে থাকবে! বাড়িতে একটা বউ এল; আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত।'

অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গণেশ বলে, 'তুই কীরে দিদি!'

'আমি কী?'

'একটা আস্ত বোকা। ফ্যামিলির এই হাল; তার মধ্যে মাকড়াটা একটা ঝঞ্ঝাট জুটিয়ে আনলে। নিজেদেরই খেতে জোটে না—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় গণেশ।

আমি বলি, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাড়ে চাপ পড়েছে; বাচ্চুটা এবার নিজের গরজেই রোজগার-টোজগারের দিকে মন দেবে।'

'কচু দেবে। ও খচড়াকে আমি চিনি না!'

একটু চুপচাপ।

তারপর গণেশই আবার শুরু করে, 'আমার কী! তেমন বুঝলে আমি শালা স্রেফ নাগা সন্ন্যাসী হয়ে কেটে পড়ব।'

ওর বলার ধরনে হেসে ফেলি। গণেশ তাতে রেগে যায়। ধমকের গলায় বলে, 'হাসিস না তো দিদি।'

আমার হাসি তাতে থামে না। এ বাড়িতে এই একটামাত্র ছেলে যে কাছে এলে কিছুক্ষণের জন্য সব ভুলে যাই। খানিকটা টাটকা সজীব নির্মল বাতাসের মতো সে আমার তিরিশ বছরের ক্লান্ত জীর্ণ ফুসফুসকে অনেকখানি শক্তি দেয়।

হাল ছেড়ে দেবার মতো করে গণেশ বলে, 'হেসে যা, হেসে যা, প্রাণ খুলে হেসে যা। আমার কী, ফাঁসবি তো তুই।'

আমার হাসি থেমে যায়, 'ফেঁসে যাব! তার মানে?'

'মানে আর কী। তোকেই তো ওদের পুষতে হবে। এ শালার ঝঞ্ঝাট তুই ছাড়া আর কে নেবে। আমি বেট ফেলে বলতে পারি কোনো মাকড়াই নেবে না।'

আমি আর কিছু বলি না। হাসিও না।

গণেশ আবার বলে, 'তুই চিরকাল একই রকম থেকে গেলি দিদি।'

অন্যমনস্কের মতো বলি, 'কিরকম?'

'একেবারে বোকা, বোকা, বোকা।' গাঢ় সহানুভূতির গলায় গণেশ বলে যায়, 'লোকে গা থেকে ঝামেলা ঝেড়ে ফেলে দেয়। আর তুই কিনা ফালতু ঝঞ্ঝাট নিজেকে জড়াস।'

আমি উত্তর দিই না।

গণেশ আবার বলে, 'বাবা সেদিন দুটোকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল; ভালই হচ্ছিল। তুই মাইরি দিদি দয়ার সাগরে ঢেউ খেলিয়ে মেয়েটাকে ঘরে এনে তুললি। এর কোনো মানে হয়?'

বিজনও এই কথাগুলো অন্যভাবে সেদিন আমাকে বলেছিল।

বাচ্চু আর ভারতীর সম্বন্ধে বাবার মনোভাব খুব পরিষ্কার। সকাল বেলা বারান্দায় বসে নিমের দাঁতন করতে করতে সূর্যস্তব আওড়ানোর মতো বাবা বলে যায়, 'পিতলা শখ! বিয়া করছে! এক কড়ার মুরদ নাই; হারামজাদার বিয়া! জুতার বাড়ি মাইরা বাড়ির থনে খেদাইয়া দিমু।'

আগে আগে বাচ্চুকে তবু বাড়িতে দেখা যেত। আজকাল আর দেখতেই পাই না। ভারতীকে এনে তোলার পর সে কখন বাড়ি আসে, কখন যায়, কে জানে। দুম করে ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে হয়তো তার মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ জেগেছে। অভাবের সংসারে আরেকটা মানুষের বোঝা চাপানো যে ঠিক হয় নি, এটা সে টের পেয়েছে।

তবু কখনও সখনও বাড়ি থাকলে বাবার বিরুদ্ধে বাচ্চু রুখে দাঁড়ায়। ঘাড় বাঁকিয়ে সে বলে, 'চুপ কর।'

বাবা গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে থাকে, 'চুপ করুম? ক্যান, তর ডরে?'

'চুপ কর বলছি।'

'হারামজাদা শুয়োরের ছাও, আমারে চোখ গরম দেখাও! জুতাইয়া তর গাল ছিড়া ফালামু।'

কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকে বাচ্চু। তারপর গলার ভেতর চাপা শিসের মতো শব্দ করে বলে, 'শুধু শুধু চেল্লাচ্ছ কেন?'

বাবা খেপে যায়, 'শুধাশুধি! বজ্জাত শয়তান—কুকর্ম করবা, আর অমি চিল্লামু না? চিল্লাইলেই দোষ?'

'তুমি কেন চেল্লাবে? তুমি কি আমাদের খাওয়াচ্ছ পবাচ্ছ? যদি কিছু বলতে হয় দিদি বলবে।'

এবার বোধহয় বাবার শরীরের সব রক্ত গিয়ে মাথায় চড়ে বসে, 'আমি না হয় খাওয়াই না, আমি না হয় পরাই না। কিন্তুক আমার বাড়িতে তো থাকস। বাইর হইয়া যা, অক্ষণই বাইর হ। আমার বাড়িতে তর জায়গা নাই—'

বাচ্চু বলে, 'যাব না; দেখি তুমি কী করতে পার!' গলার রগ টান করে বাবার সঙ্গে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যায় বাচ্চু।

যখন ব্যাপারটা বাড়াবাড়িতে গিয়ে ঠেকে তখন আমি আর মুখ বুজে থাকতে পারি না। বকাবকি করে ধমকে বাচ্চু বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিই। আর যার সঙ্গেই যা করুক, আমার মুখের ওপর কোনো কথা বলে না বাচ্চু। যত দুর্বিনীত অসভ্য আর গোঁয়ার হোক না, আমি কিছু বললে চোখ নামিয়ে তা শোনে।

বাচ্চু আর কতক্ষণ বাড়ি থাকে! তার চায়ের দোকনের আড্ডা আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, হাজার রকমের হল্লোড়বাজি আছে। চব্বিশ ঘন্টায় মধ্যে যোল ঘন্টাই তার বাইরে বাইরে কেটে যায়। কিন্তু ভারতী? 'বাইরে' বলতে তার কিছু নেই। সাড়ে চার কাঠা জায়গার পুরনো কিম্ভুত চেহারা সাড়ে তিনখানা ঘরের মধ্যেই তার সমস্ত দিন কাটে।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যায় না। সারা গায়ে দুর্বহ গ্লানি আর অপমান মেখে সবসময় মেয়েটা যেন মরমে মরে আছে। মামার সংসার থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের বাড়ি এসেছিল ভারতী, কিন্তু এ বাড়িটাও যে তার মামাবাড়ির মতোই একটা মরণকূপ কিংবা অগ্নিকুন্ড, এটাই সে জানত না। সার্কাসে কারা যেন মৃত্যুকূপে বা আগুনে ঝাঁপ.দিয়ে পরক্ষণেই হাসতে হাসতে অক্ষত বেরিয়ে আসে; তেমন কোনো ম্যাজিকের খেলা মেয়েটা জানে না। তাই সমস্ত দিনই ভারতীয় মুখ করুণ, বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত।

বাচ্চুকে তো আর সবসময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। বাবা তাই ভারতীর পেছনে লেগে আছে। ফ্যাক্টরির সময় ছাড়া সারাদিনই বাবা বাড়িতে থাকে আর বকে যায়।

বাবা বলে, 'তোমার কি এট্টু লাজ-শরমও নাই! বাউচ্চাব (বাচ্চুর) কান্ধে উইঠা ড্যাং ড্যাং করতে করতে এই বাড়িতে আইসা উঠলা!'

ভারতী উত্তর দেয় না। একেবার এতটুকু হয়ে মাটির সঙ্গে যেন মিশে যেতে চায়।

বাবা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে এবার বলে, 'ছিঃ—ছিঃ—আমরা হইলে গলায় দড়ি দিতাম।' এই সময় হয়তো বাবা তার দু'নম্বর বিয়ের কীর্তিটার কথা একেবারে ভুলে যায়।

ভারতী চুপ।

বাবা আবার বলে, 'তুমি তো জানতা বাউচ্চার একটা বাপ আছে। হ্যায় (সে) অখনও চিতায় ওঠে নাই।'

ভারতী এবারও চুপ।

বাবা ধমকে ওঠে, 'মুখ বুইজা থাকলে চলব না। কও, জানতা কিনা?'

ভারতী মুখ তোলে না। ভয়ে ভয়ে আস্তে মাথা নাড়ে।

বাবা বলে, 'আমি যখন মরি নাই তখন একবার ভাবলা না পোলারে নিকা করনের আগে তার বাপের মতামতখান লওন (নেওয়া) দরকার।'

ভারতী উত্তর দেয় না।

বাবা আবার বলে, 'তুমি কি জানতা বাউচ্চা শুয়োর একখান পয়সা কামায় না?'

ভারতী মাথা নাড়ে, অর্থাৎ জানত।

গলার স্বর সাত পর্দা চড়িয়ে বাবা চেঁচায়, 'কি ভাইবা তুমি একটা বেকার নিষ্কর্মা মস্তানরে বিয়া করলা, অ্যাঁ?'

ভারতী নিশ্চুপ।

বাবা চেঁচিয়েই যায়, 'অখন যদি ঘেটি ধইরা তোমাগো দুইজনরে বাড়িব বাইর কইরা দেই, কেমুন হয়? নিলজ্জ বেহায়া মাইয়া, পরের বাড়িতে এমুন কইরা আইসা থাকতে হয়!'

ভারতী এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে হয়, কেউ যেন পেরেক ঠুকে তার পা দুটো মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

বাবার হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, ভারতীটা একটা কথাও বলছে না। কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে থেকে সে বলে, 'কি, চুপ কইরা আছ যে?'

ভারতী আগের মতোই বোবা হয়ে থাকে।

কেউ যদি বিনা প্রতিবাদে সব অপমান মাথা পেতে নেয়, কতক্ষণ আর তার সঙ্গে একতরফা বকা যায়? বাচ্চুর মতো ভারতী যদি রুখে দাঁড়াত, বাবা তার বিরুদ্ধে হয়তো হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেত। কিন্তু একলা চেঁচিয়ে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার আগে ভারতীয় রাগ উসকে দেবার জন্যই কিনা বলে, 'একটা কথাবও তো জবাব দ্যাও না। আমারে দেখলেই তোমার বইক্য হইরা যায় দেখি।'

এরপবও ভারতী বোবাই থেকে যায়।

বাবা বলে, 'মনে করছ বোবা সাইজা পার পাইবা! তোমার শয়তানি আমি বুঝি না?'

বাবার এ জাতীয় কথাতেও ভারতীর আত্মসম্মানে কোথাও ধাক্কা লেগেছে বলে বুঝবার উপায় নেই। আসলে পরের বাড়ি থেকে, নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য উঠতে বসতে অপমান সয়ে সয়ে মর্যাদ্দাবোধ নামক বস্তুটা তার মধ্যে কোনোদিনই মাথা চাড়া দিতে পারে নি।

আগাগোড়া ভারতীকে চুপচাপ থাকতে দেখে বাবার রাগটা একসময় বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে যায়। লাফ দিয়ে ভারতীর খুব সামনে এসে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করতে থাকে, 'ছুটাইয়া দিমু পিতলা পিরীত, নিচ্চয় ছুটাইয়া দিমু। আমারে অখনও চিনো নাই।'

ভারতী তবু চুপ। মেরুপ্রদেশের বরফের নদীর মতো মেয়েটা বড় শীতল।

ভারতীর করুণ ছায়াচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বড় মায়া হয়। তাকে আমার ঘরে ডেকে এনে কাছে বসিয়ে প্রায়ই বলি, 'বাবা তোমাকে খুব বকে, না?'

ভারতী এক পলক আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। সহানুভূতির একটুখানি ছোঁয়ায় ঘাড় গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

তার পিঠে-মাথায়-ঘাড়ে-গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলি, 'কি বোকা মেয়ে রে, কাঁদে না।'

ভারতী কিছু বলে না, শুধু কাঁদতেই থাকে।

আমি বলি, 'বাবার স্বভাবটাই ওইরকম। দেখ না, সবার সঙ্গেই রাতদিন খিটখিট করছে। বাবার কথায় কিছু মনে কোরো না।'

কান্না জড়ানো আবছা গলায় ভারতী বলে, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না দিদি।'

'দূর পাগল মেয়ে; এসব আজেবাজে কথা কক্ষনো ভাববে না।'

ভারতী আমার কথা ভাল করে শোনে কিনা কে জানে, আপন মনেই বলে যায়, 'যেদিকে দু'চোখ যায় একদিন চলে যাব।'

ধমকের গলায় বলি, 'আবার ওসব ভাবছ! কোঁথাও তোমার যেতে হবে না। তুমি এখানেই থাকবে। আর বাবা যদি কিছু বলেও, এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দেবে; কিচ্ছু মনে করে রাখবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার শুরু করি, 'একটা কথা বলব ভারতী—'

'কী?' মুখ তুলে আমার দিকে তাকায় মেয়েটা। তার গালে চোখের তলায় ভেজা জলের দাগ। সেই সঙ্গে কিছুটা উৎকণ্ঠাও যেন তার চাউনিতে ফুটে ওঠে।

'এভাবে তো চিরকাল চলবে না। বাচ্চুকে তুমি একটা চাকরি-বাকরি করতে বল। দেখো, ও একটা কাজকর্ম পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে ভারতী বলে, 'আমি তো রোজ ওকে চাকরির কথা বলি।'

'বাচ্চু কী বলে?

'কিছু বলে না। তবে—'

'কী?'

একটু চুপ করে থেকে ভারতী শুরু করে, 'বার বার চাকরির কথা বললে ও খুব রেগে যায়। বলে, এ বাড়ি ঢুকেই রং ছাড়তে আরম্ভ করেছ! চাকরি নিয়ে অত মাকড়াবজি তোমাকে করতে হবে না। যা করবার আমি করব। তোমাকে এনেছি; স্রেফ কালা বোবা হয়ে থাকবে। একদম ঠোঁট ফাঁক করবে না। বেশি খিচিস খিচিস করলে লাইফ অ্যাসিড করে ছেড়ে দেব।'

আমি অবাক, 'বাঁদরটা এই সব বলে নাকি!'

'হ্যাঁ—' ভারতী বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে, 'এখন আমি কি করি বলুন তো দিদি?'

'ঠিক আছে, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখব'খন।'

ভারতী প্রথম যেদিন বাচ্চুর সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছিল তার পরনে ছিল একটা আধপুরনো রংজ্বলা হলুদ শাড়ি; সবুজ ব্লাউজ আর তালি-দেওয়া লেডিজ চটি। দু'হাতে স্টেনলেস স্টিলের দুটো চুড়ি আর কানে ফিনফিনে সরু মাকড়ি ছাড়া তার গায়ে ধাতুর চিহ্নমাত্র ছিল না। পরনের ওই শাড়ি জামা ছাড়া সঙ্গে করে সে আর কিছুই আনে নি। বাচ্চু হারামাজাদাটা ওকে রাস্তা থেকেই নিয়ে এসেছিল।

হাজার হোক মেয়ে তো। এক জামাকাপড়ে চালানোর কত যে অসুবিধে। প্রথম প্রথম ভারতীকে আমার শাড়ি-টাড়ি পরতে দিতাম। তারপর মাসের শেষে মাইনে পেলে একদিন ওর জন্য দু'খানা প্রিন্টেড শাড়ি, লনের ব্লাউজ, সায়া আর চটি কিনে দিয়েছি।

নতুন জামাকাপড় পেয়ে ভারতী কি যে খুশি! একবার সে পোশাকগুলোর ভাঁজ খুলে খুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, একবার গন্ধ শোঁকে। দেখতে দেখতে তার চোখমুখ চকচক করতে থাকে। তারপর সযত্নে পাট করে করে বাক্সে সাজিয়ে রাখে। আবার একটু পরেই ছুটে এসে বাক্স খুলে জামা-কাপড়গুলো দেখতে বসে।

ওর ছেলেমানুষি কান্ড দেখে আমি হেসে ফেলি। বলি, 'শাড়ি-টাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

খুশিতে ডগমগ ভারতী মাথাটা একদিকে অনেকখানি হেলিয়ে বলে, 'হুঁ—'

এই মেয়েটাই যে বাবা খিটখিট করলে কোনো কোনো দিন আত্মহত্যা করতে চায় কিংবা যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাবার সংকল্প করে বসে, এখন তার এই ঝকমকে উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা আর ভাবতে পারা যায় না।

জামা টামা নাড়চাড়া করতে করতে একসময় হয়তো ভারতী বলে, 'জানেন দিদি—'

তার চোখের ভেতর তাকিয়ে বলি, 'কী বলছ?'

'আমাকে এর আগে আর কেউ এতগুলো শাড়ি-জামা-জুতো একসঙ্গে কিনে দেয় নি। আমার বাড়ি থাকতে মামী আর মামাতো বোনদের ছেঁড়া-ছেঁড়া পুরনো কাপড় পরতে পেতাম। শুধু পুজোর সময় একখানা নতুন শাড়ি জুটত। সেই শাড়িটা হাতে দেবার সময় মামী আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ত। চোখের জল না ফেলে কোনোদিন আমি নতুন শাড়ি পরতে পারি নি দিদি।'

আপনাদের আগেই বলেছি, আমি মেয়েটা ভারি দুর্বল। বিজন যে বলে একটুতেই আমি গলে যাই, তা বোধ হয় মিথ্যে নয়। ভারতীর কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে যায়। বুকের কোনো এক অদৃশ্য তারে বিষাদের মতো কী বাজতে থাকে। ভারী গাঢ় গলায় বলি, 'এসব কথা থাক ভারতী;

তুমি তো এখন আর মামাবাড়িতে নেই।' বলেই যেন কট করে জিভে কামড় খাই। মামাবাড়ি ছেড়ে কি সুখের রাজ্যেই না এসে পড়েছে মেয়েটা!

আমাদের বাড়ির কাছেই বড় রাস্তার ধারে একটা সিনেমা হল। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে পারলে একেক দিন ভারতীকে নিয়ে সিনেমায় চলে যাই। আমাদের বাড়ির যা অবস্থা! সবসময় বারুদের স্তূপ হয়ে আছে; এক টুকরো আগুনের ফুলকি এসে পড়লেই হল। এই শ্বাসরুদ্ধকর বিস্ফোরক পরিবেশের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েকে দিনের পর দিন কাটাতে হলে দম বন্ধ হয়েই সে মরে যাবে। বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মাঝে মাঝে ওর ফুসফুসে বাইরের মুক্ত বাতাস লাগিয়ে আনা দরকার।

সিনেমায় নিয়ে গেলে কী খুশি যে হয় মেয়েটা! বলে, 'জানেন দিদি, আমার সিনেমা দেখতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি আমাকে তিন চারটে বই দেখালেন। তার আগে মামাবাড়ি থাকতে সবসুদ্ধু ক'টা বই দেখেছি জানেন?'

'ক'টা?'

'মোটে একটা। তাও মামারা কেউ দেখায় নি।'

'তবে?'

'পাশের বাড়ির একটা বউ আমাকে খুব ভালবাসত; সে-ই নিয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে কী কান্ড!'

'কিসের কাণ্ড!'

'মামীটা ভীষণ হিংসুটে আর ঝগড়াটি। পাশের বাড়ির বউটার সঙ্গে সে তিনদিন ঝগড়া করেছিল আর আমার যে কী অবস্থা করেছিল তা শুধু আমিই জানি।'

ভারতীর সঙ্গে আমার জীবনের প্রচুর মিল। নেহাত স্কুল ফাইনালটা পাশ করে টাইপ শিখে একটা চাকরি জোটাতে পেরেছিলাম, নেহাত মাসের পয়লা তারিখে এক কাঁড়ি টাকা সৎ-মায়ের হাতে তুলে দিতে পারি; তা না হলে আমার অবস্থা ভারতীর মতোই হত।

এই অসহায় মেয়েটাকে ভালবাসতে বড় ইচ্ছা করে। আমি জানি ওর সঙ্গে নিজেকে যত জড়াব ততই এ বাড়ি থেকে বেরুনো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। নিজের তৈরি ফাঁদে জড়িয়ে যেতে যেতে আমি ছটফট করি, রেগে যাই, তবু একটা করুণ বিষণ্ণ জনম দুখিনী মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার আনন্দ সর্বক্ষণ আমাকে যেন ঘিরে থাকে।

* * *

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এক রবিবার বিজন আমাকে শ্রীরামপুরে সুধীর সেনদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ছুটির দিনে কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যায়। এর মধ্যে আমরা পর পর দুই রবিবার নিখিল আর চিন্ময়ের বাড়ি ঘুরে এসেছি।

সকালের দিকেই ওদের বাড়ি চলে গেছি আমরা। সারাদিন হইচই হুল্লোড় করে ফিরতে রাত হয়ে গেছে।

বিজনের বন্ধু আর তাঁদের স্ত্রীদের আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি মেয়েটা যেমন ভীরু তেমনি লাজুক। সবসময় অদ্ভুত এক সঙ্কোচ আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে। খুব সহজে প্রাণ খুলে আমি কারো সঙ্গে মিশতে পারি না। কিন্তু বিজনের বন্ধুরা, বিশেষ করে বন্ধুপত্নীরা আমার সঙ্কোচ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। তারা হাত বাড়িয়েই ছিল; আলাপ-পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছে।

বিজনের বন্ধুর স্ত্রীরা সবাই দারুণ হুল্লোড়বাজ মেয়ে। তার ওপর সবারই মুখ ভীষণ আলগা; কিছুই সেখানে আটকায় না। আমার থুতনিতে টোকা দিয়ে দিয়ে ওরা চোখ টিপে টিপে যে ধরনের ঠাট্টা করে আর বিজনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে যা সব বলে তাতে আমার কান গরম হয়ে ওঠে।

বিজলীর সঙ্গে বিয়ের দিনই আলাপ হয়েছিল।

দু' রবিবার আগে শ্রীরামপুরের সুধীর সেনদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানে তার স্ত্রী লতিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

পাতলা লম্বাটে গড়ন লতিকার; গায়ের রং খুব ফর্সা; ছোট্ট কপালের ওপর কোঁকড়া কোঁকড়া নিবিড় চুলের ঘের। ঘন পালকে-ঘেরা বড় বড় চোখ। লতিকার চাউনিটা ভারি সুন্দর; তার মধ্যে কেমন একটা ঘুমের ভাব যেন মাখানো।

দুই ছেলেমেয়ের মা লতিকা, কিন্তু পাতলা ছিপছিপে গড়নের জন্য তাকে অল্পবয়সী মেয়ের মতো দেখায়।

সুধীর সেন আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে লতিকা আমাকে একটা নিরিবিলি ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পলকহীন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী দেখছেন?'

আমার থুতনির তলায় তর্জনী রেখে লতিকা দেখছিলই; উত্তর দেয় নি।

আবার বলেছিলাম, 'কী দেখছেন?'

লতিকা বলেছিল, 'আপনাকে।' তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি এবং সুরেলা, কিছুটা ঝঙ্কারময়।

লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি তো জানি এই বয়সেও আমাকে খারাপ দেখায় না। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটি কোনোদিকে তাকাই না। তবু টের পাওয়া যায় অগুনতি চোখ আমার গায়ে বিঁধছে। কখনও কখনও মুখ তুললে দেখতে পাই চারধারের মানুষগুলোর চোখে মুখে যা ফুটে আছে তার নাম মুগ্ধতা। একথা অন্যরকমভাবে আপনাদের আগেও আরেকবার বলেছি।

সে যাক। ভেবেছিলাম, লতিকাও বুঝি আমাকে দেখে মুগ্ধ। সে জন্য আমার মতো লাজুক মেয়ে তাকাতে পারছিল না। শরীরের সব রক্তকণা জমে আমার মুখটাকে লাল টকটকে করে তুলেছিল।

লতিকা আবার বলেছিল, 'আপনার মতো মেয়ে আগে আর কখনও দেখি নি ভাই।'

হঠাৎ আমার খটকা লেগেছিল, রূপ দেখে সে ঠিক মুগ্ধ হয় নি; তাব অপলক তাকিয়ে থাকাব মধ্যে অন্য কিছু আছে। আমি মুখ তুলে খানিকটা বিমূঢ়ের মতো বলেছিলাম, 'দ্যাখেন নি!'

ডাইনে এবং বাঁয়ে আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে লতিকা বলেছিল, 'না।'

হেসে হেসে এবার বলেছিলাম, 'আমি খুব সাধারণ মেয়ে। কলকাতা শহরের রাস্তায় আমার মতো মেয়ে হাজার হাজার ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

লতিকা মুখটা আমার কানের কাছে এনে বলেছিল, 'আপনি অসাধারণ।'

লতিকা কী বলতে চেয়েছে বুঝতে না পেরে চুপ করে ছিলাম।

লতিকা একটু ভেবে বলেছিল, 'আচ্ছা ভাই, বলতে পারেন কলকাতায় কত লোক আছে?'

হঠাৎ এই বিশাল শহরের জনসংখ্যা জানবার কী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল লতিকাব, কে জানে। আন্দাজে বলেছিলাম, 'সত্তর আশি লাখ হবে।'

'তার মধ্যে মেয়ে কত হবে?'

এ রকম উলটো পালটা প্রশ্ন করে কী জানতে চায় লতিকা? অবাক হয়েছিলাম ঠিকই, তবু বলেছিলাম, 'পঁচিশ তিরিশ লাখ হবে।'

লতিকা বলেছিল, 'এই পঁচিশ তিরিশ লাখের ভেতর আপনার মতো মেয়ে একটাও নেই।'

'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন না!'

'না।'

'বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি।' চোখের তারা নাচিয়ে ঠোঁট ছুঁচলো করে লতিকা বলেছিল. 'বিয়ের পর কুমারী মেয়ে সেজে আপনার মতো কেউ ঘুরে বেড়ায় না।'

এতক্ষণে লতিকার এলোমেলো প্রশ্নগুলোর মানে যেন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ হেসে বলেছিলাম, 'তা যা বলেছেন। আমার কপালই ওইরকম।'

'কপালের দোষ দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিয়ে যখন করে বসেছেন, বরের ঘর করতেই হবে।'

আমি হেসেছিলাম।

লতিকা আবার বলেছিল, 'কবে বিজন ঠাকুরপোর সঙ্গে সংসার পাতছেন বলুন—'

'দেখি।'

'দেখি টেখি না; এভাবে আপনাদের দু'জনকে ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকতে দেব না। আর ক'টা দিন দেখব। তারপর—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল লতিকা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তারপর কী?'

'আমরাই একটা বাড়ি ভাড়া করে জোরজার করে দু'জনকে ঢুকিয়ে দেব। বিয়ের পর এরকম আলাদা থাকা ভাল না।' লতিকার গলা এবার বেশ গাঢ় শুনিয়েছিল।

লতিকার আন্তরিকতা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার বাবা-মা আমার বিয়ের কথা, আমার ঘর-সংসারের কথা ভাবে না। অথচ বিজনের বন্ধু এবং তাদের স্ত্রীরা বিজন আর আমাকে সুখী দেখতে চায়; আমরা একসঙ্গে থেকে সংসার করছি, সেই দৃশ্য দেখে তৃপ্ত হতে চায়। লতিকার কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল।

বিজনের বন্ধুর স্ত্রীরা সবাই খুব ভাল মেয়ে। লতিকার মতো নিখিলের বউ অরুণাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে।

বিয়ের আট দশ বছরের ভেতর চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে হওয়ার জন্যই বোধহয় অরুণার শরীরে আর কিছু নেই। তার ওপর ছেলেপুলে যাতে আর না হয় সেজন্য অপারেশন করিয়েছে। এ খবর বিয়ের দিনই আমি জেনেছিলাম।

অরুণার গায়ের রং কাগজের মতো সাদা; রক্ত-টক্ত বলতে কিছু নেই। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায়, ওর সারা শরীরে অ্যানিমিয়ার স্পষ্ট স্থায়ী ছাপ।

খুব জোরে হাসতে পারে না অরুণা, জোরে কথা বলতেও না। তার কণ্ঠস্বর ধীর, মৃদু এবং দুর্বল। লতিকার মতো অরুণাও বিজনের কাছে এসে থাকার জন্য আমাকে তাড়া দিয়েছে। বলেছে, 'আমরা ছেলেপুলে স্বামী নিয়ে ঘর করব আর আপনি মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াবেন, তা হবে না ভাই।'

অরুণা আর লতিকাকে খুবই ভাল লেগেছে। তবে সব চাইতে মজা পেয়েছি চিন্ময়ের বউ মাধবীর সঙ্গে কথা বলে।

গায়ের রং লতিকাদের মতো অত ফর্সা নয় মাধবীর। কচি পাতার চিকন আভার মতো একটা ভাব আছে তার শরীরে; তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। গোলগাল আদুরে মুখ; বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, প্রতিমার মতো থুতনির আদল, কোমর ছাপানো চুল, গলায় শাঁখের মতো তিনটে থাক। ছ'বছরের বিবাহিত জীবন এখনও নিষ্ফলা; ছেলেপুলে হয় নি। তাই বোধ হয় চেহারাটা ভারী হয়ে আসছে।

পুরনো ধরনের সাজগোজের দিকে দারুণ ঝোঁক মাধবীর। বয়েস তিরিশের বেশি হবে না, কিন্তু নকশাপাড় ধবধবে তাঁতের শাড়ি গিন্নী-বান্নিদের ঢংয়ে পরে থাকে; আঁচলে চাবির থোকা; নরম গোল হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি; গলায় পাথর-বসানো হার, পাতলা নাকে রক্তের কুঁড়ির মতো নাকছাবি, কানে সাদা পাথরের দুল।

দারুণ পান খায় মেয়েটা; পানের রসে ঠোঁট সব সময় টুকটুকে। দারুণ কথা বলতে পারে সে এবং দারুণ হাসতে।

বিজলী আগেই আভাস দিয়েছিল। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম, মাধবীর মুখ ভীষণ আলগা।

আলাপ-টালাপ হবার পরই মাধবী একহাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুই মাইরি একটা রাবিশ মেয়ে।'

'আপনি' না, 'তুমি' না, প্রথম পরিচয়েই কেউ যে দুম করে 'তুই' বলে বসতে পারে, এমন ধারণা আগে আমার ছিল না। হকচকিয়ে বলেছিলাম, 'আমি—আমি—আমি—'

একহাতে কোমর জড়ানোই ছিল, আরেক হাতে আমার গাল টিপে লাল করে দিতে দিতে মাধবী বলেছিল, 'বিয়ে করেছিস, অথচ বিজন ঠাকুরপোর কাছে থাকিস না। বরের কাছে না শুয়ে রাত কাটাস কী করে?'

শুনতে শুনতে আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করেছিল।

মাধবী আবার বলেছিল, 'বরকে জড়িয়ে ধরতে না পারলে আমার কিন্তু ভাই ঘুমই আসে না।'

উত্তর দিই নি; জড়ানো গলায় গোঙানির মতো শব্দ করেছিলাম।

মাধবী আবার বলেছিল, 'আমি আমার মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। দারুণ আদুরে। দু'চারদিন পরপরই হয় মা, নয় বাবা এসে আমাকে নিয়ে যায়। দু-একদিন থাকতেও হয় তাদের কাছে। বাপের বাড়িতে সেই দুটো-একটা দিন কী খারাপ যে লাগে ভাই! আমি তখন কী করি জানিস?'

মাধবীর কথা শুনে দারুণ লজ্জা লাগছিল; আবার মজাও পাচ্ছিলাম খুব। বলেছিলাম, 'কী করেন?'

'স্রেফ একটা গুলতাপ্পি ঝেড়ে মা-বাবার কাছ থেকে বরের কাছে চলে আসি।'

আমি ঠোঁট টিপে এবার হেসেছিলাম; কোনো মন্তব্য করি নি।

মাধবীও হেসেছিল, 'আসলে আমার ব্যাপার হল সেই বেড়ালটার মতো—'

'কোন বেড়ালটা?'

'সেই যে রে মাছের গন্ধ ছাড়া যে ভাত খায় না সেই বেড়ালটা—'

বেড়ালের তুলনাটা বুঝতে পেরে মাধবীর দিকে তাকিয়েছিলাম।

মাধবী বলেছিল, 'ওই বেড়ালটার মতো আমারও ভাই বর না হলে একদিনও চলে না। আসলে আমরা মেয়েরা হলাম—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল সে; চোখের কোণে আমাকে দেখতে দেখতে, নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে নিঃশব্দে হাসতে শুরু করেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী?'

'একেকটা মাছ-খেকো বেড়াল। তাই বলছি—'

'কী বলছেন?'

হঠাৎ কপট রাগে চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে মাধবী শাসিয়েছিল, 'এই, আমি 'তুই' চালিয়ে যাচ্ছি। আর তুই 'আপনি' 'আজ্ঞে' করছিস। 'আপনি-টাপনি' করে বললে খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। উই আর ফ্রেন্ডস—সখি।'

এটুকু বুঝেছিলাম, আমি যদি 'তুই' নাও বলতে চাই, মাধবী ঘাড় ধরে আমাকে বলিয়ে ছাড়বে। হেসে বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, 'তুই' করেই বলব।'

মাধবী চারদিক দেখে নিয়ে এবার বলেছিল, 'বিজন ঠাকুরপো আর তুই কবে সংসার পাতছিস?'

'ইচ্ছা তো তাড়াতাড়িই পাতি। কিন্তু—'

'কী?'

'আমাদের দু'জনেরই কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। সে সবের একটা ব্যবস্থা না করে — মানে—'

'বুঝেছি।' বলেই চুপ করে গিয়েছিল মাধবী। কিছুক্ষণ পর গভীর গলায় আবার শুরু করেছিল, 'হ্যাঁ, চিন্ময়ের কাছে শুনেছি, তোদের দু'জনের কাঁধেই বার্ডেন, তা হলেও চিরকাল তো এভাবে চলতে পারে না। যত শিগগির পারিস একটা ব্যবস্থা করে ফেল—'

খানিক আগে মাধবী যে সুরে কথা বলছিল এখন একেবারে বদলে গেছে। হালকা ফাজিল চপল মাধবী এখন আশ্চর্য গম্ভীর, সহানুভূতিময়। তাকে আমার খুব ভাল লাগছিল।

মাধবীর মধ্যে গম্ভীর ভাবটাই খুব কম। কয়েক মিনিট পরেই আবার সে তার ফুরফুরে হালকা স্বভাবে ফিরে এসেছিল। ঠোঁট কুঁচকে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'বিজন ঠাকুরপোর সঙ্গে একটা রাতও কাটাস নি?'

'ধ্যাৎ! অসভ্য—'

'বেশ অসভ্য! শুনেছিলাম বিজলী ওর ফ্ল্যাটে তোদের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করেছিল—'

'হ্যাঁ।'

'তোরা নাকি ফুলশয্যা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলি?'

'কী করব? বাড়িতে বলে আসি নি। সেই অবস্থায়—'

দু আঙুলে আমার নাক ধরে নাড়তে নাড়তে মাধবী বলেছিল, 'এক ব্রহ্মচারী আর এক ব্রহ্মচারিণী!

কেন যে তোরা বিয়ে করিস! সে যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বন্ধু হিসেবে তোকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি।'

'আমার ফ্ল্যাটে ভাই অনেকগুলো ঘর। আমরা মোটে দুটো লোক; বেশির ভাগ ঘরই ফাঁকা পড়ে থাকে। বলছিলাম কি, যদ্দিন না আলাদা সংসার করছিস বিজন ঠাকুপো আর তুই মাঝে মধ্যে এসে আমাদের এখানে রাত কাটিয়ে যাবি।' বলেই চোখ টিপেছিল।

আমার কানের লতি গরম হয়ে উঠেছিল। দ্রুত মুখ নামিয়ে বলেছিলাম, 'ধুৎ—'

আমার গালে টুসকি মেরে মাধবী এবার বলেছিল, 'ধুৎ কি রে ছুড়ি, বরের কাছে থাকবি তাতে লজ্জা কিসের?'

জড়ানো গলায় বলেছিলাম, 'মুখে কিছুই আটকায় না।'

আমার কথায় কান না দিয়ে হেসে হেসে গলে পডতে পড়তে মাধবী বলে গিয়েছিল, 'বরের কাছে তো থাকতেই হবে। তার রিহার্সালটা আমার এখান থেকেই দিতে থাক না।'

এবার আমি চুপ। মুখ খুলতে আর সাহস হয় নি। যা-ই বলি না কেন, তার এমন একটা উত্তব মাধবী দেবে যে মুখ তুলে তাকাতেই পারব না। মাধবীটা যাচ্ছে-তাই।

প্রতি ছুটির দিনে আজকাল বিজনের কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন থাকে। এ কথা আপনাদের আগেই বলেছি। বিয়ের পর এই নেমন্তন্ন পাওয়াটা হয়েছে নগদ লাভ।

এর মধ্যে এক রবিবার সবাই মিলে দারুণ হই-হুল্লোড় করে স্টিমারপার্টি করা হল।

আগের থেকেই ঠিক ছিল, যে যার বাড়ি থেকে সোজা আউটরাম ঘাটে চলে যাবে। সবাই আসবার পর লঞ্চে ওঠা হবে।

ভোরবেলা তখনও ভাল করে রোদ ওঠে নি, চারদিক আবছামতো, আউটরাম ঘাটে এসে দেখি, বিজন আর তার বন্ধুবান্ধব, বন্ধুদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা এসে গেছে।

আমাকে দেখে সুধীর সেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ম্যাডাম, আপনি এত লেট? আমরা কখন থেকে আপনার পথ চেয়ে আছি।'

বললাম, 'বা রে, কতদূর থেকে আমাকে আসতে হয়েছে বলুন তো।'

'আমাদের চাইতে দূর নিশ্চয়ই না। আমরা আসছি সেই শ্রীরামপুর থেকে।'

একটা দুর্বল কৈফিয়ৎ খাড়া করবার চেষ্টা করলাম, 'এত ভোরে ঠিকমতো বাস পাওয়া যায় না; আধ ঘন্টা পর পর সারভিস। বাস রাস্তার এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম; বাস পাওয়া গেলে কখন চলে আসতাম।'

সুধীর সেন আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়েদের জটলা থেকে মাধবী চেঁচিয়ে উঠেছে, 'ছুঁড়ি, সব ব্যাপারেই তোর লেট। বিয়ে করতে লেট, ঘর-সংসার কবতে লেট। বাসে চড়ে এইটুকু আসতে লেট তো হবেই। নে—নে, আর দেরি করিস না। লঞ্চ রেডি; চটপট উঠে পড়া যাক।'

সবাই হল্লা করে হেসে উঠল।

আউটরাম ঘাটের গা ঘেঁষে একটা মাঝারি লঞ্চ দাঁড়িযে ছিল। হাসতে হাসতে আমরা তাতে উঠলাম। একটু পর লঞ্চ ছেড়ে দিল।

তারপর সারাদিন শুধু খাওয়া-দাওয়া, হুল্লোড়। নিখিল একটা রেকর্ড প্লেয়ার এনেছিল, আর রবীন্দ্র সঙ্গীতের লং-প্লেয়িং রেকর্ড। হুল্লোড়বাজির ফাঁকে ফাঁকে অনেক গান শোনা হল। সুধীর সেন জীবনানন্দ আর সুধীন দত্তের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল। নিখিল দেখাল তাসের ম্যাজিক। তারপর ছবি তোলা শুরু হয়। প্রথমে সবাই মিলে গ্রুপ ফোটো। তারপর সব বন্ধুদের একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে একটা ফোটো তোলা হল। বন্ধুর স্ত্রীদেরও আলাদা আরেকটা ফোটো নেওয়া হল।

ফটো তুলছিল নিখিল। গ্রুপ ফটো তোলা হলে সে বলল, 'এবার ভাই যুগল মিলনের ছবি নেব। সুধীর তুই আর লতিকা পাশাপাশি দাঁড়া—'

আগেও কার মুখে যেন একবার যুগলমিলনের কথা শুনেছিলাম। এখন মনে পড়ল না।

একেক জন বন্ধু আর তাদের স্ত্রীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে আলাদা আলাদা ছবি তুলল নিখিল। সবশেষে এল আমার আর বিজনের পালা।

আমি আর বিজন অন্য সবার মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলাম। গম্ভীর চালে নিখিল বলল, 'উঁহু—উঁহু—'

বিজন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'উঁহু কী?'

'তোদের এই রকম 'পোজ' চলবে না।'

'তবে কিরকম?'

'দেখাচ্ছি, দাঁড়া—' বলেই নিখিল করল কি, বন্ধুদের বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে সারেঙ-এর কেবিনের ওপাশে রেখে এল। ফিরে এসে বলল, 'বোস শালা—'

বিজন ঘাড় বাঁকিয়ে বিদ্রোহের ভঙ্গিতে বলল, 'বসব কেন, অ্যাঁ—বসব কেন? সব শালা দাঁড়িয়ে ফোটো তুলল, আমার বেলায় বসে কেন?'

'তুমি যে সবার থেকে আলাদা চাঁদ—'

'কেন, আলাদা কেন?'

খুব রগড়ের মুখ করে নিখিল বলল, 'তুমি যে দামড়া বয়সে বিয়ে করেছ, সেই জন্যে। বোস—'

ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে বিজন বলল, 'বসে কী হবে?'

'বসে পড়ই না। তারপর কী হবে, দেখাচ্ছি।'

গুচ্ছের তেতো গিলবার মতো মুখ করে শেষ পর্যন্ত বসেই পড়ল বিজন।

নিখিল এবার আমার দিকে তাকাল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছেন কী?'

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'কী করব তা হলে?'

হুড়মুড় করে বিজনের পাশে বসতে যাচ্ছিলাম, নিখিল দারুণ চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'উঁহু—উঁহু, ওখানে না—'

'তবে কোথায়?'

বিজনের কোলটা দেখিয়ে নিখিল বলল, 'এইখানে—নইলে যুগলমিলন হবে কী করে?'

বিজন এইসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'শালা খচ্চর—' বলেই উঠে পড়তে চাইছিল, পারল না। আমিও আরক্ত মুখে ছুট লাগাতে যাচ্ছিলাম, পারলাম না। বিজনের বন্ধুরা ওকে চেপে ধরে বসিয়ে রাখল; আর বন্ধুর বৌরা জোর করে আমাকে বিজনের কোলে বসিয়ে দিল। এবং এরই ফাঁকে পটাপট অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল নিখিল।

বিজন রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল, 'তোরা না মাইরি একেকটা ফার্স্ট ক্লাস হারামী—'

নিখিল বলল, 'তা যা বলেছিস! ফোটোটা ডেভলাপ করে পাঠাই; দেখবি শালা যুগলমিলন কাকে বলে'

বিজনের কোল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি আর কারো দিকে তাকাতে পারলাম না। আমার মতো ভীরু দুর্বল লাজুক মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কী কাণ্ডটাই না করল।

ভোরবেলা আমরা আউটরাম ঘাট থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গঙ্গার গেরুয়া জলে মাছের মতো সাঁতার কেটে আমাদের লঞ্চটা বিকেলবেলা ডায়মন্ডহারবার পেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

আমরা নদীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। সবে শরতের মাঝামাঝি। আকাশ যদিও উজ্জ্বল নীল; এখানেওখানে পেঁজা তুলোর মতো ধবধবে ভবঘুরে মেঘ; তবু এরই মধ্যে বাংলাদেশের এদিকটায় হিম পড়তে শুরু করেছে। শরতের এই হিম গাঢ় বা ভারী ধরনের নয় পাতলা ফিনফিনে কুয়াশার মতো নদীর দু'ধারকে ঝাপসা করে রেখেছে।

এর মধ্যেই আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে প্রকাণ্ড লাল বলের মতো সূর্যটা গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো; তার তাপও দ্রুত জুড়িয়ে আসছে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'আর গিয়ে দরকার নেই; এবার ফেরা যাক।'

অন্য সবাই বলল, 'হ্যাঁ, ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যাবে। বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে। বেশি দেরি করলে ওদের কষ্ট হবে।'

লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল। সারাদিন পর এবার কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

সূর্যটা এতক্ষণ যেন সরু সুতোয় ঝুলছিল। সুতোটা কখন যে ছিঁড়ে গেল আর কখন যে সূর্যটা দিগন্তের ওপারে টুপ তরে খসে পড়ল, মনে নেই।

জলে কালি গুলবার মতো আস্তে আস্তে চারদিক কালচে হয়ে আসতে লাগল। তারপর ঝপ করে কখন একসময় রাত নেমে এল।

আজ কী তিথি কে জানে। সন্ধ্যোর কিছুক্ষণ পর চন্দনের পাটার মতো গোল একখানা চাঁদ জলের তলা থেকে উঠে এল যেন।

সারাদিন হইচই হুল্লোড় করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ডেকের ওপর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে চুপচাপ বসে আছি। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠবার পর নদীকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। গেরুয়া জলের ধারাটি তরল রুপোর স্রোত হয়ে গেছে যেন।

নিখিল বলল, 'এখন কী হলে মন ভরে যায় বল তো—'

সুধীর সেন বলল, 'রবীন্দ্র সঙ্গীত—'

'রাইট। রেকর্ড প্লেয়ারটা বার কর—'

'উঁহু—'

'কী?'

'রেকর্ডের গান তো সবসময় শুনছি। আমাদের মধ্যে কে গাইতে পার বল—'

অরুণা বলল, 'একমাত্র মাধবী পারে।'

'ইয়েস মাধবী, মাধবী গাইবে—'

লক্ষ করেছি বিজনের বন্ধুরা একে অন্যের স্ত্রীকে 'তুমি' করে বলে। নাম ধরেও ডাকে। আমার সঙ্গে মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠতা কম বলে খুব সম্ভব 'আপনি' 'টাপনি' চালাচ্ছে। তবে খুব বেশিদিন 'আপনি'র দূরত্বটা থাকবে না বলেই আমার ধারণা।

মাধবী খালি গলায় ক'টা গান গাইল। ভারি মিষ্টি আর ভরাট গলা তার। মেয়েটা এমনিতে দারুণ কিন্তু গানের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। চারদিকে ধবধবে জ্যোৎস্না, ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া, রুপোর স্রোতের মতো নদী, মাথার ওপর আদিগন্ত খোলা শরতের আকাশ আর মাধবীর চমৎকার গলা—সব একাকার হয়ে প্রাণ যেন ভরে গেল।

একটানা সাত আটটা গান গেয়ে মাধবী থামল। বলল, 'আমি আর পারছি না ভাই।'

বিজলী বলল, 'আর দুটো—প্লিজ—'

'অনেকদিন অভ্যাস নেই। অতগুলো গাইলাম, এবার রেস্ট না দিলে গলা চিরে যাবে।'

'তার মানে এত সুন্দর সন্ধেটাকে মার্ডার করে দিতে চাইছিস?'

'বা রে মার্ডার হবে কেন, আর কাউকে গাইতে বল না—'

'আর কি কেউ গাইতে জানে? আমি হাঁ করলে তো একসঙ্গে আঠার রকমের আওয়াজ বেরোয়। আর লতিকা অরুণাও তো একেবারে গন্ধর্বলোক থেকে নেমে এসেছে—' বলতে বলতে বিজলী লতিকা আর অরুণার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

লতিকা অরুণা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'যা বলেছিস ভাই।'

বিজলী বলল, 'আর আমাদের মিস্টারদের মুখ থেকে যা বেরোয় তাকে আর যা-ই হোক গান নিশ্চয়ই বলা যায় না।'

সুধাময়, নিখিল, চিন্ময়রা কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বেরোয় বেরোয় আমাদের মুখ দিয়ে?'

'টেপ রেকর্ড করে রাখলে বুঝতে পারতে।'

মাধবী বলল, 'তোমাদের দৌড় জানা আছে। কিন্তু একজনকে টোকা দিয়ে দেখেছ?'

'কাকে?'

মাধবী আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওকে। বকুল নিশ্চয়ই গান জানে।'

মাঝে মাঝে গলার ভেতর একটু আধটু যে গুনগুন না করি তা নয়। স্কুলে পড়বার সময় বন্ধুরা বলত, আমার গানের গলা নাকি খুব ভাল; চর্চা করলে আমি নাম করতে পারব। তখন আমরা ভাল করে পেট পুরে খেতে পাই না, একই কাপড় রাত্রে ধুয়ে শুকিয়ে ঘটির পেছন দিক দিয়ে ইস্তিরি করে তবে পরের দিন বেরুতে হয়। সেই অবস্থায় বলে কিনা গান শিখে নাম করব!

আমি জোরে জোরে, প্রবলবেগে হাত এবং মাথা নেড়ে বললাম, 'না—না, আমি গান-টান জানি না।'

মাধবী বলল, 'নিশ্চয়ই জানিস।'

'সত্যি বলছি, জানি না। মা কালীর দিব্যি।' আমি প্রায় ঘেমে উঠলাম।

অরুণা বলল, 'যা জানো তাতেই চলবে। তুমি তো আমাদের কাছে সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী হবার পরীক্ষা দিতে বসছ না।'

বিজনের বন্ধুরাও তাড়া লাগাল, 'যা জানা আছে তাতেই চলবে।'

আমার যেন কী হয়ে গেল। জ্যোৎস্না-ধোওয়া এই নদী, রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ, চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে-থাকা বন্ধুরা—সব মিলিয়ে আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটে থাকবে। নিজের অজান্তেই গলায় গান তুলে নিলাম ঃ

'ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই!
কোথা সে যে আছে সংগোপনে . . .'

গানটা শেষ হবার পর সুধীর যেন খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'গ্র্যাণ্ড।'

চিন্ময় বিজনের গায়ে আলতো ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'এই শালা বিজন—'

বিজন মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কী বলছিস?'

'তোর বউটা লজ্জাবতী লতা হলে কী হবে ভেতরে মাইরি খাসা ফোয়ারা আছে—রিয়েল ফাউন্টেন—'

মাধবী আমার গানের কথাগুলো নিয়ে আচমকা মজার গলায় বলে উঠল, 'ধরা দেবে, নিশ্চয়ই সে ধরা দেবে। হাত বাড়িয়ে দ্যাখ না ছুঁড়ি—'

বিজন খুব লজ্জা পেয়ে গেল, 'কী যে বল না! থার্ড ক্লাস—'

বিজনের অন্য বন্ধুরা হই হই হেসে উঠল। আমি আর বসে থাকতে পারছিলাম না; উঠে সারেঙের কেবিনের ওধারে ছুট লাগালাম।

কলকাতায় ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বাজল।

সেই ভোর থেকে এতটা সময়, প্রায় ষোল সতের ঘন্টা স্বপ্নের মতো কেটে গেল।

* * *

মাঝখানে তিন চার দিন অফিসে আসে নি কনক।

এই অফিসে কনকই আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্টেলা, অনীতা, মঞ্জু—সব মিলিয়ে টাইপ কেশনে আমরা দশ বারটা মেয়ে। সবার সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব, প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু কনকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাটা অন্য ধরনের। খুব সম্ভব বার বছর আগে একই দিনে আমরা চাকরি করতে এসেছিলাম বলে।

একযুগ ধরে আমরা পাশাপাশি সিটে বসছি; টিফিনের সময় মুখোমুখি বসে ক্যানটিনে বা অন্য রেস্তোরাঁয় চা'টা খেয়েছি; সুখ-দুঃখ কামনা-বাসনার কথা বলেছি। কনক দারুণ খোলামেলা মেয়ে; আমার কাছে গোপনীয়তা বলতে তার কিছুই নেই। আমি বরং কনককে আমার বিয়ের কথাটা জানাই নি।

আমার ঠিক ডান পাশের চেয়ারটায় কনক বসে। তিন দিন চেয়ারটা ফাঁকা পড়ে আছে। দারুণ বিশ্রী

লাগছে আমার। কনকের সঙ্গে সারাদিনে কয়েক ঘন্টা কাটাতে না পারলে, দু'চারটে প্রাণের কথা বলতে না পারলে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। একটানা বার বছরের অভ্যাস তো।

এর আগে একসঙ্গে এতদিন কনক ছুটি নিয়েছে কিনা, আমার মনে নেই।

যাই হোক, কালকের দিনটাও দেখব। কালও যদি কনক অফিসে না আসে পরশু ছুটির পর দমদম চলে যাব। দমদমে গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের একটা লো ইনকাম-গ্রুপের ফ্ল্যাটে ওরা থাকে।

দমদম পর্যন্ত আর ছুটতে হল না। পরের দিনই কনক অফিসে এসে হাজির।

আমি বললাম, 'তুই তো আচ্ছা মেয়ে!'

কনক আদুরে গলায় বলল, 'কেন, কী করেছি রে?'

'তিন দিন কোথায় ডুব দিয়েছিলি?'

'কোথায় আবার, বাড়িতেই ছিলাম।'

'অসুখ-টসুখ করে নি তো?'

'আরো না—না।'

আমি বললাম, 'আজকের দিনটা দেখতাম। আজও যদি না আসতিস, কাল তোদের বাড়ি চলে যেতাম।'

কনক আমার দিকে তাকিয়ে থাকল; কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'অসুখ করে নি বিসুখ করে নি, বাড়িতেও ছিলি, তবে অফিসে আসিস নি কেন?'

চোখের কোন দিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল কনক।

আমার চোখ কুঁচকে গেল, 'হাসছিস যে হতাচ্ছাড়া মেয়ে!'

কনক আমার কানের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে গভীর রহস্যময় গলায় বলল, 'রিহির্সাল দিচ্ছিলাম।'

এর আগে কে যেন আমাকে কী একটা ব্যাপারে রিহার্সাল দেবার কথা বলেছিল; এক্ষুনি ঠিক মনে করতে পারলাম না। বললাম, 'কিসের রিহার্সাল?'

'একেবারেই তো ছুটি নিতে হবে; তার আগে একসঙ্গে তিন দিন নিয়ে দেখলাম কিরকম লাগে।'

আমার বুকের ভেতর দিয়ে ঢেউয়ের মতো কি খেলে গেল। চমকে উঠে বললাম, 'একেবারে ছুটি মানে!'

আলতো করে আমার গালে টুসকি মেরে কনক বলল, 'তোর কি কিছুই মনে থাকে না?'

তক্ষুনি মনে পড়ে গেল, এ মাসেই কনকের বিয়ে। বিয়ের পনের দিনের ভিতরই সে লন্ডন পাড়ি দিচ্ছে। আবছা গলায় বললাম, 'তার মানে—তার মানে—'

'তার মানে তা-ই—' কনক হাসতে লাগল। তারপর আঙুল ফোটাতে ফোটাতে আবার শুরু করল, 'এই তিনটে দিন সারা কলকাতা চরকির মতো ঘুরেছি ভাই। উঃ, হাড়গোড় একেবারে আলগা হয়ে গেছে।'

'কলকাতা চষবার কী হল?'

'বা রে, পুরশুদিন বিয়ে না?'

এ মাসেই বিয়ে জানতাম। ওরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশও দিয়েছিল। কিন্তু তারিখটাকে দু'জনে যে এত কাছে এগিয়ে এনেছে তা জানা ছিল না।

হঠাৎ আমার মনে হল, এ ষড়যন্ত্র। আমাকে না জানিয়ে এভাবে এত তাড়াতাড়ি বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলা উচিত হয় নি কনকের। রাগ দুঃখ ক্ষোভ—সব মিলিয়ে কনকের ওপর আমার মনোভাটা আচমকা কিরকম যেন হয়ে গেল। একবারও মনে হল না, আমিও ওকে লুকিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলেছি। ক্ষোভ আর রাগ—মানসিক অবস্থার দুই বিপরীত মেরুতে ধাক্কা খেতে খেতে আমি ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকলাম।

কনক হয়তো আমাকে ভাল করে লক্ষ করে নি; আপন মনে সে বলে যেতে লাগল, 'মাথার ওপর

আমার আর কে আছে বল। নিজের বিয়ের জন্যে আমাকেই ছোটাছুটি খাটা-খাটনি সবই করতে হল। এ সময় যদি বাবা থাকত—' কনকের গলা শেষ দিকে ভারি হয়ে এল।

আমার স্কোভ-টোভ পলকে উধাও। মনে পড়ল, নিজের হাতে নিজেকে সাজিয়ে চোরের মতো আমাকেও একদিন বিয়ে করতে যেতে হয়েছিল। কনকের সঙ্গে আমার জীবনের কি আশ্চর্য মিল!

কনক আবার বলল, 'ডাইভোর্স-হওয়া মেয়ে হলেও তো এটা বিয়েই। একটা বিয়ের কেনাকাটা কি কম! ঘুরে ঘুরে আমাকেই সব করতে হয়েছে। অবশ্য—'

'কী?'

'তোর কথা খুব মনে পড়ছিল।'

'কেন রে?'

'ভেবেছিলাম এই তিনদিন তোকে ছুটি নিতে বলব। তারপর দু'জনে কেনাকাটা করতে বেরুব।'

'বললেই পারতিস—'

একটু চুপ করে থেকে লাজুক হাসল কনক, দাঁত দিয়ে আঙুল কামড়াল। একসময় বলল, 'বলব কি, তার আগেই এসে হাজির—'

আমি রগড়ের গলায় বললাম, 'কিসের যেন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'আর বলিস না ভাই, এমন বিচ্ছিরি স্বভাব অরুণের, এক মিনিট আমাকে কাছছাড়া করতে চায় না।' কনক যা-ই বলুক, সুখ আর গর্বে তার মুখ-চোখে আলো খেলে যাচ্ছে। একটি পুরুষকে সম্পূর্ণ জয় করার সুখ এবং গর্ব।

আমি হেসে হেসে বললাম, 'বেশ তো। খুব ভাল, খুব ভাল—'

কনক আবার বলল, 'মার্কেটিং-এর সময় সারাক্ষণ অরুণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল; জিনিসপত্র পছন্দ করে দিয়ে আমাকে খুব হেল্প আছে, বিয়ের পর কী যে করবে!'

'আসল লোকই তো সঙ্গে ছিল; আমাকে বলার আর দরকার কী?'

আমার কথা বোধহয় শুনতে পেল না কনক, নিজের মনে বলে যেতে লাগল, 'এই লোক এখন ছায়ার মতো আমার গায়ে লেপটে আছে, বিয়ের পর কী যে করবে!'

লক্ষ করলাম, কনকের চোখে-মুখে, বলার ভঙ্গিতে এবং কণ্ঠস্বরে আগের সেই গর্ব, সেই সুখ। বললাম, 'যা করবে তা ভালই লাগবে তোর।'

ভেংচি কাটার মতো করে কনক বলল, 'ভালই লাগবে, তোকে বলেছে! ও আমার হাড় জ্বালিয়ে খাবে।'

আমি হাসতে লাগলাম।

একটু ভেবে কনক বলল, 'জানিস ভাই, একটা কাণ্ড হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম 'কী কাণ্ড রে?'

'আমি অরুণকে বলেছিলাম, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে। প্রথম দিকে ও রাজিও ছিল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে আমরা নোটিশও দিয়েছিলাম—'

'তা তো জানিই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোকে বলেছিলাম। কিন্তু ভাই শেষ পর্যন্ত অরুণ আর ওর বাড়ির লোকেরা সব গোলমাল করে দিল—'

'কী গোলমাল?'

'বলল রেজিস্ট্র-ফেজিস্ট্রি হবে না; একেবারে ছাঁদনাতলায় সাত পাক ঘুরতে হবে।'

পলকের জন্য আমার বিয়ের দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অনুভব করলাম, দারুণ হিংসেয়। আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

কনক থামে নি, সমানে বলে যাচ্ছে, 'একবার পুরুতের কাছে মন্তর পড়ে বিয়ে হয়েছিল। আবার কেমন করে যে ওভাবে বিয়ে করতে যাব! এমন বিচ্ছিরি লাগছে না!'

সোজা কনকের চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, ও যা বলছে তার উলটো খেলাটাই চলছে ওর মধ্যে। হাতে গাছকৌটো নিয়ে বিয়ের আসরে হাজার গণ্ডা লোকের ভিড়ে বরের সঙ্গে মালা-বদলের ইচ্ছে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা; অথচ মুখে শুধু না—না—না। লোভী, সুখী বেড়ালের মতো মনে মনে ফুলে আছে মেয়েটা, কিন্তু কত ন্যাকামোই যে জানে! কনক, আমার সব চাইতে প্রিয় সখি, বার বছর আমরা পাশাপাশি বসে টাইপ করেছি, কত সুখ-দুঃখের গল্প করেছি—এ সব কথা পলকে ভুলে গেলাম যেন। কনকের সঙ্গ হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলাম। প্রিয় বান্ধবীর সুখ এবং তৃপ্তি আমাকে যে এমন ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল! পরক্ষণেই নিজের ওপর আমার দারুণ রাগ হল। এত নীচ আমি! পরের সুখে এত কাতর! নিজের নীচতা ক্ষুদ্রতা আমার বুকের ভেতর অনবরত ছুঁচ ফোটাতে লাগল।

কনক বলে যাচ্ছে, 'আমি অরুণকে এ সব ঝঞ্ঝাট করতে বারণ করেছিলাম। ও কিছুতেই শুনলে না; বললে তোমার আগের বিয়েটা বিয়ে না, এটাই আসল বিয়ে। আর বিয়ে যখন হচ্ছে তখন বিয়ের মতোই হোক। অরুণের ইচ্ছেকে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। ওর পাল্লায় পড়ে, বুঝলি বকুল, আমি একেবারে গোল্লায় গেছি।'

আমার মধ্যে রৌদ্রছায়ার মতো কনক সম্বন্ধে ঈর্ষা আর সহানভূতির খেলা চলছিল। মাঝে মাঝে ঈর্ষাটাকে পোকার মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলছিলাম, তখনই কনকের প্রতি সুতীব্র ভালবাসায় আমার মন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। খুব আন্তরিক গলায় বললাম, 'এমন গোল্লায় গিয়েও সুখ, না কি বলিস কনক?'

চোখেব তারা কয়েক পলক স্থির রেখে হঠাৎ হেসে ফেলল কনক, 'তা যা বলেছিস ভাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'ভেবেছিলাম, বেজিস্ট্রি করে বিয়েটা হল দু'তিন শ টাকায় সেরে ফেলব। তা না, প্যাণ্ডেল খাটাও, পুরুত ডাক, শাঁখ বাজাও—অরুণেব জন্যে চারটে হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কে যে ক'টা টাকা জমিয়েছিলাম সব শেষ।'

'ভালই তো—'

'ভাল না হাতি। জানিস অরুণটা আরো কী কাণ্ড করেছে?'

'কী?'

'জোর করে আমার যত আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নেমন্তন্ন করিয়েছে।'

কনকের প্রতিটি কথায় একবার করে 'অরুণ' এসে পড়ছে। প্রথমে আমার মনে হল, মেয়েটা কি দারুণ হ্যাংলা; বিয়ের নামে কেমন ডগমগ হয়ে উঠেছে। তারপরেই ভাবলাম, আহা ও সুখী হোক। আগের বিয়েটা ওর বড় দুঃখের, বড় গ্লানির। জীবনের এই অবেলায় পৌঁছে অরুণের মতো একটা সরল চমৎকার ছেলেকে পেতে চলেছে; কনক তো একটু উচ্ছ্বসিত হবেই। সেটাই তো একান্ত স্বাভাবিক। আচমকা কী মনে পড়ে যেতে কনক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ও, ভাল কথা, তোর নেমন্তন্নের কার্ডটা দিচ্ছি—' বলেই একটু থেমে কী ভেবে নিল, 'আচ্ছা, এখন থাক। তোর বিজনচন্দ্র টিফিনে আসেছ তো?'

'আসবার কথা আছে।'

তখন কার্ড দেব।

আমি চুপ করে থাকলাম।

টিফিনের সময় আর সব দিনের মতো আজও বিজন এসে হাজির। আমরা তিনজনে—বিজন, কনক আর আমিও কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে চলে গেলাম।

কনক তার ব্যাগ থেকে নেমন্তন্নের চিঠি বার করে খামের ওপর গোট গোটা অক্ষরে বিজন আর আমার নাম লিখল। কার্ডটা বিজনের হাতে দিয়ে বলল, 'পরশু বিয়ে, যুগলে যাবেন।'

বিজন এক পলক আমাকে দেখল। তার চাউনির মধ্যে যা ছিল, বুঝতে অসুবিধে হল না। অর্থাৎ হাঁদা মেয়ে—দেখ, ভাল করে নিজের বন্ধুকে দেখ। তারপর দ্রুত কনকের দিকে ফিরে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশনস—'

কনক গর্বিত সুখী মানুষের মতো হাসল, 'পরশুদিন কিন্তু সকাল বেলাতেই আপনাদের আসা চাই।'

বিজন একটু চিন্তা করে বলল, 'বেলা দুটোর আগে তো অফিস কাটতে পারব না। বকুল বরং আগে চলে যাবে—আমি অফিস থেকে যত তাড়াতাড়ি পারি যাব।'

'আচ্ছা—'

কনকের বিয়েটা দারুণ হইচই হুল্লোড়ের মধ্যে কাটল। বিজন আর আমি আমার প্রিয় সখির বিয়েতে খুব খাটলাম।

সে রাতে আর বাড়ি ফেরা গেল না, কনক কিছুতেই আসতে দিল না।

বিয়ে বাড়ির খাওয়া-দাওয়া চুকতে চুকতে একটা-দেড়টা বেজে গিয়েছিল। অত রাত্তিরে কোথায় ট্রাম, কোথায়ই বা বাস! ট্যাক্সি হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মতো একটা মেয়ের পক্ষে ওই সময় একা একা রাস্তায় বেরুনো কি সম্ভব? বিজনকে বললে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে সে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু এত রাতে তাকে আর টানাটানি করতে ইচ্ছা করল না। বাকি রাতটুকু কনকের বাসরে জেগেই কাটিয়ে দিলাম।

আমি একাই না, কনকের বাসরে আমাদের অফিসের আরো দু তিনটে মেয়ে—স্টেলা, মঞ্জু, অতসীও থেকে গিয়েছিল।

এটা কনকের দু নম্বর বিয়ে হলেও হই-হুল্লোড়-আনন্দ বেশ জমেছিল। মঞ্জু আর অতসী হারোমোনিয়াম বাজিয়ে ক'টা মজাদার গান গাইল; স্টেলা সেই গানের সঙ্গে কোমর বাঁকিয়ে বাঁকিযে নাচল। জোর করে ওরা আমাকে দিয়েও তিনটে গান গাইয়ে ছাড়ল। তবে আমি রগড়ের গান, আমোদের গান তেমন জানি না। আমি গাইলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদের গান।

বিজনও অত রাত্তিবে বাড়ি ফিরতে পারে নি; কনকেদর বাড়িতে তাকেও থেকে যেতে হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের তলায় তিন চারটে টেবল জোড়া দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু দমদমেব এদিকটায় এত মশা যে কাব সাধ্য শুয়ে থাকে। বাকি রাতটা সিগারেট খেযে আর মাঝে মাঝে বাসরঘরে উঁকি দিয়ে কাটিয়ে দিতে হয়েছে তাকে।

কম করে আট দশ বার সে বাসরঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ করেছি, যখনই বিজন এসেছে, পলকহীন স্থির ঝকঝকে চোখে কনকের দিকে তাকিয়ে থেকেছে; তারপর একপলক আমাকে দেখেই চুপচাপ ফিরে গেছে।

পরদিন ভোরবেলা, রোদ উঠবার আগেই বিজন আর আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। কনক চা'টা খেয়ে যাবার জন্য বার বার বলল।

আমি বললাম, 'এখন আটকাস না ভাই। বাড়িতে না বলে সারা রাত কাটিয়ে গেলাম। সবাই নিশ্চয়ই খুব ভাবছে।'

'আহা, চা খেয়ে গেলে কী আব এমন দেবি হয়ে যেত।'

কনকের দু'হাত ধরে বললাম, 'প্লিজ, আজ আর না।'

কনক আর জোর করল না। বলল, 'বৌভাতের দিন আসছিস নিশ্চয়ই?'

'চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা না, আসতেই হবে।'

ওদের বাড়ি থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত বিজন আর আমি নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটেঃ এলাম। বাস স্টপেজে এসে হঠাৎ বিজন বলল, 'তুমি কি এখন বাড়ি যাবে?'

বললাম, 'না হলে আর কোথায় যাব?'

'আজ অফিসে যাচ্ছ?'

'না। রাত জেগেছি; দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে একটা ঘুম না লাগাতে পারলে নির্ঘাত মরে যাবে। তুমি অফিস যাচ্ছ?'

'যেতেই হবে। জরুরি কাজ আছে। চল ভবানীপুর পর্যন্ত একসঙ্গে যাই। এখন আর বাড়ি গিয়ে চান

করে খেয়ে ঠিক সময় অফিসে আসতে পারব না। ভাবছি ভবানীপুরে নিখিলের বাড়ি চান-খাওয়াটা সেরে নোব।'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'চল আমাদের বাড়ি—' তক্ষুনি কট করে জিভে কামড় পড়ল যেন। কোথায় নিয়ে যেতে চাইছি বিজনকে!

বিজন আমার স্বামী; অথচ তাকে একদিনও আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারি নি। হঠাৎ আমার দু'চোখ জলে ভরে আসতে লাগল।

বাস এসে গিয়েছিল। এত সকালে তেমন ভিড়-টিড় নেই। আমরা একটা সিটে বসলাম। আমি জানালার ধারে, বিজন আমার পাশে।

এই বাসটা সোজা এসপ্ল্যানেডে যায়; সেখান থেকে আবার বাস বদল করতে হবে।

কাছাকাছি বসে আছি ঠিকই, কিন্তু গাড়িতে উঠবার পর কেউ একটা কথাও বলিনি।

বাসটা দমদমের রাস্তা থেকে যখন বি. টি রোডে এসে পড়ল সেই সময় বললাম, 'কনকের বিয়েটা বেশ কাটল।'

বিজন অন্যমনস্কের মতো বলল, 'হুঁ—'

আমি আবার বললাম, 'দারুণ আনন্দ হল—'

বিজন আগের মতোই বলল, 'হুঁ—'

'মেয়েটা এবার সুখী হবে।'

'হুঁ—'

আমি সমানে বকে যাচ্ছি আর বিজন একই রকম হুঁ-হুঁ করে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, বিজন কিছু ভাবছে। তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তারপর বললাম, 'কী হয়েছে তোমার, কী অত চিন্তা করছ?'

বিজন সোজা আমার চোখের দিকে তাকাল, 'একটা কথা ভেবে দারুণ মজা লাগছে।'

'কী কথা?'

'বলব?'

'না বলবার কী আছে—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'কাল রাত্তিরটা কেমন চমৎকার কনকদের বাড়ি কাটিয়ে এলে!'

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম, 'বা রে, খেতে খেতে অত রাত হয়ে গেল। তখন কি বাড়ি ফেরা যায়? তা ছাড়া কনকরা অত করে বললে—'

বিজন বলল, 'বন্ধুর বিয়ের সময় বেশ পারলে। অথচ নিজের বিয়েতে একটা রাত — মোটে একটা রাত বাইরে কাটিয়ে আসতে তোমার আপত্তি। বাড়ির কথা তুলে কত রকমের ভ্যানতাড়া। ফিরে না গেলে এ ভাববে, ও ভাববে। কাল কেউ ভাবে নি?'

বিজনের আক্রমণটা আচমকা এদিক থেকে এসে পড়বে, ভাবতে পারি নি। প্রথমটা দারুণ হকচকিয়ে গেলাম; কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

চাপা তীব্র গলায় বিজন বলতে লাগল, 'সুধাময়, সুধাময়ের বউ কত করে সেদিন বলল, আমি বললাম। কারো অনুরোধ রাখা তুমি প্রয়োজন মনে করলে না। আশ্চর্য।'

বাসের ভেতর ভিড়-টিড় তেমন না থাকলেও, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আট দশজন বসে ছিল। কেউ কি বিজনের কথা শুনছে? দ্রুত চারপাশটা একবার দেখে নিলাম। তারপর বিজনের দিকে তাকালাম।

বিজনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, গলার কাছটা দারুণ কাঁপছে। তাকে খুব অস্থির আর উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন এবং আমিও জানি, খুব সঠিক কারণেই বিজন আমার ওপর ক্ষুব্ধ হতে পারে, রাগ করতে পারে। কিন্তু আমার কথাটা আপনারা একবার ভেবে দেখুন।

করুণ মুখে আমি বিজনকে বললাম, 'তুমি রাগ করছ; কিন্তু কী করব বল—'

বিজন আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'কাল তোমার বন্ধুর বিয়ে দেখতে দেখতে আমি একটা ডিশিসানে এসে গেছি।'

'কিসের ডিশিসান?'

'এখন বলব না।'

বিজনকে এবার গোঁয়ারের মতো দেখাচ্ছিল; আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

একসময় বাস এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে গেল।

* * *

বিয়ের পর কনক চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আমার পাশের সিটটা এখন ফাঁকা। নতুন কেউ না আসা পর্যন্ত ওটা ফাঁকাই পড়ে থাকবে।

কনকের শূন্য জায়গাটার দিকে তাকিয়ে সেই পুরনো হিংসেটা আমাকে পোড়াতে থাকে।

যাই হোক, চাকরি ছেড়ে দেবার পরও দু'চার বার অফিসে এসেছিল কনক। কিন্তু গেল সপ্তাহ থেকে আর আসছে না; সে তার স্বামীর সঙ্গে লন্ডন চলে গেছে।

এয়ার পোর্টে সি-অফ করবার জন্য কনক আমাকে আর বিজনকে যেতে বলেছিল; কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

কনকের বিয়েটা আমার কাছে দারুণ এক চমকের মতো। কোত্থেকে হুট করে ওর পিসতুতো বোনের দেওর এল, প্রেম করল, তারপর আকাশে উড়ে কোন লন্ডনে উধাও হয়ে গেল।

আর আমি? দশ বছর পর কোনোরকমে বিয়েটা যদিও বা করতে পেরেছি, কিন্তু স্বামীর কাছে গিয়ে থাকতে পারছি না।

আয়নায় নিজের ছায়া দেখতে দেখতে একেক সময় আমি হেসে ফেলি। হাসি আর বলি, 'হা রে বকুল!'

কনকের বিয়ে হয়েছিল পুজোর কিছু আগে। দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এল যেমন, তেমনি চলেও গেল।

পুজোর পর হঠাৎ পর পর চার দিন বিজনের দেখা নেই। বাইরে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট না থাকলে রোজ আমার অফিসে ওর আসাটা একটা নিয়মের মতো। যদি কোনো কারণে আসতে না পারে, আগে থেকে জানিয়ে দেয়।

এবার কিন্তু কিছুই জানায় নি বিজন। হঠাৎ কী এমন হতে পারে যে পরপর চারদিন খবর নেই? ও কি অসুস্থ হয়ে পড়ল?

বিজনের অফিসে খোঁজ নিয়েও কিছু বুঝতে পারছি না। ওরাও কিছু জানে না। নিউজ ডিপার্টমেন্টে ফোন করলে ওরা বলে, 'বিজন সান্যাল আসে নি।'

'ছুটি টুটি নিয়েছে?'

'না।'

'কবে আসবে বলতে পারেন?'

'না।'

বিজনের বন্ধুদের ফোন করে লাভ হল না; তারাও কিছু বলতে পারল না। মাঝখান থেকে আমার দুশ্চিন্তাটা ওদের কাঁধেও চাপল।

চারদিন একটা লোকের খবর নেই। আমি দারুণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। মনে মনে স্থির করে ফেললাম, কাল আর আর অফিসে আসব না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সোজা বিজনদের বাড়ি চলে যাব।

কিন্তু যেতে আর হল না। চারদিন পর আজ অফিস ছুটির খানিকটা আগে হঠাৎ বিজনের ফোন এল।

চারদিন পর ওর গলা শুনতে পেয়ে আমার বুকের ভেতর দিয়ে সিরসিরিয়ে স্রোতের মতো কি খেলে গেল। রাগও হল খুব। সেই সঙ্গে গাঢ় আবেগের মতো কিছু একটা আমাকে তোলপাড় করে ফেলতে লাগল। ফোনটা ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। বিজন সমানে চেঁচিয়ে যেতে লাগল, 'হ্যালো—হ্যালো—'

একসময় রুদ্ধ গলায় বললাম, 'তুমি আশ্চর্য লোক—'

'কিরকম?'

'আমার কথা ভাবো?'

'তুমিই কি আমার কথা ভাবো?'

বিজন কী বলতে চায়, বুঝেছি। অবুঝ বালিকার মতো জোরে জোরে মাথা নেড়ে আমি বলতে লাগলাম, 'চার-চারদিন ডুব দিয়ে রইলে। খবর নেই, খোঁজ নেই। একটা লোক যে তোমার কথা চিন্তা করতে পারে তা একবার ভাবোও নি।'

'ভেবেছি বাবা, ভেবেছি।'

'ছাই ভেবেছ। এক নম্বরের দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ তুমি।'

বিজন হাসতে লাগল, 'ঠিক আছে, আমি এক নম্বরের দায়িত্বজ্ঞানহীন—'

রাগে আমার গা জ্বলে যেতে লাগল। বললাম, 'কোত্থেকে ফোন করছ?'

'শ্যামবাজার পোস্ট অফিস থেকে।'

'আজ অফিসে এসেছিলে?'

'না। একটানা পাঁচদিন ডুব দিলাম।'

'চাকরিটা থাকবে তো?

'বোধহয় থাকবে। আমার পুরো তিন মাস পি এল পাওনা আছে। যাকগে, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

ইচ্ছে করছিল, বিজন আজই চলে আসুক। মুখে বললাম, 'কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আছে কি নেই সে আমি বুঝব।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

বিজন আবার বলল, 'কাল হাফ ডে ছুটি ম্যানেজ করতে পারবে?'

'কেন?'

'খুব জরুরি দরকার আছে।'

'দরকারটা কী?'

'অত জেরা কোরো না তো।'

'বেশ, করলাম না। কিন্তু টিফিনের আগে ছুটি নিতে পারব না; হাতে অনেক কাজ জমে আছে।'

'টিফিনের পর নিলেই চলবে।'

'চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা না; নিতেই হবে। আমি কাল টিফিনের সময় আসছি। আচ্ছা এখন ছাড়ি।'

পরের দিন টিফিনের সময় বিজন এল। বলল, 'ছুটি নিয়েছ?'

দারুণ গম্ভীর মুখে বললাম, 'নিয়েছি।'

ঘাড় কাত করে আমাকে দেখতে দেখতে রগড়ের গলায় বিজন বলল, 'ও ফাদার, মুখটাকে অমন হেড মিস্ট্রেসের মতো করে আছ কেন?'

বিজনের বলার ধরনে হেসে ফেললাম, 'খুব হয়েছে। এখন বল হাফ-ডে ছুটি নিতে বলেছিলে কেন?'

'চল্লিশ মিনিট পর বলব।'

'না, এখনই বল।'

'চল্লিশটা মিনিট ধৈর্য ধরতে পারবে না? কি মেয়ে রে বাবা! এখন চল—'

'কোথায়?'

'চলই না—'

অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকল বিজন। আমি অবাক। বললাম 'কী ব্যাপার বল তো?'

বিজন বলল, 'আগে ওঠ, পরে বলছি।'

বিজনের আজকের কথাবার্তা, আচরণ—সবই রহস্যপূর্ণ। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বিজন আবার তাড়া দিল, 'কী হল, উঠে পড়—'

প্রায় বিমূঢ়ের মতো ট্যাক্সিতে উঠলাম। বিজন ট্যাক্সিওলাকে বলল, 'ভি আই পি রোজ চলুন—'

ট্যাক্সি নেতাজি সুভাষ রোডের বাঁক ঘুরে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দিয়ে বউবাজার স্ট্রিটে এসে পড়ল।

আমার বিস্ময় কাটছিল না। বললাম, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

বিজন বলল, 'ফিউ মিনিটস ওললি; তারপর নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

বিজনের হেঁয়ালী ভাল লাগছিল না। বিরক্ত ঝাঁঝালো গলায় বললাম, কেন, এখন বললে কী ক্ষতি হবে?'

'সারপ্রাইজটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমি মুখ ভার করে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। বিজন তার চোখেমুখে কৌতুক মেখে হেসে হেসে অনেক কথা বলতে লাগল। আমি কিন্তু তার দিকে তাকালামও না, একটা কথারও উত্তর দিলাম না।

আধঘণ্টা লাগল না, ভি আই পি রোডের পাশে গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের বাড়িগুলোর কাছে আমরা পৌঁছে গোলম। একই মাপের একই ধরনের সারি সারি অসংখ্য বাড়ি।

বাড়িগুলোর একটা ফ্ল্যাটও খালি নেই বোধহয়। ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে জানালায় জানালায় কৌতূহলী মুখ উঁকি দিতে লাগল।

বললাম, 'এখানে কী?'

বিজন বলল, 'প্লিজ আর এক মিনিট—'

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে আমাকে-নিয়ে সামনের একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল বিজন। ওর সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠলাম। উঠেই চোখে পড়ল, ডান ধারের ফ্ল্যাটটায় তালা ঝুলছে।

বিজন পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলে ফেলল। তারপর আমার দিকে ফিরে কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে হাত-পা নেড়ে বলল, 'স্বাগতম—'

বিস্ময়টা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। বিজনেব সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। বাড়িগুলো একেবারে আনকোরা। ঢুকতেই দেওয়ালের গা থেকে হোয়াইট ওয়াশের এবং দরজা-জানালা থেকে টাটকা পেইন্টের গন্ধ নাকে এসে লাগল। বললাম, 'এটা কার ফ্ল্যাট?'

বিজন বলল, 'আগে সবটা ভাল করে দেখে নাও, তারপর বলছি।'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত ফ্ল্যাটটা আমাকে দেখাল বিজন। মোট আড়াইখানা ঘর। দু'খানা বেশ বড়, একটা ছোট। তাছাড়া স্টোর, কিচেন, রাথরুম। বড় ঘর দুটো চমৎকার—দুটোই সাউথ ফেসিং।

ফ্ল্যাটটা একবোরে ফাঁকা; আসবার-টাসবাব কোথাও কিছু নেই।

সব দেখানো হলে বিজন শুধলো, 'কেমন দেখলে?'

'খুব ভাল।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'তার মানে?'

'মানে টানে ছাড়। পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বলো।'

'যদি হয়ই, তাতে কী?'

'তাহলে এই ফ্ল্যাটটা নেওয়া সার্থক।'

বললাম, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ফ্ল্যাটটা করা?'

আমার কাঁধে আলতো করে টোকা মেরে বিজন বলল, 'একেবারে হাঁদারাম। বলে না দিলে কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না। আরে বাবা, ফ্ল্যাটটা তোমার আর আমার। সংসার-ফংসার করতে গেলে বাড়িঘর লাগে তো?'

আমার বুকের ভেতর স্রোতের মতো সিরসিরিয়ে কী খেলে যেতে লাগল। বললাম, 'ফ্ল্যাটটা কবে নিয়েছ?'

'কাল। তোমার বন্ধু কনকের বিয়ের দিনই মনে মনে ডিসাইড করেছিলাম, আর এভাবে চলে না। একটা ফ্ল্যাট নিতেই হবে। ফ্ল্যাট নিলে আমার কাছে আসার চাড় হবে তোমার।'

'আহা, তোমার কাছে আসার ইচ্ছে যেন আমার নেই!'

'দেখশুনে তো তা-ই মনে হয়।'

ঘাড় বাঁকিয়ে বললাম, 'তোমায় বলেছে!'

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'চারটে দিন ফ্ল্যাটটার জন্যে পাগলের মতো ছোটাছুটি করেছি। কালই সবে পজেসান পেয়েছি।'

'এই জন্যেই বুঝি এ ক'দিন ছুটি নিয়েছিলে?'

'রাইট।'

'ফ্ল্যাট নেবে। কই, আমাকে আগে কিছু বলনি তো?'

'সারপ্রাইজ দেব বলে চেপে রেখেছিলাম।'

'আমার কাছেও সারপ্রাইজ!'

বিজন হাসতে লাগল। আর আমার বয়স যে তিরিশ তা একবারেই ভুলে গেলাম। হঠাৎ কোনো জাদুকর আমাকে যেন সুখী আদুরে অস্থির এক কিশোরী করে দিল। দৌড়ঝাঁপ করে একবার এ ঘরে যাই, একবার ও ঘরে। আর চেঁচিয়ে বলতে থাকি, এখানে খাট পাতব, ওখানে সোফা, সেখানে আলমারি; এই ঘরটা হবে আমাদের বেড রুম, ওইটা ড্রইং রুম। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফোটো টাঙাওব, ও দেয়ালে সুন্দর দৃশ্যওলা একটা ক্যালেণ্ডার। তাকগুলোতে কবিতার বই সাজানো থাকবে। বাইরের ঘরের এককোনে অ্যাকুয়েরিয়ামে লাল-নীল মাছেরা খেলা করবে।

বিজন মাঝে মাঝে আপত্তি করছিল, 'না-না, সোফাটা এভাবে না রেখে ওভাবে রাখলে, রবীন্দ্রনাথের ছবি এ দেওয়ালে না টাঙিয়ে ও দেওয়ালে টাঙলে দেখতে ভাল হবে।'

বিজন বাধা দিলেই কোমর বেঁধে চোখ পাকিয়ে ওর সঙ্গে কপট কলহে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলাম, 'চুপ কর তো। ঘর সাজানোর তুমি বোঝো কী? ওটা আমার ব্যাপার; সেখানে নাক গলাতে এস না।'

মুখ কাঁচুমাচু করে বিজন বলছিল, 'ঠিক আছে বাবা, আর একটা কথাও বলব না।' কিন্তু তারপরেই আবার ফোড়ন কেটে উঠছিল। আমিও রুখে দাঁড়াচ্ছিলাম। ঘর সাজানো নিয়ে আমাদের মধ্যে এক মজার খেলা চলছিল।

একসময় বিজন খুব রগড়ের গলায় বলল, 'চমৎকার!'

আমি ওর চোখের ভেতরে তাকিয়ে বললাম, 'কী হল?'

দুই হাত উলটে দিয়ে বিজন বলল, 'খাট নেই আলমারি নেই, ড্রেসিং টেবল নেই, খালি হাতে আর কত ঘর সাজাবে!'

চোখ কুঁচকে বিজনের দিকে তাকালাম। তারপর হেসে ফেললাম।

বিজনও হাসতে লাগল।

দুপুরের একটু পর এই ফ্ল্যাটে এসেছিলাম। সারা বিকেল কাটিয়ে সন্ধের মুখে মুখে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে বিজন বলল, 'মাথা গোঁজার একটা জায়গা পেয়ে গেছি। ওদিকে মায়েরও একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করি, এবার তুমি আমি একসঙ্গে থাকতে পারব।'

'মায়ের কী ব্যবস্থা করলে?'

'তোমাকে মেন্টাল হসপিটালের কথা বলেছিলাম না?'

মনে পড়ে গেল। বললাম, হ্যাঁ।'

বিজন বলতে লাগল, 'একটা হসপিটালে মায়ের জন্য সিট পেয়েছি। ওখানকার অ্যারেঞ্জমেন্ট ভালই। পুরশুদিন মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আচমকা আমার বুকে কাঁপন ধরল যেন। মায়ের ব্যবস্থা যখন করে ফেলেছে, তখন বিজনকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না; আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবেই। একটু ভেবে বললাম, 'তোমার ভাগনের সেই চাকরিটা হয়ে গেছে?'

'এখনও হয় নি; তবে হয়ে যাবে।' একটু চুপ করে থেকে কী ভেবে বিজন আবার বলল, 'তোমার ফ্যামিলিতে যে জট-টটগুলো আছে, ছাড়িয়ে নাও। ভাগনের যেদিন চাকরি হবে, তার পরদিনই কিন্তু তোমাকে আমার কাছে চলে আসতে হবে।'

আস্তে বললাম, 'আচ্ছা।'

একসময় এসপ্ল্যানেডের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বিজন চলে গেল। তারপর পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে হল না; শহরতলির বাস আমাকে টুক করে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুট লাগাল।

জানালার ধারের একটা সিটে বসে ছিলাম। দু পাশের বাড়িঘর, মানুষজন এবং অন্যান্য দৃশ্য পলক পড়তে না পড়তেই সট সট বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি সে-সব কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার সামনে ভি আই পি রোডের পাশে গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের সেই ফ্ল্যাটটা ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বপ্নের মতো সেটা আমার চোখে জড়িয়ে আছে।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে বাস থেকে নামলাম। কয়েক মিনিট পর বাড়িতে পা দিতেই প্রথমে দেখতে পেলাম নীলিমাকে, তারপর নির্মলকে। নীলিমা বারান্দায় বসে ভারতীর সঙ্গে গল্প করছে। আর নির্মল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সৎ-মাকে কী বলছে। সৎ-মা রয়েছে রান্নাঘরের ভেতরে; নির্মল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

ন'টার সময় যখন অফিসে বেরুই নীলিমারা ছিল না; আমি যাবার পর এসেছে। তার মানে এখন নির্মলের কোনো কাজ নেই। বেকার হলেই বউ নিয়ে নির্মল এখানে চলে আসে।

ওদের এ বাড়িতে আসাটা এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়; বেশির ভাগ মাসের অর্ধেক দিনই তো ওরা এখানে থেকে যায়।

চোখাচোখি হতেই নির্মল হাসল। আমিও হাসলাম, 'কখন এসেছ?'

'খানিকক্ষণ আগে।'

উঠোন থেকে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললাম, 'ভাল আছ তো?'

'আছি আর কি।'

'তোমাদের বাড়ির খবর ভাল?'

'ওই একরকম।'

বারান্দায় উঠে এলাম। নীলিমা গল্প বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফাঁক পেতেই বলল, 'তোর ফিরতে এত দেরি হল দিদি?'

অফিস থেকে সাড়ে ছ'টা সাতটার ভেতর রোজই ফিরে আসি। ফ্ল্যাট দেখতে যাবার জন্য আজ ঘণ্টা দুয়েকের মতো দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। যা বললাম এই, 'এসপ্ল্যানেডের ওদিকে কী গোলমাল হয়েছে; বাস পেতে দেরি হয়ে গেল। তাই—' বলেই ওদের পাশ দিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম।

তারপর অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে সৎ-মায়ের কাছ থেকে এক কাপ চা নিয়ে আমার নিজের ঘরে এসে সবে বসেছি, নির্মল এল।

নির্মল ছেলেটা খুবই বিনয়ী, ভদ্র। ওকে আমার ভালই লাগে। বললাম, 'বোসো—'

একটু দূরে কুণ্ঠিতভাবে বসল নির্মল। তারপর আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। এক পলক ওকে দেখলাম। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'কিছু বলবে?'

অস্পষ্ট গলায় নির্মল বলল, 'হ্যাঁ।'

'বল না—'

'আপনি যদি সাহস দেন—'

একটুক্ষণ থমকে রইলাম। তারপর বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি বল—'

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকল নির্মল; খুব সম্ভব বক্তব্যটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিল। তারপর কাঁচুমাচু করুণ মুখে যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। নির্মল যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত সেটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আগে তবু মাসে দিন পনের সে কাজ পেত। এখন পুরোপুরি বেকার। কাজ নেই, তাই রোজগারও নেই। তার ফল হয়েছে এই, নির্মলের বাবা ছেলে এবং ছেলের বৌকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নির্মল বলতে লাগল, 'এখানে এসে শ্বশুর-শাশুড়িকে সব বললাম। ওরা আপনাকে জানাতে বলল। যদ্দিন না আমার একটা কিছু হচ্ছে, আমাকে বাঁচান দিদি। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো ভরসা নেই।'

শুনতে শুনতে আমার মাথায় বন বন করে কয়েক চক্কব নাগরদোলা ঘুরে গেল।

যার যত দায়, যার যত সমস্যা যদি ক্রমাগত আমার ঘাড়ে চাপতে থাকে, কোনোদিনই তো এ সংসাব থেকে বেরুতে পারব না। হঠাৎ নির্মলের ওপর ভীষণ রাগ হয়ে গেল, কিন্তু তার ভীত অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না।

* * *

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ঘরের মেঝেতে বিছানা পাততে পাততে চোখের কোন দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল গণেশ আর ঠোঁট টিপে টিপে অদ্ভুত হাসতে লাগল।

ভুরু বাঁকিয়ে বললাম, 'কী দেখছিস?'

গণেশ বলল, 'তোকে।'

'আমাকে দেখবার কী আছে? আগে কোনোদিন দেখিস নি?'

'আগের দেখা আর আজকের দেখায় তফাত আছে।'

বুকের ভেতবটা ধক করে উঠল। তবে কি বিজনের সঙ্গে আমাকে কোথাও দেখেছে গণেশ? দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে একটু থতিয়ে থেকে বললাম, 'তফাত! তার মানে?'

গণেশ আগের মতোই হেসে যাচ্ছে।

ধমকের গলায় এবার বললাম, 'হাসছিস যে?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে গণেশ বলল, 'তোর মতো হ্যাপি মানুষ আমি দেখিনি দিদি।'

'কিরকম?'

'এই দ্যাখ না, আমরা তো তোর ঘাড়ে আগেই বিশ টন ওয়েট চাপিয়ে বেখেছি। তার ওপর বাচ্চুটা একটা ছুঁড়িকে এনে তুলল। তারপর আজ নীলি আর নির্মল এসে জুটেছে। ওরাও তোর ধর্মশালায় পার্মানেন্ট গেস্ট, বুঝলি?'

'নির্মলদের ব্যাপারটা তুই তাহলে শুনেছিস?'

'নিশ্চয়ই। সন্ধেবেলা একবার বাড়িতে এসেছিলাম; তখনই সব শুনে গেছি। তখন থেকেই ভাবছি, দিদিটার সুখের সাগরে একেবারে বান ডেকে যাবে। সত্যি দিদি, তোর মতো অবস্থা হলে আমি কী করতাম জানিস?'

অন্যমনস্কের মতো বললাম, 'কী?'

'কবে স্টকে পড়তাম। আর নইলে—'

'নইলে কী?'

'গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়তাম।'

*　　　*　　　*

আমার একদিকে বাবা, সৎ-মা, তিন ভাই, নীলিমা, নির্মল ভারতী—অর্থাৎ একগাদা মানুষের দায়। আরেক দিকে বিজন এবং গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের ছিমছাম নিরিবিলি এই ফ্ল্যাটে নিজস্ব একটি সংসার। দুই বিরুদ্ধে পক্ষ আমাকে দুই বিপরীত দিকে টানাটানি করে চলেছে।

আজকাল যতক্ষণ বাড়িতে থাকি, সব সময়ই আমি ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট। মনে হয়, বাড়িসুদ্ধ এতগুলো লোক চক্রান্ত করে আমাকে আটকে রেখেছে। এরা অত্যন্ত নীচ, ইতর, স্বার্থপর। আমার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে ভাবে না। আমার সুখ-সাধ, শখ-আহ্লাদ এদের জন্য সেই কবে থেকে বিসর্জন দিয়ে বসে আছি।

শুধু দাও, দাও আর দাও। চুষে চুষে আমার সবটুকু রক্ত বার না করে এরা ছাড়বে না। আমি চলে যাব, চলেই যাব। এদের সাজানো নিপুণ ফাঁদ কেটে নিশ্চয়ই পালাব। ওরা কিছুতেই আর আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।

কিন্তু যখনই প্রতিজ্ঞা করি চলে যাব, সেই প্রতিজ্ঞাটার পাশাপাশি ছায়ার মতো আরেকটা কথা মনে পড়ে যায়। আমি গেলে এদের কী হবে? কে দেখবে এতগুলো লোককে? তখন আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ি।

ওদের কথাই আমি শুধু ভেবে মরি; ওরা কিন্তু আমার কথা ভাবে না।

যাই হোক, আজকাল প্রায় সারাদিনই গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের সেই ছোট ছিমছাম ফ্ল্যাটটা আমাকে দুরন্ত আকর্ষণে টানতে থাকে।

আপনাদের কাছে কত কথাই বলেছি। আরো একটা কথাও বলি। আজকাল টিফিনের সময় কোনো কোনো দিন বিজনের সঙ্গে সেই ফ্ল্যাটটায় চলে যাই। ছুটির দিনগুলোতে তো কথাই নেই, দু'জনে ওখানে কাটিয়ে দিই। যাই সকালে, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। বিজন টিফিন ক্যারিয়ারে করে হোটেল থেকে ভাত-মাংস কিনে আনে। গল্প করে করে দারুণ রঙচঙে ভবিষ্যতের একখানা ছবি আঁকতে আঁকতে দু'জনে এক পাতে বসে খাই।

দুটো যুবক-যুবতী প্রায়ই এই ফ্ল্যাটে আসে; ব্যাপারটা চারপাশের মানুষের কাছে সন্দেহজনক বৈ কি। আপনারা জানেন, যদিও আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমি কিন্তু সিঁদুর-টিঁদুর পরি না। কেন পরি না, তা-ও আপনাদের অজানা নেই।

হাউসিং স্কিমের অন্য সব ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা যাতে সন্দেহ না করে সে জন্য একটা চাতুরির আশ্রয় হয়েছে। এখানে এলে ট্যাক্সিতেই আসি; আমার ব্যাগে একটা সিঁদুরের কৌটো থাকে। ট্যাক্সিতে বসে টুক করে কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর পরে নিই। যখন গাড়ি থেকে নামি, কে বলবে বিজন আর আমি আলাদা আলাদা থাকি; ওর বউ হয়ে কতকাল ধরে যেন ঘর-সংসার করে আসছি। এখান থেকে চলে যাবার আগে বিজন আবার ট্যাক্সি ডেকে আনে। আসবার সময় সিঁদুর লাগাই, ফেরার সময় বিপরীত দৃশ্য। এবার সিঁদুর তোলার পালা। পরবার সময় আমার বুকের ভেতরটা খুশিতে ফুটন্ত দুধের মতো উথলায়, কিন্তু সেই সিঁদুর মুছবার সময় মনটা এত খারাপ হয়ে যায়! আপনারাই বলুন, হাজার হোক, আমি একটা মেয়ে তো।

এক আধদিন এই নিয়ে দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে যাই। ট্যাক্সির ড্রাইভারদের কেউ কেউ লক্ষ করে, তাদের গাড়িতে যখন উঠেছিলাম তখন আমি কুমারী মেয়ে; কিন্তু নামবার সময় বউ হয়ে গেছি। কিংবা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যে বউটি তাদের গাড়িতে উঠেছিল, নামবার সময়, কী আশ্চর্য, সে-ই কুমারী মেয়ে হয়ে গেছে।

ড্রাইভারেরা এই সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি কিন্তু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না; দ্রুত চোখ নামিয়ে সামনে থেকে ছুটে পালাই।

এই ফ্ল্যাটে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে আশেপাশের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে আছে এক বুড়ি; তাকে মাসিমা বলি। আরেকজন হচ্ছে একটি বউ; আমারই সমবয়সী; ছেলেপুলে নেই, দারুণ হাসিখুশি। থাকে আমাদের উলটোদিকের ফ্ল্যাটটায়। আর মাসি থাকে আমাদের পাশের ব্লকের একতলার ফ্ল্যাটে।

আমরা এলেই বুড়ি গুট গুট করে আমাদের তেতলার ফ্ল্যাটে চলে আসে। আমরা এখানে এসে থাকব, ঘর-সংসার পাতব, বুড়ি তাই নিজের হাতে একটা উনুন তৈরি করে দিয়েছে। এত সুন্দর উনুন আমি খুব কমই দেখেছি।

দেখা হলেই বুড়ি বলে, 'কবে আসছ তোমরা?'

অর্ধেক সত্যি অর্ধেক মিথ্যে মিশিয়ে আমি একই উত্তর দিয়ে যাই, 'তাড়াতাড়িই তো আসবার ইচ্ছে কিন্তু—'

'কী?'

'অনেক কেনাকাটা করতে হবে। সংসারের কোনো জিনিসই এখন পর্যন্ত কেনা হয় নি।'

'আরে বাপু, সব আগে কিনে কি কেউ সংসার পাততে পারে? একবার এসে ওঠ, দেখবে একটা দুটো করে সব কেনা হয়ে গেছে।'

আস্তে করে বলি, 'তা ঠিক। তবু—'

বুড়ি নিজের মনেই বলে যায়, 'কী নিয়ে তোমার মেসোমশাই আর আমি সংসার পেতেছিলাম জানো?'

'কী?'

'একটা তোলা উনুন, কলাই-করা দুটো থালা, সিলভারের হাঁড়ি, দুটো গেলাস, একটা বালতি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ রে মেয়ে, হ্যাঁ। তারপর হয় নি কী? কোন জিনিসটা কেনা বাকি থেকেছে? পাঁজা-পাঁজা কাঁসার বাসন, কাপ-প্লেট, খাট-পালং—' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় বুড়ি।

উলটোদিকের বউটাও আমাদের দেখলে ছুটে আসে। তারও একই কথা, 'কবে আসছেন ভাই?'

বউটির নাম শুভা; বেশ নাম। শুভাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমাকেও তার নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে। তার কাছে বিজন এবং আমার কথা অনেকখানিই বলে ফেলেছি। শুভাকে বলি, 'আমাদের কথা সবই তো জানেন। সব দিক গুছিয়ে গাছিয়ে আসতে হবে তো।'

'কবে গুছনো হবে?'

'দেখি—'

'দেখি বললে হবে না। শিগগির চলে আসুন। আপনি এলে যা আড্ডা দেব না?'

আমি হাসি, 'বেশ তো।'

শুভা কলকল করে অনেক কথা বলে যায়। আমি এলে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কী কী করবে তার লম্বা তালিকা শোনাতে থাকে।

একদিন ফ্ল্যাটে এসে বিজন বলল, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে বকুল।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, 'কী?'

বিজন বলতে লাগল, 'আমাদের তো এখানে এসে থাকতেই হবে। তার আগে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে ফেলি। মুখে মুখে না; সত্যি সত্যি জিনিস-পত্র দিয়ে। তুমি কী বল?'

তক্ষুনি সায় দিলাম।

বিজন বলল, 'অফিসে কিছু টাকা এরিয়ার পড়ে আছে; আসছে সপ্তাহে পেয়ে যাব মনে হচ্ছে। পেলেই একটা খাট কিনে ফেলব।' তারপর একটু ভেবে আবার বলল, 'রেডিমেড কিনব, না অর্ডার দিয়ে তৈরি করাব?'

'অর্ডার দিলেই ভাল হয়। তাতে পছন্দমতো করিয়ে নেওয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছ।'

বিজন যা টাকা পেল তাতে একটা খাট ছাড়াও চমৎকার এক সেট সোফা হয়ে গেল। ও সোফা-খাট কিনেছে, আমি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে লোন তুলে কিনলাম আলমারি আর ড্রেসিং টেবল। বাদ বাকি জিনিস ধারে নিয়ে এলাম; মাসে মাসে দু'জনের মাইনের টাকা থেকে কিছু কিছু শোধ করে দেব।

পাখির মতো খড়কুটো জড়ো করে করে কিছুদিনের মধ্যে দু'জনে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে ফেললাম।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে বিজন বলল, 'গৃহসজ্জা হল। মাকেও মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছি। ভাগনের চাকরিটা হয়ে গেলেই কিন্তু তোমাকে চলে আসতে হবে।'

এই সুসজ্জিত নিরিবিলি ফ্ল্যাটটা আমার অস্তিত্বের ভেতরটা উথাল-পাথাল করে দেয়। গাঢ় আবেগের গলায় বললাম, 'আসব আসব, নিশ্চয়ই আসব। আসবার জন্যে পা বাড়িয়েই তো আছি।

এক পলক তাকিয়ে থাকল বিজন; তারপর হাত বাড়িয়ে আমাকে তার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে হাজার চুমু খেয়ে চলল।

* * *

একদিন সকালবেলা দারুণ চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে দেখি, উঠোনের এককোনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারতী, বাবা বারান্দায় বসেন। আর সৎ-মা ভারতীর দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে উত্তেজিত হিংস্র ভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'লজ্জাও করে না; গলায় দড়ি দে মাগী, গলায় দড়ি দে।'

সৎ-মাকে কোনোদিন ভারতীকে গালগাল দিতে দেখি নি; সর্বক্ষণ সে শুধু বিষাক্ত কুটিল চোখে তাকিয়ে থাকত।

অবাক হয়ে বললাম, 'কী হয়েছে? মেয়েটাকে শুধু শুধু বকছ কেন?'

'শুধু শুধু?' সৎ-মা এবার আরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাল।

থতিয়ে গিয়ে বললাম, 'তবে?'

সৎ-মায়ের আঙুল ভারতীর দিকে বাড়ানোই ছিল। বলল, 'মাগীকে দ্যাখ কী কাণ্ড করে বাস আছে!'

ভারতীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, তার চোখের কোল বসে গেছে, সেখানে গাঢ় কালি। গাল ভেঙে হনুর হাড় ঠেলে উঠেছে। হাতের নীল শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে পাকিয়ে চামড়ার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পেটটা অনেকখানি স্ফীত। ভারতীর সারা গায়ে মা হবার লক্ষণ। গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের সেই ফ্ল্যাট আর তার সাজসজ্জা নিয়ে মাঝখানে এত মেতে ছিলাম যে ভারতীর এই পরিবর্তন লক্ষ করিনি।

সৎ-মা আবার চিৎকার করে উঠল, 'খচ্চর, বদমাইশ মাগী!

বাবা এতক্ষণ পলকহীন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ছিল; এবার একরোখা ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো উঠে দাঁড়াল, 'একখান পয়সা কামানোর নাম নাই, তাগো আবার পোলার শখ—'

সৎ-মা আর বাবার চিৎকারে গণেশ, হাবু নির্মল এবং নীলিমা আশপাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাচ্চুর সাড়াশব্দ নেই; খুব সম্ভব সে বেরিয়ে গেছে।

বাবা চেঁচিয়েই যাচ্ছিল, 'অমুন শখের মুখে আমি এই করি সেই করি।'

চারপাশের এতগুলো চোখের সামনে ভারতী কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল। তাকে বাজে-পোড়া একটা মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। ধমক দিয়ে বললাম, 'কী করছ এখানে দাঁড়িয়ে? যাও—ঘরে—'

মেয়েটা বেঁচে গেল যেন। কিংবা এতক্ষণ সে হয়তো অচেতন জড়স্তূপ হয়ে গিয়েছিল। এবার এক দৌড়ে দক্ষিণের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

অফিস যাবার আগে পর্যন্ত বাবা আর সৎ-মায়ের গজগজানি শুনতে লাগলাম। তারপর বাকি দিনটা কী বিশ্রী যে কাটল!

* * *

বিজন ভেবেছিল, ওর ভাগনের চাকরিটা তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। কিন্তু হতে হতে সাত আট মাস লেগে গেল।

এত দেরি হচ্ছে বলে মাঝখানে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল বিজন। প্রায়ই বলত, 'ভাগনেটার চাকরিও হবে না; তুমি আমি সঙ্গে থাকতেও পারব না। ফ্ল্যাট সাজানোই সার।'

আমি বলতাম, 'এত ভেঙে পড়ছ কেন? নিশ্চয়ই চাকরি হবে।'

'তুমি বলছ, আমি কিন্তু আর ভরসা পাচ্ছি না।'

যাইহোক, চাকরি হবার পর ছুটতে ছুটতে একদিন বিজন আমার অফিসে এসে হাজির। খুশিতে চোখমুখ জ্বলছে। প্রায় চেঁচিয়েই সে বলল, 'সব চাইতে বড় সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল। আসছে উইকে দিদিদের আলাদা বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি। ওরা চলে গেলেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব। মনে রেখো, নেক্সট উইক—' তাকে এত উচ্ছ্বসিত হতে আগে আর দেখিনি।

কয়েক দিনের মধ্যে বিজনের কাছে চলে যাব; আমার প্রাণে সুখের বান ডাকার কথা। কিন্তু তখনই পর পর বাবা, সৎ-মা, ভারতী, নির্মল, বাচ্চু-হাবু-গণেশ আর নীলিমার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। দ্বিধান্বিতের মতো বললাম, 'আচ্ছা—'

পরের সপ্তাহে কিন্তু বিজনের কাছে যাওয়া হল না। যেদিন যাবার কথা, তার আগের দিন বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল। চিরদিনই লো প্রেসার বাবার; সেটাই খুব একটা খারাপ দিকে বাঁক নিয়েছে। এখন বেশ কিছুদিন তাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে। তার ওপর যা দরকার তা হল দামী দামী ওষুধ আর ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য।

বিজনকে বাবার কথা জানিয়ে বললাম, 'এ অবস্থায় কী করে যাই?

বিজন খেপে উঠল, 'সব ব্যবস্থা করে ফেললাম; দিদিদের আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছি। এখন বলছ যাবে কী করে? এর কোন মানে হয়!'

'কী করব বল?'

'তোমার বাবা আর অসুস্থ হবার সময় পেলে না?'

বিজনের ছেলেমানুষিতে হেসে ফেললাম, 'অসুখ-বিসুখ হওয়া কি মানুষের হাতে?'

বিজন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার সুস্থ হতে কতদিন লাগবে?'

রোগটা সহজে সারবার নয়। ডাক্তার বলেছে কম করে তিনটে মাস বাবাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু সে কথা বিজনকে জানাতে সাহস হল না। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে।'

একটু চুপ করে থেকে বিজন বলল, 'আর দ সপ্তাহ তোমাকে সময় দিচ্ছি, তারপর কিন্তু কোনো কথা শুনব না।'

'আচ্ছা—'

বিজন দু সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। কিন্তু চারটে দিনও কাটল না, পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতরা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল সাধারণ নিরস্ত্র মানুষের ওপর। শুরু হয়ে গেল হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে শ্মশান হয়ে যেতে লাগল। তারপর লক্ষ লক্ষ ভীত অসহায় শরণার্থী সাতপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে লাগল সীমান্তের এপারে—পশ্চিম বাংলায়।

বিজন রোজই আসে। কিন্তু একদিন টিফিনের সময় সে এল না; ফোনে জানাল, 'আজ যেতে পারছি না।'

'কেন?'

'এক্ষুনি বর্ডারে যেতে হচ্ছে। ওপার থেকে নতুন রিফিউজি আসছে জানো তো?'

'হ্যাঁ, খবর কাগজে রোজই দেখছি।'

'অফিস থেকে আমাকে 'কভার' করতে পাঠাচ্ছে।'

'কবে ফিরবে?'

'কিছু ঠিক নেই। পাঁচ সাত দিনের আগে নিশ্চয়ই না।'

বিজন সেই যে গেল, তারপর ক'দিন আর খোঁজ নেই। তবে ও যে কাগজে কাজ করে তাতে ওর পাঠানো ছবি আর খবর রোজই দেখি। ছবি আর খবরগুলো যে ওরই তা বুঝতে পারি, কেননা তলায় লেখা থাকে :

'সীমান্ত থেকে স্টাফ রিপোর্টার বিজন সান্যাল পাঠিয়েছেন।

আট দশ দিন পর বিজন বর্ডার থেকে ফিরল; ফিরেই এল আমার অফিসে। তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। চুল উষ্কখুষ্ক, কণ্ঠার হাড় পেরেকের মতো ফুটে বেরিয়েছে। মুখময় কয়েকদিনের দাড়ি, চোখদুটো যেন রক্তের ডেলা। দেখেই টের পাওয়া যায়, এ ক'দিন ওর চান-খাওয়া ঘুম-টুম হয় নি। বললাম, 'শরীরের একী হাল করেছ!'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে বিজন বলল, 'দারুণ বিপদে পড়ে গেছি বকুল—'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠলাম, 'কী হয়েছে?'

'বর্ডারে ঘুরতে ঘুরতে একটা রিফিউজি ক্যাম্পে হঠাৎ দেখি বড় জ্যাঠামশাই আর তার ফ্যামিলি রয়েছে। পার্টিশানের পর জ্যাঠামশাই এপারে আসে নি; ওপারেই থেকে গিয়েছিল। সেই এল—আগেই যদি চলে আসত! সে যাক গে, আমাকে দেখে বুড়ো তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, এই ক্যাম্পে থাকতে পারবে না। কী আর করি, সবাইকে ওখান থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছি।'

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

বিজন বলতে লাগল, 'ভেবেছিলাম, তোমাকে এর মধ্যে আমার কাছে নিয়ে যাব, কিন্তু তা আর হল না। এখন যেমন চলছে চলুক। জ্যাঠামশাইদের একটা ব্যবস্থা করে তারপর না হয়—'

আমি বিষণ্ণ হাসলাম।

একটু চুপ করে থাকল বিজন। তারপর ক্লান্ত হতাশ গলায় বলল, 'কী ব্যবস্থাই বা করব। যা দিনকাল, কিছু করা সম্ভব নয়। সারা জীবনই হয়তো ওরা আমার ঘাড়ে বসে থাকবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি আমি বোধহয় কোনোদিনই একসঙ্গে থাকতে পারব না।'

কী বলব, ভেবে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পরে বিজন চলে গেল।

* * *

আমার মতো মেয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে একটা বিয়ে হয়তো করতে পারে, অফিস থেকে লোন-টোন তুলে মনের মতো করে ফ্ল্যাটও সাজাতে পারে, ছুটিছাটায় সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে সংসার-সংসার খেলতেও পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্বামীর কাছে গিয়ে থাকা আমার কোনোদিনই হবে না; সে পথে হাজার কাঁটা। বাচ্চু-হাবু-মা-বাবা-নীলিমা-নির্মল—সব মিলিয়ে যে মরণফাঁদ, তার বাইরে পালাবার উপায় নেই।

আমার বয়স এখন একত্রিশ। তার মানে জীবনের অর্ধেকটা তো কাটিয়েই ফেলেছি। বাকি দিনগুলোও এইভাবে কেটে যাবে। আপনারা কী বলেন?

আলোয় ফেরা

আকাশের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে সূর্যটা স্থির হয়ে আছে। কতক্ষণ আর, একটু পরেই পশ্চিমের ঢালু পাড় বেয়ে সোনালি বলের মতো সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে থাকবে।

শীতের এই দুপুর বেলায় চারদিকে রোদের ছড়াছড়ি। তবে সে রোদ মরা-মরা, মলিন। তার গায়ে ঘাড় বিষাদ যেন মাখানো।

আজ বেশ বাতাস আছে। শীতের বাতাস। এলোমেলো, প্রগলভ। কখনো উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটছে, কখনো পুবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি।

দু'মাস আগেও আকাশ ছিল আশ্চর্য নীল। পালিশ-করা আয়নার মতো ঝকঝক করত। শীত পড়তে না পড়তেই তার উজ্জ্বলতা নেই। কাচের ওপর ধুলোবালি জমলে যেমন দেখায়, শীতের আকাশ তেমনি ধূসর।

বাঁ দিকের খোয়া-ছড়ানো উঁচু-নিচু গলি থেকে বড় রাস্তায় এসে উঠল রাজা। স্কুল-টুলে পড়বার সময় আরো একটা জমকালো নাম ছিল তার—রাজকুমার সান্যাল। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচবার পর ওটাব ব্যবহাব আর নেই। অনেক দিন না শুনে শুনে রাজা হয়তো তার অত যত্নের নাম ভুলে গেছে।

বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যেই। পাতলা চেহারা। বেতের মতো নমনীয় অথচ দৃঢ়। নাকমুখ বেশ ধারাল। তবে গাল ভাঙা, চিবুক এবং কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়েছে। গায়ের রং একসময় ফর্সাই ছিল। এখন তামাটে। কপালে ডান ভুরুর ঠিক ওপরে একটা লম্বা কাটা দাগ। ঠোঁট দুটো সিগারেটের ধোঁয়ায় পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। চুলগুলো নিতান্ত অবহেলায় পেছন দিকে উলটে দেওয়া।

পরনে ময়লা চাপা প্যান্ট, কোমরের তলার দিকে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। ওপরে উলের জ্যাকেট, পায়ে আধ-পুরনো চটি।

বড় রাস্তাটা শহরের মাঝখান দিয়ে মেরুদণ্ডের মতো চলে গিয়েছে। দু'ধারে বাড়ি ঘর। ফাঁকে ফাঁকে পানাপুকুর, পচা ডোবা। কদাচিৎ এক-আধটা খাল। তাও কচুরিপানায় ঢাকা। খালের ওপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর মাথায় শঙ্খচিল ডানা মুড়ে চুপচাপ বসে রয়েছে।

বাড়ি-টাড়ি, ডোবা-পুকুর, কোনো দিকে লক্ষ্য ছিল না রাজার। বড় বড় পা ফেলে অন্যমনস্কের মতন সে হাঁটছিল।

এই দুপুর বেলায় রাস্তায় লোকজন খুব কম নেই আর মুখ বজেও তারা হাঁটছে না। তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানের পর্দায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে দু'চারটে লরি, প্রাইভেট কার, পেট্রোলের গাড়ি হুস করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। একবার তো একটা সাইকেল-রিকশা গায়ের ওপরেই এসে পড়েছিল; অন্য সময় হলে খিস্তি দিয়ে উঠত রাজা। শুধু কি খিস্তি, হাতও চালাত। কিন্তু এখন দাঁড়াবার সময় নেই।

দশটার ভেতর রমলাদি যেতে বলেছিল। এখন নিশ্চয়ই বারটা-টারটা হবে। তার মানে দু'ঘণ্টার মতো লেট।

ঠিক সময়েই পৌঁছে যেতে পারত রাজা। কিন্তু সকালবেলা ঝগড়া করতে করতে বৌদি হঠাৎ ফিট হয়ে গেল। তার জ্ঞান ফেরাতে একটা বেলা লেগেছে। বৌদির কথা মনে পড়তেই চাপা গলায় রাজা গজরালো, 'শালী, চোখ ওলটাবার আর সময় পেলে না! তোমার সংসারও টানব, আবার মাথায় জল ঢেলে হাওয়াও করতে হবে, যত ঝুট ঝামেলা।

রমলাদি ডেকে পাঠিয়েছে। রমলাদির ডাক আসা মানেই ক'টা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা। দু'ঘণ্টা পর গিয়ে হাজির হলে কী হবে, কে জানে! টাকাটা হয়তো এর ভেতর হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। বিরক্ত, ক্রুদ্ধ রাজা চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

কলকাতা থেকে বাইশ মাইল দূরে এই মফস্বল শহরটার নাম শ্যামনগর। তার সদরে রেল স্টেশন, অন্দরে নদী। আপ আর ডাউন মিলিয়ে দিনে তিরিশটা ট্রেন জায়গাটাকে ছুঁয়ে যায়।

কলকাতার এত কাছে, তবু শ্যামনগর যেন এ কালের শহর না, আদ্যি কালের কোনো নগরী। এখানকার সবই পুরনো। নোনাধরা বাড়িঘর, মন্দির, গীর্জা, সমস্ত কিছুর ওপরেই প্রাচীনত্বের শীলমোহর মারা। বড় রাস্তাটা বাদ দিলে এখানে সবই গলি, সাপের মতো, গোলকধাঁধার মতো। পাকিয়ে পাকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সেগুলো দিগ্বিদিকে ছুটে গিয়েছে।

দেশভাগের পর লোকজন অবশ্য বেড়েছে, স্টেশনের গা ঘেঁষে নতুন নতুন কলোনি বসেছে, নানা ধরনের বাড়িটাড়ি উঠেছে, তবু এ শহরে মাঠঘাট ফাঁকা জায়গাই বেশি। ভিড় কম। দুপুর বেলায় কান পাতলে ঘুঘুর ডাকও শোনা যায়, রাত্তিরে ঝিঁঝিদের একটানা করুণ বিলাপ।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা যেখানে এসে পড়ল, সেটা শ্যামনগরের সব চাইতে জমজমাট অংশ। কলকাতার ধরনে এখানে দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, দুটো সিনেমা হল, লন্ড্রি। একধারে বাস টারমিনাস, আরেক ধারে সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড।

এই দুপুর বেলায় একটা ইলেকট্রিক সাজ-সরঞ্জামের দোকানে মাইকে হিন্দি ফিল্মের গান বাজানো হচ্ছে। রীতিমত একটা ভিড় সেখানে অনড় হয়ে আছে।

সিনেমা হল দুটোর নাম 'ইন্দ্রপুরী' আর 'শ্যামনগর টকিজ'। 'ইন্দ্রপুরী'র গায়েই 'শোভা কাফে'। 'শোভা কাফে'র মালিকের নাম গণেশ। গণেশ সাধুখাঁ। বউ মরবার পর তার নামে রেস্টুরেন্ট খুলেছে। তিনবার ম্যাট্রিক ফেল গণেশ বলে, 'বুঝলে কিনা, শাজাহানের যেমন তাজমহল, আমার তেমনি 'শোভা কাফে'। বউকে কেমন ভালবাসতুম, বোঝ। এমন 'লাভ' কলিকালে চট করে দেখতে পাবে না।' বলে গা দুলিয়ে হাসে, 'হ্যা-হ্যা-হ্যা—'

'শোভা কাফে'র কাছ দিয়ে যেতে যেতে চট করে মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল রাজা। কাউন্টারে গণেশ নেই। খুব সম্ভব খেতে চলে গিয়েছে। বারটা বাজলে সে আর এক সেকেন্ডও থাকে না। যার নাম অমর করে রাখবার জন্য রেস্টুরেন্ট, সেই শোভা ছিল গণেশের এক নম্বর বউ। শোভা মরবার পর দুটো মাসও কাটেনি, আবার বিয়ে করেছে গণেশ। দু'নম্বর বউর হাতের রান্না ঝোল-ভাত খেয়ে দুপুরবেলা টানা একটা ঘুম দেয় সে। তারপর সিনেমা হলে ম্যাটিনি শো বসবার একটু আগে পান চিবোতে চিবোতে রেস্টুরেন্টে ফিরে আসে। দুপুরবেলা খদ্দেরের ভিড় থাকে না। এ সময়টা দোকানের কাজ চালিয়ে নেয় কাজের লোকেরা।

'শোভা কাফে'র কাছে এলে গণেশের দু'নম্বর বিয়ের কথা মনে পড়ে যায় রাজার। এটাকে একটা কুকীর্তি ধরে নিয়েছে সে। রোজকার মতো আজও মনে মনে গণেশকে খিস্তি দিল রাজা, 'শালা দেখ না, প্রেমের সাইনবোর্ড লটকেছে। এদিকে দু'মাস না যেতেই নিকে করে আনলে।' রেস্টুরেন্টটার সামনের দিকে টিনের সাইন-বোর্ড। তাতে শোভার নাম জ্বলজ্বল করছে। ওটা দেখলেই বিদ্রূপে রাজার ঠোঁট বেঁকে যায়।

গণেশ নেই। কিন্তু সেই আড্ডাটা ঠিকই আছে। ছয়ঋতু বারোমাস যতক্ষণ রেস্টুরেন্ট খোলা আছে, ওদের দেখা যাবেই। চেয়ার-টেবিল-কাপ-প্লেট-ওয়ালক্লকের মতো আড্ডাটা 'শোভা কাফে'র অঙ্গ! অনড়, হয়তো অপরিহার্যও। রেস্টুরেন্টের এক কোণে খানকতক চেয়ার আর একটা টেবিলের দঃ ওদের হাতেই একরকম তুলে দিয়েছে গণেশ সাধুখাঁ। এর জন্য কোনো পক্ষই আদালতে যায়নি, এ একটা অলিখিত চুক্তির মতো। অবশ্য এই চুক্তির অন্য একটা দিকও আছে। গণেশ যেমন ওদের বসবার জায়গা দিয়েছে, ওরাও তেমনি নিরাপদে গণেশকে ব্যবসা চালাতে দেবে, বিপদে-আপদে রক্ষা করবে। শহরে রেস্টুরেন্ট চালানো তো সোজা কথা নয়।

রাজা দেখল, এই মুহূর্তে 'শোভা কাফে'র ওই কোণটায় ননী, রতন আর তুলসী বসে আছে। তার একবার ইচ্ছে হল, ওদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দেয়।

তক্ষুনি রমলাদির কথা মনে পড়ে গেল। চট করে আড্ডার লোভটা সামলে নিল রাজা; মুখ ফিরিয়ে জোরে পা চালাতে যাবে সেই সময় ননীরা দেখে ফেলল।

ননী ডাকল, 'র-জ্‌জা—এই র-জ্‌জা—'

রাজা শুনেও শুনল না। আড্ডায় জমলে দু'চারটে টাকার আশা এখনও যা আছে তা থাকবে না, অথচ আজ কিছু টাকা না পেলেই নয়। ননীদের আকর্ষণ দু'হাতে ঠেলে সে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু ওরা যখন দেখেই ফেলেছে তখন কি আর সহজে ছাড়ে! ননী আবার চেঁচাল, 'মেরে র-জ্‌-জা—'

তুলসী আর রতন মুখের ভেতর আঙুল পুরে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সিটি দিল। অগত্যা কী আর করা, অসহায়ের মতো রাজা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে ননীরা হুড়মুড় করে 'শোভা কাফে' থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল। রতন বলল, 'কি মানিক, আমাদের দেখেও দেখছ না! ডাকলে শুনতে পাচ্ছ না!'

রাজা ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বলল, 'আমার একটা কাজ আছে ভাই।'

'তোরই যত কাজ। আর আমরা ফেকলু পার্টি— বেকার! লোপচু—' আঙুলের ডগা দিয়ে রাজার চিবুকটা ঠেলে ওপর দিকে তুলল ননী।

রাজা বলল, 'মাইরি বলছি খুব জরুরি। অনেক লেট হয়ে গেছে, এক্ষুনি না গেলেই হবে না।'

'কী রাজকার্য বাওয়া (বাবা)? যত কাজ তো তোমার রাত্তিরে চাঁদ। রপচানি ছেড়ে এস দেখি আমাদের সঙ্গে—' ননী হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

কাঁচুমাচু মুখে রাজা বলল, 'না ভাই, রমলাদি ডেকে পাঠিয়েছে। দশটার ভেতর—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ননী, তুলসী আর রতন একই সঙ্গে চাপা গলায় শিসের মতো শব্দ করে বলল, 'রমলাদির বাড়ি যাচ্ছিস!'

'হ্যাঁ।'

ননীদের চোখ চকচক করতে লাগল, 'তবে তো শালা, আজ টু পাইস হাতে আসছে। বেশ জুটিয়েছিস রমলাদিকে—'

রাজা হাসল, কিছু বলল না।

রতন লোভী গলায় বলল, 'মালকড়ি হাতে আসছে। আজ রাত্তিরে খাওয়াতে হবে।' চোখ টিপে হাত দিয়ে একটা বোতলের আকার দেখাতে লাগল সে।

রাজা বলল, 'আচ্ছা।'

'বিলিতি মাল খাব কিন্তু—'

'দেখি কিরকম পয়সাকড়ি পাই, তারপর—'

'ওসব শুনছি না। বাংলা খেয়ে খেয়ে লিভারে কড়া পড়ে গেছে।'

রাজা আবার হাসল।

কুঁজো হয়ে নাচের ভঙ্গিতে রাজার চারপাশে একপাক ঘুরে নিল ননী। ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'যা শালা র-জ্‌জা, জলদি যা। নইলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।' বলে আলতো করে তার পেছন দিকে লাথি কষিয়ে দিল।

হাসতে হাসতে রাজা এগিয়ে গেল। দু'পা গিয়েছে। আবার বাধা পড়ল। তুলসী ডাকল, 'রাজা—'

রাজা ঘুরে দাঁড়াল, 'কী বলছিস?'

'আমার জ্যাকেট?

'ওবেলা নিস—'

চোখ-মুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় তুলসী বলল, 'এক বেলার নাম করে নিলি, চারদিন কেটে গেল। শালা মেরে দিবি নাকি?'

রাজার গরম জামা টামা নেই। একটা পুরনো কোট অবশ্য বাড়িতে আছে। কত কাল আগের কেনা, কে জানে! ঠাকুরদা-টাকুরদা হয়তো কিনেছিল। ছেলেবেলায় বাবাকে ওটা পরতে দেখেছে রাজা, পরে

দাদা পরত। উত্তরাধিকারী হিসেবে ওটার দাবি এখন অনায়াসেই সে করতে পারে। কিন্তু কোটটার যা হাল তাতে গায়ে দেওয়া না-দেওয়া সমান। পোকায় কেটে চারদিকে বড় বড় গর্ত করে ফেলেছে; হু-হু করে হাওয়া ঢুকে যায়।

শীতকালটায় বড় কষ্ট রাজার। কান পর্যন্ত কলার তুলে, গলার শেষ বোতামটা আটকেও উত্তুরে বাতাস ঠেকানো যায় না। শরীরটা কুঁকড়ে, বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে হি হি করে কাঁপতে থাকে রাজা। একটু উত্তাপের আশায় মাঝে মাঝে হাত দুটো জোরে ঘষে নেয়, কখনও বা পকেটে পোরে।

ক'বছর ধরেই একটা পুল-ওভার কি উলের জ্যাকেট কিনবার চেষ্টা করছে রাজা। দুটো একটা করে বার কয়েক টাকাও জমিয়েছিল কিন্তু কেনা আর হয় নি। মহাভারতে কে এক ধৃতরাষ্ট্র ছিল, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাদা আরেক কুরুবংশ তৈরি করে গিয়েছে। দিনরাত সংসারটা হাঁ করেই আছে। যতই ঢোকাও হাঁ আর বোজে না। যত বার গরম জামার জন্য টাকা জমিয়েছে, একটা না একটা ঝামেলায় খরচ হয়ে গিয়েছে।

যাই হোক, ক'দিন আগে বিকেলবেলা কলকাতায় যেতে হয়েছিল রাজাকে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, তাই তুলসীর কাছ থেকে জ্যাকেটটা চেয়ে নিয়েছিল। তুলসী রোড কন্ট্রাক্টরের বাচ্চা। রাস্তায় চাট্টি খোয়া ছড়িয়ে তার ওপর পিচ বুলিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে মোটা মোটা বিল আদায় করে ওর বাবা। রাস্তাগুলোর আয়ু একটা বর্ষাও না, জোরে ক'পশলা বৃষ্টি হলেই দাঁত বেরিয়ে পড়ে। তখন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আবার তুলসীর বাবার ডাক আসে। ব্যাপারটা বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মতো।

রোড কন্ট্রাক্টরের ছেলে, তুলসীর ছ'সাতটা নতুন কোট, সোয়েটার, জ্যাকেট। ক'দিনের জন্য একটা ধার দিলে কিংবা একেবারে দিয়ে দিলেও শীতে কষ্ট পাবে না। তবু বন্ধু হয়ে তুলসী অপমান করল।

জ্যাকেটটা মেরে দেওয়ার কথায় রক্ত একেবারে মাথায় চড়েছে রাজার। চেঁচিয়ে মেচিয়ে বলল, 'রাজা কারো কিছু মারে না। শ্যামনগরের কোনো হারামী বলতে পারবে না। নে শালা, তোর জ্যাকেট নিয়ে নে—'

খুলতে যাচ্ছিল রাজা, তুলসী এবার নরম হল, 'এক্ষুনি চাইছি নাকি ! ঠাট্টাও বুঝিস না মাইরি। মাথায় তোর কী পোরা রে?'

রাজা গজ গজ করতে লাগল, 'এরকম ঠাট্টা ভাল লাগে না—'

তুলসী এবার হাসল, 'মাথা গরম না করে এখন যা। রমলাদি তোর আশায় হাঁ করে বসে আছে। যা যা, যা বে—'

তুলসীটা মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। রমলাদির কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিল রাজা, চকিতে মনে পড়ে গেল। খুব ব্যস্ত হয়ে আবার সে পা বাড়াতে যাবে, নিচু গলায় রতন বলল, 'অ্যাই—'

ভুরু কুঁচকে রাজা তাকাল, কিছু বলল না।

রতন বলল, 'কখন ফিরবি?'

'কেন?'

'একটু তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করিস। স্টেশনের ওধারে মাল এসেছে।

রাজার চোখ চকচক করে উঠল। উৎসাহের গলায় বলল, 'মাইরি?'

'আমি কি মিথ্যে বলছি?' রতন বলতে লাগল, 'তুই তো রমলাদির বাড়ি যাচ্ছিস। ওভারব্রিজে উঠে কান্নিক মেরে বাঁ দিকে একটু তাকাস, দেখতে পাবি। খবর পেয়েছি মালগুলো কাল সকালেই রেলগুদোমে পুরে ফেলবে। তার আগেই শালা যতটা পারি ফর্সা করে ছাড়ব।'

'আমি রমলাদির বাড়ি যাব আর আসব।' রাজাকে আর আটকানো গেল না। প্রায় ছুটতে শুরু করল সে। আর রতনরা ফের 'শোভা কাফে'তে ফিরে গেল।

দুই

বাজারের দিকটাই জমকালো। তারপর রাস্তার দু'ধারে আবার সেই পরিচিত ছবি। ভাঙাচোরা বাড়ি, মজা পুকুর-টুকুর। মাঝে মাঝে দৃশ্যপট বদলের জন্য ফাঁকা মাঠ। হঠাৎ এক-আধটা ঝকঝকে নতুন বাড়ি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ হাঁটবার পর স্টেশন এসে গেল। আপ আর ডাউনে মোট চারটে প্ল্যাটফর্ম। তার ওপর দিয়ে টানা ওভার ব্রিজ। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ওপরে উঠে এল রাজা। রতনের কথামতো বাঁ দিকে তাকাতে সত্যি সত্যিই দেখা গেল তলায় তারকাঁটায়-ঘেরা রেল-ইয়ার্ড। তার ভেতর অ্যালুমিনিয়মের তার, কেবল এবং নানারকম জিনিস স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। ইয়ার্ডের ওধারে, বেশ খানিকটা দূরে, শেড এবং রেলের গো-ডাউন। শেডের তলায় দুটো রেল পুলিশ বন্দুক পেতে বসে আয়েশ করে খৈনি ডলছে।

কাল বিকেলেও এখানে ঘুরে গিয়েছে রাজা, কিন্তু এত তার ফার দেখে নি। জায়গাটা ফাঁকা পড়ে ছিল। জিনিসগুলো নতুন এসেছে। খুব সম্ভব কাল রাত্তিরের দিকে, আজ সকালেও আসতে পাবে।

কয়েক পলক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চকচকে নতুন জিনিসগুলো দেখল রাজা। তারপর ওপাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

রাজা যে দিক থেকে এল সেটা উত্তর। উত্তরে শহরটা স্টেশন পর্যন্ত এসে থেমেছে। ইতির পর পুনশ্চর মতো ওভারব্রিজের এধারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে শ্যামনগর আরো খানিকটা ছড়ানো।

উত্তর দিকে শহরটা নতুন পুরনোয় মেশানো। ওখানে রিফিউজিদের কলোনি বসেছে। নতুন বড়লোকদের বাড়ি টাড়ি উঠেছে। কিন্তু দক্ষিণ দিকটা একেবারেই পুরনো। পুরনো হলেও ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপ নয়।

শহর এদিকে ঘনবদ্ধ নয়। বাড়িগুলো ছাড়া-ছাড়া, অচেনা বিদেশির মতো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে।

দক্ষিণ পাড়ার শেষ প্রান্তে হলুদ রঙের একতলা বাড়িটার কাছে এসে পড়ল রাজা। সামনের দিকে বাগান, গাছপালায় ঝুপসি ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। এখানে বেশির ভাগই ফলের গাছ। ফাঁকে ফাঁকে ফুলের সন্ধ্যামালতী, টগর, কাঁঠালি চাঁপা, রক্তজবা। বাগানটার পেছনে কোনো পরিকল্পনা নেই। ইচ্ছামতো যেখানে যেভাবে খুশি গাছ পোঁতা হয়েছে।

গাছ গাছালির মাঝখান দিয়ে সুরকির রাস্তা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই বারান্দা। বারান্দার তিনদিকে সারি সারি ঘর। রাস্তাটা দ্রুত পেরিয়ে বারান্দায় এসে উঠল রাজা।

বাড়িটা অনেক কালের। দেওয়ালগুলো বেশ চওড়া চওড়া আর মজবুত। কার্নিস এবং ঘুলঘুলির ফাঁকে বংশ পরম্পরায় পায়রাদের বাস লক্ষ করা যায়। খুব বেশিদিন হয় নি বাড়িটার রং ফেরানো হয়েছে। দেওয়াল থেকে চুনের আর জানালার পাল্লা থেকে টাটকা পেইন্টের গন্ধ উঠে আসছে।

রাজা বাঁ দিকের শেষ ঘরখানার সামনে এসে দরজায় টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা মেয়ে-গলা ভেসে এল, 'কে ?'

রাজ বলল, 'আমি—'

'আমি কে ? রাজা?'

'হ্যাঁ।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যে মুখোমুখি দাঁড়াল তার বয়েস এক অসীম রহস্য। তিরিশ হতে পারে, চল্লিশ হতে পারে। আবার পঁয়তাল্লিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। যার যেমন চোখ সে সেইভাবে মহিলার বয়েস মেপে নিতে পারে।

মুখেব গড়নটি ডিমের মতো সরু চিবুক। রং কালোই। কাব্য করে বড় জোর শ্যামালী বলা যেতে

পারে। কোমরটি সুঠাম এবং এত ক্ষীণ যে মুঠোয় বেড় পাওয়া যাবে। তার ওপর দিকে মহিলা উদ্ধত, নিচের দিকে বিশাল অববাহিকা। কপালটি ছোট্ট, মনোরম।

মহিলার সমস্ত আকর্ষণ তার চোখে। পাখিদের রাজ্য থেকে উপমা আনলে বলা যায়, সে চোখ শালিকের না, চড়ুইয়ের না, পায়রারও না। সে চোখ বাজপাখির চোখের মতো তীব্র এবং শিকার-সন্ধানী। সব সময় সজাগ, সব সময় ছটফট করে চলেছে।

এই মুহূর্তে গোলাপি রঙের একটি শাড়ি আটপৌরে ধরনে পরে আছে মহিলা। ব্লাউজটার ঝুল খুবই কম। বুকের ঠিক তলাতেই শেষ। ফলে অনাবৃত পেটের অনেকখানি বেরিয়ে আছে। অথচ জামার হাতা দুটো মস্ত, কনুইয়ের তলায় নেমে এসেছে।

একরাশ কোঁচকানো কোঁচকানো ভেজা চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে। সেগুলোর শেষ মাথায় একটা গিঁট। কপালে চিনা সিঁদুরের ছোট্ট টিপ। সাদা সিঁথি মাথার মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে ঘন চুলের অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। পায়ের পাতায় লেস-বসানো সায়ার প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। ভেতর-জামার কারসাজিতে মহিলাকে যুবতী যুবতী মনে হয়। খুব সম্ভব দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। পানের রসে ঠোঁটদুটো এখন টুকটুকে।

প্রসাধন বলতে শীতের এই দুপুরে একটু ক্রিম মেখেছে মহিলা। তাই মুখখানা তেলতেলে, মসৃণ। গয়না বলতে দু'হাতে চারগাছা করে সোনার চুড়ি, গলায় চিকচিকে সরু চেন-হার, ডান হাতের আঙুলে একটি মাত্র আংটি। কানে পুরনো ডিজাইনের কানপাশা এবং পাতলা নাকের পাটায় রক্তবিন্দুর মতো লাল পাথর বসানো নাকছাবি। নাকছাবিটা তাকে যেন জাদুকরী করে তুলেছে।

যৌবনের মধ্যদিনেও না, অস্তদিনেও না, দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। রূপসী কিনা, কে বলবে! তবে তার দিকে তাকিয়েই কেউ চোখ ফিরিয়ে নেবে, সাধ্য কী। মনে হবে তাকিয়ে থাকি, তাকিয়েই থাকি।

এই রূপে এই সাজসজ্জায় ক'বছর ধরেই মহিলাকে দেখছে রাজা। মনে মনে ক'টা খারাপ কথা উচ্চারণ করে সে বলল, 'মাঞ্জা চড়িয়ে ছুঁড়ি সাজলে কী হবে, তোমার বয়েস আমার জানা আছে।'

মহিলা ঘাড়খানা হেলিয়ে চিকন তুলিতে আঁকা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তাই তো, রাজা বলেই মনে হচ্ছে।' তার কণ্ঠস্বরটি সুরেলা, তবে ধাতব গুণ মেশানো। ব্রোঞ্জের সরু তারে আস্তে আস্তে টোকা দিলে যেমন শোনায় অনেকটা সেইরকম।

রাজা কিছু বলল না, মুখ নিচু করে থাকল।

মহিলা আবার বলল, 'এখানে আসার কথা এতক্ষণে মনে পড়ল?'

মহিলার স্বরে ব্যঙ্গ অথবা অন্য কী আছে, বোঝা গেল না। রাজা চোখ তুলে ভয়ে ভয়ে বলল, 'না, মানে—'

'মানে আবার কী? দশটার ভেতর আসতে বলেছিলাম, খেন ক'টা বাজে হুঁশ আছে?'

'বৌদি হঠাৎ ফিট হয়ে গেল, তাই—'

মহিলা এবার গজ গজ করতে লাগল, 'বৌদির ফিট নিয়ে থাকলেই পারতিস। না এলেই হত।'

রাজা চুপ। তার ভয় হতে লাগল, যে কাজের জন্য আসা সেটার হয়তো আর দরকার নেই।

মহিলা বলতে লাগল, 'তোকে নিয়ে আর চলবে না। অন্য লোক দেখতে হবে এবার।'

রাজা অনুনয়ের গলায় বলল, 'এই বারটা রমলাদি, এরপর থেকে যক্ষুনি বলবেন তক্ষুনি হাজির হয়ে যাব। এই লাস্ট।'

মহিলা অর্থাৎ রমলাদি বলল, 'খুব হয়েছে, এবার দয়া করে ঘরের ভেতর এস। দরজার [illegible] সে-ই প্রথমে ভেতরে গেল। রাজা তার পিছু পিছু এল।

ঘরখানা বেশ বড়, লম্বা ধরনের এবং মোটামুটি সাজানো। ঠিক মাঝখানটায় পুরনো আমলের কারুকাজ-করা সোফা, সেন্টার-টেবিল, আরেক ধারে ভারি মকরমুখী খাট, দরজায়-জানলায় দামি পর্দা। ক'টি চামড়া-ঢাকা মোড়াও ইতস্তত ছড়ানো। দেওয়ালে দেওয়ালে বইয়ের সুদৃশ্য আলমারি। বইগুলো অবশ্য সাজিয়ে রাখবার জন্য। কেউ কোনোদিন পাতা উলটে দেখেছে বলে মনে হয় না।

ঘরে আর কেউ ছিল না। রমলাদি বলল, 'বোস—'

খুব সন্তর্পণে, যেন ছোঁয়া বাঁচিয়ে সোফায় বসল রাজা।

রমলাদিও মুখোমুখি বসল। বলল, 'খেয়ে দেয়ে এসেছিস তো?'

সকালবেলাতেই বৌদি চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। উনুনই ধরেনি তো খাওয়া দাওয়া! জড়ানো গলায় রাজা মিথ্যেই বলল, 'হ্যাঁ।'

'একটু চা খাবি?'

সকাল থেকে কিছুই প্রায় পেটে পড়েনি। 'যা পাওয়া যায় তাই ভাল' এইরকম ভেবে রাজা বলল, 'খেতে পারি।'

রমলাদি এ ঘর থেকেই গলা তুলে ডাকতে লাগল, 'দুর্গামাসি, দুর্গামাসি—'

রাজা জানে দুর্গামাসি বলে যাকে ডাকা হল সে এক মাঝ বয়সী মেয়েছেলে। রমলাদির কাছে বারমাস থাকে। রান্নাবান্না থেকে এ বাড়ির যাবতীয় কাজই সে করে।

দুর্গার সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

রমলাদি আরো বারকতক ডাকাডাকি করে বিরক্ত মুখে উঠে পড়ল, 'দুর্গামাসিটা যে কী করে! কোথায় থাকে! হাজার ডাকলেও পাওয়া যায় না। তুই একটু বোস ভাই, আমি এক্ষুনি চা করে নিয়ে আসছি।'

রাজা দ্বিধার গলায় বলল, 'আপনি আবার চা করতে যাবেন—'

'বা রে, খাওয়াব বললাম। তোর জন্যে না হয় একটু খাটলামই।' রমলাদি চলে গেল।

এখন এ ঘরে রাজা একা। চুপচাপ বসে বসে অন্যমনস্কের মতো আলমারির বই দেখল সে, সোফা এবং খাটের কারুকার্য দেখল, জানালা দরজার পর্দায় যে নকশা আঁকা, তাই দেখল।

হঠাৎ কিচির মিচির আওয়াজে চমকে বাইরে তাকাল রাজা। বাগানের দিকের জানালার মাথায় দুটো শালিক পরস্পরকে ঠুকরে ঠুকরে খুনসুটি করছে। বেশিক্ষণ শালিকদের খেলা দেখা গেল না। একটু পরেই ফুড়ুত করে তারা গাছপালার ভিড়ে অদৃশ্য হল।

বাইরে তাকিয়ে থেকে আর কী হবে? আস্তে আস্তে চোখদুটো ফের ভেতরে নিয়ে এল রাজা। তারপর কিছুক্ষণ ভাবনাশূন্যের মতো বসে থাকল।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় ননী না, তুলসী না, রতন না, বৌদি না, দাদার একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা না, এই মুহূর্তে যার ঘরে বসে আছে সেই রমলাদির কথা মনে পড়ে গেল রাজার।

রমলাদিকে কতদিন দেখছে সে? অনেক-অনেকদিন। একই শহরের মানুষ, মুখচেনাটা ছেলেবেলা থেকেই ছিল। আলাপ হয়েছে ঢের পরে। সে এক মজার ঘটনা। ভাবলে এখনও হাসি পায়।

ছ'সাত বছর আগে ননী, তুলসী, রতনদের সঙ্গে রাজা যখন প্রথম 'শোভা কাফে'তে আড্ডা দিতে আরম্ভ করেছল সেটাকে বলা যায় যৌবনের শুরু। তখন দাদার পকেট কেটে সিগারেট খেত সে, কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়ত। আর মেয়ে দেখলেই কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অশ্লীল সিটি মারত।

সেদিনও 'শোভা কাফে'তে আড্ডা দিচ্ছিল রাজারা। বিকেল বেলা। বাজার পাড়ায় প্রচুর লোকজন তখন। সিনেমা হলে সেই মুহূর্তে ইন্টারভ্যাল চলছিল। ফাঁকটুকু পূর্ণ করা হচ্ছিল রগরগে হিন্দি ফিল্মি গানের রেকর্ড বাজিয়ে। মোটমাট জায়গাটা তখন সরগরম।

সেই সময় 'শোভা কাফে'র সামনে দিয়ে একটা সাইকেল-রিকশা যাচ্ছিল। ভেতরে একটি মাত্র যাত্রিণী। রিকশার ছাদের আড়ালে মুখটা ঢাকা, তবে পায়ের দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পা দেখে বয়সটা অবশ্য অনুমান করা যাচ্ছিল না।

মেয়ে দেখলেই শিস মারার অভ্যাস। জিভ সুড়সুড় করে উঠেছিল রাজার। রিকশাটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতর আঙুল পুরে সিটি দিয়ে উঠেছিল। সিটির শব্দ তীক্ষ্ণ ধারাল তীরের মতো ছুটে গিয়েছিল।

ননী চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ফোর ফরটি ভোল্ট মাইরি—'

তুলসী বলেছিল, 'ফোর ফরটি কি এইট এইট্রি বুঝলি কী করে? মুখ তো দেখতে পাস নি।'

'না দেখলেও বলে দিতে পারি।'

'শালা লপেটা—'

স্কুল-কলেজের মেয়েদের দেখে শিস দিলে তারা ফিরেও তাকায় না, অন্য দিকে মুখ করে চলে যায়। শুনেও না শোনার ভান করে।

সেদিন ওই রিকশাটা চলে যায়নি। সোজা 'শোভা কাফে'র সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর রিকশা থেকে যে নেমেছিল সে আর কেউ না—রমলাদি।

যাদের উদ্দেশে 'সিটি' মারা হয়, এভাবে তারা কেউ এগিয়ে আসে না। অভিজ্ঞতাটা এতদিন অন্যরকম ছিল।

· এদিকে রিকশা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকেনি রমলাদি। সোজা 'শোভা কাফে'র দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রাগে নাকের পাটা ফুলে উঠেছিল। চোখ দুটো এমনিতেই বড়, প্রতিমার মতো। সে দুটো যেন জ্বলছিল। বুক তোলপাড় করে ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। চাপা তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে, কে সিটি দিয়েছে?'

'শোভা কাফে'তে তখন বেশ ভিড়। ইন্টারভ্যালে সিনেমা দর্শকদের অনেকেই চা খেতে এসেছে। তা ছাড়া অন্য খদ্দেরও ছিল। কেউ একটা কথাও বলেনি। সমস্ত রেস্টুরেন্টটা একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল।

আজকাল হলে কী হত বলা যায় না। এখন কথায় কথায় ছুরি চালাতে পারে রাজা, বোমা ছুঁড়তে বুক একটুও কাঁপে না। কিন্তু তখন সবে এ সবের হাতেখড়ি চলছে। রমলাদিকে ওই রকম ক্রুদ্ধ, ভীষণ চেহারায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজারা হকচকিয়ে গিয়েছিল। ভয়ও পেয়েছিল খুব। হঠাৎ হুড়মুড় করে চেয়ার-টেবিল কাপ-প্লেট উলটে দিয়ে ছুট লাগিয়েছিল।

উত্তেজিত গলায় রমলাদি বলেছিল, 'ধরুন, ধরুন তো ছোঁড়াগুলোকে, রমলাদির কণ্ঠস্বর সম্রাজ্ঞীর আদেশের মতো শুনিয়েছিল।

'শোভা কাফে'র বোবা খদ্দেররা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে শিকারি কুকুরের মতো তাদের পিছু নিয়েছিল। তা ছাড়া রাস্তার লোক তো ছিলই। সবাই ধাওয়া করে আসছিল। আর ভয়ার্ত জন্তুর মতো রাজারা দিগ্বিদিকে গলিঘুঁজির ভেতর পালিয়ে যাচ্ছিল।

তুলসীদের কেউ ধরতে পারেনি। পাঁচিল-টাচিল টপকে এর-ওর বাড়ির ভেতর দিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। রাজা কিন্তু পালাতে পারেনি, জনতার হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তার চুল আর জামার কলার ধরে টানতে টানতে, ধাক্কা মারতে মারতে 'শোভা কাফে'তে নিয়ে আসা হয়েছিল। আসার সময় প্রচুর চড় চাপড় পড়েছিল। মারের চোটে ভুরু, কপাল ফুলে উঠেছিল। কাঁধের কাছটা এবং গলার কষ ফেটে গিয়েছিল।

'শোভা কাফে'র দরজায় রমলাদি তখনও দাঁড়িয়ে। লোকগুলো রাজাকে টেনে হিঁচড়ে তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়েছিল। রাজা কারো দিকে তাকাতে পারছিল না। দুই হাঁটুর ভেতর ঘাড় গুঁজে বসে ছিল।

চারধারের লোকগুলো তখন উত্তেজিতভাবে নানারকম মন্তব্য করছিল।

'মেয়েছেলের অসম্মান! শালার হাড় গুঁড়িয়ে ছেড়ে দেব।'

'জানোয়ারটাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।'

'ওইটুকু ছেলে, এর ভেতরেই কিরকম হারামী হয়ে উঠেছে। পাজি উল্লুককে তুলো ধোনা করলে ঠিক হয়।'

'এ ছেলে বড় হলে যে কী হবে! শ্যামনগরের হাড়ে যদি দুব্‌বো গজিয়ে না ছাড়ে তো কী বলেছি।'

এর মধ্যেই একজন রমলাদিকে বলেছিল, 'আপনি যদি বলেন বাঁদরটাকে থানায় নিয়ে যাই। একদিন পুলিশের কোঁতকা খেলে টাইট হয়ে যাবে।'

রমলাদি বলেছিল, 'কারোকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমিই করব।' বলেই রাজাকে ডেকেছিল, 'এই ছোকরা—'

গালের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছিল। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে দিয়ে লাল টকটকে চোখে রাজা তাকিয়েছিল।

রমলাদি বলেছিল, 'ওঠ—'

কাঁপা আড়ষ্ট গলায় রাজা বলেছিল, 'কেন?'

রমলাদি ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'একটা কথাও বলব না। যা বলছি মুখ বুজে তাই কর।'

রাজা এবার কেঁদে ফেলেছিল।

রমলাদি ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'কাঁদলে শুনছি না। ওঠ—উঠে পড়—'

আর বসে থাকতে সাহস হয়নি রাজার। ভীত অসহায় চোখে একবার চারদিক দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। তার হাত-পা ভীষণ কাঁপছিল।

সেই সাইকেল-রিকশাটা 'শোভা কাফে'র সামনে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে রমলাদি বলেছিল, 'ওখানে গিয়ে বসো—'

ফাঁসির আসামীর মতো রিকশায় গিয়ে বসেছিল রাজা। রমলাদিও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল এবং তার পাশে বসে রিকশাওয়ালাকে বলেছিল, 'চল—'

রিকশাওয়ালা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় যাব?'

'এখন রেললাইনের ওপারে তো চল। তারপর ভেবে দেখব, সেখান থেকে কোথায় যাই—'

রিকশা চলতে শুরু করেছিল।

পেছন থেকে 'শোভা কাফে'র উদ্‌গ্রীব জনতা চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আমরা যাব আপনার সঙ্গে?'

রমলাদি বলেছিল, 'দরকার নেই। এই পুঁচকে ছোঁড়াটাকে টিট করতে আমি একলাই যথেষ্ট।'

খানিকটা যাবার পর ভয়ে ভয়ে রাজা জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনি কি আমায় পুলিশে দেবেন?'

খুব বিরক্ত হয়েছিল রমলাদি। রূঢ় কর্কশ গলায় বলেছিল, 'পুলিশে দেব কি রাজকন্যার হাতে তুলে দেব, সে আমি বুঝব। তুমি চুপচাপ বসে থাক।'

চুপচাপ বসে থাকতে পারেনি রাজা। বুকের ভেতরটা তার ঢিবঢিব করছিল। খানিক যাবার পর করুণ গলায় আবার সে বলে উঠেছে, 'আর কখনো ওরকম করব না।'

রমলাদি চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'আবার কথা!'

রাজা সত্যি সত্যিই এবার চুপ করে গিয়েছে।

একবার সে ভেবেছিল, রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে যায়। পরক্ষণে একটু আগের বিশ্রী অভিজ্ঞতার কথাটা মনে পড়তেই সে দমে গিয়েছে। পাশে যে মহিলাটি বসে আছে তার অসাধ্য কিছু নেই। ছুটে পালাতে গেলেই হয়তো তখনকার মতো রাস্তার লোক ডেকে পেছনে লেলিয়ে দেবে। কাজেই পালানোর ভাবনাটাকে রাজা আর প্রশ্রয় দেয়নি।

স্টেশনটাকে ডাইনে রেখে লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে রিকশাটা একসময় ওপারে চলে গিয়েছিল। স্টেশনের ওধারটা শ্যামনগরের উত্তর দিক। নামও উত্তরপাড়া। সোজা উত্তরপাড়ার শেষ প্রান্তের পুরনো একতলা একটা বাড়ির সামনে এসে রিকশাটা থেমেছিল। এখন সেই বাড়িতেই বসে আছে রাজা।

রমলাদি আদেশের গলায় বলেছিল, 'নামো—'

সুবোধ বালকের মতো নেমে পড়েছিল রাজা। রমলাদি রিকশা-ভাড়া মিটিয়ে তাকে নিয়ে সামনের বাগানটার মাঝখান দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে এসেছিল। একটা সোফা দেখিয়ে রাজাকে বলেছিল, 'বসো—'

সেই মুহূর্তে মাথা কাজ করছিল না রাজার। রমলাদির ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিল সে। রমলাদির মুখ থেকে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে বসে পড়েছিল।

রমলাদি দাঁড়িয়ে থাকেনি। মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসে ভুরু ঈষৎ কুঁচকে রাজার মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল।

এমনভাবে কেউ তাকিয়ে থাকলে খারাপ লাগে। রাজা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল; বুকের ভেতরটা কেমন যেন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল তার। রমলাদির সামনে মুখই তুলতে পারছিল না সে। বাড়িতে এনে, সামনে বসিয়ে এরকম তাকিয়ে না থেকে রমলাদি যদি তাকে মার দিয়ে ছেড়ে দিত, সে অনেক ভাল ছিল।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রমলাদি হঠাৎ বলেছিল, 'কী নাম তোমার?'

মুখ না তুলে কাঁপা গলায় আস্তে করে রাজা জবাব দিয়েছিল, 'রাজকুমার সান্যাল।'

জিভটা মুখের ভেতর কাত করে রমলাদি প্রতিটি শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করেছিল, 'রা-জ-কু-মা-র—'

রাজার মনে হয়েছিল, তার নামটাকে ভ্যাংচাচ্ছে রমলাদি। সে কিছু বলেনি।

রমলাদি ঘাড় কাত করে আবার বলেছিল, 'নামের তো বেশ বাহার!'

রাজা এবারও চুপ।

রমলাদি থামে নি, 'অত বড় লম্বা-চওড়া নাম আমার মনে থাকে না। ছোটোখাটো ডাক-নাম কিছু নেই?'

আবছা গলায় রাজা বলেছিল, 'আছে।'

'কী?'

'রাজা।'

'যে রাজাকুমার সে-ই আবার রাজা।' তীব্র রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠেছিল রমলাদি।

কী উত্তর দেবে, রাজা ভেবে পায়নি। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে সে রাজা এবং রাজকুমার। সত্যিই তো, এই ব্যাপারটা আগে কখনও লক্ষ করেনি।

আঙুল দিয়ে রাজার থুতনিটা এবার ঠেলে তুলেছিল রমলাদি, 'রাজা হয়ে এমন ছ্যাঁচড়া স্বভাব কেন তোমার? মেয়ে দেখলে শিস দাও!' তার কণ্ঠস্বরে ধিক্কার মেশানো, চোখের তারায় ছুরির ফলার মতো কৌতুক।

বলবার মতো কিছুই ছিল না রাজার।

রমলাদি আচমকা জিজ্ঞেস করেছিল, 'বয়স কত রে ছোঁড়া তোর?'

হঠাৎ সম্বোধনের ভাষাটা 'তুমি' থেকে 'তুই'তে নেমে যেতে রাজা চমকে গিয়েছিল। সুপুষ্ট নিটোল আঙুলের ডগায় থুতনিটা তখনও বসানো রয়েছে। মুখটা যে সরিয়ে নেবে, তেমন শক্তিটুকুও বুঝি তার শরীরে ছিল না।

রাজা দুর্বল গলায় বলেছিল, 'আঠার।'

'আমার বয়েস কত বল তো?'

আস্তে মাথা নেড়েছিল রাজা, 'জানি না।'

রমলাদি বলেছিল, 'আন্দাজ করে বল না।'

পাঁচ ছ' বছর আগে সেই দিনটিতে রমলাদিকে পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি দেখাচ্ছিল না। খানিক ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে রাজা তা-ই বলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়েছিল রমলাদি। বুক থেকে কাপড় যে খসে গিয়েছে, সে হুঁশ তার ছিল না। হাসতে হাসতেই ডেকেছিল, 'মাসি মাসি, ও দুর্গামাসি—'

একটু পর মধ্যবয়সী একটি বিধবা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'ডাকছ কেন?'

'ছোঁড়া কী বলে শোন—'

'কী বলে?'

রমলাদি উত্তর দেবে কি, হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

কপট বিরক্তির সুরে মধ্যবয়সিনী বলেছিল 'হেসে হেসে তো গেলে। যা বলবে, তাড়াতাড়ি বলে ফেল। চাল বাছতে বাছতে উঠে এসেছি। চড়াই পাখিতে এতক্ষণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কী যে করছে।'

খানিক সামলে নিয়ে রমলাদি বলেছিল, 'ছোঁড়া বলছে, আমার বয়েস নাকি পঁচিশ। আসল বয়েসটা কত বলে দাও তো দুর্গামাসি—'

দুর্গা বুঝতে পেরেছিল, কোনো একটা কৌতুকের খেলা চলছে। সে হেসে বলেছিল, 'জানি না—' বলে হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিল।

দুর্গা চলে যাবার পর হাসি একেবারে থামিয়ে দিয়েছিল রমলাদি। কাপড় টাপড় গোছগাছ করে স্থির হয়ে বসেছিল, 'আমার বয়েস পুরো তেত্রিশ। ঠিক সময়ে বিয়ে হলে তোর মতো একটা ছেলে থাকত রে।'

চকিতে রমলাদির কপাল আর সিঁথিটা দেখে নিয়েছিল রাজা। সিঁথি একেবারেই সাদা। কপালে চিনা সিঁদুরের মস্ত গোল টিপ। মহিলা বিধবা কুমারী অথবা বিবাহিতা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে কুমারী মেয়ের মতো তার শরীর ঘিরে অটুট কাঠিন্য রয়েছে।

রমলাদি আবার বলেছিল, 'তোর বয়েস তো মোটে আঠার' গলা টিপলে দুধ বেরিয়ে আসবে। মায়ের বয়সী একটা মাগীকে দেখে শিস দিতে তোর আটকাল না? একটু লজ্জাও করল না?'

'মাগী' শব্দটা রাজার কানে খচ করে বিঁধে গিয়েছিল। রমলাদির যা চেহারা, যেমন সাজ সজ্জা তাতে ওই রকম অশ্লীল শব্দ তার মুখ থেকে বেরুতে পারে, এ যেন কল্পনাই করা যায় না।

জড়িয়ে জড়িয়ে অপরিষ্কার গলায় রাজা কিছু একটা উত্তর দিয়েছিল। কী দিয়েছিল, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট নয়। শুধু সে বুঝতে পারছিল, ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়ছে। কিছুতেই সেটাকে খাড়া রাখা যাচ্ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে রমলাদি ডেকেছিল, 'অ্যাই—'

গলার ভেতরে ফিস ফিস করেছিল রাজা, 'কী বলছেন?'

'শিস দিতে তোকে বারণ করছি না। দিবি, একশ' বার দিবি। দামড়া মোষের মতো জোয়ান হয়ে উঠছিস। ছুঁড়ি দেখলে বুকের ভেতর তো কুর কুর করে উঠবে। তবে হ্যাঁ, একটু দেখে শুনে দিবি। তোর বয়েস আঠার, ষোল বছরের বেশি মেয়ে দেখে তোর শিস দেওয়া উচিত না। খুব খারাপ দেখায়, বুঝলি?'

রাজা বিমূঢ়। এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আগে আর কখনো হয়নি। মহিলা তার সঙ্গে ঠাট্টা করেছিল কিনা, বোঝা যাচ্ছিল না। কিংবা ব্যাপারটার ভেতর অন্য কোনোরকম বিপজ্জনক ফাঁদ পাতা আছে কিনা, তা-ই বা কে বলবে। রাজার মন ভয়ে সন্দেহে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

রমলাদি একটু ভেবে এবার বলেছে, 'নাম তো জানলাম। তুই থাকিস কোথায়?'

'এখানেই।'

'শ্যামনগরের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'আগে তো তোকে দেখি নি। আমিও তো এখানকারই মেয়ে।' রমলাদির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, 'কোন পাড়ায় তোদের বাড়ি?'

রাজা বলেছিল, 'পুরনো পাড়ায়।'

'তোর বাবার নাম কী?'

'হরিনাথ সান্যাল।'

'শ্যামনগরে দু'জন হরিনাথ সান্যাল। একজন হাইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার, আরেকজন মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কালেক্টর। তোর বাবা কোন হরিনাথ?'

দেখা যাচ্ছিল, মহিলা শ্যামনগরের নাড়ি-নক্ষত্র জানে। বিস্মিত, হতভম্ব রাজা বলেছিল, 'ট্যাক্স কালেক্টর।'

রমলাদি বলেছিল, 'তোর বাবা তো রিটায়ার করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'মা আছে?'

'না।'

'সংসারে আর কে কে আছে?'

'দাদা, বৌদি, দাদার চার ছেলেমেয়ে—এইসব।'

'দাদা কী করে?'

'স্যানিটারি ইন্সপেক্টর।'

'মিউনিসিপ্যালিটিরই?'

'হ্যাঁ।'

'কত মাইনে পায়?'

'সাতাত্তর টাকা বাষট্টি পয়সা।'

'ওই টাকায় রাবণের গুষ্টির চলে কী করে?'

রাজা বলেছিল, 'কিছু ধান জমিটমি আছে—'

রমলাদি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল, 'ক' বিঘে?'

'দশ বিঘের মতো—'

'কত ধান পাস?'

'ভাগচাষীদের দিয়ে বত্রিশ তেত্রিশ মণের মতো।'

'তাতে ছ'মাসের খোরাকও তো হয় না।'

'না।'

একটু চুপ। তারপর কিছু ভেবে নিয়ে রমলাদি বলেছিল, 'তুই কী করিস? পড়িস টড়িস?'

রাজা মাথা নেড়েছিল, 'না।'

'কেন?'

'এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর মাইনে দিতে না পারার জন্যে নাম কাটা গেল। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে।'

'পড়িস না তো, চাকরি বাকরি কিছু করিস?'

'না, এখনও পাই নি! চেষ্টা করছি।'

'কোথায়?'

'এই কারখানায় টারখানায়—'

'তার মানে পড়িসও না, কাজও করিস না। রেস্টুরেন্টে বসে দিনরাত আড্ডা মারিস আর মেয়ে দেখলে শিস দিস—এই তো? বেশ ভালই চালাচ্ছিস।'

রাজা নিরুত্তর।

রমলাদি জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ রে, সিগারেট ধরেছিস?'

বার বছর বয়েসেই বিড়ি সিগারেট ধরেছে রাজা। সে কথা তো আর বলা যায় না। মুখ নিচু করে জোরে জোরে মাথা নেড়েছিল সে।

রমলাদি বলেছিল, 'মেয়েদের দেখে শিস দিস আর সিগারেট ধরিস নি? এ কথা আমি বিশ্বাস করব ভেবেছিস?'

রাজার মাথা নাড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রমলাদি স্থির চোখে তাকে দেখতে দেখতে গলার স্বর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলেছিল, 'তা হলে সিগারেট ধরেছিস?'

রাজা চুপ।

রমলাদি আবার বলেছিল, 'মদ খাস?'

'না।'

'একদিনও খাস নি?'

বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো উলটোপালটা জেরা করে মহিলা ঠিক কোন কথাটা জানতে চায়, রাজা বুঝতে পারছিল না। মদের কথায় একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে সে বলেছিল, 'একদিনও খাই নি।' সত্যিই মদ কী জিনিস, তখনও সে ছুঁয়ে দেখে নি। ছোঁয়া দূরের কথা, চোখেও দেখে নি।

রমলাদি বলেছিল, 'চট করে মদটা ধরে ফ্যাল, বুঝলি?' এমনভাবে বলেছিল, যেন মদ খাওয়া ব্যাপারটা জল খাওয়ার মতনই সহজ।

রাজা উত্তর দ্যায় নি।

রমলাদি থামে নি, 'মেয়েদের পেছনে লাগিস, সিগারেট ফুঁকিস, মদটা ধরলে ষোল কলা পূর্ণ হয়ে যেত।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ একসময় রমলাদিই আবার বলে উঠেছিল, 'বাঁদরামো তো খুব শিখেছিস। সোফায় বসে ফ্যানের হাওয়াও খেলি। চল এবার তোকে থানায় দিয়ে আসি—'

এ বাড়িতে এসে প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল রাজা। তারপর কথা বলতে বলতে তার মনে হয়েছিল, মহিলা হয়তো সাংঘাতিক কিছু করবে না। কিন্তু হঠাৎ থানার কথায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল তার। সংসারের এত খোঁজখবর, এত ঠাট্টা-টাট্টার পর যে থানার কথা আসতে পারে, এটাই সে ভাবতে পারে নি।

কিছু না বলে ভীত চোখে রমলাদির দিকে তাকিয়েছিল রাজা।

রমলাদি বলেছিল, 'কি রে, অমন করে তাকিয়ে আছিস যে?'

'আমি—আমি—' কোনোরকমে শব্দ দুটো গলার ভেতর থেকে বার করে এনেই রাজা থেমে গিয়েছিল। আর কিছু বলতে পারে নি।

'থানার কথায় খুব ভয় পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে?'

'মানে—মানে—'

'মানে টানে বুঝি না। থানায় যেতে চাস কিনা, সেইটেই বল—'

যেন তার ইচ্ছার ওপরেই থানায় যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করছে। রাজা কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গলা দিয়ে এবার স্বর বেরোয়নি।

রমলাদি দুই ভুরু ঘন করে বলেছিল, 'যেতে না চাস যাবি না। তা অমন দম বন্ধ করে আছিস কেন?'

এতক্ষণে সহজভাবে বুকে শ্বাস টানতে পেরেছিল রাজা।

রমলাদি আবার বলেছিল, 'থানায় যাবার ইচ্ছে নেই? খুব ভাল কথা। তা হলে এখন কিছু খা।'

রাজা হতবাক। প্রায় একই সুরে থানায় যাওয়ার এবং খাওয়ার কথা বলে গিয়েছিল রমলাদি। ওই রকম একটা অঘটনের পর কেউ তাকে যে বাড়ি নিয়ে আসতে পারে, সেটাই এক অভাবনীয় ব্যাপার। তার ওপর খাওয়ার কথা। এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

রমলাদি বলে যাচ্ছিল, 'অনেক ছোটাছুটি করেছিস। দু'চারটে চড়-চাপড়ও কি আর খাস নি? শরীরের ওপর দিয়ে ধকল তো কম যায় নি। এখন কিছু খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নে।' বলতে বলতে হঠাৎ গলা তুলে ডুকতে শুরু করেছিল, 'দুর্গামাসি—'

ভেতর থেকে সাড়া এসেছিল, 'কী বলছ?'

'ডিম ভেজে চা-টা করে নিয়ে এস।'

একরকম জোর করেই রাজাকে খাইয়েছিল রমলাদি। তারপর বলেছিল, 'এবার যা—'

রাজা উঠে পড়েছিল। তার সঙ্গে বারান্দায় আসতে আসতে রমলাদি বলেছিল, 'ছুঁড়িদের শিস দিয়ে, আড্ডা মেরে, সিগারেট ফুঁকে যদি সময় থাকে, মাঝে মাঝে আসিস—'

রাজা আস্তে করে মাথা হেলিয়েছিল।

তারপর বাগান টাগান পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অবাক বিস্ময়ে রমলাদির বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে বিস্ময়কর

এবং অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। খানিক আগে সত্যিসত্যিই ওই ঘটনাগুলো ঘটেছে কি? না দিনের বেলাতেই বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখেছে সে?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মুখের ভেতর আঙুল পুরে পিঠ ধনুকের মতো বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণ সিটি দিয়ে উঠেছিল রাজা। তারপরেই দৌড়। 'শোভা কাফে'র দরজায় এসে তার দৌড় থেমেছিল।

ততক্ষণে ননী, রতন, তুলসীরা আবার 'শোভা কাফে'তে ফিরে এসেছে। এক কোণে বসে তারা গুলতানি করছিল।

রাজাকে দেখে কিছুক্ষণ ওরা হাঁ করে থাকল। তারপর ননীই প্রথম বলে উঠেছিল, 'রাজা তুই!'

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে রাজা বলেছিল, 'হ্যাঁ মেরে জান, আমি রাজাই—'

'তোকে না ধরে নিয়ে গিয়েছিল?'

'ইয়েস।'

রতন এই সময় বলে উঠেছিল, 'মাইরি, কত ছুঁড়িকে কানকি মেরেছি, সিটি দিয়েছি, কিন্তু এমন তেড়ে কেউ আসেনি।'

গৌর বলেছিল, 'শালী একেবারে এইট এইট্টি—'

রতন বলেছিল, 'এইট কিরে, থাউজেন্ড। কী স্পার্ক দিচ্ছিল, দেখেছিস।'

রাজা ক্ষোভের গলায় বলেছিল, 'দেখেই তো শালারা দুদ্দাড় করে হাওয়া হয়ে গেলি। কেমন সব ফ্রেন্ড জানা আছে।'

'তুমিও তো হাওয়া হয়েছিলে চাঁদ। কপাল খারাপ, তাই ধরা পড়ে গেলে।'

রাজা উত্তর দেয়নি। দুই আঙুল কাঁচির মতো ফাঁক করে গৌরের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, 'একটা ছাড় তো—'

রাজার আঙুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে দিয়েছিল গৌর।

রতন আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ননী তার আগেই চেঁচিয়ে উঠেছে, 'ঝুট ঝামেলা ছাড়, আসল কথাই শোনা হচ্ছে না—' বলে রাজার দিকে ফিরেছে, 'আমরা তো তখন পালিয়ে গেলাম। একটু পরে ফিরে এসে শুনলাম তোকে ধরে নিয়ে গেছে—'

রাজা মাথা নেড়েছে, 'হ্যাঁ।'

'মালখানা কিরকম?'

'দেখেছ তো বাওয়া।'

'কেমন দিলে?'

'কী দেবে?'

কী আবার, আড়ং ধোলাই।'

'একটুও না।'

'থানায় নিয়ে গিয়েছিল?'

'বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।'

'মাইরি!'

'মাইরি।'

'তারপর?'

ননীরা চেয়ার টেনে আরো ঘন হয়ে বসেছিল। ধরা পড়ার পর যা যা হয়েছে, এক নিশ্বাসে বলে গিয়েছিল রাজা।

সব শুনে ননীদের চোখ গোল্লা পাকিয়ে গিয়েছিল। রতন বলেছিল, 'শালা তোমায় বাড়ি নিয়ে ওইসব বললে! ফ্যানের তলায় বসিয়ে খাওয়ালে! রংবাজি ছাড়বার আর জায়গা পাও নি?'

'যা হয়েছে তা-ই বললাম। বিশ্বাস করা না-করা তোদের ইচ্ছে।'

রমলাদির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের পর দুই বছর কেটে গিয়েছে। এর ভেতর রাজাদের সংসারে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তিনদিনের জ্বরে বাবা মারা গিয়েছে। বাবার মৃত্যুর মাসকয়েক পরে

শ্যামনগর লেভেল ক্রসিং-এর কাছে রেলে কাটা পড়ে মরল দাদা। তার জামার পকেটে একটা চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল : 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'।

দাদার মৃত্যুটা অ্যাকসিডেন্ট না, নেহাতই আত্মহত্যা। সাতাত্তর টাকা বাষট্টি পয়সার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর দাদা সব মাসে মানে পেত না। মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা খুবই খারাপ। কোনোরকমে পঙ্গু ঘোড়ার মতো ধুঁকে ধুঁকে চলে! ট্যাক্সফ্যাক্স আদায় মোটেই হয় না। এক কোয়ার্টার যদি কেউ দেয় তো পাঁচ কোয়ার্টার বাকি ফেলে রাখে। মিউনিসিপ্যালিটির যখন এই দুরবস্থা তখন মাইনে দেবে কোত্থেকে?

মাসের পর মাস মাইনে না পেয়ে কিভাবে যে দাদা সংসার চালাত সে-ই জানে। তার মৃত্যুর পর জানা গেল, ধারে ধারে মাথা পর্যন্ত ডুবে ছিল। শ্যামনগরের হেন মানুষ নেই যার কাছে হাত পাতেনি দাদা। এমন কি কাবুলিওলাদের কাছ থেকেও চড়া সুদে ধার করেছে। চারদিকের এত ঋণ জল্লাদের মতোন তাড়া করে তাকে রেল লাইনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর চলন্ত ইঞ্জিনের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছিল!

দাদা তো মরে বেঁচেছে। কিন্তু তার চার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর যাবতীয় দায় এসে চেপেছিল রাজার কাঁধে। শুধু কি তা-ই, দাদার হাজার তিনেক টাকা ঋণের উত্তরাধিকারও সে পেয়েছিল।

দাদা রেলে কাটা পড়বার পর প্রথমটা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল রাজা। কী করবে, কোথায় যাবে, কেমন করে এতগুলো মানুষকে বাঁচাবে, বুঝে উঠতে পারছিল না।

সেভেন এইটের বিদ্যের পুঁজি নিয়ে আর যা-ই হোক, অফিসে চাকরি হয় না। কলকারখানায় অবশ্য ঢোকা যায়।

শ্যামনগর চারধারে নানারকমের কারখানা—কাচকল, চটকল, কাগজকল, স্টিল রোলিং ফ্যাক্টরি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে বেড়াতে লাগল সে। কিন্তু যেখানেই যায় সেখানে হয় স্ট্রাইক, নয় ছাঁটাই কিংবা লক-আউটের তালা ঝুলছে।

মাথা ঠুকে ঠুকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে রাজা, কিন্তু কোথাও একটা দরজা খুলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নিদারুণ এই সময় তাকে ধাক্কা মারতে মারতে পাতালের অন্ধকার সুড়ঙ্গটার ভেতর ঠেলে দিয়েছিল। রাতারাতি রেল ইয়ার্ডের মাল পাচার কবতে শুরু করল সে। ট্রেনগুলোতে উঠে তার কাটতে লাগল, ফ্যান খুলতে লাগল। রাত্রিবেলা নির্জন গলির মুখে দাঁড়িয়ে ছোরা দেখিয়ে ছিনতাইও করতে লাগল। মোট কথা, সারা দেশ আর কাল জুড়ে যে গাঢ় গভীর অন্ধকার, ততদিনে রাজা তার শিকার হয়ে গিয়েছে।

এই ভাবেই চলেছিল।

এর ভেতর রমলাদির কথা যে তার মনে পড়েনি, তা নয়। আড্ডা-গুলতানি-ছিনতাই-মালপাচার, এ সবের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো সেদিনের সেই অদ্ভুত ঘটনা মাঝে মাঝে তাকে চকিত করে গিয়েছে। সময় পেলে রমলাদি তাকে যেতে বলেছিল। রাজা যায় নি। রমলাদি সম্বন্ধে তার মনে যত আকর্ষণ, তার চাইতে অনেক বেশি ভয়। যে মহিলা লোক লেলিয়ে তাকে ধরে এনে বাড়ি নিয়ে যায় এবং ওইরকম অকল্পনীয় আচরণ করে, তাকে সবটুকু বোঝা যায় না। তার বাইরের দিকে সামান্য একটু খোলা, বাদ বাকি সমস্তই রহস্যময়। এমন মানুষকে যেন বিশ্বাস করা যায় না।

এই ক' বছর মাঝে মধ্যে শ্যামনগরের রাস্তায় রমলাদির সঙ্গে দেখা হয়েছে। রমলাদি বলেছে, 'ভাল আছিস?'

রাজা মাথা কাত করেছে, 'হ্যাঁ।'

'আমাদের বাড়ি গেলি না তো?'

'যাব একদিন।'

'আসিস কিন্তু—'

ব্যস, ওই পর্যন্তই। কিন্তু কে জানত, রমলাদির বাড়ি তাকে প্রায়ই যেতে হবে এবং তার জীবনের একটা দিক নিদারুণভাবে ওখানে জড়িয়ে যাবে! কে জানত, অমোঘ নিয়তির মতো রমলাদি তাকে

নিজের ইচ্ছামতো চালাতে থাকবে। কে জানত, এক বিচিত্র ভয়ঙ্কর খেলায় রমলাদির হাতের ঘুঁটি হয়ে যাবে সে।

ব্যাপারটা এইরকম।

রেল-ইয়ার্ডের মাল চুরি এবং ছিনতাইয়ের ব্যাপারে পুলিশের নজর ছিল রাজার ওপর, পেছনে লেগেও ছিল তারা। কিন্তু ধরতে পারছিল না।

ছিনতাই-টিনতাইয়ের দলে নাম লেখাবার পর নাক আশ্চর্য ধারাল হয়ে উঠেছিল রাজার। আধ মাইল দূর থেকে সে পুলিশের গন্ধ পেত এবং সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যেত।

রোজই পুলিশের চোখে ধুলো ছিটিয়েছে রাজা। একদিন রাত্রিবেলা ছিনতাইয়ের সময় কিন্তু সে ধরা পড়ে গেল। সোজা তাকে থানায় নিয়ে লক-আপে পুরে দেওয়া হয়েছিল। পরের দিন কিঞ্চিৎ দলাই মলাই করে কোর্টে পাঠানো হবে। লক-আপে যখন তাকে পোরা হয় তখন অনেক রাত। সেই থেকে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে ছিল রাজা। থানা থেকে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছিল; ছোঁয়নি।

রাজা শুধু ভাবছিল। তার যদি জেল হয়, সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে। ঘুরে ঘুরে দাদার বাচ্চা চারটের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বৌদিকে কোনোদিনই পছন্দ করে না রাজা। তবু তার রুক্ষ কর্কশ ভাঙাচোরা মুখটা দেখতে পাচ্ছিল সে।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। চোখ জ্বালা জ্বালা করছিল। কপালের দু'ধারে মোটা মোটা দুটো রগ সমানে লাফিয়ে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ রাজা এইভাবে বসে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ হিন্দুস্থানী জমাদারের ঘুমজড়ানো, ভারী গলা কানে এসেছিল, 'এ ছোকরে—' তারপরেই তালা খোলার শব্দ।

চমকে মাথা তুলেছিল রাজা। তার চোখ দুটো পাকা করমচার মতো লাল। চারধারে পকেটমার-গাটকাটা-মাতাল-ছিঁচকে চোর, পাতালের অন্ধকারে সরীসৃপের মতো যাদের চলাফেরা, গা জড়াজড়ি করে তারা ঘুমোচ্ছিল। তাদের নাকের মিহি-মোটা-ঘড়ঘড়ে নানারকম আওয়াজে হাজতের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছিল।

চারপাশের কুখ্যাত লোকগুলোর দিকে মনোয়োগ ছিল না রাজার। উদ্বিগ্ন চোখে সে জমাদারের দিকে তাকিয়েছিল।

জমাদার ডেকেছিল, 'আ মেরা সাথ—'

এত রাতে তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় লোকটা? ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল রাজা। লক-আপে তালা লাগিয়ে জমাদারটা সোজা তাকে অফিসার-ইন-চার্জের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল।

সেখানে পা দিয়েই রাজা থ। তখন ক'টা বাজে? দুটো আড়াইটার কম না। এত রাতে অফিসার-ইন-চার্জের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে ছিল রমলাদি। কী একটা মজার কথায় দু'জন প্রচুর হাসছিল।

জমাদারের সঙ্গে রাজাকে দেখে ওদের হাসি থেমে গিয়েছিল। পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, 'এই ছেলেটা তো?'

রমলাদি বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'ওকে কি আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ—' রাজার দিকে ফিরে অফিসার বলেছিলেন, 'এঁর সঙ্গে যাও।'

রাজা বিমূঢ়ের মতো দেখছিল। রাতের এই শেষ প্রহরে রমলাদি কেনই বা থানায় এসেছে, কেনই বা হাজত থেকে তাকে বার করে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায়ই বা যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

এদিকে রমলাদি উঠে পড়েছিল। অফিসার-ইন-চার্জকে বলেছিল, 'রাত্তিরবেলা আপনাকে খুব কষ্ট দিয়ে গেলাম।'

অফিসার এসে বলেছিলেন, 'বিন্দুমাত্র না। আমরা আপনাদের সেবার জন্যই এখানে আছি। যখন ইচ্ছে আসবেন।'

'ধন্যবাদ—' রমলাদি হেসেছিল, 'আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

'নমস্কার।'

অফিসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজার দিকে ফিরেছিল রমলাদি। বলেছিল, 'চল—'

নিঃশব্দ মন্ত্রচালিতের মতো তার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছিল রাজা।

থানার ঠিক গা ঘেঁষেই রাস্তা। সেখানে একটা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। রমলাদি রাজাকে নিয়ে সেটার ওপর উঠে বসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'রাত্তিরে যদি না ফিরিস, তোর বৌদি খুব চিন্তা করবে?'

রাজা বলেছিল, 'না।'

'তা হলে আমার বাড়িই চল।'

দু'বছর আগের মতো নিজের একতলা বাড়িটায় এনে তাকে সোফায় বসিয়ে মুখোমুখি বসেছিল রমলাদি।

থানায় রমলাদিকে দেখার পর রাজা সেই যে বিমূঢ় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি এসেও তেমনটি ছিল। বিস্ময়, বিমূঢ়তা, কিছুই তার কাটেনি। এতক্ষণ রমলাদির কথায় সে যে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল, তা যেন অনেকটা ঘোরের মধ্যে। এবার অনেকটা সজ্ঞানে বলল, 'অত রাত্তিরে আপনি থানায় গিয়েছিলেন যে।'

শব্দ করে হেসে উঠেছিল রমলাদি, 'মাঝে মাঝে আমার ঘাড়ে ভূত চাপে। রাত-বিরাতে যেখানে সেখানে গিয়ে হাজির হই।'

রাজার মনে হয়েছিল, উত্তরটা এড়িয়ে গেল রমলাদি। কী মনে পড়তে রাজা খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'আমার জন্যেই কি আপনি থানায় গিয়েছিলেন?'

একটু ভেবে রমলাদি উত্তর দিয়েছে, 'তোর জন্যে? হবে।'

বিহ্বলের মতো রাজা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি থানায়, আপনি জানলেন কী করে?'

গলার স্বর পাতালে নামিয়ে রমলাদি ফিস ফিস করেছিল, 'হাত গুনে—' তারপরেই স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করেছিল, 'হ্যাঁ রে, হাজতে তোকে কিছু খেতে দিয়েছিল?'

'দিয়েছিল। খাই নি।'

'কেন?'

'খেতে ইচ্ছে করছিল না।'

'পেট ভর্তি তো খিদে রয়েছে। কিছু খাবি?'

'না।'

বার বার বলা সত্ত্বেও রাজা খায় নি। সে আবার বলেছিল, 'আমার হাজতে থাকার কথা কেমন করে জানলেন, বলুন না?'

রমলাদি হালকা গলায় বলেছিল, 'বললাম তো।'

'না।'

'কী না?'

'হাত গোনার কথাটা সত্যি না।'

'বিশ্বাস না করলে আমি আর কী করতে পারি?'

একটু চুপ। তারপর হঠাৎ চাপা গলায় রমলাদি বলে উঠেছিল, 'এই শ্যামনগরে কে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে, সব আমি জানি। আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে কিছু হবার উপায় নেই।' কাছ থেকে না, অনেক অনেকদূর থেকে তার কণ্ঠস্বর যেন হাওয়ায় ভর করে ভেসে এসেছিল।

'আপনি সবার খবর জানেন?'

'জানি। কার খবর জানতে চাস বল?'

কী উত্তর দেবে, রাজা ভেবে পায় নি।'

রমলাদি আবার বলেছিল, 'অন্যের কথা থাক, তোরটাই বলি।'

'আমার কী কথা?' রাজার গলার স্বর শিথিল শুনিয়েছিল।

'তোর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল কদ্দিন আগে?'

'দু' বছর হবে।'

'এর ভেতর তোর বাবা আর দাদা মারা গেছে। সংসারের সব দায় এসে চেপেছে তোর কাঁধে। চাকরি বাকরির জন্যে চারদিকে হন্যে হয়ে বেড়িয়েছিস, কিন্তু কিছুই জোটে নি। রোজগারের পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছেনতাইয়ের দলে জুটেছিস। রেলের মাল পাচার করে চোরা বাজারে বেচিস—'

যত শুনছিল ততই মাথা ঝিমঝিম করছিল রাজার। মহিলা কি সত্যিই হাত গুনতে জানে, না অদৃশ্য ছায়ার মতো নিয়ত তাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে?

রমলাদি বলেছিল, 'কি রে, যা বলছি সত্যি?'

আস্তে মাথা নেড়েছিল রাজা।

রমলাদি আবার বলেছিল, 'আরো বলব?'

ভয়ে ভয়ে রাজা শুধিয়েছিল, 'কী?'

'আজ তোকে কেন থানায় যেতে হয়েছিল?'

রাজা নিরুত্তর।

রমলাদি বলেছিল, 'তুই যখন শুনতে চাস না, থাক।'

কথায় কথায় ভোর হয়ে গিয়েছিল।

রমলাদি বলেছিল, 'সারারাত তো বক বক করে কেটে গেল। মুখ টুখ ধুয়ে এবার কিছু খেয়ে নে।'

রাজা বলেছিল, 'আমি বাড়ি যাই।'

'এতক্ষণ থেকে শেষ অব্দি বাসি মুখে চলে যাবি?'

'বাড়ি গিয়ে চান করে ঘুমোব।'

'ইচ্ছে হলে এখানেও চান করে ঘুমোতে পারিস।'

রাজা বলতে পারে নি, নিজের বিছানাটি ছাড়া তার অন্য কোথাও ঘুম আসে না। একটু ইতস্তত করে সে বলেছিল, 'বাড়িই চলে যাই।'

রমলাদি অনিচ্ছার সুরে বলেছিল, 'তোর যখন থাকবার ইচ্ছে নেই, যা।'

রাজা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই মুহূর্তে কী মনে পড়ে গিয়েছিল তার। রমলাদির চোখে চোখ রেখে বলেছিল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'.

'কী?'

'আপনি কী করে আমাকে থানা থেকে বার করে আনলেন?'

'কী করে বলতে?'

'মানে আপনি কি আমার জামিন হয়েছেন?'

'না।'

'তবে?'

'অত কথায় তোর দরকার কী? ছাড়া পেয়েছিস, বাড়ি চলে যা।'

তবু দাঁড়িয়ে ছিল রাজা।

রমলাদি বলেছিল, 'কী হল? আর কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ—' রাজা ভয়ে ভয়ে শুধিয়েছে, 'আমাকে আবার থানায় যেতে হবে?'

'থানায় যাবি কেন?' রমলাদি অবাক।

'আপনি তো বললেন, জামিন দেন নি। পুলিশ যদি কোর্টে পাঠাবার জন্যে পবে টানা-হ্যাঁচড়া করে? তার চাইতে আগেভাগেই যাওয়া ভাল।'

ভুরু কুঁচকে ঝকমকে ধারাল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে রমলাদি। তারপর রুক্ষ বিরক্ত গলায় বলেছে, 'থানায় আর কোর্টে যাবার বুঝি খুব শখ? বলিস তো এক্ষুনি পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি।'

রাজা হকচকিয়ে গিয়েছে, 'না, মানে—'

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই ছিল রমলাদি। আস্তে আস্তে বলেছিল, 'যা, বাড়ি যা—'

আর কিছু মুখে আনতে সাহস হয় নি রাজার। নিঃশব্দে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সে।

হঠাৎ পেছন থেকে রমলাদি ডেকেছিল, 'এই শোন—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল রাজা।

রমলাদি বলেছে, 'তোর তো খুব টাকার দরকার, না?'

মহিলা কী বলতে চায়, কিছু বুঝতে না পেরে রাজা তাকিয়েই থেকেছে।

রমলাদি আবার বলেছে, 'কি বোকা ছেলে রে, এত বড় একটা সংসার না তোর মাথায়?'

'হ্যাঁ।'

'সংসার চালাতে টাকা লাগে না?'

রাজা মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ লাগে।

রমলাদি বলেছে, 'পরশুদিন দুপুরবেলা একবার আসবি। নিশ্চয়ই আসবি। তোর জন্যে আমি একটা কাজ রেখে দেব। করতে পারবে ভালই টাকা পাবি।'

'আসব।'

মাঝখানে দুটো দিন খুবই অস্বস্তিতে কাটিয়েছিল রাজা। কিভাবে, কোন মূল্যে রমলাদি তাকে লক-আপ থেকে বার করে এনেছিল, সে জানতে পারেনি। তার শুধু মনে হয়েছে, এই বুঝি পুলিশ এল। এই বুঝি তাকে নিয়ে আবার হাজতে পুরল। কিন্তু না, পুলিশ আসে নি।

কথামত 'পরশু দিন'ই রমলাদির বাড়ি গিয়েছিল। প্রথম আলাপের পর দু'বছর সে যে আসত না তার কারণ ছিল ভিন্ন। কিন্তু এবাব রমলাদি তার নাকের সামনে লোভনীয় টোপ ঝুলিয়ে দিয়েছে।

সেদিন আব বসতে বলে নি রমলাদি। দবজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, একটা লম্বা বাদামি রঙের খাম এনে রাজার হাতে দিয়েছিল। বলেছিল, 'এই চিঠিটা নিয়ে এক্ষুনি তোকে একবার কলকাতায় যেতে হবে।'

রাজা বলেছিল, 'যাব।'

'খামের ওপর নাম আর ঠিকানা লেখা আছে। ওই ঠিকানায় গিয়ে যার নাম লেখা আছে তাকে চিঠিটা দিবি।'

'আচ্ছা।'

'চিঠিটা যে পেয়েছে সে কথা একটা কাগজে তার কাছ থেকে লিখিয়ে আনবি।'

রাজা মাথা নেড়েছিল। তারপরেই একটা কথা মনে পড়তে জিজ্ঞেস করেছিল, 'যদি ভদ্রলোককে না পাই, তাহলে এই চিঠি ফেরত নিয়ে আসব তো?'

একটু ভেবে রমলাদি বলেছিল, 'পাবিই। এই চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছে। যদি কোনো কারণে না পাস, চিঠিটা আর কারো হাতে দিবি না, ফেরত নিয়ে আসবি।'

'আচ্ছা।'

'পকেটে পয়সা কড়ি আছে?'

'আছে।'

'তা হলে গাড়ি ভাড়াটা তোর কাছ থেকেই দিয়ে দিস, কলকাতা থেকে ফিরে এলেই পেয়ে যাবি।' একটু থেমে রমলাদি আবার বলেছিল, 'একটা-দশে কলকাতার ট্রেন আছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলে ধরতে পারবি। না পারলে বসে থাকিস না। বাসে চলে যাস।'

রাজা বেরিয়ে পড়েছিল।

সন্ধেবেলা কলকাতা থেকে ফিরে আসতেই রমলাদি জিজ্ঞেস করেছিল, 'চিঠি দিয়ে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক লোককে দিয়েছিস তো?'

চিঠি দিয়ে লিখিয়ে এনেছিল রাজা। পকেট থেকে নিঃশব্দে প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদটা বার করে রমলাদির হাতে দিতে দিতে বলেছিল, 'এই দেখুন—'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাগজের টুকরোটা দেখতে দেখতে তারিফের গলায় রমলাদি বলেছিল, 'তাই তো রে, তুই দেখছি বেশ কাজের ছেলে।'

প্রশংসার কথায় মুখ নামিয়ে নিয়েছিল রাজা।

রমলাদি এরপর আর বিশেষ কিছু বলেনি। কলকাতায় যাতায়াতের ভাড়া এবং চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার মজুরি হিসেবে পনেরটা টাকা দিয়েছিল।

একটা চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য পনের টাকা! রাজা অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সেই শুরু। তারপর থেকে রমলাদির কাছে নিয়মিত যেতে লাগল সে। নিজের থেকে খুব কমই যেত। রমলাদিই 'শোভা কাফে'তে খবর দিয়ে তাকে ডেকে পাঠাত।

অকারণে ডাকে না রমলাদি। যখন ডাকে, একটা না একটা কাজ দেয়। প্রথম প্রথম ছোটোখাটো কাজ দিত। বেশির ভাগ দিনই কলকাতায় চিঠি নিয়ে যেতে হত। মাঝে মাঝে দু-একজনের সঙ্গে দেখা করে শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' জাতীয় দু'একটা কথা বলতে হত। কী প্রসঙ্গে এই 'হ্যাঁ' বা 'না', রাজা বঝতে পারত না। জিজ্ঞেস করলে রমলাদি রুক্ষ গলায় বলত, 'অত কথায় তোর দরকার কী? যেটুকু বলতে বলা হয়েছে তার বেশি জানতে হবে না। অকারণ কৌতূহল ভাল না।' সমস্ত ব্যাপারটাই রাজার রহস্যময় মনে হয়েছে তখন।

রাজা লক্ষ করেছে, কলকাতার সঙ্গেই রমলাদির যত যোগাযোগ। বড় বড় হোটেলের ম্যানেজার কি মালিক, সরকারি অফিসার, বিরাট বিরাট কোম্পানির ডিরেক্টর, বাঙালি অবাঙালি, সমাজের নানা স্তরের প্রতিষ্ঠিত, প্রখ্যাত কত মানুষকে যে চেনে মহিলা! নিয়মিত যাতায়াতের ফলে রাজা টের পেয়েছে, ওই মানুষগুলো রমলাদির আঁচালে বাঁধা। রমলাদি ভুরু কুঁচকে একটু ইশারা করলে তাঁরা প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন। একেক দিন রাজা দেখেছে, শ্যামনগরের পুরনো নির্জন পাড়ায় রমলাদির একতলা বাড়িটার সামনে খোয়া ওঠা রাস্তার ওপাশে ঝকঝকে নতুন মোটরের ভিড় লেগে যায়।

প্রথম বছর দু'একটি চিঠি-টিঠি কি খবর পৌঁছে দিয়ে আসত রাজা। তারপর নতুন একটা কাজের ভার দিল রমলাদি। একেকটি তরুণী মেয়েকে সে তার সঙ্গে দিয়ে দিত। তাদের পাহারা দিয়ে কলকাতায় নিয়ে যেত রাজা এবং রমলাদির নির্দেশ মতো কোনো হোটেলে কিংবা পার্ক স্ট্রিট কি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের নির্জন অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ঘরে রেখে আসত। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার পরই দায়িত্ব থেকে তার মুক্তি।

চিঠি কি খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজা পেত পনের টাকা। মেয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিরিশ টাকা।

শ্যামনগর নামে এক বেগবর্ণহীন মলিন শহরের এক মহিলার সঙ্গে কলকাতার ওই সব উচ্চ চূড়ের মানুষগুলোর এত ঘনিষ্ঠতা কেন, প্রথম দিকে সে রহস্য বুঝতে পারত না রাজা। কিন্তু যেদিন থেকে কলকাতায় মেয়ে রেখে আসার দায়িত্ব কাঁধে চাপল, রাজার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, কলকাতার ওই লোকগুলো তো অতি তুচ্ছ, গোটা পৃথিবীকে পায়ের তলায় রাখবার চাবিকাঠিটা রমলাদির হাতের মুঠোয় রয়েছে।

কতক্ষণ একা একা বসে ছিল খেয়াল নেই। পায়ের শব্দে রাজা চমকে উঠল।

রমলাদি নিজেই চায়ের কাপ আর ডিমভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে একটি আঠার উনিশ বছরের মেয়ে।

অন্যদিন দুর্গা চা'টা, খাবার দাবার এনে দেয়। এক পলক রমলাদির পেছনের সেই মেয়েটিকে দেখে নিয়ে বিব্রতভাবে রাজা বলল, 'সত্যিসত্যিই আপনি ওসব করে নিয়ে এলেন! দুর্গামাসিকে পাওয়া গেল না?'

চা আর খাবার টেবিলে নামিয়ে রমলাদি বলল, 'পাওয়া গেছে। সে এখন ওধারের ঘর দোর ধুচ্ছে। দু'একবার চায়ের কথা বললাম তো চেঁচিয়ে মেঁচিয়ে উঠল। মহারানীর যা মেজাজ!'

দুর্গা যদিও মাইনে-করা লোক, তাকে সেভাবে দেখে না রমলাদি। রমলাদির ব্যবহার অনেকটা সখীর মতো। ক'বছর নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সে কথা রাজার জানা হয়ে গিয়েছে।

রমলাদি আবার বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। এক্ষুনি কলকাতায় যেতে হবে।'

রাজা ঘাড় গুঁজে খেতে শুরু করল।

একটু পর রমলাদি ডাকল, 'রাজা—'

রাজা চোখ তুলে তাকাল।

সঙ্গের সেই মেয়েটিকে দেখিয়ে রমলাদি বলল, 'এর নাম জয়া—'

কখন মেয়েটা অর্থাৎ জয়া ওধারের একটা তক্তপোষে গিয়ে বসেছিল, রাজা টের পায় নি। সে জয়ার দিকে তাকাল।

একটু আগেই জয়াকে দেখেছে রাজা। কিন্তু সে দেখার পেছনে বিশ্লেষণ ছিল না। যেভাবে মানুষ পাখি দেখে, আকাশ দেখে, কিংবা অন্য কোনো দৃশ্যের দিকে অন্যমনস্কের মতো তাকায় ঠিক সেইভাবে জয়াকে দেখেছিল সে। কিন্তু এবার ভালভাবে তাকাল। খুব মনোযোগ দিয়ে পলকহীন দেখতে লাগল।

বয়সটা অগেই আন্দাজ করেছিল রাজা। পানপাতার মতো মুখ, সরু চিবুকের এক কোণে মুসুর ডালের মতন লালচে একটা জড়ুল। পাতলা নাক। চোখ দুটি বড় বড়, তাতে যেন অনেক মায়া জড়ানো। ছোট কপালের ওপর থেকে থাক থাক ঘন চুল। গায়ের রং কালোর ধার ঘেঁষা। কালো হলেও বেশ মসৃণ আর উজ্জ্বল। তবে মেয়েটা রোগা। সেটা অসুখের জন্য নয় বলেই মনে হয়। অপুষ্টি আর খাদ্যাভাবই তার কারণ। তবু তাকে ঘিরে কোথায় যেন অলৌকিকের একটু ছোঁয়া আছে।

পরনে সস্তা রঙিন তাঁতের শাড়ি আর হলুদ জামা। জামাটার হাতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ছুঁচ দিয়ে হাতে রিপু করা হয়েছে। পায়ে খেলো চটি, তা-ও তালিমারা। বাইরে বেরুবার সাজ যদি এই হয়, বাড়িতে কিভাবে সে থাকে অনায়াসেই অনুমান করা যায়। কোন আর্থিক দুরবস্থার ভেতর তার দিন কাটে তা বলে না দিলেও চলে। জয়ার সর্বাঙ্গে তার ছাপ মারা আছে।

রমলাদি আবার বলল, 'আগরওলাকে চিনিস তো?'

জয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল রাজা। দূরমনস্কের মতন শুধলো, 'কোন আগরওলা?'

'দ্বারকাপ্রসাদ আগরওলা। আগেও তো দু'বার গেছিস তার কাছে।'

রাজার মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্ক স্ট্রিটের ওদিকটায় তো?'

রমলাদি আস্তে মাথা নাড়ল, 'জয়াকে আগরওলার কাছে পৌঁছে দিবি। ওর ইন্টারভিউ আছে।'

'আচ্ছা—'

ডিম ভাজা আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এক চুমুকে চা শেষ করে রাজা উঠে দাঁড়াল, 'আমি রেডি—'

রমলাদি জয়াকে বলল, 'তুমি রাজার সঙ্গে যাও—'

ভীরু চোখে রাজার দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জয়া। মৃদু, আধফোটা গলায় বলল, 'যাব?'

'যাবে বৈকি।'

রাজা বাইরে যাওয়ার দরজাটার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল।

রমলাদি বলল, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ—' জয়া খুব আস্তে মাথা নাড়ল।

'বল না—'

একটু ইতস্তত করে জয়া ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না?'

দু'পা এগিয়ে তার কাঁধে আলতোভাবে একটি হাত রাখল রমলাদি। বলল, 'আমিই তোমাকে নিয়ে যেতাম কিন্তু হঠাৎ একটা জরুরি কাজ পড়েছে। এক ভদ্রলোক বিকেলবেলা আসবেন; তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমি না হয়—'

'কী?'

'পরে একদিন আপনার সঙ্গে যাব।'

'পরে গেলে তো হবে না। আজই যেতে হবে, সেইরকম ব্যবস্থা করা আছে। আর দেরি করো না, যাও—'

জয়া তবু দাঁড়িয়ে রইল।

রমলাদি আবার বলল, 'কী হল?'

জয়া চুপ।

তার মনোভাব কিছুটা যেন আন্দাজ করতে পারল রমলাদি। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'রাজার সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করছে?'

জয়া উত্তর দিল না। রমলাদির দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ নামাল।

জয়ার চাউনির ভেতর উত্তরটা ছিল। রমলাদি তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কিছু ভয় নেই। রাজা খুব বিশ্বাসী ভাল ছেলে। আমার সঙ্গে যাওয়া যা, ওর সঙ্গে যাওয়াও তাই।'

জয়া কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে রমলাদি বলল, 'আজ না গেলে কিন্তু কাজটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। চল—'

একরকম ঠেলতে ঠেলতেই জয়াকে বাইরে নিয়ে গেল রমলাদি। রাজা আগেই বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জয়া আর রমলাদির সব কথাই শুনেছে সে।

রাজার চোখে চোখ রেখে রমলাদি বলল, 'জয়াকে নিয়ে যা। দেখিস ওর যেন কোনো অসুবিধে না হয়।'

রাজা বলল, 'আচ্ছা—'

সজ্ঞানে না, যেন ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে অদৃশ্য কোনো শক্তি জয়াকে ধাক্কা মারতে মারতে রাজার পিছু পিছু হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

কিছুক্ষণের ভেতর তারা স্টেশনে এসে পড়ল।

তিন

রমলাদির বাড়ি থেকে স্টেশন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি রাজা। স্টেশনে এসে রাজা বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি টিকিট কেটে আনি।'

জয়া অস্ফুটে বলল, 'আচ্ছা।'

প্ল্যাটফর্মের একধারে তাকে দাঁড় করিয়ে রাজা টিকিট নিয়ে এল।

কলকাতায় ট্রেন আসতে এখনও দেরি আছে। অন্তত মিনিট কুড়ি তো বটেই। রাজা বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, বেফায়দা পায়ে ঝিঁঝি ধরানো। চলুন কোথাও বসা যাক।'

প্ল্যাটফর্মে অনেকগুলো সিমেন্টের বেঞ্চ রয়েছে। জয়াকে নিয়ে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল রাজা।

শীতের সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। রোদ এখন হলদে। দিনটা দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। রুক্ষ জকণাহীন বাতাস মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে যেন।

রাজা আর জয়া এক বেঞ্চে বসেছিল ঠিকই, তবে পাশাপাশি নয়। দু'জনের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা।

আগেও অনেক মেয়ে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে রাজা। কেউ তার সঙ্গে যেতে আপত্তি করে নি, ভয়ের কথাও বলে নি। কিন্তু এই মেয়েটা—

আগে যেসব মেয়েদের নিয়ে গিয়েছে তাদের দিকে রাজা তাকাত না পর্যন্ত। পয়সার জন্য তাদের পৌঁছে দেওয়া। ব্যস ওইটুকুই। অকারণ কোনো কৌতূহল দেখাত না। প্ল্যাটফর্মের এই বেঞ্চিতে বসে আড়ে আড়ে আজ কিন্তু জয়াকে দেখতে লাগল সে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে সারা গা মুড়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে জয়া। তার চোখেমুখে এক ধরনের উদ্বেগ আর ভয় ফুটে রয়েছে। কিন্তু ভয় এবং উৎকণ্ঠার মধ্যেও জয়ার মুখখানা ভারি সরল আর নিষ্পাপ। ভোরে ফোটা প্রথম ফুলটির মতো স্নিগ্ধ, পবিত্র।

অনেক দ্বিধার পর রাজা গলার ভেতরে একটু কাশল। চমকে জয়া তার দিকে তাকাল।

রাজা বলল, 'কী ভাবছেন অত?'

'কই, কিছু না তো—' জয়ার গলা খুব অস্পষ্ট, মৃদু।

'আমার সঙ্গে যেতে ভয় করছে?'

একটুক্ষণ থমকে রইল জয়া। তারপর আরো আবছা গলায় বলল, 'না, ভয় কিসের—'

রাজা বলল, 'ভয় নেই তো—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেল সে।

জয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

রাজা আবার বলল, 'ভয় নেই তো আমার সঙ্গে আসতে চাইছিলেন না কেন?'

'কে বললে?'

'রমলা দিদিদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি শুনেছি।'

জয়া উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় উত্তর দিক থেকে হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল। রাজা বলল, 'উঠুন উঠুন। এখানে মোটে এক মিনিট দাঁড়াবে। তাড়াতাড়ি না করলে ট্রেন ধরতে পারব না। এ গাড়ি ফসকালে তিন ঘন্টার ভেতর কিন্তু কোনো ট্রেন নেই।'

চকিতে একবার রাজাকে দেখে নিয়ে দ্রুত সামনের একটা কামরায় উঠে পড়ল জয়া। তার পেছন পেছন উঠল রাজা।

এই দুপুর বেলায় গাড়িতে বিশেষ ভিড় থাকে না। কামরাটা প্রায় ফাঁকাই। দু'চার জন যাত্রী এখানে সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

এককোণে জানলার ধার ঘেঁষে প্রথমে জয়াকে বসাল রাজা, তারপর একটু দূরে নিজে বসল।

তারা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। জানালার বাইরে ঝোপঝাড়, ফসলহীন শূন্য মাঠ, মজা খাল, টেলিগ্রাফের তার সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই দুপুরেও আকাশটা ধূসর, ঝাপসামতো। দিগন্তের কাছটায় অল্প অল্প কুয়াশা জমেছে যেন। অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ঘেঁষে এক ঝাঁক শঙ্খচিল ডানা মেলে একেবারে স্থির হয়ে আছে।

অলস চোখে কিছুক্ষণ মাঠ-পাখি-আকাশ এবং টেলিগ্রাফের তার দেখল রাজা, তারপর অন্যমনস্কের মতো জয়ার দিকে তাকাল।

আশ্চর্য, জয়া তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই খুব তাড়াতাড়ি জানালার বাইরে মুখ ফেরাল।

রাজার মনে হল, কিছু বলতে চায় জয়া। অনেকক্ষণ তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও যখন দেখা গেল জয়া তার দিকে তাকাচ্ছে না, তখন চোখ দুটো আবার জানালার বাইরে নিয়ে গেল রাজা।

দেখতে দেখতে আরেকটা স্টেশন এসে গেল। যাত্রীদের ওঠানামা, কুলিদের ছোটাছুটি, ব্যস্ততা, গার্ডের হুইসিল। তারপরেই ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করল। জানালার বাইরে আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। মাঠ-পাখি-আকাশ-কুয়াশা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুক্ষণ সে সব দেখে কী ভেবে আবার সঙ্গিনীর দিকে তাকাল রাজা। এবার চোখাচোখি হয়ে গেল। জয়া তার দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখে চোখ পড়তেই বিব্রত জয়া আগের বারের মতো জানালার বাইরে মুখ নিয়ে যাচ্ছিল। রাজা বলল, 'আমায় কিছু বলবেন?'

জয়ার মুখ কেমন যেন বিষণ্ণ, করুণ। আজই, খানিক আগে তাকে প্রথম দেখেছে রাজা। তবু মনে হয়, মেয়েটা সবসময় কী যেন ভাবে।

জয়া কিছু বলল না। চোখ নামিয়ে দ্বিধান্বিতের মতো আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে লাগল।

রাজা আবার সেই প্রশ্নটাই করল, 'আমায় কিছু বলবেন?'

আবছা, আধফোটা গলায় জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

'কী?' রাজা উন্মুখ হল।

সঙ্গে সঙ্গে জয়া উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছুতে ক'টা বাজবে?'

'তিনটে, সাড়ে তিনটে।'

'আজই ইন্টারভিউ হয়ে যাবে তো?'

কিসের ইন্টারভিউ, রাজা বুঝতে পারল না। অস্পষ্ট গলায় কী উত্তর দিল, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট নয়।

জয়া বলল, 'আচ্ছা, ইন্টারভিউ দিতে কতক্ষণ লাগে?'

ইন্টারভিউ ব্যাপারটা কী, রাজার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে শুনেছে, চাকরি বাকরির জন্য ওটা দরকার। অনেকটা আন্দাজে, ভাসা-ভাসা ভাবে সে বলল, 'ঘণ্টাখানেক লাগবে হয়তো।'

'তার মানে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ওখানে থাকতে হবে।'

'ওই রকম।'

একটু ভেবে জয়া বলল, 'ইন্টারভিউ না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন তো?'

'কেন?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রাজা।

'আমাকে নিয়ে আসবেন না?'

রাজা জানে, যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে সহজে জয়ার মুক্তি নেই। কখন সে ছাড়া পাবে, কে বলবে। নরকের সিংদরজায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব। তারপরের ব্যাপার নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

রাজা বলল, 'রমলাদি আপনাকে পৌঁছে দেওয়ার কথাই বলেছে। নিয়ে যাবার কথা তো কিছু বলে নি।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

'আমি একা—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করল জয়া।

তার মনের কথা যেন পড়তে পারল রাজা। বলল, 'একা ফিরতে পারবেন না?'

'আমি কখনো কলকাতায় একা একা যাতায়াত করি নি। যা দু'চারবার এসেছি, বাবার সঙ্গে।'

'তা হলে তো মুশকিল।'

জয়া এবার অনুনয়ের গলায় বলল, 'এক ঘণ্টার তো ব্যাপার। আপনি একটু কষ্ট করে থেকে যাবেন। ইন্টারভিউটা হয়ে গেলেই আপনার সঙ্গে ফিরে আসব।'

রাজা মনে মনে ভাবল, একবার আগরওলার হাতে তুলে দিই না। তারপর কায়দা করে চম্পট দেওয়া যাবে। অন্যমনস্কের মতো বলল, 'আচ্ছা—'

'রাগ করলেন?'

'রাগ করব কেন?'

'আপনার ওপর জুলুম করছি বলে।'

'জুলুম কি আছে—' রাজা হাসতে চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার ভেতর আরেকটা স্টেশন পেরিয়ে গেল।

হঠাৎ এক সময় মৃদু গলায় জয়া ডেকে উঠল, 'শুনছেন—'

চমকে রাজা ঘুরে বসল, 'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল জয়া।

উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে থাকল রাজা।

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে আগেও কি আপনি এসেছেন?'

জয়া কী জানতে চায় বুঝতে না পেরে খুব সতর্কভাবে রাজা বলল, 'এসেছি। কেন?'

'ওটা কিসের অফিস?'

রাজা কেমন করে বলবে, ওটা একটা হোটেল। তার দোতলায় সারি সারি গোপন অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। সেখানে সন্ধের পর নরকের খেলা শুরু হয়ে যায়। কলকাতার যত সরীসৃপ বুকে হেঁটে হেঁটে ওখানে চলে আসে। আর রমলাদি তাদের জন্য চারদিক থেকে যুবতী মেয়ে জোগাড় করে সাপ্লাই দেয়। তাদের দাবি—কৌমার্য অটুট আছে, এমন তাজা অনাঘ্রাতা তরুণী। স্বাস্থ্যবতী কিশোরী হলে কথাই নেই।

রাজা জড়ানো সুরে বলল, 'এই নানারকম ব্যাপারের—'

'খুব বড় অফিস?'

'মন্দ না।'

কী ভেবে জয়া বলল, 'শুনেছি, রমলাদি বললেই ওখানে চাকরি হয়ে যায়?'

রাজা বিব্রত বোধ করল। এর আগেও অনেক মেয়েকে আগরওলার হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে সে। কিন্তু রাস্তায় কারো সঙ্গেই দু'একটার বেশি কথা হয়নি।

রাজা বলল, 'আমি ঠিক জানি না। আপনাকে কে বললে?'

'রমলাদি নিজে।'

'ও—'

একটু চুপ।

তারপর একটা কথা মনে পড়তেই রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা—'

জয়া তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী বলছেন?'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'নবীপুরে।'

'ওখানেই আপনাদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তাই হবে। শ্যামনগরের মেয়ে হলে মুখচেনা অন্তত থাকত। আপনাকে আগে দেখেছি বলে মনে হয় না।'

জয়া উত্তর দিল না।

রাজা আবার বলল, 'নবীপুরে আপনাদের বাড়িটা কোথায়?'

জয়া বলল, 'নবীপুরে আপনি কখনও গেছেন?'

'অনেক বার।'

'আমাদের বাড়ি স্টেশনের গায়েই।'

চোখ কুঁচকে ভাবতে লাগল রাজা। তারপরে বলল, 'স্টেশন থেকে বেরুলেই তো একটা হলদে দোতলা বাড়ি। ওইটা?'

'না।' জয়া মাথা নাড়ল, 'দোতলা বাড়িটার পর একটা মজা পুকুর আছে না?'

'আছে।'

'তার পুব পাড়ে যে পুরনো একতলা বাড়িটা, সেইটে আমাদের।'

রাজা বলল, 'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

রমলাদি এর আগে তার সঙ্গে যাদের কলকাতায় পাঠিয়েছে তাদের কোনো কথাই জিজ্ঞেস করত না রাজা। অপরিচিত দর্শকের মতো মাঝে মাঝে তাকাত শুধু। কিন্তু আজকের ওই জয়া, যার মুখ করুণ এবং বিষণ্ণ, যার চোখেমুখে ভীরুতা আর উৎকণ্ঠা, ধীরে ধীরে তার সম্বন্ধে কেমন যেন কৌতূহল বোধ করতে শুরু করল রাজা। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাবার নাম কী বলুন তো—'

মৃদু গলায় জয়া বলল, 'রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলি।'

রাজা চমকে উঠল, 'আপনার বাবা নেই।'

জয়া উত্তর দিল না, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

রাজা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দিন মারা গেছে?'

'বছর দুই।'

'কী হয়েছিল?'

'টি. বি—'

একটু ভেবে রাজা এবার শুধলো, 'মা আছে?'

জয়া বলল, 'আছেন।'

'ভাইবোন?'

'আছে।'

'ক'জন?'

'আমরা তিন বোন, দুই ভাই।'

'ভাইরা কেউ চাকরি বাকরি করে?'

'না—' রাজার চোখের দিকে তাকিয়ে জয়া বলল, 'ভাইরা খুব ছোট, চাকরি করার বয়েস হয় নি।'

'আর বোনেরা?'

'আমার চাইতে একজন বড়, আরেকজন ছোট। তবে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল জয়া।

রাজা জিজ্ঞাসু সুরে বলল, 'তবে কী?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জয়া বলল, 'দিদি থেকেও নেই, সে পাগল। মাঝে মাঝে দড়ি দিয়ে বেঁধেও রাখতে হয়।'

বন্ধুদের সঙ্গে যে ভাষায় যে সুরে রাজা কথা বলে তেমন ভাবে অন্যের সঙ্গে বলে না। পাছে মুখ ফসকে আজেবাজে ঢিলে শব্দ বেরিয়ে পড়ে সে জন্য খুব সতর্ক থাকে।

সেই দুপুর থেকে সংযম দেখিয়ে আসছে রাজা। এবার আর পারল না। নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'বাপ মরেছে, বোন পাগল। বেড়ে গাড্ডায় পড়ে গেছেন মাইরি।'

জয়া চুপ করে থাকল।

রাজা আবার বলল, 'ফ্যামিলিতে ইনকাম করবার আর কেউ আছে?'

'না।'

রমলাদি যাদের পৌঁছে দিতে বলে তাদের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না রাজা। কিন্তু জয়ার সঙ্গে সমানে বকে যাচ্ছে। খেয়াল হতে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

একটু ভেবে নিয়ে রাজা বলতে লাগল, 'সেই জন্যেই বুঝি চাকরির খোঁজে বেরিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'আপনি কদ্দুর পড়াশোনা করেছেন?'

'পি. ইউ পাস করেছি। তারপরেই বাবা মারা গেল। নইলে এতদিনে বি. এ পার্ট ওয়ানটা পাস করে যেতাম।'

এই রোগা করুণ মেয়েটা পি. ইউ পাশ। কোনো কারণ নেই, তবু মনে মনে কেমন যেন দমে গেল রাজা।

লোকাল ট্রেনটা মাঝখানে কতগুলো স্টেশন পার হয়ে গিয়েছে, কেউ লক্ষ করেনি। অনেকক্ষণ গাড়ির চাকার একটানা ঝকঝক শব্দ শুনল রাজা, জানালার বাইরে পরিচিত রহস্যহীন দৃশ্য দেখল। তারপর আচমকা ঘুরে বসে শুধলো, 'রমলাদির সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো?'

'এমনি জানতে ইচ্ছে করছে।'

জয়া বলল, 'মাস তিনেকের মতো।'

'কোথায় আলাপ হয়েছিল?' রাজা স্থির চোখে তাকাল।

'আমাদের বাড়িতে।'

চোখ কুঁচকে রাজা শুধলো, 'রমলাদি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল?'

জয়া মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ?'

'আমাদের দুর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে রমলাদির জানাশোনা ছিল। তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন।'

'কোনো দরকারে এসেছিল?'

'না—' একটু ভেবে জয়া বলল, 'আমার আত্মীয়টি আমাদের বাড়ি আসছিলেন, উনি সঙ্গে ছিলেন তাই এসেছিলেন।'

রাজা জানে, চারদিকের ছোট ছোট শহর আর গ্রামগুলোর কী নিদারুণ অবস্থা। চাকরি নেই, বাকরি নেই, জীবিকার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। কলকারখানাগুলো ঝপাঝপ দরজায় তালা লাগাচ্ছে।

নিজেকে দিয়েই রাজা জানে, বেশির ভাগ বাড়িতে এক বেলা খাওয়া জোটে তো আরেক বেলা উপোস। এই যখন অবস্থা তখন রমলাদি চরকির মতো চারদিকের শহর আর গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। যে বাড়িতে যুবতী মেয়ে আছে, গায়ে পড়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করে, ভাব জমায়। তারপর শুভাকাঙ্খিনীর ছদ্মবেশে সর্বনাশা চোরাবানের মতো তাদের সংসারের ভিত ধসিয়ে দেয়। 'চাকরি করে দেব' কিংবা 'রোজগারের পথ দেখিয়ে দেব'—এই সব লোভনীয় টোপ চোখের সামনে ঝুলিয়ে একদিন যুবতী মেয়েটিকে ঘর থেকে বার করে আনে। তারপর কলকাতার হোটেলগুলোতে পাঠিয়ে দেয়।

রাজা বলল, 'তারপর?'

রাজার প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে জয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

রাজা আবার বলল, 'আলাপ হবার পর রমলাদি প্রায়ই আপনাদের বাড়ি যেত, না?'

'প্রথম দিকে যেতেন না। পরে আমাদের অবস্থার কথা শুনে প্রায়ই যেতেন।'

'কী বলত?'

'কী আর বলবেন? খুব দুঃখ করতেন। বলতেন, লেখাপড়া শিখেছ, একটা কাজ টাজ কিছু কর।'

স্থির পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল রাজা, কিছু বলল না।

জয়া থামেনি, 'কাজের কথায় আমি হাসতাম।' রমলাদি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করতেন, 'হাসছ যে?' আমি বলতাম, 'চাকরি চেষ্টা কি কম করেছি? কত জায়গায় দরখাস্ত পাঠিয়েছি, ঠিকঠিকানা নেই। বেশির ভাগই উত্তর আসে না। কদাচিৎ এক আধটা ইন্টারভিউ আসে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। চাকরি যে পাব, আমার কি তেমন কেউ জানাশোনা আছে?' শুনে রমলাদি বলেছিলেন, 'দেখি তোমার জন্যে কী করতে পারি—'

রাজার চোখ ঝকঝক করছিল। সে বলল, 'তারপর?'

জয়া বলতে লাগল, 'আমার জন্যে চেষ্টা করবেন বলে সেই যে রমলাদি চলে গেলেন তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা নেই। কাল হঠাৎ আমাদের বাড়ি গিয়ে বললেন, চাকরির একটা ব্যবস্থা হয়েছে।'

রাজা কিছু বলল না।

জয়া আবার বলল, 'রমলাদি বলেছিলেন, আজ দশটার ভেতর আমি যেন শ্যামনগরে ওঁর বাড়ি চলে আসি। উনি সঙ্গে করে আমাকে কলকাতায় ইন্টারভিউ দেওয়াতে নিয়ে যাবেন।'

জয়ার দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাজা। তাকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতর কেমন যেন দুর্বল বোধ করছিল সে। এই বিষণ্ণ রোগা মেয়েটা জানে না, তাকে ঘিরে ব্যাধেরা কী সাঙ্ঘাতিক ফাঁদ পেতেছে।

অন্যমনস্কের মতো রাজা বলল, 'কোথায় রমলাদির সঙ্গে কলকাতায় যাবেন তা না, আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে।'

জয়া উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পর বলল, 'চাকরিটার বড্ড দরকার আমার।'

রাজা হাসল, 'তা তো বুঝতেই পারছি।'

জয়া আর কিছু বলল না। এক সময় ট্রেনটা শিয়ালদায় পৌঁছে গেল।

চার

গাড়ি থেকে নেমে ভিড়ের ভেতর ভাসতে ভাসতে দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল। রাজা সামনের দিকে হাঁটছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখ সব সময় রয়েছে জয়ার দিকে।

আগেও তো কত মেয়েকে আগরওলার হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু আজকের মতো মেন অস্বস্তি আর কখনো বোধ করে নি। এই রোগা ভীরু মেয়েটা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

একটু পর ওরা ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ল। রাজা একবার ভাবল, ছুঁড়ির যা হওয়ার হবে। আমার শালা কচু। রমলাদির কাছ থেকে তিরিশটা টাকা পেলেই হল।

গা থেকে পোকা ঝাড়ার মতো জয়ার ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল রাজা, কিন্তু পারল না। মেয়েটা যেন মাথার ভেতর আঠার মতো আটকে আছে। মনে মনে একটা অশ্লীল খিস্তি উচ্চারণ করে রাজা বিড় বিড় করতে লাগল, 'শালী গাড্ডায় ফেলে দিলে দেখছি।'

ট্রাম-বাস, লোকজন, সব একাকার হয়ে স্রোতের মতো দিগ্বিদিকে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ জয়ার গলা কানে এল, 'কিসে যাবেন?'

চমকে তার দিকে ফিরল রাজা, 'কিছু বললেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'এখান থেকে কিভাবে যাবেন? ট্রামে না বাসে?'

'ট্রামেও যাওয়া যায়, বাসেও যাওয়া যায়। দেখি, কোন্‌টা ফাঁকা পাই। আসুন—' দু'চার পা এগিয়ে রাজা হঠাৎ ঠিক করে ফেলল, জয়াকে আগরওলার কাছে নিয়ে যাবে না। এর ফলাফল কী হবে, এই মুহূর্তে সে ভাবতে পারছিল না। আগরওলার হোটেলটা পার্ক স্ট্রিটের দিকে। জয়াকে নিয়ে রাজা রাস্তার উলটোদিকে শ্যামবাজারের বাসে উঠল।

ট্রেনের মতো বাসটা ফাঁকাই ছিল। জানালার ধার ঘেঁষে জয়া বসল; তার ঠিক পেছনের সিটে রাজা।

গোটা দুই স্টপেজ পার হওয়ার পর রাজা হঠাৎ শুধলো, 'তখন বললেন, আপনার বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসতেন—'

'হ্যাঁ—' জয়া পেছনে তাকাল।

'কতবার এসেছেন?'

'খুব বেশি না। ন'মাসে ছ'মাসে এক আধবার আসা হত।'

'কলকাতার রাস্তাঘাট চেনেন?'

'বিশেষ না।'

রাজা আরাম বোধ করল।

জয়া জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ রাস্তাঘাট চেনার কথা বললেন?'

'এমনি।'

শ্যামবাজার এসে বরানগরের বাস ধরল রাজা। তারপর সেখান থেকে এসপ্ল্যানেডের। এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অবশ্য গেল না। লালবাজারের কাছাকাছি এসে জয়াকে নিয়ে নেমে পড়ল।

এতখানি ঘোরাঘুরির ফল হল এই, শীতের স্বল্পায়ু বিকেলটা চট করে ফুরিয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে গেল।

চিন্তাগ্রস্তের মতো জয়া জিজ্ঞেস করল, 'আবার বাসে উঠতে হবে নাকি?'

আস্তে মাথা নাড়ল রাজা, 'না।'

'অফিসটা এখান থেকে কতদূর?'

'কাছেই।'

'ঘোরাঘুরি করতেই তো সন্ধে হয়ে গেল। আপনি বলেছিলেন, সাড়ে তিনটে চারটের ভেতর পৌঁছে যাব।'

'তাই ভেবেছিলাম।'

'এখন কি ইন্টারভিউ হবে?'

'দেখি—'

জয়াকে নিয়ে কী করবে, তার ছক কেটে নিয়েছিল রাজা। একটা বাড়ির সামনে এসে সে বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।'

জয়া বলল, 'এই সেই অফিস?'

'হ্যাঁ।'

যেন গুপ্তধনের গুহার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এমনভাবে সাগ্রহে চকচকে উজ্জ্বল চোখে বাড়িটা দেখতে লাগল জয়া। আর রাজা টুক করে ভেতরে ঢুকে গেল। খানিক পরে বেরিয়ে এসে কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ভারি ঝামেলা হল তো?'

জয়ার মুখে দীপ্তি মাখানো ছিল। ফস করে আলো নিভে যাওয়ার মতো নিমেষে মুখটা মলিন হয়ে গেল। উদ্বেগের গলায় সে বলল, 'কী হয়েছে?'

'একটু আগে ইন্টারভিউ শেষ হয়ে গেছে।'

ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল জয়ার। এই শীতের সন্ধেতেও নাকের ডগায় পোখরাজের দানার মতো কণা কণা ঘাম ফুটেছে। শিথিল সুরে সে বলল, 'এখন কী হবে?'

রাজা চোখ নামিয়ে চটির ডগা দিয়ে ফুটপাত আঁচড়াতে লাগল।

জয়া যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। রাজার মনে হল, সে বুঝি হাত-পা ভেঙে হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে যাবে। না, শেষ পর্যন্ত টাল সামলে দাঁড়িয়েই থাকল। অস্থির ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'এত দিন পর একটা ইন্টারভিউ জুটল। বড় আশা করে এসেছিলাম—' চোখ ফেটে তার জলই বেরিয়ে পড়বে বুঝিবা।

রাজা ফিস ফিস করে বলল, 'রমলাদির খুব হাত আছে এখানে। তাকে বলে যদি আরেক বার ব্যবস্থা করা যায়—'

'আর কি ব্যবস্থা হবে?'

'হতেও ও তো পারে।'

উত্তর না দিয়ে জয়া বলল, 'চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে?'

ফেরার ট্রেনে খুব ভিড়। জয়া কোনোরকমে একধারে গুটিসুটি হয়ে বসতে পেরেছে। রাজা কিন্তু বসবার জায়গা পেল না। জয়ার সামনে বাঙ্ক ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলল।

তিন চারটে স্টেশন পেরুবার পর জয়া বলল, 'আমার জন্যে কোথাকার টিকিট কেটেছেন?'

রাজা বলল, 'কেন বলুন তো?'

'দরকার আছে।'

'আপনার নবীপুরের টিকিট নিয়েছি।'

'তা হলে তো মুশকিল হল।'

'মুশকিল।' রাজাকে চিন্তিত দেখাল।

জয়া বলল, 'হ্যাঁ, আমার একবার শ্যামনগর যাওয়া উচিত ছিল।'

'শ্যামনগর কেন?' শ্বাসরুদ্ধের মতো শুধলো রাজা।

'রমলাদির সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা বলে যেতাম।'

চোখ কুঁচকে রাজা কী ভেবে নিল। তারপর বলল, 'এই ঠাণ্ডার রাত্তিরে আপনাকে আর শ্যামনগর যেতে হবে না। রমলাদিকে আমিই বলে দেব। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছেন, আপনি বাড়িই চলে যান।'

কুণ্ঠিতভাবে জয়া বলল, 'আপনার আবার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট আর কী। আমাকে তো শ্যামনগর যেতেই হবে। বাড়ি যাবার সময় একবার না হয় রমলাদির সঙ্গে দেখা করে যাব।'

মৃদু গলায় জয়া বলল, 'আচ্ছা।'

পাঁচ

একসময় নবীপুরে নেমে গেল জয়া। এর পরের স্টেশনই শ্যামনগর।

এতক্ষণ জয়া সঙ্গে ছিল। তার ভাবনাই রাজাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে একা। শীতের বাতাস আর অন্ধকার ঠেলে ঠেলে ট্রেনটা যত শ্যামনগরের দিকে ছুটছে, ভেতরে ভেতরে ততই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল রাজা। আজ হোক, কাল হোক, আর দু চারদিন পরেই হোক, ব্যাপারটা জানতে পারবেনই রমলাদি। তখন কী হবে? ঝোঁকের মাথায় এ কী করে বসল সে?

নিজের ওপর ভয়ঙ্কর রকমের রাগ হচ্ছিল রাজার। মেয়েটার যা হবার হত। চারদিকে চাকরি নেই, বাকরি নেই, কলকারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই দুঃসহ অবস্থায়, এই নিদারুণ সময়ে প্রতিদিনই তো কত মেয়ের সর্বনাশ ঘটছে। তাতে রাজার কী? ক'টা মেয়েকেই বা সে বাঁচাতে পারে? আজ কেন যে তার ঘাড়ে ভূত চাপল!

তাছাড়া রমলাদি যখন ব্যাপারটা জানতে পারবে, নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে না। তাকে চটানো কোনো কাজের কথা নয়। বিপদে আপদে রমলাদিই তার একমাত্র ভরসা।

রাজার যা কাজ তাতে সর্বক্ষণ পুলিশের ঝামেলা লেগেই আছে। যে কোনো সময় পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এতদিনে কবে তাকে ঘানি ঘোরাবার জন্য জেলে পুরে ফেলত। নেহাত রমলাদি আছে বলে গায়ে আঁচটি লাগছে না।

রমলাদি শুধু বাঁচিয়েই যাচ্ছে না, প্রায়ই টুকিটাকি কাজ করিয়ে বেশ ভাল পয়সা দেয়। মাঝে মাঝে ধার চাইলেও পাওয়া যায়। নানা ব্যাপারে রমলাদির কাছে কৃতজ্ঞ রাজা। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় এ কী করল সে!

ট্রেনটা শ্যামনগর পৌঁছে গেল। আচ্ছন্নের মতো নেমে পড়ল রাজা। তারপর পায়ে পায়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল।

রাজা জয়াকে বলে এসেছে, রমলাদির বাড়ি যাবে। ওটা নেহাতই স্তোক বাক্য। নইলে জয়াই চলে আসত।

আজ অন্তত রমলাদির বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। হঠাৎ রাজার মনে পড়ল, ননীরা 'শোভা কাফে'তে বসে থাকবে। রেল ইয়ার্ডের মাল আজ রাতের ভেতর সরাতে না পারলে আর কোনো আশাই নেই।

বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগল রাজা। রাত খুব একটা বেশি হয় নি। কিন্তু এরই ভেতর শ্যামনগর নিশুতিপুর হয়ে উঠেছে। রাস্তায় কদাচিৎ দু'চারটে লোক দেখা যাচ্ছে। হিম আর কুয়াশা মিউনিসিপ্যালিটির মিটমিটে আলোগুলোকে যেন অন্ধ করে দিতে চাইছে।

বাজারপাড়ায় এসে কিছু লোকজন চোখে পড়ল। তবে দোকান-পাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। মাঝরাতের এই ভাঙা আসরে সিনেমা হল দুটো হিন্দি গানের রেকর্ড বাজিয়ে চারদিক যা একটু সরগরম করতে চাইছে।

'শোভা কাফে'তে ভিড় ছিল না। সারাদিন বিকিকিনির পর এখন কেমন যেন ঢিলেমি লেগেছে এখানে। দুটো বয় একধারে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বাকিরা চেয়ার টেবিল গুছোচ্ছে। 'নাইট শো'টা শেষ হয়ে গেলেই রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। 'শোভা কাফে'র মালিক গণেশ সাধুখাঁ কাউন্টারে বসে থাক থাক রেজগি আর টাকা সাজিয়ে হিসেব করে যাচ্ছে। আজকের সমস্ত দিনের বিক্রিবাটার হিসেব।

ভিড় থাক বা না থাক, ননীরা ঠিক আছে। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত তাদের সেই কোণটিতে গোল হয়ে বসে রয়েছে।

রাজাকে দেখতে পেয়েই ননীরা ওবেলার মতো সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'রজ্জা—আ মেরে রজ্জা—'

রাজা একপলক ওদের দেখে নিল। ননী, রতন, তুলসী—কে নেই ওখানে? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, ওবেলা ওরা মাল খাওয়ার জন্য খুব ধরেছিল।

কাছাকাছি এসে চেয়ার টেনে বসে পড়ল রাজা।

ননী বলল, 'বেশ ছেলে বাওয়া (বাবা) তুই। সন্ধেবেলা ফেরার কথা ছিল না তোর? এত দেরি করলি? আমরা সেই কখন থেকে বসে আছি—'

রাজা দুই হাতের তালু চিত করে ঠোঁট ওলটালো, 'শ্লা, কী ফ্যারাক্কায় যে পড়েছিলুম!'

'কী হয়েছিল?' নেহাত বলবার জন্যই বলা, নইলে গলার স্বর শুনেই বোঝা যায় জানবার খুব একটা আগ্রহ নেই ননীর।

'সে এক মহা ঝামেলা—' উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে রাজা সামনের বয়টাকে হাতের ইশারায় ডাকল, 'একটা ডবল হাফ দে। বেশ কড়া করে—'

ননী তুলসী রতন—সবাই একসঙ্গে চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'চা দিয়ে কী হবে রে—'

হুস করে লম্বা নিশ্বাস ফেলল রাজা। বলল, 'কী আর হবে, খাব। সেই দুপুর থেকে একবার ট্রেন, একবার বাস, আবার বাস, আবার বাস, আবার ট্রেন—শ্লা এক চরকি কলে ঘুরেছি। দুপুরের পর থেকে এতখানি রাত হয়ে গেল, এক ফোঁটা চা'ও পেটে পড়ে নি।'

'চা খাবি কি, একেবারে—' চোখের তারা বার দুই নাচিয়ে নিল ননী, 'গণেশদাকে দিতে বলি?'

চা, কেক চপ-কাটলেট ছাড়াও এই 'শোভা কাফে'তে দিশি-বিলিতি দু'রকম মদই পাওয়া যায়। ব্যাপারটা বে-আইনি। তাই প্রকাশ্যে বেচাকেনা হয় না। তার জন্য রেস্টুরেন্টের পেছন দিকে একটা ছোট ঘুপচি মতো অন্ধকার ঘর রয়েছে। সেখানে ক'টা বেঞ্চি পাতা। খুব চেনাজানা লোক হলে গণেশ সাধুখাঁ ওই ঘরটায় পাঠিয়ে দেয়। ভাবখানা এই রকম। খাও টাও, তারপর মুখ মুছে ফিরে এস। পুলিশ টুলিশ যেন টের না পায়।

রাজা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না—না—'

ননীরা অবাক, 'না মানে?'

'আজকে মাল ফাল হবে না।'

'মাইরি আর কি। সেই দুপুর থেকে জিভ ধুয়ে বসে আছি।'

'কী করব বল—' রাজা বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বলল, 'ক্যাশ পাই নি—'

অবিশ্বাসের চোখে তাকাল ননীরা। গৌর বলল, 'শ্লা, তাপ্পি মারছ?'

'মা কালীর দিব্যি, এই তোদের গা ছুঁয়ে বলছি।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'তোর রমলাদি তো অ্যাদ্দিন নগদা কারবার করত। আজকেই বাকি ফেলে দিলে! ও সব মা কালী-টালী, গা ছোঁয়াছুঁয়ি বুঝি না। ভালয় ভালয় বার কর তো চাঁদ।'

রাজা এবার বিরক্ত হল, 'তোরা যে শ্লা বিশ্বাস করিস না, এই জন্যেই রাগ ধরে যায়। দ্যাখ সার্চ করে—' বলে দু'হাত মাথার ওপর তুলে উঠে দাঁড়াল।

ঠোঁট ছুঁচলো করে জিভের অদ্ভুত শব্দ করল ননী। আঙুলের ডগা দিয়ে রাজার থুতনিটা নাড়তে নাড়তে বলল, 'তুমি সেই মাল, টাকা পকেটে করে এসে সার্চ করতে বলবে। ক্যাশ সরিয়ে তারপর 'শোভা কাফে'তে এসে ঢুকেছ। ওসব ধাপ্পাবাজি আমরা জানি।'

জুয়ার ব্যাপারটা এদের খুলে বলা যাচ্ছে না। গা ছেড়ে দেওয়ার মতো করে রাজা বলল, 'বিশ্বাস না করলে আর কী করতে পারি!'

রতন বলল, 'গণেশদাকে বলে রেখেছি, দুটো বোতল আলাদা করে রাখতে। এখন শ্লা বলছিস ক্যাশ নেই।'

এই সময় কাউন্টার থেকে গণেশ বলে উঠল, 'রাজা তো এসেছে। তোমরা পেছনের ঘরে যাও। মাল রেডি আছে।'

রাজা বলল, 'আজ হবে না গণেশদা—'

চোখ ছোট করে গণেশ সাধুখাঁ বলল, 'এটা কিরকম হল? অন্য খদ্দের ভাগিয়ে তোমাদের জন্যে রেখে দিলাম। এখন বলছ, হবে না—'

গণেশ গজগজ করতে লাগল, 'আজ কারবারটাই মাটি। আগে জানলে কখন ছেড়ে দিতাম। এখন বোতল দুটো গলায় ঝুলিয়ে রাখি আর কি।'

রাজা বলল, 'মালটা ক'দিন রেখে দাও দাদা, পরে নিয়ে নেব'খন। এ তো আর মাছ না যে পচে গন্ধ ছুটবে।'

'আর শালা তোমাদের ভরসায় থাকি! খদ্দের পেলে আজই ঝাড়ব। এখন ওঠ দিকি, দোকান বন্ধ করি।'

শীতের রাতটা কোথায় মৌজ করে কাটাবে তা নয়। আশাভঙ্গ হওয়াতে রতনরা ভীষণ চটে গিয়েছিল। চেয়ার ছেড়ে সবাই উঠে পড়ল।

বাইরে আসতে আসতে তুলসী বলল, 'দে, আমার জ্যাকেট দে—' ডান হাতটা রাজার দিকে টান টান করে বাড়িয়ে দিল সে।

বাইরে এখন ভয়ানক ঠাণ্ডা। রাত যত বাড়ছে, হিম এবং কুয়াশা তত ঘন হচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। শীতের এই রাত্তিরে বাতাসের যেন দাঁত বেরোয়। শরীরের যে জায়গাগুলো খোলা, দাঁতাল বাতাস সেখানে সেখানে কেটে বসে যাচ্ছে।

রাজা বলল, 'আজই নিবি? কাল নিলে হত না?'

মুখের চেহারাটাই পালটে গেল তুলসীর। দাঁত-টাত খিঁচিয়ে বলল, 'আজ না কাল, কাল না পরশু। মাজাকি ছাড় দিকি। ওবেলা না রেলা দেখিয়ে গা থেকে খুলে দিচ্ছিলি! দে—'

মাল না খাওয়াতে ওরা রেগেছে, রাজা বুঝল। আর একটা কথাও না বলে জ্যাকেটটা খুলে তুলসীর দিকে ছুঁড়ে দিল।

কিছুক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বলল না।

এদিকে গণেশ সাধুখাঁ রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে ফেলেছে। দরজায় গোটা ছয়েক তালা ঝুলিয়ে চাবির গোছা পকেটে পুরে রাজাদের কাছে এসে দাঁড়াল, 'কি হে, এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ? বাড়ি যাবে না?'

ননী বলল, 'পরে যাব।'

'ধান্দা আছে নাকি কিছু?' ওদের কাজকর্ম এবং গতিবিধির মোটামুটি খবর রাখে গণেশ।

উত্তর না দিয়ে ননী বলল, 'তুমি বাড়ি যাও গণেশদা।'

গণেশ কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

গৌর এবার বলল, 'কি রে, এখানেই সব স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি? ওবেলা কী কথা হয়েছিল?' গলার স্বর নিচু করে বলল, 'আজকের রাতটা কাজে না লাগালে কাল কলা চুষতে হবে। ইয়ার্ডের মাল সব গো-ডাউনে তুলে ফেলবে।'

'চল—চল—'

হঠাৎ রাজা বলল, 'আমি আজ যাব না, তোরা যা—'

ননী অবাক, 'যাবি না কেন?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না। তা ছাড়া-

'কী?'

'এই দ্যাখ না, শীতে জমে যাচ্ছি। পাতলা জ্যালজেলে জামা গায়ে দিয়ে আর কিছুক্ষণ থাকলে নির্ঘাত মরে যাব।'

'আজ না গেলে তোর জন্যে মালগুলো পড়ে থাকবে নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'যা হবার হবে। আমি এখন বাড়ি যাব।'

ননী বলল, 'ছেনালি রাখ, চল আমাদের সঙ্গে—' বলেই রাজার হাত ধরে টানল।

রাজা মিনতির মতো সুরে বলল, 'আজ আমায় ছেড়ে দে ভাই—'

রতন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ চাপা, ধারাল গলায় বলে উঠল, 'ঝামেলা ছাড় তো ননে। ও আজ নিশ্চয়ই টাকা পেয়েছে। আমাদের ধোঁকা দেবার জন্যে বলছে পায়নি। না পেলে রেল ইয়ার্ডে অত জিনিস পড়ে থাকতে বাড়ি যেতে চাইছে! মাল না খাওয়াবি না খাওয়াবি, তা অত ধানাই-পানাই, এত ভ্যানতাড়া কিসের? সোজা বলে দিলেই হত।'

রাজার ইচ্ছে হল, রতনকে টেনে এক চড় কষায়। কিন্তু কিছুই করল না, কিছু বললও না।

আর দু' একবার টানাটানি করে ননীরা চলে গেল। একটু পর রাস্তার বাঁকে অন্ধকারের ভেতর তাদের আবছা চেহারা আর ভুতুড়ে ছায়াগুলো অদৃশ্য হল।

রাজা আর দাঁড়াল না। উত্তুরে বাতাস ঠেলে ঠেলে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। শরীর খারাপ বাজে কথা। আসলে মনটাই তার পেঁজা তুলোর মতো এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বার বার জয়ার কথাই মনে পড়ছিল তার। জয়াকে আগরওলার কাছে পৌঁছে না দেওয়ার জের খুব সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে কে জানে!

ছয়

জনশূন্য ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে মাইল খানেকের মতো হেঁটে এক সময় বাড়ি পৌঁছে গেল রাজা।

বাড়িটা একেবারে রাস্তার ওপর। ভেঙেচুরে তার যা হাল হয়েছে যে কোনোদিন হুড়মুড় করে পড়তে পারে। দেওয়ালে সিমেন্ট-বালির আস্তর বলতে আর কিছু নেই। ফলে ভেতরকার ইট নোনা লেগে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। ছাদটা কত জায়গায় যে ফুটো! দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই ভেতরে বান ডেকে যায়। তিনখানা ঘরের একটারও মেঝে অক্ষত নেই। সিমেন্ট উঠে উঠে অসংখ্য গর্ত হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, বট-অশ্বত্থেরা ভিতে শেকড় চালিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে।

এ জন্মে এ বাড়ি আর সারানো হবে না। বাবা-দাদাই পারেনি, রাজা পারবে কোত্থেকে? একদিন রাত্তিবেলা হয়তো বাড়িসুদ্ধু সবাই চাপা পড়ে মরে থাকবে।

সবগুলো ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ। এই শীতের রাতে কার প্রাণে এত শখ, হাট করে ঘর খুলে রাখবে?

রাজা বাইরে থেকে ডাকতে লাগল, 'বৌদি—বৌদি—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে একটি বিধবা বেরিয়ে এল। তার হাতে যে হেরিকেনটা ঝুলছে, কালি পড়ে পড়ে সেটা প্রায় অন্ধ।

মেয়েমানুষটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চোখের কোল বসে গিয়েছে, সেখানে কালচে শ্যাওলার মতো দাগ। মুখ ভাঙাচোরা, কপালের ওপর থেকে গোছা গোছা চুল উঠে গিয়েছে। চোখ দুটো গোল,

একবার তাকালে খুব সহজে পাতা পড়ে না। পরনে নোংরা সরু-পাড় ধুতি, তার ওপর মোটা খদ্দরের চাদর। শরীরময় এত যে ধ্বংসের চিহ্ন, তবু মনে হয়, মেয়েমানুষটি একদা বেশ সুরূপাই ছিল।

মেয়েমানুষটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত একপলক দেখে নিল রাজা। মনে মনে ভাবল, কড়া জান শালীর।

কেউ কিছু বলবার আগে ভেতর থেকে টুনির গলা ভেসে এল, 'মা, কাকু এসেছে?' টুনি দাদার ছোট মেয়ে, বছর পাঁচেকের মতো বয়েস।

বৌদি বলল, 'হ্যাঁ।' রাজাকে বলল, 'ভেতরে এস।'

ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বৌদি।

মেঝে জুড়ে বিছানা। ভোলা, গোলাপ আর মিনু কাঁথা আর ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দাদার ছেলেমেয়েগুলো বড্ড ঘুমকাতুরে। শুধু টুনিটা জেগে আছে। কাঁথা কম্বলের ফাঁক দিয়ে তার বড় বড় চোখ জুল জুল করে তাকিয়ে রয়েছে। মুখে আঙুল পোরা। বাঁ হাতের দুটো আঙুল খাওয়া মেয়েটার অভ্যাস।

রাজা যখনই ফিরুক, রাত বারটাই হোক আর একটাই হোক, টুনিটা জেগে থাকবেই। তার সঙ্গে দুটি না খেলে, তার পাশটিতে না শুলে, কিছুতেই মেয়েটার ঘুম আসে না। ভাইপো ভাইঝিদের মধ্যে টুনিটা তার খুব প্রিয়।

বৌদি বলল, 'একেবারে হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসো। রাত হয়েছে। শুধু শুধু তেল পুড়িয়ে কী হবে?'

নিঃশব্দে একটা গামছা নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল রাজা। ওদিকটায় উঠোন। তাব একধারে কুয়ো।

মুখটুখ ধুয়ে এসে খেতে বসে গেল রাজা।

হেরিকেনটা ধোঁয়ায় আর কালিতে দ্রুত আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। যেটুকু আলো সেটা থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে কিছুই স্পষ্ট নয়।

দাদা বেঁচে থাকার সময়ও এ বাড়িতে বিজলি আলো জ্বলত। ঘরে ঘরে লাইনগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু ক'মাস বিলের টাকা দিতে না পারায় কোম্পানি থেকে তার কেটে দিয়ে গিয়েছে। এখন হেরিকেনই ভরসা।

রাজা খেতে বসতেই কাঁথা-টাথা ঠেলে দিয়ে টুনি উঠে এল, চুপ করে তার গা ঘেঁষে বসে হাঁ করল।

এক দলা ভাত টুনির মুখে দিয়ে নিজে খেতে শুরু করল রাজা। একটু দূরে পিঁড়ির ওপর গুটিসুটি মেরে চুপচাপ বসে ছিল বৌদি। হঠাৎ সে মুখ খুলল, 'আজ কত টাকা পেলে ঠাকুরপো?'

বিস্বাদ গলায় রাজা বলল, 'পাই নি।'

বৌদির গোল চোখে এমনিতেই পাতা পড়ে না, এবার একেবারে স্থির হয়ে গেল। সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'সত্যি পাওনি?'

'বললাম তো, না।'

'তোমার রমলাদির কাছে গিয়েছিলে না?'

'তাতে কী?'

'রমলাদির কাছে গেলে তো টাকা পাও—'

'গেলেই পেতে হবে, এমন কথা আছে নাকি?'

তীক্ষ্ণ সুরে বৌদি বলল, 'পাও, তাই বলছিলাম—'

কটু গলায় রাজা বলল, 'রমলাদি আমার জন্যে টাকার গাছ পুঁতে রেখেছে একেবারে। গিয়ে নাড়া দিলেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে।'

বৌদি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, কিছু বলল না। রাজা আর টুনি খেয়ে যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর বৌদি হঠাৎ বলে উঠল, 'শুনছ—

'কী?'

'ঘরে যা চাল আছে তাতে কাল এক বেলার মতো হবে।'

'তা আমি কী করব?'

বৌদির চোখ কুঁচকে গেল। নীরস গলায় বলল, 'চাল কিনে আনবে।'

রাজা মুখ তুলে তাকাল, 'বললাম তো টাকা পাইনি।'

'পেয়েছ কি পাওনি, তা আমার জানবার দরকার নেই। চাল না আনলে হাঁড়ি চড়বে না।'

'না চড়ুক—'

ধারাল চোখে কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকল বৌদি। তারপর চিৎকার করে বলল, 'তোমার ইচ্ছেমতো নাকি? যেখান থেকে পার টাকা জোগাড় করে কাল চাল নিয়ে আসবে।'

রাজা ভ্যাংচানোর মতো মুখ করে বলল, 'মাইরি আর কি। অর্ডার দিলেই নিয়ে আসতে হবে!'

'মাইরি ফাইরি বুঝি না। যা বললাম তা-ই করবে—'

হঠাৎ ভাতের থালাটা ঝনাৎ করে ঠেলে দিয়ে রাজা হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, 'পারব না, পারব না—'

'কী পারবে না?'

'তোমার এই রাবণের গুষ্টি চালাতে।'

'আমার রাবণের গুষ্টি!'

'আলবাত।'

'বাপের বাড়ি থেকে আমি এদের নিয়ে এসেছিলাম?' হঠাৎ বৌদি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'বল হারামির ছানা, বল—'

রাজাও হিংস্র গলায় চেঁচাতে লাগল, 'বাপ তুলে কথা বলবি না মাগী।'

বৌদি যেন রাজার কথা শুনতে পেল না। বিছানায় শায়িত সারি সারি ছেলেমেয়েগুলোকে দেখিয়ে বলতে লাগল, 'এই পঙ্গপাল তোদের বাড়ি এসেই হয়েছে।'

এবার তিক্ত গলায় অশ্লীল খিস্তি দিয়ে উঠল রাজা। জঘন্য অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বলল, 'শালী আমার জন্যে হয়েছে?'

'তোর জন্যে না হোক, তোর দাদার জন্যে তো হয়েছে।'

'দাদাকে গিয়ে ধর। তার গুষ্টি সে চালাবে—'

'তাকে পাচ্ছি কোথায়? রেলে গলা দিয়ে সে সরে পড়েছে।'

'আমিও পালাব—'

'কোথায় পালাবি?'

'এমন জায়গায় যাব যেখান থেকে আর ধরতে হবে না।'

বৌদি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলতে লাগল, 'না মরা পর্যন্ত তোর নিস্তার নেই। পালিয়ে দ্যাখ না—'

রাজা আর খেতে বসল না, থালাটা পড়ে রইল। ঝড়াং করে দরজা খুলে ওধারের কুয়োতলা থেকে মুখ ধুয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল।

বৌদি তখনও গজ গজ করছিল। অকথ্য ভাষায় রাজাকে সমানে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছিল।

রাজা বিরক্ত। ক্রুদ্ধ চোখে বৌদিকে একবার দেখল। ইচ্ছে হল, গলা টিপে ধরে। কিন্তু কিছুই করল না, একটা কথাও বলল না। সে জানে, ঝগড়াঝাটির মাত্রা বেড়ে গেলে এক্ষুনি চোখ উলটে ফিট হয়ে যাবে বৌদি। এই রাত্রিবেলা, যতই অনিচ্ছা আর আপত্তি থাক, তার মাথায় জলটল ঢেলে জ্ঞান ফেরাতে হবে রাজাকেই।

রাজা একবার ভাবল, এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বৌদির সঙ্গে যখনই ঝগড়া হয় তখনই ওই কথাটা ভাবে সে। কিন্তু শীতের এই রাত্তিরে জ্যালজেলে পাতলা একটা জামা ছাড়া গায়ে আর কিছু নেই। এই অবস্থায় বাইরের হিমে বেরুতে সাহস হল না।

এই ঘরটার পুব দেয়ালে নিচু মতো একটা দরজা রয়েছে। দরজার ওধারে ছোট্ট ঘর, ঘরটা রাজার।

দরজা ঠেলে ওঘরে চলে গেল রাজা। মেঝের ওপর হেরিকেন নিভু নিভু জ্বলছিল। চাবি ঘুরিয়ে আলোটাকে প্রথমে উসকে দিল সে।

ঘরের একধারে দেওয়াল ঘেঁষে তক্তাপোষ। সেখানে বিছানা পাতা রয়েছে। তার ওপর মশারি টাঙানো।

বারমাস বিছানা আর মশারি এভাবেই টাঙানো থাকে। মশারিটা ধোওয়া বা বিছানাটা তুলে রোদে-টোদে দেওয়া, এসবের বালাই নেই। রাত্রিবেলা এসে মশারিটা তুলে টুক করে ভেতরে ঢুকে যায় রাজা।

পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিল রাজা। তারপর হেরিকেন নিভিয়ে রোজকার মতো মশারির ভেতর ঢুকে গেল।

টান টান শুয়ে সবে ময়লা গন্ধওলা লেপটা গলা পর্যন্ত টেনেছে, সেই সময় খুব কচি গলার ফোঁপানি শোনা গেল। রাজা চমকে উঠল, 'কে রে?'

'আমি—' গলাটা ভাঙা ভাঙা, কান্নায় জড়ানো।

'টুনি?'

'হ্যাঁ—'

চকিতে রাজার মনে পড়ে গেল, অন্যদিন খাওয়া দাওয়ার পর টুনিকে নিয়ে এ ঘরে শুতে আসে। রাত্রিবেলা টুনি তার কাছে থাকে।

টুনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি একলা চলে এসেছ। আমাকে নিয়ে আসো নি।'

'এই জন্যে কাঁদছিস?'

'হুঁ—'

'আয়, আয়—' মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে দিল রাজা। টুনি এসে হাতটা ধরল। পলকে পাখির মতো হালকা মেয়েটাকে তুলে বুকের ওপর নিয়ে এল রাজা।

বুকের ওপর শুয়ে শুয়েও ফোঁপাতে লাগল টুনি। মেয়েটার বড় অভিমান। রাজার এতটুকু উদাসীনতাও সে সইতে পারে না। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়।

টুনির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল রাজা। বলতে লাগল, 'কাঁদে না, সোনা কাঁদে না। কাল তোমাকে অনেকগুলো লবঞ্চুস এনে দেব, আর জিলিপি। কেমন?'

লবঞ্চুস আর জিলিপির কথায় ফোঁপানি থামল। আস্তে করে টুনিকে পাশে শুইয়ে দিল রাজা।

কিছুক্ষণ পর টুনি ডাকল, 'কাকু—'

'কী বলছিস?'

'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না?'

রাজার মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগে ঝগড়ার সময় বৌদিকে ওই কথাটা বলেছিল। আগেও অনেকবার পালাবার কথা বলেছে সে, কিন্তু প্রতিবারই তার সব সঙ্কল্প এই মেয়েটার জন্যে বানচাল হয়ে গিয়েছে।

রাজা গাঢ় গলায় বলল, 'না।'

'ঠিক?'

'ঠিক। তোকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারি?'

'তবে মাকে বললে কেন?'

'এমনি, রাগ করে। নে, এবার ঘুমো।' আলতো করে টুনির গালে একটা চুমু খেল রাজা।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল টুনি। একটু পরে তার মৃদু, ধীর শ্বাস টানার শব্দ কানে আসতে লাগল।

রাজা কিন্তু ঘুমোতে পারল না। ননী, তুলসী, রতন, রমলাদি, টুনি কিংবা বৌদির সঙ্গে ঝগড়া, সব যেন তার স্মৃতি থেকে মুছে গেল। এই অন্ধকার হিমের রাতে, চারদিক যখন নিশুতিপুর, ঘুরে ফিরে বার বার জয়ার মুখটাই মনে পড়ে যেতে লাগল।

জয়াকে আগরওলার কাছে পৌঁছে দেয়নি। তার ফল কী হবে কে জানে! ভাল যে হবে না, সে ব্যাপারে রাজার সন্দেহ নেই। জয়ার কথা ভাবতে গিয়ে আচমকা আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল তার—ফাদার ডোনাল্ডস। কাল সকালের দিকে একবার ফাদারের কাছে যাবে সে।

সাত

শ্যামনগরের সদরে রেল স্টেশন। খিড়কির দিকে নদী। নদীর ধারটা প্রায় ফাঁকাই। ওপারে যাওয়ার একটা খেয়াঘাট অবশ্য রয়েছে। দিনের বেলা, সকাল সাতটা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত, জায়গাটা মোটামুটি সরগরম থাকে। তার পরেই নিঝুম হয়ে যায়। কেননা, সরকারি খেয়ার মাঝি ছ'টা বাজলে আর থাকে না। নৌকো বেঁধে রেখে চলে যায়।

খেয়াঘাটের এক ধারে শ্মশান। শ্মশানের গায়ে একটা চা-পান-বিড়ির দোকান। আরেক ধারে বেশ খানিকটা দূরে, ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় রামসীতার মন্দির। মন্দির বলতে আগে ছিল একটা টিনের চালা। বছর খানেক হল, মারোয়াড়ী ব্যবসাদাররা পাকা বাড়ি তুলে দিয়েছে। সামনের দিকে অনেকখানি জায়গা উঁচু করে বাঁধিয়ে দিয়েছে। যেমন তেমন করে বাঁধানো না, রীতিমত ফুল-লতা-পাতা আঁকিয়ে মোজেক করে বাঁধানো।

খেয়াঘাট, শ্মশান, রামসীতা মন্দির পেরিয়ে আরো কিছুটা গেলে প্রকাণ্ড গীর্জা। গীর্জাটার সামনের দিকে মোটা মোটা থাম, আর অগুনতি সিঁড়ি। তার মাথাটা ক্রমশ সরু হয়ে হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে আকাশে বিঁধে আছে।

গীর্জাবাড়িটা খুবই পুরনো, কত কাল আগের কে জানে। কেউ কেউ বলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্প্যানির আমলে তৈরি হয়েছিল। বাড়িটার আস্তর খসে খসে অনেক জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। মেঝে ফেটে ফেটে চৌচির। সেই সব ফাটলের ভেতর বট-অশ্বত্থেরা পঞ্চম বাহিনীর মতো শেকড় চালিয়ে চালিয়ে ধ্বংসের কাজ এগিয়ে রেখেছে। ঘুলঘুলিতে পায়রা আর চড়াইরা বংশ পরম্পরায় বাস করে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই। কোনোদিন কোনো কারণে দাঙ্গা বাধিয়ে তাদের রক্তারক্তি করতে দেখা যায় না।

ফাদার ডোনাল্ডস্ এই গীর্জাতেই থাকেন। থাকেন তো ঠিকই, কিন্তু কতটুকু সময় আর। সকালের দিকে খানিকটা, দুপুরবেলা ঘণ্টা দুই আর রাত্রিটা। ভোরবেলা বেশ কিছুক্ষণ বাইবেল পড়েন; তাই থাকতে হয়। দুপুরবেলা খাওয়া এবং একটু বিশ্রাম দরকার, সেই জন্যেও থাকতে হয়। আর রাত্তিরে থাকতে হয় ঘুমের জন্যে। নইলে বাকি সময়টা, নেহাত অসুখ বিসুখ না করলে তাঁকে গীর্জায় পাওয়া অসম্ভব। পুরনো মডেলের জোড়াতালি-দেওয়া একটা লঝঝর সাইকেল আছে ফাদার ডোনাল্ডসের। সেইটেতে করে সারাদিন শ্যামনগরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে ফেরেন। পথে যার সঙ্গেই দেখা হোক, হেসে হেসে দু'চারটে কথা বলবেনই তিনি। যেমন :

তিনি হয়তো জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন আছিস রে নেপাল?'

উত্তর আসে, 'ওই একরকম। আপনি কেমন আছেন পাদ্রীসাহেব?'

'খুব ভাল। আমি কখনো খারাপ থাকি না। তারপর বাড়ির খবর কী? গেল হপ্তায় দেখে এসেছিলাম, তোর বউটার খুব জ্বর। সেরেছে?'

'হ্যাঁ। কাল ভাত খেয়েছে।'

কিংবা 'অমন হন হন করে কোথায় চললে কেষ্টলাল?'

উত্তর আসে, 'কারখানায় যাচ্ছি পাদ্রীবাবা।'

'তোমাদের কারখানা খুলেছে?'

'আজ থিঙে (থেকে) খুলবে, শুনতে পাচ্ছি। যাই, সঠিক খপরটা লিয়ে আসি।'

'তোমাদের কারখানা কদ্দিন যেন লক-আউট হয়ে আছে?'

'তা পেরায় ছ'মাস হবে। সোমসারের যা হাল হয়েছে! ই. এস. আই'র টাকা লিয়ে লিয়ে কবেই ফতুর হয়ে গেল। এখন উপোস চলছে। কারখানাটা আজ খুললে বাঁচি।'

কারোকে হয়তো বলেন, 'এই যে হারুবাবু, আপনার মেয়েটির ছেলেপুলে হল?'

উত্তর আসে, 'না। এখনো কিছু হয় নি। বড্ড দুর্ভাবনায় আছি।'

'সেদিন প্রসূতি-সদনে ভর্তি করলেন না?'

'করেছিলাম। দু'দিন রেখে আবার ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।'

'কেন?'

'ফলস পেইন উঠেছিল। ডাক্তাররা দেখেটেখে পরীক্ষা করে বললে, আরো দেরি আছে। মেয়েটা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।'

'কিন্তু এক্সপেক্টেড ডেট তো সাত আট দিন আগেই পার হয়ে গেছে।'

'তা গেছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।'

কারোকে হয়তো বলেন, 'ভবতোষবাবু যে। অনেকদিন আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নি। হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট তো বেরিয়ে গেছে। আপনার সেজ ছেলেটি পাশ করেছে?'

উত্তর আসে, 'করেছে কোনোরকমে, থার্ড ডিভিসনে। ওই রেজাল্টে কোথায় যে ভর্তি করব! ফার্স্ট ডিভিসন ছাড়া কোনো কলেজ নিতে চাইছে না। চারদিন ধরে এ কলেজ সে কলেজে ধর্না দিয়ে জেরবার হয়ে গেলাম।'

'দেখুন, নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে নেবে। ফার্স্ট ডিভিসনে ক'টা ছেলে আর পাশ করে!'

'দেখি—'

'শুধু ফার্স্ট ডিভিসন চাইলে কী করে চলবে? সেকেন্ড ডিভিসন থার্ড ডিভিসনদের কী গতি হবে?'

'সে কথা আর কে বুঝতে চায় বলুন!'

এইরকম সব কথাবার্তা।

প্রায়ই দেখা যায়, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সাইকেল থামিয়ে ফাদার ডোনাল্ডস এর ওর বাড়িতে ঢুকে পড়ছেন। শ্যামনগরের অন্তঃপুর পর্যন্ত তাঁর অবাধ গতিবিধি।

সত্তরের মতো বয়েস ফাদার ডোনাল্ডসের। এই বয়সেও চেহারা টানটান। শরীরে এক ছটাক বাড়তি মেদ নেই। চামড়ায় অবশ্য ভাঁজ পড়েছে। চোখের দৃষ্টি কিন্তু এখনও সতেজ। আধ মাইল দূরের জিনিস দেখতে চশমা লাগে না। দু' একটা ছাড়া সবগুলো দাঁতই অটুট আছে, অক্লেশে আখ টাখ চিবিয়ে খেতে পারেন। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠের মতো হয়ে উঠেছে।

বারমাস তাঁর পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া জাতীয় জামা। ধুতিটা এদেশের গেঁয়ো লোকেদের মতো করে পরা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। মাথায় সর্বক্ষণ শোলার হ্যাট। শীতের সময় ফতুয়ার ওপর একটা ভারি ধুসো লং কোট চাপিয়ে দেন।

যৌবনের গোড়ায় মিশনারি হয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন ফাদার ডোনাল্ডস। তারপর মনে প্রাণে এখানকারই মানুষ হয়ে গিয়েছেন। বাংলা ভাষাটা চমৎকার বলতে পারেন। এমনকি কথায় কথায় স্থানীয় ইডিয়ম, প্রবাদ কিংবা ছড়া নির্ভুল ব্যবহার করেন। নানারকম মজার মজার গল্প জানেন। প্রতি কথায় তাঁর ঠাট্টা, প্রতি কথায় কৌতুক। যেখানেই যান, তাঁকে ঘিরে আসর জমে ওঠে।

সব সময় মানুষটি হাসিখুশি। তাঁর চোখ কৌতুক আর স্নেহের রসে যেন ভাসো ভাসো।

এই মানুষটির সঙ্গে কিভাবে আলাপ টালাপ হয়েছিল, রাজার মনে নেই। ফাদার ডোনাল্ডস হয়তো তাদের বাড়ি এসে থাকবেন, তখন পরিচয় হয়েছে। কিংবা রাস্তায় টাস্তায় কোথাও হয়ে থাকতে পারে।

আলাপের পর থেকেই ফাদার ডোনাল্ডসকে কেমন যেন আপনজন মনে হয়েছে রাজার। মন-টন খুব খারাপ হলে, বন্ধুদের সঙ্গ খারাপ লাগলে কিংবা বাড়িতে ঝগড়া টগড়া বাধলে, মাঝে মধ্যে নির্জন নদীর পাড়ে পুরনো গীর্জায় ফাদার ডোনাল্ডসের কাছে চলে আসে সে। এখানে এলে ধীরে ধীরে টগবগে ফুটন্ত মন জুড়িয়ে যায়।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই গীর্জাবাড়িতে চলে এল রাজা।

বেশ কিছুক্ষণ আগে রোদ উঠে গিয়েছে। কিন্তু সে রোদ এত নির্জীব আর মলিন যে শীতের সকালটাকে উষ্ণ, আরামদায়ক করে তুলতে পারে নি। নদীর দিক থেকে হু হু হাওয়া ছুটে আসছে। চামড়া মাংস ভেদ করে একেবারে হাড়ের ভেতর পযন্ত যেন ঢুকে যায়।

রাজা দেখল, দড়ির খাটিয়ায় কম্বল মুড়ি দিয়ে সুর করে বাইবেল পড়ছেন ফাদার ডোনাল্ডস। রাজার পায়ের আওয়াজে একবার চোখ তুলে হাতের ইশারায় বসতে বললেন। তারপর আবার পড়তে লাগলেন।

রাজা বসল না। সে জানে যতক্ষণ বাইবেল পড়া চলবে আর মুখ তুলবেন না ফাদাল ডোনাল্ডস। একটা কথাও বলবেন না।

রাজা কয়েক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর অন্যমনস্কের মতো পায়ে পায়ে বিশাল হল-ঘরের আরেক কোণে চলে গেল। সেখানে উঁচু বেদির ওপর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বিশাল অয়েল পেন্টিং। কত বার এই ছবিটা দেখেছে রাজা। কিন্তু যতবাব দেখে ততবারই ভাল লাগে।

ছবিটার মধ্যে কী আছে, অলৌকিক কিছু, রাজা বলতে পারবে না। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলে শুধু মনে হয়, সব কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তখন কোনো খারাপ কথা, নোংরা দৃশ্য, কিংবা কুৎসিত খিস্তিটিস্তি, কিছুই ভাবতে পারে না সে।

যিশুর ছবিটা অনেকক্ষণ দেখল রাজা। তারপর ডান পাশে সরে গিয়ে গরাদহীন প্রকাণ্ড জানালার বাইরে তাকাল। এখান থেকে নদীটা স্পষ্ট দেখা যায়। গেরুয়া রঙের জল এখন ভাটার টানে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। দু' চারটে মহাজনী ভড় মন্থর গতিতে উত্তরে চলেছে। মাঝ নদীতে একটা গাধাবোট অনড় পড়ে আছে। ক'টা পাখি অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছিল। অনেক দূরে শ্মশানটা এখন নিঝুম। তার পাশে খেয়াঘাটে লোক চলাচল শুরু হয়েছে। নদীর ওপারটা এখনো কুয়াশায় ঝাপসা।

নদী-কুয়াশা-পাখি-খেয়াঘাট-মহাজনী ভড়, টুকরো টুকরো দৃশ্য চোখের সামনেই রয়েছে। তবু যেন স্পষ্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না রাজা।

পেছনে ফাদার ডোনাল্ডস পড়ে যাচ্ছিলেন :

> In thee, O LORD, do I put my trust ;
> Let me never be ashamed :
> deliver me in thy righteousness.
>
> Bow down thine ear to me ;
> deliver me Speedily :
> Be thou my strong rock,
> for a house of defence to Save me.

বাইবেলের সুর আবছাভাবে কানের কাছে বেজে যাচ্ছিল। তবু কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না রাজা। শুনলেও বুঝতে পারত না। অত ইংরেজি বিদ্যে তার পেটে নেই।

একসময় বাইবেল বন্ধ করলেন ফাদাল ডোনাল্ডস। তারপর ডাকলেন, 'এস হে রাজ রাজেশ্বর—' রগড় করে ওই নামেই রাজাকে ডেকে থাকেন তিনি। কখনও বা বলেন, 'রাজ চক্রবর্তী।'

জানালার কাছ থেকে সরে এসে খাটিয়ার একধারে গুটিসুটি মেরে বসল রাজা।

ধুতির খুঁটে চশমার কাচ মুছে চোখে লাগাতে লাগাতে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'এবার অনেক দিন পর এলি। সেই দশহরার সময় এসেছিলি। তারপর এই—'

'হ্যাঁ—'

'অ্যাদ্দিন কোথায় ডুব দিয়েছিলি?'

'এখানেই তো ছিলাম।'

'তবে আসিস নি কেন?'

'কত রকমের ঝামেলা।'

ফাদার ডোনাল্ডস হাসলেন, 'হ্যাঁ, কত রাজকার্য তোমার।'

একটু চুপ। তারপর ফাদার ডোনাল্ডসই আবার বললেন, 'কেমন আছিস বল—'

'আমার আবার থাকাথাকি। দিনকে দিন 'পান্‌চার' হয়ে যাচ্ছি।' গুচ্ছের তেতো গেলার মতো মুখ করল রাজা। বুকে একটা আঙুল রেখে বলল, 'এখান থেকে যেরকম হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে তাতে একদিন 'ফুস' হয়ে যাব।'

রাজার কথাবার্তার ধরনে আমোদ লাগল ফাদার ডোনাল্ডসের। হাসতে হাসতেই বললেন, 'বাড়ির খবর বল—'

'সবগুলো আছে এখনো। কেউ মরে নি।'

'তোর বৌদি?'

'তার আবার কী হবে? আমার বুকের ওপর রক্কেকালী হয়ে নেচে যাচ্ছে। আমাকে খতম না করে শালী মরবে না।'

'বৌদির সম্বন্ধে ওরকম করে বলে।'

'ও বৌদি নাকি, ডাইনী। রক্ত চুষে চুষে আমাকে ছিবড়ে করে ছাড়ছে।'

ফাদার ডোনাল্ডস আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নজর এসে পড়ল রাজার ওপর। এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেন নি। এবার দেখতে পেলেন, শীতের এই সকালে ছেলেটার গায়ে জ্যালজেলে বুশ শার্ট ছাড়া আর কিছু নেই। হাত দু'টো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে একেবারে কুঁকড়ে আছে। কনকনে উত্তুরে বাতাসে তার গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ফাদার ডোনাল্ডসের খুব কষ্ট হল। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তোর গরম কোট টোট নেই? পাতলা একটা জামা পরে এই শীতে বেরিয়ে পড়েছিস!'

রাজা উত্তর দিল না। তার চোখের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। মনে হল, এক্ষুনি ভেতর থেকে জল বেরিয়ে আসবে। শীতে সে মরে যাচ্ছে কিনা, সে খোঁজ একবারও নেয় না বৌদি। শধু টাকার সঙ্গে তার সম্পর্ক। রাজা মরে গেলে যদি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মেলে, এই মুহূর্তে বৌদি তার মৃত্যু কামনা করবে। রোড কনট্রাক্টরের বাচ্চা তুলসী নাকি তার প্রাণের বন্ধু। সেই হারামজাদার ছা-টা পর্যন্ত তার গা থেকে বেমালুম কাল উলের জ্যাকেটটা খুলে নিল। অথচ ফাদার ডোনাল্ডস তার কষ্টের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

রাজা বলল, 'না, কোট ফোট নেই।'

'একটা কিনে নে।'

'পয়সা কোথায়?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে ফাদাল ডোনাল্ডস বললে, 'এক কাজ কর, ওই কম্বলটা গায়ে দিয়ে বোস—'

দূরে টিনের বাক্সর মাথায় একটা কম্বল ভাঁজ করা ছিল। সেটা নামিয়ে এনে গায়ে দিয়ে বসল রাজা।

একটু ভেবে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'অনেক দিন আসিস না। ভেবেছিলাম, দু' একদিনের ভেতর তোদের বাড়ি যাব। তা হ্যাঁ রে, আজকাল কী করছিস?'

'ওই যা করছিলাম।' বলেই মাথা নিচু করল রাজা। রেল ইয়ার্ডের মাল পাচার, ইলেক্ট্রিকের তার কাটা, ইত্যাদি ইত্যাদির খবর ফাদার ডোনাল্ডস জানেন।

বিষণ্ণ সুরে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'কোথাও একটা কাজ টাজ জোটাতে পারলি না?'

'না। কাজ কোথায়?'

'তা বটে। চারদিকের কল-কারখানা ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো খোলা আছে সে সব জায়গাতেও স্ট্রাইক, লক-আউট।'

ফাদার ডোনাল্ডস লম্বা শ্বাস টেনে বললেন, 'কোথাও শান্তি নেই, কী সময় যে পড়ল!'

রাজা চুপ করে রইল।

এবার চিন্তিত মুখে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'তোকে নিয়ে আমার বড্ড ভয়। কখন কী বিপদ আপদ ঘটিয়ে বসিস।'

জড়ানো গলায় রাজা কী উত্তর দিল, বোঝা গেল না।

ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'সকালবেলা উঠেই তো চলে এসেছিস। নিশ্চয়ই খেয়ে টেয়ে আসিস নি?'

তাঁর কাছে রাজার কোনোরকম সঙ্কোচ নেই। বলল, 'না।'

ফাদার ডোনাল্ডস্ বললেন, 'কাল বিকেলবেলা রাধামোহনবাবুদের বাড়ি থেকে অনেক মিষ্টি টিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওই যে পেতলের সরাটায় রয়েছে। খা—'

রাজা ইতস্তত করতে লাগল, 'একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'আগে খা, তারপর শুনছি।'

খাওয়ার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে রাজা বলল, 'পাঁচটা টাকা দিতে হবে। পরশু দিন ফেরত দিয়ে যাব।'

কাল রাত্তিরেই বৌদি জানান দিয়ে রেখেছিল, ঘরে একদানা চাল নেই। ফাদার ডোনাল্ডসের কাছ থেকে টাকাটা পেলে চাল কিনে নিয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে দরকার হলে এখানে এসে হাত পাতে রাজা: আবার দু' চারদিন পর ফেরত দিয়ে যায়।

অবশ্য বন্ধুদের কাছে গেলেও ধার পাওয়া যেত। কিন্তু তাদের কাছে যেতে ইচ্ছা করছিল না। তা ছাড়া জয়ার ব্যাপারে ফাদার ডোনাল্ডসের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সেইটেই আসল।

বাক্স থেকে টাকা বার করে রাজার হাতে দিতে দিতে বলল, 'পাঁচটা টাকা নিবি। তার জন্যে অত ভণিতা কেন রে?'

রাজা বলল, 'এবার সেই দরকারের কথাটা বলি।'

'বলে ফেল।'

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে মুখ নিচু করল রাজা, পায়ের নখ দিয়ে মেঝে আঁচড়াতে আঁচড়াতে দ্বিধার গলায় বলল, 'একটা মেয়ের জন্যে আপনার কাছে এসেছি।'

ফাদার ডোনাল্ডস অবাক হয়ে গেলেন, 'মেয়ে!'

'হ্যাঁ।'

'কে?'

'আপনি চিনবেন না।'

'শ্যামনগরের এমন কেউ আছে নাকি যাকে আমি চিনি না? তুই নাম বল দিকি—'

'শ্যামনগরের মেয়ে না।'

'তবে কোথাকার রে?'

'সে আছে।'

ফাদার ডোনাল্ডস বুঝলেন, মেয়েটার নাম-ধাম পরিচয় এক্ষুনি বলতে চায় না রাজা। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধোলেন, 'তোর সঙ্গে আলাপ হল কি করে?'

রাজা মুখ নিচু করেই ছিল। বলল, 'হঠাৎ হয়ে গেছে।'

'তোর সবটাই যে হেঁয়ালি। কিছুই পরিষ্কার করে বলছিস না।'

রাজা উত্তর দিল না।

ফাদার ডোনাল্ডস আবার বললেন, 'সে যাক গে। যে মেয়েকে কোনোদিন দেখিনি, নাম শুনিনি, তার জন্যে আমাকে কী করতে হবে বল—'

'একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে হবে।' রাজা মুখ তুলল।

ফাদার ডোনাল্ডস চমকে উঠলেন, 'চাকরি!'

'হ্যাঁ। জয়াটা ভারি গাড্ডায় পড়ে গেছে। একটা চাকুরি বাকরি না হলে ওদের ফ্যামিলি স্রেফ ফুটুস হয়ে যাবে।'

'মেয়েটার নাম বুঝি জয়া?'

ঝোঁকের মাথায় নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। রাজা হাসল। আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'জয়া। বেশ নাম।' বার দুই তিন নামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারণ করলেন ফাদার ডোনাল্ডস। তারপর বললেন, 'তোর সঙ্গে কদ্দিনের আলাপ মেয়েটার?'

'একদিনের। কালকেই হয়েছে।'

'একদিনের আলাপেই তার জন্যে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছিস! ব্যাপার কি রে—' রগড়ের গলায় বলে গেলেন ফাদার ডোনাল্ডস।

রাজা হকচকিয়ে গেল, 'না মানে—যাঃ শ্লা, আপনি যেন কী!'

ফাদার ডোনাল্ডস হাসতে লাগলেন।

রাজার খুবই অস্বস্তি হতে লাগল। বিব্রতভাবে সে বলল, 'হাসবেন না মাইরি। আপনি যা ভাবছেন তা মোটেই না—'

'আমি কী ভাবছি?'

'জানি না, যান। কী জন্যে এলাম আর আপনি আমাকে কোন ক্যাঁচাকলে ফেলতে চাইছেন।'

খুব এক চোট হেসে ফাদার ডোনাল্ডস একসময় গম্ভীর হয়ে গেলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি চাকরি কোথায় পাব?'

'তা আমি জানি না। আপনার সঙ্গে কত লোকের জানাশোনা। সবাই আপনার কথা শোনে, আপনাকে খাতির করে। আপনি বললে কেউ 'না' বলতে পারবে না।'

'আমার সঙ্গে যাদের জানাশোনা, তুইও তো তাদের চিনিস। তুই একবার তাদের বলে দ্যাখ না—'

'কী যে বলেন পাদ্রীসাহেব!'

'খারাপটা কী বলেছি?'

রাজার মুখটা এবার ভারি করুণ দেখাল, 'আপনি তো আমাকে ভাল করেই জানেন। আমি মাল পাচার করি, ছেনতাই পার্টিতে আমার নাম লেখানো আছে। আমার মতো লোককে কেউ বাড়িতেই ঢুকতে দেবে না। দেখলেই দারোয়ান ফারোয়ান ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে।'

ব্যথিত সুরে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'আচ্ছা দেখি, কী করতে পারি—'

'যা করবার তাড়াতাড়িই করবেন। দু' চারদিনের ভেতর একটা কিছু জোগাড় না হলে কী যে হবে ভাবতে পারছি না।' রাজা বলছিল ঠিকই কিন্তু তার চোখের সামনে বার বার জয়ার মুখ ভেসে উঠছিল, আর তার পেছনে অন্ধকার ছায়ার মতো রমলাদি দাঁড়িয়ে।

কপট বিরক্তির গলায় ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'কোত্থেকে যে সব ঝঞ্ঝাট জুটিয়ে আনিস—'

'রাগ করুন আর যা-ই করুন, আপনি ছাড়া আর কার কাছে যাব!'

'খুব অয়েল দিচ্ছিস।' মাঝে মধ্যে মজার জন্যে রাজাদের মতো 'ইডিয়ম' ব্যবহার করে থাকেন ফাদার ডোনাল্ডস।

'শুধু শুধু অয়েল দেব কেন? যা সত্যি তাই বলছি।'

ফাদার ডোনাল্ডস রাজার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে কৌতুকের আভা ঝকমক করছে। বললেন, 'বাবা, একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—'

রাজা বলল, 'আমি কিন্তু জয়াকে খবর দেব, তার চাকরি হয়ে যাবে।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'না না, কোথায় চাকরি কোথায় কী, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। উনি খবর দিতে চললেন!' হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে আবার বললেন, 'হ্যাঁ রে—'

'মেয়েটা কতদূর পড়াশুনা করেছে তা তো বলিস নি—'

রাজা বলল, 'পি. ইউ পাশ করেছে।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'গুড। পি. ইউ পাশ মেয়ে তোর পাল্লায় পড়ল কেমন করে?'

রাজা একবার ভাবল, কালকের কথা সব খুলে বলে। পরক্ষণে ঠিক করল, এখন নয়। ফাদার ডোনাল্ডস অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য, তবু ব্যাপারটা পরেই বলবে। সে চুপ করে রইল।

ফাদার ডোনাল্ডস এ নিয়ে আর প্রশ্ন করলেন না। জয়ার সঙ্গে রাজার কিভাবে আলাপ টালাপ হয়েছে, আগেও একবার জানতে চেয়েছিলেন। রাজা উত্তর দেয় নি। ওর অনিচ্ছার কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।

রাজা হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি এবার যাই। বাড়িতে আবার চাল ফাল কিনে দিতে হবে।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'আমিও বেরুব। একটু বোস, একসঙ্গেই বেরুনো যাবে।'

'আচ্ছা।'

ফাদার ডোনাল্ডস তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলেন। জোড়াতালি-দেওয়া লঝ্ঝর সাইকেলটা বার করে বললেন, 'চল—'

রাজা উঠে পড়ল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে দু'জন পাশাপাশি নামতে লাগল।

নদীর পাড়, শ্মশান, রামসীতা মন্দির, সব পেছনে ফেলে ওরা একসময় শ্যামনগরের রাস্তায় এসে পড়ল।

হঠাৎ ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'তোর সেই রমলাদির খবর কি রে—'

বুকের ভিতর বোমা ফাটাব মতো আওয়াজ হল যেন। রমলাদির সঙ্গে তার সম্পর্কটা মোটামুটি জানেন ফাদার ডোনাল্ডস। জড়ানো গলায় রাজা বলল, 'ভালই আছে রমলাদি।'

'এখনো তার কাছে যাস?'

'যাই। ডেকে পাঠালেই যেতে হয়।'

ফাদার ডোনাল্ডস গম্ভীর হয়ে গেলেন। রমলা যে ভাল নয় তা তিনি জানেন। তবে কতখানি খারাপ, সেটা হয়তো তাঁর অজানা।

রাজা আবার বলল, 'রমলাদির কাছে গেলে দু' চারটে পাত্তি হাতে আসে। না গিয়ে করি কী?'

কথায় কথায় ওরা শ্যামনগরের মাঝমধ্যিখানে এসে পড়েছিল। রাজা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'আমি বাজারের দিকে যাব। আপনি?'

''আমি স্টেশনের কাছে—'

'তা হলে চলি—'

'আচ্ছা।'

'জয়ার কথা কিন্তু মনে রাখবেন।'

'রাখব-বৈকি।'

'ওই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কবে দেখা করব?'

'দু' চারদিন পর আসিস।'

'একটু তাড়াতাড়ি করবেন কিন্তু—'

'চাকরি কি আমার হাতে রে—' ফাদার ডোনাল্ডস হাসলেন।

'তবু—' রাজা বাঁ দিকে ঘুরে বাজারের রাস্তায় নেমে গেল।

ফাদার ডোনাল্ডস এতক্ষণ সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছিলেন। এবার উঠে স্টেশনের দিকে চালিয়ে দিলেন।

আট

দেড় কেজি চাল, পাঁচশ' গ্রাম মুসুর ডাল, আলু আর পেঁয়াজ কিনতেই পাঁচ টাকার নোটটা প্রায় ফৌত হয়ে গেল। মাত্র তেরটা নয়া পয়সা বেঁচেছে। তা দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেটও হবে না।

আজকের দিনটা কোনোবকমে চলে যাবে। কিন্তু কাল? পরশু? তারপরের দিন? থান ইটের মতো চাঁই চাঁই ভাবনার বোঝা মাথায় চাপিয়ে রাজা বাড়ি ফিরে এল। ফিরতেই টুনি বলল, 'সকালবেলা উঠে কোথায় গিয়েছিল কাকু?'

অন্যমনস্কের মতো রাজা উত্তর দিল, 'কাজে গিয়েছিলাম।'

'একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'কে রে?'

'কে তুমিই বল না—'

'আমি কি করে বলব? আমি কি বাড়িতে ছিলাম?'

'একটু ভাবো না।'

এটা টুনির অনেক দিনের পুরনো খেলা। মজার খেলাও। রাজা যখন বাড়ি থাকে না সেই সময় কেউ এলে তার নামটা সহজে বলতে চায় না। রাজাকে কিছুক্ষণ ভাবায়। তাবপব বলে। রাজাও এতে খুব আমোদ বোধ করে।

ভাবনার ভান করে বাজা বলল, 'বতন এসেছিল?' তাব বন্ধুবান্ধবদের সবাইকেই চেনে টুনি।

'উঁহু—' টুনি জোবে জোরে মাথা নাড়ল।

'তা হলে তুলসী।'

'উঁহু—'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে রাজা চমকে উঠল। তবে কি রমলাদি লোক পাঠিয়েছিল? হাড়ের ভেতর দিয়ে হিমের মতো কী যেন নেমে গেল তাব। চোখমুখ কুঁচকে রূঢ় গলায় বলল, 'কে এসেছিল? বাঁদরামি না করে নাম বল—'

রাজার এই আকস্মিক পরিবর্তনে ভয় পেয়ে গেল টুনি। দুবন্ত অভিমানে চোখদুটো নিমেষে জলে ভরে উঠল। ভারী গলায় সে বলল, 'বিল্টুকাকু এসেছিল।'

'কে বিল্টু?'

'ননীকাকুর ভাই।'

মনে পড়ে গেল। ননীর ছোট ভাইটার নাম বিল্টুই। রাজা এই ভেবে আরাম বোধ করল যে রমলাদি অন্তত লোক পাঠায় নি। কিন্তু এই সকালবেলা বিল্টু এল কেন? রাজা শুধলো, 'বিল্টু কী বলে গেছে?'

'তোমাকে ওদের বাড়ি যেতে বলেছে।'

'কখন?'

'তুমি বাড়ি ফিরলেই।'

'আর কিছু বলেছে?'

'না।'

বিল্টুদের বাড়ি যাওয়ার জন্য পেছন ফিরেই আবার ঘুরে দাঁড়াল রাজা। স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে টুনির দিকে তাকাল। টুনির চোখের ভেতর মার্বেলগুলির মতো কুচকুচে কালো মণিদুটো এখন ঝাপসা। টুকটুকে পাতলা ঠোঁট দুটো থথর কাঁপছে। অনেকখানি ঝুঁকে রাজা খুব আস্তে করে বলল, 'রাগ হয়েছে?'

টুনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিছু বলল না।

টুক করে টুনিকে কোলে তুলে নিয়ে রাজা ছড়া বলতে লাগল :

'রাগ করেছে রাগুনি,
রাঙা মাথায় চিরুনি,
বর আসবে এক্ষুনি,
তুলে নিয়ে যাবে তক্ষুনি।'

টুনি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাতেও লাগল, 'ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও—'

রাজা ছাড়ল তো না-ই, টুনির হালকা পাখির মতো দেহটা ওপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লোফালুফি করতে লাগল।

টুনি সমানে চেঁচিয়েই যাচ্ছে, 'ছাড় আমাকে, ছাড়। আমাকে ধরবে না, আমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

রাজা বলল, 'ছাড়তে পারি, তার আগে হাসতে হবে।' বলেই আবার আকাশে ছুঁড়ে দিল টুনিকে।

অনেকক্ষণ পর টুনি সত্যিই হেসে ফেলল। তাকে নামিয়ে রাজা বলল, 'রাগ পড়ল?'

টুনি হাসছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখ জলে বোঝাই। সে বলল, 'আমাকে বকে আবার হাসতে বলবে!'

'আমি বকেছি নাকি?'

'তবে কী করলে?'

'ঠাট্টা রে, ঠাট্টা—'

'ঠাট্টা! আমি যেন কিছু বুঝি না—'

'তুই আর বুঝবি না! পাকা বুড়ি যে—' রাজা বলল, 'ঢের হয়েছে, এবার একটা হাম খা—' বলে একটা গাল বাড়িয়ে দিল।

চোখ কুঁচকে ঘাড় বাঁকিয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আলতো করে রাজাকে একটা চুমু খেল টুনি।

রাজা এবার আরেকটা গাল বাড়িয়ে দিল। আরেকটা চুমু খেল টুনি।

চুমু-টুমুর পর রাজা বলল, 'তোর জন্যে কী আনব?'

'জিলিপি।'

'আচ্ছা। এখন তা হলে যাই?'

টুনি হাসিমুখে ঘাড় কাত করল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকগুলো অলিগলি আর কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল রাজা। রাস্তাটা দক্ষিণে স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছে। স্টেশন যেদিকে, তার ঠিক উলটোদিকে, অর্থাৎ উত্তরে হাঁটতে শুরু করল রাজা।

এতক্ষণে বেশ রোদ উঠে গিয়েছে। খানিকটা আগেও কনকনে হাওয়া যেন হাড়ের ভেতর বিঁধে যাচ্ছিল। এখন তত হিম নেই। হাওয়া উষ্ণ আরামদায়ক হয়ে উঠেছে।

উত্তর দিকে কিছুক্ষণ গেলেই ঢালী পাড়া। ঢালী পাড়ায় কোনো কালে ঢালীরা থাকত কিনা, কে জানে। রাজা অন্তত জানে না। তবে এখন ঢালীরা নেই। তারা ছাড়া আর সব জাতই দেখতে পাওয়া যাবে।

ঢালী পাড়ার শেষ মাথায় ননীদের বাড়ি। বাড়ি আর কি, বড় রাস্তার কাঁচা নর্দমার ধারে খান তিনেক টালি-ছাওয়া খুপরি খুপরি ঘর। ঘরগুলো কোমর সিধে করে দাঁড়িয়ে নেই, একদিকে হেলে আছে। বাড়িটা অবশ্য পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটা সদর দরজাও আছে, রাস্তার দিকে।

জোরে জোরে পা ফেলে একসময় ননীদের বাড়ির কাছে এসে পড়ল রাজা। সদর দরজার দু'ধারে উদ্দাম বুনো কচুর ঝাড়। কচুর পাতায় এত বেলাতেও শিশির টলটল করছে। খোলা নর্দমা পেরিয়ে বাড়ি ঢুকবার জন্য দু'খানা তক্তা পাতা রয়েছে।

রাস্তা থেকেই রাজা দেখতে পেল, সদরে হেলান দিয়ে বিল্টু দাঁড়িয়ে আছে। পনের ষোল বছর

হবে ছেলেটার। রোগা, দুর্বল চেহারা। ভাসা ভাসা দুটো চোখ আর এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছাড়া বলবার মতো তার শরীরে আর কিছুই নেই।

বিল্টু রাজাকে দেখতে পেয়েছিল। ডাকল, 'এস—এস রাজাদা। সকালবেলা তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

তক্তার ওপর দিয়ে বিল্টুর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল রাজা। বলল, 'খবর পেয়েছি। টুনি বলেছে। কী ব্যাপার বিল্টু?'

'আমার কোনো ব্যাপারে না। দাদা ডাকতে পাঠিয়েছিল।'

'কেন রে?'

'কাল রাত্তিরে দাদা এক কাণ্ড করে এসেছে।'

'কী?'

'ভেতরে যাও, গেলেই দেখতে পাবে।'

রাজা মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বলল, 'ননী বাড়ি আছে?'

'আছে—' বিল্টু মাথা নাড়ল, 'কোথায় যাবে আর? এখন কম করে দু'টো মাস ঘরে বসে থাকতে হবে।'

রাজা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বিল্টুর পাশ দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। ঢুকতেই চোখে পড়ল, সামনের রকে ননীর বাবা রাসমোহন বসে আছে।

রাসমোহনের বয়স ষাটের আশেপাশে। সারা গায়ে মাংস বলতে কিছু নেই। হাড়ের ওপর ঢিলে চামড়া জড়িয়ে আছে। চোখ গর্তে ঢোকানো। পাঁশুটে রঙের চুল ঘাড়ের ওপর কানের ওপর ঝুলছে। মুখময় দশ-বার দিনের দাঁড়ি-গোঁফ কাঁটার মতো ফুটে আছে।

রাসমোহনের একটা হাতও নেই। বছর কয়েক আগে সে ছিল স্টিল রোলিং মিলের ফিটার। কাজ করতে করতে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ফল হয়েছিল এই, মেশিনের দাঁত তার হাত টেনে নিয়েছিল। তিন মাস হাসপাতালে থেকে যখন সে বাড়ি ফিরেছিল, দু' হাতের কনুই পর্যন্ত খোয়া গিয়েছে; সেই সঙ্গে চাকরিটাও। অবশ্য কোম্পানি দু'হাতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দু'হাজার টাকা দিয়েছিল।

এই মুহূর্তে রাসমোহন ঠিক বসে নেই। দু'হাতের দু' কনুইতে একটা নিমের ডাল আটকে আশ্চর্য কৌশলে দাঁত মাজছে।

রাজাকে দেখে দাঁতন করা বন্ধ হল। গর্তের ভেতর থেকে ঝট করে দুই চোখ বার করে এনে রাসমোহন বলল, 'বন্ধুকে দেখতে এসেছিস বুঝি?'

জড়ানো গলায় রাজা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। মানে—'

'যা ওই ঘরে পড়ে আছে। দ্যাখ গে, হারামজাদা কাল রাত্তিরে কী করে এসেছে—' থুতনি উঁচু করে ডান ধারের একটা ঘর দেখিয়ে দিল রাসমোহন।

রাজা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, বাঁ দিকের ঘর থেকে ননীর মা বেরিয়ে এল। পরনে লাল পাড় শাড়ি, আর সাদা জামা। কপালে সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। নরম গড়ন, প্রতিমার মতো মুখ। বড় বড় চোখ দুটিতে স্নেহ আর ভয় যেন সবসময় মাখানো। এই বয়সেও প্রচুর চুল। একেবারে কোমর ছাপিয়ে নেমে গিয়েছে। ননীর মা রাগ করতে জানে না। কোনোদিন তাকে উঁচু গলায় কথা বলতে শোনা যায় নি। চিরকাল তাকে একই রূপে একই বেশে দেখে আসছে রাজা।

ননীর মা'র গা ঘেঁষে বছর আটেকের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও ননীর ছোট বোন পুতুল।

রাজার গলা পেয়ে মাঝখানের ঘর থেকে আরেকজনও বেরিয়েছে। সে ননীর বড় বোন মীনা। কুড়ি বাইশের মতো বয়েস মেয়েটার। মাজা মাজা রঙে চকচকে মসৃণ একটা ভাব আছে। গোল মুখ, চাপা থুতনি, কমলার কোয়ার মতো ভারী রসালো ঠোঁট, নাকটা বেশ ধারাল। লালচে চুল মুখময় পিঠময় এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। মেয়েটার সবই বড় বড়—চোখ, বুক, হাত, পা, আঙুল—সব। দীর্ঘ চোখে তার চকিত, খর চাউনি। পরনের শাড়ি-জামা ঢিলেঢালা, অগোছালো। মেয়েটার চোখের দিকে

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, বুকের ভেতর ঝাঁপতালে কী যেন বাজতে থাকে। সেই সঙ্গে অস্বস্তিও হয়।

ননীর মা বলল, 'তোর বন্ধু কী সর্বনাশটা যে করে এল কাল!' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

সমস্ত ব্যাপারটা এখনো রহস্যময়। রাজা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মাসিমা?'

'কী হয়েছে, ননীর ঘরে গিয়ে দেখে আয় না। বাঁদর নিজেও মরবে, আমাকেও মারবে। ওর জন্যে ভেবে ভেবে আমার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

রাজা মনে মনে বিরক্ত হল। বিল্টু থেকে আরম্ভ করে সবাই ধানাইপানাই করছে, অথচ আসল কথাটা কেউ খুলে বলছে না। আর কোনো প্রশ্ন না করে রাজা রাসমোহনের পেছনে দিয়ে ননীর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ননীর ঘরটা বড় রাস্তার নর্দমার ধার ঘেঁষে। এক কোণে তক্তপোষের ওপর আধশোয়ার মতো করে পড়ে ছিল সে। মাথায় মস্ত ব্যান্ডেজ। ডান হাতে আর বাঁ উরুতে প্লাস্টার।

রাজা চমকে উঠল, 'শ্লা, করেছিস কী?'

ননী বিষণ্ণ হাসল, 'আর বলিস না, কাল রাতে ব্যাপারটা হয়ে গেল। উরুটা বোধ হয় ভাঙে নি। তবে হাতের হাড় পাউডার হয়ে গেছে। মরে যাব রাজা, মাইরি বলছি মরে যাব।'

রাজা সান্ত্বনার গলায় বলল, 'পাউডার হলে কি আর প্লাস্টার কবত? তোর বাবার মতো হাতখানা উড়িয়ে দিত। হয়তো ভেঙেছে; ও ঠিক জোড়া লেগে যাবে। তা এমন জখম হলি কী করে?'

ননী বলল, 'কাল রাতে গণেশদার রেস্টুরেন্ট থেকে তুই তো বাড়ি কাটলি। তারপর আমরা গেলাম স্টেশনে।'

রাজার মনে পড়ে গেল। সে বলল, 'রেল ইয়ার্ডের সেই মালগুলোর জন্যে তো?'

'তা হলে কি শীতের রাতে হাওয়া খেতে?'

রাজা বলল, 'তারপর?'

ননী এবার যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। স্টেশনে গিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করেছিল। লাস্ট ট্রেন চলে যাওয়ার পর চারদিক যখন নিঝুম হয়ে গেল, ননীরা একে একে স্টেশনের ওভার-ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়েছিল। রেল ইয়ার্ডের যে জায়গায় মালগুলো রয়েছে সেটা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা। ফ্লাড লাইট জ্বলছিল। আলোয় এত জোর যে সব কিছু দিনের মতো স্পষ্ট। তাছাড়া চারটে রেল পুলিশ রাইফেল ঘাড়ে পাহারা দিচ্ছিল।

ওভার-ব্রিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ননীদের মনে হচ্ছিল, হিমে হাত-পা জমে যাচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ পাহারাওলারা জেগে আছে, কিছু করার উপায় নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ননীদের চোখে পড়েছিল, রেল পুলিশ চারটে ইয়ার্ডের একধারে তাঁবুর ভেতরে ঘুমোতে গেল। তারপর ওরা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। যখন তাঁবুটা গভীর ঘুমে ডুবে গেল সেইসময় খুব সাবধানে পা টিপে টিপে ননীরা নিচে নেমে গিয়েছিল। তারপর তারকাঁটার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ইঁদুরের মতো বুকে হেঁটে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছিল।

চারধারে ছোট ছোট মেসিন পার্টসের অসংখ্য পেটি। স্ক্রু-ড্রাইভার আর সাঁড়াশি নিয়ে গিয়েছিল ননীরা। ক্ষিপ্র হাতে পেটি ভেঙে টকাটক মেশিন পার্টস থলেতে বোঝাই করছিল।

সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ মসৃণ গতিতে চলছিল। হঠাৎ তাঁবুর ভেতর থেকে একটা পাহারাওলা পেচ্ছাপ করতে বেরিয়েছিল। ননীদের বুকে দম আটকে গিয়েছিল যেন।

প্রাকৃতিক কর্মটি সেরে পুলিশটা তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে হতে ঘুম চোখে ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়েছিল। আর তক্ষুনি ননীদের দেখতে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 'কৌন কৌন' করে চিৎকার করে উঠেছিল। চেঁচামেচিতে তাঁবুর ভেতর থেকে অন্য পাহারাওলারা ধড়মড় করে বেরিয়ে এসেছিল।

নীরা আর বসে থাকে নি। তারকাঁটা ফাঁক করে দুদ্দাড় দৌড় লাগিয়েছিল। পাহারাওলারা পিছু পিছু অনেকখানি ধাওয়া করে এসেছিল। ননীরা অবশ্য ততক্ষণে ইয়ার্ড পেরিয়ে স্টেশনের দু' নম্বর

প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ওভার-ব্রিজে গিয়ে উঠেছে। আর ওভার-ব্রিজ টপকে ওধারের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা হড়কে গড়তে গড়াতে নিচে পড়ে গিয়েছিল ননী।

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় চোখ গোল হয়ে গিয়েছিল রাজার। এই শীতকালেও কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। জোরে শ্বাস টেনে সে বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কি—' ননী হাসল, 'হাড়গোড় পাংচার হয়ে স্রেফ তালগোল পাকিয়ে গেলাম। ফোর ফাদারের ভাগ্যি, ধরা পড়িনি। পুলিশ এসে পড়বার আগেই রত্না শালা আমায় কাঁধে তুলে চোঁ চাঁ দৌড়—'

রাজা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়েই থাকল। কিছু বলল না।

ননী বলতে লাগল, 'গলিফলির ভেতর দিয়ে রত্নারা আমাকে নিয়ে তুললে ঘোষ ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার ঘুমুচ্ছিল। তাকে তুলে তার হাতে আমাকে ছেড়ে দলে। ডাক্তার আমাকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে সেলাই-টেলাই করে এই সব গয়না-গাটি পরিয়ে দিলে—' বলে ব্যান্ডেজ আর প্ল্যাস্টারগুলো দেখাল।

রাজা বলল, 'শ্লা, যদি ধরা পড়ে যেতিস?'

'কী আর হত, এতক্ষণ পুলিশের কোলে বসে লাপ্সি খেতুম। তারপর হাড় মাড় জোড়া লাগলে, ঘা ফা সারলে ড্যাডাং ড্যাডাং করে গারদখানায় ঢুকে পড়তাম।' এই পর্যন্ত বলে থামল ননী। তারপর কী ভেবে চোখ কুঁচকে আবার শুরু করল, 'আমার তো আর তোর মতো একটা রমলা টমলা নেই যে পুলিশের কবজা থেকে বার করে আনবে—'

রমলাদির কথায় ভীষণভাবে চমকে উঠল রাজা। তার রক্তের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো খুব তোড়ে কী যেন ছোটাছুটি করতে লাগল।

ননী আবার বলল, 'মাইরি, কাল ধরা পড়লে কী ফ্যাসাদে যে পড়তাম! পুরো ফ্যামিলিকে উপোস দিয়ে পেটে গামছা বেঁধে পড়ে থাকতে হত।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল রাজা। তার ভাগ্যের সঙ্গে ননীর খুব মিল। অবশ্য ননীর বাবা রাসমোহন রোলিং মিলে কাজ করবার সময় ওদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। সপ্তাহে পাঁচ দিন ওভার-টাইম খেটে রাসমোহন প্রচুর পয়সা কামাত। তবে কিছুটা ছোঁকছোঁকানি ছিল তার। মাসে আট দিন ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে সোজা জগবন্ধু সাহার দিশি মদের দোকানে চলে যেত সে। সেখান থেকে একটা কালীমার্কা বোতল কিনে থলের ভেতর লুকিয়ে গুটি গুটি গিয়ে হাজির হত শ্যামনগরের শেষ মাথায়। ওখানে খাপরা-ছাওয়া অনেকগুলো বস্তি ছিল। জায়গাটা শ্যামনগরের মোহিনীপাড়া। সেখানে বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল তার। চনমনিয়ে চারদিক দেখে টুক করে বস্তির ভেতর ঢুকে পড়ত রাসমোহন। যতই লুকোতে ছাপাতে চাক, এ খবরটা শ্যামনগরের কারো জানতে আর বাকি ছিল না।

মাল খাক আর মেয়েমানুষ রাখুক, রাসমোহন কখনো বেহেড হত না। তার সব কিছুই ছিল হিসেবের মধ্যে। মদের জন্যে দু' টাকা আর মেয়েছেলের জন্যে পাঁচ টাকা, মোট সাত টাকা করে আট দিনে ছাপ্পান্ন টাকা। মাসে এই ছিল তার বাজে খরচের বরাদ্দ। এর বাইরে সিকি পয়সাও এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই।

যেখানে যাক আর যা-ই করুক, সংসারের দিকে ননীর বাবার বেশ নজর ছিল। ছেলেবেলায় রাজা লক্ষ করত, ননী আর তার ভাইবোনেরা ভাল ভাল জামা, চকচকে জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্টিলের সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে ওদের যেতে দেখেছে রাজা।

তারপর যেদিন হাসপাতাল থেকে দু'খানা হাত খুইয়ে রাসমোহন বাড়ি ফিরল সেদিন থেকেই সংসারের চকমকানি গেল। দুই হাতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দু' হাজার টাকার আয়ু আর ক'দিন? ননী সে বছর স্কুল ফাইনাল ফেল করে পরের বারের জন্য তোড়জোড় করছিল। পরক্ষিা টরীক্ষা আর দেওয়া হল না। বইটই শিকেয় তুলে সে এসে রাজাদের দলে ভিড়ে গেল।

ননী বলল, 'পুলিশে ধরা না পড়লেও কদ্দিন যে ঘরে আটকে থাকতে হবে, কে জানে।'

রাজা বলল, 'তোর প্লাস্টার কবে খুলবে?'

'মাস খানেকের আগে না।'

একটু ভেবে রাজা বলল, 'পুলিশগুলো এমনি তাড়া করেছিল, না বন্দুক ছিল তাদের হাতে?'

ননী বলল, 'বন্দুক ছিল না।'

'বন্দুক থাকলে শ্লা ঠিক গুলি ঝেড়ে দিত।'

'তা দিত।'

জোরে জোরে বুকের ভেতর বাতাস টেনে রাজা বলল, 'কোন দিন দেখবি পুলিশের গুলি খেয়ে আমাদের লাইফ ফুট হয়ে যাবে।'

একটু চুপ। তারপর রাজা আবার বলল, 'আমাকে কী জন্যে আসতে বলেছিলি?'

'দরকার আছে। বোস না—'

'কী দরকার?'

ননী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দরজার কাছে মীনা এসে দাঁড়াল। রাজা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মেয়েটার সাপের মতো চকচকে চামড়ায়, গোল মুখে, পুরু ঠোঁটে আর স্থির চোখের তীব্র চাউনিতে এমন কিছু আছে যাতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রাজা। অদ্ভুত স্বভাব মেয়েটার। ননীর বন্ধুরা, বিশেষ করে রাজা এ বাড়িতে এলেই সে কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। এক জাতের বেড়াল আছে, গাছ দেখলেই গা ঘষে, মেয়েটা অনেকটা সেইরকম।

মীনাকে তেমন পছন্দ করে না রাজা। তবে অন্য বন্ধুরা, রতন-তুলসী-প্রদীপ ওই মেয়েটার জন্যই মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আড্ডা মারতে আসে। রতন একদিন নেশার ঘোরে রাজাকে বলেছিল, 'মীনাকে না পেলে মাইরি সুইসাইড করব। নইলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব।' নেশা কেটে গেলে অবশ্য দুটো সংকল্পের কথাই বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। রোড কন্ট্রাক্টরের বাচ্চা তুলসীটা একদিন রাজাকে একা পেয়ে বলেছিল, 'ননের বোনটা মাইরি যে কী না! ওদের বাড়ি গেলেই গন্ধ শুঁকতে আসবে। আর যদি গায়ে একটা হাত দিস স্রেফ তোর সঙ্গে জুড়ে যাবে। ঠিক যেন চিটে গুড়।'

রাগের গলায় রাজা জিজ্ঞেস করেছিল, 'মীনার গায়ে হাত দিয়েছিস নাকি রে?'

ভুরু কুঁচকে পগেয়া হারামীর মতো হেসে তুলসীটা বলেছিল, 'তুই কি আমায় ব্রহ্মচারী ভেবেছিস নাকি, অ্যাঁ? সেদিন রাত্তিরে দটো চুমু ঝাড়তে লাট খেয়ে এমন শালা বুকের ভেতর জমে গেল, আর ছাড়তে চায় না।'

প্রদীপও মীনার সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য করেছিল।

যাই হোক, মীনার দিকে তাকিয়ে ননী বলল, 'কি রে, কিছু বলবি?'

কোমর বাঁকিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল মীনা। মাথা নেড়ে বলল, 'না—'

'তা হলে এখন যা—'

মীনা গেল না, দাঁড়িয়ে থাকল।

ননী আবার বলল, 'যা না—'

মীনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'দাঁড়িয়ে থাকলে তোর গায়ে ফোস্কা পড়বে নাকি? খালি তাড়াতে চাইছিস।'

'রাজার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।'

'আমার সামনেই বল না।'

'না।'

মীনার গোল মুখ বিরক্ত, অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। আর কিছু না বলে এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল সে। তারপর বাস্তুসাপের মতো হেলেদুলে বারান্দা ধরে ওদিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর রাজা বলল, 'নে, এবার দরকারের কথাটা সেরে ফ্যাল—'

'তার আগে আমার একটা কথার জবাব দে তো—'

'কী কথা?'

'কাল তোর কী হয়েছিল রে?'

মনে মনে কিছুটা থতিয়ে গেল রাজা, 'কী হবে? কিছু হয় নি—'

সোজাসুজি রাজার চোখের দিকে তাকাল ননী। আস্তে আস্তে বলল, 'আমার চোখে তুই ধুলো দিতে পারবি না।'

রাজা চুপচাপ মুখ নামিয়ে তক্তপোষে নখের আঁচড় কাটতে লাগল।

ননী বলতে লাগল, 'কাল বোতল খাওয়ালি না। আমাদের সঙ্গে ইয়ার্ডের মাল হাপিস করতে গেলি না। কলকাতা থেকে ফিরে 'শোভা কাফে'তে যতক্ষণ ছিলি, কী যেন ভাবছিলি। কী হয়েছিল বল না রে—'

বন্ধুদের ভেতর এই একটা মাত্র ছেলে যাকে অনেক সময় প্রাণের কথা খুলে বলে রাজা। সেটা অকারণে না। ননীর মতো উপকারী ছেলে তার বন্ধুদের ভেতর একটাও নেই। বিপদের দিনে সে পাশে এসে দাঁড়ায়। বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে জানে। অনেক সময় নানা বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শও করে রাজা। ননী ছাড়া বাকিগুলো এক নম্বরের স্বার্থপর। কেমন করে অন্যের টু পাইস খসিয়ে দেবে শুধু সেই ধান্দা।

রাজা একবার ভাবল, জয়ার ব্যাপারটা বলে ফেলে। পরক্ষণেই ঠিক করল, এখন না। বলল, 'পরে শুনিস—'

ননী বলল, 'পরে কেন, এখন বললে কী হবে?'

'অনেক কথা। বলতে সময় লাগবে। পরেই শুনিস। আমি এবার উঠব। তোর দরকারী কথাটা সেরে নে।'

ননী বলল, 'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে—'

'কী?'

'কাল রাত্তিরে যে মাল সরিয়েছিলুম সেগুলো জগদীশ কালোয়ারের দোকানে ঝেড়ে দিয়ে আসবি। এমনি এমনি করতে বলছি না। শেয়ার পাবি। তোকে পাঁচটা টাকা দেব। রত্না শালাদের মাল ঝাড়তে দিলে আদ্ধেকের বেশিই মেরে দেবে।' রাজা ছাড়া আর কারোকেই টাকাপয়সা দিয়ে বিশ্বাস করে না ননী।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাজা, 'তুই না কাল হাড়-মাড় গুঁড়িয়ে ফেলেছিস।'

ননী মাথা নাড়ল। রাজার মনোভাবটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছিল সে। বলল, 'গুঁড়িয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু মালের থলেটা ছাড়িনি।.বাঁ হাতে ওটা বুকের ভেতর পুরে রেখেছিলাম।'

ঠোঁট ছুঁচলো করে রাজা বলে উঠল, 'গুরু গুরু, তোর হবে। শ্লা, পায়ের ধুলো দে—' বলে ঝুঁকে টুক করে ননীর পায়ে কপাল ঠুকে দিল।

হাসতে হাসতে ননী বলল, 'খচড়া—'

রাজাও হাসতে লাগল। বলল, 'মালগুলো দে—'

ননী বলল, 'তক্তপোষের তলায় থলেটা আছে, নিয়ে যা।'

থলে বার করে রাজা বলল, 'চললাম—'

'আজই কিন্তু টাকাটা দিয়ে যাস। ঘরে যা আছে এ বেলাটা চলবে কিনা কে জানে। বুঝতেই পারছিস—'

রাজা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সবে ঘুরেছে, ননী ডাকল, 'শোন—'

'কী বলছিস?' রাজা ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'একটা কথা বলব?'

'বল না—'

'মানে—'

'ভ্যানতাড়া না করে বলে ফ্যাল দিকি—'

তবু দ্বিধা কাটল না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল ননী, 'মালগুলো বেচলে জগদীশ কালোয়ার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকার বেশি দেবে না। ওই টাকায় ক'দিন আর চলবে?'

ননী কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে রাজা চুপ করে থাকল।

ননী আবার বলল, 'আমি যে ক'দিন সেরে না উঠছি তোকে মাইরি হেলপ্ করতে হবে। বাড়ি থেকে বেরুতে পারলেই তোর টাকা তোকে ফেরত দিয়ে দেব।' একটু থেমে, 'তোর অবস্থা জানি, নিজের ফ্যামিলি চালিয়ে আমাকে কিছু দেওয়া ভারি মুশকিল। কিন্তু তুই ছাড়া আমার আর কোনো ফ্রেন্ড নেই। ও শালাদের তো চিনি, এক পয়সাও ঠেকাবে না। যদ্দিন ঘরে পড়ে থাকব, খচড়াগুলো এ ধার মাড়াবে না।'

সরাসরি 'না' বলতে পারল না রাজা। চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়ল, 'আচ্ছা দেখি—'

'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'তোর গরম জামা টামা নেই। আমার পুল-ওভারটা নিয়ে যা।'

'তুই কী পরবি?'

'আমি তো আর এখন বেরুচ্ছি না। বাড়িতে কম্বল টম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকব।'

কৃতজ্ঞ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ননীর পুল-ওভারটা নিয়ে বেরিয়ে গেল রাজা। বাইরে এসে রাসমোহনকে দেখতে পাওয়া গেল না। মীনা বা বিন্টুও নেই। তবে ননীর মা আর পুতুল এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ননীর মা বলল, 'দেখলি তো?'

রাজা বলল, 'হ্যাঁ।'

'হাত-পা কি করে ভেঙেছে ননী বলল? আমি কত করে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু ছেলের পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারি নি।'

জড়ানো গলায় রাজা বলল, 'হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল তাই—'

'পড়ে গিয়েছিল!' কান্নার গলায় ননীর মা বলতে লাগল, 'মনে করেছিস, আমি কিছুই বুঝি না? মরবি, তোরা একদিন মরবি। তোদের কপালে ভগবান অপঘাত লিখে রেখেছে।'

রাজা খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মাসিমা আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।' বলে আর আর দাঁড়াল না। প্রায় লাফ দিয়ে নিচের উঠোনে নেমে হাঁটতে শুরু করল।

সদর দরজায় এসে কিন্তু রাজাকে থমকাতে হল। মীনা, ননীর সেই বোনটা দরজার পাল্লায় ঠেস দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সদর দরজায় এভাবে দাঁড়ানো মেয়েটার চিরদিনের অভ্যাস।

রাজা বঝতে পারল, তাকে ধরবার জন্যেই মীনা সদর জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো জায়গা নেই। যেতে হলে মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে যেতে হয়।

রাজা বলল, 'সিনেমার পোজ মেরে দাঁড়িয়ে আছিস যে। একটু সর—'

মীনা রাস্তা ছাড়ল না। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ রাজাকে দেখল। তারপর বলল, 'বন্ধুর সঙ্গে গল্প হল?'

'হ্যাঁ, হল।'

'বাবারে বাবা, সেই কখন দাদার ঘরে ঢুকেছ, এতক্ষণে বেরুবার সময় পেলে! কী কথাটাই না তোমরা বলতে পার!'

রাজা চুপ করে রইল।

মীনা এবার বলল, 'এবার কিন্তু অনেকদিন পর আমাদের বাড়ি এলে—'

'অনেকদিন কোথায়—' রাজা ভেবে বলল, 'এই তো সেদিন তোদের বাড়ি এসেছিলাম।'

'সেদিন!' মনে মনে হিসেব করে মীনা বলল, 'দু' মাস পার হয়ে গেছে তারপর—'

রাজা অবাক, 'তুই তারিখ মারিখ মনে করে রেখেছিস নাকি?'

'হুঁ—' মাথার সঙ্গে শরীরটাও নুইয়ে দিল মীনা, 'দাদার বন্ধুরা কে কবে আসে, সব আমার মনে থাকে।'

রাজা ভাবল, তা আর মনে থাকবে না! শালী বদমাইশের ধাড়ি। মনে মনে একটা অশ্লীল খিস্তিও আওড়াল সে। মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

মীনা বলল, 'আজকাল আসো না কেন রাজাদা?'

'এই কত রকমের ঝঞ্ঝাট—'

'ঝঞ্ঝাট যেন তোমার একলারই। আর কারো নেই? জান—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেল মীনা।

রাজা শুধলো, 'কী?'

অতলে গলা নামিয়ে মীনা ফিস ফিস করল, 'রোজ ভাবি তুমি আসবে, রোজ ভাবি তুমি আসবে—'

'আমি এলে কী?'

মৃদু ঝংকার দিয়ে উঠল মীনা, 'জানি না যাও। ন্যাকা কোথাকার, কিচ্ছু বোঝো না—' চোখের তারা স্থির করে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে সে হাসতে লাগল।

অনেকটা সময় বাজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে রাজা বলল, 'রাস্তা ছাড়। এবার যেতে হবে—'

'আরেকটু দাঁড়াও না বাপু—'

'কেন?'

'কেন আবার, গল্প করব।'

'গল্প করবার সময় নেই এখন।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তোমার যত ছটফটানি। কেন, আমি কি গায়ে জলবিছুটি মারি?'

'না রে, ভীষণ তাড়া আছে।' রাজা বলল, 'আরেক দিন এসে তোর সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেব।'

হতাশভাবে হাত আর ঠোঁট উলটে দিয়ে মীনা বলল, 'আর এসেছ তুমি!' বলে সরে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল। রাজা বাইরে বেরিয়ে যেতেই সে আবার বলল, 'ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে এখন গল্প-টল্প করব। তা না, বেশ সটকে পড়লে—'

হঠাৎ রাজার মাথায় বজ্জাতি ভর করল। সে বলল, 'গল্প যখন করতে পারলি না তখন এক কাজ কর—'

'কী?'

রগড়ের গলায় রাজা বলল, 'দেয়ালে গা ঘষতে থাক—' বলেই বড় রাস্তায় উঠে দৌড়। যেতে যেতে একবার ভাবল, ননীকে বলবে, খুব তাড়াতাড়ি যেন ছুঁড়িটার বিয়ে দিয়ে দেয়।

নয়

ননীদের বাড়ি থেকে খানিক দূর যাওয়ার পর রাজা ভাবল, এখনই জগদীশ কালোয়ারের দোকানে ননীর মালগুলোর ব্যবস্থা করে যাবে। পরক্ষণেই সে টের পেল, পেটের ভেতর পেরেক ফুটছে। খিদে, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

জগদীশের দোকানে যাওয়ার চিন্তাটা ধুলো ঝাড়ার মতো মাথা থেকে নামিয়ে দিল রাজা। আপাতত বাড়ি যাবে সে। খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা টানা একটা ঘুম লাগাবে। বিকেলে উঠে যা হয় করা যাবে।

বাড়ি ফিরতেই বৌদি বলল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

রাজা রুক্ষ স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোমার কী দরকার?'

বৌদির গলাও চড়ল, 'আমার আবার কী দরকার! দু'বেলা হাঁড়ি চড়াবার বন্দোবস্ত করে দিলেই আমি খুশি। তার বেশি কিছু জানতে চাই না।'

'তবে?'

'অনাথ এসেছিল।'

রাজা চমকে উঠল, 'কোন অনাথ?'

'বাপের বয়েসে এক অনাথকেই তো চিনি—' বিরক্ত কোঁচকানো মুখে বৌদি বলতে লাগল, 'ওই যে তোমার রমলাদির কাছ থেকে যে আসে।'

'কী, কী বলে গেছে অনাথদা?' রাজার গলা কাঁপতে লাগল।

'তোমাকে একবার রমলার বাড়ি যেতে বলেছে।'

'কবে?'

'আজই।'

'কখন?'

'যখন ইচ্ছে। রমলা আজ সারাদিনই বাড়ি আছে।'

'আর কিছু বলেছে?'

'না।' বৌদি চলে গেল।

তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রাজা। না, রমলাদির বাড়ি আজ সে যাচ্ছে না। কিছুতেই না।

খেয়েদেয়ে টানা একটা ঘুম লাগিয়ে রাজা যখন উঠল, শীতের বেলা বেশ হেলে গিয়েছে। নিজের ঘরের জানালা দিয়ে সে দেখল, সূর্যটা পশ্চিমের গাছপালার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। রোদে আর উজ্জ্বলতা নেই। বাসি হলুদের মতো দ্রুত তা মলিন হয়ে যাচ্ছে। আকাশ জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ আকাশ দেখল রাজা, পাখি দেখল, তারপর ডাকল, 'টুনি—'

বাইরে থেকে টুনির গলা ভেসে এল, 'কী বলছ?'

'তোর মাকে বল তো এক কাপ চা করে দিতে পারবে কিনা—'

'মা বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেল আবার?'

'লীলাপিসিদের বাড়ি গেছে।'

দু'খানা বাড়ির পরেই লীলাদের বাড়ি। মাঝে মাঝে সংসারের পাট চুকিয়ে দুপুরবেলা লীলার মা'র সঙ্গে গোলোকধাম খেলতে যায় বৌদি। আজও হয়তো গিয়েছে। এখন ডেকে আনলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে।

বাড়ির চায়ের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রাজা। প্যান্ট জামাটামা পরে ননীর পুল-ওভারটা তার ওপর চড়িয়ে দিল। জিনিসটা রীতিমত দামি এবং গরম। গায়ে দিয়ে বেশ আরামই বোধ করল সে।

দেওয়াল-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে নিজেকে কিছুক্ষণ দেখল রাজা। তারপর ননীর সেই হাপিস-করা জিনিসগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জগদীশের দোকানের দিকে যেতে যেতে অনেকক্ষণ পর জয়ার মুখখানা মনে পড়ে গেল তার।

ফাদার ডোনাল্ডস্ কি জয়ার একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবেন? পারলে ক'দিনের ভেতর? বেশি দেরি হলে মেয়েটা আবার রমলাদির ফাঁদে গিয়ে পড়বে। খুব তাড়াতাড়িই একবার নবীপুর যাওয়া দরকার, আভাসে ইঙ্গিতে জয়াকে সাবধান করে দিয়ে আসতে হবে। রমলাদির নাম অবশ্য করবে না।

হঠাৎ উলটো দিক থেকে আরেকটা ভাবনা রাজাকে চঞ্চল করে তুলল। ফাদার ডোনাল্ডস যদি চাকরি জোগাড় করে দিতে না পারেন? তাহলে যে কী হবে, এই মুহূর্তে রাজা ভেবে উঠতে পারল না।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যে বাজারের কাছাকাছি সে পড়ল রাজা। জগদীশ কালোয়ারের দোকানটা এখানেই।

সামনের দিকে একপাশে উঁচু গদি। আরেক পাশে নানা ধরনের লোহালক্কড়। কড়ি, বরগা, জয়েস্ট, বড় বড় জলের পাইপ, ইত্যাদি। এগুলো প্রকাশ্য—বাইরের ভড়ং। ঘোমটার নিচে খ্যামটার মতো তলায় তলায় আরেকটা ব্যবসা আছে জগদীশের। সেটা চোরাই মালের ব্যবসা। এই শ্যামনগরের আশপাশ থেকে রাজারা যত জিনিস পাচার করে, সব জগদীশের কাছে নিয়ে তোলে। পাচার করা মাল বলে পুরো সুযোগ নিয়ে থাকে জগদীশ; পাঁচ টাকার জিনিস পাঁচ পয়সায় কেনে। সব বুঝেও মুখ বুজে মার খেতে হয় রাজাদের। এই ব্যাপারে কলকাতার সঙ্গে জগদীশের যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া,

লোকের ধারণা পুলিশের সঙ্গেও নাকি তার গোপন গাঁটছড়া বাঁধা। রাজাদের মালগুলো অনেক রাত্তিরে লরিতে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয় সে।

জগদীশ তার গদিতে বসে ছিল। বয়স চল্লিশের মতো। থলথলে চেহারা। তার শরীরে হাড়ের চাইতে মাংস আর চর্বি বেশি। মাথা হুঁকোর খোলের মতো! মুখময় বসন্তের দাগ। গলা টলা বলতে জগদীশের কিছু নেই। মুণ্ডুটা সরাসরি ঘাড়ের ওপর বসানো। মোটা মোটা আঙুলে পাথর-বসানো ছ'সাতটা আংটি। গলায় সোনার হার। তিনটে দাঁতও সোনা-বাঁধানো। জগদীশ মানুষটা বেশ সৌখিন। পরনে তার সবসময় সিল্কের পাঞ্জাবি আর বাহান্ন ইঞ্চি বহরের ফিনফিনে ধুতি।

রাজাকে দেখে জগদীশের চোখ চকচক করতে লাগল। রাজা আসা মানেই বিনা পরিশ্রমে কিছু পয়সা পকেটে ঢুকে যাওয়া। খাড়া হয়ে বসে জগদীশ বলল, 'এস রাজাদা, এস—' তিনপুরুষ বাংলাদেশে থেকে প্রায় বাঙালিই হয়ে গিয়েছে জগদীশ। বাংলা ভাষাটা ভালই বলে।

রাজা লোহালক্কড়ের পাশ দিয়ে জগদীশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

গলা নামিয়ে জগদীশ ফিসফিস করল, 'কী ব্যাপার?'

চোখের একটা ভঙ্গি করে রাজা জানিয়ে দিল, 'মাল আছে।'

জগদীশ খুব ব্যস্তভাবে গদি থেকে নিচে নামল, 'চল—চল, ভেতরে যাই—'

গদির ঠিক পেছনেই ছোট একটা ঘর। রাজাকে নিয়ে সেখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল জগদীশ। একটা চেয়ারে রাজাকে বসিয়ে নিজে মুখোমুখি বসল। বলল, 'দেখি কী জিনিস—'

থলের মুখ উপুড় করে ঢেলে দিল রাজা। ছোট ছোট এবং দামি অনেকগুলো মেশিন পার্টস বেরিয়ে পড়ল।

লুব্ধ সুরে জগদীশ বলল, 'বেড়ে জিনিস বাগিয়েছ তো মাইরি—'

রাজা বলল, 'এবার বেড়ে দাম দিয়ে দাও। কেটে পড়ি—'

'হে—হে—হে—' টেনে টেনে কিছুক্ষণ হাসল জগদীশ, 'তোমাদের আমি ভাল দাম দিই না? বল শালা রাজাদা, বল। বুকে হাত দিয়ে বল।'

নীরস সুরে রাজা বলল, 'দাম কী দিচ্ছ তা আমিও জানি, তুমিও জান। স্রেফ এইটে চোষাচ্ছ—' বলে দু'হাতের বুড়ো আঙুল দেখাল।

'নেমকহারামি করো না মাইরি।' জগদীশ বলতে লাগল, 'আমি যা দিই কোনো শালা তা দেবে না। মা কালীর দিব্যি—' একটু থেমে আবার বলল, 'বুঝতেই তো পারছ, কত জায়গায় টাকা খাওয়াতে হয়। চোরাই মাল বলে কথা। সবাইকে দিয়ে থুয়ে কী এমন লাখ বেলাখ থাকে যে তোমাদের খুশি করে দেব।'

রাজা গজগজ করতে লাগল, 'জান কয়লা করে জিনিস নিয়ে আসছি। তুমি শ্লা ইঁহাকা মাল উঁহা পৌঁছে দিয়ে সব রস চুষে ছিবড়েটুকু মুখের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছ। নেহাত শ্লা তুমি ছাড়া গতি নেই, তাই—' একটু থেমে রাজা আবার বলল, 'অনেক বাত্তাল্লা (বকবকানি) হয়েছে। ভ্যানতাড়া না কষে এবার মালকড়ি দিয়ে দাও। কেটে পড়ি।'

জগদশ কালোয়ার উঠে গিয়ে গদি থেকে টাকা এনে দিল। রাজা গুনে দেখল, পঞ্চাশ টাকা। পকেটে পুরতে পুরতে মনে মনে জগদীশকে একটা অশ্লীল খিস্তি দিল, 'শালা পগেয়া খচ্চর—' ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর আর একটি কথাও না বলে সুট করে রাস্তায় নেমে এল।

রাস্তায় আসতেই সেই মেয়েটা, যার নাম জয়া, যার বড় বড় নিষ্পাপ চোখে শুধু সরলতা, তার কথা আবার মনে পড়ে গেল।

শীতের সন্ধে ঘন হয়ে আসছিল। উত্তুরে বাতাসে এখন হিম জমাট বাঁধছে। সেই বিকেল থেকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। এখন চারদিক ঝাপসা। মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে আলোগুলো হিমে আর অন্ধকারে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছে।

একবার আকাশ দেখল রাজা, একবার কুয়াশা দেখল, একবার রাস্তার আলো দেখল। তারপর মনে মনে স্থির করে ফেলল, এখনই নবীপুরে যাবে। জয়ার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

এই রাস্তাটাই সোজা স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছে। রাজা লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু স্টেশনে গিয়ে নবীপুরের ডাউন ট্রেন ধরা হল না। কেননা রাস্তাটা সোজা বাজারপাড়ার ভেতর দিয়ে 'শোভা কাফে' ছুঁয়ে চলে গিয়েছে।

লোকের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে হাঁটছিল রাজা। উদ্দেশ্য, 'শোভা কাফে'টা এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু পারা গেল না।

'শোভা কাফে'র কাছাকাছি আসতেই তুলসীরা কালকের মতো চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'রাজা—এই রাজা—'

'মেরে রজ্-জা—'

নাঃ, এই রাস্তাটা দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। চিলের চোখ নিয়ে সবসময় তুলসীরা 'শোভা কাফে'তে বসেই আছে। তাদের চোখে ধুলো ছিটনো সহজ নয়।

রাজা বিরক্ত হচ্ছিল। তবু না তাকিয়ে পারল না।

ওরা একসঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ে পায়ে 'শোভা কাফে'র ভেতর চলে এল রাজা।

রতন বলল, 'কি চাঁদ, সারাদিন ছিলে কোথায়?'

রাজা সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'কাজ ছিল।'

'কী কাজ বাওয়া?'

'সে আছে।'

'বলতে বারণ নাকি?'

রাজা উত্তর দিল, 'না।'

তুলসী এই সময় বলে উঠল, 'এমন টেম্পোগাড়ির মতো হনহনিয়ে কোথায় ছুটছিলে?'

রাজা বলল, 'স্টেশনে—'

'কেন?'

'নবীপুর যাব।'

'নবীপুরে কী?'

'কাজ আছে।'

'কাজ আছে, কাজ ছিল, এই বলে চেপে যাও। কাজটা কি মানিক?'

রাজা চকিতে একবার ভেবে নিল। জয়ার কথা বললে ওরা হয়তো অশ্লীল রকমের রসিকতা করবে। কেন জানি কাল থেকে এই নিষ্পাপ সরল মেয়েটাকে সবরকম নোংরামির বাইরে একটা পবিত্র বেদির ওপর বসিয়ে রাখতে ইচ্ছা করছে।

রাজা মিথ্যেই বলল, 'বৌদি তার একটা দরকারে নবীপুরে যেতে বলেছে।'

ওধার থেকে চাপা গলায় গৌর বলল, 'কাল রাত্তিরে তো রেলা মেরে বাড়ি কাটলি। আমাদের সঙ্গে রেল ইয়ার্ডে গেলি না। গেলে—'

'গেলে কী?'

চোখের তারা নাচাতে নাচাতে গৌর বলল, 'একেক জন ফিফটির মতো করে পেয়েছি। গেলে তুইও পেতিস।'

পঞ্চাশ করে যে ভাগে পড়ত রাজা তা জানে। ননীর টাকাটা এখনও তার পকেটে রয়েছে। কিছুটা হতাশা বোধ করল রাজা। কাল রমলাদির কাছে একটা পয়সা তো পায়ই নি, তার ওপর এই পঞ্চাশটা টাকা গচ্চা গেল। অবশ্য মাল বিক্রির কমিশন হিসেবে পাঁচ টাকা দিতে রাজি হয়েছে ননী।

রাজা কিছু বলতে যাচ্ছিল, আচমকা তুলসী চেঁচিয়ে উঠল, 'রাজা—' চোখমুখ দেখে মনে হল, তার কিছু মনে পড়ে গিয়েছে।

'কী বলছিস?' রাজা তুলসীর চোখের দিকে তাকাল।

'তোর রমলাদি না—'

রাজা চমকে উঠল, 'রমলাদি কী?'

'তোর খোঁজে এখানে তিনবার লোক পাঠিয়েছিল।'

বাড়িতে একবার লোক পাঠিয়েছিল রমলাদি। এখানে পাঠিয়েছে তিনবার। বুকের ভেতরটা অসহ্য কাঁপছিল রাজার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'এতক্ষণ বলিস নি যে—'

'খেয়াল ছিল না মাইরি—'

'লোক পাঠিয়েছিল কেন জানিস?'

'না।' তুলসী বলতে লাগল, 'রমলাদির লোক আমাদের বলে গেছে তোর সঙ্গে দেখা হলেই যেন পাঠিয়ে দিই।'

অন্য সবাই সায় দিল।

রাজা কিছু বলল না।

রতন বলল, 'যা বে শ্লা, যা। তোর রমলাদি যখন ডাকিয়েছে টু পাইস পেয়ে যাবি।'

নিঃশব্দে উঠে পড়ল রাজা। এই সন্ধেবেলায় বাজার পাড়াটা বেশ জমজমাট। লোকজনের ভিড়, নিয়ন আলো, মাইকে হিন্দি গান, সব মিলিয়ে চারদিক সরগরম। কিন্তু কিছুই শুনতে, বুঝতে বা দেখতে পাচ্ছিল না রাজা। ভিড়ের ভেতর দিয়ে সে যেন আলগাভাবে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিল। কোন দিকে যাচ্ছিল, জানে না।

চারপাশের জনতা, আলো, হইচই, হল্লা, যেদিকেই তাকানো যাক, সমস্ত কিছুর ওপর একটি মুখই অনড় হয়ে আছে—রমলাদির মুখ।

রমলাদি কি কালকের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে? সেই ঘটনার পর দেড় দিনের মতো কেটে গেল; জানাই উচিত। জানা থাকলে কী মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা করছে মহিলা? পরক্ষণেই আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল। অন্য দিন কলকাতা থেকে ফিরেই রমলাদির বাড়ি চলে যায় রাজা, কাল যায় নি। সেই জন্যেই কি রমলাদি ডেকে পাঠিয়েছে?

হাঁটতে হাঁটতে কখন স্টেশনের কাছে চলে এসেছিল, রাজার খেয়াল নেই। পুব দিক থেকে একটা ট্রেন আসছিল। ঝড়ের মতো আওয়াজে সে চমকে উঠল। সামনের ওভার-ব্রিজটা হঠাৎ তার চোখে পড়ল। ওটা পেরিয়ে খানিকটা গেলেই রমলাদির বাড়ি।

সেই সন্ধেবেলা জয়াদের বাড়ি যাওয়ার জন্য স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়েছিল রাজা। কিন্তু অন্য একটা স্রোত একটানে তাকে ওভার-ব্রিজ পার করিয়ে ওপারে রমলাদির বাড়ি নিয়ে গেল। সামনের বাগান টাগান পেরিয়ে হলুদ রঙের একতলা বাড়িটার বারান্দায় উঠে আচমকা তার খেয়াল হল, আজ এখানে না এলেই পারত। একবার সে ভাবল, ফিরে যায়। ফেরার জন্যে পা-ও বাড়িয়েছিল কিন্তু তার আগেই রমলাদির গলা কানে এল, 'এই রাজা—'

রাজা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, দরজার ফ্রেমে কোমর হেলিয়ে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে রমলাদি। ভুরু দুটো কোঁচকানো, ঠোঁট শক্তবদ্ধ, দাঁতে দাঁত চাপা।

রাজার বুকের ভেতরটা দুলতে লাগল। এই শীতের রাতে যখন এলোপাতাড়ি উত্তুরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, চারদিক যখন কুয়াশায় ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট, সেই সময় গলা শুকিয়ে আসতে লাগল তার। তালু থেকে আলজিভ পর্যন্ত ধারাল বালির মতো খরখরে হয়ে উঠছে।

রমলাদিই প্রথম কথা বলল, 'ব্যাপারটা কী তোর?'

ভয়ে ভয়ে রাজা তাকাল।

রমলাদি আবার বলল, 'বারান্দা পর্যন্ত এসে গোঁত্তা খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলি যে?'

রাজা ভয়ে ভয়ে বলল, 'না—মানে—'

স্থির পলকহীন তাকিয়ে ছিল রমলাদি। চাপা কঠিন গলায় বলল, 'ভেতরে আয়—

ঘরের ভেতর এসে দু'জনে মুখোমুখি বসল। রমলাদি আবার বলল, 'অনাথকে তোদের বাড়ি একবার পাঠিয়েছি। 'শোভা কাফে'তে পাঠিয়েছি তিনবার। এতক্ষণে আমার কাছে আসার সময় হল তোর?'

আবছাভাবে রাজা মিথ্যেই বলল, 'আমি বাড়ি ছিলাম না।'

'আড্ডাখানায় যাস নি?' রমলাদি 'শোভা কাফে'কে আড্ডাখানা বলে।

'গিয়েছিলাম।'

'তোর সাঙ্গোপাঙ্গরা আমার কথা বলে নি?'

'এই খানিকক্ষণ আগে বলেছে। খবরটা পেয়েই চলে এলাম।'

'সেই দুপুর থেকে লোক পাঠাচ্ছি। খানিকক্ষণ আগে বলবে কেন?'

'সারা দিন আমি আজ 'শোভা কাফে'তে আসিনি। আপনাদের বাড়ি আসবার আগে ওখানে গিয়েছিলাম।'

'সমস্ত দিন ছিলি কোথায়?'

'বাড়ির কাজে একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল।'

ঘাড় কাত করে গালে হাত রাখল রমলাদি, 'বাবাঃ, ঘরের কাজে তোর এত মন তা তো জানতাম না। দু'বেলা খাওয়া আর রাত্তিরে শোওয়া ছাড়া বাড়ির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক আছে, এতকাল বলিস নি তো।'

রাজা চুপ।

রমলাদি আবার বলল, 'খুব দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে উঠেছিস, দেখছি।'

এরপর অনেকক্ষণ নীরবতা।

হঠাৎ একসময় রমলাদি আবাব বলে উঠল, 'কাল কলকাতা থেকে ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করিস নি কেন?'

রাজা হকচকিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলল, 'কাল শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। তাই আসিনি।'

'কী হয়েছিল?'

'পেটের যন্ত্রণা।'

রমলাদি হাসল, 'পেটের যন্ত্রণা আর মাথাধরা, এ দুটো জিনিস এমন যে শিবের বাবারও সাধ্যি নেই ধরতে পারে। তা হ্যাঁ রে—'

'কী বলছেন?' রাজা সতর্কভাবে তাকাল।

'আজ কেমন আছিস?'

এখন পর্যন্ত রমলাদি যেভাবে কথা বলছে তাতে মনে হয় না কালকের ব্যাপারটা জানে। অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে রাজা বলল, 'ভাল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমলাদি হঠাৎ বলে উঠল, 'আজ দুপুরবেলা আগরওলা লোক পাঠিয়েছিল।'

রাজা ভীষণ চমকে উঠল। রমলাদি তাকে লক্ষ করেছিল। চোখ কুঁচকে বলল, 'কি রে, অমন করে উঠলি?'

রাজা প্রাণপণে হাসতে চেষ্টা করল, 'কোথায়?'

'আগরওলা কী খবর পাঠিয়েছে জানিস?'

'কী?'

'তুই কাল জয়াকে নিয়ে তার ওখানে যাস নি।'

তক্ষুনি কিছু বলতে পারল না রাজা। আগরওলার নামটা রমলাদির মুখে শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে রাজার বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে এল। মনে মনে সে ভেবে নিল, ধরা যখন পড়েই গিয়েছে তখন আর লুকোচুরি করে লাভ নেই। মুখ নামিয়ে আস্তে করে বলল, 'না।'

পলকে সমস্ত চেহারাটাই বদলে গেল রমলাদির। ভেতরে যা-ই থাক, তার বাইরের দিকটা মোটামুটি কৌতুকময়। স্বভাবে রমলাদি রঙ্গিণী। কিন্তু এই মুহূর্তে তার চোখ দপ দপ করছে। অনুদ্ধত ভরাট বুক উত্তেজনায় খুব দ্রুত উঠছে, নামছে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক, তার ভেতর দিয়ে ক'টি ঝকমকে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তীক্ষ্ণ, কর্কশ গলায় রমলাদি বলল, 'জয়াকে নিয়ে যাসনি কেন?'

রমলাদির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাজার মনে হল, একটা বাঘিনী। কাঁপা, শিথিল গলায় সে বলল, 'কলকাতায় গিয়ে দেখি শিয়ালদার কাছে একটা মিছিল বেরিয়েছে। ট্রাম-বাস বন্ধ। অনেক ঘুরেটুরে যখন ধর্মতলায় এলাম, সন্ধে হয়ে গেছে। আমার শরীরটাও খুব খারাপ লাগছিল। তা ছাড়া—' কাল রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে ভেবে রেখেছিল, রমলাদির সঙ্গে দেখা হলে এই কথাগুলো বলবে।

রমলাদি আগের সুরেই শুধলো, 'তা ছাড়া কী?'

'ওই মেয়েটা, মানে জয়া, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিল। বাড়ি ফেরার জন্যে খুব তাড়া লাগাচ্ছিল।'

রমলাদির চোখমুখ দেখে মনে হল, রাজার কথাগুলো তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। খানিক নরম গলায় সে বলল, 'এটা ব্যবসা, বুঝলি?'

রাজা চুপ।

রমলাদি আবার বলল, 'জিনিসটা ইয়ার্কি না। কালই ফিরে এসে আমাকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল। অন্তত আজ সকালেও একবার আসতে পারতিস। তা নয়, বাবুকে বার বার লোক পাঠিয়েও ধরা যায় না।' রমলাদি গজ গজ করতে লাগল সমানে।

রাজা এবারও কিছু বলল না।

একটু ভেবে রমলাদি আবার বলল, 'তোর টাকাটা রেখে দিয়েছি। নিয়ে যা—'

'কিসের টাকা?'

'কাল ওই যে জয়াকে নিয়ে গেলি।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'কাজ তো হয় নি।'

'ও বাবা—' চোখ গোল করে রমলাদি বলতে লাগল, 'কাজ হয় নি বলে টাকা নিবি না!'

রাজা থতিয়ে থতিয়ে বলল, 'না, মানে—'

'এক কাজ কর রাজা, এখানে না থেকে যাত্রার দলে বিবেক সাজ গে যা।'

আসলে জয়ার ব্যাপারে হাত পেতে রমলাদির কাছ থেকে টাকা নিতে ইচ্ছা করছিল না রাজার। ওই টাকার সঙ্গে এমন পাপ এবং গ্লানি মেশানো আছে যাতে হাত-পা কুঁকড়ে আসে।

রমলাদি কিন্তু কোনো কথা শুনল না। পাশের ঘর থেকে তিরিশটা টাকা এনে রাজার পকেটে গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'বেশি ওস্তাদি না করে রেখে দে। দরকারে লেগে যাবে।'

দরকারে যে লাগবে, রাজার চাইতে কে আর ভাল জানে। আজ সকালেই ক'টা টাকা ধার করেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার চারদিকে শুধু একটি মাত্র শব্দ—টাকা, টাকা আর টাকা। জল-স্থল-আকাশ-বাতাস জুড়ে ওই শব্দটা ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। রমলাদি যে টাকাগুলো দিল তা নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে কিনা সন্দেহ। তার আগেই হয়তো হাওয়া হয়ে যাবে।

অথচ বুকের কাছে নোটগুলো কাঁটার মতো বিঁধছে। রাজা অনুভব করতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে কেউ যেন সমানে তাকে ধিক্কার দিয়ে যাচ্ছে। তবু পকেট থেকে বার করে টাকাগুলো সে ফেরত দিতে পারল না।

রমলাদি আবার বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন বাড়ি যা।'

রাজা যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

রমলাদি বলল, 'দু'চার দিনের ভেতর আবার কলকাতায় যেতে হবে।'

অপরিষ্কার গলায় রাজা বলল, 'আচ্ছা।'

'খবর পাঠালেই চলে আসবি।'

রাজা মাথা কাত করল। অর্থাৎ আসবে।

রমলাদি বলল, 'বার বার যেন লোক পাঠাতে না হয়।'

'আচ্ছা—' রাজা বাগানে নেমে গেল।

আবার রাস্তা। কনকনে হিম-বাতাস ঠেলে সামনের দিকে যেতে যেতে কিছুই পরিষ্কার করে ভাবতে পারছিল না রাজা। বার বার মনটা এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

একসময়ে স্টেশন এসে গেল। হঠাৎ রাজার মনে পড়ল, নবীপুরে জয়াদের বাড়ি যাওয়ার জন্যেই সে এদিকে এসেছিল। কোথায় যাবে বলে বেরিয়েছিল আর কোথায় ঘণ্টা দুই কাটিয়ে এল!

ন'টা সাড়ে ন'টার বেশি দেরি হবে না। কিন্তু শীতের রাত বলে এর ভেতরেই চারদিক নিঝুম হয়ে গিয়েছে। রাস্তা-টাস্তা, এমন কি রেলস্টেশনেও তেমন লোকজন নেই। সন্ধের কিছুক্ষণ পরেই আজকাল চারদিক ফাঁকা হয়ে যায়।

পরের স্টেশনই নবীপুর। এখান থেকে ডাউন ট্রেনে বড় জোর মিনিট দশেকের রাস্তা। স্টেশনে নেমে জয়াদের বাড়িটা খুঁজে বার করতে খুব একটা কষ্ট হবে না। মুখে মুখে জয়া তাদের বাড়িতে যাওয়ার পরিষ্কার একটা ছক এঁকে দিয়েছিল কাল।

কিন্তু শীতের রাতে সব যখন নিস্তব্ধ তখন নবীপুরে যাওয়া কি ঠিক হবে? গিয়ে হয়তো দেখবে জয়ারা ঘুমিয় পড়েছে। এত রাতে ডেকে তুললে বাড়ির লোকেরা ভাববেই বা কী? তা ছাড়া—

তাছাড়া বুক পকেটে সেই টাকাগুলোর অস্তিত্ব যেন আবার নতুন করে টের পাওয়া গেল। হঠাৎ রাজার রক্তের ভেতর সির সির করে কী খেলতে লাগল। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, এই টাকা নিয়ে যে জয়াদের বাড়ি যেতে পারবে না।

আজ আর না, কাল সকালেই নবীপুর যাবে রাজা।

দশ

পরদিন কিন্তু নবীপুর যাওয়া হল না। পরদিন কেন, পর পর চারদিনই সে বাড়ি থেকে বেরুতে পারল না। টুনিটা হঠাৎ ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়ে বসল। ধুম জ্বর। জ্বর হলেই দারুণ ছটফট করতে থাকে মেয়েটা, আর ভুল বকে। তখন রাজা কাছে না থাকলেই নয়।

চারদিন পর টুনির জ্বর একটু কমলে 'শোভা কাফে'তে এল রাজা। গৌর রতন তুলসী, কেউ নেই। গণেশের কাছে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, এ বেলা ওরা আসবে না।

তুলসীরা নেই। আড্ডাটা এখন আর জমছে না। চুপচাপ বসে এক কাপ চা খেল রাজা। তারপর হঠাৎ জয়ার কথা মনে পড়ে গেল তার।

টুনির মাথার কাছে বসে থাকতে থাকতে এ ক'দিন জয়ার কথা ভাল করে ভাবতে পারছিল না রাজা। এই দুপুরবেলায় ফাঁকা রেস্টুরেন্টে বসে থাকতে থাকতে ঠিক করে ফেলল, জয়াদের বাড়ি যাবে।

রাজা উঠে পড়ল। কাউন্টারে এসে গণেশকে চায়ের দাম দিয়ে বেরুতে যাবে, সেই সময় অনাথ এসে রেস্টুরেন্টের দরজায় দাঁড়াল। এই লোকটাকে পাঠিয়ে রমলাদি তাকে ডেকে নিয়ে যায়।

এই মুহূর্তে রাজার ভাবনার হাজার মাইলের মধ্যে কোথাও অনাথ ছিল না। তাকে আশাও করেনি রাজা।

অনাথকে দেখে চোখ দুটো আপনা থেকেই কুঁচকে গেল। চাপা বিরক্ত গলায় রাজা বলল, 'কী খবর অনাথদা—'

লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পাটের ফেঁসোর মতো রুক্ষ, জটপাকানো চুল। গায়ে ডুমো ডুমো মাংস। কপালে তিনটে জড়ুল। গলার কাছে, পায়ের পেছন দিকের ডিমে মোটা মোটা শিরাগুলো কেঁচোর মতো ডেলা পাকিয়ে আছে। চোখদুটো বড় বড় এবং ঘোলাটে। কালচে দাঁতগুলো বাঁকাচোরা, অসমান।

অনাথ হাসল। হাসলে তাকে বীভৎস দেখায়। বলল, 'তোমায় যেতে বলেছে।'

'কবে?'

'আজই।'

একটু ভেবে রাজা বলল, 'বিকেলবেলা যাবখ'ন।'

'উঁহু—' রাক্ষসের মতো প্রকাণ্ড মাথাটা জোরে ঝাঁকাল অনাথ।

দেখা যাচ্ছে, জয়াদের বাড়ি যাওয়ার সময় একটা না একটা বাধা পড়বেই। বিরক্ত রাজা কর্কশ গলায় বলল, 'তবে কখন?'

'এক্ষুনি, আমার সঙ্গে।'

রাজা চুপ করে থাকল।

অনাথ আবার হাসল, 'জোর তলব, বুঝলে কিনা—'

ভ্যাংচানোর মতো মুখ করে বলল, 'বুঝেছি।'

'তোমায় একেবারে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অনাথের ইচ্ছাতেই নিজেকে ছুঁড়ে দিল রাজা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'চল।'

রমলাদির বাড়ি আসতেই সে বলল, 'আজ দেখছি একেবারে গুড বয়।'

রাজা এক পলক তাকাল শুধু। কিছু বলল না।

রমলাদি বলল, 'লোক পাঠানো মাত্র হাজির হয়ে গেছিস। আমার কি ভাগ্যি রে—' বলে হাসল।

রাজা নীরস গলায় বলল, 'ডেকেছেন কেন?'

উত্তর না দিয়ে রমলাদি বলল, 'তোর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে?'

'না।'

'টাকা দিয়ে দেব, হোটেলে খেয়ে নিবি। তোকে এক্ষুনি কলকাতায় যেতে হবে।'

'কলকাতায়!'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ—' রমলাদি হালকা গলায় বলতে লাগল, 'যেমন করে তাকিয়ে আছিস, মনে হচ্ছে কলকাতার নাম কোনোদিন শুনিস নি।'

রাজা বলল, 'ওবেলা গেলে চলবে না?'

'অসম্ভব—' চাপা গলায় রমলাদি বলতে লাগল, 'সেই মেয়েটা এসে কখন থেকে বসে আছে। এক্ষুনি তাকে না নিয়ে গেলেই নয়।'

রাজা চমকে উঠল, 'কোন মেয়েটা?'

তার চমকানি লক্ষ করেনি রমলাদি। আস্তে করে বলল, 'জয়া রে জয়া। সেই যে তোর সঙ্গে সেদিন গিয়েছিল। আয়, ভেতরে আয়—'

রাজা আর আপত্তি করল না। রমলাদির সঙ্গে বাইরের ঘরে ঢুকল।

আজ এ ঘরেই বসে ছিল জয়া। জয়ার ঠাণ্ডা মুখ, বড় বড় করুণ চোখ, সব যেন বড় মায়ায় জড়ানো। তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা তিরতির করে কাঁপতে লাগল রাজার।

রাজাকে দেখে জয়া মুখ তুলেছিল। তার চোখে ছায়ার মতো কিছু একটা খেলে গেল। তারপরেই মুখ নামিয়ে ফেলল সে।

রমলাদি বলল, 'এখন আর বসে দরকার নেই রাজা। তোরা চলে যা।' জয়ার দিকে ফিরে বলল, 'ওর সঙ্গে যাও—'

আজ আর আপত্তি করল না জয়া। নিঃশব্দে উঠে রাজার সঙ্গে বাইরে চলে গেল। রমলাদিও তাদের পিছু পিছু বাইরে এল। রাজাকে বলল, 'যেমন করে পারিস সাড়ে তিনটের ভিতর ওইখানে জয়াকে পৌঁছে দিবি, বুঝলি?'

রমলাদি যে আগরওলার কাছে যাওয়ার কথা বলছে, রাজা বুঝতে পারল। অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ল সে।

রমলাদি আবার বলল, 'সেদিনকার মতো আবার ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসো না।'

রাজা উত্তর দিল না।

একটু পরে দু'জনে সামনের ঝুপসি বাগান ঠেলে রাস্তায় এসে পড়ল। স্টেশনের দিকে যেতে যেতে সেদিনকার মতোই আড়ে আড়ে জয়ার দিকে তাকাতে লাগল রাজা। হঠাৎ বলল, 'আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ।' অল্প হাসল জয়া, একটু থেমে বলল, 'আপনার সঙ্গে আজও কলকাতা যাব, ভাবতেই পারি নি।'

'আজ আর ভয় নেই তো?'

'না।' জয়ার গলা অস্ফুট, আবছা।

'সেদিন রাত্রিবেলা ঠিকমতো বাড়ি যেতে পেরেছিলেন?'

'বা রে, পারব না কেন?'

'না, মানে আপনার তো আবার একা একা চলাফেরার অভ্যেস নেই।'

'তাই বলে স্টেশনে নেমে বাড়ি যেতে পারব না? স্টেশনের গায়েই আমাদের বাড়ি। দু' মিনিটেরও পথ না।'

কিছুক্ষণ চুপ।

একটা কথা জানাবার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল রাজা। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আচ্ছা—'

জয়া ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

রাজা আরো একটু এগিয়ে এসে বলল, 'সেদিন তো আমরা কলকাতা থেকে ফিরে এলাম। তারপর কবে রমলাদির সঙ্গে দেখা হল?'

'পরশু—'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি।'

'রমলাদি গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

রাজার গলার কাছে কাঁটার মতো কিছু একটা বিঁধল। আগেই যদি সে জয়াদের বাড়ি যেত। যাবে কি, নানা ঝুট ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছিল। যাই হোক, চাপা কৌতূহলে তার চোখ চকচক করতে লাগল, 'আপনাদের বাড়ি গিয়ে রমলাদি কী বললে?'

জয়া বলল, 'কেন সেদিন আমরা অফিসে যেতে পারিনি, রাস্তায় কী হয়েছিল, এই সব জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। রমলাদি বললেন, আরেক দিন ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি যখন আছেন, ভয়ের কিছু নেই। চাকরি হবেই।'

'তাই বুঝি আজ আসতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কখন এসেছেন?'

'খেয়ে দেয়ে ঠিক দশটার সময়।'

রেল স্টেশনের ওভার-ব্রিজটার কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দুম করে রাজা বলে বসল, 'এই চাকরিটা না নিলেই কি আপনার চলে না?'

জয়া অবাক, 'এ কথা বলছেন কেন?'

'না, এমনি—'

একটু চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'চাকরি একটা না হলেই নয়। সেদিনই তো আপনাকে বলেছি, আমাদের সংসার একেবারে অচল।'

'তা বলেছেন।' রাজা মাথা নাড়ল।

কিছুক্ষণ পর রাজা আবার বলল, 'আচ্ছা—'

'বলুন—'

'মাসে আপনাদের কত টাকা দরকার?'

'কম করে আড়াই শ—'

'আড়াই শ!' রাজার চোখমুখ নিভে এল যেন, গলার স্বর পাতালে ডুবতে লাগল।

'হ্যাঁ—' জয়ার চোখে বিষাদ ঘন হতে লাগল।

রাজা এবার আর কিছু বলল না। ঘাড় নিচু করে অন্যমনস্কের মতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

জয়া একপলক রাজাকে দেখল, কী ভাবল। তারপর দ্বিধার গলায় বলল, 'হঠাৎ আমাদের সংসার খরচের কথা জানতে চাইলেন?'

অপরিষ্কার গলায় রাজা বলল, 'এমনি—'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওভার-ব্রিজ পেরিয়ে দু'জনে প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ল। জয়াকে সিমেন্টের বেঞ্চে বসিয়ে টিকিট কিনে আনল রাজা। আর তখনই হুড়মুড় করে কলকাতার ট্রেন এসে পড়ল। ছোটাছুটি করে জয়াকে নিয়ে একটা কামরায় উঠল রাজা। তারপর ডিসট্যান্ট সিগনাল মাথা নোয়াল, গার্ডের বাঁশি বাজল, ফ্ল্যাগ নড়ল, ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠে গাড়ি চলতে শুরু করল।

জানালার বাইরে সেদিনের সেই সব চেনা ছবি—শীতের রুক্ষ মাঠ, মজা খাল, বাঁশের সাঁকো, খাড়া খাড়া তাল গাছ, রোগা চেহারার বাবলা, মাছরাঙা, ধূসর আকাশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুক্ষণ এইসব দৃশ্য দেখল রাজা। তারপর সট করে মুখটা বাঁ দিকে ফিরিয়ে জয়ার দিকে তাকাল। জয়া চুপচাপ বসেছিল। কিছু ভাবছিল হয়তো; তার আঙুলগুলো আলতোভাবে শাড়ির আঁচল নিয়ে খেলা করছিল।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল রাজা। তারপর বলল, 'শুনছেন—'

জয়া তাকাল।

রাজা বলল, 'আপনি এর আগে কবে যেন আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন?'

একটু ভেবে নিয়ে জয়া বলল, 'বুধবার।'

'আজ সোমবার। তার মানে চারদিন পর আপনার সঙ্গে ফের দেখা হল।'

'হ্যাঁ।'

'এ ক'দিন কী করলেন?'

'কী আর করব।'

'বাড়িতেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

ডান হাত তুলে আঙুল দিয়ে একবার গালটা ঘষে নিল রাজা। দু'তিন দিন কামানো হয়নি। মুখময় দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে। চোদ্দ পনের বছর বয়স থেকে গালে ব্লেড চালাচ্ছে রাজা। ফলে তার দাড়ি বেশ ঘন আর কড়া।

গাল ঘষতে ঘষতেই রাজা বলল, 'জানেন, এই চারদিন রোজই আমার মাথায় একটা পোকা নড়েছে। আরেকটু হলে একটা ফ্যাকড়া বাধিয়ে ফেলতাম।'

সে কী বলতে চায় জয়া বুঝতে পারল না। তার দুই ভুরুর মাঝখানটায় অল্প ভাঁজ পড়ল।

'ব্যাপারটা কী জানেন—' এই পর্যন্ত বলে রাজা থামল।

'কী?'

'এই চার দিন ভেবেছি, নবীপুরে আপনাদের বাড়ি যাব।'

জয়ার চোখে মৃদু আভার মতো আগ্রহ ফুটে উঠল, 'গেলেন না কেন?'

রাজা বলল, 'আপনার সঙ্গে মোটে একদিনের আলাপ, গেলে আবার কী ভাবতেন—'

'কিছু ভাবতাম না। খুব খুশি হতাম—' জয়া এমনভাবে মাথাটাথা নাড়ল যে তাকে সরলা কিশোরী বলে মনে হল।

'সত্যি কি খুশি হতেন?'

'তবে কি মিথ্যে?'

'যা শ্লা, তবে তো চলে গেলেই হত। শুধু শুধু ভাবলাম, আপনাদের বাড়ি গেলে রগড়ান খেয়ে ফিরে আসতে হবে।' বলেই জিভের ডগায় যেন কামড় খেল রাজা। জয়ার সামনে নোংরা কথাটথা সে পারতপক্ষে মুখে আনে না। এ জন্য খুব সাবধানে থাকে। কিন্তু আনন্দ আর বিস্ময়ের তোড়ে ঝট করে দু'টো খারাপ শব্দ নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এসেছে। জয়ার দিকে তাকিয়ে রাজা করুণভাবে একটু হাসল। অর্থাৎ নিজগুণে যেন জয়া খারাপ কথা দু'টো ক্ষমা করে দেয়।

রাজার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিল জয়া। সে-ও হাসল।

একটু পর রাজা বলল, 'আপনি তো যাবার কথা বললেন, কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি ছাড়া আপনাদের বাড়িতে আর কেউ তো আমাকে চেনে না।'

'তাতে কী?'

একটা অশ্লীল শব্দ সট করে আবার বেরিয়ে আসছিল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে রাজা বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই বললে হয়তো ঘাড়ে র‍্যাঁদা ঘষে তাড়িয়ে দিত।'

জয়া হেসে ফেলল, 'কী যে বলেন!'

রাজা কিছু না বলে হাসতে লাগল।

জয়া আবার বলল, 'আপনার কথা বাড়িতে বলেছি। না দেখলেও সবাই আপনাকে চেনে—'

রাজার চোখ এবং কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, 'কী—কী বলেছেন আমার সম্বন্ধে?'

'আপনার সঙ্গে রমলাদি আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, আপনি আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেছেন, আমার জন্যে আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। এই সব আর কি—'

'কী আর কষ্ট করেছি!'

'বা রে, কষ্ট না! সারাটা দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে-ট্রামে-বাসে অত ঘোরাঘুরি করলেন। তাতে কম ধকল গেছে!'

রাজা চুপ।

জয়া আবার বলল, 'যাবেন একদিন আমাদের বাড়ি। নিশ্চয়ই যাবেন।'

খুব আস্তে রাজা বলল, 'যাব।'

আবার কিছুক্ষণ ওরা জানালার বাইরের আকাশ দেখল, পাখি দেখল, মাঠ দেখল, শীতের অনুজ্জ্বল মলিন আলো দেখল।

তারপর হঠাৎ জয়া ডাকল, 'শুনছেন—'

রাজা মুখ ফেরাল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ—' জয়া মাথাটা ডান দিকে ঈষৎ হেলিয়ে দিল। লাজুক সুরে বলল, 'আপনার সঙ্গে দু'দিন কলকাতায় যাচ্ছি। অথচ—'

'অথচ কী?'

'আপনার নামটাই কিন্তু জানি না।'

রাজা লক্ষ করল, জয়ার মধ্যে সেদিনকার মতো ভয় বা অবিশ্বাসের ভাব আর নেই। আজ সে বেশ সহজ, অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে। রাজা বলল, 'রমলাদি আপনাকে আমার নাম বলে নি?'

জয়া বলল, 'না।'

'আমার নাম রাজা। রাজকুমার সান্যাল।'

'আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন—'

'তা শুনেছি।'

জয়া একটু ভেবে বলল, 'সেদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কথা অনেক শুনেছেন। আজ আপনার কথা।'

রাজা বলল, 'আমার আবার কী কথা?'

'বা রে, আপনি কী করেন, কোথায় থাকেন, এসব বুঝি জানতে ইচ্ছে করে না?'

রাজা অস্বস্তি বোধ করল। নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু লুকিয়ে ভাসা ভাসা-ভাবে উত্তর দেয় সে। রেল-ইয়ার্ডের মাল-পাচার, ছেনতাই, ট্রেনের তার কাটা, এসব কি আর কারোকে বলা যায়!

জয়া আবার কী বলতে যাচ্ছিল, একটা স্টেশন এসে গেল। তারপরেই দরজা ঠেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের একটা কনস্টেবল এই কম্পার্টমেন্টে উঠে এল। লোকটা হিন্দুস্থানী, বয়েস বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশের মতো। সরু, বেঢপ বুকের তলা থেকে পেতলের কলসীর মতো বিরাট পেট। তারপর খাকি হাফ প্যান্টের তলা দিয়ে বুট পট্টি লাগানো সরু সরু দু'খানা পা নেমে গিয়েছে। ওই রকম দুর্বল নড়বড়ে পায়ের ওপর কেমন করে যে অত বড় পেটওলা বিরাট দেহ সে খাড়া রাখতে পেরেছে সেটাই বিস্ময়। সেপাইটার গোল মুখে দেখবার মতো একটাই জিনিস। সেটা তার গোঁফ। এমন মুখজোড়া জমকালো গোঁফ কদাচিৎ দেখা যায়। গোঁফের ওপর ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ দুই চোখ। বগলে বেতের ডাণ্ডা।

কনস্টেবলটাকে রাজা চেনে। তাদের শ্যামনগর থানায় সাত আট বছর দেখে আসছে! তাকে দেখে জামার ভেতর অদৃশ্য পোকা হাঁটার মতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রাজা। কিছুটা ভয় ভয়ও।

এই দুপুরবেলায় গাড়িতে ভিড়টিড় নেই। দশ-বারটা লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে কোনো বেঞ্চে টান টান শুয়ে এখন কলকাতা পর্যন্ত যাওয়া যায়। তব চোখে চরকি ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল কনস্টেবলটা। দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি রাজার ওপর এসে স্থির হল। কনস্টেবলটা রাজাকে চেনে। কয়েক পলক রাজার দিকে তাকিয়ে রইল সে! তারপর গলার ভেতর থেকে চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'রাজোয়া না রে?' বলেই সরু সরু, ঢ্যাঙা পা ফেলে ফেলে একেবারে মুখোমুখি অন্য একটা বেঞ্চে এসে বসে পড়ল।

থানা-টানা কিংবা পুলিশ সম্বন্ধে রাজার বিশেষ ভয় নেই। তার কেমন যেন ধারণা হয়ে গিয়েছে, যদি কখনো ধরা পড়ে, মাঝরাতে অলৌকিক পরী নামার মতো রমলাদি এসে তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। (অনেকদিন আগে একবার ছাড়িয়ে নিয়েও গিয়েছিল।) তবু পুলিশ বলে কথা। কখন কিভাবে ফাঁসিয়ে দেবে, তার কি ঠিক আছে! রাস্তায় টাস্তায় দেখা হলে বেশ খাতির করে কথা বলে রাজা। চা খাওয়ায়, সিগারেট খাওয়ায়।

কিন্তু এখন কিছু বলল না রাজা। অত্যন্ত সতর্ক চোখে কনস্টেবলটাকে লক্ষ করতে লাগল। জয়া সঙ্গে রয়েছে। তার শুধু ভয়, মেয়েটার কাছে নিজের সম্বন্ধে যা সে গোপন করে রেখেছে, কথায় কথায় তা আবার না ফাঁস করে ফেলে কনস্টেবলটা।

পায়ের ওপর পা তুলে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে পুলিশটা। বগল থেকে ডাণ্ডা আর মাথা থেকে টুপি নামিয়ে পাশে রাখল সে। তারপর চৌগাঁফা আদর করতে করতে বলল, 'বহুত বোজ বাদ তোকে দেখলাম। অ্যাদ্দিন কুথায় ছিলি রাজোয়া—' রাজাকে সে রাজোয়া বলে।

সুরহীন মোটা গলায় রাজা বলল, 'কোথায় আর থাকব, শ্যামনগরেই ছিলাম।'

'শ্যামনগরে ছিলি? তবে দেখিনি কেন?'

মনে মনে একটা অশ্লীল খিস্তি আওড়াল রাজা। মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

কনস্টেলটা এবার অন্য কথায় চলে গেল, 'তারপর দুফ্‌ফার বেলায় চললি কুথায়?'

রাজা বলল, 'কাছেই।'

'কাছে হলেও তো জায়গাটার নাম আছে।'

'তিন চারটে স্টেশন পরে যাব।'

'আ বে—' কনস্টেবলটা একটু ঝুঁকল, 'তিন চার টিশন পরের জায়গাটার নাম মুখে আনতে পারছিস না? জায়গাটা তোর ভাসুরা নাকি?' বলে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল। যেন খুব উঁচু ধরনের একটা রসিকতা করেছে, ভাবখানা এইরকম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজাকে বলতে হল, 'কলকাতা যাচ্ছি।'

'কলকাত্তা তো এখান থেকে তের টিশন পর। তুই বলছিস তিন চার টিশন বাদ যাবি!'

'ওই হল।'

'তিন চার আর তের কি এক? মতলব কি রে তোর?'

রাজা উত্তর দিল না।

কনস্টেবলটা সমানে বকে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার চোখদু'টো ঘুরে ঘুরে জয়ার ওপর গিয়ে পড়ছে। আড়ে আড়ে জয়াকে দেখতে দেখতে কনস্টেবলটা রাজাকে ডাকল, 'আ বে রাজোয়া—'

'বলুন সিপাইজি—'

'তুই শালে বড়া হারামি হয়ে উঠেছিস।'

ভয়ে ভয়ে রাজা বলল, 'আপনি কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।' বলেই ঘাড় ফিরিয়ে একবার জয়াকে দেখে নিল। জয়া জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখা গেল না।

কনস্টেবলটা এবার বলল, 'মাক্ষীচুষ, এতক্ষণ বাকোয়াস করলাম, এখনো পাকিট থেকে একটা সিগারেট বার করলি না?'

এর জন্যে এত! শালা বদমাশ যেভাবে আরম্ভ করেছিল তাতে হাড় চমকে গিয়েছে। নিঃশব্দে পকেট থেকে চারমিনারের একটা প্যাকেট আর দেশলাই বার করে কনস্টেবলটাকে দিল রাজা।

দু'টো সিগারেট বার করে একটা রাজাকে দিল কনস্টেবলটা, একটা নিজে ধরাল। তারপর বাকি প্যাকেটটা আর দেশলাই পকেটে পুরে ফেলল।

লম্বা টান দিয়ে মুখ থেকে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কনস্টেবলটা বলল, 'শালে চারমিনার ছাড়া আর সিগারেট চোখে পড়ে না? এবার থেকে পকেটে ক্যাপস্টান রাখবি।'

রাজা মনে মনে বলল, 'তোমার বাবার মাথা রাখব।' সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিল, ওই দিয়েই সারাটা দিন চালিয়ে দেবে। তা না, আবার কতগুলো পয়সা গচ্চা যাবে।

কনস্টেবলটা কি ভেবে আবার বলল, 'কলকাতায় যাবি তো বললি—'

'হ্যাঁ—'

'কী ব্যাপার?'

'এই একটু কাজ আছে।'

'কাজটাজ সবই তো তোর রাত্তিরে—' পুলিশটা চোখ টিপে হাসল।

খচ্চরটা জান কয়লা করে ছাড়বে দেখছি, রাজা ভাবল। যেখানে সাপের গর্ত সেখানেই শালা কাঠি ঢুকিয়েছে। রাজার বুকের ভেতরটা কিছুক্ষণের জন্যে জমে গেল যেন। তারপরেই ঘাড়ের পাশ দিয়ে জয়াকে একবার দেখে নিল সে। জয়ার মুখ যথারীতি জানালার বাইরে। খুব নিচু গলায় রাজা বলল, 'কী যে বলেন সিপাইজি, যত বাজে কথা। তারপর বলুন আপনার তবিয়ত কেমন আছে?'

শেষ কথাগুলো শুনতেই পেল না কনস্টেবলটা। গোঁফ ফুলিয়ে গর্জনের মতো করে বলল, 'শালে বাজে কথা! শ্যামনগরের কে না জানে রাত্তিরে তোর যত কাজ। উতার (নাম), উতার। আভি তোকে আমি শ্যামনগর নিয়ে যাব। সবাইকে পুছব, তারা জানে কিনা—' ভাবগতিক দেখে মনে হল, চেন টেনে চলন্ত ট্রেন থামিয়ে এখুনি রাজাকে টানতে টানতে সে শ্যামনগর নিয়ে যাবে।

এই শীতের দিনেও রাজা ঘামতে শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল, জামা-টামা ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে। প্রায় হাত জোড় করল সে। তারপর গলা একেবারে পাতালে নামিয়ে ফিস ফিস করতে লাগল, 'ওসব কথা থাক সিপাইজি—' বলে চোখের ইশারায় জয়াকে দেখিয়ে দিল।

ইঙ্গিতটা মোটামুটি বুঝল কনস্টেবলটা। ঘাড় পেছন দিকে হেলিয়ে ঠোঁট টিপে চোখ কুঁচকে মাথা নেড়ে নেড়ে মিটিমিটি রহস্যময় হাসতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, 'সমঝা, সমঝা—'

একটু চুপ।

তারপর রাজা বলল, 'আপনার তবিয়ত কেমন আছে সিপাইজি?'

তার ইচ্ছা, কনস্টেবলটাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে দেবে না। এলোমেলো নানারকম কথা বলে বলে তাকে অন্যমনস্ক করে রাখবে।

কনস্টেবলটা বলল, 'রামজির কিরপায় ভালই আছি।'

'মুলুকের খবর কী?'

'ভালই।'

'শুনেছিলাম আপনার বড় লেড়কির শাদি হবে।'

'হাঁ, হয়ে গেছে।'

'কোথায় শাদি হল?'

'দানাপুর, বিহার।'

'জামাই কী করে?'

'জামাইও পুলিশ—বিহার আরমড (আর্মড্) ফোর্সে আছে।'

'বাঃ বাঃ—'

চোখ কুঁচকে কনস্টেবলটা তাকাল। বলল, 'বাঃ বাঃ মতলব?'

রাজা বলল, 'আপনারা তিন ভাই পুলিশ, আপনার বাবাও পুলিশ ছিল, আপনার জামাইও পুলিশ। আপনাদের দেখছি পুলিশের ঘরানা।'

'যা বলেছিস!' হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল কনস্টেবলটা।

দম নিয়ে রাজা বলল, 'আপনার তো তিন লেড়কা, দুই লড়কী—'

'নহী।'

'তবে?'

'লড়কী এক—'

'তা হলে তো সিপাইজি বেশ সুখী লোক—'

'কিরকম?'

'এক লড়কী। তারও শাদি হয়ে গেছে। আর কোন চিন্তা ফিন্তা নেই।'

কিছুটা হতাশ সুরে কনস্টেবলটা বলল, 'লড়কী তো লছমী রে। আরো যদি দু-চারটে থাকত।'

রাজা অবাক তাকিয়ে রইল।

রাজার মনোভাব আন্দাজ করে কনস্টেবলটা বলে উঠল, 'আ রে বুদ্ধু, লড়কীর শাদির সময় আমরা অনেক পণ পাই। সেই পণের রুপেয়ায় দু'টো ঘর তুলেছি এবার। আরো দু'একটা লড়কি থাকলে আরো পণ পেতাম।'

'তবে তো বড় 'লস' হয়ে গেছে।' চোখ টিপে রাজা জিভের ডগায় চুক চুক করে আক্ষেপসূচক শব্দ করল, 'এক ডজন মেয়ে থাকলে তো আপনি বিহারের 'কিং' বনে যেতে পারতেন—'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ রাজার দিকে তাকিয়ে রইল কনস্টেবলটা। ছোকরা তাকে ঠাট্টা-টাট্টা করছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝবার আগেই রাজা চট করে বলে উঠল, 'আপনার ছেলেরা পড়াশোনা করছে নিশ্চয়ই।'

'হাঁ।'

'কী পড়ছে?'

'বড় লেড়কা টেন কিলাসে পড়ে।'

'মেজো?'

'এইট কিলাসে—'

'ছোট?'

'টু কিলাসে—'

একটু ভেবে রাজা বলল, 'মেয়ের শাদি হয়ে গেল। ভাবীজি আর লড়কাদের এবার এখানে নিয়ে আসুন।'

'আ রে, বাপ রে—' কনস্টেবলটা আঁতকে ওঠার মতো করে বলল, 'ওদের এনে মরি আর কি—'

'মরবেন কেন?'

'তোদের মতো হারামীদের পাল্লায় পড়লে ছেলেগুলো চৌপট হয়ে যাবে। ওদের এখন আনছি না।' তব্—'

'কী?'

'বোর্ডের পরীক্ষা হয়ে গেলে আনব।'

'তখন আনবেন কেন?'

'নৌকরির চেষ্টা করতে হবে তো।'

রাজা মনে মনে বলল, তালে ঠিক আছে শ্লা। চাকরির বেলায় ঠিক এখানে। মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

যা যা মনে এসেছে, সবই বলে ফেলেছে। আর কী জিজ্ঞেস করা যায়, রাজা যখন ভাবছে, সেই ফাঁকে কনস্টেবলটা সট করে ডেকে উঠল, 'এ রাজোয়া—'

রাজা তার চোখের ভেতর তাকাল। কনস্টেবলটার হাই উঠেছিল। তুড়ি দিয়ে দিয়ে হাইটাকে তোয়াজ করে সে বলল, 'হরবখত আমাকেই তো হাজার বাত পুছ করছিস। এবার তোর বাত বল—'

'আমার আবার কী কথা?'

'আ রে শালা, কাম-কারবারের বাত পুচছি। কিরকম চালাচ্ছিস?'

রাজা খুব সতর্ক হয়ে গেল। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে জয়াকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'ভাল না—'

কনস্টেবলটা অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'কী যে বলিস হারামী, তোদের কারবার আবার ভাল চলে না!'

সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে রাজা ফিসফিস করল, 'আবার সেই কথা সেপাইজি—' বলেই জয়াকে দেখিয়ে চোখ টিপল।

কনস্টেবলটার চোখ জয়ার দিকে চরকির মতো ঘুরছিলই। চোখ দু'টো প্রায় বুজে জিভ বার করে সে চুকচুক শব্দ করল। বলল, 'এ হে-হে-হে, মাইরি একদম ভুলে গেছলাম। তুমি শালে গুণধর, তোমার বাত ওর কাছে বলা যাবে না। এই তো?'

রাজা আরাম বোধ করল, 'হ্যাঁ—' বলেই চোখে চোখে হাসল।

'তা হ্যাঁ রে রাজোয়া—'

'বলুন—'

'মেয়েটা কে রে?'

একটু ভেবে রাজা বলল, 'পরে বলব—'

চোখ কুঁচকে কনস্টেবলটা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে জোটালি?'

'পরে বলব।'

'সবই শালার পরে। কেন এখন বললে কী হয়?' কনস্টেবলটা গজ গজ করতে লাগল।

রাজা চুপ।

কনস্টেবলটা আবার বলল, 'ছুঁড়িটা কে, কোত্থেকে জোটালি, কিছুই তো বললি না। কলকাতায় যাচ্ছিস তো বললি তখন?'

রাজা বলল, 'হ্যাঁ।'

'মতলব কী?'

'এমনি।'

গলার ভেতর আবছা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করল কনস্টেবলটা, 'এমনি! তুমি খচ্চর সেই মাল—'

রাজা বলল, 'বিশ্বাস করুন সিপাইজি। মা কালীর দিব্যি—'

কনস্টেবলটা অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে থাকল।

একটু ভেবে রাজা বলল, 'এমনি বলতে এই বেড়াতে আর কি। সিনেমা টিনেমাও দেখব।'

কনস্টেবলটা এবারও কিছু বলল না। দু'চোখে তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়েই থাকল।

রাজা বলল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন সিপাইজি?'

'ভাবছি তোদের সাথ সাথই যাব।'

গলার ভেতর বিড়বিড় করে একটা অকথ্য খিস্তি দিল রাজা। তারপর স্পষ্ট করে বলল, 'বেশ তো, চলুন না—'

উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে রাজার সেই সিগারেটের প্যাকেটটা বার করল কনস্টেবলটা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা যখন পকেটে পুরতে যাবে, রাজা হাত পাতল, 'আমাকে একটা দিন সেপাইজি। অনেকক্ষণ টানিনি, গলার ভেতরটা শ্লা খরখরে হয়ে গেছে।'

কনস্টেবলটা বিরক্ত হল, 'তুই আবার একটা নিবি!'

রাজা মনে মনে বলল, 'শ্লা খচড়ার হাড়। আমার মাল গায়েব করেছে, আর আমাকে একটা খসাতে চাইছে না।' মুখে অবশ্য বলল, 'এখন গলায় ধোঁয়া না দিলে আমি একদম মরে যাব সিপাইজি, নির্ঘাত মরে যাব।'

প্যাকেট খুলে সিগারেটগুলো গুনে গুনে দেখল কনস্টেবলটা। মোট ছ'টা। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা তুলে রাজাকে দিল। তার দেওয়ার রকম দেখে রাজা ভাবল, শ্লা দিচ্ছে দেখ না, যেন বাপের সম্পত্তি!

সিগারেট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাজা দেখতে পেল, কনস্টেবলটা আবার জয়ার দিকে তাকিয়েছে। তাকানো তো নয়, যেন চোখ দিয়ে চাটছে। শালার দু'টো দামড়া দামড়া ছেলে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পর নাতির মুখ দেখবে, এখনো লুচ্চাটার বদমাইশি কত!

কনস্টেবলটা হঠাৎ বলল, 'কলকাতায় কোথায় বেড়াবি?'

রাজা আস্তে করে বলল, 'এই এখানে ওখানে—'

'কী সিনেমা দেখবি?'

'দেখি কোথায় টিকিট পাই। কলকাতা বলে কথা, ওখানে সব জায়গায় ভিড়—'

কথায় কথায় একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। কনস্টেবলটা উঠে পড়ল, 'আমাকে এখানে নামতে হবে।'

রাজা খুব আরাম বোধ করল। মনে হল, এতক্ষণে জামার তলার সেই পোকাটা বেরিয়ে গিয়েছে।

দরজার দিকে যেতে যেতে কনস্টেবলটা বলল, 'ছুঁড়িটা কে এবার বল—'

তৎক্ষণাৎ বলল না রাজা। এদিক সেদিক তাকিয়ে গড়িমসি করতে লাগল।

কনস্টেবলটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'কি রে শালে, বল—'

একটু পর গার্ডের হুইসিল বাজল, ফ্ল্যাগ নড়ল, কনস্টেবলটা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। তারপর যেই ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে ঝট করে মুখ বাড়িয়ে রাজা বলল, 'মেয়েটা আমার ছোটমাসি—' বলেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

'আঁ—' কনস্টেবলটা বোকাটে মুখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ—' রাজা ঘাড় হেলিয়ে চোখ টিপল।

হঠাৎ কী হল, কনস্টেবলটা হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই খচড়া হারামির বাচ্চা, তোর ছোট মাসি! বাপের শাদি দেখিয়ে ছাড়ব—'

চেঁচানো পর্যন্তই। ততক্ষণে গাড়িটার স্পিড বেড়ে গিয়েছে; চোখের পলকে রাজারা প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে গেল।

এগার

আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল রাজা। সবে বসেছে, জয়া জানলার বাইরে থেকে মুখ ফেরাল, 'পুলিশটা আপনার চেনা?'

তারা দু'টো চোখের কোণে এনে তাড়াতাড়ি একবার জয়াকে দেখে নিল রাজা। মেয়েটার মুখ' আগের মতো করুণ, নিষ্পলক। বড় বড়, স্বচ্ছ সরল চোখে অন্য কোনো ছায়া পড়েছে কিনা, বোঝা গেল না। খুব আস্তে করে রাজা বলল, 'হ্যাঁ—'

জয়া চুপ।

রাজা আবার বলল, 'আমাদের ওখানে মানে শ্যামনগর থানায় ক'বছর ধরে আছে। এক জায়গায় থাকলে চেনাশোনা হয়েই যায়—'

জয়া উত্তর দিল না।

ঠোঁট কামড়ে জয়ার মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করল রাজা। কিছুই অবশ্য বোঝা গেল না।

জয়া হঠাৎ বলল, 'লোকটা কেমন?'

'শ্লা, মহা টিকরমবাজ, হারামীর বাচ্চা—' উত্তেজনায় তোড়ের মতো রাজার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বলতে বলতেই আচমকা থেমে গিয়ে সে জিভ কাটল। নাঃ, বার বার জয়ার অস্তিত্ব সে ভুলেই যায়। মুখটা একেবারে ভড়ভড়ে কাঁচা নর্দমা হয়ে উঠেছে।

স্থির চোখে এক পলক রাজাকে দেখল জয়া। ভুরু দু'টো অল্প একটু কুঁচকে গিয়ে পরক্ষণেই টান টান হয়ে গেল। মৃদু হাসির আভা লাগল তার ঠোঁটে। বলল, 'আপনি লোকটার ওপর খুব রেগে গেছেন দেখছি।'

জয়া কী বলতে চায় বুঝতে পারল না রাজা।

জয়া আবার বলল, 'রাগবার কথাই। আপনার সিগারেটের প্যাকেটটা ফেরতই আর দিলে না।'

রাজা হেসে ফেলল, 'না না, ক'টা সিগারেটের জন্যে মরে যাচ্ছি না। লোকটা আদতে বদমাশ। ঘুষখোর, লুচ্চা—'

একটু চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'অমন ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলছিলেন কেন?'

রাজা থতিয়ে গেল, 'কাকে বলছিলাম?'

'পুলিশটাকে—'

'মিথ্যে আবার কী বললাম?' রাজা ভাবতে চেষ্টা করল।

'বা রে—' জয়া বলতে লাগল, 'তখন বললেন না, আমাকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছেন। আসলে আমি তো যাচ্ছি ইন্টারভিউ দিতে, আর আপনি যাচ্ছেন আমাকে পৌঁছে দিতে।'

'ও, এই কথা! আপনি তা হলে সবই শুনেছেন? আমি তো ভেবেছিলাম, জানালার বাইরে তাকিয়ে গাছপালা আকাশ টাকাশ দেখছেন। কানটা মাইরি আপনার ভারি কড়া—'

জয়া কিছু বলল না। রাজা আবার বলল, 'ব্যাপারটা কী জানেন?'

'কী?'

'একটা বাজে পগেয়া হারামজাদাকে সত্যি কথা বলে কী লাভ? যা করতে যাচ্ছি, তা তো আমরাই জানি। ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে লোককে জানাবার কোনো মানে হয় না।'

'ইন্টারভিউ কথাটা না হয় না-ই বললেন, কিন্তু ওই কথাটা বললেন কেন?'

'কী?'

'পুলিশটা নামবার সময় যখন আমার কথা জিজ্ঞেস করল তখন কী বললেন?'

'কী বলেছি?' রাজা ঘেমে উঠল।

'যা বলেছেন, আমি শুনেছি—' রাজার চোখের ভেতর তাকাল জয়া।

জয়া অবার বলল, 'আমি আপনার ছোটমাসি!'

মুখটা হঠাৎ সাদা হয়ে গেল রাজার। ধাতস্থ হতে খানিকক্ষণ সময় লাগল। তারপর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'এঃ হে, এই কথাটাও শুনে ফেলেছেন!'

'ফেলেছি তো।'

মুখ কাঁচুমাচু করে কিছুক্ষণ বসে থাকল রাজা। পরে বলল, 'সত্যি কথাটা কেন বলি নি জানেন?'

'কোন?'

'ও ব্যাটা তা হলে ঝঞ্ঝাট করত। আ রে মশাই—'

মশাই শুনে জয়ার চোখ কুঁচকে গেল। রাজা গ্রাহ্য করল না। তোড়ের মুখে বলে যেতে লাগল, 'আপনি যে আমার ছোটমাসি হন না তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। আপনি যা আছেন তা তো আছেনই। মাঝখান থেকে ওই শালাকে এক পাক মুরগি নাচিয়ে দিলাম।'

জয়া উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

শহরতলির লোকাল ট্রেনটা স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছিল। আগরপাড়া, সোদপুর, ইছাপুর, দমদম।

কিছুক্ষণ আগেও পুলিশটা ছিল। অস্বস্তি বোধ করলেও তার সঙ্গে কথা বলে অন্যমনস্ক থাকতে পেরেছিল রাজা। কিন্তু ট্রেনটা যতই কলকাতার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে ততই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল সে। সেদিন তো বাসে বাসে ঘুরপাক খেয়ে সন্ধে করে দিয়েছিল। আজ কোন কৌশল খাটাবে, রাজা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আগরওলার হোটেলে সেদিনও জয়াকে পৌঁছে দিতে পারেনি সে। রাজা মনে মনে ভাবল , দেখা যাক, কী করা যায়।

কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটেয় লোকার ট্রেনটা শিয়ালদা পৌঁছে গেল। যাত্রীদের সঙ্গে রাজারাও প্ল্যাটফর্মে নেমে এল। তারপর ভিড়ের ভেতর ভাসতে ভাসতে গেট পেরিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে চলল।

জয়া পাশাপাশি হাঁটছিল। আস্তে করে ডাকল, 'শুনছেন—'

রাজা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, কী বলছেন?'

'আড়াইটে কিন্তু বেজে গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক সময়ে আমরা অফিসে পৌঁছতে পারব তো? আজ ইন্টারভিউ দিতে না পারলে চাকরিটার আশা আর নেই। রমলাদিকে আমি আর কিছুতেই বলতে পারব না।' জয়ার গলা উৎকণ্ঠায় অল্প অল্প কাঁপছিল।

দূরমনস্কের মতো রাজা বলল, 'ইন্টারভিউ দিতে পারবেন।'

বড় বড় পা ফেলে তারা ট্রাম রাস্তায় এসে পড়েছিল। জয়া আবার কী বলতে যাচ্ছিল, দূর থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় শ্লোগানের শব্দ ভেসে এল :

'ইনকিলাব—'

'জিন্দাবাদ।'

'শ্রমিক ঐক্য—'

'জিন্দাবাদ।'

'কৃষক ঐক্য—'

'জিন্দাবাদ।'

'ছাত্র যুবক—'

'জিন্দাবাদ।'

'দুনিয়ার মেহনতী মানুষ—'

'এক হও, এক হও—'

রাজারা দেখতে পেল, শিয়ালদা সাউথ স্টেশন থেকে গল গল করে মানুষের স্রোত মিছিল হয়ে বউবাজার স্ট্রিট ধরে চলেছে। আজ হয়তো মনুমেন্টের তলায় মিটিং টিটিং আছে। কিংবা রাইটার্স বিল্ডিং ঘেরাও করা হবে।

ঢলের মতো লোক নামছে তো নামছেই। মিছিলটার মাথায় অসংখ্য পতাকা আর ফেস্টুন। এদিকে কয়েক শ' প্রাইভেট কার লরি ট্রাম ট্যাক্সি রিকশা ঠেলা টেম্পো দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মিছিলটা দেখে আরাম বোধ করল রাজা। অন্তত ঘণ্টা দেড় দুইয়ের জন্য নিশ্চিন্ত। তারপরও ডেলা-পাকানো ট্রাম-বাস ঠিকমতো চালু হতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। মোট ঘণ্টা দুই আড়াই কাটিয়ে দিতে পারিলেই শীতের সন্ধে নেমে আসবে। তখন আর আগরওলার ওখানে যাওয়ার ঝামেলা থাকবে না।

রাজা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দেখাদেখি জয়াও। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কী হল, চলুন—'

রাজা বলল, 'যাব কি করে? দেখছেন না?'

'তাই তো, কী করা যায় এখন?'

রাজা উত্তর দিল না।

জয়া আবার জিজ্ঞেস করল, 'এই মিছিল কতক্ষণ চলবে বলুন তো?'

দুই হাত উলটে দিয়ে রাজা বলল, 'কে জানে—'

'তবু—'

'দু' তিন ঘণ্টা তো নিশ্চয়ই।'

জয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে বলল, 'এক কাজ করলে হয় না?'

'কী?'

'চলুন এখান থেকে হেঁটে চলে যাই।'

'আপনার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'কেন, মাথা খারাপ হবে কেন?'

'রাস্তা কি একটুখানি যে টেংরি চালালেই পৌঁছে যাব। তা ছাড়া —'

'কী?'

'যেতে হলে ওই মিছিলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা তো সম্ভব না।'

'সম্ভব না?'

'না।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কী। যতক্ষণ মিছিলটা না যাচ্ছে, স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

করুণ, হতাশ মুখে মিছিলটার দিকে তাকিয়ে থাকল জয়া। উত্তর দিল না।

মিছিলটা চলে যাওয়ার পর ট্রাম বাস আবার যখন চলতে শুরু করল তখন বেলা আর নেই। শীতের সন্ধে লম্বা পায়ে নেমে এসেছে। অন্ধকার এখনো তেমন গাঢ় নয়। তবু এরই ভেতর রাস্তায় কর্পোরেশনের আলো জ্বলে উঠেছে। উলটোদিকে শিয়ালদা মার্কেটের দোকানগুলো আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। স্টেশনের মাথায় নিওন বাতির উৎসব চলছে।

সার্কুলার রোডটা এখন আর রাস্তা নেই। বিশাল এক হাট হয়ে উঠেছে। কয়েক হাজার আনাজওলা, ফলওলা আর হকার রাস্তাটার পুরোপুরি দখল নিয়ে ফেলেছে। তার ওপর আছে খদ্দেরদের ভিড়। এতক্ষণে ডালহৌসি পাড়ায় অফিসগুলো ছুটি হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে গল গল করে কয়েক লক্ষ মানুষ বেরিয়ে এসে ট্রেন ধরবার জন্যে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে ছুটছে। ট্রেনে উঠবার আগে যে যা পারছে রাস্তার বাজার থেকে কিনে থলের ভেতর পুরে নিচ্ছে।

রাস্তার এই বাজার এবং দমবন্ধ ভিড়ের ভেতর দিয়ে শামুকের মতো বুকে হেঁটে ট্রাম বাস চলেছে। ড্রাইভাররা হয়তো ভোজবাজি জানে, নইলে যেখানে ছুঁচ ঢোকে না সেখানে অত বড় ট্রাম আর ডবল ডেকার কী করে পুরে দিচ্ছে?

জয়ার দিকে ফিরে রাজা বলল, 'যা মাইরি, আপনার দেখছি লাকটাই খারাপ—'

জয়া ভীরু চোখে তাকিয়ে রইল।

রাজা আবার বলল, 'সেদিনও ইন্টারভিউ দিতে পারলেন না। আজ শ্লা মিছিলটা ব্যাগোরবাঁই করে দিলে।'

জয়া করুণ হাসল, 'নাঃ, আমার কপালে ওই চাকরিটা নেই। শুধু শুধু দু'-দু' বার কলকাতায় আসা-যাওয়াই সার।'

রাজা চুপ করে রইল।

সেদিনকার মতো জয়া আবার বলল, 'এখন তো ট্রাম বাস ছেড়েছে। একবার অফিসে গেলে হয় না?'

'অফিসে গিয়ে কী হবে?'

'যদি ওঁরা থেকে যান—'

'আপনার ইন্টারভিউ নেবার জন্যে?' রাজা হেসে ফেলল, 'দেখছেন না, সন্ধে হয়ে গেছে। অফিস টফিস ছুটি হয়ে গেছে। এখন গিয়ে কারোকে পাবেন না।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কি, ট্রেন ধরে ব্যাক করা।'

বড় করে শ্বাস টেনে জয়া বলল, 'চলুন।'

দু'জনে শিয়ালদা নর্থের দিকে ফিরে চলল। সেদিন তবু বাইরে বেরিয়ে ট্রাম বাসে ঘণ্টা দুই তিন টো টো করা গিয়েছে। আজ তারা স্টেশন কম্পাউন্ডের বাইরেই বেরুতে পারল না।

বার

আসার সময় পুলিশটার সঙ্গে এবং জয়ার সঙ্গেও সমানে বক বক করেছে রাজা। ফেরার সময় কিন্তু একেবারে চুপচাপ। আজ রমলাদির কাছে কী কৈফিয়ত দেবে ভেবেই পাচ্ছিল না। অবশ্য আড়াই মাইল লম্বা জলজ্যান্ত একটা মিছিল আর সার্কুলার রোডের ট্রাফিক জ্যামটা হাতেই রয়েছে, তবু খুব একটা ভরসা পেয়ে উঠল না।

অফিস-ফেরত প্যাসেঞ্জারদের নিজের খোলের ভেতর পুরে ডাউন লোকাল ট্রেনটা স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজা জানালা বন্ধ, কেননা বাইরে শীতের হাওয়া কনকনে হয়ে উঠেছে।

রাজা অন্যমনস্কের মতো বসে ছিল। কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ জয়া বলল, 'আমার স্টেশন এসে গেছে।' বলেই উঠে পড়ল।

রাজা চমকে উঠল, 'ও, তাই নাকি? নামবেন?'

'নামব না তো কী—' বলতে বলতে দরজার দিকে চলতে লাগল জয়া। রাজাও তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। ভাবল, তাই তো, এখানে না নামলে এই শীতের রাতে তার সঙ্গে কোথায় যাবে মেয়েটা?

দরজা খুলে জয়া নেমে পড়ল।

হঠাৎ কী মনে পড়তে রাজা বলল, 'কাল সকালে বাড়ি থাকছেন?'

'সকালে কেন, সারাদিনই থাকব। কেন বলুন তো?'

'আমি যেতে পারি।'

'যাবেন।'

'খুব দরকার আছে।'

'দরকার না থাকলেও আসতে পারেন।'

রাজা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ভাঙা গলায় হুইসিল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল।

শ্যামনগর পৌঁছে রাজা প্রথমটা ঠিক করতে পারল না, কী করবে। একবার ভাবল, সোজা বাড়ি চলে যায়। আবার ভাবল, না, রমলাদির সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। কিন্তু কিছুই করল না। অস্থির পায়ে ওভার-ব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে এল সে। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে 'শোভা কাফে'তে এসে পড়ল, নিজেই জানে না।

রাত এমন কিছু হয়নি। সাড়ে সাতটা আটটার বেশি কিছুতেই নয়। শীত বলে এর মধ্যেই রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে যাচ্ছে। 'শোভা কাফে' বেশ ফাঁকা। এ কোণে সে কোণে দু'একজন বসে আছে। সব চাইতে অবাক কাণ্ড, তুলসী ফুলসীদের দেখা পাওয়া গেল না। শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, দুনিয়া জাহান্নামে চলে যাক, সন্ধের পর ওদের 'শোভা কাফে'র এই কোণটিতে দেখা যাবেই। জমজমাট আড্ডা ছেড়ে আজ ওরা গেল কোথায়?

রাজা শুধলো, 'মালেরা গেল কোথায়?'

ছাই রঙের একটা র‍্যাপার জড়িয়ে কম্ফোর্টারে মাথা ঢেকে কাউন্টারে বসে ছিল গণেশ সাধুখাঁ। বলল, 'জানিনা। দুপুরের পর থেকে একজনেরও টিকি দেখতে পাই নি। তোমাকেই এখন যা দেখলাম। কেন, তুমি ওদের সঙ্গে ছিলে না?'

'না।'

'তবে!' গণেশের প্রশ্নটার ভেতর বিস্ময়ের মতো কিছু ছিল। অর্থাৎ দলছুট কোথায় ছিল রাজা!

রাজা বলল, 'আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম।'

'তাই বল। তা কাজ ফাজ ছিল?'

'হ্যাঁ।'

গণেশের চোখ চকচকিয়ে উঠল। গলা খাটো করে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমার রমলাদি পাঠিয়েছিল নাকি?'

রাজা আস্তে করে মাথা নাড়ল।

গণেশ বলল, 'তার মানে টু পাইস পকেটে এসেছে।'

রাজা উত্তর না দিয়ে বলল, 'একটা ডবল হাফ দিতে বল তো গণেশদা।' সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। তুলসী-রতনদের কথা তার আর মনে পড়ছিল না। গণেশ রমলাদির কথা বলল। তার মুখটাই বার বার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

চা এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে রাজা ভাবতে লাগল, আজ রাত্তিরেই রমলাদির কাছে যাবে কি না? না ঘাপটি মেরে থাকবে? রমলাদি ডেকে পাঠালে তবে যাবে? পরিষ্কার কিছুই সে চিন্তা করতে পারছিল না। মাথার ভেতরটা ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছিল।

রাজার মনে হতে লাগল, শীতটা যেন হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। হাড়ের ভেতর থেকে তাঁর কাঁপুনি উঠে আসছিল। সে ডাকল, 'গণেশদা—'

গণেশ মুখিয়েই ছিল। বলল, 'কী বলছ?'

'আজ বড্ড শীত মাইরি—'

'হ্যাঁ। তা একটু—'

'চা দিলে। ঠিক শানাল না। হাত-পা গরমই হল না।'

নাক কুঁচকে ভুরভুরি কাটার মতো করে হাসল গণেশ। বলল, 'চায়ে কি হাত-পা গরম হয়? ছেনালি না করে ভেতরের ঘরে যাও দিকিন। এক পাঁট গলায় ঢালো, দেখবে গায়ে আগুন ছুটবে।'

'সেই ভাল—' রাজা সট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ডানদিকের দেওয়ালে ঝোলানো পর্দাটা সরিয়ে ঘুপচি একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

চল্লিশ পাওয়ারের টিমটিমে একটা ডুম জ্বলছিল মাঝখানে। বাল্বটার তেজ কম, দু' হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। ওটা জ্বললেও যা, না জ্বললেও তা-ই। আর বাল্বটারও এমন জানের জোর

যে বছরের পর বছর জ্বলেই যাচ্ছে; ফিউজ হওয়ার নাম নেই। গণেশ সাধুখাঁ যা মাল, তাতে চালু থাকতে থাকতে ওটাকে বদলে ফেলবে এমন আশা নেহাতই দুরাশা।

আবছা আবছা অন্ধকারে দেখা যায়, খানতিনেক নড়বড়ে বেঞ্চি ছড়িয়ে রয়েছে। পাঁচ ছ'টা লোক ছায়ামূর্তির মতো বসে মাটির খুরিতে এক নম্বর বাংলা মদ ঢেলে খাচ্ছিল, ফাঁকে ফাঁকে শালপাতার ঠোঙা থেকে রগরগে ঝাল দেওয়া ঘুগনি তুলে তুলে মুখে দিচ্ছিল।

রাজার সঙ্গে সঙ্গে গণেশও ঘুপচি ঘরটায় ঢুকে পড়েছিল। লম্বা গলা এবং গোলমতো পেট, একটা বোতল বড় টিনের বাক্স থেকে বার করে রাজাকে দিতে দিতে বলল, 'চাট লাগবে?'

রাজা বলল, 'চাট ছাড়া মাল খাওয়া যায়? দিনকে দিন তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি না দাদা একেবারে হড়কে যাচ্ছে।'

'আমিও তো তাই বলি। তা কী চাট দেব? ঘুগনি না চপ-কাটলেট?'

'চপ-কাটলেট! মাইরি আর কি। এমনিতেই মালে কতগুলো পয়সা খসে যাবে, তার ওপর চপ-কাটলেট গছালে মরে যাব দাদা। তুমি ঘুগনিই দাও—'

বেজার মুখে এক ঠোঙা ঘুগনিই দিল গণেশ। কেননা চাট হিসাবে ঘুগনিটা ফ্রি। চপ-কাটলেট নিতে হলে বাড়তি পয়সা ফেলতে হবে।

পেটের ভেতর দু' ভাঁড় বাংলা মাল পড়তেই শরীরটা একেবারে হালকা হয়ে গেল। মনের অবস্থাও সেই রকমই। সেটা যেন পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে! বোতলটা সাফ করে দাম ফাম মিটিয়ে তুড়ি দিতে দিতে 'শোভা কাফে' থেকে রাস্তায় নামল রাজা, গুন গুন করে একটা হিন্দি গানের সুরও ভাঁজতে লাগল, 'রূপ তেরা মস্তানা, পেয়ার মেরা দিওয়ানা—'

বাংলা মালের মহিমা আছে। মাথার ভেতরটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটু আগেও রাজা ঠিক করে উঠতে পারছিল না, রমলাদির বাড়ি যাবে কি যাবে না। মাথার সেই ঝাপসা কুয়াশা এখন কেটে গিয়েছে। রাজা স্থির করে ফেলল, রমলাদির সঙ্গে এখনই দেখা করবে। পরোয়া কিসের? তিন মাইল লম্বা মিছিল চলতে থাকলে সে জয়াকে নিয়ে যায় কেমন করে? কালীমার্কা বাংলা মদের বোতলটা রাজাকে অনেকখানি সাহস দিয়েছে!

এখন আর তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না। ডিসেম্বরের কনকনে হাওয়া বেশ আরামদায়ক হয়ে উঠেছে। খুব জোরে জোরে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল রাজা। গলাটা আরেকটু চড়িয়ে দিল, 'পেয়ার মেরা—'

স্টেশনে এসে টকাটক সিঁড়ি বেয়ে ওভার-ব্রিজের মাথায় উঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রাজা। দূরে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছটায় মাতালের চোখের মতো লাল টকটকে আলো জ্বলছে। ডাউনের দিক থেকে একটা গাড়ি হুড়মুড় করে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামল। একটু পর ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠে ট্রেনটা কলকাতার দিকে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাউন ট্রেনের আসা যাওয়া দেখল রাজা। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলো দেখল। অন্ধকার আর কুয়াশায়-ঢাকা ভুতুড়ে চেহারার স্টেশনটা দেখল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরিয়ে নিল। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওধারে নেমে গেল।

এদিকের রাস্তাটা আরো নির্জন। কদাচিৎ এক আধটা লোক আগাপাশতলা চাদর মুড়ি দিয়ে সাঁই সাঁই বেরিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের হিম থেকে কতক্ষণে ঘরের ভেতর ঢুকে আশ্রয় নেবে তাদের একমাত্র লক্ষ্য তা-ই। দু' ধারে ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলোর পেছন দিকে ঝোপঝাড়, বনবাদাড়। সেখানে ঝাঁক ঝাঁক শেয়াল ডাকছে, জোনাকি উড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে রমলাদির বাড়ি এসে পড়ল রাজা। দরজায় টোকা দিতেই দুর্গা দরজা খুলে দিল। গোলগাল শ্যামবর্ণা মধ্যবয়সিনী মেয়েমানুষটির গাল আর ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে পেল রাজা। উজ্জ্বল আলোয় ডান দিকে পুরনো আমলের ভারী খাটে নীল র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে আছে রমলাদি। সামনে একটা বই খোলা।

রমলাদি রাজাকে দেখতে পাচ্ছিল না। বলল, 'কে গো দুগ্‌গা মাসি?'

দুর্গা উত্তর দেবার আগেই রাজা বলে উঠল, 'আমি, রাজা—'

'ও, তুই—' রমলাদির গলায় আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য ফুটল, 'মনে মনে তোর কথাই ভাবছিলাম। আয়, ভেতরে আয়—'

দুর্গা সরে দাঁড়াল। রাজা ভেতরে ঢুকল। একটু ইতস্তত করে বড় সোফার কোণ ঘেঁষে ঝপ করে নিজেকে ছেড়ে দিল। তার বুকের ভেতরটা দমকা বাতাসে গাছের পাতার মতো কাঁপছে।

রমলাদি ব্যস্তভাবে বলল, 'দোর বন্ধ করে দাও দুগ্‌গা মাসি। বড্ড ঠাণ্ডা আসছে।'

ঝড়াং করে দরজার পাল্লা আটকে দিল দুর্গা। রাজা চোখের কোণে তারা দু'টো এনে লক্ষ করল, রমলাদি খোলা বইটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে ফেলল। বইটার মলাটে লেখা কাশীরাম দাসের মহাভারত। মাগী আবার মহাভারত পড়ে! ঘোমটার তলায় শালীর খ্যামটা।

রমলাদি বলল, 'আজ আর পড়ব না মাসি। অভিমন্যু বধ পর্যন্ত হয়ে রইল। কাল আবার শুনো—'

বোঝা গেল, রমলাদি দুর্গাকে মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছিল। দুর্গা হাসল, 'আজ যে আর পড়বে না তা কি বুঝিনি? রাজাদা যখন এসেছে তখন পড়ার নিকেশ হয়ে গেল।' হাসতে হাসতে সে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

রমলাদি এবার ঘুরে বসে সোজাসুজি রাজার দিকে তাকাল। বলল, 'কলকাতা থেকে কখন ফিরেছিস?'

'এই খানিকটা আগে।'

'কাজ হল?'

রমলাদি কোন কাজের ইঙ্গিত করেছে, রাজা বুঝতে পারল। তবু না বোঝার ভান করে বলল, 'কী কাজ?'

রমলাদির চোখের তারা স্থির হল, 'কী কাজ জানিস না? ন্যাকামো।'

রাজা চুপ করে থাকল।

রমলাদি আবার বলল, 'জয়াকে পৌঁছে দিয়েছিস?'

মেরুদণ্ডের হাড়ের ভেতর হিম অনুভব করল রাজা। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থেকে জোর শ্বাস টেনে বলল, 'না—'

'না!' সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শব্দ করে প্রতিধ্বনি করল রমলাদি।

রাজা উত্তর দিল না।

রমলাদি এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'আজও পৌঁছে দিস নি?' রাগে আক্রোশে তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে; চোখের তারা দপদপ করছে। রেগে গেলে এমন সুন্দর মেয়েমানুষটাকে কি কুৎসিতই না দেখায়।

রমলাদি গলার শির টান করে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'কেন, কেন পৌঁছে দিস নি? ভেবেছিস কী তুই?'

বুকের ভেতর যেটুকু সাহস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, সব কুড়িয়ে টুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাজা কোনোরকমে বলতে লারল, 'কী করব? আজও মিছিল বেরিয়েছিল যে—'

'কলকাতায় মিছিল রোজই বেরোয়। তার জন্যে কোন কাজটা আটকে থাকে শুনি? সেদিনও মিছিলের দোহাই দিয়েছিলি। মতলবটা কী তোর?'

'সত্যি বলছি রমলাদি, আজকের মিছিলটা মস্ত বড়। শিয়ালদা দিয়ে পাস করতেই ক'ঘণ্টার মতো লেগে গেল। ট্রাম-বাস সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'ট্রাম বাস বন্ধ হয়েছিল তো পায়ে হেঁটে যেতে পারিস না? না পা দু'টো শ্যামনগরে ফেলে রেখে গিয়েছিলি?'

'হেঁটেই বা যাব কেমন করে?'

'কেন?'

'মিছিলের ভেতর দিয়ে গলে যেতে দেয় না।'

'মিছিল চলে যাবার পরও তো যেতে পারতিস।'

'তা পারতাম। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

রমলাদি দপদপে চোখে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি ছুঁচের মুখের মতো বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। ঢোক গিলে রাজা বলল, 'মিছিল পার হতে হতে সন্ধে হয়ে গেল যে—'

ধারাল কর্কশ গলায় রমলাদি বলল, 'সন্ধেবেলায় গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?'

'না।'

'তা হলে?'

রাজা বলল, 'সন্ধের পর কোনো অফিস চালু থাকে নাকি? তখন ইন্টারভিউয়র জন্যে নিয়ে গেলে মেয়েটা সন্দেহ করত।'

কথাগুলোর ভেতর যুক্তি ছিল। রমলাদি তবু খেপে উঠল, 'তোর মতলবটা কী?'

রাজা হকচকিয়ে গেল, 'কিসের মতলব?'

'কিসের, তা তুই বলবি।'

রাজা চুপ।

রমলাদি থামে নি, 'আগে তো তোর এমন বাঁদরামো দেখিনি। এই মেয়েটাকে পৌঁছে দিচ্ছিস না কেন?' তার কণ্ঠস্বর মতো গর্জনের মতো শোনাতে লাগল।

রাজা বলল, 'বললাম তো। মিছিল বেরুলে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?'

রমলাদি উত্তর দিল না। হিংস্র কুটিল চোখে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় বলল, 'আচ্ছা তুই এখন যা।'

এত তাড়াতাড়ি ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে, রাজা ভাবে নি। চট করে এক পলক রমলাদিকে দেখে নিয়ে দরজার দিকে ঘুরতে যাবে, রমলাদি হঠাৎ ডাকল, 'শোন—'

রাজা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

রমলাদি বলল, 'মিছিল বেরিয়ে শিয়ালদার বাস ট্রাম বন্ধ হয়েছিল কিনা, আমি কিন্তু খোঁজ নেব।'

মনে মনে রাজা বলল, 'ওতে সুবিধে হবে না চাঁদু, রাজা ফলসের ওপর চলে না।' মুখে অবশ্য বলল, 'আচ্ছা—'

'আর একটা কথা, কাজ হয় নি। আমি কিন্তু আজ টাকা দোব না।'

'ঠিক আছে।'

রাজা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

তের

পরের দিনটা 'শোভা কাফে'তে তুলসীদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিল রাজা। রাত্তিরে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকট্রিক পোস্ট থেকে তামার তার হাফিস করে জগদীশ কালোয়ারের দোকানে দিতেই নগদ পঁয়ত্রিশটা টাকা হাতে এসে গেল। তার থেকে কিছু খরচ করে বাজার করল সে। পাঁচ কেজি চাল কিনল। তারপর মাঝরাত্তিরে 'শোভা কাফে'তে গিয়ে হুল্লোড় করে বন্ধুদের সঙ্গে কালীমার্কা বাংলা মাল খেল। এত সবের পরেও দেখা গেল, নগদ দু'খানা দশ টাকার নোট বেঁচে গিয়েছে। অর্থাৎ আরো পাঁচ ছ' দিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

সারাদিন ফিকেভাবে জয়ার কথা যে মনে পড়ে নি তা নয়। কিন্তু কয়েক ঢোক ঝাঁঝাল দিশি জিনিস পেটে পড়তেই মেয়েটার মুখ বেমালুম ভুলে গিয়েছিল রাজা। তারপর রাস্তায় টাল খেতে খেতে বাড়ি ফিরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, হুঁশ নেই।

পরের দিন ঘুম ভাঙল কার যেন চেঁচামেচিতে, 'রাজা আছিস? এই রাজা—রাজ চক্রবর্তী—'

চোখ মেলে রাজা দেখতে পেল, দরজা জানালার ফুটো দিয়ে, ঘুলঘুলির ফাঁক গলে সোনার মতো

সরু সরু রোদের রেখা এসে পড়েছে ঘরে। পাশে দেখল, টুনি নেই। মেয়েটার খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙে। আর জাগলে এক মিনিটও সে বিছানায় থাকে না।

বাইরে সেই ডাকটা আবার শোনা গেল, 'রাজা—এই রাজা, এই কুম্ভকর্ণের ভায়রাভাই—'

গলা শুনেই চেনা গেল, ফাদার ডোনাল্ডস। ধড়মড় করে উঠে বসল রাজা। তারপর এক ঝটকায় মশারি তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে চলে এল।

ফাদার ডোনাল্ডস তাঁর লঝ্ঝড় সাইকেলটা হেলিয়ে তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'কি ঘুম যে ঘুমোতে পারিস! আধ ঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা আমার চিরে গেল।'

রাজা লজ্জা পাওয়ার মতো করে হাসল, 'না, মানে কাল রাত্তিরে বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'তুই বেশ ছেলে—'

ফাদার কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে রাজা তাকিয়ে থাকল।

ফাদার ডোনাল্ডস আবার বললেন, 'সেদিন বলে এলি শিগ্‌গির আমার সঙ্গে দেখা করবি। তারপর একেবারে বেপাত্তা। ব্যাপার কী রে? মেয়েটার সঙ্গে ভাব-টাব ছুটে গেছে?' কৌতুকে চোখমুখ ঝকমক করতে লাগল তাঁর।

রাজা কিছুই মনে করতে পারল না। কালীমার্কা ধেনো ·দের ক্রিয়ায় মাথার ভেতরটা এখনো ঘোলাটে হয়ে আছে। অবাক হওয়ার মতো সে বলল, 'কোন মেয়ের কথা বলছেন?'

'সে কি রে! তুই তো আচ্ছা ছোকরা—'

'যা শ্লা, সক্কালবেলা কি ন্যাকরা লাগালেন মাইরি! কে মেয়ে, কার কথা বলছেন?'

'জয়া—জয়া। যার জন্যে ভোর রাত্তিরে উঠে চার্চে ছুটেছিলি। এর মধ্যেই ভুলে গেলি?'

এবার মনে পড়ে গেল। হাই তুলে ধেনো মদের খোয়ারি কাটাতে কাটাতে রাজা উৎসাহের সুরে বলল, 'জয়ার কথা? তাই বলুন। অত ভ্যানতাড়া না করে নামটা বললেই হত। ওর কী ব্যবস্থা করলেন?'

ফাদার ডোনাল্ডস এতক্ষণ লক্ষ করেন নি। হঠাৎ স্থির দৃষ্টিতে রাজার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, চোখ অমন লাল কেন রে? কাল রাত্তিরে খুব টেনেছিলি বুঝি, অ্যাই—'

রাজা হকচকিয়ে গেল। চোখ নামিয়ে বিব্রতভাবে বলল, 'যা শ্লা, কি যে বলেন। যত ভাগাড়ের দিকে আপনার চোখ।'

'তুই মরবি। আজে বাজে ধেনো মেনো খেয়ে নির্ঘাত লিভারখানা একদিন পচিয়ে ছাড়বি। তোর মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'জয়ার কী করলেন বলুন। চাকরি বাকরি জুটল কিছু?'

একদৃষ্টে রাজাকে দেখতে দেখতে ফাদাল ডোনাল্ডস আস্তে করে বললেন, 'না—'

কাল সমস্ত দিন জয়ার কথা তেমন ভাবে নি রাজা। কিন্তু এই·মুহূর্তে তার চিন্তা রাজাকে আবার পেয়ে বসল। মেয়েটাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। রাজা বলল, 'তা হলে—'

'অন্য একটা ব্যবস্থা হয়েছে। দ্যাখ, তোর আবার পছন্দ হয় কিনা—'

'কী ব্যবস্থা?'

'সুরযলাল মারোয়াড়ি দুই ছেলেমেয়ের জন্যে পড়াবার লোক খুঁজছিল। ছেলেমেয়ে দু'টো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ভাল টাকা দেবে।'

'কত দেবে?'

'দেড়শ'। জয়া পড়াতে পারবে তো?'

প্রচণ্ড উৎসাহে বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতের ঘুষি কষিয়ে দিল রাজা, 'পারবে না মানে, শালীকে পারতেই হবে।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'কাল পরশু সকালের দিকে জয়াকে আমার কাছে আনতে পারবি?'

রাজা খানিকটা দমে গেল, 'কেন?'

'বা রে, ওকে নিয়ে সুরযমলের কাছে যেতে হবে না?'

'ঠিকই তো। আমি যেন শ্লা কী—'

'তা হলে ওই কথা রইল। এখন চলি—' সাইকেলটা একটু ঠেলে উঠতে গিয়ে থেমে গেলেন ফাদার ডোনাল্ডস— 'তবে আর একটা কথা—'

'কী?'

'সূরয মারোয়াড়ি আরো ক'জনকে ডেকেছে। কথাবার্তা বলে যাকে পছন্দ হবে তাকে নেবে। জয়া বেশ চটপটে, স্মার্ট তো?'

দ্রুত জয়ার মুখটা একবার ভেবে নিল রাজা—করুণ, জড়সড়, ভীরু। ফস করে আলো নিভে যাওয়ার মতো একটু আগের উৎসাহ টুৎসাহ আর রইল না। নৈরাশ্যের সুরে রাজা বলল, 'জয়াকে নিয়ে আসি। দেখলে বুঝতে পারবেন—'

'আচ্ছা—' ফাদার আর দাঁড়ালেন না, সাইকেলে উঠে চালিয়ে দিলেন।

রাস্তার বাঁকে ফাদার ডোনাল্ডস অদৃশ্য হয়ে গেলে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে ঘুরল রাজা। আর তক্ষুনি বৌদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দরজার আড়ালে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েমানুষটা।

অমন করে দাঁড়িয়ে থাকার মানে কী? সন্দেহে রাজার চোখ কুঁচকে যেতে লাগল।

বৌদির গোল চোখে সহজে পাতা পড়ে না। পলকহীন তাকিয়ে থাকে সে বলল, 'মেয়েটা কে গো?'

'কার কথা বলছ?'

'ওই যে পাদ্রী সাহেবের কাছে যার কথা বলছিলে। জয়া না কী নাম—'

যা সন্দেহ করা গিয়েছিল, দরজার পাল্লায় শরীর ঢেকে আড়ি পেতে তাদের কথা শুনেছে বৌদি। বিরক্ত গলায় রাজা বলল, 'যে-ই হোক, তোমার কী দরকার?'

বৌদি বলল, 'আমার আবার কী দরকার। নামটা কানে এল, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'নামটা অমনি অমনি কানে গেল, না লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে শুনেছিল?' হঠাৎ মেজাজ খারাপ করে ফেলল রাজা।

'আমি চোর? আমি চোর?'

'আলবাত চোর—'

বৌদির চোখের তারায় আগুনের ফুলকি খেলতে লাগল। জোরে জোরে বারকতক শ্বাস টেনে উগ্র চাপা গলায় বলল, 'বেশ চোরই আমি। একটা কথা মনে রেখো। ছুঁড়িটাকে নিয়ে যা করতে চাও করো; তবে একটু বুঝে সুঝে। সংসারে পাঁচটা মুখ হাঁ করে আছে, সেটা ভুলে যেও না।'

বৌদি আর দাঁড়াল না। ডান দিকে ঘুরে রান্নাঘরে চলে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণ তাকে দেখল রাজা। চোখের সেই তেজ থাকলে মেয়েমানুষটাকে ভস্মই করে ছাড়ত। গলার ভেতর জড়ানো জড়ানো শব্দ করে সে শুধু বলল, 'মাগী খচরি—' তাদের সম্পর্কটা নিয়ত যুদ্ধের।

বৌদি ঠিক শুনতে পেয়েছিল। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'আমি খচরি হলে তুই কী? হারামজাদা হাড় খচ্চরের বাচ্চা—'

খিস্তি দিতে দিতে নিজের ঘরে চলে গেল রাজা। তারপর প্যান্ট ট্যান্ট পরে, কোমরের তলায় বেল্ট আটকে, চুলে পরিপাটি একখানা সিঙাড়া বানিয়ে ননীর বেরিয়ে পড়ল।

মাথাটা গরম হয়েই ছিল। হাঁটতে হাঁটতে কখন স্টেশনে চলে এসেছে, রাজার খেয়াল নেই। হঠাৎ তার চোখ পড়ল, উত্তর দিক থেকে কলকাতার একটা ট্রেন এই মাত্র স্টেশনে ঢুকে যাচ্ছে। তক্ষুনি জয়ার মুখটা আবার মনে পড়ে গেল। খানিক আগে ফাদার ডোনাল্ডস তাদের বাড়ি এসেছিলেন। চট করে তাঁর কথাও ভেবে নিল রাজা। সঙ্গে সঙ্গে কী একটা স্রোত এক টানে তাকে কলকাতার ডাউন গাড়িটার দিকে টেনে নিয়ে গেল যেন। কিছুটা ঘোরের মধ্যেই একটা কামরায় উঠে বসল রাজা। তার কানের কাছে অবিরাম ফিসফিসিয়ে কেউ বলতে লাগল, 'জয়াদের বাড়ি এখনই একবার যাওয়া দরকার।'

নবীপুর পৌঁছুতে দশ মিনিটও লাগল না। স্টেশনের বাইরে আসতেই হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটা দেখতে পেল রাজা। এ বাড়ি তার চেনা। নবীপুর শহরে ঢুকতে হলে এই বাড়িটার পাশ দিয়েই যেতে হয়। দোতলা বাড়িটার পর প্রকাণ্ড মজা পুকুর। জয়ার কথামতো পুব পাড়ে তাকাতেই পুরনো একতলা বাড়ি চোখে পড়ল। পুব পাড়ে বাড়ি বলতে ঐ একটাই। সুতরাং ওটা জয়াদেরই।

এত কাছাকাছি এসেও কিন্তু হুট করে জয়াদের বাড়ি যেতে পারল না রাজা। পগেয়া শাহানশা ছেলে সে, তবু পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, যাবে কি যাবে না। লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা, সব একাকার হয়ে সে যেন কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত রাজা ঠিক করল, এতদূর যখন এসেই পড়েছে, যাওয়াই উচিত। ফাদার ডোনাল্ডস জয়ার জন্য অনেকটা এগিয়েছেন, সেটা জানানো দরকার।

নিজের দিকে একবার তাকাল রাজা। তারপর চুলের সিঙাড়াটা ভেঙে চেপে চেপে মাথার সঙ্গে লেপটে দিল। কোমরের তলা থেকে বেল্টটাকে টেনে টেনে নাভির ওপর তুলে আনল। তারও পর আস্তে আস্তে হেঁটে পুকুরের পাড়ে একতলা বাড়িটার দরজায় এসে দাঁড়াল।

বাড়িটা বেশ বড়। তবে অনেক কালের পুরনো। সেটার দেওয়াল থেকে চাঙড়া চাঙড়া পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে আছে। সামনের রকটা ফেটেফুটে চৌচির।

দরজার কড়াতে হাত দিয়ে অস্বস্তি বোধ করল রাজা। পরক্ষণেই এক ঝটকায় অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু ঝেড়ে ফেলে জোরে জোরে কড়া নাড়ল।

একটু পর দরজা খুলে মাঝবয়সী এক বিধবা মুখোমুখি দাঁড়াল। ভাঙাচোরা মুখ। কাঁধের হাড়, হাতের আর গলার শির চামড়ার তলা থেকে ফুটে বেরিয়েছে। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠের মতো। সব চাইতে আশ্চর্য তার চোখ। এ চোখ জগতের কোনো কিছুকে যেন বিশ্বাস করে না।

ঘোমটাটা সামনের দিকে অল্প একটু টেনে বিধবাটি বলল, 'কাকে চাই?'

রাজা হঠাৎ ঘাবড়ে গেল। সরাসরি জয়ার নামটা সে মুখে আনতে পারল না। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'এটা কি রমেশবাবু মানে রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলির বাড়ি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন—'

'হ্যাঁ, জানি—মানে—' কিভাবে জয়ার কথাটা তুলবে ভেবে পাচ্ছিল না রাজা।

তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে বিধবাটি আবার বলল, 'কাকে চাই?'

রাজা কী উত্তর দিতে চাচ্ছিল, সেই সময় বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছ মা?' বলতে বলতে যে এসে বিধবাটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে জয়া।

রাজাকে দেখে জয়া অবাক, 'আপনি!'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ। সকালবেলা এদিকে একটু দরকারে এসেছিলাম। ভাবলাম, দেখা করে যাই।'

'আসুন, আসুন—' বলেই বিধবার দিকে ফিরল জয়া, 'মা', এর নাম রাজকুমার সান্যাল—তোমাকে এর কথা বলেছিলাম।'

বিধবাটি দরজা থেকে একপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। বলল, 'এর সঙ্গেই দু' দিন কলকাতায় চাকরির জন্যে গিয়েছিলি না?'

জয়া মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকেই রাজা জয়ার মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। বিধবাটি আবেগহীন গলায় বলল, 'হয়েছে, হয়েছে। বেঁচে থাকো।'

দরজার পরেই উঠোন। একটু পর উঠোন পেরিয়ে তিনজনে সামনের একটা ঘরে এল। হাতল-ভাঙা খান দুই চেয়ার, একটা তক্তপোষ, পুরনো আমলের নকশা-করা জবড়জং একটা আলমারি ছাড়া এখানে আর কোনো আসবাব টাসবাব নেই। জয়ার মা বলল, 'বসো—'

রাজা একটা চেয়ারে বসল। জয়ার মা আর জয়া দাঁড়িয়ে থাকল।

জয়ার মা আবার বলল, 'তোমার কথা মেজ খুকির মুখে অনেকবার শুনেছি। বলছিল তোমার মতো ছেলে নাকি হয় না—'

মেজ খুকি নিশ্চয়ই জয়া। ওটা খুব সম্ভব আদর বা অবহেলার নাম। চোখ তুলে চট করে একবার জয়াকে দেখে নিল রাজা। মেয়েটার মুখে লজ্জার আভা মাখানো একটুখানি হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। জয়া তাকিয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল।

জয়ার মা বলল, 'মেজ খুকি বলছিল তুমি ওর জন্যে খুব কষ্ট করেছ। দু' দিন সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে গেছ, আবার ফিরিয়ে এনেছ। ও তো কোনোদিন একা একা কোথাও যায় নি। তুমি সঙ্গে না গেলে মেয়েটা ভারি বিপদে পড়ে যেত। কলকাতা শহর বলে কথা।'

জীবনে প্রশংসার কথা বিশেষ শোনে টোনেনি রাজা। তা ছাড়া, কী উদ্দেশ্যে জয়াকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল, সে তা ভাল করেই জানে। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গিয়ে রাজা বলল, 'না না, কী এমন করেছি—'

'যা করেছ তা-ই বা কে করে?' জয়ার মায়ের গলায় কৃতজ্ঞতার আভাস।

রাজা চুপ। মহিলা তো জানে না, কত বড় হারামজাদা বজ্জাতকে বাড়ি ঢুকিয়ে আদর করে চেয়ারে বসিয়েছে।

জয়ার মা বলতে লাগল, 'তোমাদের বাড়ি তো শ্যামনগরেই?'

'হ্যাঁ।'

'রমলা তোমার কেউ হয়?'

'না। তবে এক জায়গায় থাকি—' বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে রাজা উত্তর দিল, 'অনেকটা আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে।'

'বুঝেছি।' জয়ার মা বলল, 'রমলা মেয়েটা ভারি ভাল, বড্ড আপন করে নিতে জানে। ক'দিনই বা আমাদের বাড়ি এসেছে। এর ভেতর বাড়ির একজন হয়ে উঠেছে।'

রাজা উত্তর দিল না।

জয়ার মা বলল, 'তোমাদের বাড়ি থেকে রমলাদের বাড়ি কতদূর?'

'খুব বেশি না, এপাড়া-ওপাড়া।'

একটু ভেবে জয়ার মা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কে কে আছে? বাবা-মা?'

রাজা বলল, 'বাবা-মা নেই।' সংসারে আর কে কে আছে, তাদের তালিকা দিল রাজা।

'তুমি কী কর? লেখাপড়া?'

'না।'

'তবে কি চাকরি বাকরি?'

'না, চাকরি কে আর দিচ্ছে। ছোটখাট ব্যবসা করি—'

'কিসের ব্যবসা?'

প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর। রাজা ভাসা ভাসা জবাব দিল, এই নানা রকমের। ঠিক কিছু নেই, যখন যা পাই—'

জয়ার মা এ ব্যাপারে আর কিছু জানতে চাইল না। রাজার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আস্তে আস্তে এবার বুকের ভেতর বাতাস টানতে লাগল।

একটু ভেবে জয়ার মা বলল, 'দু'দিন কলকাতায় গেল মেয়েটা। যাওয়াই সার। কাজের কাজ কিছুই হল না।' তার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে।

আবছা গলায় রাজা বলল, 'হ্যাঁ—'

'তোমার কী মনে হয় বল তো?'

'কী ব্যাপারে?'

'এই মেজ খুকির চাকরি কথা বলছি। কাজটা কি ওর হবে?'

'আমি কেমন করে বলি—' রাজা হাসতে চেষ্টা করল।

জয়ার মা বলতে লাগল, 'তা বটে। তুমি কেমন করে বলবে। তবে শুনেছিলাম, রমলার ওখানে খুব হাত আছে। চাকরিটা হয়ে যেতেও পারে।'

রাজা চুপ করে থাকল।

হঠাৎ কী মনে পড়তে জয়ার মা বলল, 'ওই দেখ, সমানে বকবক করে যাচ্ছি। চা-টা কিছুই দেওয়া হয় নি। প্রথম দিন এলে—'

জয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আমি যাচ্ছি মা। চায়ের জল চড়িয়ে দিই গে।'

জয়ার মা বলল, 'নানা, তুই কথা টথা বল, আমিই চা করে আনছি।'

রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চায়ের দরকার নেই।'

জয়ার মা শুনল না, বাইরে বেরিয়ে গেল।

একটু চুপচাপ। তারপর রাজাই প্রথম বলল, 'দেখলেন, আপনাদের বাড়ি ঠিক চলে এলাম।' বলে হাসল।

আঙুলের ডগায় আঁচল জড়াতে জড়াতে মৃদু গলায় জয়া বলল, 'তাই তো দেখছি। সে-ও হাসল, 'আমি কিন্তু সত্যিসত্যিই ভাবতে পারি নি আপনি আসবেন।'

'কেন?'

'তা জানি না।'

'তবু?'

জয়া বলল, 'অনেকে দেখা হলে বলে, আসবে। কিন্তু আসে না।'

রাজা বলল, 'আমি কিন্তু যা বলেছি তা-ই করেছি।'

জয়া হেসে ফেলল, 'আপনি শুধু কথার মানুষ না, কাজের মানুষও।'

'বলছেন?'

রাজার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়েই মুখ নামাল জয়া। কিছু বলল না।

খানিকটা সময় কেটে গেল।

হঠাৎ রাজার মনে হল, বাড়িটা বড় বেশি নির্জন। এতক্ষণ এসেছে, জয়া এবং জয়ার মাকে ছাড়া আর কাউকে এখনো দেখে নি। অথচ জয়া বলেছিল, তার তিন চারটে ভাইবোন। বড় বোন পাগল। রাজা তাদের খোঁজ নিতে যাবে, জয়া জিজ্ঞেস করল, 'রমলাদিকে সেদিনকার খবরটা দিয়েছিলেন?'

রাজা ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ।'

'কিছু বললে?'

'কি আর বলবে। মিছিল ফিছিল বেরুলে লোক যায় কী করে?'

বিষণ্ণ মুখে জয়া বলল, 'ও চাকরিটা আমার হবে না। প্রথম থেকেই বাগড়া পড়ছে। দু দু'বার ইন্টারভিউ পেলাম। একবারও অফিস পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলাম না। আর কি রমলাদি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করবে?'

রাজা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, সেদিনের পর রমলাদি আপনাদের বাড়ি আর এসেছিল?'

'না। কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

জয়া বলল, 'রমলাদি আর আসবে না। নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছে!'

রাজার গলার ভেতর বিড় বিড় করল, 'মাগী আবার আসবে না! তোমাকে খাবার জন্যে ঠিকই আসবে।' তার কথা অবশ্য জয়া শুনতে পেল না।

জয়া বলল, 'অথচ একটা কাজকর্ম না হলে আর চলছে না। যে করে হোক, একটা চাকরি আমায় পেতেই হবে। কিন্তু কোথায় যে পাব!'

রাজা দুম করে বলল, 'আচ্ছা, রমলাদির ওই চাকরিটা ছাড়া যদি অন্য চাকরি পান, করবেন?'

'বা রে, কেন করব না? আপনার খোঁজে আছে নাকি?'

জয়ার মা চায়ের কাপ আর হালুয়ার প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। রাজার সামনে একটা দাগ-ধরা নোংরা

টেবিলে সেগুলো রাখতে রাখতে বলল, 'চাকরির কথা কী বলছিলে? আসতে আসতে যেন শুনলাম—'

সকাল থেকে এখন পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ে নি; খিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছে। কাপ প্লেট থেকে ভেলিগুড়ের চা এবং ঠাণ্ডা ডেলা-পাকানো হালুয়া থেকে ডালডার গন্ধ উঠে আসছে। লোভী চোখে খাবার দেখতে দেখতে যা-যা কথা হচ্ছিল, রাজা বলল।

জয়ার মা-ও জিজ্ঞেস করল। তার হাতে চাকরি-বাকরির সন্ধান আছে কিনা।

রাজা ভাবল, এই সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। বলল, 'আছে একটা। তবে—'

আগ্রহে জয়ার মায়ের চোখ চকচক করতে লাগল, 'তবে কী?'

'আপনাদের পছন্দ হবে কিনা, জানি না।'

'বলে পেটে ভাত নেই, তার আবার পছন্দ অপছন্দ। কী চাকরি?'

'বড়লোক মারোয়াড়ীর বাড়ি দু'টো বাচ্চাকে পড়াতে হবে। দেড়শ টাকা করে মাইনে দেবে।'

'মারোয়াড়ীর বাড়ি কোথায়?'

'আমাদের ওখানে—শ্যামনগরে—'

'তুমি ওই চাকরিটাই জোগাড় করে দাও। এখান থেকে যাতায়াতের অসুবিধে নেই। বাসেই যাক আর ট্রেনেই যাক, মিনিট দশেকও লাগবে না।' জয়াব মা বলতে লাগল, 'আপাতত এটা পাওয়া গেলে নিয়ে নিক। পরে রমলারটা পেলে না হয় ছেড়ে দেবে।'

রাজা বলল, 'এটা পাবেই যে তা বলছি না। তবে চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'সে তো একশ' বার।'

এক চামচ হালুয়া মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে রাজা ভয়ে ভয়ে বলল, 'তা হলে তো একদিন শ্যামনগর যেতে হয়। মারোয়াড়ীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে নিতে হবে।'

জয়ার মা বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। কবে যেতে হবে বল।'

এত সহজে জয়াকে শ্যামনগর নিয়ে যাওয়া যাবে, রাজা ভাবতেই পারে নি। তার ধারণা ছিল, অনেক ধানাই পানাই টানাহ্যাঁচড়া করতে হবে। সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে উৎসাহের গলায় সে বলল, 'কাল যেতে পারবেন?'

জয়ার মা বলল, 'কাল কখন?'

একটু ভেবে নিয়ে রাজা বলল, 'ধরুন সকালের দিকে। ফার্স্ট ট্রেনে যেতে পারলেই ভাল হয়।' ফাদার ডোনাল্ডসের কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছিল। দুপুরবেলা গেলেও তাঁকে ধরা যায়, তবু সকালে যাওয়াই ভাল।

রাজা আবার বলল, 'তবে শীতকাল। অত ঠাণ্ডায় কি ফার্স্ট ট্রেন ধরতে পারবেন?'

জয়া বলল, 'কেন পারব না? দু' পা গেলেই স্টেশন। চাকরির ব্যাপার, যেতেই হবে।'

জয়ার মা বলল, 'সে তুমি কিছু ভেবো না। যাতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

রাজা বলল, 'আচ্ছা—' জয়ার দিকে ফিরে, 'আপনি একা একা যেতে পারবেন তো?'

জয়া বলল, 'একটা তো মোটে স্টেশন। পারব না কেন? আপনি আমাকে কী ভাবেন বলুন তো? খুব ছেলেমানুষ?' বলে হাসল।

রাজাও হাসল।

জয়ার মা বলল, 'বাইরে বেরুবার অভ্যেস ওদের কোনোকালেই নেই। তবে কিনা প্রাণের দায় বলে কথা। বেরুতেই হবে। তুমি ভেবো না, ও ঠিক চলে যেতে পারবে।'

জয়া বলল, 'যেতে তো বললেন কিন্তু স্টেশনে নেমে কোথায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

'এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে অনেকগুলো সিমেন্টের বেঞ্চি আছে। আপনি তার একটায় বসে থাকবেন। আমি আপনাকে ওখান থেকে নিয়ে যাব।'

'ঠিক যাবেন তো?'

জয়ার মা বলল, 'তোর যেমন কথা। ছেলেটা নিজে যেচে চাকরির খবর এনেছে। সে কিনা স্টেশনে তোকে বসিয়ে রাখবে! তার একটা দায়িত্ব নেই?'

জয়া উত্তর দিল না।

রাজা চা আর হালুয়া শেষ করে বলল, 'এ ব্যাপারে আমার একটা কথা আছে।'

জয়ার মা সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকালে, 'কী?'

'আমি যে চাকরির খোঁজ নিয়ে আপনাদের বাড়ি এসেছিলাম, তা কিন্তু রমলাদিকে বলবেন না।'

জয়ার মায়ের চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। সন্দিগ্ধ, চাপা স্বরে সে বলল, 'কেন বল তো?'

'না মানে—' একটা ঢোক গিলে রাজা বলল, 'ব্যাপারটা হল গিয়ে, রমলাদি তো একটা চাকরির চেষ্টা করছে। আমি আরেকটার খোঁজ এনেছি। রমলাদির সঙ্গেই আপনাদের বেশি আলাপ টালাপ। আমার কথা শুনলে হয়তো কিছু মনে করবে। বলবে, দেখ ওস্তাদি মেরে রাজাটা আমার ওপর দিয়ে ওদের উপকার করতে গেছে। এই আর কি—'

জয়ার মা স্থির তাকিয়ে ছিল। এখন তার সেই চোখ যা বিশ্বাসও করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না।

রাজার অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, জামার তলায় কিছু একটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। জড়ানো গলায় সে বলল, বিশ্বাস করুন, আমার কোনো খারাপ মতলব নেই। মা কালীর দিব্যি—'

জয়ার মা আস্তে আস্তে বলল, 'অবিশ্বাস করে আর কী করব! এমনিতে তো ডুবতেই বসেছি। যে কুটোটা হাতেব কাছে পাই আপাতত সেটা ধরেই বাঁচতে চেষ্টা করি। তারপর কপালে যা আছে, হবে।' রাজার সামনে থেকে শূন্য কাপ প্লেটগুলো তুলে জয়ার মা চলে গেল।

কোথায় কোন অদৃশ্যে যেন তাল কেটে গিয়েছিল। রাজা এবং জয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ সেই কথাটা আবার মনে পড়ে যাওয়ায় রাজা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনার ভাই-বোনদের তো দেখছি না!'

জয়া মুখ নিচু করে নখ খুঁটছিল। সহজভাবে রাজার দিকে তাকাতে পারছিল না সে। মা যেন কী! ওভাবে মুখের ওপর কেউ কাউকে বলে! মুখ না তুলেই আবছা গলায় জয়া বলল, 'ওরা ভেতর দিকের ঘরে আছে।'

'ডেকে আনুন না—'

জয়া দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'নান্টু, পুতুল, সুনু—'

একটু পরে দুড়দাড় করে তিনটি ছেলেমেয়ে এঘরে এসে পড়ল। আট থেকে চোদ্দর ভেতর বয়স। ওদের চোখেমুখে জয়ার আদলটি যেন বসানো। জয়ার মতোই ওরা সুশ্রী, তবে রোগা রোগা। দেখেই চেনা যায়, জয়ার ভাইবোন।

বাড়িতে নতুন লোক দেখে ছেলেমেয়ে তিনটে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঈষৎ ভীরু লাজুক এবং কৌতূহলী চোখে তারা রাজার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হলেই মুখ নামিয়ে নিচ্ছে।

রাজা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'নান্টু—'

'তোমার?'

'পুতুল—'

'তোমার?'

'সুনু—'

'কী করছিলে?'

'পড়ছিলাম।'

'কোন ক্লাসে পড় তোমরা?'

নান্টু বলল, 'এইটে।' পুতুল বলল, 'ফাইভে।' সুনু বলল, 'থ্রিতে।'

জয়া এই সময় বিষণ্ণ সুরে বলল, 'ওদের কথা আপনাদের বলেছিলাম। অভাবের জন্যে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। এখন বাড়িতেই পড়ছে। আমি যা পারি, দেখিয়ে দিই।'

রাজার খুব কষ্ট হতে লাগল। লেখাপড়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব মধুর নয়। এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তবু মনে পড়ে গেল, ক্লাস এইটে উঠবার পর শুধু ক'টা টাকার জন্য তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আর আড্ডা দিতে দিতে জীবনটা কিরকম হতচ্ছাড়া মার্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল রাজা। তারপর পড়াশোনার কথা বাদ দিয়ে আলতো করে জিভ কেটে বলল, 'এ হেঃ, একটা কথা একদম ভুলে গেছি।'

জয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

'আপনাদের বাড়ি ফার্স্ট এলাম। আপনার ভাইবোনদের কথা মনে ছিল না। নান্টুদের জন্যে বিস্কুট-লজেন্স কিছু আনলে ভাল হত। কাছাকাছি দোকান ফোকান আছে?'

'কেন বলুন তো?

'ঝট করে নিয়ে আসছি।'

'বিস্কুট টিস্কুটের দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'মনটা কিন্তু বড্ড খুঁত খুঁত করছে।'

'আপনি চুপ করে বসুন তো।'

রাজা ঠোঁট উলটে হাসল। হাত ঘুরিয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। অর্থাৎ বসে না থেকে কী আর করা যাবে।

জয়া নান্টুদের বলল, 'তোরা পড় গে—'

নান্টুরা চলে গেল।

আরো খানিকক্ষণ এলোমেলো কথা বলে রাজা উঠে দাঁড়াল। জয়া বলল, 'উঠলেন যে?'

'বা রে, কতক্ষণ এসেছি হুঁশ আছে? ঝাড়া দু'ঘণ্টা আপনাদের বাড়ি থেকে গেলাম।' রাজা দরজার দিকে পা বাড়াল।

জয়া বলল, 'এখুনি যাবেন?'

রাজা মাথা নাড়ল। ঘরের বাইরে এসে বলল, 'আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাই। কোথায় আছে?'

জয়া তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, 'মাকে ডাকছি।' কিন্তু ডাকবার আগেই ডান দিকের একখানা ঘর থেকে তীক্ষ্ণ অমানুষিক হাসির একটানা আওয়াজ এল।

রাজা চমকে উঠল, 'কী—কী ব্যাপার? কে হাসছে বলুন তো অমন করে?'

জয়ার মুখ গাঢ় ছায়ায় ঢেকে গেল হঠাৎ। অবসন্ন করুণ গলায় সে বলল, 'আমার দিদির কথা আপনাকে বলেছিলাম না?'

রাজা মনে করতে পারল, 'হ্যাঁ। বলেছিলেন পাগল?'

জয়া বলতে লাগল, 'মাঝে মাঝে ওইরকম হেসে ওঠে দিদি, কখনও কাঁদে।'

রাজা উত্তর দিল না।

জয়া কী ভাবল, কে জানে। রাজার দিকে তাকিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, 'দিদিকে একবার দেখে যাবেন নাকি?'

হাসির শব্দটা আসছিলই! রাজা বলল, 'কী হবে দেখে?'

জয়া ম্লান হাসল, 'এসেছেন যখন দেখেই যান। কী সুখে আছি, খানিকটা বুঝতে পারবেন।'

রাজা আর আপত্তি করল না। কিসের ঘোরে কে জানে, জয়ার সঙ্গে ডান দিকের একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকে শেকল তোলা। ভেতরে জানালার গরাদ ধরে জয়ার চাইতে পাঁচ ছ'বছরের বড়, জয়ার চাইতে অনেক সুশ্রী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনের কাপড়টা আধময়লা, পুরনো মোটা ছিটের ব্লাউজটার কাঁধ ছেঁড়া। সরু সরু আঙুলগুলোর মাথায় বড় বড় নখ। সুন্দরী হলেও

মুখটা শীর্ণ, রোগাটে। কণ্ঠার হাড় চামড়ার তলা থেকে গজালের মতো ফুটে বেরিয়েছে। ঘাড়ে, গলায়, কাঁধের কাছে চাপ চাপ ময়লা জমে আছে। চুলগুলো রুক্ষ, জটপাকানো। কতকাল যে মাথায় তেল-ফেল পড়ে নি! ঘন পালকে-ঘেরা বড় বড় চোখ দু'টোয় জীবনের আভা নেই। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, স্থির। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মরা মানুষের চোখ। জয়ার সঙ্গে অচেনা নতুন একটি যুবককে দেখে জয়ার দিদির হাসি থমকে গেল। শান্ত শীতল চোখে রাজাকে কিছুক্ষণ দেখল সে। তারপর বলল, 'ছেলেটা কে রে জয়ী? আগে তো দেখিনি—'

জয়া অল্প কথায় রাজার পরিচয় দিল।

জয়ার দিদি বলল, 'বেশ।' পরক্ষণেই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'ওকে চা দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু চা?'

'না, হালুয়াও দিয়েছিল মা।'

'হালুয়া! কেন, রসগোল্লা টসগোল্লা এনে দিতে পারিস নি?'

জয়া চুপ। রাজার দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল, 'না-না, রসগোল্লা আবার কিসের?'

জয়ার দিদি উত্তর দিল না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় পা ফেলে উলটোদিকের জানালার কাছে চলে গেল। তারপর মৃতের চোখের মতো অসাড় দৃষ্টিতে দূর গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু পর খিল খিল করে তীক্ষ্ণ রিনরিনে গলায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো হেসে উঠল।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়া বলল, 'চলুন—'

পাশাপাশি যেতে যেতে রাজা গলার ভেতর ফিস ফিস করল, 'আমাদের সঙ্গে যখন আপনার দিদি কথা বলছিল তখন বেশ ভাল মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু—'

'ওই তো মজা। একেক সময় বুঝতেই পার যায় না, ও পাগল।'

'পাগল হল কেন?'

'কী জানি। ছেলেবেলা থেকে দিদিকে ওইরকম দেখছি।'

'ডাক্তার দেখান নি?'

'বাবা বেঁচে থাকতে কম চিকিৎসা করানো হয়েছে! আমাদের ফ্যামিলি দিদির জন্যে শেষ হয়ে গেল।'

'কিছু ফল হল না?'

'তেমন কিছু না। তবে—'

'কী?'

'ডাক্তাররা সবাই বলেছিল, দিদির বিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়ে যেত।'

অনেকখানি ঝুঁকে আগ্রহের গলায় রাজা বলল, 'বিয়ে দিলেই তো পারতেন—'

জয়া করুণ হাসল।

রাজা বলল, 'হাসলেন যে?'

জয়া বলল, 'আপনি খুব ছেলেমানুষ।'

'কেন?' রাজা থতিয়ে গেল যেন।

'মুখের কথা বার করলেই যদি বিয়ে হয়ে যেত, ভাবনা ছিল না। জেনেশুনে কে পাগলকে বিয়ে করবে বলুন—'

'না জানিয়ে দিলেই পারতেন।'

'সংসার সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা খুব কম।'

'কিরকম?'

'পরে ধরা তো পড়তই। বিয়ের সময় কিংবা মেয়ে দেখবার সময় যদি দিদির পাগলামি চাপত, তখন? তাছাড়া আত্মীয়স্বজনদের ভেতর শত্রু টত্রু কম নেই। বিয়ের আগেই ছেলেপক্ষকে জানিয়ে দিত। কেলেঙ্কারি হওয়ার চাইতে বিয়ে না দেওয়াই ভাল।'

রাজা এতটা তলিয়ে ভাবেনি। ঝোঁকের মাথায় বিয়ের কথা বলে ফেলেছিল। মাথা হেলিয়ে এবার বলল, 'আপনার কথাই ঠিক। বিয়ে দিলে শ্লা আরেক ফ্যাকড়া বেধে যেত। আমি যেন কী, মাথার ভেতর ঘুঁটে পোরা। সব জিনিস লেটে ব্রেনে ঢোকে।'

জয়া চুপ।

কথায় কথায় তারা বারান্দা ঘুরে প্রকাণ্ড ঢালা উঠোনের মাঝখানে চলে এসেছিল। হঠাৎ রাজা বলল, 'এই যাঃ—'

জয়া বলল, 'কী হল?'

'আপনার মা'র সঙ্গে তো দেখা করলাম না—'

জয়া ওখান থেকেই ডাকতে লাগল, 'মা—মা—'

উঠোনের বাঁ দিকের শেষ মাথায় রান্নাঘর। সেখান থেকে জয়ার মায়ের গলা ভেসে এল, 'কী বলছিস জয়ী?'

'একটু বাইরে এস।'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে জয়ার মা রান্নাঘর থেকে উঠোনে নেমে এল।

রাজা বলল, 'আমি এখন যাচ্ছি মাসিমা—' এই প্রথম জয়ার মাকে মাসিমা বলল সে। বলেই মনে হল, শব্দটা নিজের কানে খচ করে বিঁধে গিয়েছে। তার পরেই ঝুঁকে জয়ার মায়ের পা ছুঁল।

জয়ার মা তার মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'আবার এস। আর জয়ার চাকরিটা যাতে হয়, দেখ—'

'নিশ্চয়ই।' রাজা আর দাঁড়াল না, সদর দরজার দিকে যেতে লাগল। জয়া তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জয়ার মা তাদের সঙ্গে এল না, রান্নাঘরে ফিরে গেল।

বাড়ির বাইরে গিয়ে রাজা আরেকবার মনে করিয়ে দিল, 'কালকে ফার্স্ট ট্রেন ধরবার কথা ভুলে যাবেন না যেন—'

'আমার বলে নিজের গরজ। কী যে বলেন, ভুলে যাব!' জয়া হাসল।

রাজা দু' পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, 'সেই কথাটা মনে আছে?'

'কোনটা?'

'ওই যে রমলাদিকে আমার আসার কথা বলতে বারণ করেছি।'

পলকহীন, স্থির চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে করে মাথা হেলিয়ে দিল জয়া, 'আছে।'

রাজা বলল, 'আপনার মাকেও একটু বুঝিয়ে বললেন, রমলাদিকে আমার কথা যেন না বলে। বুঝতেই তো পারছেন। শুধু শুধু ঝুটঝামেলা বাধিয়ে কী লাভ!'

'আচ্ছা।' রাজা চলে গেল।

চোদ্দ

শহরতলির ডাউন ট্রেন ধরে রাজা যখন শ্যামনগর ফিরল, বেশ বেলা হয়েছে। ন'টা সাড়ে ন'টার মতো হবে। শীতের রোদ বলেই হিমের ভাবটা তেমন কাটে নি, তবু উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ছেয়ে গিয়েছে।

স্টেশনে খুব ভিড়। শ্যামনগরের অফিস-যাত্রীদের মন কলকাতার দিকে এখন উড়ু উড়ু। ভিড় টিড় কাটিয়ে বাইরে এল রাজা। তারপর সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড পেছনে ফেলে বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাজারপাড়ায় গণেশ সাধুখাঁর 'শোভা কাফে'তে এসে পড়ল।

ভোরবেলা যখন সে সামনের রাস্তা দিয়ে স্টেশনে গিয়েছিল তখন 'শোভা কাফে' ফাঁকা। অত সকালে কে আর লেপের মায়া ছেড়ে হি হি কাঁপতে কাঁপতে আড্ডা মারতে আসবে। এখন কিন্তু গণেশ সাধুখাঁর রেস্টুরেন্ট জমজমাট। সেই নির্দিষ্ট কোণটিতে অবশ্য তুলসী এবং গৌর ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না রাজা।

রাজাকে দেখে ওরা দু'জন হল্লা করে উঠল, 'কি রে, আজ এত লেট যে?'

অন্য দিন আটটার ভেতর চলে আসে সবাই। রাজা বলল, 'একটু কাজ ছিল মাইরি—'

'কী কাজ?'

'এই বাড়ির—'

'বাড়ির কাজ তো বুঝলাম। কিন্তু এলি তো স্টেশনের দিক থেকে। ব্যাপারটা কি মানিক—' হাত ঘুরিয়ে রগড়ের ভঙ্গি করল তুলসী।

কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল রাজা। কিন্তু তুলসীদের তা জানতে না দিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'বাড়ির কাজ বলে কি বাড়িতেই লটকে থাকতে হবে? বাড়ির কাজ বাইরে হতে নেই? এমন খিস্তি করতে ইচ্ছে করে না?'

বোঁ করে এক পাক নেচে তুলসী বলল, 'কর মাইরি, খিস্তিই কর। সক্কাল বেলা একটু কেষ্টবুলি শুনি—'

রাজা বলল, 'শ্লা যেন জাম্বুবানের ছানা—'

'বাপ তুললি?'

'হ্যাঁ, তুললাম।'

চুক চুক করে জিভের ডগায় অদ্ভুত শব্দ করল তুলসী। বলল, 'কর হারামী, বাপকে দিয়েই শুরু কর—'

রাজা তাকে গ্রাহ্য না করে চেঁচিয়ে বলল, 'গণেশদা, তিনটে ডবল হাফ দিতে বল—'

চা এলে চুমুক দিতে দিতে রাজা বলল, 'তোরা দুই শ্লা বসে আছিস, রতনারা কোথায়?'

'কে জানে। আমরা এসে ওদের দেখিনি—' গৌর বলল।

খিস্তির সঙ্গে চা খেতে খেতে খানিকটা সময় কাটল। আড্ডা যখন জমতে শুরু করেছে সেইসময় রতন আর পল্টু 'শোভা কাফে'তে এসে ঢুকল।

রোড কন্ট্রাক্টরের বাচ্চা তুলসীটা স্রেফ টুকলিফাই করে স্কুল ফাইনাল পাশ করে গিয়েছিল। ক'মাস কলেজেও যাতায়াত করেছিল, তারপর ইস্তফা দিয়েছে।

সে সব কবেকার কথা, কিন্তু তুলসী হারামজাদা গায়ে এখনো কলেজের গন্ধ লাগিয়ে রাখতে চায়। কথায় কথায় শালার এন্তার ইংরেজি। ভুল ভালই ঝাড়ে বোধ হয়। সে বলল, 'কোত্থেকে রাইজ করলে বাওয়া?'

চোখের তারা নাচিয়ে রতন বলল, 'নবীপুরকা আশমানসে—'

নবীপুর বলতেই বুকের ভেতর চমক খেলে গেল রাজার। সক্কালবেলা উঠে রতন তার পিছু নিয়েছিল নাকি? ও হারামী পারে না, এমন কাজ নেই। ভয়ে ভয়ে রাজা বলল, 'নবীপুর গেছিলি নাকি?'

'জি সাব—'

'কেন রে?'

'থোড়েসে কাম থা জনাব।'

রগরগে হিন্দ ছবি আর বম্ব মার্কা ফাইট পিকচার দেখে দেখে রতনটা ঘুণ হয়ে গিয়েছে। মুখ খুললেই উড়ন তুবড়ির মতো তোড়ে হিন্দি বেরিয়ে আসে। রাজা শুধলো, 'কী কাজ?'

রতন বলল, 'ধান্দামে গিয়া থা—'

'কিসের ধান্দা চাঁদ?'

'পহলে চায় তো পিলাও, উসকে বাদ ধান্দেকা বাত—'

রাজা চেঁচিয়ে বলল, 'গণেশদা, আর দু'টো ডবল হাফ—'

'স্রিফ চায়?' রতন দু' হাত চিত করে কাঁধ ঝাঁকাল, 'কমসে কম এক আন্ডাকে মামলেট, দো পিস রোট্টি—'

চাপা গলায় একটা খিস্তি দিয়ে দাঁত খিঁচলো রাজা, 'মামলেট, রুটি! আমার বাবার তেলকল আছে, না? খেতে হলে নিজের পয়সায়। পরের গাঁট খসিয়ে ফোকটাই অত হয় না, বুঝলে বাওয়া—'

'আপকো মর্জি—' সার্কাস পার্টির ক্লাউনের মতো মুখের ভাব করে ঝপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রতন।

চা খাওয়া হলে রাজা তাড়া লাগাল, 'এবার বল তো মানিক, কোন ধান্দায় নবীপুর গিয়েছিলে?'

একপলক রেস্টুরেন্টটা ভাল করে দেখে নিয়ে খুব নিচু গলায় রতন বলল, নবীপুরমে মাল আয়া—'

রাজা-তুলসী-গৌর, সবার চোখ চকচকিয়ে উঠল। রতনের ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে ওরা বলল, 'কী, কী মাল?'

'তামাকা তার—'

'তামার তার?'

'জি মহারাজ—' রতন বলতে লাগল, 'অয়ারিং-এর জন্যে এনেছে, লাগাবার আগেই হাফিস করে দিতে হবে।'

তুলসী শুধলো, 'কবে?'

'পরশু দিন থেকে অয়ারিং-এর কাজ শুরু হবে।'

'তা হলে তো আজ কি কাল রাত্তিরেই অপারেশন করতে হয়।'

'জি। নইলে—'

দু' হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে রতন বলল, 'এই দু'টো চুষতে হবে।'

তুলসীরা হাসল, 'যা বলেছিস।'

একটু চুপ।

কিছু একটা মনে পড়তে তুলসী শুরু করল, 'একটা কথা আছে মাইরি—'

সবাই তার চোখের দিকে তাকাল, 'কী?'

'জগা শালাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।'

'কোন জগা?'

'জগদীশ—জগদীশ কালোয়ার। হারামীর বাচ্চাটা হাফিস-করা মালের জন্যে যা দেয় তাতে চলে না। রস চুষে খানকির ছেলেটা নাকের ডগায় ছিবড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।'

গৌর বলল, 'কিন্তু এ ছাড়া তো গতি নেই।'

'একটা গতি করতে হবে।'

'কী করবি?'

'ভাবছি কলকাতার কোনো দোকানের সঙ্গে ব্যবসা করব।'

'সে অনেক ঝামেলা।'

রাজা বলে উঠল, 'ঝামেলা বলে ঝামেলা। একে শ্লা মাল হাফিস করতেই লাইফ পাংচার হয়ে যায়। তার ওপর পুলিশের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আবার কোন ক্যাঁচাকলে পড়ে যাব—'

তুলসী বলল, 'সে একটা কথা—'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তুলসী আবার কী বলতে যাচ্ছিল, দুটো মেয়ে 'শোভা কাফে'তে এসে ঢুকল। একজনের নাম বিজলী, আরেক জনের নাম সুলতা। বিজলী বেশ মোটাসোটা, গোলগাল। চব্বিশ পঁচিশের মতো বয়স; এর ভেতরেই সারা গায়ে প্রচুর মাংসটাংস জমিয়ে ফেলেছে। মেয়েটার হাত-পা-নাক-মুখ এবং বুক, সবই বড় বড়। ফাঁপানো চুল কায়দা করে বাঁধা, দু'গালের ওপর ফিল্মস্টারদের মতো দু গোছা চুল ঝুলছে। এই শীতেও কাঁধ-কাটা ছোট ব্লাউজ। তার ওপর নাইলনের পাতলা শাড়ি। শাড়িটা আবার কোমরের কাছে কোনোরকমে আটকানো। শাড়ি আর ব্লাউজের মাঝখানে কালো পেট। গোল চোখ দু'টোয় কাজলের শানানো টান। ঘাড়ে-গালে-গলায় এক ইঞ্চি পুরু পাউডার আর ক্রিম। কমলা-কোয়ার মতো ভারি ঠোঁট আর লম্বা ছুঁচলো নখ রক্তবর্ণ। তবু তাকে ঘিরে আলগা একটা চটক আছে। সুলতা বিজলীর মতো মোটা নয়। রংটিও ফর্সা। পাতলা শরীর, সরু কোমর কিন্তু বুক বেশ ভারী এবং

কোমরের তলায় বিশাল সুগোল অববাহিকা। সাজটাজ দু'জনেরই একরকম। ডিসেম্বরেও তাদের গায়ে জামাকাপড় এত কম আর স্বচ্ছ যে মনে হয়, মেয়েদু'টো শীত-বিজয়িনী।

সুলতা আর বিজলীকে শ্যামনগরের রাস্তায়, সিনেমায়, রেস্টুরেন্টে, রেল-স্টেশনের কাছে যখন তখন দেখা যায়। এমন কি মাঝরাত্তিরেও কোনো কোনো দিন চোখে পড়ে, দুই সখি হাত ধরাধরি করে ঘুরছে। ছুঁচের সঙ্গে সুতোর মতো বিজলীর সঙ্গে সুলতা সবসময় আছেই। ডাউন ট্রেন ধরে মাঝে মাঝে কলকাতায় পর্যন্ত চলে যায় ওরা। ফেরে শেষ গাড়িতে। ছেলেদের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা রকে কি চায়ের দোকানে ওরা আড্ডা দিতে পারে। গালের ভেতর আঙুল পুরে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সিটি দিতে পারে। সিগারেট টেনে নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়ার আংটি ছাড়তে পারে। আর পারে চুটিয়ে খিস্তি করতে।

রাজাদের সঙ্গে ওদের সদ্ভাবও নেই, আবার শত্রুতাও নেই। এক শহরে থাকে, ছেলেবেলা থেকে মুখচেনাটা আছে। কথা টথাও হয়। তবে তুলসীটা ওদের পেছনে লাগে খুব।

বিজলীরা রাজাদের দেখতে পেয়েছিল। ভুরুতে তিন চারটে ঢেউ তুলে বিজলী বলল, 'আ রে তোরা!'

রাজা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা।'

'তোরা এখানে!'

'লে বাবা, আমরা যে এখানে দিনরাত ঘাঁটি গেড়ে আছি তা যেন জানিস না? কত নকশা যে শিখেছিস—'

মুখ মুচকে একটু হাসল বিজলী। একটা চেয়ার টেনে ঝপ করে বসে পড়ল। তার পাশাপাশি সুলতাও বসল।

বিজলী বলল, 'আজ বড্ড ঠাণ্ডা মাইরি—'

তুলসী চোখ টিপল, 'তোদের আবার ঠাণ্ডা কি?'

'কেন, আমরা মানুষ না?'

'উঁহু—'

'তবে কী?' বিজলীর দুই ভুরুর মাঝখানটা এবং চোখ কুঁচকে যেতে লাগল।

'টাটার ফার্নেস—'

টেবিলে চাপড় মেরে রতন চেঁচিয়ে উঠল, 'শ্লা, কাবাবমে হাড্ডি।' বাকি সবাই হুল্লোড় করে হেসে উঠল।

বিজলী ঠোঁট কামড়ে চড় তুলল, 'শালা বদমাশ—' বোঁ করে সরে গিয়ে মাথা বাঁচাল তুলসী।

যে হাতটা চড়ের জন্য উঠেছিল সেটাই চিত করে সামনে পেতে দিল বিজলী, 'দে মাইরি, একটা সিগারেট দে। একেবারে জমে গেলাম—'

চোখের কোণ দিয়ে বিজলীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে দেখতে চাপা ঘন গলায় তুলসী ফিস ফিস করল, 'সারা গায়ে ওইরকম ভেন্টিলেটার খুলে রেখেছিস। জমে যাবি না তো কী?'

ঠোঁট ছেতরে দিয়ে চোখ কুঁচকে হাসতে লাগল বিজলী। একটা খিস্তি দিয়ে বলল, 'সিগারেট বার কর, কুইক—'

তুলসী সিগারেটের প্যাকেট বার করতেই ছোঁ মেরে একটা তুলে নিয়ে বিজলী ঠোঁটের ভেতরে গুঁজে দিল। রাজা লাইটার দিয়ে সেটা ধরিয়ে দিল।

তুলসী সিগারেটের প্যাকেটটা আবার পকেটে পুরতে যাচ্ছিল। সুলতা হাত বাড়াল, 'যাঃ বাবা, আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এলাম। দে—'

বেজার মুখে আরেকটা সিগারেট বার করতে করতে তুলসী বলল, 'যাঃ শালা, সক্কালবেলা দু'টো সিগারেট গচ্চা হয়ে গেল।'

বিজলী বলল, 'কি রে, শুধু ধোঁয়াই গেলাবি? চা-ফা খাওয়া।'

সুলতা বলল, 'আমি মাইরি একটা ডবল ডিমের মামলেট খাব। আর ডবল হাফ চা—'

রাজা বলল, 'তোর যে দেখছি সবই ডবল ডবল রে—'

তুলসী গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত চাপা স্বরে বলল, 'আর কিছু খাবি না?'

তার বলার মধ্যে এমন একটা কিছু মাখানো যে সবাই হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠল। নাক কুঁচকে কুঁচকে বিজলীরাও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বিজলী বলল, 'তুই পগেয়া হারামী হয়ে উঠেছিস তুলসী।'

'যা বলেছিস—'

তারপর চা এল, ডিমের অমলেট টমলেট এল। খেতে খেতে বিজলী বলল, 'মামলেটটা কড়া ভেজেছে। যা টেস্ট মাইরি—'

তুলসী বলল, 'আর কদ্দিন এরকম চালাবি?'

'এ রকম বলতে ?' চোখের তারা কোণের দিকে এনে বিজলী তাকাল।

'এই পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়া। কী একখানা হ্যাবিট যে করেছিস মাইরি! চালা চালা, যদ্দিন পারিস চালিয়ে যা—'

বিজলীরা উত্তর দিল না। হাসতে লাগল।

রাজা বলল, 'পরের ট্যাঁক খসিয়ে খসিয়ে যা একটা জিনিস হয়ে উঠেছিস বিজলী, কী বলব! একেবারে ডবল ডেকার—'

বিজলী ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা, গোলগাল। ডবল ডেকারের উপমা দিয়ে রাজা তাকে খোঁচা দিয়েছে। মেয়ে-বেড়ালের মতো বিজলী ফ্যাঁস করে উঠল, 'ডবল ডেকার হব না তো তোর মতো শুকনো আমসি হয়ে থাকব!'

রাজা এবার সুলতার দিকে ফিরল, 'বিজলীটা পরের ঘাড় মটকে ডবল ডেকাব হয়ে উঠেছে। তুই কিন্তু সেই সাইকেলের টায়ার হয়েই রইলি। গায়ে একটু মাংসফাংস, চর্বি টর্বি লাগা।'

সুলতা বলল, 'মাংস লাগিয়ে ধুমসি হয়ে মরি আর কি। এই বেশ আছি। বাবা, মুটকি হয়ে আর দরকার নেই।'

আচমকা গৌর ডেকে উঠল, 'অ্যাই বিজলী—'

বিজলী মুখ ফেরাল, 'কী?'

'পরশুদিন সন্ধেবেলা তুই আর সুলতা, কোথায় ছিলি রে?'

'কোথায় আবার থাকব—'

'বল না, কোথায় ছিলি?'

'এখানেই ছিলাম।' না ভেবেটেবেই উত্তর দিল বিজলী।

ঠোঁট চিবোতে চিবোতে গৌর বলল, 'এখানে ছিলি! সন্ধেবেলা শ্যামনগরে পড়ে থাকবার জিনিসই তোমরা!' ঝপ করে গলা নামিয়ে ফেলল গৌর, 'সেই ছোঁড়া দু'টোকে কোত্থেকে জুটিয়েছিলি রে? দুই ব্যাটা যেন হরিয়ানার ষাঁড়—'

'কী বলছিস যা-তা—'

'যা-তা বলছি! পরশুদিন মেট্রো থেকে তোরা চারজন বেরুলি, চৌরঙ্গি ধরে পার্ক স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলি। বল, সব মিথ্যে?'

'মিথ্যেই তো—'

বিজলী এরকম উত্তর দেবে গৌর ভাবতে পারেনি। হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি শ্লা অন্ধ কিনা বুঝতে পারছি না।'

রাজা বলল, 'কেন মাইরি নকশাবাজি করছিস! বল্ না, ছোঁড়া দু'টোর কিরকম খসালি?'

হঠাৎ কী হয়ে গেল, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বিজলী। অন্য দিন এরকম কথা বললে সে রাগে না। বরং হেসে হেসে আরো খিস্তি দিয়ে দিয়ে ব্যাপারটাকে মজাদার করে তোলে। আজ একেবারে খেপে উঠল মেয়েটা। চোখের তারা দিয়ে আগুনের ফুলকি কাটতে লাগল। উত্তেজনায় ভারী গোল বুক ওঠানামা করতে লাগল। ধারাল গলায় বিজলী চেঁচাতে লাগল, 'আমাদের কী ভেবেছিস তোরা, হারামী কুত্তার দল। বল কী ভেবেছিস?'

রাজারা একেবারে থ।

বিজলীর গলা আরেক ধাপ চড়ল, 'আমরা বাজারের মেয়ে? অ্যাঁ, আমরা বাজারের মেয়ে?'

প্রথম দিকের হকচকানো ভাবটা কেটে গেলে রাজা তুলসী গৌররাও চিৎকার করতে লাগল, 'না রে, সগ্‌গের সতী নেমে এসেছিস! এই বাজারে দাঁড়িয়ে হাঁড়ি ফাটাব?'

বিজলীর দেখাদেখি সুলতাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। ওদিকে তুলসীরাও উঠে পড়েছে। দু' দলে তুমুল হল্লা আর চিৎকার শুরু হয়ে গেল। তার মধ্যে দুম করে এক কাণ্ড করে বসল বিজলী, রাগের মাথায় একটা চায়ের গেলাস তুলে রাজার দিকে ছুঁড়ে মারল। গেলাসটা রাজার গায়ে লাগল না, ওধারের দেওয়ালে লেগে চুরমার হয়ে গেল।

ওদের হল্লা-টল্লা আরম্ভ হতেই অন্য খদ্দেররা পালিয়ে গিয়েছে। কাউন্টার থেকে গণেশ সাধুখাঁ চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'অ্যাই তুলসী, অ্যাই রাজা, তোমরা কী করছ মাইরি? আমার ব্যবসাপত্তর লাটে তুলে ছাড়বে! অ্যাই বিজলী, গেলাস ভাঙলে! এমন করলে আমার চলে কী করে বল দিকিন? একটু বিবেচনা কর। ছা-পোষা গরিব মানুষ, একেবারে মরে যাব।'

গণেশের কথা কেউ গ্রাহ্যও করল না। দু' পক্ষে খিস্তি ফিস্তি চলতেই লাগল। আরো গোটাকয়েক গেলাস আর কাপ-প্লেট ভাঙল। তারপর দু' দলই হুড়মুড় করে 'শোভা কাফে' থেকে বেরিয়ে পড়ল।

গণেশ সাধুখাঁ কপাল চাপড়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে লাগল, 'আমার সর্বনাশ করে দিলে। এই রকম করলে আর কি খদ্দের ঢুকবে এখানে?' বয়গুলো কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজনকে বলল, 'অ্যাই ফটকে, ভাঙা গেলাসগুলো ঝাঁট দিয়ে ফ্যাল।'

এ জাতীয় ঘটনা 'শোভা কাফে'তে খুব বেশি ঘটে না। কেননা এখানকার শান্তিরক্ষায় তুলসীরা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ; একটা অলিখিত চুক্তি তাদের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই হয়ে আছে। তবু দুর্ঘটনাটা আজ ঘটে গেল।

পনের

'শোভা কাফে' থেকে বেরিয়ে তুলসীরা জোঁকের মতো বিজলীদের সঙ্গে লেগে রইল। রাজা কিন্তু ওদের সঙ্গে গেল না। 'কাজ আছে' বলে সোজা বাড়ি চলে এল। আসলে ওসব তার ভাল লাগছিল না।

বাড়ি ফিরে টুনিকে নিয়ে কিছুক্ষণ নাচানাচি করল রাজা। তারপর চান করে খেয়ে দেয়ে টানা একটা ঘুম লাগাল। বিকেলে উঠে গেল ননীদের বাড়ি। অনেকদিন ননীর খোঁজ নেওয়া হয়নি।

ননীর সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা দিয়ে রাজা যখন বাড়ি ফিরল, বেশ রাত হয়েছে। এবেলা আর 'শোভা কাফে'তে যেতে ইচ্ছে করছিল না তার। বাড়ি ফিরে খেয়েই আবার শুয়ে পড়ল।

আজ তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়া দরকার। কাল খুব ভোরে উঠে স্টেশনে যেতে হবে। 'জয়া আসবে' এই কথাটাই উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে সারাদিন তার মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। বেশি রাত করে ঘুমোতে গেলে ভোর-ভোর ওঠা অসম্ভব। এমনিতেই দেরিতে তার ঘুম ভাঙে। তার ওপর এখন এই শীতের সকাল। লেপের ভেতর থেকে হাত-পা বার করতেই ইচ্ছা করে না।

জয়ার ভাবনাটা মাথার ভেতর আঠার মতো আটকে ছিল। অন্ধকার থাকতে থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল রাজার। কাল রাত্তিরে হেরিকেনটায় কেরোসিন ছিল না। কাজেই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে প্যান্ট-জামা-পুল ওভার বার করে নিল রাজা। কোটটা গায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

যতদূর চোখ যায়, কুয়াশা আর অন্ধকারে সব কালো হয়ে আছে। দু'ধারের বাড়িঘর ভুতুড়ে চেহারা

নিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তায় একটা লোকও নেই। উত্তর দিক থেকে উলটোপালটা কনকনে হাওয়া ছুটে আসছে। একেবারে হাড়ের ভেতর পর্যন্ত বিঁধে যায়।

অন্ধকার কুয়াশা আর শীতের বাতাস ঠেলে ঠেলে নির্জন ভৌতিক রাস্তার ওপর দিয়ে রাজা যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল, পুব দিককার আকাশটা সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে।

কালো কোট-পরা এক রেলবাবুকে জিজ্ঞেস করতে ঘুমন্ত গলায় সে বলল, 'মিনিট কয়েক হল ফার্স্ট লোকাল ট্রেন কলকাতায় চলে গেছে।'

তার মানে জয়া এসে গিয়েছে। লম্বা লম্বা পায়ে ওভারব্রিজ টপকে দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ল রাজা। খোঁজাখুঁজি করতে হল না। নির্দিষ্ট বেঞ্চিগুলোর একটায় জড়সড় হয়ে বসে আছে জয়া। মাঝে মাঝে গলা তুলে চারদিক দেখছে। বোধহয় রাজা আসছে কিনা লক্ষ করছে।

কাছাকাছি আসতেই জয়া উঠে দাঁড়াল। রাজা বলল, 'আসতে পেরেছেন তাহলে?' বলে হাসল।

জয়াও হাসল, 'পেরেছি কিনা দেখুন—'

'চলুন—'

রাজার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল জয়া। রাজা আবার বলল, 'ফার্স্ট ট্রেনে কিরকম ভিড় ছিল?'

জয়া বলল, 'একদম না। একটা বড় কামরায় দু'টো লোক আর আমি ছিলাম। ভীষণ ভয় করছিল।'

কথা বলতে বলতে ওরা স্টেশনের এপারে চলে এল। সাইকেলরিকশার স্ট্যান্ডটা ফাঁকা। এত সকালে রিকশাওলারা আসেনি।

রাজা বলল, 'তাই তো, বড় গাড্ডায় পড়ে গেলাম—'

'কী হল?'

'একটা রিকশাও নেই। যেতেও হবে অনেকখানি রাস্তা। কী করা যায়, বলুন তো?'

'কতটা রাস্তা?'

'আড়াই মাইল হবে।'

'রিকশা যখন নেই তখন আর কী করা—' জয়া বলতে লাগল, 'চলুন হেঁটেই যাই।'

রাজা বলল, 'পারবেন তো?'

'খুব। আপনি আমাকে কী ভাবেন? ননীর পুতুল?'

রাজা কিছু বলল না, ঘাড় ফিরিয়ে হাসল শুধু।

একটু পর স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা; সামনের রাস্তা ধরে সোজা নদীর দিকে হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে সান্ত্বনা দেবার মতো করে রাজা বলল, 'রাস্তায় যদি রিকশা পেয়ে যাই নিয়ে নেব।'

অনেকখানি যাওয়ার পর একটা সাইকেল রিকশা অবশ্য পাওয়া গেল। রাজা ডাকতে যাচ্ছিল, জয়া বলল, 'দরকার নেই, হেঁটেই যাব।'

একসময় শ্মশান টশান পেছনে ফেলে নদীপাড়ের পুরনো গীর্জায় এসে পড়ল ওরা। এর মধ্যে বেশ রোদ উঠে গিয়েছে। নদীর ওপারে সিল্কের মতো ফিনফিনে নরম কুয়াশা এখনও একটু আটকে আছে। ঝাঁক ঝাঁক শীতের পাখি চারদিকের গাছপালার মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে।

ফাদার ডোনাল্ডস রোদে পিঠ দিয়ে একটা খাটিয়ায় বসে ছিলেন। তাঁর বাইবেল পড়া একটু আগেই হয়তো শেষ হয়েছে। বইটা বন্ধ করে তিনি পাশেই রেখে দিয়েছেন।

জয়া বলল, 'একি, কোথায় নিয়ে এলেন? এটা তো চার্চ।'

রাজা বলল, 'এখানে দরকার আছে।'

এই নির্জন গীর্জায় কী দরকার থাকতে পারে, জয়া ভেবে পেল না। সন্দেহের গলায় সে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি যে বলেছিলেন মারোয়াড়ীর বাড়িতে যেতে হবে—'

'সে তো যাবেনই।'

'তবে?'

রাজা কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ফাদার ডোনাল্ডস হয়তো ওদের কথা শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। একটুক্ষণ অবাক হয়ে উঁচু গলায় বলে উঠলেন, 'আরে রাজ চক্রবর্তী যে, আয় আয়—'

ওরা গীর্জার ঠিক তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা নিচু গলায় জয়াকে বলল, 'আসুন—'

'উনি তো পাদ্রী সাহেব দেখছি—'

'হ্যাঁ।'

'পাদ্রী সাহেবের কাছে—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল জয়া।

তার মনের কথাটা যেন পড়তে পারল রাজা। বলল, 'আসুন না। এই সকালবেলা ঝাড়া আড়াই মাইল রাস্তা হাঁটিয়ে ঝুটমুট আপনাকে এখানে আনি নি—'

ফাদার ডোনাল্ডস এবার তাড়া লাগালেন, 'কি রে, দু'জনে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! আয়—'

রাজা সিঁড়ি টপকে টপকে ওপরে উঠতে লাগল। পেছন ফিরে চট করে একবার দেখেও নিল, জয়া উঠছে কিনা। জয়ার মুখ দেখে মনে হতে লাগল, সংশয় বা অনিচ্ছার মতো কিছু একটা তার ওপর ছায়া ফেলেছে।

ফাদার ডোনাল্ডসের কাছে আসতেই তিনি বললেন, 'বোস বোস—'

বড় খাটিয়ার এক কোণে রাজা বসল। একটু দূরে জয়াও বসল গুটিসুটি মেরে। দু'চোখে স্নেহ এবং কৌতুক মিশিয়ে জয়াকে দেখতে লাগলেন ফাদাল ডোনাল্ডস। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'এই বুঝি জয়া?'

রাজা মাথা নাড়ল।

একজন মিশনারি পাদ্রীর মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল জয়া। পরক্ষণে তার মনে হল, নিশ্চয়ই রাজা তার কথা ওঁকে বলেছে। কী বলেছে, কে জানে। নিজের অজান্তেই জয়া সতর্ক হয়ে রইল।

ফাদার ডোনাল্ডস আবার বললেন, 'সকালবেলা ওকে কোত্থেকে ধরে আনলি?'

রাজা বলল।

ফাদার ডোনাল্ডস এবার সোজাসুজি জয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নবীপুর থেকে ফার্স্ট ট্রেন ধরে এসেছ!'

জড়ানো গলায় জয়া বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাঃ, বেশ আর্লি রাইজার তো তুমি।'

জয়া চুপ করে রইল।

ফাদার ডোনাল্ডস আজই প্রথম দেখলেন জয়াকে। দেখামাত্রই মেয়েটার প্রতি অসীম মমতা অনুভব করলেন। বললেন, 'তোমরা নবীপুরে থাক। আমি কতবার ওখানে গেছি। অনেককে চিনিও। আশ্চর্য, তোমাদের সঙ্গে কেন যে আলাপটা হয়নি!'

আধফোটা গলায় জয়া জানতে চাইল, 'নবীপুরে কাদের চেনেন?'

'অনন্ত বোসদের চিনি, তারাপদ সাহাদের চিনি, শিশির মুস্তাফিদের চিনি, অবিনাশ গাঙ্গুলিদের চিনি। কত লোকের নাম করব?'

'আপনি তো অনেককেই চেনেন দেখছি।'

ফাদার ডোনাল্ডস হাসলেন। তারপরেই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'আরে তাই তো, এত ভোরে নবীপুর থেকে এসেছ। নিশ্চয়ই চা'টা খাওয়া হয় নি?'

লজ্জায় একেবারে এতটুকু হয়ে গেল জয়া। মুখ নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খেয়েছি। রাত থাকতে উঠে মা উনুন ধরিয়ে চা-খাবার করে দিয়েছে।'

'তবু আরেকটু খাও। ঠাণ্ডায় এতটা পথ এসেছ।'

'না না, থাক—'

'আরে লজ্জার কি! তুমি খেলে আমরাও একটু খেতে পারি। বোকা মেয়ে—'

জয়া এবার আর আপত্তি করল না, নতমুখে লাজুক হাসল।

ফাদার ডোনাল্ডস রাজাকে বললেন, 'যাও হে মহারাজ, স্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দাও। ভেতরের ঘরে বড় দালদার কৌটোয় বিস্কুট আছে। খানকতক নিয়ে এস।'

এই পুরনো গীর্জাবাড়ির কোথায় কী আছে, সব রাজার মুখস্থ। উঠতে উঠতে সে বললে, 'লে বাবা, সক্কালবেলা উঠেই খাটনি—'

জয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমাকে দেখিয়ে দিন, চা করে আনছি।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'না না, তুমি বসে থাক। প্রথম এলে, গেস্ট। তোমাকে আজই কি খাটাতে পারি? একটু পুরনো হও, তারপর দেখা যাবে। তখন খাটুনির ভয়ে আসতেই চাইবে না।'

একটা ব্যাপারে জয়ার বিস্ময় লাগছিল। বলি বলি করেও বলতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ফস করে বলেই ফেলল, 'আপনি কিন্তু চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। একেবারে আমাদের মতো।'

'অনেকদিন এখানে আছি যে। বাংলাদেশ আমার নিজের দেশ হয়ে গেছে।' ফাদার ডোনাল্ডস হাসলেন।

'কতদিন আছেন?'

'চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর হবে।'

'আমাদের জন্মই হয় নি তখন।'

'তোমরা তো সেদিনের ছেলে মেয়ে। তোমাদের দাদা-টাদা থাকলে তারাও তখন জন্মায়নি।'

রাজা এই সময় চুমকুড়ি কাটল, 'বাংলাদেশে থেকে থেকে একেবারে বাঙালির বাবা হয়ে উঠেছেন।'

'যা বলেছিস!' ফাদাল ডোনাল্ডস হেসে ফেললেন।

কিছুক্ষণ পর চা খেতে খেতে ফাদার ডোনাল্ডস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জয়াদের সংসারের যাবতীয় কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। প্রথম দিকে যে সঙ্কোচ যে আড়ষ্টতা ছিল ধীরে ধীরে সে সব কেটে গিয়েছে। ফাদার ডোনাল্ডসের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য স্নেহময়তা আছে যা সব কুণ্ঠা ভুলিয়ে কাছে টানে। কাচের ঘরে সুন্দর একটি ফুলের মতো তাঁর স্বচ্ছ হৃদয় যেন বাইরে থেকেও দেখা যায়।

ফাদার ডোনাল্ডসের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল জয়া। তাদের সংসারের সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'সত্যি তোমার একটা চাকরি বাকরি দরকার।'

ফাদারের সঙ্গে গল্প করতে করতে খেয়াল ছিল না। চাকরির কথায় মারোয়াড়ীর বাড়ি যাবার কথাটা ঝট করে আবার মনে পড়ে গেল। কি আশ্চর্য, যে জন্য রাত থাকতে উঠে ফার্স্ট ট্রেন ধরে এতদূরে আসা, গল্পে গল্পে তাই ভুলে গিয়েছিল। জয়া চঞ্চল হয়ে উঠল। রাজার দিকে ফিরে বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেল। এবার যাবেন না?'

রাজা তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ফাদার ডোনাল্ডস জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কোথায় যাবি?'

'আমি ঠিক যাব না, যাবেন আপনি।' রাজা বলতে লাগল, 'সাড়ে ন'টা বাজে। মারোয়াড়ীর বাড়িতে জয়দেবীকে নিয়ে যান। এরপর গেলে কি আর দেখা হবে?'

জয়া ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। রাজা বলেছিল, সে-ই তাকে মারোয়াড়ীর কাছে নিয়ে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে, পাদ্রী সাহেবের ওপর সেই ভারটা চাপাতে চাইছে রাজা। বিমূঢ়ের মতো সে একবার রাজাকে, আরেকবার ফাদার ডোনাল্ডসকে দেখতে লাগল।

জয়ার মনোভাব আন্দাজ করে রাজা বলল, 'মারোয়াড়ীর বাড়িতে চাকরির খবরটা এনেছেন পাদ্রী সাহেব। আপনি ওঁর সঙ্গে গেলেই হবে।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে গেলেই হবে। আড্ডায় আড্ডায় হুঁশ ছিল না, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। ওঠ জয়া।' তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ব্যাপারটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। জয়া রাজাকে বলল, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না—'

রাজা কী বলতে যাচ্ছিল, ফাদার ডোনাল্ডস তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'না না, ওর যেতে হবে না। দল পাকিয়ে যাবার দরকার নেই। রাজা এখানে বসুক, আমরা চট করে ঘুরে আসছি।' ফাদার ডোনাল্ডস উঠে পড়লেন।

একটু পর জয়াকে নিয়ে ফাদার ডোনাল্ডস বেরিয়ে পড়লেন। রাজা তক্তপোষের ওপর বসে বসে দেখতে লাগল, ওরা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখবেন চাকরিটা যেন হয়।'

ফাদার ডোনাল্ডস ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন, হাসলেন, হাত নাড়লেন এবং ঘাড় কাত করে জানালেন, চেষ্টা করবেন।

কিছুক্ষণের ভেতর নদীর পাড় ধরে জয়ারা শ্মশান আর খেয়াঘাটের ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজা বসেই থাকল।

জয়ারা ফিরল ঘণ্টাখানেক পর।

রাজা অনেকখানি উদ্বেগ নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই শ্বাসরুদ্ধের মতো বলল, 'কী হল?'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'সূরযলালের সঙ্গে আলাপ টালাপ করিয়ে দিলাম। সূরযলাল জয়াকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল।'

'ব্যস, আর কিছু না?'

'আবার কী?'

রাজা বিরক্ত, 'স্রেফ গল্প করবার জন্যে ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন নাকি? চাকরির কী ব্যবস্থা হল?'

ফাদার ডোনাল্ডস হেসে ফেললেন, 'আরে বাবা, তোর দেখছি দারুণ তাড়া। অত হুটোপুটি করলে কখনো হয়। আজ যা কথাবার্তা হল তা অনেকটা ইন্টারভিউর মতো। জয়াকে রাখবে কি রাখবে না, পরে খবর দেবে সূরযলাল।'

রাজা বলল, 'ইন্টারভিউ কেমন দিল?'

'ভালই। তবে—'

'তবে কী?'

'জয়া খুব লাজুক তো—'

রাজা উৎকণ্ঠের মতো বলল, 'তা হলে কি চাকরিটা হবে না?'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'দেখা যাক।'

'দেখা যাক মানে? আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে চাকরিটা নাও হতে পারে।'

'বেশ ছেলে তুই। আগে থেকে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকছিস। চাকরি হবে না আমি বলেছি একবারও? তবে—'

'কী?'

'সূরযলালটা চালু আছে।'

'কিরকম?'

ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'ব্যাটা আরো ক'জনকে ইন্টারভিউ দিতে ডেকেছিল—'

রাজা বলল, 'আপনি কী করে জানলেন? সূরযলাল বলেছে?'

'তাই কখনো বলে?' হাবে ভাবে কথায় বার্তায় জেনে নিলাম।'

'তাদের ভেতর থেকে কাউকে নেবে না তো?'

'সে সব কিছু বলে নি। অতগুলো করে টাকা মাসে মাসে দেবে। না দেখেশুনে কি আর লোক রাখবে?'

'যাঃ শালা, কোনো আশাই নেই দেখছি।' রাজার মুখ করুণ, হতাশ দেখাল, 'বেকার এত ছোটাছুটি করলাম।'

রাজার মুখ দেখে ফাদার ডোনাল্ডসের মায়া হয়ে থাকবে। বললেন, 'আমি ওবেলা আরেকবার সুরযলালের কাছে যাব। জয়াকে যাতে নেয় তার জন্যে আবার বলব।'

'আচ্ছা—' রাজার মুখ দেখে মনে হল না, সে খুব একটা ভরসা পেয়েছে।

এই সময় জয়া বলে উঠল, 'ক'টা বাজে এখন?'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'ক'টা আর, সাড়ে দশটার মতো হবে। রাজা, আমার ঘরে গিয়ে ঘড়িটা দেখে আয় তো—'

রাজা গীর্জার ভেতর চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে বলল, 'এগারটা দশ—'

'বলিস কি, এত বেলা হয়েছে!'

'শীতের বেলা ঠিক বোঝা যায় না।'

এদিকে জয়া খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, 'আমি কিন্তু এবার বাড়ি ফিরব। আর দেরি করলে মা খুব ভাববে।'

রাজা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল, 'হ্যাঁ। যাওয়া দরকার। এখান থেকে স্টেশন ঝাড়া আড়াই মাইল রাস্তা। এতখানি ঠেঙিয়ে গিয়ে তবে গাড়িতে উঠতে হবে। নবীপুর ফিরতে ফিরতে সাড়ে বারটা একটা হয়ে যাবে।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'তবে যা—'

ওরা দু'জন উঠে পড়ল। রাজা জিজ্ঞেস করল, 'চাকরির কী হল, কবে খোঁজ নেব?'

'কাল পরশু একবার আসিস।'

মাথা হেলিয়ে রাজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জয়াও।

হঠাৎ ফাদার ডোনাল্ডস ডাকলেন, 'এই শোন—'

ওরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রাজা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কী বলছেন?'

'আজ ক' তারিখ জানিস?'

রাজা বলতে পারল না। জয়া কিন্তু পারল, 'বাইশে ডিসেম্বর।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'দু'দিন পর এক্সমাস—বড়দিন। রাজা তুই আসবি। জয়া তোমারও কিন্তু নেমন্তন্ন রইল। নিশ্চয়ই আসবে।'

জয়া বলল, 'আমি মাকে বলব। যদি আসতে দেন—'

'রাজার আর আমার কথা বলো, নিশ্চয়ই আসতে দেবেন।'

জয়া ঘাড় কাত করল।

কী মনে পড়তে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'ভাল কথা—'

রাজা বলল, 'কী?'

'জয়াকে যখন পাওয়া গেছে তখন এক কাজ করলে হয়।'

'কী কাজ?'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'আমি ব্যাটাছেলে মানুষ। আমি তো আর সাজাতে টাজাতে পারি না। সাজসজ্জার ব্যাপারটা পুরোপুরি মেয়েদের। ভাবছি এবার বড়দিনে জয়াকে দিয়ে গীর্জা সাজাব।'

রাজা উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'ফাইন হবে। এমন সাজান সাজানো হবে যাতে সবাই ট্যারা হয়ে যাবে।'

ফাদার ডোনাল্ডস হেসে ফেললেন, 'ট্যারা করে দেবার দরকার নেই। মোটামুটি সাজিয়ে দিলেই হবে।' জয়ার দিকে ফিরে বললেন, 'কিন্তু জয়ারানী, একটা ব্যাপারে তো ভাবনায় পড়লাম—'

জয়া উন্মুখ হল।

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'সাজাতে গোছাতে হলে বড়দিনের আগেই তোমাকে আরেক বার আসতে হবে। কাল কি পরশু এলেই ভাল হয়।'

জয়া কিছু বলবার আগেই রাজা বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল পরশুই আসবে।'

'ওর মা কি আসতে দেবেন?'

'ম্যানেজ করে চলে আসবে। আপনি ভাববেন না। আমি কেটে আসার কায়দা শিখিয়ে দেব। আচ্ছা এখন চলি—'

তরতর করে রাজা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। তার সঙ্গে জয়াও। ওরা যখন সিঁড়ির শেষ মাথায় চলে গিয়েছে ফাদার ডোনাল্ডস ফের ডাকলেন, 'রাজা—'

রাজা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার সে বিরক্ত। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী হল আপনার? বার বার পিছু ডাকছেন?'

ফাদার ডোনাল্ডসের চোখ ঝকমক করছিল। ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে হাতের ইশারায় তিনি ডাকতে লাগলেন।

রাজা বলল, 'আবার শ্লা অতগুলো সিঁড়ি টপকাতে হবে। ওইখান থেকেই বলুন না—'

'না রে, এখান থেকে হবে না—'

'কি যে রংবাজি করছেন মাইরি—' জয়াকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওপরে উঠে এল রাজা, 'বলুন, কী দরকার—'

ফাদার ডোনাল্ডস তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে রাজাকে দেখতে লাগলেন।

রাজা প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'কী যে আপনার মাথায় চাপে! নকশা মেরে না হেসে বলুন। নইলে কেটে পড়ি—'

ফাদার ডোনাল্ডস এবার চাপা গলায় বললেন, 'খাসা জুটিয়েছিস রাজা।'

রাজা থতিয়ে গেল, 'কী জুটিয়েছি!'

'কিছুই জান না—' ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'জয়া রে জয়া। চমৎকার মেয়ে। যেমন শান্ত তেমনি ভদ্র আর কি ভাল—' তাঁর চোখমুখ থেকে একটু আগের কৌতুক মুছে গিয়েছে। এখন সেখানে শুধু স্নেহকোমল লাবণ্যময় স্নেহ।

রাজা চুপ করে রইল।

ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'তবে একটা কথা—'

'কী?'

উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেলেন ফাদার ডোনাল্ডস। অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললেন, 'না, কিছু না।'

রাজা কাছে এগিয়ে এল। ঘনিষ্ঠ সুরে বলল, 'লে হালুয়া, মুখ খুলতে গিয়েও তালা আটকে দিলেন! যা মনে হয়েছে বলে ফেলুন না। কিছু মনে করব না। তা ছাড়া, আমি হলাম দুনিয়ার রদ্দি ফালতু মাল। আমার মনে করাতে কী যায় আসে।'

তবু খানিকটা ইতস্তত করলেন ফাদার ডোনাল্ডস। তারপর দ্বিধার গলায় বললেন, 'একদিনের দেখায় যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়, জয়া মেয়েটা ভারি সরল আর ফুলের মত পবিত্র। তোকে ও দারুণ বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। সুরযলালের বাড়ি যেতে যেতে তোর কত কথা যে বলছিল। তাই বলছিলাম—'

রাজা দম বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল। কিছু বলল না।

ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'বলছিলাম কি, ওর সঙ্গে এমন কিছু করিস না যাতে মেয়েটা কষ্ট পায়, তোর সম্বন্ধে ওর বিশ্বাস শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়।'

পলকে মুখটা করুণ হয়ে গেল রাজার। পরক্ষণেই এক ঝটকায় সেই ভাবটা ঝেড়ে ফেলে রগড়ের গলায় সে বলে উঠল, 'বুঝেছি বুঝেছি, আপনিই আমার ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। তা শ্লা, ভরসা না রাখবারই কথা। আমি যা একখানা জিনিস—' বলে দ্রুত হাতের তালু চিত করে দিয়ে চোখমুখ কুঁচকে কুঁচকে হাসতে লাগল।

ফাদার ডোনাল্ডস বিব্রতভাবে বলতে চেষ্টা করলেন, 'না না, আমার কথাটা ঠিক ওভাবে নিস না—'

রাজা যেন শুনতে পেল না। নিজের মনে বলে যেতে লাগল, 'আপনার কথা মনে রাখতে চেষ্টা করব। এবার যাই—'

'আচ্ছা—'

দু' পা গিয়ে পেছন ফিরল রাজা। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'আর পিছু ডাকবেন না মাইরি। চার বার ডেকেছেন—'

ফাদার ডোনাল্ডস হাসলেন, 'চার বার কোথায় রে, তিন বার ডেকেছি—'

'ওই হল—' হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে চলে গেল রাজা।

ষোল

গীর্জা থেকে বেরিয়ে শ্মশানঘাট, রামসীতা মন্দির এবং নদী পেছনে ফেলে একসময় জয়ারা বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

রাজা বলল, 'ঢের বেলা হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। এখন আর হাঁটা যাবে না, বুঝলেন। হাঁটতে গেলে টেংরি ঢিলে হয়ে যাবে। আসুন একটা রিকশা নিই।'

রিকশায় উঠবার পর জয়া বলল, 'আমার জন্যে আপনার খুব কষ্ট হল। এক কাজ করুন বরং—'

'কী?' চোখ ছুঁচলো করে রাজা জিজ্ঞেস করল।

'বাড়ি চলে যান। খিদে খুব পেয়েছে তো!'

'আর আপনি?'

'আমি এই রিকশাটা নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যাব।'

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাজা জয়াকে দেখতে লাগল।

জয়া অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'কী দেখছেন?'

'আপনাকে—'

'আহা, আমাকে দেখবার কী আছে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে রাজা বলল, 'বেড়ে লোক আপনি। খিদে পেয়েছে বলে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইছেন। খিদে কি আমার একলারই পেয়েছে? আপনার পায় নি? আপনি নবীপুর গেলে খেতে পাবেন আর আমার ভাত এখানেই আছে। আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে কতক্ষণ আর লাগবে! আপনার কি ধারণা ততক্ষণ আমি খিদে চেপে রাখতে পারব না?'

জয়া লজ্জা পেয়ে গেল। বিব্রতভাবে বলল, 'সত্যি আমি ওসব ভেবে বলিনি। রিকশাওলা স্টেশনে নিয়ে যেতে পারবে। তাই ভাবছিলাম, শুধু শুধু আপনি আর কষ্ট করে এতটা পথ—'

রাজা চুলে একটা ঝটকা মেরে বলল, 'সেই পয়লা দিন থেকে শুনে আসছি, আমি আপনার জন্যে কষ্টই করে যাচ্ছি। কী ভদ্রতাই যে শিখেছেন!'

'ঠিক আছে, এই আমি চুপ করলাম।

খানিকটা যাওয়ার পর জয়া হঠাৎ বলল, 'আপনি কিন্তু আমাকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিয়েছেন—'

'কিরকম?' বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকাল রাজা।

জয়া বলল, 'পাদ্রী সাহেবকে তো খুব আগ বাড়িয়ে বলে দিলেন আমি কাল পরশু এসে গীর্জা সাজিয়ে দেব। কিন্তু আসব কী করে? মাকে কী বলব?'

'মাকে বলবেন—কী বলবেন বলুন তো?' রাজাকে চিন্তিত দেখাল, 'তাই তো কী বলা যায়?'

জয়া চুপ করে থাকল।

কিছুক্ষণ ভেবে রাজা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কায়দা করে তুড়ি বাজাতে লাগল, 'হয়েছে, মাথায় প্ল্যান খেলে গেছে।'

'কী?'

'আপনার মাকে বলবেন, চাকরির জন্যে তেল লাগাতে যেতে হবে। চাকরির কথা বললে দেখবেন ঠিক ছেড়ে দেবে।'

'তা হয়তো দেবে। কিন্তু—' জয়াকে দ্বিধান্বিত দেখাল।

'আবার কী?' রাজা সোজা জয়ার চোখের ভেতর তাকাল।

'মাকে মিথ্যে বলতে বলছেন?'

'আহা, আপনি একেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে থাকতে চান। যা টাইম পড়েছে, তাতে ওইসব চলে না, বুঝলেন?'

জয়া মৃদু হাসল, উত্তর দিল না।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল রাজা, অল্প ঝুঁকে বলল, 'একটা সত্যি কথা বলুন তো—'

'কী?'

'জীবনে কখনো মিথ্যে কথা বলেন নি?'

'এ বাবা, মিথ্যে বলি নি, তাই কখনো হয়? ঢের বলেছি। তাই বলে আপনি যা প্ল্যান দিলেন এইরকম ডাহা মিথ্যে কখনো বলতে হয় নি।' জয়া আস্তে করে মাথা নাড়ল।

রাজা হাসল, 'চোখ কান বুজে ঝেড়ে দেবেন।'

জয়াও হাসল, 'চেষ্টা করে দেখব।'

একটু চুপ। তারপর রাজা বলল, 'কালই চলে আসুন—'

'কাল কি হবে?'

'ইচ্ছে করলেই হবে।'

'আচ্ছা দেখি—'

কথায় কথায় ওরা বাজারপাড়ায় এসে গিয়েছিল। এ পাড়ার মাঝমধ্যিখানে 'শোভা কাফে'র কাছে আসতেই হঠাৎ মিলিত কণ্ঠের হল্লা ভেসে এল, 'এ রাজা—মেরি জান—' সেইসঙ্গে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তিন চারটে তীক্ষ্ণ সিটির শব্দ।

রাজা সোজাসুজি তাকাল না। আড়ে আড়ে দেখতে লাগল, আজ আর তুলসীরা 'শোভা কাফে'র ভেতর বসে নেই। সামনের রাস্তায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শালারা আর বাইরে দাঁড়াবার দিন পেল না!

রাজার বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে। এই শীতের দুপুরেও সে ঘেমে উঠতে লাগল। জয়া যদি কোনোরকমে টের পায়, এরা তার সাঙ্গোপাঙ্গ, তা হলে কী ভাববে? তার সম্বন্ধে মেয়েটার ধারণা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? রাজা দম আটকে ভাবতে লাগল, কতক্ষণে এই জায়গাটা পেরিয়ে যাবে।

কিন্তু বিপদ কি একদিকে? রাস্তার সামনের দিকে একটা লরি টায়ার পাংচার করে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে রীতিমত একটা ভিড়। তার ভেতর দিয়ে রিকশা চালানো যায় না। রাজার ইচ্ছে করছিল, মরে যায়।

রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পেছন থেকে তুলসীরা চেঁচিয়েই যাচ্ছে, 'এ রজ্-জা, রজ্-জা—'

রাজা মুখ ফেরাল না। ঘাড় শক্ত করে সোজা তাকিয়ে রইল।

জয়া একবার পেছন দিকে তাকাচ্ছে। তারপরই সন্দিগ্ধভাবে রাজাকে দেখছে। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'আপনাকে বোধহয় ওরা ডাকছে।'

রাজা শুনেও শুনল না। খুব মন দিয়ে লরির সামনের জটলা দেখতে লাগল।

জয়া আবার বলল, 'শুনছেন—এই রাজকুমারবাবু—'

কতক্ষণ আর না শোনার ভান করে থাকা যায়। শ্বাসরুদ্ধের মতো রাজা বলল, 'কী বলছেন—'

'ওই ছেলেগুলো আপনাকে ডাকছে যে—'

রাজা উত্তর দিল না।

এদিকে এক কাণ্ড হল। তুলসীরা এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিল, এবার 'শোভা কাফে'র সামনে থেকে ছুটতে ছুটতে এসে রিকশাটাকে ছেঁকে ধরল।

পল্টু আড়চোখে জয়াকে দেখতে দেখতে বলল, 'গুরু, মাইরি গুরু—'

তুলসী কোমর বাঁকিয়ে টুইস্টের কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত উচ্চারণে বলল, 'বেশ রসে বশে আছ মানিক—'

রতন বলল, 'বহুত আচ্ছা জনাব। চালিয়ে যা, চালিয়ে যা পানসি—'

পল্টু আবার বলল, 'ডুবে ডুবে কদ্দিন ধরে ঢুকু ঢুকু চালাচ্ছ বাওয়া? আমরা শালা জানতেই পারিনি।'

রাজা ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগল। চাপা দুর্বল গলায় বলল, 'এই কী হচ্ছে পল্টে, তোরা এখন যা—'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পল্টু বলল, 'যাব কি রে, তোর হাড় সেঁকে নি আগে। তারপর তো যাওয়া—'

তুলসী বলল, 'শালা ক্যায়সা হারামী, সব কথা বলে আর এই কথাটাই স্রেফ চেপে গেছে। তোমাকে এমনি এমনি ছাড়ছি না।'

রাজা বলল, 'তোদের পায়ে ধরছি মাইরি, এখন যা—' রাজা প্রায় হাতজোড় করল।

তুলসী এক পলক কী ভাবল, তারপর ঠোঁট ছুঁচলো করে টিপে টিপে হাসতে হাসতে বলল, 'যেতে পারি। তবে—'

'কী?'

'ফাইন দিতে হবে—'

'কিসের ফাইন?'

'রাত্তিরে গণেশদার দোকানে সেই জিনিসটা খাওয়াতে হবে।' বলে চোখ টিপল তুলসী।

রাজা বুঝল, এক বোতল কালী মার্কা বাংলা মদের দাম খসাতে হবে। রাজা এখন যে কোনো শর্তেই রাজি। বলল, 'খাওয়াব মাইরি, ঠিক খাওয়াব।'

রতন বলল, 'খাওয়াতে যখন রাজি হয়েছে তখন আর কি। ওদের মাঝখানে কাবাবমে হাড্ডি হো কর খড়া হোনেসে ক্যা ফায়দা? চল জনাব, লৌট যায় হামলোগ—'

তুলসীরা জয়ার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। দূরে 'শোভা কাফে'র কাছাকাছি গিয়ে জোর সিটি লাগাল, 'বুইক—বুইক—'

রাজা জয়ার দিকে তাকাতে পারছিল না। তার ঘাড় ভেঙে ঝুলে পড়তে লাগল। ঘামে জামাটামা ভিজে উঠেছে।

একসময় জয়া খুব আস্তে করে বলল, 'ওরা কারা?'

জড়ানো গলায় রাজা উত্তর দিল, 'এখানকারই ছেলে—'

'আপনার বন্ধুবান্ধব নাকি?'

রাজা চমকে উঠল, 'না—না, বন্ধু হবে কেন?'

জয়া বলল, 'ওদের ভাবভঙ্গি দেখে কিন্তু তাই মনে হল।'

'আরে কী গাড্ডায় যে পড়া গেল!' বিব্রত নার্ভাস রাজা ফ্যাসফেসে গলায় বলতে লাগল, 'এক জায়গায় থাকি। ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা—এই আর কি। বন্ধুটন্ধু কিছু না।'

জয়া কী বুঝল, কে জানে। বলল, 'ছেলেগুলো খুব অসভ্য।'

রাজা তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'যা বলেছেন। একেকটা মহা খচ্চর।'

জয়া উত্তর দিল না।

রাজা বিপুল উৎসাহে বলে যেতে লাগল, 'রোজ ব্যাটারা হুজ্জুত করে যাচ্ছে।'

দুম করে জয়া বলল, 'রাত্রিবেলা ওদের কী খাওয়াবেন বললেন? ফাইন-টাইন ওরা কী বলছিল?'

পলকের জন্যে মুখটা সাদা হয়ে গেল রাজার, মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। সে এত হকচকিয়ে গিয়েছে যে কী বলবে, প্রথমটা ভেবেই উঠতে পারল না। একটু পর সে তোতলাতে শুরু করল, 'না না, তেমন কিছু না। আপনাকে পরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব।'

চকিতে একবার রাজাকে দেখে নিল জয়া। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

এদিকে লরিটার সামনে যে ভিড় জমেছিল, ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে গিয়েছে। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে রাজাদের রিকশা চলতে শুরু করল। স্টেশন পর্যন্ত কেউ আর কোনো কথা বলল না।

নবীপুরের ডাউন ট্রেনে জয়াকে উঠিয়ে দিয়ে রাজা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকল। বলল, 'কাল আসবেন কিন্তু।'

'আচ্ছা—' জানালার ধার ঘেঁষে বসতে বসতে জয়া হাসল, 'মাকে সাত কাহন মিথ্যে বলে আসবার পাসপোর্ট জোগাড় করতে হবে।'

রাজাও হাসল।

জয়া আবার বলল, 'কাল কখন আসব?'

'সকালের দিকেই চলে আসুন—' বলেই কী একটু ভেবে নিল রাজা, 'আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালও স্টেশনে আসতে হবে নাকি?'

জয়া বলল, 'না-ও আসতে পারেন। কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলে দিলে আমি সেখানে চলে যেতে পারি।'

'তা হলে ভালই হয়। আপনি এক কাজ করবেন, সিধে গীর্জায় চলে যাবেন। আমি বাড়ি থেকে ওখানে চলে যাব। গীর্জায় যেতে পারবেন তো?'

'খুব পারব। সোজা রাস্তা।'

একটু চুপ।

তারপরই জয়াই আবার বলে উঠল, 'আপনি কিন্তু বেশ লোক—'

মেয়েটার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে রাজার চমক লাগল। ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল, জয়ার ঠোঁট ঈষৎ টেপা, চোখ কৌতুকের আভায় ঝকমক করছে। রাজা একটা থতিয়ে গেল, জড়ানো গলায়, 'কিরকম?'

'শ্যামনগরে এলাম, সেই সকাল থেকে এতক্ষণ থেকে গেলাম। অথচ—'

'অথচ কী?'

'আপনাদের বাড়ি একবারও যেতে বললেন না।'

রাজা থতিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না। তারপর উত্তরটা যখন সবেমাত্র গুছিয়ে নিয়েছে সেই সময় তীক্ষ্ণ ভোঁ বাজিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন সাঁ করে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল।

সতের

পরের দিন একটু বেলা করে গীর্জায় এসে রাজা দেখল, জয়া ফাদার ডোনাল্ডসের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে। তাকে দেখে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'এই যে মূর্তিমান, এতক্ষণে আসাব সময় হল?'

রাজা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'না মানে, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠতে দেরি হয়ে গেছে। তাই—'

'ঘুমটা তোর বড্ড খানদানী। একেবারে রাজাবাদশার ব্যাপার—'

বিব্রত হেসে রাজা জয়ার দিকে তাকাল, 'কখন এসেছেন?'

জয়া বলল, 'অনেকক্ষণ।'

'ফার্স্ট ট্রেন ধরে?'

'না। সেকেন্ড ট্রেনে।'

'তা হলে তো ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হয়েছে—'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'তুমি আসো নি বলে জয়ার খুব একটা অসুবিধে হয় নি। আমার ধারণা এই দু'ঘণ্টা সময় জয়া আমার সঙ্গে ভালই কাটিয়েছে। নাকি বলিস জয়া?' দ্বিতীয় দিনেই জয়াকে 'তুই' বলতে শুরু করেছেন ফাদার ডোনাল্ডস।

জয়া হেসে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সময়টা খারাপ কাটে নি তার।

রাজা বলল, 'লাও ঠ্যালা, আমি যেন বলেছি অসুবিধে হয়েছে।' একটু থেমে ফাদার ডোনাল্ডসের দিকে তাকিয়ে আবার বলল. 'কাল বিকেলে সূরযলালের কাছে যাবার কথা ছিল। গিয়েছিলেন?'

ফাদার ডোনাল্ডস ঘাড় কাত করলেন, 'হ্যাঁ।'

'কী বললে?'

'বললে, দেখি। ব্যবসাদার লোক তো, পরিষ্কার করে কিছু বলে না। তবে আমিও ছাড়ছি না সহজে। আঠার মতো আটকে থাকব।'

একটু চুপ!

তারপর ফাদার ডোনাল্ডসই আবার শুরু করলেন, 'বেশ বেলা হয়েছে। এবার চার্চ সাজানোর কাজে লাগবি নাকি?'

রাজা বলল, 'তার আগে চা, ফা একটু খাওয়াবেন না?'

'বেশ তো, খেয়ে গা গরম করে নে—'

চা খাওয়া হলে জয়া, রাজা এবং ফাদার ডোনাল্ডস, তিনজনেই কাজে লাগল। গীর্জাবাড়ির বড় হল-ঘরটা কতকাল যে ঝাড়ামোছা করা হয় নি। চারধারে ধুলোবালি আর কোণে ঝুলকালি জমে আছে।

জয়া গাছকোমর করে শাড়িটা জড়িয়ে নিল। তারপর ঝাঁটা দিয়ে কতকালের জমানো ধুলো সাফ করতে লাগল। ফাদার ডোনাল্ডস ঢ্যাঙা ঝাড়ু দিয়ে উঁচু উঁচু কোণ থেকে ঝুল পাড়তে লাগলেন। রাজা গীর্জাবাড়ির পেছন দিকের টিউবওয়েল থেকে বালতি করে জল আনতে লাগল।

বড় হল-ঘর ঝাড়া হয়ে গেলে ধোয়া শুরু হল। যে জয়া ভীরু লাজুক, তার ভেতর থেকে চটপটে ক্ষিপ্র সজীব একটি মেয়ে যেন বেরিয়ে এসেছে। একাই দশ হাতে কাজ করে যাচ্ছে মেয়েটা। হাতই শুধু চলছে না, মুখও চলছে। রাজাকে সমানে ফরমাশ দিয়ে যাচ্ছে সে, 'জল আনুন, বালি আনুন, ঝামা আনুন—' কিংবা 'ওটা সরান, এটা টানুন—' কোনো কাজ মনের মতো না হলেই ধমকে উঠছে, 'আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

রাজা ধমকটা গায়ে মাখে না। হেসে হেসে বলে, 'যা বলেছেন। আমি একটা যা তা, ফোর্থ ক্লাস—'

জয়াও হাসে, 'যেমন অকর্মা তেমনি আনাড়ি। আর—'

'কী?'

'কথা আছে ঝুড়ি ঝুড়ি—'

ফাদার ডোনাল্ডস উৎসাহের গলায় বলেন, 'ঠিক বলেছিস। বড় বড় বক্তৃতা ঝাড়তে মজবুত—'

ধোয়া মোছা হয়ে গেলে যিশুখ্রিস্টের বড় ফটোটা মেজে ঘষে ঝকমকে করে তুলল জয়া। দেখতে দেখতে বেলা দুপুর হয়ে গেল। আকাশের দিকে এক পলক তাকিয়ে জয়া বলল, 'এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

'সকাল থেকে এত খাটলি। এখন এই দুপুরবেলায় ফিরে যাবি?' ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'বরং এক কাজ কর—'

জয়া তাকাল, 'কী কাজ?'

'এখানেই চাট্টি ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিচ্ছি। খেয়ে জিরিয়ে ওবেলা বাড়ি ফিরিস—'

'না, তা হয় না।'

'কেন রে?'

'মাকে বলে এসেছি, বারটা একটা নাগাদ ফিরব। না ফিরলে মা খুব ভাববে—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'তা হলে তো তোকে ছেড়ে দিতে হয়। বাড়িই যা। হ্যাঁ, ভাল কথা—'

'কী?'

'ঝাড়পোঁছ তো হল। কিন্তু সাজানোর কী হবে?'

ফাদার ডোনাল্ডসের চোখের দিকে তাকিয়ে জয়া হাসল, 'কী আর হবে, কালও আসব। আবার মা'র কাছে এক ঝুড়ি মিথ্যে বলতে হবে।'

'মিথ্যে বলতে হবে!' ফাদার ডোনাল্ডস অবাক হলেন।

'হ্যাঁ।'

'কেন রে?'

'নইলে আসতে দেবে নাকি?'

ফাদার ডোনাল্ডস একটু ভেবে বললেন, 'আজও কি মিথ্যে বলে এসেছিস?'

'নিশ্চয়ই—' জয়া মাথা নাড়ল।

ফাদার ডোনাল্ডস শঙ্কিত হলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, 'কী বলেছিস?'

'বলেছি চাকরির তদ্বির করতে শ্যামনগর যাচ্ছি।'

'এই পরামর্শটা কে দিল শুনি? তোর মাথা থেকে বেরিয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

'ওই যে উনি—' জয়া রাজার দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে দিল।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম—' ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'ওই হারামজাদা ছাড়া এমন বুদ্ধি কে আর দেবে।'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে রাজা বলল, 'এই রকম একটা বুদ্ধি ঝেড়েছিলাম বলেই তো আসতে পারল। নইলে কি বাড়ি থেকে বেরুতে পারত?'

'বুঝলাম—' ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'একটু আধটু মিথ্যে অনেক সময় বলতে হয়। কিন্তু মা-বাবাকে ধোঁকা দেওয়া ঠিক নয়। কাল থেকে মাকে সত্যি কথাই বলে আসবি।'

বিব্রত, আধফোটা সুরে জয়া বলল, 'একবার মিথ্যে বলে ফেলেছি। এরপর যদি আবার সত্যি কথা বলতে যাই—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেল।

ফাদার ডোনাল্ডস চট করে জয়ার মনের কথাটা পড়ে নিলেন। হেসে বললেন, 'মিথ্য দিয়ে শুরু করেছ। এখন তাতে সত্যি ঢোকাতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আচ্ছা এবারটা মিথ্যে দিয়েই চালিয়ে যা—'

রাজা চুমকুড়ি কাটল, 'ফলস দিয়ে আরম্ভ করলে ফলস দিয়েই যবনিকা পতন করতে হয়।'

শুনে সবাই হাসল।

তারপর জয়াকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাজা।

এতক্ষণ তবু ফাদার ডোনাল্ডস ছিলেন। এখন জয়া আর সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। রাজার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। কাল দুপুরে জয়াকে নবীপুরে ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর থেকেই তার ভীষণ খারাপ লাগছে। শ্যামনগর পর্যন্ত এল মেয়েটা, অথচ তাকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারে নি রাজা; এ নিয়ে ঠাট্টার সুরে আসলে একটু খোঁচা দিয়ে গিয়েছে জয়া। সেই কথাটা যত ভাবছিল ততই ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল সে।

ওরা রাস্তায় এসে গিয়েছিল। একটা কথাও কেউ বলছিল না। দু'জনেই চুপচাপ। অবশ্য মাঝে মাঝে চোরা চোখে রাজা জয়াকে দেখে নিচ্ছিল।

পাশাপাশি অনেকক্ষণ হাঁটার পর রাজা আর পারল না। বার দুই তিন ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত ডেকেই ফেলল, 'শুনছেন—'

জয়া মুখ ফেরাল, 'কী বলছেন—'

'না, মানে ইয়ে—'

'ইয়েটা কী?'

'কাল আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি নি। সারাদিন আমার খুব খারাপ লাগছিল।'

জয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে না না, আমি যেতাম না। আপনাকে এমনি ঠাট্টা করেছিলাম। ওই দুপুরবেলা কেউ কারো বাড়ি যায়—'

রাজা যেন তার কথা শুনতেই পেল না। আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'ব্যাপারটা কি জানেন, আমাদের বাড়িটা হল শুয়োরের খোঁয়াড়।'

জয়া বলল, 'থাক ওসব কথা—'

'থাকবে কেন, শুনুন। নইলে হয়তো ভাববেন, শুধু শুধু আমি আপনাকে কাটিয়ে দিতে চাই। আসলে আপনি আমার বৌদিকে তো দেখেন নি। সে যে কী একখানা জিনিস! আমার হাড়ে ব্যাম্বু গজিয়ে দিলে—'

রাজার বলার ধরনে জয়ার খুব মজা লাগল। রাস্তার মাঝখানেই চপলা কিশোরীর মতো জোরে জোরে শব্দ করে হেসে উঠল।

রাজা বলল, 'আপনি হাসছেন! আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

জয়া হাসতেই লাগল।

রাজা ঈষৎ বিরক্ত গলায় বলতে বাগল, 'হাসবেন না মাইরি। বিশ্বাস যখন করতে পারছেন না তখন চলুন বৌদিকে দেখে আসবেন। বুঝতে পারবেন শালী আমার জান কেমন করে লটকে দিচ্ছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'ফাঁসির দড়ি, বুঝলেন? গলা থেকে খোলা যায় না। কোনদিন দেখবেন, আমার হয়ে গেছে। চলুন—চলুন আমাদের বাড়ি, সব দেখিয়ে দিচ্ছি—'

নিজের বাড়ির কথা অল্প স্বল্প বললেও এভাবে কখনো বলেনি রাজা। জয়া হাসি থামিয়ে আস্তে করে বলল, 'আজ থাক। আরেক দিন যাব।' সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, রাজা তাদের সংসারের ব্যাপারে খুবই অসুখী।

'না, আজই যেতে হবে।'

'কত বেলা হয়েছে দেখেছেন।'

'পাঁচ মিনিটের জন্যে চলুন। তার বেশি এক সেকেন্ডও আটকাব না।'

'প্লিজ, আজকের দিনটা থাক। পরে যেদিন বলবেন সেদিন যাব।'

রাজা একটু ভেবে বলল, 'আপনার যখন ইচ্ছে নেই তখন থাক। কাল আসছেন তো। কালই আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।'

জয়া মাথা নাড়ল।

রাজা আবার বলল, 'কাল কিন্তু কোনোরকম টালবাহনা শুনব না।'

'আচ্ছা—' জয়া হাসল।

একটা সাইকেল রিকশা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হাতের ইশারায় রাজা থামাল। জয়াকে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'চলুন আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।' রিকশাওলাটাকে বলল, 'স্টেশনে চল।'

জয়া আজ আর আপত্তি করল না। করে লাভও নেই। কেননা রাজা তার কথা শুনবে না।

খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ কী মনে পড়তে অত্যন্ত উদ্বেগের গলায় রাজা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই রিকশাওলা, এই—'

রিকশাওলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। রাজা বলল, 'বাজারের ভেতর দিয়ে না, তুমি ওই মালোপাড়া দিয়ে স্টেশনে যাও—'

রিকশাওলা বলল, 'সে যে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে।'

'তা হোক—'

'ভাড়া কিন্তু পঁচিশ নয়া বেশি পড়বে।'

'ঠিক আছে—'

একটু এগিয়ে বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল রিকশাওলা।

জয়া চুপচাপ বসে ছিল। আচমকা খুব নিচু গলায় সে ফিসফিস করল, 'এতটা ঘুরে যাচ্ছেন যে?'

রাজা চমকে উঠল, 'না, মানে এমনি—'

চোখের তারা স্থির করে জয়া ঠোঁট টিপল, 'এমনি?'

'এমনি ছাড়া কী? আপনি তো শ্যামনগরের একটা রাস্তা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি। ভাবলাম, এই দিকটা দেখিয়ে নিয়ে যাই—' রাজা চট করে একটা কৈফিয়ত বানিয়ে ফেলল।

জয়া অল্প একটু ঝুঁকে গলার স্বর আরো নামিয়ে দিল, 'নাকি ওদের ভয়ে এ রাস্তায় এলেন?'

বুঝেও না বোঝার ভান করল রাজা, 'কাদের কথা বলছেন?' তার বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছিল।

জয়া বলল, 'আপনার কিছুই মনে থাকে না দেখছি। ওই যে কাল যারা বাঁদরামি করছিল—'

মেয়েটা কি আন্তর্যামী? রাজা কয়েক পলক নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। তারপর ঝাপসা, জড়ানো গলায় বলল, 'আরে না না—'

জয়া বলল, 'না না নয়, হ্যাঁ। ওদের ভয়েই আপনি এদিক দিয়ে যাচ্ছেন। যা অসভ্য ছেলে সব, ভালই করেছেন।'

রাজা গলার ভেতর কী বিড় বিড় করল।

একটু চুপ করে থেকে জয়া আবার বলল, 'কাল ওদের যা খাওয়াবেন বলেছিলেন, খাইয়েছেন?'

মেয়েটা দেখা যাচ্ছে, কিছুই ভোলে না। আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি তো। রাজার ভয়ানক অস্বস্তি হতে লাগল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ঘাড় হেলিয়ে দিল, অর্থাৎ খাইয়েছে।

'কী খাওয়ালেন?'

রাজার মনে পড়ে গেল, তুলসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে এক বোতল কালীমার্কা বাংলা মদ খাওয়াতে রাজি হয়েছিল। ফলে সন্ধেবেলা গণেশ সাধুখাঁর দোকানে পুরো আড়াইটা টাকা গাঁটগচ্চা দিতে হয়েছে। পেঁয়াজ কুচি আর ছোলাসেদ্ধর চাট দিয়ে দিশি মাল খেতে খেতে তুলসীরা জয়া আর তাকে জড়িয়ে অশ্লীল হুল্লোড় বাধিয়ে দিয়েছিল। ওদের সঙ্গে রাজাও মদ খেয়েছে, ওদের ঠাট্টায় হেসে হেসে উঠেছে, কিন্তু তার খারাপ লাগছিল। কে জানে কেন, জয়ার সম্বন্ধে কোন ইতর রসিকতা সে সহ্য করতে পারে না। সবরকম নোংরামির বাইরে একটা পবিত্র নির্মল ফুলের মতো জয়াকে রাখতে চায় সে। তার গায়ে কেউ ধুলো টুলো ছিটিয়ে দিক, রাজার কাছে তা অসহ্য।

জয়া আবার বলল, 'কী খাওয়ালেন ওদের?'

যা খাওয়ানো হয়েছে তা তো আর বলা যায় না। রাজা আবছা গলায় বলল, 'এই কাটলেট টাটলেট খাইয়েছি।'

জয়া কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। কথাটা বিশ্বাস করল কিনা, কে জানে। কিছুক্ষণ পব সে বলল, 'কাল বললেন, ওরা আপনার বন্ধুটন্ধু না—'

জয়া ঠিক কী জানতে চায়, বুঝতে পারল না রাজা। খুব সতর্কভাবে বলল, 'না, কেন?'

'বন্ধুটন্ধু নয়, তবে শুধু শুধু ওদের খাওয়াতে গেলেন কেন?'

'আর বললেন না, ওরা যে কী একেকখানা চীজ তা তো আর জানেন না। পরের ঘাড় ভাঙতে ওস্তাদ—'

জয়া আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

শ্যামনগরের এই মালোপাড়াটা অনেক কালের পুরনো। দু'ধারে ভাঙাচোরা আদ্যিকালের বাড়িঘর, কাঁচা নর্দমা, দুর্গন্ধ, আবর্জনা, মাঝে মধ্যে কচুরি-পানায় ঠাসা দু'একটা পুকুর, মন্দির, আগাছায়-ভরা মাঠ। রাজার পাশে বসে বসে খানিকক্ষণ এই দৃশ্য দেখল জয়া। তারপর বলল, 'আপনাদের এই দিকটা বড্ড নোংরা—'

তুলসীদের প্রসঙ্গ জয়া আর তুলল না। এতেই যথেষ্ট আরাম বোধ করল রাজা। উৎসাহের গলায় বলল, 'হ্যাঁ, পুরনো পাড়া তো। মান্ধাতার আমল থেকে এইরকম দেখছি। মিউনিসিপ্যালিটি নামেই আছে। ভোটের আগে আগে কিছু কাজ হয়। নইলে যে-কে সেই। অ্যাদ্দিনে যে শ্লা নোংরায় শ্যামনগর ডুবে যায় নি সেটাই আশ্চর্য।'

জয়া চুপ করে রইল।

একটু পরে তারা স্টেশনে এসে গেল।

আঠার

পরের দিন আরো আগে আগে গিয়েও রাজা দেখল জয়া গীর্জায় এসে গিয়েছে। হাত দু'টো উলটে দিয়ে সে বলল, 'নাঃ, আপনার সঙ্গে পারা যাবে না দেখছি।'

জয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

রাজা বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাবলাম আজ অন্তত আপনার আগে এখানে পৌঁছে যাব। লে বাবা, আপনি তার আগেই হাজির হয়ে গেছেন।'

জয়া হাসল।

রাজা বলল, 'আপনি আট মাইল ঠেঙিয়ে সেই নবীপুর থেকে আসেন। আমি আসি এই কাছাকাছি থেকে। তবু আপনার সঙ্গে পেরে উঠছি না।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'ও যদি হিল্লি দিল্লি থেকেও আসে, তবু ওর সঙ্গে পারবি না।'

'যা বলেছেন।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'চা'টা খাবি তো?'

রাজা মাথা নাড়ল, 'না না, ওসব ঝঞ্ঝাট করে এখন আর দরকার নেই।'

'কেন রে, অমৃতে অরুচি যে?'

'আজ একটু তাড়াতাড়ি যাব।'

'কাজ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

একটু চুপ করে থেকে দ্বিধার গলায় রাজা বলল, 'আজ একে নিয়ে আমাদের বাড়ি যাব।' সে আঙুল বাড়িয়ে জয়াকে দেখিয়ে দিল।

ফাদার ডোনাল্ডসকে চিন্তিত দেখাল। উদ্বেগের গলায় বললেন, 'তোদের বাড়ি নিয়ে যাবি! কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'তোর বৌদি—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন ফাদার ডোনাল্ডস।

রাজা বলল, 'বৌদিকে দেখাবার জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি।'

ফাদার ডোনাল্ডস কী বুঝলেন তিনিই জানেন। আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

এরপর নদীর পাড় থেকে রাজ্যের দেবদারু পাতা আর ফুল নিয়ে এল রাজা। বাজার থেকে লাল-নীল কাগজ কিনে আনল। তিনজনে হাত লাগিয়ে ফুল-পাতা দিয়ে গীর্জা সাজিয়ে ফেলল। ছোট ছোট ক'টা তোরণ তৈরি করল। লাল-নীল কাগজের শিকলি বানিয়ে চারদিকে ঝুলিয়ে দিল। সাজানোর পর গীর্জাবাড়িটাকে আর যেন চেনাই যায় না। রঙে রঙে চার্চটা ঝলমল করছে।

সাজানো গোছানো হয়ে গেলে রাজা বলল, 'এবার চলি—'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'আচ্ছা—' জয়াকে বললেন, 'এই মেয়ে, কাল কিন্তু বড়দিন। খুব সকালবেলা ফার্স্ট ট্রেন ধরে চলে আসবি। কাল কিন্তু দুপুরে ফেরা হবে না। এখানেই খাওয়া দাওয়া করবি। বুঝলি?'

জয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফাদার ডোনাল্ডস আবার বললেন, 'মাকে আমার কথা বলেছিস?'

'হ্যাঁ—' জয়া ঘাড় কাত করল।

'বলবি, পাদ্রী সাহেবের বিশেষ অনুরোধ কালকের দিনটা এখানে খাবি। আমার মনে হয়, তোর মা আপত্তি করবে না।'

'মাকে বলব।'

জয়াকে নিয়ে রাজা চলে গেল। গীর্জা থেকে রাস্তায় নেমে হঠাৎ রাজা বলল, 'সত্যিই যাবেন আমাদের বাড়ি ?'

জয়া স্থির চোখে এক পলক রাজাকে দেখে নিল। তারপর সুরহীন গলায় বলল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'তার মানে?'

'বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি চার্চ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এখন জিজ্ঞেস করছেন' সত্যিই যাব কিনা—'

রাজা থতিয়ে গেল। একটু পর অন্যমনস্কের মতো বলল, 'ব্যাপারটা কি জানেন—'

বাধা দিয়ে জয়া বলল, 'আপনার বৌদি তো—'

'হ্যাঁ—' রাজা বলতে লাগল, 'বৌদি যদি আপনাকে কিছু বলে, মানে ব্যবহার ট্যবহার খারাপ করে—'

'আমি কিছুই মনে করব না।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

জয়া বলল বটে, রাজা কিন্তু তেমন ভরসা পেল না। বিমর্ষ চিন্তিত মনে চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা রাজাদের বাড়ি এসে গেল। দরজায় কড়া নাড়তেই বৌদি এসে খুলে দিল। বৌদিকে ঠিক এই মুহূর্তে প্রত্যাশা করেনি রাজা। ভেবেছিল, বুলা টুলা কিংবা টুনি এসে দরজা খুলবে।

রাজার মতো তুখোড় ছেলেও থতিয়ে গেল। এই প্রথম সে অনুভব করল, বৌদির সঙ্গে যতই ঝগড়া করুক, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যতই খিস্তিটিস্তি দিক, মনে মনে এই মেয়েমানুষটাকে সে ভয় করে। তার বুকের ভেতর ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কিছু একটা খেলে গেল। কী বলবে, রাজা ভেবে পেল না।

বৌদি পলকহীন তাকিয়ে তাকিয়ে রাজা এবং জয়াকে দেখছিল। একসময় আবেগহীন গলায় বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস—'

দু'জনে ভেতরে ঢুকল।

জয়াকে দেখিয়ে বৌদি জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটি কে ?'

জয়ার কী পরিচয় দেবে, রাজা ঠিক করতে পারল না। অস্থিরভাবে একটা কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু গলার স্বর এত অস্পষ্ট যে বোঝা গেল না।

মাঝখান থেকে জয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি জয়া—' এমনিতে মেয়েটা ভীরু লাজুক এবং আড়ষ্ট। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে। কুণ্ঠা বা আড়ষ্টতার লেশমাত্র নেই।

ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বৌদি। তারপর আবার রাজাকেই জিজ্ঞেস করল, 'এর কথাই সেদিন বুড়ো পাদ্রীকে বলছিলে না?'

বৌদির স্মৃতিশক্তি যে এত সাংঘাতিক, কে ভাবতে পেরেছিল! রাজা অবাক হয়ে গেল। কেশে গলাটা সাফ করতে করতে আবছা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তোমার মনে আছে?'

'আমার সব মনে থাকে। কিছুই ভুলি না—'

রাজা চুপ।

বৌদি আবার বলল, 'আজ তা হলে একেবারে বাড়ি এনেই তুললে!'

রাজার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বৌদি ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। যদি জয়াকে অসম্মানজনক কিছু বলে আজ আর রক্ষা নেই। একেবারে তুলকালাম করে ছাড়বে। চাপা তীক্ষ্ণ গলায় রাজা বলল, 'হ্যাঁ তুললাম। তোমার আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি আবার কী। আর করলেই বা তুমি শুনবে?'

রাজা উত্তর দিল না। খুব সতর্কভাবে বৌদিকে লক্ষ করতে লাগল।

বৌদি রাজাকে আর কিছু বলল না। জয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোথায় থাক?'

'নবীপুর—'

'সেখান থেকেই এলে?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা-মা আছে?'

'মা আছেন, বাবা নেই—'

কথায় কথায় ওরা ভেতর দিকের একটা ঘরে এসে পড়েছিল। বৌদি বলল, 'তোমরা এ ঘরে বসো, আমি যাই—'

জয়া বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'রান্নাঘরে। কড়ায় ডাল চাপিয়ে এসেছি। এতক্ষণে তলা বোধহয় ধরে গেল—'

'চলুন আমিও যাই—'

'তুমি রান্নাঘরে যাবে!'

'হ্যাঁ। এখানে বসে কার সঙ্গে গল্প করব?'

'কেন, ঠাকুরপোই তো আছে।'

জয়া বলল, 'ওর সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে হলে তো বাইরেই করতে পারতাম। আমি এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।'

'আমি আবার একটা মানুষ—' বৌদি মুখ বাঁকাল, 'আমার সঙ্গে আবার আলাপ! হুঁ—'

জয়া হাসল, 'ধরুন না কেন, আমি আপনার একটা নতুন বোন। কতদূর থেকে আসছি, দু'টো কথাও বলবেন না?'

স্থির নিষ্পলকে জয়াকে আরেকবার দেখে নিল বৌদি। কী ভেবে খুব আস্তে করে বলল, 'এস তা হলে—'

বৌদির গা ঘেঁষে ঘেঁষে হাটতে লাগল জয়া। রাজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, ওরা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

জয়াটাকে যত সোজা সরল ভাবা গিয়েছিল, আসলে দেখা যাচ্ছে তা নয়। বেশ চালাক মেয়েটা, বৌদিকে মোটামুটি জপিয়ে ফেলেছে। অবশ্য শেষরক্ষা করতে পারবে কিনা কে জানে!

রাজা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ অদ্ভুত এক সন্দেহ তার মনে দ্রুত ছায়া ফেলল। রান্নাঘরে বসে ওরা কী গল্প করবে? রাজা নিজের যে অন্ধকার দিকগুলো জয়ার কাছে গোপন করে রেখেছে, বৌদি সে সব বলে দেবে না তো? রাজা অস্থির হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে বিচিত্র স্নায়ুভীতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যেন। যে সন্দেহটা তার মনে ছায়া ফেলেছে তার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

রাজা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার মাথার ভেতর চাকার মতো কী একটা ঘুরছিল। বড় বড় পা ফেলে সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

উঠোনে নামতেই দেখা গেল, উনুনের কাছে বসে খুন্তি দিয়ে কড়ায় কী নাড়ছে বৌদি, জয়া পাশেই একটা কাঠের পিঁড়িতে বসে বসে কী বলছে। রাজা সোজা গিয়ে দরজায় দাঁড়াল।

বৌদি ঘাড় ফেরাতেই রাজাকে দেখতে পেল। বলল, 'এই যে ঠাকুরপো, তোমাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম। এসে ভালই করেছ।'

রাজা তীক্ষ্ণ চোখে বৌদিকে দেখে নিল। বৌদির মুখের পরিচিত কঠিন রেখাগুলো একটু যেন নরম। চোখের দৃষ্টিতে সেই চেনা রুক্ষতাও নেই। রাজা কিছুটা বিমূঢ়। তবু সাবধানী ভঙ্গিতে বলল, 'ডাকতে যাচ্ছিলে কেন?'

'বা রে, মেয়েটা প্রথম দিন এল। ওকে কিছু খাওয়াবে না? যাও, দেশপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে রসগোল্লা নিয়ে এস। ওরা রসগোল্লাটা বানায় ভাল।'

রাজা বৌদিকে যত দেখছে ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছে। জয়া কি মন্ত্র টন্ত্র জানে? তার জন্য এরকম একটা আপ্যায়ন যে অপেক্ষা করছিল, কে জানত! রাজা তো উলটোটাই ভেবে নিয়েছিল। তবু তার সংশয় পুরোপুরি কাটল না। বৌদির মতলবটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দোকানে যাওয়ার জন্যে রাজা পা বাড়াতে যাবে, বাধা পড়ল। জয়া দ্রুতবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'না না, এখন আর কিছু আনতে হবে না।'

বৌদি বলল, 'তাই কখনো হয়। প্রথম দিনে তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ না করাতে পারলে কি ভাল লাগবে!' রাজাকে বলল, 'যাও ঠাকুরপো, আর দাঁড়িয়ে থেক না।'

রাজা চলে গেল। খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে দেখল, বৌদি আর জয়া কী একটা মজার কথায় হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। খানিক আগে বাড়ি ঢুকে টুনিদের দেখতে পায় নি। হয়তো ওরা কোথাও খেলতে টেলতে গিয়েছিল। এখন দেখা গেল, জয়াদের ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও হাসছিল।

রসগোল্লার ভাঁড়টা বৌদির হাতে দিয়ে রাজা অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কতকাল পর বৌদিকে হাসতে দেখছে সে? বৌদি যে এককালে খুব হাসিখুশি আমুদে মেয়ে ছিল আজকাল তা মনেও পড়ে না। বিয়ের পর কিছুদিন প্রতি কথায় ছিল তার হাসি আর রগড়। নানা রকমের দুষ্টুমি তার মাথায় গিজ গিজ করত। সে সব কত কাল আগের ঘটনা। পূর্বজন্মের স্মৃতির মতো সুদূর আর অবিশ্বাস্য মনে হয়। রাজা বলল, 'এত হাসি কিসের?'

বৌদি কাচের প্লেটে রসগোল্লা সাজিয়ে জয়াকে দিতে দিতে বলল, 'জয়া ওদের ওখানে একটা পাগলার কাণ্ডকারখানার কথা বলছিল। তাই—'

রাজা বলল, 'ও—' জয়াকে বলল, 'বেশ জমিয়ে নিয়েছেন দেখছি—'

জয়া ইঙ্গিতময় হেসে প্লেট থেকে টুনিদের হাতে একটা করে মিষ্টি তুলে দিতে লাগল।

বৌদি চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কি, ওদেরই তো সব দিয়ে দিলে। তুমি কী খাবে?'

জয়া বলল, 'এই তো আছে—'

'মোটে একটা।'

'ওতেই হবে।'

'না না, এই দু'টো নাও—'

জয়াকে কিছুতেই আর দেওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট মিষ্টিটা মুখে পুরে এক গেলাস জল খেয়ে সে উঠে পড়ল, 'এবার যাই দিদি—'

'তাই কখনো হয়! এই দপুরবেলা একমুঠো ভাত না খাইয়ে তোমাকে ছাড়তে পারি। অবিশ্যি খেতে দেবার মতো কিছুই নেই। শুধু ডাল-ভাত—'

জয়া বলল, 'আপনার হাতের ডাল-ভাতই আমার কাছে অনেক। কিন্তু দিদি আজকের দিনটা আমাকে ক্ষমা করে দিন। মাকে বলে আসিনি তো। রান্নাবান্না করে রেখেছেন। সেগুলো নষ্ট হবে। তা ছাড়া, এবেলা ফিরে না গেলে মা ভীষণ ভাববে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৌদি বলল, 'তা হলে তো ফিরে যেতেই হয়। কিন্তু আরেকদিন এসে দু'মুঠো না খেয়ে গেলে কিন্তু আমার শান্তি হবে না।'

'একদিন কেন, বলেন তো রোজ এসে খেতে পারি—' বলতে বলতে জয়া উঠে পড়ল।

'আচ্ছা দেখা যাবে—' বৌদিও উঠল।

রান্নাঘরের বাইরে পা বাড়িয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে আবার ঘুরে দাঁড়াল জয়া। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে বৌদির পা ছুঁল।

বৌদি বিব্রতভাবে বলল, 'একি একি, আবার প্রণাম কেন?'

'বা রে, আপনি আমার দিদি। যাবার সময় একটা প্রণাম করব না?' রান্নাঘর থেকে জয়া এবার বেরিয়ে এল। রাজা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বলল, 'চলুন, আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবেন।'

রাজা নিঃশব্দে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জয়া তাকে অনুসরণ করতে লাগল। বৌদি এবং দাদার ছেলেমেয়েরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

জয়ারা রাস্তায় নামতেই বৌদি সস্নেহে, গাঢ় গলায় বলল, 'আবার এস জয়া—'

'আসব—' জয়া ঘাড় হেলিয়ে দিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা যেতেই একটা সাইকেল রিকশা পাওয়া গেল। রিকশায় উঠে স্টেশনে যাওয়ার কথা বলে দিয়ে রাজা সোজাসুজি স্থির চোখে জয়াকে দেখতে লাগল। আলাপ টালাপ হওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝেই এভাবে জয়াকে দেখে সে।

জয়ার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল, 'এমন করে তাকিয়ে থাকবেন না তো—'

রাজা যেন তার কথা শুনতে পেল না। নিজের মনে বলে যেতে লাগল, 'মাইরি বলছি, আপনাকে যত দেখছি তত ট্যারা হয়ে যাচ্ছি—'

'তার মানে?' জয়ার কপাল কুঁচকে যেতে লাগল।

'মানে আপনি দারুণ ওস্তাদ আছেন। গুরু—গুরু, টপ গুরু—'

'কিরকম?'

'আমি তো ভেবেছিলাম, বাড়ি নিয়ে গেলে রায়ট বেধে যাবে। কিন্তু না, বৌদিকে ঠিক জপিয়ে ফেলেছেন—'

জয়ার কপালের ভাঁজগুলো অদৃশ্য হল। ঠোঁট টিপে অল্প হাসল সে।

রাজা আবার বলল, 'বৌদিকে কী করে ভজালেন বলুন তো?'

রহস্যময় গলায় জয়া বলল, 'সে একটা কায়দা আছে—'

'কী কায়দা?'

'তা বলছি না।'

একটু ভেবে রাজা বলল, 'বেশ, না বললেন। বৌদিকে কেমন দেখলেন তাই বলুন—'

জয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি যা বলেছেন, ঠিক তার উলটো—'

রাজা থতিয়ে গেল, 'উলটো!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ উলটো—' জয়া বলতে লাগল, 'আপনি যখন মিষ্টি আনতে গেলেন তখন বসে কত গল্প করলাম। ব্যাপারটা কি জানেন, মানুষটা চমৎকার। অভাবে দুঃখে হয়তো অনেক সময় মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ঝগড়াঝাঁটি করে, গালাগালি দেয়। নিজেই সে সব বলছিল।'

রাজার বিস্ময় বাড়ছিলই। দিনের পর দিন একই বাড়িতে থেকে যা সে টের পায় নি, এক পলকের দেখায় জয়া তা বুঝে ফেলল!

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাজা আবার শুরু করল, 'বৌদির সঙ্গে কী গল্প করছিলেন?'

'সে কি এক রকমের গল্প! আমাদের বাড়ির কথা, আপনাদের বাড়ির কথা। আজকালকার অবস্থা, জিনিসপত্রের দাম। সে হাজার রকম ব্যাপার—'

'আমার কথা কিছু হয়নি?'

'বাবা, আপনার কথা আবার হবে না!' চোখের তারা ঘুরিয়ে জয়া হাসল।

'কী কথা হল আমার সম্বন্ধে?'

'বলছিল আপনি গুণধর।'

রাজার হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন দ্রুত হল, 'কিরকম?' তার ভয়, সেই অন্ধকার ঘৃণ্য দিকগুলো বৌদি আবার জয়ার কাছে মেলে দিয়েছে কিনা।

জয়া বলল, 'কিরকম আবার। গুণধর গুণধরই—'

'নকশা করছেন কেন মাইরি। কী বলেছে তাই বলে ফেলুন না—' রাজার উদ্বেগ বা ভয়, কোনোটাই কাটছিল না।

জয়া বলল, 'খারাপ কিছু বলে নি মশাই, খারাপ কিছু বলে নি। বরং লম্বা একখানা সার্টিফিকেটই দিয়েছে।'

'যেমন?'

'বাবা রে বাবা, তাও শুনতে হবে?'

'ভাল ভাল কথা কে শুনতে না চায় বলুন—'

'এমন প্রশংসার কাঙাল আর কখনো দেখিনি—' জয়া আরম্ভ করল, 'আপনার বাবা আর দাদা মারা যাবার পর কত কষ্ট করে সংসারটাকে চালাচ্ছেন, সেই কথাই বলছিল আপনার বৌদি। বলছিল, আপনি না থাকলে এতগুলো মানুষ ভেসে যেত—'

বুকের ওপর থেকে পাষাণভারের মতো খানিকটা কী যেন নেমে গেল রাজার। পরক্ষণেই আরেক দিক থেকে অন্য রকম সংশয় তাকে ঘিরে ধরল। দ্বিধার গলায় রাজা বলল, 'আমি কিভাবে রোজগার করি, বলেছে?'

'বলেছে।'

'কী?' রাজার গলার ভেতর থেকে ঝাপসা, দুর্বল স্বর বেরিয়ে এল।

জয়া লক্ষ করে নি। বলল, 'কী ব্যবসা ট্যাবসা করেন—'

রাজা আর কিছু বলল না। বুক ভরে এতক্ষণে স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস টানতে পারল।

জয়াকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে ঝটপট স্নান করে নিল রাজা। খেতে বসে কিন্তু থালার দিকে নজর ছিল না। বার বার সামনে বসে-থাকা বৌদির দিকে তার চোখ চলে যাচ্ছে। খিটখিটে, রাগী, ঝগড়াটে এই মেয়েমানুষটির ভেতর থেকে এক অচেনা মমতাময়ীকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছে। বিস্ময়টা কিছুতেই আর কাটছে না।

বৌদি ডাকল, 'ঠাকুরপো—'

রাজা তাকিয়েই ছিল। বলল, 'কী বলছ?'

'জয়া মেয়েটা বেশ।'

রাজা উত্তর দিল না।

বৌদি আবার বলল, 'প্রথম দিন এসেই মন কেড়ে নিয়েছে।'

রাজা চুপ।

বৌদি বলতে লাগল, 'আমাদের বাড়ি মাঝেমধ্যে ওকে নিয়ে এস—'

জড়ানো গলায় রাজা বলল, 'আনব।'

একটু ভেবে বৌদি এবার বলল, 'মেয়েটা ভারি দুঃখী ঠাকুরপো। বাপ নেই। একটা বোন পাগল। এই বয়েসে সংসারের সব দায় ওইটুকু মেয়েটার কাঁধে চেপেছে। অথচ চাকরি বাকরি কিছু নেই।'

রাজা কিছু বলল না।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বৌদি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এক কাজ কর না ঠাকুরপো—'

'কী?'

'তোমার রমলাদির সঙ্গে কত লোকের তো আলাপ। তাকে বলে জয়ার একটা চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করে দাও—'

রাজা ভীষণ চমকে উঠল। তারপর হেসে বলল, 'তুমি একদিনেই জয়াকে ভালবেসে ফেলেছ দেখছি।'

'ভালবাসার মতো মেয়ে, তাই—'

খাওয়া দাওয়া হলে আঁচিয়ে এসে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল রাজা। টিপ করে বৌদির পায়ে মাথা ঠুকে দিল।

বৌদি পা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'আরে আরে, এ কী করছ! এ কী করছ।' রাজার হাত ধরে ফেলল সে।

গাঢ় আবেগের গলায় রাজা বলল, 'তোমাকে কতকাল প্রণাম করি না। আজ ভারি ইচ্ছে হল একটা করি—'

তাকে পাশে বসিয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বৌদি। তারপর কাঁপা কাঁপা, অস্থির গলায় বলতে লাগল, 'কতকাল তোমাকে এত কাছে পাইনি ঠাকুরপো। মনে পড়ে, আমার বিয়ের পর তুমি কাছছাড়া হতে না?'

'পড়ে।'

'আমি যখন এ বাড়িতে আসি তুমি তখন আর কতটুকু! সাত আট বছরের বেশি হবে না। বলতে গেলে দুধের ছেলেই। তোমার মা ছিল না। আমিই তোমাকে বকে করে মানুষ করেছি।'

'জানি বৌদি, জানি। আমি কিছুই ভুলিনি।'

বুকের ভেতর অনেকদিনের একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে গিয়েছে। বৌদি বলে যেতে লাগল, 'সেই দুধের ছেলেকে আজকাল যা মুখে আসে তা-ই বলি।'

রাজা বলল, 'থাক বৌদি, ওসব কথা থাক। আমিও কি তোমাকে ছেড়ে দিই? যা-তা খিস্তি করি। তুমি আমার মায়ের মতো—'

'শোকে অভাবে আমার মাথাটার ভেতর আর কিছু নেই ঠাকুরপো। যদি কখনো কিছু বলে ফেলি তুমি ওগুলো ধরো না।'

রাজা উত্তর দিল না। তার মনে হতে লাগল, অনেক—অনেকদিন পর এ বাড়ির দমবন্ধ গুমোট ঘরগুলোতে দখিনা বাতাস খেলা করে বেড়াচ্ছে।

উনিশ

জয়াকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবার পর সেই যে রাজা বাড়ি ঢুকেছিল তারপর আর বেরুল না। বাকি দিনটা বৌদির কাছে বসে পুরনো দিনের সুখের গল্প করে করেই কাটিয়ে দিল।

তারপর যেই সন্ধে হল, তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে টুনিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল রাজা। রাত পোহালেই বড়দিন। কাল যেমন করে হোক, জয়ার আগে আগে তাকে গীর্জায় পৌঁছতে হবে। রোজ রোজ মেয়েটার কাছে হেরে যাওয়া ঠিক না।

পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠে পড়ল রাজা। দ্রুত মুখটুখ ধুয়ে প্যান্ট-ট্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়ল। গীর্জায় যখন পৌঁছল, পুব দিকটায় সবে আলোর ছোপ ধরেছে।

গীর্জাবাড়িটাকে আজ আর চেনা যায় না। রাজারা কাল যে সাজিয়ে গিয়েছিল তাতেই খুশি থাকেন নি ফাদার ডোনাল্ডস। কোত্থেকে বিরাট এক ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে এসেছেন। বুড়ো সান্তা ক্লজের মূর্তি এনে বসিয়েছেন। তা ছাড়া, আলোয় আলোয় গীর্জাটাকে ঝলমলে করে তুলেছেন।

রাজা দেখল, ফাদার ডোনাল্ডস ছাড়া গীর্জাবাড়িতে এখন আর কেউ নেই। যিশুখ্রিস্টের ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে এখনও তিনি বড়দিনের প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। তাঁর সুরেলা গম্ভীর কণ্ঠস্বর নির্জন নিস্তব্ধ গীর্জার পবিত্রতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রার্থনা শেষ হলে ঘুরে দাঁড়াতেই রাজাকে দেখতে পেলেন ফাদার ডোনাল্ডস, 'কতক্ষণ এসেছিস রে?'

রাজা বলল, 'মিনিট দশেক হবে।'

'আজ দেখছি গুড় বয়। একেবারে ভোর হতে না হতে এসে গেছিস।'

রাজা হাসল।

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। চল ওইখানে বসি গিয়ে—'

দু'জনে সেই দড়ির খাটিয়াটায় গিয়ে বসল। ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'আজ জয়ার ওপর খুব টেক্কা দিয়েছিস—'

রাজা এবারও হাসল।

'রোজ ও তোকে হারিয়ে দেয়। আজ কিন্তু ও ডিফিটেড—' ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'জয়াকে হারাতে গিয়ে আজ ভোরের সুখনিদ্রাটা গেল, না কি বলিস?'

রাজা হেসে ফেলল, 'তা যা বলেছেন—'

'যাক, জয়ার জন্যে তবু একদিন তাড়াতাড়ি উঠলি—'

সে কথার উত্তর না দিয়ে রাজা বলল, 'আমি কিন্তু চা'ফা খেয়ে আসিনি। এখন এক কাপ না খেতে পারলে ঠাণ্ডায় স্রেফ আইসক্রিম হয়ে যাব।'

'একটু সবুর কর। জয়া আসুক, তারপর একসঙ্গে চা হবে।'

হতাশ একটা ভঙ্গি করে দু' হাতের তালু উলটে দিল রাজা, 'সবুরই করি—'

ফাদার ডোনাল্ডস এবার বললেন, 'শেষ পর্যন্ত কাল জয়াকে তোদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ—' রাজা ঘাড় কাত করল।

রাজার দিকে অনেকটা ঝুঁকলেন ফাদার ডোনাল্ডস, 'তারপর—'

'তারপর বলতে?'

'যুদ্ধের ফলাফল কী হল?'

'যুদ্ধ হবে কেন?'

ফাদার ডোনাল্ডস অবাক, 'যুদ্ধ হয় নি! তোর বৌদি কি তবে জয়াকে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলেছিল?'

রাজা বলল, 'প্রায় সেই রকমই—'

'ব্যাপার কি রে! বল—বল, সবটা শুনি—'

কাল জয়াকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর থেকে যা যা হয়েছে, আগাগোড়া বলে গেল রাজা। সব শুনবার পর ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'কাল তো তা হলে তোর জীবনে একটা দারুণ দিন গেছে। গ্র্যান্ড—'

তৃপ্তি এবং আনন্দ মিশিয়ে রাজা হাসল।

ফাদার ডোনাল্ডস আবাব বললেন, 'মেয়েটা পযা আছে রে—'

রাজা কী বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, সিঁড়ি ভেঙে জয়া ওপরে উঠে এল। ফাদার ডোনাল্ডস চেঁচিয়ে, সুর টেনে বলতে লাগলেন, 'এস, এস হে জযারানী। আজ কিন্তু তুই পরাজিত। রাজ চক্রবর্তী তোব চাইতে আগে এসে পড়েছে।'

এক পলক বাজাকে দেখে নিয়ে জযা হাসল, 'তাই তো! আমাকে হাবাবার জন্যে সারা রাত জেগে বসে ছিলেন নাকি?'

'খাসা বলেছিস—' ফাদার ডোনাল্ডস হই চই জুড়ে দিলেন, 'এটা তো আমাব মাথায় আসে নি।'

আরো কিছুক্ষণ এই নিয়ে ঠাট্টা টাট্টা চলল। তাবপর চা তৈবি হল। কলকাতা থেকে ক্রিসমাস কেক আর ফল টল কালই আনিযে রেখেছিলেন ফাদার ডোনাল্ডস। সেই সব খাওয়া হল।

খেতে খেতে ফাদাব ডোনাল্ডস বললেন, 'হ্যাঁ বে জযা, আজ মাকে বলে এসেছিস তো, দুপুরবেলা ফিরবি না?'

'হ্যাঁ—'

'এখানে কিন্তু রান্নাবান্না করতে হবে। বাজা আর আমি অবশ্য হাতে হাতে জোগাড় দেব। রাঁধতে পারিস তো?'

জয়া হাসল। অর্থাৎ এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই।

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'কী খাবি বল—'

'কী খাব?'

'মাংস না মাছ?'

জয়া চুপ করে থাকল।

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'আরে বাপু, লজ্জার কি আছে? বল না কী খাবি—'

জয়া উত্তর দিল না।

ফাদার ডোনাল্ডস এবার বললেন, 'ঠিক আছে, মাছও হোক মাংসও হোক।'

রাজা ইশারায় জয়াকে দেখিয়ে বলল, 'মাছ মাংস, দুই-ই খাবার বোধহয় ইচ্ছে—'

জয়া রক্তিম লাজুক মুখে ভেংচে উঠল, 'আপনাকে বলেছে! আমি ছোঁচা, না?'

জয়ার মুখচোখের ভাব দেখে রাজারা হেসে উঠল।

জয়া লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এরকম করলে কিন্তু আমি চলে যাব—'

ফাদার ডোনাল্ডস সস্নেহে তার একটা হাত ধরে বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'দূর বোকা, তুই ঠাট্টাও বুঝিস না?' রাজাকে বললেন, 'যা, বাজার থেকে ভাল গলদা চিংড়ি, কাটা রুই, কপি, কড়াইশুঁটি আর মাংস নিয়ে আয়। ভাল কথা, দই আর মিষ্টিও আনবি। ততক্ষণ আমরা উনুনে আঁচ ধরিয়ে দিচ্ছি—'

রাজা থলে টলে নিয়ে বাজারে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পর বাজার থেকে ফিরে এসে রাজা দেখল, চার্চের পেছন দিকের একটা ঘরে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে বসে আছে জয়া। বাইরের বারান্দায় একটা মোড়ার ওপর বসে আছেন ফাদার ডোনাল্ডস। ওরা কী গল্প টল্প করছিল। এখান থেকে গীর্জার বড় হল-ঘরটা চোখে পড়ে। যিশুখ্রিস্টের বড় অয়েল পেন্টিংটা অবশ্য দেখা যায় না, কিন্তু বড়দিন উপলক্ষে ফাদার ডোনাল্ডস যে প্রকাণ্ড ক্রিসমাস ট্রি আর বুড়ো সান্তা ক্লজকে সাজিয়েছেন সে দু'টো স্পষ্ট দেখা যায়।

যাই হোক, বাজার এসে গিয়েছে। তিন জনে ক্ষিপ্র হাতে মাছ-মাংস আনাজ-টানাজ কেটে কুটে ধুয়ে ফেলতে লাগল।

ভাত নামলে ডাল চড়ল। ডালের পর মাছ। তারপর মাংস। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে গল্প এবং হাসিঠাট্টাও চলছে।

হঠাৎ রাজা বলল, 'ব্যাপারটা পিকনিকের মতোই হল। ঘরের ভেতর না করে বাইরে কোথায় নিয়ে রেঁধে টেঁধে খেলে হত।'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'ঠিক বলেছিস। কাল যদি পিকনিকের কথাটা বলতিস। যাক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আসছে বছর বড়দিনে আমরা তিনজনে কোথাও চড়ুইবাতি করতে যাব। আমি যদি ভুলেও যাই তোরা কিন্তু মনে করিয়ে দিস।'

রাজা বলল, 'আসছে বছর পর্যন্ত শ্লা বেঁচে তো থাকি ! যা দিনকাল, তার আগে পটকে না যাই—'

'কী যে বলিস, তার মাথামুণ্ডু নেই—'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর জয়া হঠাৎ ফাদার ডোনাল্ডসকে বলল, 'একটা ব্যাপার আমি ঠিক জানি না—'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'কী?'

'বড়দিনে এক্সমাস ট্রির সঙ্গে ওই বুড়ো লোকটাকে সাজানো হয় কেন?' আঙুল বাড়িয়ে হল-ঘরে ক্রিসমাস ট্রির তলায় বুড়ো সান্তা ক্লজকে দেখিয়ে দিল জয়া।

বড়দিনের মহিমা এবং সান্তা ক্লজের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'বড়দিনে বুড়ো সান্তা ক্লজ উপহার নিয়ে আসে।'

রাজা বলল, 'সবার জন্যে?'

'ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'বাচ্চাদের জন্যে।'

'আমার জন্যে?'

'নিশ্চয়ই। মনে মনে তুইও তো বাচ্চাই রে—'

'কই, কোনো উপহার তো পাই নি—'

'সারাদিনটা কাটুক, তারপর ভেবে দেখিস—'

রান্নাবান্নার পর স্নান-খাওয়া সারতে সারতে শীতের বেলা গড়িয়ে এল। রাজা বলল, 'এবার একটু শুয়ে নেওয়া যাক।'

'না না, কক্ষনো না—' ফাদার ডোনাল্ডস জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'এই অবেলায় ঘুমুলে আর দেখতে হবে না। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করবে। তার চাইতে একটা কাজ করা যাক—'

'কী?'

'চল্ নদীতে একটা নৌকো ভাড়া করে ঘুরে আসি—'

জয়া লাফিয়ে উঠল, 'খুব ভাল হবে। চলুন—চলুন। আমি কক্ষনো নৌকোয় চড়িনি।'

'সে কি রে মেয়ে! এত বয়েস হল, এখনও নৌকোয় চড়িস নি!' ফাদার ডোনাল্ডস অবাক. 'তবে তো তোর সাধটা মিটিয়ে দিতেই হয়।'

কিছুক্ষণ পর তিনজন নদীর ঘাটে এসে একটা নৌকো ভাড়া করে উঠে বসল। মাঝি বৈঠার চাড় দিয়ে নৌকোটাকে গভীর জলের দিকে নিয়ে গেল।

উত্তুরে বাতাসের জন্য নদীতে বেশ ঢেউ উঠছে। কাজেই নৌকোটা খুব দুলছিল।

মাঝমধ্যিখানে বসে জয়া ভয়ে জড়সড়। ভীরু গলায় সে বলতে লাগল, 'ওরে বাবা, নৌকো উলটে যাবে না তো?'

জয়ার ছেলেমানুষি ভয়ে রাজার খুব মজা। জোরে জোরে নিজে দুলে দুলে নৌকোটাকে আরো দোলাতে দোলাতে সে বলল, 'এই ওলটাল, এই ওলটাল—'

জয়া কাঠ। প্রাণপণে সে চেঁচাতে লাগল, 'আমি কিন্তু সাঁতার জানি না। নৌকা ডুবে গেলে মরে যাব, মরে যাব—'

ফাদার ডোনাল্ডস রাজাকে ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন, 'অ্যাই রাজা, কী বদমাইশি হচ্ছে।'

রাজা হাসতে হাসতে দুলুনি থামাল। রগড়ের গলায় বলল, 'এক্কেবারে ভীতুর ডিম।'

দেখতে দেখতে নৌকোটা মাঝনদীতে এসে গেল। শীতের এই অবেলায় রোদের রং গাঁদাফুলের মতো। ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন পাপড়ির মতো আকাশময় অসংখ্য পাখি উড়ছিল। বড়দিন বলে আরো অনেকে নৌকো ভাড়া করে বেড়াতে বেরিয়েছে। নৌকোয় নৌকোয় নদীর জল দেখা যায় না।

ফাদার ডোনাল্ডস আকাশে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওইগুলো কী পাখি বল তো জয়া—'

জয়া বলল, 'কি জানি, ডাক পাখি বোধ হয়—'

'হল না। তুই বল রাজা—'

রাজা ঘাড় চুলকে বলল, 'কাদাখোঁচা হবে—'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'তোমার মাথা। একেক জন দেখছি পক্ষিতত্ত্ববিদ—'

রাজা বলল, 'আমি শ্লা অত পাখিটাখির খোঁজখবর রাখি না। আমার খবর কে রাখে তার ঠিকঠিকানা নেই, তা পাখির খবর—'

জয়া শুধলো, 'কী পাখি ওগুলো?'

'শঙ্খচিল।'

'বাঃ, বেশ সুন্দর দেখতে তো—'

ফাদার ডোনাল্ডস বলতে লাগলেন, 'জগতে আরো অনেক সুন্দর জিনিস আছে। তোরা তো চোখ মেলে দেখবি না। মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসব দেখতে হয়। ফুল-পাখি-আকাশ-মাঠ—তাতে মনের অনেক ময়লা মুছে যায়—'

রাজা বলে উঠল, 'আপনার মতো আমাদের হাতে তো ফালতু সময় নেই যে পাখি দেখে বেড়াব। কত বড় সংসার চালাতে হয়—'

'তার মধ্যেই সময় করে নিতে হয়, বুঝলি—'

খানিকক্ষণের এ গল্প সে গল্পের পর কাছের একটা নৌকো থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় গানের সুর ভেসে এল— •

'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায় বুঝি তার নাগাল পেলে না। ....'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'কেউ গাইছে বোধ হয়—'

রাজা বলল, 'না, গ্রামোফোন চালাচ্ছে—'

গানটা কিন্তু সব শোনা গেল না। গ্রামোফোন-ওলা নৌকোটা দূরে চলে গেল।

ফাদার ডোনাল্ডস হতাশার গলায় বললেন, 'অমন সুন্দর গানটা শুনতে পেলাম না, বিচ্ছিরি

লাগছে।' একটু চুপ করে থেকে জয়াকে বললেন, 'এই মেয়ে, তুই গান জানিস?'

দ্রুত মুখ তুলে জোরে জোরে মাথা নাড়ল জয়া, 'না না, আমি গান টান জানি না—'

'কোনো দিন গাস নি?'

'ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে একটু আধটু গুন গুন করেছি। তাকে গান জানা বলে না—'

রাজা বলে উঠল, 'আরে মশাই, যা জানেন তাই গান না। এ তো আর ফাংসান না, নিজেদের ব্যাপার—'

ফাদার ডোনাল্ডস উৎসাহের গলায় বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গা। একটা গান শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে—'

অনেক পীড়াপড়ির পর জয়া বলল, 'আপনারা যখন অত করে বলছেন তখন গাইছি। খারাপ হলে কিন্তু তখন বলতে পারবেন না—'

ফাদার ডোনাল্ডস বললেন, 'না, কী আবার বলব—'

রাজা বলল, 'উঁহু, খারাপ হলে গর্দান নেওয়া হবে।'

তার বলার ধরনে সবাই হেসে উঠল। তারপর জয়া শুরু করল ঃ

'আমার মন মানে না—দিনরজনী।
আমি কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কী ভাবিয়া মনে .....'

প্রথমে চাপা সুরে গাইছিল জয়া। ধীরে ধীরে সংকোচ কেটে যেতে সে গলা ছাড়ল।

গান শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ রেশটা থেকে গেল। তারপর ফাদার ডোনাল্ডস ললেন, 'তোর গলাটা কিন্তু চমৎকার—'

রাজা বলল, 'গান শিখলে মাইরি নাম-করা আর্টিস্ট হতে পারতেন।'

ক্রমে রোদের রং মলিন হয়ে গেল। শীতের ছায়া নামতে লাগল নদীর জলে। উলটোপালটা উত্তুরে হাওয়ায় হিম মিশতে লাগল। ক্লান্ত ডানায় আকাশ মাপতে মাপতে পাখিরা এখন ফিরে যাচ্ছে।

ফাদার ডোনাল্ডস একসময় বললেন, 'এবার ফেরা যাক, কি বলিস?'

রাজা বলল, 'হ্যাঁ, সন্ধে হয়ে এল।'

নদীর পাড়ে নেমে ফাদার ডোনাল্ডস গীর্জার দিকে চলে গেলেন। রাজারা তাঁর সঙ্গে গেল না; ওখান থেকেই বিদায় নিয়ে বড় রাস্তায় এসে রিকশায় উঠল।

পাশাপাশি বসে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে আজকের দিনটার কথাই বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল রাজার। ভোরবেলা উঠে চার্চে যাওয়া, ফাদার ডোনাল্ডসের সুরেলা গম্ভীর গলায় বড়দিনের স্তব, তিনজনে মিলে রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া, হাসি ঠাট্টা, নৌকোয় করে ঘোরা, জয়ার গান—সবটা মিলিয়ে অলৌকিক স্বপ্নের মতো। হঠাৎ খুব গাঢ় গলায় সে বলল, 'আজকের দিনটা খুব সুন্দর কাটল, না?'

জয়াও হয়তো তার মতোই কিছু ভাবছিল। বলল, 'হ্যাঁ।'

আচমকা রাজার মনে পড়ল, ফাদার ডোনাল্ডস বলেছিলেন, বুড়ো সান্তা ক্লজ বড়দিনের উপহার নিয়ে আসে। সান্তা ক্লজ তার জন্যে এই স্বপ্নের মতো সুন্দর দিনটা নিয়ে এসেছে।

জয়াকে ট্রেনে তুলে দিয়ে 'শোভা কাফে'তে এল রাজা। আজ সারাদিনে একবারও এখানে আসার সময় পায় নি সে।

রাজাকে দেখে তুলসীরা হুল্লোড় বাধিয়ে দিল। গৌর বলল, 'ঠিক সময় এসে গেছিস। আরেকটু দেখে আমরা তোর বাড়ি যেতাম।'

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে রাজা বলল, 'কী ব্যাপার?'

তুলসী বলল, 'বলছি! তার আগে একটা কথার জবাব দে তো—'

'কী?'

'সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কোথায় ছিলে সোনার চাঁদ?'

'কাজ ছিল।'

'আজকাল শালা তোমার শুধু কাজ আর কাজ।' চোখের তারা নাচিয়ে তুলসী বলতে লাগল, 'না কি সেই দিদিমণির সঙ্গে কোথাও হাওয়া হয়েছিলে?'

রাজা চমকে উঠল। একটু চুপ করে থাকল। তারপর গৌরের দিকে ফিরে বলল, 'আমাদের বাড়ি যেতিস কেন?'

গৌর গলা নামিয়ে ফিসফিস কবল, 'আজ লোহা ফ্যাক্টরির মাল এসেছে। ওয়াগন বাইরে পড়ে আছে। কাল ফ্যাক্টরির ভেতরে ঢোকাবে।'

গৌরের কথা শেষ হওয়ার আগেই পল্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আজ শ্লা বড়দিন। কোম্পানির সাহেবরা কলকাতায় মাল খেয়ে ফুর্তি করতে গেছে। পাহারা টাহারাও তেমন নেই। এই ফাঁকে কিছু হাফিস করতে হবে।'

রাজার বুকের ভেতর দূরাগত কোনো সৌরভের মতো আজকের সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে আসছিল। এই দিনটাকে সে পবিত্র উপহারের মতো আলাদা করে রাখতে চায়। এর গায়ে সামান্য একটুও ময়লা লাগুক, রাজা তা চায় না। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তোরা যা, আমি বাড়ি চলি।'

'আমাদের সঙ্গে যাবি না!'

'না। ভাবছি—'

'কী?'

'এ লাইন ছেড়ে দেব।'

'দিদিমণি দিব্যি দিয়েছে নাকি?'

রাজা উত্তর দিল না।

তুলসী আবাব বলল, 'ছাড়লে খাবি কী? সবকাব তোকে মন্ত্রী টন্ত্রী করে দেবে নাকি?'

রাজা যেন শুনতে পেল না। আপন মনে বলতে লাগল, 'ভাবছি, ছোটখাট একটা ব্যবসা করব।' বলে আর দাঁড়াল না। বড় বড় পা ফেলে 'শোভা কাফে'ব বাইবে ঘন অন্ধকাবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুলসীরা কিছুক্ষণ দম আটকে থেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'লে বাবা! শ্লা ধম্মপুত্তুর হয়ে গেল নাকি—'

কুড়ি

আরো দু'তিনটে দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে একটা খারাপ খবর পাওয়া গিয়েছে। সূরযলালের বাড়িতে জয়ার চাকরিটা হয় নি। সেখানে অন্য লোক রাখা হয়েছে।

তা ছাড়া, ঝাড়া তিনটে দিন ঘোরাঘুরি করেও ছোটখাট কোনো ব্যবসার ব্যবস্থাট্যবস্থা করতে পারে নি রাজা। অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের আলোকিত দিকটায় পা বাড়াতে চেয়েছে সে। কিন্তু সেখানকার একটা দরজাও খোলা পাওয়া যায় নি। এ ক'দিন তুলসীদের সঙ্গে রাতে বেরুনো হয় নি। রোজগার নেই। কাজেই মাঝখান থেকে অনেকগুলো টাকা ধার হয়ে গিয়েছে।

আজ সকালবেলা দূরমনস্কের মতো স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল রাজা। বড়দিনের পর জয়ার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। রাজার ইচ্ছা আজ একবার নবীপুর যায়।

হঠাৎ খুব চেনা একটা গলা কানে এল, 'রাজাদা, অ্যাই মাইরি—'

চমকে মুখ তুলল রাজা। তার ঠিক সামনেই সারা গায়ে ডুমো ডুমো মাংসওলা সেই লোকটা, যার নাম অনাথ, দাঁড়িয়ে।

চোখাচোখি হতেই অনাথ বলল, 'অ্যাই দেখ, মেঘ না চাইতেই জল। আমি তোমার বাড়িই যাচ্ছিলাম গ—'

রাজা ভুরু কুঁচকে শুধলো, 'কেন?'

'তলব এয়েছে—' চোখের তারায় বিচিত্র ইঙ্গিত ফোটাল অনাথ।

'রমলাদি যেতে বলেছে?'

'ঠিক ধরেছ। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'আমি এখন যেতে পারব না।'

লোকটা আঠার মতো গায়ের সঙ্গে আটকে রইল, 'না গেলে যে চলবে না।'

রাজা বিরক্ত, 'আমার জরুরি কাজ আছে। পরে যাব।'

অনাথ অনেক টানাটানি করল, কিন্তু রাজা যখন কিছুতেই সঙ্গে যেতে রাজি হল না তখন হতাশ সুরে বলল, 'তবে কখন যাবে?'

'পরে।'

অনাথ একটা ছিনে জোঁক। বলল, 'পরে বলতে ?'

রাজা বলল, 'দশটার সময়।'

'আমি কিন্তু ওই কথাই গিয়ে বলব।'

'বলো।'

রাজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, হঠাৎ রমলাদি ডেকে পাঠাল কেন? আজ আবার জয়াকে তার সঙ্গে কলকাতায় পাঠাবে? কিংবা অন্য কারণ কী-ই বা থাকতে পারে?

পায়ে পায়ে কখন স্টেশনে চলে এসেছিল, রাজার হুঁশ নেই। এখানে এসে শোনা গেল, আজ সকাল থেকেই নবীপুরের দিকে ট্রেন যাচ্ছে না। ওদিকে কী একটা গোলমাল হয়েছে, সে জন্যে গাড়ি বন্ধ।

রাজা ভাবল, ট্রেন যখন চলছে না তখন জয়া নিশ্চয়ই শ্যামনগরে আসতে পারে নি। সে অনেকটা হাল্‌কা বোধ করল। বুকের ওপর থেকে ভারী কিছু একটা নেমে গেল যেন।

ঘণ্টাতিনেক এ রাস্তায় সে রাস্তায় ঘুরে 'শোভা কাফে'তে যখন এসে রাজা পৌঁছল তখন প্রায় বারোটা বাজে। এই দুপুরবেলাতেও তুলসীরা আছে। জমজমাট আড্ডা চলছে।

রাজা ঢুকতেই গৌর চেঁচিয়ে উঠল, 'এখন আর বসতে হবে না। পানসি উত্তর দিকে চালিয়ে দে—'

রাজা শুধলো, 'তার মানে?'

'অনাথদা সেই দশটা থেকে তিনবার এসে তোর খোঁজ করে গেছে। তোর রমলাদি তোকে ডেকে পাঠিয়েছে। যা শালা, সকালবেলা একটা সুখবর দিলাম—টু পাইস মিলে যাবে।'

উত্তর না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল রাজা।

রতন বলল, 'জম্পেশ করে বসে পড়লি যে! রমলাদির বাড়ি যা—'

রাজা বলল, 'যাব যাব। অত তাড়া কিসের? একটু চা খেয়ে নিই তো আগে।' একটা বয়কে ডেকে বলল, 'কড়া মাঞ্জা দিয়ে একটা ডবল হাফ নিয়ে আয় বকা—'

চায়ের কাপে রাজা সবে মুখ ঠেকিয়েছে সেই সময় দ্রুত চাপা গলায় ওধার থেকে তুলসী বলে উঠল, 'রাজা, কে এসেছে দ্যাখ—দরজার কাছে—'

ধাঁ করে রাজা পেছন ফিরল। দেখল 'শোভা কাফে'র দরজায় রমলাদি দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিল, 'শোন—'

রমলাদি এভাবে 'শোভা কাফে'তে তার খোঁজে আসতে পারে, এ ছিল অকল্পনীয়। মন্ত্রচালিতের মতো উঠে পায়ে পায়ে দরজার দিকে গেল রাজা। বিমূঢ়ের মতো বলল, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, আমিই—' রমলাদি বলতে লাগল, 'তিন চার বার অনাথকে পাঠিয়েছি, তুই যাস নি। বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হল। যা, ওই রিকশায় গিয়ে ওঠ—'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি চা খাচ্ছিলাম। এখনও খাওয়া শেষ হয় নি—'

'আমার বাড়ি গিয়ে খাবি।'

রাস্তায় একটা রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। রাজাকে নিয়ে সেটায় গিয়ে উঠল রমলাদি। সঙ্গে সঙ্গে রিকশা চলতে শুরু করল।

রিকশায় একটা কথাও হল না। বাড়ি এসে রমলাদি বলল, 'এত বড় সাহস তোর কোত্থেকে হল?'

এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল রাজা।

রমলাদি নিমেষে অন্য মূর্তি ধরল। চোখের তারা নিষ্ঠুর, স্থির। ঠোঁট দু'টো তীব্র রেখায় বেঁকে গিয়েছে। বুক ঘনশ্বসিত। সব মিলিয়ে সে যেন হিংস্র বাঘিনী। তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলল, 'সত্যি করে বল আগরওলার কাছে জয়াকে দিয়ে আসিস নি কেন?'

রাজা জড়ানো গলায় বলল, 'আগেই তো বলেছি, মিছিলের জন্যে—'

'মিথ্যে কথা—'

রাজার হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল। সে উত্তর দিল না।

রমলাদি বলল, 'মনে করেছিস ডুবে ডুবে জল খেলে কেউ টের পাবে না? আমার চোখে ধুলো ছিটোতে হলে এখনো তোকে দশবার জন্ম নিতে হবে।'

রাজা চুপ। রমলাদি হঠাৎ কেন এত খেপে উঠল, সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

রমলাদি এবার সোজা রাজার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জয়াদের বাড়ি কবে থেকে যাওয়া-আসা করছিস?'

রাজার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে হিমের স্রোত নেমে গেল। চমকে উঠে সে বলল, 'জয়াদের বাড়ি যাই, আপনাকে কে বলেছে?'

'যে-ই বলুক, কথাটা সত্যি কিনা?'

তবে কি এর মধ্যে রমলাদি জয়াদের বাড়ি গিয়েছিল? বার বার বারণ করা সত্ত্বেও জয়ারা সেদিনের সব কথা বলে দিয়েছি কি? রাজার মনে হল, তার গলায় কোথায় যেন ফাঁস আটকে গিয়েছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে। গলায় স্বর ফুটল না।

রমলাদি এবার এক কাণ্ড করে বসল। এগিয়ে এসে রাজার গালে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিল, 'মুখ বুজে আছিস কেন? বল—বল—'

রমলাদি যে গায়ে হাত তুলতে পারে, রাজার কাছে তা অভাবনীয়। বিস্ময়ে অপমানে রাগে তার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। নিজের অজান্তেই তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'একদিন গিয়েছিলাম—'

'কেন?'

রাজা চুপ।

রমলাদি বলল, 'কে তোকে যেতে বলেছিল?'

রাজা চুপ।

রমলাদি বলল, 'উত্তর দিচ্ছিস না কেন?'

রাজা চুপ।

রমলাদির চোখের তারায় আগুনের হলকা খেলতে লাগল। সে আবার বলল, 'তুই নাকি জয়ার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছিস?'

রাজা টের পেল, ধরা পড়ে গিয়েছে। যেভাবেই হোক রমলাদি সব জেনেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

রমলাদি যেন জাদুকরী। আচমকা তার আচরণ এবং কণ্ঠস্বর বদলে ফেলল। রাজার কাঁধে একটা হাত রেখে শুভাকাঙিক্ষণীর মতো সস্নেহ কোমল সুরে বলল, 'চেষ্টা করে তো দেখলি। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া তোর কর্ম নয়। ওসব পাগলামি ছেড়ে যাতে দু'টো পয়সা হয় তাই কর।'

রাজা অবাক। কিছু বলল না।

রমলাদি আবার বলল, 'আমার কাজ যা করছিস, আপাতত করে যা। তোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি ভাবছি। আড়াই তিনশ টাকা মাসে মাসে যাতে পাস তার একটা ব্যবস্থা করে দেব।'

রাজা এবারও চুপ।

রমলাদি বলতে লাগল, 'আজ হল সোমবার। আসছে শুক্রবার একবার আসতে পারবি?'

আবছা গলায় রাজা বলল, 'কেন?'

'জয়াকে নিয়ে আগরওলার কাছে যেতে হবে। এবার আর বদমাইশি করবি না কিন্তু। বার বার আগরওলার কাছে কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'শোভা কাফে' থেকে রমলাদির সঙ্গে আসবার সময় রাজার হাত-পা কাঁপছিল। সেই কাঁপুনি এখনো কমেনি। হঠাৎ কোত্থেকে অনেকখানি দুঃসাহস তার ওপর ভর করল। রাজা চিৎকার করে উঠল, 'না।'

'কী না?'

'জয়াকে আগরওলার হাতে তুলে দিতে পারব না।'

রমলাদি প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারল না। অনেকক্ষণ পর ভ্রূ কুঁচকে ধারাল গলায় বলল, 'কেন?'

রাজা উত্তর দিল না।

রমলাদি চেঁচিয়ে উঠল, 'বুঝেছি—বুঝেছি—পিরীত হয়েছে! সেই জন্যেই ছুঁড়ির বাড়ি এত যাতায়াত, তার চাকরির জন্যে এত চেষ্টা। সেই জন্যেই তাকে প্রাণ ধরে আগরওলার হাতে তুলে দিয়ে আসতে পারবি না, এই তো?'

বুকের ভেতর, মাথার ভেতর, রক্তের ভেতর ঝম ঝম করে কী যেন ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল রাজার। রমলাদি যা বলেছে তা কি সত্যি? জয়াকে সে ভালবেসে ফেলেছে? ভাবনাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আবার রমলাদির গলা শোনা গেল, 'তুই যখন পারবি না, অন্য লোক দিয়ে জয়াকে পাঠাতে হবে।'

গলা ফাটিয়ে রাজা চেঁচাল, 'না।'

'তোর ইচ্ছে মতো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি পাঠাবই।'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো রাজা উন্মাদের গলায় বলতে লাগল, 'জান লড়িয়ে দেব তা হলে। শ্যামনগরের সবাইকে এখানে এনে তোমার কীর্তির কথা বলব মাগী—'

কোমরে দুই হাত রেখে বাঘিনীর মতো ফুঁসতে লাগল রমলাদি, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—'

'কথাটা মনে রাখিস—'

'রাখব।'

'আরেকটা কথা মনে রাখবি, আমি যদি তোর পেছনে না থাকতাম, অ্যাদ্দিন জেলে পচে মরতিস। তোর কোনো বাপও রক্ষা করতে পারত না।'

একুশ

রমলাদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না রাজা। তার চোখের সামনে সব ঝাপসা, অন্ধকার। মাথার ভেতরটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল যেন।

মাতালের মতো টলতে টলতে সে হাঁটছিল। শীতের এই দুপুরেও তার মনে হচ্ছিল, গনগনে আগুনের ওপর পা ফেলছে। গলগল করে তার গায়ে ঘাম ছুটছিল।

হাঁটতে হাঁটতে ফের স্টেশনে চলে এসেছিল রাজা। এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত, বুঝে উঠতে পারছিল না।

হঠাৎ রেল লাইনের দিকে তার চোখ গেল। চকচকে লোহার দু'টো পাত সমান্তরাল রেখায় নবীপুরের দিকে চলে গিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাজা স্থির করল, আজই—এখনই একবার

নবীপুর যেতে হবে। রমলাদির হাত থেকে জয়াকে বাঁচাতেই হবে। তাকে সতর্ক করে দিয়ে আসা দরকার।

আজ এ দিকে ট্রেন চলাচল বন্ধ। রাজা রেল লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করল। তারপর কখন যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো জয়াদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল নেই। দম বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রাজা। তারপর চোখ বুজে কড়া নাড়ল। একটু পর দরজা খুলে জয়ার মা মুখোমুখি দাঁড়াল। কর্কশ সুরে বলল, 'তুমি!'

কণ্ঠস্বরটা দমিয়ে দিল। তবু হাসতে চেষ্টা করল রাজা, 'আমি, মানে এদিকে এসেছিলাম তাই—'

'এখানে কী দরকার?'

'জয়াদেবীর সঙ্গে একটা কথা আছে—'

'কোনো কথার দরকার নেই।'

বুকের ভেতর ভূকম্পনের মতো কিছু একটা অনুভব করল রাজা। কাঁপা জড়ানো গলায় বলল, 'দেখুন, কথাটা না বললে—'

জয়ার মা তীব্র গলায় বলল, 'তুমি এখন যেতে পার।'

জয়ার মা দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, রাজা শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে উঠল, 'আচ্ছা রমলাদি কি এর ভেতর এসেছিল?'

'হ্যাঁ, এসেছিল। এই খানিকক্ষণ আগে চলে গেল।'

রাজার মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। ট্রেন বন্ধ, তবু এত তাড়াতাড়ি রমলাদি এল কী করে? সে জিজ্ঞেস করল, 'কিসে এসেছিল?'

'মোটরে। আর তার কাছেই তোমার গুণকীর্তির কথা শুনেছি। গুণ্ডা, বদমাশ—'

মোটরে না এলে এত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব নয়। রাজা এই ভেবে অবাক হচ্ছিল, রমলাদি কি খড়ি পেতে মানুষের মনের কথা জানতে পারে? নইলে সে যে আজই এখানে আসবে তা জানল কি করে? এবং সে আসবার আগেই তাড়াতাড়ি মোটরে এসে জয়াদের মন বিষাক্ত করে গিয়েছে।

করুণ গলায় রাজা বলল, 'আমি যা-ই হই, আপনাদের তো কোনো ক্ষতি করি নি।'

'তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না—' দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল জয়ার মা।

তারপর আরো দু'দিন এল রাজা। কড়া নাড়তে দরজা খুলে তাকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয় জয়ার মা। কোনো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে রাজা ঠিক করল, ফাদার ডোনাল্ডসকেই জয়াদের বাড়ি পাঠাবে। কিন্তু চার্চে গিয়ে ফাদারকে পাওয়া গেল না। দিন দশেকের জন্য তিনি কলকাতায় চলে গিয়েছেন।

রাজার মনে হতে লাগল অনিবার্য নিয়তির মতো দারুণ সর্বনাশ নেমে আসছে।

বাইশ

জয়ার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। এদিকে ধারের পর ধার জমে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এমন হল, ধারও আর পাওয়া যায় না। চেনাশোনা সবার কাছেই সে হাত পেতেছে। হাত পাতবার মতো আর কোনো জায়গা নেই।

ওদিকে ছ'জনের বিরাট সংসার তার মুখের দিকেই তাকিয়ে বসে আছে। রাজা অস্থির হয়ে উঠল। ভাবল জয়ার কথা তাকে ভুলতেই হবে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের যে স্বপ্নটাকে দেখেছিল সেটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আজ রাত্তিরে রাজা 'শোভা কাফে'তে এল। তারপর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ধারে দু' বোতল বাংলা মদ খেয়ে বলল, 'চল—'

তুলসীরা বলল, 'কোথায় রে?'

'রেল ইয়ার্ডের মাল ঝাপতে—'

'তার মানে?'

'বাংলা ভাষাও বুঝিস না নাকি?'

'তুই না এসব ছেড়ে ব্যবসা ট্যবসা করবি বলেছিলি—'

বিকৃত মুখে রাজা বলল, 'নাঃ—'

তুলসী রগড়ের গলায় বলল, 'দিদিমণি সটকে পড়েছে নাকি রে?'

রাজা উত্তর দিল না। শুধু বলল, 'চল—'

ওধার থেকে রতন বলে উঠল, 'আজ ইয়ার্ডে গিয়ে সুবিস্তা হোবে না ইয়ার—'

রাজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, 'কেন?'

'জোরদার পাহারা আছে—'

'পাহারাদার কী করবে? ঠিক ম্যানেজ করতে পারব। আয় আমার সঙ্গে—'

তুলসীরা গেল না। বলল, 'না ভাই, বেফায়দা ঝঞ্ঝাটের ভেতর গিয়ে লাভ নেই—'

'শ্লা হারামির দল—' মুখ কুঁচকে তীব্র ঘৃণা এবং রাগের গলায় শব্দ ক'টা উচ্চারণ করে রাজা চলে গেল।

কিন্তু ইয়ার্ডের মাল আজ আর সরানো গেল না। অন্য দিন এর চাইতে বেশি পাহারার মধ্যেও সে কাজ করে এসেছে। আজ কিন্তু ইয়ার্ডে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেল। তারপর সোজা থানায়।

ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই প্রথম দিনের মতো আজ আর রমলাদি এল না। সে যে আসবে না, রাজা জানে। আজ তার পাশে কেউ নেই। তিন দিকে নিরেট দেওয়াল আর সামনের বন্ধ দরজায় সারি সারি গরাদ ছাড়া আর কিছু নেই। এককে সময় রাজার কেন জানি মনে হয়, এই ধরা পড়ার সঙ্গে রমলাদির হয়তো কোনো অদৃশ্য যোগাযোগ আছে। কে জানে, রমলাদি অদৃশ্যে বসে সুতো টেনেছে কিনা এবং তারই ফলে এক ধাক্কায় সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে এই হাজতেব ভেতর চলে আসতে হয়েছে।

চুরি, মাল পাচার এবং আগরওলার কাছে মেয়ে পৌঁছে দেওয়া—ওই হচ্ছে রাজার জীবন। জয়ার জন্য তার বাইরে যেই একটা পা ফেলতে চেয়েছিল, অমনি সব গোলমাল হয়ে গেল।

জয়াকে ঘিরে ক'টা দিন কেন যে সব কিছু ওই রকম এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, রাজা ভেবে পায় না। সামনের মোটা মোটা গরাদগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বৌদির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার, ভাইপো ভাইঝিগুলোর কথা মনে পড়ছিল। সব চাইতে বেশি করে যাকে মনে পড়ছিল, সে টুনি। ওদের যে কিভাবে চলছে।

তিনটে দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে বৌদি টুনিকে নিয়ে একদিন এসেছিল। যতক্ষণ ছিল দু'জনেই সমানে কেঁদেছে। রাজার চোখও শুকনো ছিল না। ফাদার ডোনাল্ডসও একদিন এসেছিলেন।

বৌদি বা ফাদার ডোনাল্ডস জামিনের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। অবশ্য ফাদার ডোনাল্ডস বলে গিয়েছেন, জামিনদার জোগাড়ের চেষ্টা করবেন। রাজাকে তাই জেল-হাজতেই থাকতে হয়েছে। তার নামে শুধু রেল ইয়ার্ডের মাল পাচারই না, আরো অনেকগুলো চার্জ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পনের ফুট চওড়া আঠার ফুট লম্বা একখানা ঘরে দিনগুলো বড় বেশি দীর্ঘ, রাতগুলো দীর্ঘতর। সময় এখানে আর কাটতেই চায় না।

একদিন দুপুরবেলা চুপচাপ বসে ছিল রাজা। হঠাৎ হিন্দুস্থানী সিপাইয়ের গলা কানে এল, 'এ ছোকরে—'

চমকে রাজা সামনের দিকে তাকাতেই সেপাইটা বলল, 'এক জেনানা তোর সাথ দেখা করতে চাইছে। করবি?'

বৌদি ছাড়া আর কে মেয়েলোক তার সঙ্গে দেখা করতে পারে? রাজা শুধলো, 'বিধবা মেয়েছেলে?'

'নহী—'

তবে কি রমলাদি? সাপটি হয়ে কামড়ে শেষে ওঝা হয়ে ঝাড়তে এসেছে? রমলাদি যদি তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় নিশ্চয়ই যাবে। রমলাদির হাতে পায়ে ধরে বলবে, আর কখনো তার অবাধ্য হবে না। রাজার যদি জেল হয়ে যায়, দাদার সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে। তার চাইতে চুরি, মাল পাচার, জল্লাদের হাতে মেয়ে দিয়ে আসা—এই সব দিয়ে খেরা সেই জীবনটা ছাড়া জগতে আর কোনো কাম্য বস্তু তার থাকতে নেই।

অসীম আগ্রহে রাজা বলল, 'করব, নিশ্চয়ই করব। কোথায় সে?'

'অফিস ঘরে। থোড়া সবুর কর, ডেকে আনছি।'

রাজা উন্মুখ হয়ে রইল। একটু পর সেপাইটার সঙ্গে যে এসে লোহার গরাদের ওপাশে দাঁড়াল, এই মুহূর্তে সে রাজার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। জয়া—জয়া এসেছে—

নিজের রক্তস্রোতের ভেতর অনেকক্ষণ অগণিত বড় বড় ঢেউয়ের ওঠানামা অনুভব করল রাজা। রুদ্ধস্বরে বলল, 'আপনি!'

'হ্যাঁ—' পলকহীন তাকিয়ে ছিল জয়া। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'আপনাকে দেখতে এলাম।'

'হ্যাঁ, দেখবার জায়গাই বটে—' রাজা অদ্ভুত হাসল। তার চোখের কোণটা জ্বালা জ্বালা করছিল, 'এখানকার খবর কোথায় পেলেন?'

'পাদ্রী সাহেবের কাছে।'

'গীর্জায় গিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ—'

'কবে?'

'আজই। এখানে আসবার আগে—'

একটু চুপ। তারপর জয়াই আবার বলল, 'আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।'

'কৃতজ্ঞতা! শ্রদ্ধা! আমাকে?' বিমূঢ়ের মতো প্রতিধ্বনি করল রাজা, 'আপনি কি জানেন, কেন আমাকে জেল হাজতে আসতে হয়েছে?'

'জানি। শুধু জেল হাজতে আসার ব্যাপারটাই না, আপনার সম্বন্ধে আমার সবই জানা হয়ে গেছে।'

'তারপরেও শ্রদ্ধা আছে?'

'আছে।'

'কেন?'

'তার কারণ আপনি আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। সেই দু'বার বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে জেনেছিলাম কেন আপনি আমাকে রমলাদির অফিসে নিয়ে যান নি।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল রাজা।

এবার জয়া যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। রাজা যখন তাকে দু'বার কলকাতায় নিয়ে গেল না তখন অন্য একটা লোককে দিয়ে কলকাতার অফিসে পাঠিয়েছিল রমলাদি। কিন্তু যাকে অফিস বলা হয়েছে সেটা একটা মৃত্যুফাঁদ। জয়া নেহাত বুদ্ধি আর ভাগ্যের জোরে অতি কষ্টে সেখান থেকে সবার চোখে ধুলো ছিটিয়ে বেরুতে পেরেছিল। কাল কলকাতা থেকে ফিরে আর সময় পাওয়া যায় নি। আজ সকালে সে রাজার খোঁজে ফাদার ডোনাল্ডসের কাছে গিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতার কথাটা না বলে জয়া থাকতে পারছিল না।

জয়া বলতে লাগল, 'পাদ্রী সাহেবের কাছে শুনেছি, আমার জন্যেই আপনার এই দুর্দশা।'

রাজা বলল, 'না না, সে কি—'

তার কথা যেন শুনতে পেল না জয়া। ঘোরের মধ্যে বলে যেতে লাগল, 'যেমন করে পারি আপনাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাব। আমার এক দূর সম্পর্কের মেসোমশাই উকিল। কালই তাঁকে নিয়ে আসছি।'

রাজা চুপ করে থাকল।

জয়া আবার বলল, 'অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। এখন যাই—'

'আচ্ছা। কাল কখন আসছেন?'

'দুপুরে।'

'চলি—' জয়া যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

হঠাৎ বুকের ভেতর দুমড়ে মুচড়ে কী হয়ে গেল রাজার। নিজের অজান্তেই অশান্ত, ফিস ফিস গলায় ডাকল, 'জয়া—'

জয়া ঘুরে দাঁড়াল। স্থির নিষ্পলক তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর গরাদের খুব কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ—' রাজা মাথা নাড়াল, 'আগরওলার ওখান থেকে পালিয়ে এসেছ, এ খবর রমলাদি নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে। ওদের অনেক কথা আমরা জেনে ফেলেছি। সহজে কিন্তু ওরা আমাদের ছাড়বে না। আমি যদ্দিন না হাজত থেকে বেরুচ্ছি, খুব সাবধানে থাকবে। এখান থেকে বেরুতে পারলে রমলাদির সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া আছে। খুব সাবধান কিন্তু। ওটা সাপের বাচ্চা—'

জয়া বলল, 'আচ্ছা—'

'আর কী?'

শিথিল কাঁপা গলায় রাজা বলতে লাগল, 'তুমি এখান থেকে আমাকে বার করে নিয়ে যাও। এবার—এবার—'

জয়া ঝুঁকল, 'এবার কী?'

'এতদিন যেভাবে চলেছি তার থেকে অন্যভাবে বাঁচবার একটা চেষ্টা করে দেখি। শুধু একটা সুযোগ আমাকে দাও—'

গাঢ় আবেগের গলায় জয়া বলল, 'কাল আমি আসব। যেমন করে পারি এখান থেকে আপনাকে বার করে নিয়ে যাবই।'

'আচ্ছা—'

'এখন যাই তবে—'

'এস—'

জয়া চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল রাজা। তার বুকের ভেতর অনেকগুলো দুরন্ত স্রোত উলটোপালটা ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল।

ছোটগল্প

সূচিপত্র

মাঝি

দু' পাশে ঘন সুবজ জলঘাস, তার মাঝখান দিয়ে মেঘমতী রাজকন্যার সিঁথির মতো ঋজু রেখায় রয়নাবিবির খালটা সামনের ধলেশ্বরীতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই খালটা যেখানে নারকেল আর সুপারি গাছের মর্মরিত কুঞ্জে আশ্বিনের প্রসন্ন সকালে ঝলমলিয়ে ওঠে, ঠিক সেইখানেই আবছা ভোরে একমাল্লাই কেরায়া নৌকোটা এনে ভিড়িয়েছিল ফজল। তার অস্থির দৃষ্টিটা একবার পারের করমচা ঝোপের আড়াল দিয়ে, সুপারি বনের মধ্য দিয়ে, সামনের ক্যাঁচা বাঁশের চৌচালা ঘরখানার চারপাশ দিয়ে, এক নিমেষে চক্রাকারে ঘুরে এসেছিল। কিন্তু নাঃ, সলিমা হয়তো ভুলেই গিয়েছে কাল সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতির কথা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল ফজল। তারপর কাঁঠাল কাঠের বৈঠাখানা হাতে তুলে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সিরাজদীঘার হাটে যেতে না পারলে অন্য মাঝিরা সব সওয়ারি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে।

নৌকোটা ছেড়েই দিত ফজল, সেই সময় রয়নাবিবির খালের একটা উচ্ছল ঢেউ যেন কলশব্দে এসে ভেঙে পড়েছিল কানের ওপর। একটা দীঘল নারকেল গাছের পাশ থেকে জলতরঙ্গের বাজনার মতো খিল খিল করে হেসে উঠেছিল সলিমা।

ফজল তাকায়নি, পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিল। সলিমার এত দেরি হওয়ার জন্য তার মুখে অভিমানের মেঘ ঘন হয়ে নেমে এসেছিল।

এদিকে একেবারে নৌকোর গলুইয়ের কাছে এসে পড়েছে সলিমা। তার চোখের নীলাভ মণিদু'টিতে সকালের প্রথম আলো টলমল করে উঠেছিল। নিটোল নরম সজীব ভুঁইচাপার মতো সুদেহিনী সলিমা। কিন্তু জিভের ডগায় কৌতুকের তীক্ষ্ণ ঝাঁঝ তার, 'ইস, গোসা হ'লি নিকি আবার। রঙ্গ দেইখা শরীল আমার জ্বইলা যায় মরিচের লাখান (মতো)।'

ফজল নির্বাক।

সলিমা আবার বলেছিল, 'কী হইল, মুখ ফিরা—'

ফজল মুখ ফেরায়নি। আগের মতোই নিশ্চুপ বসে ছিল।

এবার গাঢ় স্বরে সলিমা বলেছিল, 'অমুন মুখ ঘুরাইয়া বইসা থাকলে আমার কিন্তুক ভাল লাগে না। হুধাহুধি গোসা হইলেই হয় নিকি! বাজানের চোখে ধূলা দিয়া তর কাছে আইতে হয়। হে যে কত কষ্ট তুই তো জানস। দিনরাইত আমারে আগলাইয়া রাখে। ঘুম থিকা উইঠা এতক্ষণ উঠানে বইয়া তামুক খাইতে আছিল বাজানে। এট্টু আগে জমিনে গেছে, হেই ফাকে তর কাছে আইছি।'

এবার মুখ ফিরিয়েছিল ফজল। সলিমার দেরি হওয়ার যুক্তিসঙ্গত একটা কৈফিয়ত শুনে তার কাঁচা আনাজের মতো মুখখানা থেকে অভিমানের মেঘ উড়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, 'বাজানের লগে (সঙ্গে) আর বেশিদিন লুকাচুরি খেলতে অইব না। দুই চাইর দিনের ভিত্রেই হগল ব্যবস্থা কইরা ফেলাইতে আছি। ছয় কুড়ি দশ ট্যাকা জমছে। আর দশটা ট্যাকা পাইয়া যামু। হিন্দুরা দ্যাশ ভিটামাটি ছাইড়া যাইতে আছে, কেরায়া পাইয়া যামুই। হেয়ার পর সাত কুড়ি ট্যাকা তর বাজানের হাতে দিয়া আমার ঘরে নিয়া আহুম তরে। আইচ্ছা, অহন আমি যাই।'

সলিমা বলেছিল, 'না না, অহনই তর যাওন অইব না। এত কষ্ট কইরা আইলাম। দুই দণ্ড যদি এট্টু কথা না কই—' ছায়া নেমে এসেছিল তার মুখে।

ফজল বলেছিল, 'তর বাজানে যা চামার, সাত কুড়ি ট্যাকা নিব গইন্যা গইন্যা (গুনে গুনে), হেয়ার পর মাইয়া দিব। যাই অহন, সন্ধ্যার সময় আবার আহিস।'

'তবে যা। ঠিক সন্ধ্যার সময় আহুম। আবার দেরি করিস না য্যান।'

'না না, দেরি করুম না।'

একটুক্ষণ কী ভেবে সলিমা বলেছিল, 'একখান কথা—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল ফজল।

'কাইল রাইতে নবীপুরের কাসিম আলি ট্যাকা লইয়া বাজানের কাছে আইছিল। আমারে শাদি করতে চায় শয়তানডা। আমি তারে কাইন্দা খেদাইছি। এর আগে আইছিল বাসাইলের আইবুদ্দি, তার আগে গিরিগঞ্জের হাবিব মিঞা। হগলেরে ভাগাইছি। কিন্তুক বেশিদিন আর পারুম না। বাজানেরে ত চিনস (চিনিস)। ট্যাকা হাতে লইয়া কুনদিন আমারে কার লগে যে গাইথা দিব! হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'একা একা আমার আর ভালা লাগে না। পরান জানি কেমুন করে।'

সকৌতুকে ফজল বলেছিল, 'কেমুন করে? আসমানের পঙ্খী হইয়া উইড়া যাইতে চায়?'

সলিমা লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল, 'জানি না, যা।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেনি ফজল। অনেকক্ষণ কী যেন ভেবে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিল, 'ডর নাই, কাসিম আলি সিকিম আলি—কারোর সাইধ্য নাই তরে আমার কাছ থিকা ছিনাইয়া লইতে পারে। কাইলই তর বাজানের পাওনা আমি মিটাইয়া দিমু। অহন যাই।' বলে আর অপেক্ষা করেনি সে। বৈঠার ধাক্কায় নৌকোটাকে রয়নাবিবির খালের মাঝখানে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বাইতে বাইতে একখানা ভাটিয়ালি গলায় তুলে নিয়েছিল :

ষোল বছরের তাজা মাইয়া
সতেরে দিছে পাড়া,
আখির মইধ্যে রাখছে বাইন্ধা
পরভাতিয়া তারা।

প্রভাতিয়া তারার স্বপ্ন-ধরে রাখা চোখের মেয়ে তার যৌবন-বন্দনা শুনতে শুনতে সেই সুন্দর সকালে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর খালের নীলচে রেখাটা ধরে অনেক দূরে ধু-ধু একটা বিন্দুর মতো মিলিয়ে গিয়েছিল ফজলের নৌকোটা, আর তার গলার আচ্ছন্ন সুর।

এখন সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এসেছে। সিরাজদীঘার কেরায়া ঘাটে নৌকাগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে।

হাটের চালার তলায় ভিন-গেরামী দোকানীদের কেরোসিনের কুপিতে এই অন্ধকারে লাল লাল শিখা ফুটে উঠেছে অজস্র। দূরের কোনো একটা মহাজনী নৌকো থেকে মাঝির গলায় নমাজ পড়ার শান্ত, গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে।

শেষ সওয়ারির ক্ষেপ দিয়ে এইমাত্র ফজলের একমাল্লাই কেরায়া নৌকোটা এসে ভিড়ল নদীর ঘাটে। সারাদিন সওয়ারি পারাপার করে আজ মোট সাত টাকা মিলেছে। লগিটা পারের মাটিতে শক্ত করে পুঁতে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধল ফজল। তারপর কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে কোমরের গোপন গেঁজেটা বার করে কাঁচা টাকাগুলো একটা একটা করে গুনে নিল। মোট ছ'কুড়ি সতের টাকা। সাত কুড়ি পূর্ণ হতে এখনও তিনটে টাকা বাকি। আশা ছিল, আজই সাত কুড়ি পূর্ণ হবে। নাঃ, আরো একটা দিন লাগবে, দেখা যাচ্ছে।

হিন্দুরা সাত পুরুষেব ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে বেবাজিয়াদের মতো চলে যাচ্ছে কলকাতার দিকে। একটা কেরায়া মিললে পাঁচ দশটা টাকা পাওয়া আজকাল আশ্চর্য কিছু নয়। আর তা কালকের মধ্যে মিলবেও। এ বিশ্বাস ফজলের আছে। সকালবেলা সলিমাকে বলে এসেছিল, কালই তার বাপের সাত কুড়ি টাকার খাঁই মিটিয়ে আসবে। নাঃ, কাল আর সম্ভব হবে না। একেবারে পরশুই যাবে সে। সলিমার বাজানের

বুনো খাটাশের মতো মুখটার ওপর হাতের সমস্ত শক্তিতে এক শ' চল্লিশটা কাঁচা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে নিজের ঘরে আনার সব ব্যবস্থা পাকা করে আসবে।

দিন কয়েক আগে সলিমার বাজান শকুনের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে বলছিল, 'সলিমারে শাদি করতে চাও? সাত কুড়ি ট্যাকা ডাইন হাতে দিয়া বাও (বাঁ) হাতে মাইয়ারে নিয়া যাইও। আর এট্টা কথা মনে রাইখো। শাদির হগল খরচ তুমার।'

বিরস স্বরে ফজল বলেছিল, 'আমার কাছে চাইর কুড়ি ট্যাকা আছে। অহন তাই দেই। শাদির পর বাকি ট্যাকা দিয়া যামু। খোদার কসম।'

বাকি বকেয়ার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন সলিমার বাজান। বাকি টাকা হল আসমানের তারা। কখনই তা মুঠোয় এসে পৌছয় না। অতএব নির্লিপ্ত স্বরে বলেছিল, 'ধার-বাকি লইয়া আমার কারবার নাই মিঞা। আমি নগদ লইয়া ব্যাপার করি।'

'বেশ, তাইলে আমারে এক মাসের সময় দ্যান। আমি ট্যাকার যোগাড় কইরা লই।'

'এইর ভিত্রে আর কেও যদি ট্যাকা লইয়া আইয়া পড়ে আমি হেইখানেই মাইয়ার শাদির ব্যবস্থা কইরা ফালামু।'

সেদিন আর জবাব দেয়নি ফজল। ধীরে ধীরে সলিমার বাজানের কুৎসিত মুখখানার সামনে থেকে উঠে খালের কিনারে একমাল্লাই নৌকোটায় চলে গিয়েছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেমন করে হোক, আর যাত তাড়াতাড়ি হোক, টাকাটা সে যোগাড় করে ফেলবেই।

সেদিন থেকে একটি একটি করে টাকা জমিয়েছে সে। তার সমস্ত যৌবনের কামনাকে ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমের মূল্যে কিনবার জন্য একাগ্র নিষ্ঠায় কেরায়া বেয়ে সওয়ারি পার করেছে। দেলভোগ, সাভার, বাসাইল, সোনারং—জলবাংলার দিগ্‌দিগন্তে নৌকো ছুটিয়েছে অবিরাম। দিনরাত, পল-প্রহর, ক্লান্তি-অবসাদ—কোনো কিছুর হিসাব ছিল না এই ঝড়ের মতো দিনগুলোতে। সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য অবিরাম পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছে ফজল। ঘরের ভেতরে সলিমার স্বপ্নকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্যই ঘরের বাইরে এই ক্লান্তিবিহীন আয়োজন।

যাই হোক, টাকাগুলো গুনে একটা একটা করে আবার গেঁজের মধ্যে ভরে নিল ফজল। তারপর কোমরে বেঁধে ফেলল। একটা টাকাও যাতে হারিয়ে না যায়, তাই শরীরের চামড়ার সঙ্গে তার স্পর্শ ধরে রেখেছে সে। এর মধ্য থেকে একটি টাকা নিয়ে বেহেস্তে কি দোজখে গেলেও কারুর রেহাই নেই। নিশিরাত্তিরের অপযোনির মতো তার পিছু পিছু ধাওয়া করে যাবে ফজল।

আর মাত্র তিনটি টাকা। তারপরেই সলিমাকে শাদি করা যাবে। ভবিষ্যতের সেই মধুর স্বপ্নময় দিনটির কল্পনা করে মৃদু, আচ্ছন্ন গলায় গান ধরল ফজল :

কালো চোখের মদ খাইয়াছি
হইয়াছি উন্মন
আর মদ খাইয়ছি আমার বধূর
পেরথম যৈবন।
কেমুনে ভাঙ্গুম আমি হেই
বধূয়ার মান—
চোখের পাতায় চুমা দিমু
ঠোঁটে সাচি পান।

গান-গাওয়া তন্ময়তার মধ্যে আচমকা সকালবেলার সেই প্রতিশ্রুতির কথাটা মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যার সময় মর্মরিত নারকেল বনে সলিমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তার।

অতএব তাড়াতাড়ি উঠে 'পারা' তুলল ফজল। আর সঙ্গে সঙ্গে সওয়ারির গলা শোনা গেল, 'মাঝি, কেরায়া যাইবা নিকি? আরে কে? আমাগো ফজল মাঝি নিকি?'

পরিচিত স্বর। পেছনে ফিরে ফজল দেখল, জলের প্রায় কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে মালখানগরের ইয়াছিন শিকদার। আর তার ঠিক পেছনেই বোরখা-ঢাকা এক নারীমূর্তি। খুব সম্ভব মিঞা সাহেবের বিবিজান।

কেরায়াঘাটের লাগোয়া লঞ্চঘাটা। একটা নিশ্চল জেটি সেখানে পড়ে রয়েছে। এইমাত্র নারায়ণগঞ্জ থেকে একটা লঞ্চ এসে জেটিটার গায়ে ভিড়ল। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় সমস্ত এলাকাটা ভরে গিয়েছে। ফজল জিজ্ঞেস করল, 'কই যাইবেন মিঞাছাব?'

'চর ইসমাইল।' ইয়াছিন বলল।

'অহন অতদূর যাইতে পারুম না। রাইত অইয়া গেল। কাইল হকালে আইয়েন।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল ইয়াছিন। নৌকোর গলুইটা চেপে ধরে বলল, 'রাইত কইরা কেউ যাইতে চায় না। আমার বড় ঠেকা। তুমি লও, খুশি কইরা দিমু।'

এবার মন দেওয়ার চেষ্টা করল ফজল, 'কেরায়া কত দিবেন?'

'পাচ ট্যাকা।'

'পাচ ট্যাকা—ফুঃ! একখান কাথা দেই, বিবিজানের লইয়া হারা রাইত পইড়া ঘুমান উই হাটের চালায়। হকালে উইঠা হাতর (সাঁতার) দিয়া যাইয়েন গিয়া।'

হ্যাঁ, অনেকটা সময় বাজে খরচ হয়ে গিয়েছে। একক্ষণে মর্মরিত নারকেল বীথির আড়ালে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে রাত্রির সমস্তটুকু অন্ধকার নিশ্চয়ই ঘন হয়েছে সলিমার মুখে।

এদিকে গলুইটা আরো তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরল ইয়াছিন, 'সাত ট্যাকাই দিমু, আমারে আইজ যাইতেই অইব চর ইসমাইলে।'

ফজল বলল, 'সাত ট্যাকা আমারে দিবেন ক্যান? ওই দিয়া আড়াই স্যার ত্যাল কিন্যা নাকে দিয়া পইড়া থাকেন। চর ইসমাইলে যাওনের কথা মনেও থাকব না। ছাড়েন ছাড়েন, নাও ছাড়েন—'

'তাইলে কত চাই তুমার?'

'দশ ট্যাকা দিতে অইব মিঞাছাব। এক্কেবারে সাফা হিসাব।'

'দশ ট্যাকা!' আতঙ্কিত চিৎকারের সঙ্গে মহাপ্রাণীটাও যেন গলার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল ইয়াছিনের, 'নাঃ, পাহিস্তান (পাকিস্তান) হওনের পর তুমরাই সাপের পাচ পাও দেখছ—'

খুব নির্লিপ্ত সুরে ফজল বলল, 'ওই ট্যাকাটা দিতে পারলে নায়ে ওঠেন, নাইলে গলুই ছাড়েন। আমার কাম আছে।'

চাপা গলায় গজ গজ করে উঠল ইয়াছিন, 'মোচড় দিয়া ট্যাকা আদায় কর। ঠ্যাকায় পাইছ। কী আর করুম—দশ ট্যাকাই দিমু।'

প্রথম কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি ফজল। কিন্তু শেষের কথা ক'টা নির্ভুলভাবে তার কানে ঢুকেছে। ফজল বলল, 'এই ত মিঞাছাবের মরদের লাখান কথা বাইর অইছে। বিবিজানেরে নিয়া নায়ের পাটাতনে ওঠেন।'

ফজলের কথা শেষ হতে না হতেই ইয়াছিন শিকদার পিছনের বোরখা-ঢাকা নারীমূর্তির হাত ধরে একটা টান লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল নারীমূর্তি, 'না না, আমি যামু না। আমারে ছাইড়া দ্যান। আপনের পায়ে পড়ি।'

চাপা গর্জন শোনা গেল ইয়াছিনের, 'হারামজাদীর সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। গিয়া থাকবি খাঞ্জা খাঁর নাতিনের লাখান। নাইলে গুয়াখোলার ওই কেরামত ডাকুই তরে নিয়া যাইত। তার কিল খাওয়ার থিকা আমার খোদ বেগম হওন কি ভাল না?'

এবার চিৎকারটি মর্মান্তিক হয়ে উঠল। চমকে উঠল ইয়াছিন। তারপর দু'টো ভারী কর্কশ হাত নারীমূর্তির মুখে ঠেসে ধরল, 'চুপ চুপ—এক্কেবারে খুনই কইরা ফালামু তরে।'

গলার আওয়াজে অমন একটা সাংঘাতিক কর্ম করা যে একেবারে অসম্ভব নয়, সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ফেরি লঞ্চের সার্চ লাইটটা অন্য দিকে ঘুরে গিয়েছে। আলোর দিকটায় কালো কাচের মতো ধলেশ্বরীর জল ঝকমক করছে। আর এদিকটায় নিরেট অন্ধকার, আর তারই মধ্যে সাপের মাথার মণির মতো জ্বলছে ইয়াছিনের চোখ।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দু'টো চোখ আর দু'টো কানের মধ্যে একত্র করে দেখা এবং শোনা, দুই-ই করছিল ফজল। আচমকা সে বলে উঠল, 'কি মিঞাছাব, বিবিজান চর ইসমাইলে যাইতে চায় না নিকি?'

ফজলের স্বরটা কেমন যেন সংশয়জনক। লাফিয়ে নৌকোর কাছে ছুটে এল ইয়াছিন। এলোমেলো গলায় বলল, 'পোলাপান (ছেলেমানুষ) কিনা। বাজানের কাছ থিকা হোয়ামীর ঘরে যাইতে কান্দে। ও কিছু না মাঝি, ও কিছু না।'

'অঃ, আমি আবার ভাবলাম অন্য কিছু বুঝিন।'

ফজলের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নারীমূর্তিটিকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নৌকোর পাটাতনে তুলে নিয়ে এল ইয়াছিন। সঙ্গে সঙ্গে বোরখার আড়াল থেকে আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠল।

কাঁপা ভীত সুরে ফজল বলল, 'মিঞাছাব, আমার য্যান কেমুন লাগতে আছে। আপনে কাইল হকালেই যাইয়েন।'

'বাগে পাইছ। আইচ্ছা পনের ট্যাকাই দিমু। লও, আর দেরি কইরো না। নাও খুইলা দাও। আইজ রাইতের মইধ্যে চর ইসমাইলে আমার যাইতেই অইব।'

পনের টাকা! বলে কি লোকটা! নৌকোর বাদাম তুলে দিলে উত্তুরে বাতাসের টানে রাত ভোর হওয়ার অনেক আগেই চর ইসমাইলের মাটিতে পৌঁছুনো যাবে। হালের বৈঠাটা শক্ত করে মুঠোয় চেপে আকাশে নক্ষত্রমালার ফাঁকে ফাঁকে সলিমার মুখ দেখবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকবে না। তার বদলে নগদ পনের টাকা! সলিমার পণের জন্য সাত কুড়ি পূর্ণ হয়েও বারটা কাঁচা টাকা গেঁজের ভেতর পাশাপাশি শুয়ে আনন্দে বাজতে থাকবে। ভাবতে ভাবতে মনটা খুশিতে ভরে গেল ফজলের।

এতক্ষণে নারকেল বনে তার আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চয়ই চলে গেছে সলিমা। তা যাক। কাল সকালে পুবের আকাশে লালচে ছোপ লাগার আগেই সে সলিমার চামার বাজানের নাকের ডগায় পণের টাকাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে তাজ্জব করে দেবে। তারপর এই মাসটা গেলেই সলিমাকে শাদি করে তার ঘরে নিয়ে আসবে। সাদাসিধা মানুষ ফজল মাঝি। সলিমাকে ঘিরে ছোট আনন্দ, ছোট খুশি আর ছোট ছোট সুখের কল্পনায় কয়েকটা মুহূর্ত সে ডগমগ হয়ে রইল।

একটু পরেই ফজল আরেক বার ইয়াছিনকে পরখ করল, 'কত ট্যাকা দিবেন?'

ছইয়ের ভেতর থেকে জবাব এল, 'পনের।'

মোচড় দিলে আরো রস ঝরবে, এ ব্যাপারে ফজল নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে আর গুণাহ্ করল না। কিঞ্চিৎ ধর্মভয় অন্তত তার আছে।

যাই হোক, আর দেরি করল না ফজল। বৈঠা দিয়ে খোঁচা মেরে নৌকোটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এল। এরপর ধলেশ্বরীর অন্তহীন খরধারা। কালো কুটিল রাত্রি ছড়িয়ে পড়েছে দিকদিগন্তে। ঘোলাটে চাঁদের আলো ধলেশ্বরীকে ভৌতিক করে তুলেছে। জামকাঠের নৌকোর গায়ে ছপ ছপ শব্দে ঢেউয়ের আঘাত বাজছে।

হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আবছা আকাশের দিকে তাকাল ফজল। মিটমিটে জোনাকির মতো সেখানে অগণিত তারা ছড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সলিমার কথা ভাবতে লাগল সে। মনটা আশ্চর্য এক মাদকতায় ভরে গেল যেন। নাঃ, সলিমাকে না পেলে জীবনটা ব্যর্থই হয়ে যাবে তার। আজকাল দোচালা ঘরের বিছানাটাকে মরা সাপের হিমাক্ত আলিঙ্গনের মতো ভয়াবহ মনে হয়।

বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। আর সেই নিরানন্দ নিরুৎসব একাকিত্বের মধ্যে সলিমার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সমস্ত রাত জেগেই কাটিয়ে দেয় ফজল।

আজ রাত্রেই চর ইসমাইলে সওয়ারি পৌঁছে দিয়ে সলিমাদের বাড়ির দিকে নৌকোর বাদাম তুলে দেবে। আনন্দে উত্তেজনায় শিরায় শিরায় যেন টান পড়ল, রক্তে মাতামাতি শুরু হল, হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগল।

তর তর করে নৌকোটা জল কেটে এগিয়ে চলেছে। হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে গান ধরল ফজল :

'যৈবন আইল কইন্যার অঙ্গে
জোয়ারের জল রে—
আমার চৌখের জলে পদ্ম নাচে
টলমল রে—
ও কইন্যা, তুমি হইও চান্দোবদন,
আমি হমু মুখের আচল।
তুমি হইও লয়নমণি, আমি হমু
কালো কাজল, ও কইন্যা—

আচমকা গানের সুরটা ছিঁড়ে গেল। তীব্র ঝাঁকানি লাগল ইন্দ্রিয়গুলোতে। গোটা সত্তাকে কানের মধ্যে এনে উৎকণ্ঠ হয়ে রইল ফজল।

ছইয়ের ভেতর তাণ্ডব শুরু হয়েছে। ধস্তাধস্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বুকের ভেতর একটা বিশ্রী, অস্বস্তিকর বোধ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল ফজলের।

সাপের শিসের মতো শব্দ করে ইয়াছিন শিকদার গর্জাচ্ছে, 'চুপ চুপ, এক্কেবারে গলা টিপা মারুম।'

'তাই, তাই করেন। হয় আমারে মাইরা ফালান, নাইলে ছাইড়া দ্যান। নাইলে আমি জলে ঝাপ দিমু।' নারীকণ্ঠটি অবরুদ্ধ আর ভয়ার্ত।

গোরস্থানের শিয়ালের মতো খিক খিক করে হেসে উঠল ইয়াছিন, 'মরণ কি অতই হস্তা, এমনে তরে মারুম নিকি? এট্টু এট্টু কইরা খুন করুম।'

ইয়াছিন আর সেই নারীমূর্তিটির কথোপকথন খ্যাপা তুফনের মতো ধড়াস করে আছড়ে পড়ল ফজলের হৃৎপিণ্ডে।

ধলেশ্বরীর অন্তহীন খরস্রোতে নৌকোটা উল্কার মতো ছুটে চলেছে। পারের নারকেল আর হিজল বনে ঝড়ো বাতাস এলোপাথাড়ি আছাড় খাচ্ছে।

এদিকে ছইয়ের তলায় ধস্তাধস্তি একসময় থেমে গেল। যে মনটাকে একাগ্র করে ইয়াছিনদের দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছিল ফজল, ধীরে ধীরে সেটাকে আরেক দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আকাশময় অগুনতি তারা। দৃষ্টিটা সেদিকে ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে আবার ভাবতে চেষ্টা করল সে।

মোরগ ডেকে উঠবার আগেই কাল ভোরে সলিমার বাজানকে জাগিয়ে সাত কুড়ি টাকার মেয়ে-পণ নাকে ছুঁড়ে মারার পর তার মুখখানা কেমন হাবাগোবা বলদের মতো দেখাবে, সেটা ভাবতেই খুব আমোদ লাগল ফজলের।

বেশিক্ষণ অবশ্য তার মনটা সলিমার বাজানকে নিয়ে মগ্ন রইল না।

একটু একটু করে সলিমার স্বপ্ন সমস্ত চেতনার মধ্যে নিবিড় হয়ে এল। টানা টানা দু'টি ঘন কালো চোখ, শ্যামলী লতার মতো সতেজ সুঠাম দেহ, তার ডোরাকাটা রঙিন শাড়ি—সব মিলিয়ে সলিমা যেন এক পরমাশ্চর্য রহস্য।

স্বপ্নটা আবার ছিঁড়ে গেল।

ছইয়ের ভেতর থেকে কান্নাভরা অসহায় নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'আমারে কইলকাতায় দিয়া আহেন। আপনে আমার ধর্মের বাপ, আপনের পায়ে ধরি।'

চাপা, বীভৎস গলায় ইয়াছিন হেসে উঠল, 'তর বাজান না লো হমুন্দির ঝি, আমি তর পোলার বাজান হইতে চাই। অহন চুপ মাইরা থাক। তরে আনতে গিয়ে তর হোয়ামীর তিনটা সড়কির খোচা খাইছি।'

ইয়াছিনের হাসি, তরঙ্গিত কালো ধলেশ্বরী, আবছা অন্ধকার, ঢেউ আর পালের শব্দ, বাতাসের আওয়াজ, সব একাকার হয়ে একটা ভয়ানক অশুভ ইঙ্গিত চারদিক থেকে ক্রমাগত ঘনিয়ে আসছে। নদীর অতল থেকে কোটি কোটি ইবলিশ উঠে এসে দিগন্ত জুড়ে অট্টহাসি শুরু করে দিয়েছে যেন। কেমন ভয় করতে লাগল ফজলের।

আবার ইয়াছিনের সেই ভয়ঙ্কর গলা আর হাসি শোনা গেল, 'বেশি ঘ্যান ঘ্যান করবি না মাগী, এক্কেবারে শ্যাষই কইরা ফালামু।'

সেই নারীকণ্ঠটি এবার মরিয়ার মতো শোনাল, 'হেই করেন, তাইলে আমি বাইচা যাই। আপনে আমার হোয়ামীরে মারছেন।'

'হোয়ামীরে মারছি! পুরান হোয়ামীতে কতদিন আর হোয়াদ (স্বাদ) থাকে? নয়া হোয়ামী লইয়া অহন ঘর করবি। মন-ম্যাজাজ তাজা অইব।' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটানা অট্টহাসি চলল ইয়াছিনের।

এইবার অমানুষিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। বোবখার আড়ালে এমন একটা আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ কোথায় লুকিয়ে ছিল, ভেবে দিশেহারা হয়ে গেল ফজল।

চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চকিত নারীকণ্ঠটি শোনা গেল, 'আমারে ছুইবেন না, ছুইবেন না। এই আপনের ধর্মের বিচার! এইর লেইগা অগো হাত থিকা আমারে ছিনাইয়া আনছেন? আপনে কইছিলেন না আমারে কইলকাতায় পৌছাইয়া দিবেন! আমারে ছুইয়েন না—আঃ—'

'ইস, সতী বেউলা একেবারে! ছুইয়েন না!' টেনে টেনে বলল ইয়াছিন।

তারপরেই ছইয়ের মধ্যে নতুন করে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। নৌকোটা ঢেউয়ের মাথায় আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। এত দুলছে, যে-কোনো সময় ডুবে যেতে পারে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফজল। তার আগেই তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটি, 'আমারে বাচাও মাঝি, বাচাও। আমার সব্বনাশ কইরা ফালাইল।'

চিৎকারটা ফজলের শিরা-স্নায়ু-মজ্জা ফুঁড়ে চেতনায় বিঁধে গেল যেন।

ওপরে অবারিত আকাশ, হু-হু বাতাস, নিচে উথলপাথল নদী। দু'টি সওয়ারি ছাড়া কেউ নেই কোথাও। মনের মধ্য থেকে সলিমার স্বপ্নটা অনেক আগেই মুছে গিয়েছে। শিরায় শিরায় রক্তস্রোতে কী এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল ফজলের। চোখদু'টো বাঘের চোখের মতো জ্বলে উঠল। সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন। ভয়ঙ্কর গলায় ফজল চেঁচিয়ে উঠল, 'মিঞাছাব—'

ডাকটা শেষ হওয়ার আগেই হালের বৈঠাটা বাঁ হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ডান হাতখানা আড়কাঠের নিচে ধারাল কোঁচের ফলাগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল ফজল। আজ সারাটা রাত আবছা আকাশ আর মিটমিটে অগণিত তারার দিকে তাকিয়ে সলিমার স্বপ্ন দেখার সুন্দর একখানা সাধ ছিল তার। কিন্তু কে জানত, সেই সাধটার পাশে এমন একটা কদর্য দুর্যোগ ওত পেতে আছে!

ডাকটা কানে যাওয়ামাত্র ছই খুলে বাইরের পাটাতনে এসে বসল ইয়াছিন শিকদার। সঙ্গ সঙ্গে একরকম ঝাঁপিয়েই বেরিয়ে এল মেয়েটা। নৌকো কাত হয়ে পাটাতনে জল উঠল ছিটকে। মেয়েটা সেইরকম অমানুষিক স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আমারে বাচাও মাঝি, আমারে বাচাও। আমি তাতি বাড়ির বউ। দাঙ্গায় আমার হোয়ামীরে মারছে অরা। আর এই—'

মেয়েটার গলায় অশরীরী একটা আত্মা যেন ভর করেছে। ফজলের স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে স্বরটা শিরশিরিয়ে বয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডের ওপর কী একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল অতর্কিতে। নিজের

অজ্ঞাতসারে ফজলের হাতের থাবা থেকে কোঁচটা সাঁ করে ছুটে গেল। অব্যর্থ লক্ষ্য। ইয়াছিন বাধা দেওয়ার আগেই সেটা তার পাঁজরে গেঁথে গেল। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল ইয়াছিন শিকদার, 'ইয়া-আ-আ—'

তারপরেই নৌকোর ভার খানিকটা হালকা করে ইয়াছিনের শরীর ধলেশ্বরীর খরস্রোতে পাক খেতে খেতে কোন দিকে মিলিয়ে গেল কে জানে। ততক্ষণে কোঁচের ফলাগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে আবার ডোরার তলায় চালান করে দিয়েছে ফজল।

আতঙ্কে শ্বাসনালীটা বোধহয় চেপে চেপে আসছিল মেয়েটার। আঙুল ফেটে ঝি ঝি করে বুঝিবা রক্ত ছুটবে। চোখের মণিদু'টো হয়তো ঠিকরেই বেরিয়ে আসবে।

শান্ত, যেন কিছু ঘটেনি, এমন ভঙ্গিতে ফজল শুধলো, 'আপনে কই যাইবেন?'

আবছা, স্খলিত স্বরে মেয়েটি বলল, 'এইখানে আমার কেউ নাই। দাঙ্গায় সব পলাইছে। হোয়ামী মরছে। কইলকাতায় আমার এক ভাসুর আছে। হেইখানে যাইতে চাই।'

ফজল আর কোনো প্রশ্ন করল না। নৌকোর গলুইটা শুধু তারাপাশা স্টিমারঘাটাব দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আবার একটানা খরস্রোত, সোঁ সোঁ ঢেউ, সাঁই সাঁই বাতাস।

ভোরে পুব আকাশে এক আস্তব ছায়া ছায়া আলোর যখন ছোপ ধবল, ঠিক সেই সময় তাবাপাশা স্টিমারঘাটায় এসে লগি পুঁতল ফজল।

নৌকোর পাটাতনে নিস্পন্দের মতো বসে রয়েছে মেয়েটি। মুখের ওপর ভোরের ফুটি ফুটি আলো এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে চোখ দু'টো চমকে উঠল ফজলের। চকিতের জন্য মেয়েটির মুখে যেন সলিমার আদল ফুটে বেরুল।

স্টিমারঘাটায় অসংখ্য মানুষের জটলা। যাযাবরের মতো দেশের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে।

একসময় মেয়েটিকে নিয়ে ওপরে টিকিট-ঘরের দিকে এগিয়ে এল ফজল। বলল, 'ট্যাকা দ্যান, আপনের টিকিট কিনা দেই।'

মাথা নিচু করে মেয়েটি জানাল, তার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই।

এক মুহূর্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ফজল। তারপরই চকিতে মনে পড়ে গেল, কোমরের গোপন গেঁজেতে যৌবনের সুন্দর স্বপ্ন কিনে আনার মূল্য রয়েছে।

একটু দ্বিধা করল ফজল। বুকের ভেতরটা একটু দুলে উঠল। পরক্ষণে নিজের প্রাণের দিকে সবলে পিঠ ফিরিয়ে বিরাট জনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকাতার টিকিট কিনে আনল একখানা।

ইতিমধ্যে গম্ভীর শব্দ করে স্টিমার এসে গিয়েছে। টিকিটটা আর টিকিট কিনে যে টাকাগুলো অবশিষ্ট ছিল—সে সবই মেয়েটার হাতে দিতে দিতে ফজল বলল, 'এই ট্যাকা কয়টা রাখেন। এত মানুষ যাইতে আছে, তাগো লগে কইলকাতায় চইলা যান। পারবেন তো যাইতে?'

'পারুম, কিন্তুক এই ট্যাকা—' অপরিসীম সংকোচে মাথাটা বুকের দিকে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটির। খানিকটা পর যখন সে চোখ তুলল, কাউকেই দেখতে পেল না। অবিশ্বাস্য ভোজবাজিতে মাঝিটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কেরায়া ঘাটে নিজের একমাল্লাই নৌকোটার দিকে ফিরে আসতে আসতে ফজলের কী মনে পড়ল? সলিমাকে? না। তাঁতি বাড়ির ওই সর্বস্বহীনা বউটিকে? না। দু' চারদিনের ভেতর সাত কুড়ি টাকা পণ দিতে না পারলে সলিমার বাজান অন্য জায়গায় মেয়ের শাদির ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবে, সেই চিন্তাতেই কি বিকল হয়ে গেল ফজলের মন? তাও না।

তার মনে পড়ল, কাল রাতের সেই রক্তাক্ত কোঁচের ফলাটার কথা। চেতনার ওপর দিয়ে দুলে দুলে তারা অবিরাম নেচে চলেছে। ধলেশ্বরীপারের মাটিতে কোনো নিভৃত ছায়াতরুর তলায় সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগে রাতের ক্রূর অন্ধকারে কত বার ইয়াছিনদের আবির্ভাব হবে তার নৌকোয়? কত বার?

ফজলের মনে পড়ল, কোঁচটায় অনেক দিন শান দেওয়া হয়নি। আজই ধার দিয়ে রূপার মতো ঝকঝকে করে তুলতে হবে সেটা।

রাজা যায় রাজা আসে

ভোরবেলা পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে পা নাচাচ্ছিল রাজেক। পরনে সবুজ জমির ওপর হলুদ হলুদ রেখ-কাটা লুঙ্গি আর জালি গেঞ্জি। এই সাত সকালেই চুলে কাঁকই পড়েছে, মাথায় পেখম তুলে টেরি কেটে নিয়েছে সে। তার বুকে এখন সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আজই শুধু? ক'মাস ধরেই সুখের নদীতে বান ডেকে আছে তার।

পুবের ঘর বাদ দিলে উত্তর এবং পশ্চিমের ভিটেয় বড় বড় পঁচিশের বন্দের চারখানা ঘর। সেগুলোর মাথায় ঢেউটিনের নকশা-করা চাল, শালকাঠের খিলান-দেওয়া দেওয়াল, বিলিতি মাটির পাকা মেঝে।

রাজেক যেখানে বসে আছে, তার তলা থেকে ঢালা উঠোন। উঠোনটার একধারে সারি সারি ধানের ডোল, আরেক ধারে শিউলি গাছ। উঠোনের পর খানিকটা নাবাল জমি, পিঠক্ষিরা আব সোনালের ঝোপে জায়গাটা ছেয়ে আছে। তারপর পুকুর। পুকুর পেরিয়ে ধানের খেত। বর্ষায় পুকুর এবং ধানখেত ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখনও তেমনিই রয়েছে, দুইয়ের মাঝখানে সীমারেখা নেই কোথাও।

এতগুলো বড় বড় টিনের ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, পুকুর, পুকুরের পর একলপ্তে নব্বুই কানি দো-ফসলা জমি—সমস্ত মিলিয়ে রাজা-বাদশার ঐশ্বর্য। আর এ-সবই এখন রাজেকের। অথচ আট মাস আগে? আট মাস আগের কথা এখন নয়।

আশ্বিন মাস যায় যায়। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ভাদ্রের গোড়ায় আকাশ সেই যে আশ্চর্য রকমের নীল হয়ে গিয়েছিল এখনো তা-ই আছে। তার গায়ে থোকা থোকা ভবঘুরে নেঘ। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে সেজে রয়েছে। সেই কবে থেকে, শরৎ আসার আগেই বুঝি, সারা গায়ে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল গাছটা। এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। গলানো সোনার মতো রোদের ঢল নামল চারদিকে। কোত্থেকে দুটো মোহনচূড়া পাখি উত্তরের ঘরের চালে উড়ে এসে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে খুনসুটি জুড়ে দিল। সামনে-পেছনে, পুবে-পশ্চিমে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, শবৎকাল যেন যাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

পা নাচাতে নাচাতে অন্যমনস্কর মতো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। ক'মাস ধরে রোজ সকালবেলা এমনিভাবে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে অলস চোখে তাকিয়ে থাকছে সে। এটা যেন বিলাসের মতো, কিংবা তার মনেরই কোনো প্রিয় খেলা।

দূরে, অনেক দূরে ধানখেত চিরে একটা নৌকো আসছিল। নৌকোটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। ধানবনের ওপর গোল ছই, একটা কালো কুচকুচে মাঝি আর উঁচু লগির ওঠানামা চোখে পড়ছিল।

রোজ সকালে কত নৌকোই তো ধানখেত ভেঙে কত দিকে চলে যায়। ওই নৌকোটা কোথায় কোন দিকে চলেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রাজেকের। চারধারে আশ্বিনের নরম রোদের ছড়াছড়ি, মোহনচূড়া পাখি দু'টোর নাচানাচি কিংবা আকাশের ভাসমান মেঘ—কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। রাজেক ভাবছিল নিজের কথা, নিজের তিরিশ বছরের একটানা দীর্ঘ জীবনটার কথা।

হায় রে, কী জীবন ছিল তার! আজ এই যে জালি গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে মাথায় শৌখিন টেরিটি কেটে, সুখের নদীতে গা ভাসিয়ে রাজেক পা নাচাচ্ছে, আট মাস আগে তা ছিল অসম্ভব। দেশখানা যদি দু' ভাগ না হত, বৈকুণ্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।

ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই কী আশ্চর্য, ধানখেতের সেই নৌকোটা পুকুর পাড়ি দিয়ে ঘাটে এসে ভিড়ল।

ভুরু কুঁচকে খাড়া হয়ে বসল রাজেক। ভেবেই পেল না, সকালবেলায় তার কাছে কে আসতে পারে। সেজন্য অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পর নৌকো থেকে যে নামল সে আর কেউ না, স্বয়ং তোরাব আলি—ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড় ধানী গৃহস্থ।

দুশ' কানি তে-ফসলা জমি তোরাব আলির, হাল-হালুটি অগুনতি, গোরু আর বলদ পঞ্চাশ-যাটটা, নৌকো গোটা চল্লিশেক। পঁচিশ-তিরিশটা কামলা বার মাসই তার বাড়ি আর জমিতে খাটছে। ধান-পাট-মুগ-মুসুর, সব মিলিয়ে এলাহী কাণ্ড। মাস আষ্টেক আগেই তার বাড়ি কামলা খেটেছে রাজেক। এই ছিপতিপুর গ্রামের সে মাথা, সব চাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বড় গৃহস্থই শুধু না, তোরাব আলি মানুষটি ভারি শৌখিনও। এই সকালবেলাতেই পরিপাটি সাজসজ্জা করে বেরিয়েছে। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, কলিদার পাঞ্জাবি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা, চুলে-দাড়িতে কলপ। রাজেক জানে, কাছে গেলে তার চোখে সুর্মার টান দেখতে পাবে, আতরের ভুরভুরে গন্ধ নাকে এসে লাগবে।

তোরাব আলি কি তার কাছেই এসেছে? প্রথমটা বুঝতে পারল না রাজেক। তোরাব আলির মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা জগতে আর বোধ হয় কিছু নেই। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রাজেক, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পুকুরঘাটে চলে এল। হাত কচলাতে কচলাতে খুব সম্ভ্রমের সুরে বলল, 'আপনে!'

দু' হাতে দাড়ি তোয়াজ করতে করতে সামান্য হাসল তোরাব আলি। বলল, 'হ, আমিই। তর কাছে আইলাম—'

হায় আল্লা! শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না রাজেক। প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'আমার কাছে!'

'হ—হ, তরই কাছে।'

কী উত্তর দেবে, রাজেক ভেবে পেল না।

খুব তরল গলায় তোরাব আলি এবার বলল, 'পুকৈর (পুকুর) ঘাটেই খাড়া করাইয়া রাখবি নিকি! ঘরে নিয়া যাবি না?'

সুরটা অন্তরঙ্গ। সেই ছোটকাল থেকে তোরাব আলিকে দেখছে রাজেক, এভাবে তাকে কথা বলতে আগে আর কখনো শোনেনি।

রাজেক খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বলল,'আসেন—আসেন—'

বাড়ি এনে তোরাব আলিকে কোথায় বসাবে, কিভাবে আপ্যায়ন করবে, ঠিক করে উঠতে পারল না রাজেক। প্রথমে ছুটে গিয়ে একটা পাটি এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। কিন্তু নিজের কাছেই তা মনঃপূত হল না। তক্ষুনি সেটা গুটিয়ে একটা জলচৌকি নিয়ে এল।

তোরাব আলি কিন্তু বসল না। তার সমাদরের জন্য রাজেকের ছোটাছুটি, ব্যস্ততা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট। প্রসন্ন গলায় বলল, 'আমার লেইগা অস্থির হইস না রাজেক। বসুম পরে। আগে তর ঘরদুয়ার দেখা—'

চমকে সংশয়ের চোখে তোরাব আলিকে একবার দেখে নিল রাজেক। তার বাড়িঘর দেখার জন্যই কি সকালবেলা ছুটে এসেছে লোকটা? তোরাব আলির মনে কী আছে, কে জানে।

রাজেকের মুখচোখের সন্দিগ্ধ চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল তোরাব আলি। মৃদু কৌতুকের সুরে বলল, 'ডর নাই, তর বাড়িঘর.আমি কাইড়া নিমু না। তর জিনিস তরই থাকব।'

মুখে ফুটে তোরাব আলি একবার যখন দেখতে চেয়েছে তখন আর 'না' বলা যাবে না। মনের ভেতর স্তূপাকার সন্দেহ নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল রাজেক।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত দেখে জলচৌকির ওপর জাঁকিয়ে বসল তোরাব আলি। বলল, 'তামুক আছে রে?'

খেয়াল করে তামাক-টামাক দেওয়া উচিত ছিল। রাজেক দিতও, কিন্তু সংশয়ে দুশ্চিন্তায় মনটা হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় ভুলে গিয়েছিল।

ছুটে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল রাজেক। আয়েশ করে হুঁকো টানতে টানতে তোরাব আলি বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা বাড়িঘর তরে দেখাশুনা করতে দিয়া গেছে না?'

লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় দম বন্ধ করে রাজেক উত্তর দিল, 'হ।'

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তোরাব আলি বলল, 'ওই পুকৈরও তো বৈকুণ্ঠ সা'র?'

'হ।'

'পুকৈরের ওই পারের জমিন?'

'হেয়াও (তাও) সা'কত্তার।'

'কত জমিন আছে?'

'নব্বই কানি।'

'হগলই অখন তর হ্যাফাজতে?'

আবছা গলায় রাজেক বলল, 'হ।'

একটু নীরবতা। দ্রুত বারকতক হুঁকো টেনে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ল তোরাব আলি। তারপর বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা আট মাস আগে গেরাম ছাইড়া গেছে না?'

লোকটা দেখা যাচ্ছে, অনেক খবর রাখে। আগের সুরেই রাজেক বলল, 'হ।'

'কই গেছে জানস?'

'শুনছিলাম কইলকাতার দিকে যাইব।'

'খোজখপর কিছু পাইছস?'

'না।'

'এইর ভিত্‌রে তরে চিঠিপত্তর দিছে?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে কপাল কুঁচকে কী ভাবল তোরাব আলি। তারপর বলল, 'তর কী মনে লয়?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না রাজেক। জিজ্ঞেস করল, 'কোন ব্যাপারে?'

বৈকুণ্ঠ সা'রা আর দ্যাশে ফিরব?'

'কেমনে কমু?'

রাজকের কথা যেন শুনতে পেল না তোরাব আলি। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'আমার মনে লয় অরা ফিরব না।'

রাজেক উত্তর দিল না।

তোরাব আলি আবার বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা না ফিরলে তার জমিন, বাড়িঘর, পুকৈর, সগল তর হইয়া যাইব। হইয়া যাইব কি, হইয়া গেছেই।'

রাজেক এবারও চুপ।

বৈকুণ্ঠ সাহা এবং তার বিপুল সম্পত্তি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে আরো কিছুক্ষণ খবর-টবর নিল তোরাব আলি। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এইবার কামের কথাখান সাইরা লই।'

দম বন্ধ করেই ছিল রাজেক। আবছা গলায় বলল, 'কী কাম?'

'আমার ইচ্ছা, কাইল দুফারে আমাগো বাড়িত চাউরগা ডাইল-ভাত খাবি।'

সামনে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাত না রাজেক। ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়, সব চাইতে সম্মানিত, সব চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থ—যার বাড়ি ক'দিন আগেও সে কামলা খেটেছে, সেই তোরাব আলি কিনা নিজে এসে তাকে নেমন্তন্ন করছে! কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রাজেক, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

এদিকে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়েছে তোরাব আলি। বলল, 'তাইলে ওই কথাই রইল। কাইল দুফারে আসবি কিলাম।'

সজ্ঞানে না, অনেকটা ঘোরের মধ্যেই যেন ঘাড় কাত করল রাজেক।

তোরাব আলি বলল, 'আবার ভুইলা যাইস না। আমরা কিন্তুক তর লেইগা বইসা থাকুম।' বলে আর দাঁড়াল না। সামনের ঢালা উঠোন, তারপর সোনাল আর পিঠক্ষিরা গাছের জঙ্গল পেরিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল। একটু পর তার নৌকো দূর ধানখেতের ভেতর অদৃশ্য হল।

তোরাব আলি চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে থাকল রাজেক। পুকুরঘাট পর্যন্ত যে তাকে এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল, এই কথাটা রাজেকের একবারও মনে পড়েনি। আসলে এত বিস্মিত, এত স্তম্ভিত, এত বিহুল আগে আর কখনো হয়নি সে। এমন ভয়ও কখনো পায়নি।

তোরাব আলি তার কাছে এসেছিল, কাল দুপুরবেলা খাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গিয়েছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। তোরাব আলির মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, শুধু আসাই না, এত খাতির করতে পারে—এমন ঘটনা ভাবাই যায় না। আজ না হয় বৈকুণ্ঠ সাহারা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর একটু সুখের মুখ দেখেছে। নইলে আট মাস আগেও তার দিন যে কিভাবে চলত!

আশ্বিনের এই সকালে বিমূঢ়ের মতো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সময়ের উজান ঠেলে পেছন দিকে ফিরে গেল রাজেক।

হায় রে, কী জীবন ছিল তার! ছোটকালেই তো বাপ-মা খেয়ে বসেছে। তারপর থেকে দু' গরাস ভাতের জন্য কুকুরছানার মতো ছিপতিপুরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। কখনও যেত মৃধাদের বাড়ি, কখনো সর্দারদের, কখনো বা খানেদের। তবে সব চাইতে বেশি যেত হিন্দুপাড়ায়। কোথাও কিছু জুটত, কোথাও আবার কিছুই না। খিদে ছাড়া সে সময় আর কোনো অনুভূতি ছিল না। সর্বক্ষণ খিদেটা তার পায়ে পায়ে ফিরত।

একটু বড় হওয়ার পর রাজেকের মনে হয়েছিল, অন্যের করুণার ওপর চিরকাল বাঁচা যায় না, আর তা সম্মানজনকও নয়। কাজেই খানিকটা টোন সুতো আর বঁড়শি যোগাড় করেছিল সে। লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনেছিল খান দুই মূলি বাঁশ। বাঁশ চিরে 'পলো' এবং 'চাই' বানিয়েছিল আর বুনে নিয়েছিল একখানা 'ধর্মজাল'। তখন থেকে কঠিন জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তার।

এ দেশে সারা বছরই জল। খাল শুকোয় তো বিল আছে, বিল শুকোয় তো গাঙ তার বুক ভরে রেখেছে। বঁড়শি নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, পলো নিয়ে খাল বিল কি দু' মাইল দূরের বড় নদীতে চলে যেত রাজেক। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ যে মাছ মিলত তাই নিয়ে সে ছুটত ইনামগঞ্জের হাটে। মাছ বেচে সন্ধের পর ছিপতিপুরের এক কোণে যে গরিব মুসলমান পল্লীটা আছে সেখানে চলে যেত। ওদের রান্নাবান্না হয়ে গেলে কারো উনুনে চাট্টি চাল ফুটিয়ে নিত। তারপর খেয়েদেয়ে তাদেরই ঘরের দাওয়ায় টান হয়ে শুয়ে পড়ত।

সারাটা বছর জলে জলেই কেটে যেত রাজেকের। ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে লোকের বাড়ি কামলা খাটত। এর ধান কেটে দিত, ওর পাট 'তুলে' দিত। বেশির ভাগ সময় সে খাটত তোরাব আলির কাছে। পৌষ মাঘ মাসে ধান উঠে গেলে মাঠে যে শস্যের দানাগুলো কৃষাণদের চোখ এড়িয়ে পড়ে থাকত

সেগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে আনত রাজেক, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বার করত। কুড়নো ফসল থেকে এক-আধটা মাস ভালই কেটে যেত তার।

জলে-স্থলে সারা বছরই তখন তার নিদারুণ জীবন সংগ্রাম। ডাঙায় অবশ্য বেশিদিন থাকতে পেত না রাজেক। প্রায় বার মাস জলে ভিজে ভিজে চামড়া ফেটে ফেটে গিয়েছিল, গা থেকে সর্বক্ষণ খই উড়ত। চুল-দাড়িতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, চোখ দু'টো থাকত ঘোলাটে হয়ে। নখের কোণে পাঁক ঢুকে 'কুনি' হয়েছিল, হেজে হেজে আঙুলের ফাঁকে থকথকে ঘা। রাজেকের চোখের সামনে দিনরাতের একটাই মোটে রং তখন। তার নাম দুঃখ, অসীম অন্তহীন দুঃখ।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের!

শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-হেমন্ত—ঋতুর চাকায় পাক খেয়ে খেয়ে তিরিশটা বছর কিভাবে কেটে গিয়েছে, রাজেক জানে না।

একদিন সকালবেলা এক কোমর স্রোতে নেমে ধর্মজাল বাইতে বাইতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, স্কুলবাড়ির সামনের বড় মাঠটায় কাতারে কাতারে মানুষ গিয়ে জমা হয়েছে। চিত্রবিচিত্র পোশাক-পরা একদল লোক বিলিতি বাজনা বাজাল। কারা যেন গলার শির ফুলিয়ে ফুলিয়ে, প্রচুর মাথা নেড়ে বক্তৃতা করল। সিল্কের নতুন সবুজ পতাকা উঠল আকাশের দিকে।

সকালবেলা বর্ণশূন্য ধূসর চোখে স্কুলবাড়ির মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। সন্ধের পর ওখানেই যখন বাজি পোড়াবার ধুম পড়ে গেল, তখন আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, 'এত রংতামশা ক্যান? বাজি ফুটানের হইল কী?'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন ধিক্কারের গলায় বলে উঠেছিল, 'আরে আহাম্মক, তুই আলি (এলি) কইথন (কোথা থেকে)? দেখি, দেখি তর চোপাখান (মুখখানা)।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটা এবার বলেছিল, 'তাই কই, আমাগো রাজেইকা ছাড়া এমুন কথা আর কার মুখ দিয়া বাইর হইব! জলে থাইকা থাইকা বুদ্ধিসুদ্ধি তর গেছে। কুনো খপরই রাখস না—'

'প্যাচাল না পাইড়া কী হইছে হেই কথাখান কও—'

লোকটা এবার বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে একটা দিনের মতো দিন। সেদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনই শুধু না, কোটি কোটি মানুষ যার স্বপ্ন দেখেছে, যার জন্য মৃত্যুপণ সংগ্রাম করেছে, সেই পাকিস্তানেরও প্রতিষ্ঠা সেই দিনটিতে। এমন একটা দিন বছরের, এক-আধ বছরের কেন, বহু-বহু বছরের লক্ষ লক্ষ ম্যাড়মেড়ে আটপৌরে দিন থেকে আলাদা। তাকে তো অন্যমনস্কের মতো উদাসীনভাবে হাত পেতে নেওয়া যায় না। বিপুল সমাদরে, রাজকীয় সমারোহে বরণ করে নিতে হয়। তাই এত লোকজন, এত বাজি পোড়াবার ধুম, এত উদ্দীপনা।

মনে আছে, অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন স্কুলবাড়ির মাঠে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। এত আলো, এত হই চই, এত উত্তেজনা, এত রোশনাই, এত রং—সবই ভাল লেগেছিল তার, নতুন নতুন মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাল লাগার আয়ু মোটে একটা রাত। পরের দিনই 'পলো' নিয়ে খালে গিয়ে নামতে হয়েছিল তাকে।

সেই চমকপ্রদ বিশেষ দিনটির পর বছরখানেক কাটল। হঠাৎ একদিন কার্তিক মাসের পচা জলে 'চাই' পাততে পাততে রাজেক খবর পেল, ছিপতিপুর গ্রামে ভাঙন লেগেছে। গোঁসাই বাড়ির লোকেরা নাকি জমিজমা ঘরদুয়ার বেচে কলকাতায় চলে গিয়েছে। গোঁসাইদের পর গেল ভুঁইমালীরা, তারপর একে একে বারুইরা, কুমোররা, যুগীরা। দেখতে দেখতে ছিপতিপুর একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

বার মাস জলে থেকে থেকে অনুভূতিগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল রাজেকের। গ্রামে কারা থাকল, কারা গেল—তা নিয়ে আদৌ দুর্ভাবনা নেই। তার দিনরাতের একমাত্র চিন্তা—জলের তলা থেকে কেমন করে জীবন্ত রুপোলি ফসলগুলোকে তুলে আনবে।

দেশভাগ, স্বাধীনতা দিবসের জমকালো উৎসব কিংবা গ্রামের ভাঙন—সমস্ত কিছুই রাজেককে আলতোভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সে-সব নিয়ে বসে থাকার মতো যথেষ্ট সময় তার নেই। কেননা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তাকে এত খাটতে হ'ত যে তারপর আর কোনো ব্যাপারে মেতে ওঠার মতো উৎসাহ থাকত না।

কিন্তু খুব বেশিদিন চারপাশের জগতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা গেল না। মাঘ মাসের এক শীতল দুপুরে মাঠে মাঠে ফেলে যাওয়া শস্যের দানা কুড়োচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ বুড়ো বৈকুণ্ঠ সাহা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজেক শুধিয়েছিল, 'আমারে কিছু কইবেন সা'মশয়?'

'হ—' বৈকুণ্ঠ সাহা মাথা নেড়েছিল।

'ক'ন।'

'আমরা তো গেরাম ছাইড়া চললাম—'

'কই চললেন?'

'কইলকাতা।'

'ফিরবেন কবে?'

'ফিরনের ঠিক নাই।'

রাজেক আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

বৈকুণ্ঠ সাহা আবার বলেছিল, 'তর লগে একখান কামের কথা আছে।'

'কী?'

'আমরা কইলকাতা গেলে আমাগো ঘরদুয়ার জমিন-পুকৈর সগল তুই দেখবি। এমনে এমনে দেখতে কই না, ধান পাট যা হয় তুই পাবি। যদি কুনোদিন ফিরি তহন বাড়িঘর ফিরাইয়া দিস। না ফিরলে বেবাক তরই হইয়া যাইব।'

বৈকুণ্ঠ সাহারা সত্যিই চলে গেল। তাদের বিপুল সম্পত্তি, বিশাল ঐশ্বর্য এসে পড়ল রাজেকের হাতে। ইদানীং আট মাস ধরে জীবনধারণের জন্য জলে-স্থলে আর উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াতে হচ্ছে না তাকে। এ ব্যাপারে এখন সে নিশ্চিন্ত। আরামে আর সুখে থেকে পায়ের হাজা, নখের কুনি-টুনি সেরে গিয়েছে রাজেকের। খই-ওড়া চামড়ায় চকচকে মসৃণতা এসেছে, মাথায় ঢেউখেলানো টেরি দেখা দিয়েছে। মেজাজটিও হয়ে উঠেছে শৌখিন। আজকাল সিল্কের লুঙ্গি, জালি গেঞ্জি, কলিদার পাঞ্জাবি ছাড়া চলে না। গন্ধতেলটি না হলে মন খুঁতখুঁত করে।

ক'মাস ধরে সব সময় রাজেকের মনে হয়, ভাগ্যি দেশখানা দু' ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুণ্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল! না হলে তার কপাল কি খুলত! এত সুখের মুখ কি সে দেখতে পেত!

দিনগুলো ভালোই কাটছিল কিন্তু ছিপতিপুর গ্রামের এত মানুষ থাকতে আজ তোরাব আলি কেন যে বেছে বেছে হঠাৎ তার কাছে আসতে গেল! শুধু আসা না, দাওয়াতও করে গেল। লোকটার মনে কী আছে, কে জানে।

তোরাব আলি নেমন্তন্ন করে গিয়েছে। না গেলেও নয়, আবার যেতেও ভরসা হয় না। পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে ভাবল রাজেক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তোরাব আলির উদ্দেশ্যটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর নিজের অজান্তেই এক সময় চানটান সেরে, রঙচঙে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিটি পরে কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

ছিপতিপুর গ্রামের শেষ মাথায় একটা দ্বীপের মতো জায়গায় তোরাব আলির বাড়ি। যেমন তেমন বাড়ি না, রীতিমত পাকা দালান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা, অসংখ্য ঘর। মানুষজনও প্রচুর।

ধানবন ঠেলে রাজেক যখন সেখানে পৌঁছল, আশ্বিনের বেলা অনেকখানি হেলে গিয়েছে। রোদে হলুদ আভা লাগতে শুরু করেছে।

ঘাটে নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই তোরাব আলি ছুটে এল। সমাদরের গলায় বলল, 'আইছ মেঞা! আমি তো ভাবছিলাম, তুমি ভুইলাই গেছ—'

উত্তর দেবে কি, রাজেক স্তম্ভিত। এই সেদিনও অবজ্ঞার সুরে তাকে 'তুই' বলত তোরাব আলি, সম্ভাষণের ভাষাটা ছিল 'রাজেইকা'। বেশি দূরে পিছিয়ে যেতে হবে কেন, কালও তাকে 'তুই তোকারি' করে এসেছে। রাতারাতি হঠাৎ এমন কী ঘটে গেল যাতে সে অত সম্মানিত হয়ে উঠেছে! 'তুই' থেকে 'তুমি', 'রাজেইকা' থেকে 'মেঞা'—এতখানি বিস্ময় রাজেক সহ্য করতে পারছে না।

তোরাব আলি বলল, 'আসো—আসো—'

নিঃশব্দে নৌকো থেকে পারে নামল রাজেক। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে তোরাব আলি বলতে লাগল, 'এত দেরি হইল ক্যান?'

জড়ানো গলায় রাজেক কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

তোরাব আলি বলল, 'আরেট্টু দেখতাম। হে'র (তার) পরও যদি না আইতা, তোমার বাড়িত্ লোক পাঠাইতাম।'

অনেক কষ্টে স্বরটাকে গলার ভেতর থেকে এবার মুক্ত করে আনল রাজেক, 'আপনে কাইল কইয়া আইলেন। না অইসা কি পারি? ঘেটিতে (ঘাড়ে) আমার কয়টা মাথা?'

তোরাব আলি কিছু না বলে হাসল।

বাড়ির ভেতরে এনে ধবধবে ফরাসের ওপর খুব যত্ন করে রাজেককে বসানো হল। তক্ষুনি সরবত এল, মিঠাই এল, পান-তামাক এল। বাড়ির যত বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ সবাই এসে রাজেককে ঘিরে বসল। বাচ্চাগুলো দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল।

রাজেক ঘামতে শুরু করেছিল। আট মাস আগেও যে সে এ-বাড়িতে কামলা খেটেছে, মাঠ থেকে ধান কেটে এনেছে, পাট 'জাগ' দিয়েছে—এই কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তোরাব আলিরা কিন্তু সে-সব ভুলে গিয়েছে। অন্তত তাদের আদর যত্ন এবং খাতিরের ঘটা দেখে তাই মনে হয়। সে যেন এ-বাড়ির অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি।

তোরাব আলি বলল, 'খাও মেঞা, শরবত খাও। রান্ধনের (রান্নার) দেরি আছে। দুই-একখান পদ অহনও বাকি।'

বাড়ির অন্য লোকেরাও সায় দিল, 'হ হ, খাও—'

কাঁপা কাঁপা হাতে শরবতের গেলাস তুলে নিল রাজেক।

শরবতের পর তামাক সাজা হল। তোরাব আলি হুঁকোয় দু' চারটে টান দিয়ে রাজেকের দিকে এগিয়ে দিল।

সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল রাজেক। দু' হাত এবং মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'না-না, না-না—'

তোরাব আলি হুঁকোটা প্রায় তার হাতে গুঁজেই দিল, 'আরে মেঞা, ধর ধর। মাইয়ামাইনষের লাখান অত শরম ক্যান?'

মুখ নিচু করে আবছা গলায় রাজেক বলল, 'আপনের সুমখে নিশা (নেশা) করুম! না-না—'

'আমার সুমখে বইলা কী? খাও খাও—'

অনেক বলার পর তোরাব আলির দিকে পেছন ফিরে বারকয়েক দ্রুত হুঁকো টানল রাজেক। তারপর কাছে যাকে পেল তার হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে আবার ঘুরে বসল।

মিঠাই, শরবত আর তামাকের পর গল্প শুরু হল। দেশভাগের গল্প, গ্রামে ভাঙন লাগার গল্প। ধান-

পাট, এবারের বর্ষা—কিছুই বাদ গেল না। তবে বেশির ভাগ কথাই হল বৈকুণ্ঠ সাহা আর তার বিষয় আশয় নিয়ে।

কথায় কথায় বেলা আরো হেলে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢালু পার বেয়ে সূর্যটা যখন অনেকখানি নেমে গিয়েছে সেই সময় ভেতর-বাড়ি থেকে খবর এল রান্নাবান্না শেষ।

তোরাব আলি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ইস, বেইল (বেলা) যায়। তোমার বড় কষ্ট হইল মেঞা।'

রাজেক বলল, 'না, কষ্ট কিসের।'

'লও লও, খাইতে যাইবা।'

খাওয়ার ব্যবস্থা ভেতর-বাড়িতে। তোরাব আলি আয়োজনও করেছে প্রচুর। পাঁচ ছ' রকমের মাছ, মাংস, পায়েস, পাতক্ষীর, বড় বড় মোহনবাঁশি কলা, পুরু সরওলা হলুদবর্ণ ঘন দুধ।

একা রাজেক না, তার সঙ্গে তোরাব আলি এবং এ-বাড়ির বর্ষীয়ান ক'টি মানুষও খেতে বসল। খেতে খেতে আবার বৈকুণ্ঠ সাহাদের কথা উঠল, তাদের ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হল।

রাজেক অবশ্য বিশেষ কথা বলছিল না। সে এত বিস্মিত, এত স্তম্ভিত হয়ে আছে যে তোরাব আলির প্রশ্নের উত্তরে খুব সংক্ষেপে এক-আধটা 'হুঁ' 'হ্যাঁ'র বেশি তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল না।

মাথা নিচু করেই খাচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ তোরাব আলির এক বুড়ো চাচার কথায় মুখ তুলে পাশের দিকে তাকাতে গিয়েই ওধারের এক জানালায় তার চোখ আটকে গেল। সেখানে কামরন দাঁড়িয়ে আছে। তোরাব আলির মেয়ে কামরন। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং, দীঘল টান দেওয়া নাক-চোখ-চিবুক। মুখখানা পানপাতার মতো। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে থাক থাক কোঁচকানো চুল, ফুরফুরে ঠোঁট। পরস্তাবে (রূপকথায়) সেই যে গুলেবাখালি রাজকন্যার কথা আছে, কামরন যেন তাই।

মেয়েটা খুব সম্ভব একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই সলজ্জ, মধুর হেসে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কামরনকে অবশ্য এই প্রথম দেখল না রাজেক। কামলা খাটতে এসে কত বার দেখেছে। কী দেমাক ওই মেয়ের! রূপের দেমাক, বড়মানুষির দেমাক। দুনিয়াখানাকে যেন পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে। মানুষকে মানুষ বলেই সে ভাবত না।

সেই কামরন যে এমন হাসতে পারে, তা যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার।

খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের ঘরের ফরাসে এসে বসতে না বসতেই সন্ধে নেমে গেল। রাজেক বলল, 'অহন আমি যাই।'

তোরাব আলি আর তাকে আটকাল না, 'আইচ্ছা যাও, আবার আইসো।' ঘাট পর্যন্ত গিয়ে রাজেককে নৌকোয় তুলে দিয়ে এল সে।

যতদূর চোখ যায় এখন গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত চরাচর জুড়ে লক্ষ কোটি জোনাকি জ্বলছে। আশ্বিনের এলোমেলো ঝিরঝিরে হাওয়া ছুটছে দিগ্বিদিকে।

ধানখেতের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে যেতে যেতে রাজেক সেই পুরনো কথাটাই ভাবছিল। তোরাব আলির এত খাতির, এত সমাদর—এ সবের উদ্দেশ্য কী? এগুলো ফাঁদ নয় তো? ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৈকুণ্ঠ সাহার জমিজমা বাড়িঘর সে গ্রাস করতে চায় কী?

সেই যে নেমন্তন্ন খাওয়া শুরু হল, কার্তিকের শেষাশেষি পর্যন্ত একটানা তার জের চলল। দু' চারদিন পর পরই একটা না একটা উপলক্ষে তোরাব আলির বাড়ি যেতে হয়েছে রাজেককে। প্রথম দিনের মতোই প্রতিবার সেখানে আদর-যত্ন-খাতির মিলেছে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রাজেক, ইদানীং কামরন তার সামনে আসে না। খেতে বসে কিংবা গল্প করতে করতে জানালার ফাঁকে চকিতের জন্য এক-আধবার তাকে দেখা যায়। অথচ আট-দশ মাস

আগেও এ-বাড়িতে যখন সে কামলা খাটতে আসত, সর্বাঙ্গে রূপ আর গর্বের ঝিলিক দিয়ে গরবিনী মেয়েটা তাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই কামরনের এজাতীয় আচরণের কোনো কারণ খুঁজে পায় না রাজেক। ভেবে ভেবে কূলকিনারা চোখে পড়ে না তার।

শেষ পর্যন্ত রহস্যটা পরিষ্কার হল। অঘ্রাণ মাসের গোড়ায় একদিন সকালবেলা তোরাব আলি রাজেকের কাছে এল, 'তোমার লগে কামের কথা আছে মেঞা—'

এতদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শুধু নেমন্তন্নই খাইয়েছে তোরাব আলি আর প্রচুর খাতির-যত্ন করেছে। এলোমেলো গল্প ছাড়া বিশেষ কোনো কথা বলেনি। তবে সে যে বলবে, নিদারুণ উদ্দেশ্যপূর্ণ কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুবে, তা আন্দাজ করতে পারছিল রাজেক। সেজন্য রাজেকের ঘুম নেই, একটা ধারাল কাঁটা বুকের ভেতর সবসময় যেন আড় হয়ে বিঁধে আছে।

তোরাব আলির কাজের কথাটা কী, কে বলবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাজেক তাকিয়ে থাকল।

তোরাব আলি বলল, 'আমার মাইয়া কামরনরে দেখছ তো?'

লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল রাজেক, 'হ—'

'আমার ইচ্ছা, কামরনের লগে তোমার শাদি দিমু—'

ভীষণভাবে চমকে উঠল রাজেক, 'এ আপনে কী ক'ন বড় মেঞা!'

তোরাব আলি শুধলো, 'ক্যান, কী কই?'

'আপনে কত বড় মানুষ, কত বড় ঘর আপনেগো। আপনের কাছে হেই দিনও কামলা খাইটা গেছি। হেই মাইনষের মাইয়ারে শাদি! না-না—'

'কামলা খাটার কথা ভুইলা যাও মেঞা। আর বড় মানুষ, বড় ঘরের কথা যহন তুললা তহন কই তুমিও ছোট না। বৈকুণ্ঠ সা'র অত জমিন পাইছ, ঘর-দুয়ার হাল-হালুটি পাইছ। তুমি কম কিসে? জাতে উইঠা গেছ মেঞা—'

দ্বিধান্বিত সুরে রাজেক বলল, 'কিন্তুক—'

'আবার কী?'

'আমার লগে মাইয়ার শাদি দিলে মাইনষে আপনারে কী কইব!'

'কুনো হালায় কিছু কইব না। সুমখা-সুমখি কওনের মতো বুকের পাটা কারো নাই। হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'আমার দেখতে হইব মাইয়া কোনখানে সুখে থাকব। তুমি ছাড়া আর কোন সুমুন্দির পুতের নব্বই কানি জমিজেরাত আছে, এমুন সোন্দর ঘরদুয়ার আছে? লোক না পোক। মাইনষের কথায় আমি কান দেই না।'

এ একেবারে আশাতীত, অকল্পনীয়। জামাই করবে বলেই তবে তোরাব আলির এত ছোটাছুটি, এত সমাদর, এত মেজবান খাওয়াবার ঘটা! সুখের নদীতে ভাসতে ভাসতে রাজেক বলল, 'তাইলে আমি আর কী কমু, আপনে যা ভাল বোঝেন—'

একটু ভেবে তোরাব আলি বলল, 'ভাবছি, ধান-টান উইঠা গেলে তোমাগো শাদিটা সারুম—'

রাজেক উত্তর দিল না, মুখ নিচু করে বসে থাকল।

তোরাব আলি আবার বলল, 'তাইলে ওই কথাই রইল। অহন আমি যাই—'

তোরাব আলি চলে যাওয়ার পরও উঠল না রাজেক। বসে বসে ভাবতে লাগল, ভাগ্যি দেশখানা দু'ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুণ্ঠ সাহারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নইলে এত সুখ কি তার কপালে

অঘ্রাণের মাঝামাঝি ধান কাটার মরশুম শুরু হল। মাঠ থেকে ধান তুলে এনে সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে, ডোলের ভেতর সেঁতে রাখতে রাখতে মাঘ মাস পেরিয়ে গেল। তারপর আবার এল তোরাব আলি। বলল, 'ফসল টসল তো উঠল, এইবার মোল্লামুছুল্লিগো খপর দেই—'

নখ খুঁটতে খুঁটতে রাজেক বলল, 'আপনের যা ইচ্ছা—'

খানিক চিন্তা করে তোরাব আলি বলল, 'আইজ কী বার?'

'বুদ (বুধ)—'

'শনিবার দুফারে নাও পাঠাইয়া দিমু, তুমি আমাগো বাড়িত্ যাইও। মোল্লামুছুল্লিগো কইয়া রাখুম, তারাও আইব। হেইদিন শাদির কথা, দেনমোহরের কথা পাকা হইব।'

রাজেক বলল, 'নাও পাঠাইতে হইব না, আমি এমনেই যামু গা—'

তোরাব আলি শুনল না। জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, 'এট্টা ভাল কামে আইবা, নাও না পাঠাইলে হয়! তোমার সোম্মান নাই?'

বুধবার তোরাব আলি চলে যাওয়ার পর দিন যেন আর কাটতেই চায় না। শিরায় শিরায় সীমাহীন উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ অস্থির হয়ে থাকল রাজেক।

তবু একে একে বেস্পতি গেল, শুক্র গেল। শনিবার সকাল থেকে সময় যেন একেবারে থেমেই গিয়েছে। সূর্যটা অন্য দিনের চাইতে অনেক দেরি করেই বুঝি আজ উঠেছে, আর চলছে দেখ না! এক ঘন্টার রাস্তা পাড়ি দিতে আজ দশ ঘন্টা লেগে যাচ্ছে তার।

রাজেক ঘুরছে ফিরছে আর দূর মাঠের দিকে তাকাচ্ছে। সকাল থেকে কত বার যে পুকুরের ওধারের মাঠটার দিয়ে তাকিয়েছে তার হিসাব নেই।

এই ফাল্গুনে মাঠে অবশ্য জল নেই। কিন্তু তার পাশ দিয়ে একটা বড় খাল আছে, সেটা সোজা এসে বৈকুণ্ঠ সাহার পুকুরে থেমেছে। তোরাব আলির নৌকো ওই খাল দিয়েই আসবে।

সময় যত ধীরেই চলুক, এক সময় দুপুর হল। আর তখনই অনেক দূরে নৌকোর গোল ছই চোখে পড়ল রাজেকের। সঙ্গে সঙ্গে দোতারায় এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর ঝড় বইতে লাগল তার। এটা যেন সাধারণ দু'মাল্লাই নৌকো না, পরস্তাবের মনোহারিণী রাজকন্যা তার জন্য একখানা ময়ূরপঙ্খীই পাঠিয়ে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে নৌকোটা পুকুরঘাটে এসে ভিড়ল। পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাজেক। ভাবছিল ঘাটে যাবে কিনা।

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই নৌকো থেকে যে নামল, এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে কেন, দু-তিন মাসের ভেতর তার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি রাজেক। সে চমকে উঠল, সামনে বাজ পড়লেও মানুষ এত চমকায় না। হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো সিরসিরিয়ে কী যেন বয়ে গেল তার।

একা বৈকুণ্ঠ সাহাই না, তার সঙ্গে আর একজনও নেমেছে। পোশাক-আশাক এবং চেহারা-টেহারা দেখে মুসলমান বলেই মনে হয়। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

পুকুরঘাট থেকে সঙ্গীকে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এলে বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেককে দেখে ভারি খুশি সে। বলল, 'ভালই হইল রাজেক, বাড়িতে পাও দিয়াই তরে পাইয়া গেলাম। ভাবছিলাম, পামু না। তা আছস কেমুন? শরীল-গতিক ভাল তো?'

বাজ-পড়া অসাড় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। কোনোরকমে বলতে পারল, 'আপনে সা'মশয়!'

বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'হ, আমিই। তরে খপর দিয়া আইতে পারি নাই। হঠাৎ সুযুগ হইল, আইসা পড়লাম।'

'অ্যাদ্দিন আছিলেন কই?'

'মেলা জায়গায়। কইলকাতা, বনগাঁ, দত্তপুকৈর—কতখানের নাম কমু? শ্যাষম্যাষ মুশ্‌শিদাবাদে থিতু হইছি।' বলতে বলতে সঙ্গী সম্বন্ধে সচেতন হল বৈকুণ্ঠ সাহা। তার উদ্দেশে বলল, 'বসেন, বসেন আমিন সাহেব। দে রে রাজেক, একখান জলচৌকি বাইর কইরা দে। তামুক টামুক থাকলে সাজ—'

জলচৌকি এলে আমিন সাহেব বসল। বৈকুণ্ঠ সাহাও বারান্দার একধারে বসে পড়ে। তারপর গল্প-টল্প শুরু হয়। দেশের হালচাল, গ্রামে কারা কারা আছে, কারা কারা ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গিয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। বৈকুণ্ঠ সাহাই এক তরফা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল। রাজেক মনে মনে অবসন্ন বোধ করছিল, নির্জীব গলায় উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

টুকরো টুকরো অনেক কথার পর আসল কথা পাড়ল বৈকুণ্ঠ সাহা, 'তারপর ঘর দুয়ার ভাল কইরা গুছাইয়া সাফসুফ রাখছস তো?'

এতকাল পরে হঠাৎ কেন বৈকুণ্ঠ সাহা গ্রামে ফিরে এল, বোঝা যাচ্ছে না। আর এল এমন দিনে যেদিন শাদির কথা পাকা হবে। অন্যমনস্কের মতো রাজেক বলল, 'দ্যাহেন না, কেমুন কইরা রাখছি—'

বৈকুণ্ঠ সাহা তক্ষুনি উঠে পড়ল। আমিন সাহেবকে ডেকে বলল, 'আসেন, আসেন। নায়ে কইরা আসনের সময় আমার জমিন দেখাইছিলাম। অহন আমার বাড়িঘর দ্যাখেন—'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমিন সাহেবকে চারদিক দেখাতে লাগল বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেক কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না, আকণ্ঠ দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকল। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল তার।

বৈকুণ্ঠ সাহা এতদিন পর বউ-ছেলেমেয়ে বা সংসারের অন্য কাউকে নিয়ে আসেনি সত্যি কিন্তু আমিন সাহেবকে সঙ্গে এনেছে। আমিন সাহেব এ-দিককার লোক না। হলে রাজেক নিশ্চয়ই চিনতে পারত। এই মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পর্ক কী? আসবার সময় তাকে ধানজমি দেখিয়েছে বৈকুণ্ঠ, এখন বাড়িঘর দেখাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই রাজেকের কাছে রহস্যময় লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ পর আমিন সাহেবরা ফিরে এল। দাওয়ায় বসতে বসতে বৈকুণ্ঠ সাহা শুধলো, 'বাড়িঘর কেমুন দেখলেন?'

আমিন সাহেব বলল, 'ভাল।'

'পছন্দ হইছে তো?'

'হ্যাঁ।'

আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বৈকুণ্ঠ সাহার। তাড়াতাড়ি রাজেকের দিকে ফিরে বলল, 'ভাল কথা, তর লগে তো আমিন সাহেবের আলাপ-সালাপই করাইয়া দেই নাই। উনি মুশ্‌শিদাবাদের মানুষ, আমার বন্ধু।' আমিন সাহেবকে বলল, 'আর ও হইল রাজেক মেঞা, বড় বিশ্বাসী। আমরা যহন দ্যাশ ছাইড়া যাই অর উপর বাড়িঘর জমিজিরাতের ভার দিয়া গেছিলাম। দ্যাহেন কেমুন সোন্দর পরি (পাহারা) দিয়া রাখছে।'

আমিন সাহেব কিছু বলল না, মাথা নাড়ল শুধু।

আলাপ-পরিচয়ের পর বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'বুঝলি রাজেক, দ্যাশে আমরা আর ফিরুম না। হেইর লেইগা আমিন সাহেবরে লইয়া আইলাম। ক্যান আনছি বুঝছস?'

রাজেক মাথা নাড়ল, অর্থাৎ বোঝেনি।

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চাপা গলায় এবার বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'আমার সগল সম্পত্তি আমিন সাহেবরে দানপত্তর কইরা দিমু। আসলে ব্যাপারটা কী জানস?'

'কী?'

'আমিন সাহেব ইণ্ডিয়ায় থাকব না। মুশ্‌শিদাবাদে তেনার ঘরদুয়ার খ্যাতখামার যা আছে, আমারে দানপত্তর কইরা দিব। পাকিস্থানে আমার যা আছে, তেনারে দিমু। ব্যাপারটা অইল 'এচেঞ্জ' (এক্সচেঞ্জ), বাংলায় কয় বিনিময়—'

রাজেক কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেইসময় তোরাব আলির দুই মাঝি এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'লন মেঞাসাব, তরাতরি লন। আমাগো আইতে এট্টু দেরি হইয়া গেল—'

আমিন সাহেবকে সব সম্পত্তি দানপত্তর করে দেবে বৈকুণ্ঠ সাহা। এ-কথা শুনবার পরও তোরাব আলির বাড়ি যাওয়ার আর প্রয়োজন আছে কিনা, রাজেক বুঝতে পারছে না। মোট কথা, গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছিল না সে।

এদিকে মাঝি দু'টো সমানে তাগাদা দিতে শুরু করেছে। হঠাৎ তোরাব আলির সহৃদয় ব্যবহারের কথা মনে পড়ল রাজেকের, খাতির-যত্নের কথা মনে পড়ল। রাজেক ভাবল, শাদির ব্যাপারে এতদূর এগিয়ে এখন আর না-ও পিছোতে পারে তোরাব আলি।

একরকম ঘোরের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল রাজেক। বৈকুণ্ঠ সাহাদের বলল, 'আপনেরা বসেন সা'মশয়। আমি এট্টু ঘুইরা আসি—' বলে মাঝি দু'টোর সঙ্গে গিয়ে নৌকোয় উঠল।

তোরাব আলির বাড়ি আসতেই দেখা গেল, বার-বাড়ির আসর একেবারে জমজমাট। মোল্লামুছুল্লিরা ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। সর্দারদের বাড়ি থেকে, খানেদের বাড়ি থেকে, মৃধাদের বাড়ি থেকে—ছিপতিপুর গ্রামের হেন বাড়ি নেই যেখানে থেকে মান্যগণ্য লোকেরা এসে হাজির হয়নি।

রাজেক ঢুকতেই সাড়া পড়ে গেল। পিচকিরি দিয়ে প্রচুর গোলাপ জল ছিটানো হল। পান এল, তামাক এল, মিঠাই এল, ভুরভুরে আতর এল। ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-ঠিসারা চলল। রঙের কথায়, রসের কথায় হাসি উথলে উথলে উঠতে লাগল।

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না রাজেক, দেখতে পাচ্ছিল না। নির্জীবের মতো, বিহ্বলের মতো বসে ছিল সে।

তোরাব আলি রাজেককে লক্ষ করছিল। মেজাজখানা আজ তার খুব ভাল। মনে গোলাপি আভা লেগেছে। ভাবী জামাইকে একটু ঠাট্টা করার লোভ কিছুতেই সে সামলাতে পারল না। রাজেকের কাছে ঘন হয়ে বসে বলল, 'আইজের দিনে এমুন মনমরা ক্যান মেঞা? ব্যাপারখান কী?'

ফস করে নিজের অজান্তেই রাজেক বলে ফেলল, 'আইজ বৈকুণ্ঠ সা আইছে।'

তোরাব আলি চকিত হয়ে উঠল, 'বৈকুণ্ঠ সা আইছে!'

'হ। লগে আমিন সাহেব বইলা একজনেরে আনছে। তারে নিকি জমিনজিরাত বাড়িঘর লেইখা দিয়া যাইব।'

মুহূর্তে সমস্ত ঘরখানায় স্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর তোরাব আলি বলল, 'তাইলে শাদির কথার দরকার কী? খোদা যা করে ভালর লেইগাই করে। ভাগ্যে আইজই বৈকুণ্ঠ সা আইছে—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল এবং বড় বড় পা ফেলে ভিতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু পর একে একে মোল্লামুছুল্লিরা, গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরা চলে গেল। ফাঁকা ঘরে একা একা অনেকক্ষণ বসে থেকে একসময় বাইরে চলে এল রাজেক।

তারপর দিন যায়, দিন আসে।

আবার পলো নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, টৌন সুতোর বঁড়শি নিয়ে খালে বিলে নদীতে নামল রাজেক, আবার হেমন্তের মাঠে শস্য কুড়োতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তার পা ফেটে গেল, আঙুলের ফাঁকে থকথকে হাজা হল, চামড়া থেকে খই উড়তে শুরু করল।

মাছ আর শস্যকণার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আজকাল রাজেক নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বলে, 'দ্যাশখান দুই-ভাগ হয়, সাহারা-ভূইমালীরা-যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশের এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?'

চোর

আবীর-গোলা বিকেলটা রক্তকমলের মতো ফুটে উঠেই আবার ঝরে পড়েছে। দিগন্তবিসারী আকাশের কোণে এক টুকরো নিরীহ মেঘ উঁকি দিয়েছিল। তারপর কখন যেন একসময় দূরের গাছগাছালির অস্পষ্ট সারিগুলোর মাথায় সন্ধে নেমে এসেছিল ধীরে পায়ে।

মেঘনার আকাশে এক টুকরো মেঘ। দেখতে দেখতে সেই মেঘের টুকরোটা সাপের চোখের মণির মতো হিংস্র ক্রূরতায় ছেয়ে ফেলে চারদিক। উথলপাথল জল হঠাৎ যেন খেপে উঠতে থাকে। যতদূর চোখ যায়, উলটোপালটা ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি। মেঘনার ঢেউ ফুঁড়ে ফুঁড়ে বাতাস উঠে আসছে হু হু করে, উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাবের হিজল আর বউন্যার জঙ্গলে, কৃষাণ গ্রামের একচালা দোচালা ঘরগুলোর ঝুঁটি ধরে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে।

একসময় ঝড়ের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

কালি-ঢালা নিঃসীম অন্ধকাবে একটা দোচালা ঘরের ভেতর বয়রা বাঁশের মাচায় ক্লান্ত শরীর ঢেলে শুয়ে ছিল আকলিমা। রজিবুল ঘরে নেই, সেই দুপুরে উত্তরপাড়ায় গেছে কিতাব্দী শেখের মেয়ের শাদির দেনমোহর পাকা করতে। এ বাবদে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এ অঞ্চলেব মক্তবে কী সব করে সে। তা ছাড়া, শাদি-টাদির ব্যাপারে সব বাড়িতেই তাব ডাক পড়ে। তাকে বাদ দিয়ে এখানে বিয়ে শাদির কথা ভাবা যায় না। সে যা সাব্যস্ত করে দেবে, মেয়ে এবং ছেলে দুই পক্ষই তা মেনে নেয়। এই কারণে সে ভাল রকমের মজুরি নিয়ে থাকে।

মেঘনার বেপরোয়া বাতাসের দাপাদাপি আর প্রচণ্ড বৃষ্টিব তোড়ে ঘরের আড়া মচ মচ করে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল। মেঘের ডাক, আকাশটাকে চিরে আড়াআড়ি বিদ্যুতের ঝলক আর ঘন ঘন বাজের গজরানিতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় আকলিমার। দারুণ ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে সে। বাখারির জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকারে। পৃথিবী এখানে নিরাবরণ, আকাশ সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। কিন্তু এই অনাবৃত আকাশের নিচে এমন বৃষ্টিঝরা রাতগুলো বড়ই দুঃসহ আর ভয়াবহ মনে হয় আকলিমার। সে জানে আজও বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছে রজিবুল। এটা অনিবার্য নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কোথাও বেরুলেই আকলিমাকে ঘরে রেখে তালা লাগিয়ে যায় সে।

আকলিমা জানে, এতদিন ঘর করার পরও তাকে আদৌ বিশ্বাস করে না রজিবুল চৌধুরি।

এক সময় পশ্চিমের আকাশ পুরোপুরি ফেড়ে দিয়ে নতুন করে বিদ্যুৎ চমকায়। ওধারের মাঠে তালগাছের মাথা ঝলসে দিয়ে বাজ পড়ে। অন্ধকারে ঝড়ের ঝাপটায় ডানাভাঙা পাখিদের মরণ-চিৎকার ভেসে আসে।

এমন বৃষ্টি-ঝরা রাতগুলোকে একদিন কী ভাল যে লাগত আকলিমার! নারকেল আর হিজল বনের ফাঁক দিয়ে বয়ে-যাওয়া বাতাসকে গানের সুরের মতো মোহময় মনে হত। এমন সব রাতে একা থাকলে স্মৃতিতে অন্য এক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। মনে হয় সেটা যেন পূর্ব জন্মের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এভাবে এই বন্দি হয়ে থাকা জীবনটাকে অসহ্য লাগে।

আকলিমা জানে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ডাকাত পড়ার মতো আবির্ভাব ঘটবে রজিবুলের। তার শরীর ডালে পিষে ধামসে চুরমার করে দিতে থাকবে লোকটা। রজিবুলের কথা ভাবতেই বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায় আকলিমার। এই কুৎসিত জীবন থেকে কত বার যে সে পালিয়ে যেতে চেয়েছে তাব ঠিক নেই। কিন্তু মুক্তির কোনো সম্ভাবনা তার বহুদূর কল্পনাতেও ফুটে ওঠে না।

বাইরে সীসার লক্ষ কোটি ফলার মতো একটানা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আকলিমা ফিরে যায় তার আঠার বছরের যৌবনে, যখন প্রথম পুরুষের ভালবাসার উষ্ণ স্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু ভাবনাটা বেশি দূর এগোয় না। হঠাৎ জানালার পাশ থেকে একনাগাড়ে অস্বস্তিকর একটা শব্দ হতে থাকে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝমঝমানি ছাপিয়ে মাটির চাঙড় খসার শব্দ। আকলিমা চমকে ওঠে। স্নায়ুগুলো টান টান করে শব্দটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে চেষ্টা করে। প্রথমে মনে হয়, কোনো বুনো খটাশ কিংবা শিয়াল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ঘরের ভেতর নিরাপদ আশ্রয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু খানিক পরেই পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায়। তার কান এই আওয়াজের মধ্যে অনিবার্য একটা আভাস পেয়েছে। আসলে ঘরের ভিতে সিঁধকাঠি চলছে।

ভয়ে অসাড় হয়ে বসে থাকে আকলিমা।

গ্রামের শেষ মাথায় আকলিমাদের এই পলকা দোচালা ঘর, তার পর একটা ভাঙা মসজিদ পেরিয়ে ভাতারমারী খাল। খাল পেরিয়ে বেশ খানিকটা গেলে গ্রামের অন্য সব বাড়িঘর। এখান থেকে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচালেও এই দুর্যোগের রাতে যখন মেঘের ডাকে, বাজের গজরানিতে আর প্রবল বর্ষণে সমস্ত চরাচরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে, তার চিৎকার গ্রামের কেউ শুনতে পাবে না। অপরিসীম আতঙ্কে তার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসতে থাকে।

একসময় ঘরের বাঁশের খুঁটিতে ঠক করে সিঁধকাঠির ঘা শোনা গেল। এবার মনস্থির করে ফেলে আকলিমা। এভাবে সিঁটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ক'দিন আগে রজিবুল তাকে এক ছড়া রুপোর হার, চার গাছা রুপোর চুড়ি আর সোনার কানফুল কিনে এনে দিয়েছিল। সেগুলো গায়েই রয়েছে। তবু একবার অন্ধকারে হাত বুলিয়ে গয়নাগুলো ছুঁয়ে নেয় আকলিমা।

পদ্মা-মেঘনার দেশের মেয়ে সে। শানানো সড়কি হাতে কত বার সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিংস্র ভাম কিংবা লাঠি নিয়ে জাতি সাপের ওপর। একবার ছেন্ দা দিয়ে সন্ধের অন্ধকারে একটা বদ লোকের হাত কাঁধ থেকে এক কোপে নামিয়ে দিয়েছিল। যার এত সাহস, আজ কেন তার এত ভয়, এমন আতঙ্ক?

এই দোচালা ঘরের আড়াতেই রয়েছে একটা মারাত্মক বল্লম, সাপের জিভের মতো লিকলিকে হিংস্র সেটার আধ হাত লম্বা ফলা। বল্লমটা নামিয়ে এনে যে সিঁধ কাটছে সে মাথা তুললেই তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে। কিন্তু কিছুই করে না আকলিমা। কয়েক বছর আগের স্মৃতিই কি তাকে দুর্বল করে ফেলেছে?

গাঢ় অন্ধকারেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাঁশের মাচার পাশ দিয়ে একটা লোক কবর ফুঁড়ে যেন জিনের মতো মাথা তুলল। আর তখনই প্রবল ধাক্কায় তার স্নায়ু থেকে আতঙ্ক ঝরে যায়। লাফিয়ে উঠে আড়া থেকে বল্লমটা টেনে বার করার আগেই সিঁধ-কাটা গর্তের ভেতর থেকে শিকারি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে, মসৃণ পায়ে ঘরের মধ্যে চলে আসে লোকটা।

নিজের মধ্যে আকস্মিকভাবে কী ঘটে যায়, বুঝতে পারে না আকলিমা। এখন আর উঠে দাঁড়িয়ে দূরে চালার বাতা থেকে বল্লমটা পেড়ে আনার সময় নেই। আচমকা লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে আকলিমা, তারপর প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে, 'চোর—চোর—চোর—'

আকলিমার নির্মম জাপটানোর মধ্যে চমকে ওঠে লোকটা। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে সিঁধকাঠি নিয়ে বেরুবার সময় কে ভাবতে পেরেছিল তার জন্য এমন একটা দুর্ঘটনা ওত পেতে রয়েছে! তার ধারণা ছিল, পৃথিবী যখন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তখন এই গ্রহের কেউ আর জেগে নেই, আর সেই সুযোগে সে তার কাজ গুছিয়ে নিশ্চিন্তে সরে পড়তে পারবে, কিন্তু তার সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যায়।

হাতের সিঁধ, কাঠিটা তুলে আকলিমার মাথায় বসিয়ে দিতে পারত লোকটা, কিন্তু তা আর হয়ে

ওঠে না। হঠাৎ তার মনে হয়, যে মেয়েমানুষটা তাকে জড়িয়ে ধরেছে তার স্পর্শ এবং আলিঙ্গন বড়ই চেনা।

এদিকে আকলিমাও একই কথা ভাবছিল। তবু সে টের পায়, লোকটার বৃষ্টিভেজা শরীর থেকে গরম ভাপ উঠে আসছে। তার কঠোর বেষ্টনীর মধ্যে থর থর কাঁপছে লোকটা। নিশ্চয়ই তার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ অন্ধকারে লোকটা তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'বউ, তুই!' তার কণ্ঠস্বরে জগতের সবটুকু বিস্ময় যেন মাখানো।

'কে তুমি!' আকলিমার স্বরও কেঁপে ওঠে। পরক্ষণে তার দুই হাত আলগা হয়ে লোকটার গা থেকে খসে পড়ে।

'আমি খলিল।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে আকলিমা। তারপর বলে, 'তুমি এইখানে!'

গোঙানির মতো আওয়াজ করে খলিল বলতে থাকে, 'কী করুম, তিন দিন প্যাটে ভাত নাই। চুকা (টক) কাউ ফল খাইয়া আছি। আইজ খিদার জ্বালায় ঠিক করলাম চুরি করুম। যেমুন কইরা পারি প্যাট ভইরা খাইতেই হইব। ডাকাইতা পাড়াব রহমতের কাছ থিকা সিদকাঠিখান চাইয়া আইনা ম্যাঘনা পাড়ি দিয়া এই পারে আইলাম। তর (তোর) ঘরেই যে সিদ দিছি, ভাবতেও পারি নাই। তাজ্জবের ব্যাপার।'

'তুমার তো সাই জ্বর হইছে। গাও বেজায় গরম, ধান দিলে অখনই খই ফুটব।'

অন্ধকারে করুণ হাসে খলিল। বলে, 'হ জ্বর হইছে। প্যাটে ভাত পড়লে জ্বব ছুইটা যাইব গিয়া।' তার হাসির শব্দ আর্তনাদের মতো শোনায়।

দোচালা ঘরখানায় বৃষ্টির ঝমঝমানিব মধ্যে বিষাদ ঘন হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একেবারে বেসুরো গলায় আকালিমা বলে, 'অহন চৌকিদার ডাইকা যদিন তুমারে ধরাইয়া দেই?'

খলিল কিন্তু আদৌ ভয় পায় না। আগের মতোই ম্লান হেসে বলতে থাকে, 'ভালই তো, চৌকিদারের কিল আর গুতা পিঠে খাওনের পর প্যাটে তো এক সানকি ভাত পড়ব। কিন্তুক মুশকিল তো অগো লেইগা (জন্য)।'

'কাগো লেইগা?'

খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে খলিল। আকলিমার প্রশ্নটা সে সাবধানে এড়িয়ে যায়, 'না না, ও কিছু না।'

খলিলের কথাগুলো বুঝিবা শুনতে পায় না আকলিমা। বৃষ্টিপাতের একটানা আওয়াজ যেন এই পৃথিবী থেকে একেবারেই মুছে যায়। নিরাকার হয়ে যায় এই দোচালা ঘর, মামুদপুর গাঁ এবং দুর্যোগের এই রাত। কোনো এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তার মন উধাও হয়ে যায় মেঘনার ওপারে, বেশ কয়েক বছর আগে তার আঠার বছরের যৌবনের দিনগুলোতে।

বুকের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা এই মানুষটা অর্থাৎ কিনা খলিল, যে পেটের খিদেয় আজ তার ঘর সিঁধ দিয়েছে, একদিন তাকেই জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বসেছিল আকলিমা। তার যৌবনের সে-ই ছিল বাদশা।

আশ্চর্য সেই সব দিন।

তখন গান-বাজনা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকত খলিল। সেদিন তার হাতে সিঁধকাঠি ছিল না, থাকত একটা পুরনো সারিন্দা। সারিন্দার তারে মিঠে সুর তুলে সে দিনরাত গান গাইত। গানে মাধুর্যের রং ধরেছিল আকলিমার উষ্ণ, ঘন সান্নিধ্য পেয়ে।

মল বাজিয়ে গৃহস্থালির কাজ করত আকলিমা। এই ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখছে, পরক্ষণে চঞ্চল পায়ে পাখির মতো উড়ে এসে উঠোনে ধান মেলে দিচ্ছে, তারপরেই হয়তো ছুটে গিয়ে আখার আগুনে শুকনো কাঠ গুঁজে দিয়ে মাটির হাঁড়িতে ভাত বসাচ্ছে। মেঘনার ঢেউ-এর মতো তার পিঠময় ছড়ানো কালো চুলে আর সিঞ্জিনা লতার মতো শ্যামল, সতেজ দেহটি ঘিরে রাঙা ডুরে শাড়িটায় তাকে কী অপরূপই না দেখাত!

গানবাজনা তো ছিলই, পেটের জন্য পদ্মা-মেঘনা উথলপাথল করে সে-সব দিনে ইলসা ডিঙি বাইত খলিল। নদীর অতল থেকে তুলে আনত রুপোলি ফসল। ইনামগঞ্জের বাজারে মাছ বেচে কিনে আনত চাল ডাল তেল মরিচ আর আকলিমার জন্য সুগন্ধি ফুলেল তেল, চুলের কাঁটা, হাড়ের কাকুই। কোনো কোনো দিন বা তাঁতের রঙচঙে ডুরে শাড়ি।

তবে বেশির ভাগ দিনই বেরুতে ইচ্ছা করত না। আকলিমা কি যেন যাদু করেছিল তাকে। পদ্মা-মেঘনা দাপিয়ে বেড়াত যে, সেই খলিল ছোট্ট দোচালা ঘরটায় যেন আটকা পড়ে গিয়েছিল। আকলিমা ছোটাছুটি করে ঘরের কাজ করত। তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে গেয়ে উঠত ঃ

ময়ূরপাঙ্খি নাও ভিড়াইয়া আইলাম
তোমার খালে,
সোতের কোলে ঢেউয়ের দোলে
পরান কেমুন করে।
মেঘবরণ চুল কইন্যা, তুমার
টানা টানা ভুরু,
রাঙ্গা ডুইরা শাড়ি দিমু
আয়না চুড়ি সরু।
তুমার লেইগা আনুম কইন্যা
আসমানেরই তারা—
পৈছা খাড়ু আনুম কইন্যা
রাঙ্গা চান্দের পারা।
ময়ূরপঙ্খি নাও ভিড়াইয়া-য়া-য়া—

সুরেলা গলার সঙ্গে সারিন্দার সুর একাকার হয়ে স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলত আকলিমার। গাইতে গাইতে আর বাজাতে বাজাতে পলকহীন তাকিয়ে থাকত খলিল আর পাখির মতো ঘাড় বাঁকিয়ে মিষ্টি করে হেসে উঠত আকলিমা। বলত, 'আমুন ড্যাব ড্যাব কইরা আমারে যে গিলতে লাগলা, শ্যাষে ভাতের খিদা থাকব তো?'

ঘোরের ভেতর থেকে খলিল জবাব দিত, 'না থাউক, প্যাট আমার এমনেই ভরা আছে।'

আর কিছু না বলে, স্বামীকে কটাক্ষে বিদ্ধ করে, রুপোর মল ঝমঝমিয়ে এনামেলের ক'টা এঁটো সানকি নিয়ে সামনের আয়নামতীর খালের দিকে দৌড়ে যেত আকলিমা।

'বউ, বউ—আ গো পরানের বিবি—' আকলিমার পেছন পেছন মেঘনার কাইতানের মতো ছুটে আসত খলিল। সেদিন বুকটা ছিল কপাটের শক্ত পাল্লার মতো বিশাল, কবজিতে ছিল বাঘের তাকত। অথৈ নদীতে ইলসা জাল ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ টেনে তুলত সে, পার থেকে মেঘনার বিশ হাত ফারাকে ছুঁড়ে দিত খ্যাপলা জাল। (কিন্তু সেদিনের সেই শক্তিমান তেজী খলিল আর নেই। কিছুক্ষণ আগে আকলিমা যখন তাকে জাপটে ধরে তখনই টের পেয়েছিল, খলিলের শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে সে। হাড়ের কাঠামোর ওপর জেলজেলে ঢিলে চামড়ার খোলস কোনোরকম আটকে আছে।)

আয়নামতীর খালের দিকে যেতে যেতে লাজুক হেসে আকলিমা বলত, 'যাও। কেউ আবার দেইখা ফেলব।' তার হাসিতে লজ্জা মেশানো থাকলেও অনেকটাই ছিল গর্ব—একটি পুরুষকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করার দেমাক।

খলিল বলত, 'দেখুক।'

'তুমি বড় আদেখিলা। আমার গন্ধ পাইলে এক্কেবারে ছোক ছোক কর বিড়ালের লাখান (মতো)।

যাও, নাও আর জাল লইয়া গাঙ্গে (নদীতে) যাও। পুরুষমাইনষে ঘরে বিবির আচলের তলে বইসা থাকলে মাইনষে মোন্দ কয়।'

'কউক। কারোর নিন্দামোন্দরে আমি পারোয়া করি না। আমার বিবির গন্ধ আমি শুকি। কারো জরুরে ধইরা তো টান দেই না।'

ফিক করে একমুখ হাসি নরম আলোর মতো ছড়িয়ে দিত আকলিমা। বলত, 'না গো, না। কেউ কিছু কয়ও না, নিন্দামোন্দও করে না। যা কওনের আমিই কই। তুমি দেখাইলা বটে।' একটু থেমে বলত, 'একখান কথা জিগামু?'

'কী?'

'বউ কি আর কারো হয়না?'

'হইব না ক্যান? তবে আমার লাখান না।'

এমন বাধ্য, মুগ্ধ স্বামী ভাল নসিব ছাড়া মেলে না। নিজের সৌভাগ্যে আপ্লুত হয়ে যেত আকলিমা। মনে মনে বলত, খলিল সারা দিনরাত তার গায়ে জড়িয়ে থাক। মুখে বলত, 'যাও, ঘরে বইসা থাইকো না। গাঙ্গে যাও। ওই দেখ, ইত্তিমালির ছোট বইনটা আমাগো দেখতে আছে।'

চকিত হয়ে চারদিকে তাকাত খলিল, কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। বলত, 'কী ব্যাপার লো বউ?'

ততক্ষণে মেঘনার ঢেউ-এর মতো উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়েছে আকলিমা।

এবার খেলাটা ধরা পড়ে যেত। চোখ কুঁচকে খলিল বলত, 'বুঝছি, তুই আমারে ফাকি দ্যাস।'

তারপরেই দু'জনে একসঙ্গে হাসির তুফান তুলত।

শাদির পর কয়েকটা মাস সারিন্দার মিষ্টি সুরের মতো মসৃণ ছাঁদে কেটে যায়। আজকের মতো এমন বর্ষার রাতগুলোকে নেশার মতো মনে হত সে-সব দিনে। সেই সময় দূরের মেঘনা যখন ফুলে ফুলে গর্জাচ্ছে, বিদ্যুতের আলোয় কাছের আয়নামতীর খালটাকে বাঁকানো খাঁড়ার মতো দেখাচ্ছে, ঢেউটিনের চালে যখন অবিরত বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে তখন খলিলের বুকের ভেতর নিজেকে সঁপে দিয়ে আরামে সুখে তৃপ্তিতে চোখ বুজে থাকত আকলিমা।

ঘোর-লাগা, কাঁপা গলায় খলিল ডাকত, 'বউ—অ বউ—'

আবছা গলায় আচ্ছন্নের মতো সাড়া দিত আকলিমা, 'উঁ—'

'কই তুই?'

'তুমার কাছে।'

'আরো কাছে আয়।'

'তুমার বুকের মইধ্যেই তো রইছি।'

'বুকে না, পরানটার মইধ্যে আয়।'

আকলিমার মুঠো মুঠো নলথুড়ি ফুলের মতো কোমল দেহটাকে বলিষ্ঠ বুকের ভেতর মিশিয়ে দিত খলিল। শরীরের প্রতিটি রক্তকণায় তখন বিদ্যুৎ চমকে চমকে যেত যেন আকলিমার। বাইরে অবিরাম ধারাপতন, ব্যাঙেদের গলা ফুলিয়ে ডাকাডাকি আর কাঞ্চন কি সোনাল ফুলের বুনো গন্ধ—সব মিলিয়ে স্নায়ুর মধ্যে কি এক মাতন তুলে দিয়ে যেত যেন।

এ তো গেল বর্ষার কথা। তারপর একদিন সাদা সাদা ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে মাঠঘাটের জল নেমে যেত মেঘনার দিকে। শরতে সাদা কাশফুলে চারদিক ছেয়ে যেত। এরপর আসত সোনালি ধানের হেমন্ত।

সেবার অঘ্রাণ মাসের উজ্জ্বল সকালে আকাশের কোন প্রান্তে যেন অদৃশ্য মেঘ জমতে শুরু করেছিল। খলিল বা আকলিমা কেউ টের পায় নি, কানা রজিবুল আয়নামতীর খালের ওপার থেকে একটি মাত্র চোখে শকুনের নজর দিয়ে আকলিমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছে। নবীপুরে তখন জমি কেনাবেচার দালালি টালালি কী সব করত সে। তার সারা মুখে ছিল গুটি বসন্তের দাগ। কালো

খসখসে চামড়া, ছুঁচলো থুতনি, গোল চোখ, পুরু ঠোঁট, বেজায় ঢ্যাঙা চেহারা—সব মিলিয়ে একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানের আকৃতি। সে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে ছিল।

একদিন সন্ধেবেলায় জেলে ডিঙি নিয়ে মেঘনায় গিয়েছে খলিল, ফিরতে ফিরতে পরদিন দুপুর হয়ে যাবে। ঘরে একাই থাকবে আকলিমা। সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের দরজায় খিল তুলে যখন খলিলের কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময় ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া কেটে কারা যেন তার বিছানার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভারি ঠুনকো ঘুম আকলিমার। অন্ধকারে ক'টা মূর্তিকে দেখে চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই একটা শক্ত কর্কশ হাত তার মুখে কাপড় ঠেসে দিয়ে বেঁধে ফেলে। অবরুদ্ধ গোঙানির মতো আওয়াজ তার মুখের ভেতর পাক খেতে থাকে, বেরিয়ে আসার পথ পায় না।

শুধু মুখই না, মোটা কাছি দিয়ে হাত-পা বেঁধে খালের ঘাটে বড় ঘাসি নৌকোয লোকগুলো আকলিমাকে এনে তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছিল।

আয়নামতীর খাল সিকি মাইল দূরে মেঘনায় গিয়ে পড়েছে। ঘাসি নৌকোটা নদীতে যেতেই একটা পরিচিত গলা আকলিমার কানে করাত চালিয়ে দিচ্ছিল, 'এট্টু কষ্ট কইরা পইড়া থাকো সোনা। মইধ্য গাঙ্গে গিয়া হাত-পাও আর মুখের বান্ধন খুইলা দিমু। ত্যাখন যত পার চিল্লাইও।' বলে খ্যা খ্যা করে কর্কশ আওয়াজ তুলে যে হেসে উঠেছিল সে রজিবুল।

এদিকে তার পরের দিন দুপুরে গ্রামে ফিরে এসেছিল খলিল। পুরো একটা রাত আকলিমার উষ্ণ, মধুর সান্নিধ্য সে পায় নি।

গোটা রাত মেঘনায় মাছ মেরে সেই মাছ ইনামগঞ্জে বেচে গোটা পাঁচেক কাঁচা টাকা পেয়েছিল খলিল। তার থেকে একটা ভাঙিয়ে সুগন্ধি সাবান আব সস্তা দামের গন্ধতেল কিনে এনেছিল আকলিমার জন্য। বাকি টাকা আর খুচরো কোমরের গেঁজেতে ঝন ঝন করে বাজছিল।

লম্বা লম্বা পায়ে ফসলের জমির আঁকাবাঁকা আলপথগুলোব ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, কতক্ষণে সে আকলিমার কাছে পৌঁছুবে। তার মন বাতাসের আগে আগে পাখির মতো ডানা মেলে যেন উড়ে যাচ্ছিল। নিজের অজান্তেই তার গলায় গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠেছিল।

কালনাগিনী কইন্যা তুমি
আমার বুকের জ্বালা,
তুমার গলায় দিমু কইন্যা
সোনাল ফুলের মালা।
চিকন চুমা আইক্যা (এঁকে) দিমু
তুমার রাঙ্গা মুখে,
আমার মনের মধু দিমু
তুমার গহীন বুকে।
কালনাগিনী কইন্যা তুমি-ই-ই-ই—

ধান-কাটা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে উলটো দিক থেকে আসছিল ফারুক। সে এ অঞ্চলের বড় ভুঁইয়াদের জমিতে পেটভাতায় আর দেড় টাকা রোজে কিষাণী করে।

ফারুক বলেছিল, 'পরানে ফুর্তির বান ডাকাইয়া বড় যে গান গাও। উই দিকে ঘরে কী হইচে, খপর রাখো?'

ফারুকের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে খলিল। প্রবল ধাক্কা খেয়ে তার গলায় সুরটা কেটে যায়। দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠায় তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে। ভয়-পাওয়া গলায় সে বলে, 'কী হইচে ফারুক ভাই?'

'তুমার বিবিরে কাইল রাইতে কারা য্যান জোর কইরা উঠাইয়া লইয়া গেছে।'

খলিলের হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসে। তার চোখের সামনে গোটা পৃথিবী একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। হাতের মুঠি থেকে গন্ধতেলেব শিশি আর সাবান কখন যে জমিতে পড়ে যায়, সে টেরই পায় না।

দু' একদিনের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা তাব কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল। আকলিমার সঙ্গে সঙ্গে রজিবুল চৌধুরিও গ্রাম থেকে উধাও হয়েছে।

আকলিমাকে সারা দুনিয়া তোলপাড করে অনেক খুঁজেছে খলিল কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তারপর একে একে কত বিনিদ্র রাত কেটেছে খলিলেব। পুবের আকাশে কত বার সূর্যোদয় ঘটেছে, পশ্চিম দিগন্তে কত বার যে সূর্য ডুবে গিয়েছে তার হিসেব নেই। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর পেরিয়ে গিয়েছে।

ওদিকে রজিবুল চৌধুরি আকলিমাকে মেঘনার এপারে এই মামুদপুরে এনে তুলেছে। গ্রামের মাঝখানে তারা থাকে না। মামুদপুরের শেষ মাথায় গাছপালায় ঢাকা নির্জন জঙ্গলের ভেতর একটা দোচালা ঘর তুলে নিয়েছে। রজিবুলের মনে সারাক্ষণ সন্দেহ, এই বুঝি আকলিমা পালায। কাজেকর্মে কোথাও বেরুতে হলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভয়ঙ্কর গলায় শাসিয়ে যায, 'পলানের মতলব করবি না। যেইখানেই যাস আমারে ফাকি দিতে পারবি না। ধরতে পারলে এক্কেবারে শ্যাষ কইরা ফেলুম।'

ক'বছর আগের সেই অভিশপ্ত রাতটা থেকে অসহ্য বন্দি জীবন মেনে নিতে হয়েছে আকলিমাকে। অভ্যস্ত হতে হয়েছে এই ভয়াবহ পরিবেশেব সঙ্গে। কিন্তু এমনি বৃষ্টিঝরা উদ্দাম সব রাতে বয়রা বাঁশের মাচার ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে স্মৃতিব ভেতর কয়েক বছর আগের জীবনটা প্রবল নাড়া দিয়ে যায়। বড সবল, বড়ই মুগ্ধ একটি মানুষের স্মৃতি তাকে অস্থিব করে তোলে। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে নিজেকে পুবোপুরি সঁপে দিতে ইচ্ছা করে।

সেই মানুষটা এখন দাঁড়িয়ে আছে আকলিমার মুখোমুখি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। বাতটা পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের দিনে ফিরে গিয়েছে যেন।

কতক্ষণ তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। একসময় সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙেচুরে দিয়ে আকুল স্বরে আকলিমা বলে, 'আমি আব পারি না। শয়তানটা আমারে শ্যাষ কইরা দিছে। আমারে তুমার লগে লইয়া যাইবা?'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড আচমকা লাফিযে উঠেই থেমে যায যেন খলিলের। কাঁপা গলায় সে বলে, 'কিন্তুক—'

'না না, কুনো কিন্তুক না। আমারে নিতেই হইব তুমার লগে। অহনই পলাইয়া যাওনেব সুবিধা। খাটাশটা আইসা পড়লে উপায় থাকব না। চল যাই—' খলিলের একটা হাত আঁকড়ে ধরে আকলিমা।

তার ব্যাকুলতা প্রথমটা ভয়ানক বিচলিত করে তোলে খলিলকে। বুকের ভেতর অশান্ত ঝড় বয়ে যেতে থাকে যেন। খানিক পর নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়ে সে বলে, 'কিন্তুক তোরে নিয়া রাখুম কই? খাওয়ামু কী? তিনদিন না খাইয়া আছি। না না, তুই এইখানেই থাক। আর যাই হউক, প্যাটে খাইয়া তো বাচবি।'

আস্তে আস্তে হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায় আকলিমার। সে যেন বুঝতে পারে, যেখানে আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে তার আর খলিলের কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে আকলিমা। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়তে বলে, 'আইচ্ছা, তুমার সেই সারিন্দাখান অহনও আছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে খলিল। করুণ গলায় বলে, 'না। তুই যেই দিন নিখোজ হলি হেইদিনই ম্যাঘনার পানিতে ফালাইয়া দিছি।'

আবার অস্থির হয়ে ওঠে আকলিমা। ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাকুম না এইহানে। আমারে এই জঙ্গলের মইধ্যে তালা দিয়ে রাখে বখিলটায়। না খাইয়া মরি, তবু তুমার কাছে থাকুম। তুমি আমার সোয়ামী।'

খলিল টের পায় জ্বরটা আচমকা আরো চড়তে শুরু করেছে। ঝাপসা গলায় বলে, 'কিন্তুক অরা যে আছে—' কথাটা আর শেষ করতে পারে না। ঘাড় ভেঙে তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে যেন।

'অরা কারা?' ভয়ে ভয়ে, বুকের ভেতর গভীর আশঙ্কা নিয়ে জিজ্ঞেস করে আকলিমা।

বাইরে প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ে নারকেল আর বউন্যা গাছগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে থাকে। আকাশটাকে চৌচির করে কোথায় যেন বাজ পড়ে।

খলিল উত্তর দেয় না।

আকলিমা এবার চিৎকার করে ওঠে, 'অরা কারা?'

খলিল ঘাড় নুইয়ে শিথিল গলায় বলে, 'অনেক দিন তোরে তালাশ করছি। ম্যাঘনার দুই পারে গেরামে গেরামে ঘুরছি তোর লেইগা। সগলে কইতে লাগল তুই আর এই দ্যাশে নাই। কিন্তুক হাত পুড়াইয়া কয়দিন আর খাইতে পারে পুরুষমাইনষে! আমারে তো পয়সার লেইগা ম্যাঘনায় যাইতে হয় রোজ রাইতে। দুফারে যহন ঘরে ফিরি শরীলে আর কিছু থাকে না। কত দিন যে আলস্যিতে রান্ধি নাই! শ্যাষে উপায় না দেইখা নিকাহ্ করতে হইল। পোলপানও হইছে।' বলতে বলতে তীব্র অপরাধবোধে যেন গলা বুজে আসে তার।

ঘরের ভেতর এবার অদৃশ্য একটা বাজ পড়ে যেন।

আকলিমা চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি নিকাহ্ করছ!'

ঝাপসা গলায় খলিল উত্তর দেয়, 'হ।'

বাইরের অশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ছাড়া অনেকক্ষণ ঘবের ভেতর আর কোনো শব্দ নেই। দু'টি নরনারীর হৃৎপিণ্ডও বুঝি থমকে গেছে।

একসময় ভাঙা ভাঙা, অস্পষ্ট গলায় খলিল বলে, 'আর খাড়ইতে পারি না। জ্বরে শরীল ভাইঙ্গা আইতে আছে। যাই গা। কিছু না লইয়া গেলে ওই গুষ্টি শুটকি দিব। দেখি অন্য কুনোখানে যদি কিছু পাই।' একটু থেমে ফের বলে, 'তুই ভাইবা দ্যাখ, ওই দোজখে গিয়া থাকনের থেইকা তোর এহানে থাকনই ভাল।'

গভীর বিষাদে মন ভরে যায় আকলিমার। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। তারপর অন্ধকারে গা থেকে রুপোর গোট, বেসর, নাকফুল—সব খুলে ফেলে জড়ানো গলায় বলে, 'এই গয়নাগুলান ধর। আমি তুমার লগে যামু না। রজিবুল ইবলিশটায় তুমার ঘর এক ফির ভাইঙ্গা দিছে। আমি গিয়া তুমার নয়া ঘর ভাঙ্গুম না। ঘর যেমুন ভাঙছে তার দাম আমি দিয়া দিমু। তুমার নয়া ঘর আর য্যান না ভাঙ্গে। আবার আইসো, আবার দাম লইয়া যাইও।'

হাতের মুঠোয় গয়নাগুলো চেপে ধরে ঘোরেব ভেতর থেকে খলিল বলে ওঠে, 'আবার আসুম?'

'হ, আসবা। একবার না, দুই বার না, অনেক বার। রজিবুলরে আমি শ্যাষ কইরা দিমু।' বলে একটু থামে আকলিমা, তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'আর পারলে একখান নয়া সারিন্দা কিন্যা লইও।' নতুন করে বুকের ভেতর থেকে কান্নার বেগ উথলে বেরিয়ে আসতে থাকে তার।

হঠাৎ বাইরে তালা খোলার আওয়াজ শোনা যায়। সেই সঙ্গে রজিবুলের কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'কি লো হুমুন্দির ঝি, বাদশাজাদীর লাখান পইড়া পইড়া ঘুমাও! শরীলে জব্বর ত্যাল হইছে তুমার। ঘরে একখান বাত্তি জ্বালাইয়া রাখতে পার নাই? ওঠ, উইঠা বাত্তি জ্বাল—'

এদিকে ব্যগ্র হাতে ঠেলতে ঠেলতে খলিলকে সিঁধ-কাটা গর্তের দিকে নিয়ে যায় আকলিমা, 'তরাতরি যাও গা। রজিবুলটা কিন্তুক ডাকু, মানুষ খুন করতে পারে।'

শরীরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে দ্রুত সিঁধের গর্তে ঢুকে যায় খলিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে রজিবুল ঘরে ঢোকে। খোলা দরজা দিয়ে তীরের মতো বৃষ্টির ফলাগুলো ঘরের ভেতর ঢুকতে থাকে।

রজিবুল আর কিছু বলার আগেই তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আকলিমা, 'তুমি আমারে একা ফেলাইয়া যাও এই জঙ্গলে। এই দ্যাখো সিদ কাইটা চোরে আমার গয়নাগাটি কাইড়া লইয়া গেছে। একা আছি, ডরে চিল্লাইতে পারি নাই।'

বাইরের আকাশ থেকে মেঘনায় আরেক বার বাজ পড়ে।

চর

আধডুবন্ত জলঘাসগুলোর ওপর দিয়ে সর সর করে চারমাল্লাই নৌকোটা এসে চরের মাটিতে আটকে গেল।

কালো, কুটিল শেষ রাত্তির। আকাশের গায়ে বিবর্ণ তারাগুলো এতক্ষণে জমাট মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছে। মেঘনার প্রমত্ত ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে একটা মাতাল গোঙানি গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চিহ্নহীন দিগন্তের দিকে।

একজন মাঝি বলল, 'কামটা ভাল অইল না তমিজ। ধলা মিয়া জানতে পারলে ঘরের টুয়ায় আগুন লাগব। আমার ডর লাগতে আছে, এই খবর কানে গেলে বীজধান বন্ধ কইর‍্যা দিব নিঘ্‌ঘাৎ। তহন ফসল ফলামু কী দিয়া?'

হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে তারাহীন কালো আকাশটার দিকে অর্থহীন নজর ছড়িয়ে এতক্ষণ বসে ছিল তমিজ। কথাগুলো শুনবার সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় তীক্ষ্ণ বিরক্তি ফুটে বেরুল, 'তুই মানুষ না! ধলা মিয়া জানব ক্যামনে? তারে না কইলেই অইল। না না, নিজের হাতে আমি মাইয়ামানুষ খুন করতে পারুম না। হেয়া ছাড়া ও পোয়াতি। তার থিকা এই চরে নামাইয়া দিয়া যাই। অর বরাতে যা আছে তাই অইব।'

'কি জানি, আমার জবর ডর করে।' আবছা গলায় কথাগুলো বলল সেই মাঝিটা।

'হ—হ, তর যে অমুন আলগা ডর আছে, হে আমি জানি। তুই মাইয়ামাইনষেরও বেহদ্দ হালিম। খুন করতে ডরাস না, কিন্তুক মাইয়াটা বাইচা থাকলে তর ডর!' তমিজের গলাটা অসন্তোষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর একটু থেমে বলে, 'নে, তরাতরি কর, রাইত পোয়াইয়া আইল। মাইয়াটারে নামাইয়া দে ছইয়ের তল থিকা।'

আধডুবন্ত সেই ঘাসবনের পাশে বর্ষাস্নিগ্ধ নরম চরের ওপর একটি গর্ভিণী যুবতীকে নামিয়ে দিয়ে নৌকোটা তর তর করে অনেক দূরের ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মেয়েটার নাম সুখী। তার চেতনা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক খেতে খেতে, পেটের নরম মাংস কখনো মুচড়ে, কখনো দুমড়ে, ভেতরের নাড়িগুলো মুঠো পাকিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। একটু একটু করে যন্ত্রণাটা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ; ঢেউয়ের মতো হাড়-মাংস-চামড়ার মধ্য দিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল।

এদিকে পুবের আকাশে জলো আলতার মতো আবছা ছোপ ধরেছে একসময়। সকালের মৃদু আভাস মেঘনার জলে দোল খাচ্ছে। দূরের কোনো মুসলমান বাড়ি থেকে এক ঝাঁক মোরগ ডেকে উঠল।

এতক্ষণ চেতনার ওপর বাদুড়ের কালো ডানার মতো পর্দা নেমে এসেছিল। সমস্ত কিছু অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে থেকে।

কষ্টটা খানিক সামলে নিয়ে চোখ মেলবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে চমকে উঠল সুখী। এখন আর সে একলা নয়, তার পাশে রক্তমাখা এক নবজাতক। বাচ্চাটার নির্জীব দু'টো ছোট ছোট চোখের পাতায় সকালের আলো এসে পড়েছে। আর কী আশ্চর্য, একটুও কাঁদছে না শিশুটা। নরম মুঠো দু'টো পাকিয়ে চুপচাপ পড়ে রয়েছে তারই পাশে।

সুখীর দুর্বল ক্ষীণ স্মৃতির মধ্যে একটা রাত্রি কেঁপে উঠল। সে রাত কতদিন আগের? ঠিক ঠাহরে আসছে না। তবু ছেঁড়া ছেঁড়া একটা ছবি এখনো দেখতে পায় বৈকি সুখী। সেই রাত্রিটা—

তাঁতি পাড়ায় সব ঘরবাড়ি তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকে নারীকণ্ঠের প্রাণফাটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সব ছাপিয়ে শিশুর গলায় মৃত্যুহিম কান্না কী একটা ভয়ানক অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঘরে খিল দিয়ে ভয়ে আতঙ্কে শরীরটা কুঁকড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল সুখী। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা উন্মত্তের মতো লাফাচ্ছিল। একটা প্রবল কাঁপুনির বেগ শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। সেটা কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। সারাদিন তাঁতের মাকু চালিয়ে সমস্ত শরীরটা বেদনায় টন টন করে উঠছিল, কিন্তু ওই চিৎকার, ওই আগুন, ওই হিংস্র শোরগোল, সব মিলিয়ে তার ভাবাভাবির শক্তিটাকে অসাড় করে দিয়েছিল যেন।

সেই রাত্রিটা! কতদিন আগের? এখনকার দুর্বল স্মৃতিতে ঠিক ধরতে পারছে না সুখী।

কিন্তু, একসময় ওই আগুন, ওই শোরগোল একেবারে তারই ঘরের সামনে এসে গেল।

কদর্য অট্টহাসি শুনতে শুনতে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে ফেলতে একটা চেনা গলা কানে এসেছিল সুখীর, 'ভারি খুবসুরৎ দেখতে সুখীরে, জব্বর খুবসুরৎ, দরজাটা ভাইঙ্গা ঘরে ঢোক—' তারপরের ছবিগুলো ধারাবাহিকভাবে এখনকার এই দুর্বল স্মৃতিতে ঠিক ধরতে পারছে না সুখী।

এক বছর আগে সুখীর জীবনের পরিচয় ছিল আলাদা। সে তাঁতির ঘরের সন্তানহীনা বিধবা। সারাদিন মাকু চালিয়ে গামছা বুনত, মোটা বনাতের কাপড় বুনত। হাটেবাজারে পাইকারের কাছে বিক্রি করে আসত। স্বাবলম্বী জীবন। কারো তোয়াক্কা করত না সুখী।

কিন্তু এখন? সকালের এই মৃদু আলোতে চরের বালুকণাগুলো যখন ঝিকমিক করছে, কিংবা আধডুবন্ত জলঘাসগুলোর মধ্য দিয়ে হু হু করে বয়ে আসছে মেঘনার উজানী হাওয়া, অথবা দূরের হেউলি ঝোপটা যখন উথালপাথল হয়ে উঠেছে, তখন আলো আর বাতাসের মতো একটা সত্য, ভয়ানক সত্য সুখীকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল—সে মা।

অদ্ভুতভাবে বুকের ভেতরকার হৃৎপিণ্ডটা নাড়া খেয়ে উঠল সুখীর। সে মা! আর তারই পাশে সেই রক্তমাংসের ডেলার মতো শিশুটা বর্ষার ঠাণ্ডা বাতাসে কুঁকড়ে রয়েছে।

মুখের বিচিত্র এবং কঠিন রেখাগুলোর ওপর একটা নিষ্ঠুর হিংস্রতা নেমে এল সুখীর। হাত বাড়িয়ে শিশুটার গলার ওপর নিয়ে এল সে। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। একটু দ্বিধা করল সুখী, তারপর ভাবল, না—না—নিজের এই কলঙ্ক বাঁচিয়ে রাখবে না।

আর সেই মুহূর্তেই চরের আধডোবা খেতটা, যেখানে জলের ওপর মাথা তুলে ধানচারাগুলো একটু একটু দোল খাচ্ছে, তারই পাশ থেকে একটা মিষ্টি ও স্বপ্নাচ্ছন্ন গানের গলা এগিয়ে আসতে লাগল :

বাজার হুদ্দা কিনা আইন্যা ঢাইলা দিমু পায়,
এট্টুখানি হাসো কইন্যা পরান জুইল্যা যায়।
আতর গুলাপ ইসেন (এসন্স) দিমু...

এ চর তবে নির্জন নয়! গানটা নির্ভুলভাবে শুনতে শুনতে সুখীর হাত শিশুটির গলার কাছে থমকে গেল। সকালের এই স্নিগ্ধ আলোতে পৃথিবীর নতুন আগন্তুকটার দিকে আর একবার তাকিয়ে চমকে উঠল সুখী। কই, ওর মুখে ছদন শিকদারের অপরাধ তো লেগে নেই। বরং তার নিজের মুখের আদলটা যেন পরিষ্কার ফুটে রয়েছে।

হাতটা গুটিয়ে নিল সুখী। আগের সঙ্কল্পটা মন থেকে ছেঁটে বাতিল করে দিল। না না, ওকে খুন করে আত্মহত্যা সে করতে পারবে না; গত একটা বছর পারেওনি। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটার পর অনেকগুলো নারকীয় দিন তার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও পারেনি। শিশুটাকে এবার বুকের কাছে টেনে আনল সুখী।

এতক্ষণ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে গানটা ভেসে আসছিল। এবার গানের মানুষটা একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে। বছর পনের বয়স ছেলেটার, একটা রাঙা ডোরাকাটা লুঙ্গি পরনে। কয়েকটা টোন সুতোর বঁড়শি নিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে এই সকালেই বেরিয়ে পড়েছে মাছের খোঁজে। সুখীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। চারদিকে রক্তের ছোপ এবং রক্তমাখা নবজাত শিশুটির দিকে তাকাতে তাকাতে অবাক হয়ে গেল ছেলেটা। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বলল, 'আপনে কে? এই চরে আইলেন ক্যামনে?'

'আমি তুমার বুইন। কী নাম তুমার?' সেই আদিম ভয়ঙ্কর রাত্রিটার পর এই প্রথম মিষ্টি করে হাসল সুখী।

ড্যাবড্যাবে দু'টো চোখে পলক পড়ছে না ছেলেটার। কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'আমার নাম রমজান।'

পেটের মধ্যে যন্ত্রণাটা হঠাৎ আবার তীক্ষ্ণভাবে আঁচড় কাটতে শুরু করেছে। বিকৃত গলায় সুখী বলে উঠল, 'আমার বড় কষ্ট অইতে আছে ভাই, বড় কষ্ট—'

'আপনে এট্টু একা থাকেন, আমি আইতে আছি।' বলতে বলতেই দৌড়ুতে শুরু করল রমজান। বঁড়শিগুলো একপাশে ফেলে দূরের হেউলি ঝোপের কিনার দিয়ে একসময় আধডুবন্ত ধানখেতটার আড়ালে মিলিয়ে গেল তার ডোরাকাটা রাঙা লুঙ্গিটা।

নির্জীব চোখের মণির ওপর পাতাদু'টো কখন যেন নেমে এসেছিল সুখীর, সে জানে না। অনেকগুলো পায়ের আওয়াজে চেতনাটা নাড়া খেতে খেতে আবার সজাগ হয়ে গেল।

রমজান কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন বুড়িও রয়েছে। চুলগুলো পাটের ফেঁসোর মতো রুক্ষ, চোখের ওপর এক আস্তর ছানি পড়েছে। সমস্ত দেহের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে।

রমজান বলল, 'দাদী, এই যে, যার কথা কইতে আছিলাম। দেখছ তো—'

ঘোলাটে চোখে সুখীকে দেখতে দেখতে বুড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'দ্যাখস কী তরা! যত বেকুব নিয়া আমার সোংসার। যা, সইরা যা। মাইয়ামাইনষের এই সময়ে পুরুষের থাকতে নাই কাছে। এলেম যা তো ভাই, একখান ডিঙ্গি নিয়া আয় গাঙ দিয়া। মাইয়াটারে ঘরে নিয়া যাইতে অইব।'

ইজেম, ওসমান এবং রুস্তম হেউলি ঝোপটার আড়ালে সরে গেল। রমজান আর এলেম ডিঙির তল্লাশে বালুচরের ওপর দিয়ে হন হন করে পা চালিয়ে ধানবনের ওধারে মিলিয়ে গেল।

বুড়ি দাদী রক্তমাখা শিশুটির নাড়ি ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে দিল। সুখীর চোখদু'টো ক্লান্তিতে যন্ত্রণায় আপনা থেকেই বুজে আসতে লাগল।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিতে নিতে বুড়ি দাদী বলল, 'গাঙের উজানী বাতাসে ছাওটার শরীল একেবারে টালকি (ঠাণ্ডা) মাইরা গেছে। ইস, কী কষ্টটাই না অইতে আছে পোয়াতির। হগলই বরাত।'

একটা জীর্ণ শীর্ণ হাড়সার হাত সুখীর পিঠে রেখে আস্তে আস্তে বুলোতে থাকে বুড়ি দাদী। নবজাতক এসেছে পৃথিবীর মাটিতে। এ উৎসব তো মানুষের আদিম। এই পবিত্র মুহূর্তে সব মানুষের সমান অধিকার।

একটু পরে নদী ঘুরে নৌকো নিয়ে এল রমাজনেরা। এলেম আর বুড়ি দাদীর কাঁধে ভর দিয়ে নৌকোর পাটাতনে এসে উঠল সুখী। রমজান শিশুটাকে কোলে তুলে নিয়ে পাশে বসল।

বর্ষার নীলাভ সকাল মৃদু কৌতুকে মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে তখন।

হেউলি ঝোপ, হিজল বন, শর জঙ্গল সাফ করে অতি নগণ্য একটা জনপদের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকখানা মাত্র হোগলার ছাউনি দেওয়া দোচালা। হোগলা বনের ফাঁকে ফাঁকে ঘরগুলো সর্বহারা মানুষের ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমের হরফ হয়ে ফুটে রয়েছে। একটা দোচালা ঘরে নৌকো থেকে সুখীকে নামিয়ে আনা হল।

বুড়ি দাদী পুরনো ছেঁড়া বেতের ঝাঁপি থেকে একটা সিকি বার করে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তরাতরি যা ভাই, গাঙ্গের ওই পার থিকা এট্টু দুধ নিয়া আয়।'

রমজান বলল, 'এই পয়সা দিয়া তুমি না ইমান ফকিরের দরগায় সিন্নি দিবা কইছিলা।'

'যা যা ভাই, অহন আর দেরি করিস না। দ্যাখস না মা'টা কেমুন মড়ার লাখান (মতো) পইড়া আছে। অগো যদি বাচাইতে পারি, তা অইলেই আমার সিন্নি দেওয়ার থিকা বড়ো কাম অইব। আমার বেহেস্ত যাওয়ার পুণ্যি অইব।' বুড়ি দাদীর গলাটা ধরে এল। একটু হেসে বলল, 'আর খাড়ইয়া থাকিস না ভাই, তরে আইজ এক দব্য খাইতে দিমু।'

রমজানের লোভাতুর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'কী খাইতে দিবা?'

'তুই আগে দুধ নিয়া আয়। হের (তার) পরে কমু।'

রমজান ছোট ডিঙিটা নিয়ে মেঘনার মাতলা ঢেউগুলোর মাথায় দোল খেতে খেতে ধু ধু পারের দিকে মিলিয়ে গেল।

ঘরের ভেতর ঢুকে বুড়ি দাদী বলে, 'তুমার নাম কী বুইন?'

'আমার নাম! আমার নাম!' আচমকা চিৎকার করে উঠল সুখী।

'থাউক থাউক বুইন। পরে অইব উই হগল। কাচা পোয়াতি অমন চিল্লায় নিকি? নাড়িতে বেদনা অইব। সারা রাইত ঘুমাইতে পারবা না।'

পৃথিবী এখানে নিরাবরণ, আকাশ চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। বাতাস অবাধে বয়ে আসে হু হু করে। প্রতি মুহূর্তে এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম। মানুষের জৈবিক দাবি পূরণের জন্য অবিরাম লড়াই।

আজ একেবারে উলটোপালটা বাতাস।

সন্ধ্যার সময় সুখীর ঘরের মাথায় এক আঁটি হোগলা বিছিয়ে দিতে দিতে রুস্তম বলে, 'দাদী, মহাজন সওয়ারি বাওয়ার নাও দিতে চায় না। তিরিশ ট্যাকা জমা চায়, তবে নাও দিব। সোংসার যে ক্যামনে চলব, বুঝতে আছি না। গত বচ্ছর যে বীজধান কর্জ দিচ্ছিল, দুই হপ্তার ভিতরে হেয়া ফিরত চাইছে।'

'না দেউক নাও, আমি একখান ধম্মজাল বুইন্যা দিমু পরশুর মইধ্যে। তুই খালে খালে মাছ ধইরা বেচতে যাবি। আর বীজধান দিমু কইথন (কোত্থেকে)? হগলই আউশ আর আমন বুনতে গেছে। বাকিগুলা তো খাইতেই লাগছে। আউশ ধান উঠলে কিছু শোধ করুম।' ধীর শান্ত গলায় বুড়ি দাদী বলল।

রুস্তমের মুখখানা কেমন যেন দেখায়। ভীরু গলায় সে বলে, 'গরু আর লাঙ্গল কিননের লেইগা যে ট্যাকাটা ধার আনছিলাম মহাজনের কাছ থিকা, হেরপর সিরাজদীঘার হাটে যে হারাইয়া গেছিল, হেই ট্যাকাটাও দিতে অইব। তা না অইলে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রুস্তম।

'ডরাস ক্যান ক' দেখি রুস্তম! মনে নাই হেই দিনগুলার কথা? ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া

মারছিল ভুঁইয়া। তবু আমরা মরছি নিকি? আমরা হেই সময় যহন বাইচা গেছি, তহন আর মরুম না, কিছুতেই না। সুখের দিন আমাগোও আইব।'

এই সব-হারানো মানুষগুলির অভাব, হতাশা, দারিদ্র্য এবং বিপদ ভরা জীবনে বুড়ি দাদীই একমাত্র ভরসা, সব মুশকিলের একমাত্র আসান, একমাত্র আশ্বাস। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সকলে নতুন করে বাঁচার দাবিগুলোর কথা ভাবে। সব সমস্যার সুরাহা খুঁজে পায়।

কয়েক বছর আগেও তারা অন্য মানুষ ছিল। তাদের জীবনের পরিচয় ছিল আলাদা। ধু ধু ওই দিগন্তে, যেখানে বনভূমির একটা ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ে, সেখানেই ছিল তাদের গ্রাম। হিজল আর মাদার বনের ছায়ায় একটি টিনের চালা এবং কয়েক কানি ধানের খেত, এ ছাড়া তাদের প্রত্যাশা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু সেই প্রত্যাশাটা একদিন মাটির বাসনের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এল আকাল, এল যুদ্ধ, এল দাঙ্গা। আর একসময় খাজনা দিতে না পারার অজুহাতে ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিল ভুঁইয়ার লোকেরা। ঘরের ভেতর পুড়ে মরল রহিমুদ্দির অন্তঃসত্ত্বা বউ আর কাসেমের তিনমাসের বাচ্চাটা।

তারপর এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ডিঙি নৌকোয় করে মেঘনা পাড়ি দিয়ে এই চরে চলে এল রমজান, বুড়ি দাদী, রুস্তম, ওসমান, এমন অনেকে। ওই ধু ধু গ্রামের আধপোড়া ঘা-খাওয়া জীবনকে এই নির্জন ভূখণ্ডে নতুন করে, সতেজ সবল করে তুলবার একাগ্র সাধনায়, পরিশ্রমে এবং ঘামঝরানো আনন্দে মানুষগুলো বুঁদ হয়ে রয়েছে।

আর তাদের মধ্যে, মেঘনার এই দ্বৈপায়ন জীবনে হঠাৎ ছিটকে এসে পড়েছে সুখী।

একদিন বুড়ি দাদী সেই শিশুটাকে পায়ের ওপর রেখে মৃদু মৃদু দোল দিচ্ছিল। দূরে বসে নতুন ধান সেদ্ধ করতে করতে সুখী ভাবে, কী অসাধারণ প্রাণশক্তি শিশুটার! জল-বাতাস-ঠাণ্ডার ঘা খেয়ে খেয়ে, সেই ঘা সামলে এখনো বেঁচে রয়েছে। তাজ্জব হয়ে ভাবে সুখী, কেন বাঁচবে না? আস্ত শয়তানের বাচ্চা যে।

বুড়ি দাদী বলে, 'তর ছাওটা বড় দুষ্টু অইচে লো বুইন। কেমুন সোহাগখান বোঝে এতটুক মানুষটা। এক্কেবারে তাজ্জব কইরা দিল আমারে। অর বাপও বুঝিন দুষ্টু, তা না হইলে বউ-ছাওয়ের এট্টা খপর লয় না! বড় দেখতে ইচ্ছা করে অর বাপটারে।'

ভয়ানক চমকে ওঠে সুখী। বুকের মধ্যে ধড়াস করে রক্ত আছাড় খায়। চোয়াল এবং চোখমুখের ভঙ্গি কঠিন হয়। স্মৃতির আরশিতে অনেকগুলো সাংঘাতিক দিনরাতের ছায়া পড়ে। মনে পড়ে সেই রাত্রিটা। একটা লোভী, কামার্ত গলা শুনতে শুনতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তারপরের দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলেই বুকের মধ্যে বাতাস আটকে আসে। হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে চায়। শিরায় শিরায় রক্ত আছাড়ি পিছাড়ি খেতে থাকে। ভয়ে আতঙ্কে চামড়া মাংস কুঁকড়ে যায়।

একটা ভাঙা বাড়ির মধ্যে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাতের পর রাত, আবার কখনো কখনো দিনের বেলাতেও আসত সেই লগ্নি লহনার কারবারী মহাজনটা।

বুড়ি দাদীকে প্রায় সব কথাই বলেছে সুখী। এমনকি তমিজ এবং হালিমকে যে হুকুম দিয়েছিল মহাজন, তা-ও বাদ যায়নি। মহাজন বলেছিল, 'এই পাপ আর রাখনের কাম নাই। পরশু আমাবইস্যার আন্ধারে ম্যাঘনার জলে কাইটা লাশটা ভাসাইয়া দিবি। কেউ ট্যার পাইব না।'

সবই বলেছে সুখী, কিন্তু শিশুটির কলঙ্কিত জন্মের কথা বলেনি। সে কথা কিছুতেই বলতে পারবে না সে।

সুখীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ি দাদী খনখনে গলায় বলে, 'বুঝচি, অভিমান তো হওনের কথাই। অর বাপ আইলে আমি কি ছাইড়া কথা কমু নিকি? নাতিন জামাই অইলে অইব কি, কিছুতেই ছাড়ুম না। বউ না হয় চুরি হইছিলই, কিন্তুক খোঁজ তল্লাশ করে না, এ কেমুন হোয়ামী!'

হোয়ামী অর্থাৎ স্বামী। সুখী ভাবে, মনগড়া একটা কাল্পনিক ধারণা নিয়ে বুড়ি দাদী যখন খুশি হয়েছে, নিঃসন্দেহ হয়েছে, তখন হোক। মনে মনে সে নিজেই জ্বলুক। পুড়ে পুড়ে খাক হোক। চুপচাপ ধানের ভাটির পাশে বসে রইল সুখী।

মাসখানেক পর চরের আউশ পেকে এসেছে। সোনার মতো ঝিকমিক করছে শ্রাবণের সকাল। চাষী কৃষাণের পরিশ্রমের পরশপাথর লেগে আষাঢ়ের সবুজ প্রান্তর মধুগন্ধী লাবণ্যে ভরে গিয়েছে এই শ্রাবণের শেষ দিনগুলোতে।

একদিন বুড়ি দাদী বলে, 'এইবার হগলে খ্যাতে নামবি তো? ধান তুলবি কবে?'

'আর একখান হপ্তা যাউক। হের (তার) পরে দেখা যাইব। উত্তরের চকটা তো অহনও কাচাই রইছে।' ওসমান জমির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে।

সন্ধ্যার সময় ওপারের হাট থেকে রুস্তম ফিরে এল। বুড়ি দাদী একখানা ধর্মজাল বুনে দিয়েছে তাকে। সারাদিন চরের খালে খালে বর্ষার মাছ ধরেছে। বিকেলে নৌকো নিয়ে ওপারের কমলাঘাটের হাটে পাইকারের কাছে বিক্রি করে এসেছে। গোটা তিনেক কাঁচা টাকা কোমরের গেঁজে থেকে বার করে বুড়ি দাদীর হাতে তুলে দিতে দিতে বলে, 'দাদী, আইজ একখান নয়া খবর হোনলাম।'

'কী খবর?'

'মহাজনের মাইনষেরা আমাগো আউশ ধান জোর কইরা কাইটা নিয়া যাইব। হেই বীজধান আর নাও লাঙ্গলের ট্যাকার লেইগা একেবারে খেইপা উঠছে।' ফিসফিস করে বলতে বলতে ভীরু নজরে তাকায় রুস্তম।

ইতিমধ্যে ওসমান রমজান ইত্তিমালি, সবাই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সুখীও এসেছে শিশুটাকে নিয়ে। সকলের চোখমুখে শঙ্কা এবং উত্তেজনা।

কে যেন বলল, 'কী উপায় অইব দাদী?'

আর একজন বলে, 'আউশ ধান নিলে সারা ভন্নার (বর্ষার) দিনগুলা না খাইয়া মরতে অইব যে।'

বুড়ি দাদী আশ্বাস দিল, 'তরা এট্টুতেই বড় ভাইঙ্গা পড়স। মনে নাই ঘরে আগুন দিছিল ভুইয়া। তবু আমরা মরছি নিকি? তরা মরদ না? কইলজায় লউ (রক্ত) নাই? নদীর ওই পার থিকা আইসা ধান নিয়া যাইব, আর তরা চাইয়া চাইয়া দেখবি?'

ভয়ার্ত গলায় একজন বলে, 'তুমি কি কাজিয়ার কথা কও দাদী?'

'পেয়োজন অইলে কাজিয়া করতে অইব। তরা যদি করতে ডরাস তবে ঘরে বইসা থাকিস। আমিই দাদী আগাইয়া। এই যে রমজানের বাপ, আমার পোলাটা ভুঁইয়ার মাইর খাইয়া মরল, হেই শোধ তুলুম। ওই ভুইয়ারই তো ভাই মহাজন।'

এবার ওসমানের গলাটা উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'মরতে আমরা ডরাই নিকি? কও কি তুমি নানী? আমরা না মুসলমানের ছাও। কাজিয়া আমাগো লউতে (রক্তে) আছে। না না, ওই পার থিকা আইসা আমাগো ঘরের ধান নিয়া যাইব, কেমুন কেরামতি দেখুম মহাজনের।'

ধীরে ধীরে রাত্রিটা ঘন কালো হয়ে যায়।

বুড়ি দাদীর কথা জমায়েতের মানুষগুলোর সামনে কঠিন প্রতিজ্ঞার মতো, আশ্বাসের মতো জ্বলতে থাকে— 'পেয়োজন অইলে কাজিয়া করতে অইব না?'

কয়েক দিন পরের কথা। সকালবেলা সুখী বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে ছিল। পাশে রমজান। শিশুটাকে কোলে তুলে নাচাতে নাচাতে সে বলে, 'তোমার পোলাটা দেখতে জবর সৌন্দর অইচে। ঠিক তোমার লাখান নাকমুখ চোখা অইব। বড় অইলে মিলাইয়া নিও।'

সুখী চমকে ওঠে। তীক্ষ্ণ নজরটা শিশুটার মুখের ওপর রেখে ছদন শিকদারের আদল খুঁজতে থাকে। ছদনের রক্ত-কলঙ্কের কোনো চিহ্ন কি লেগে আছে ওর মুখে? সেই আদিম কুৎসিত রাত্রিগুলো কোনো অপবিত্র ছায়া ফেলেছে কি? দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানা ভরে গেল সুখীর। না না, ওই নিষ্পাপ মুখে ছদন শিকদারের অপরাধ লেগে নেই।

সুখী বলে, 'না রে ভাই, অর মুখ ঠিক অর মামুর লাগান অইচে।' এদের সঙ্গে নিজের জীবনকেও এই চরের মাটিতে একাকার করে মিশিয়ে-দিয়েছে সুখী। অনেক দূরের একটা ছায়াভরা মিষ্টি গ্রাম, সেখানে ছোট্ট ঘরের মধ্যে সাদা থান-পরা কে এক বিধবা সারাদিন খট খট করে তাঁতের মাকু চালাত, সেই ছবিটা আজ অসত্য, অবাস্তব মনে হয়। আজ তার পরিচয়, অন্তত এই চরের ছোট্ট পৃথিবীটা জানে, এই জনপদ সেই পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে—সে মা, সে সন্তানের জননী।

আরো ক'দিন পর চরের ওপর দিয়ে খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এই নগণ্য জনপদটা প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়ে উঠল। মহাজন এসেছে চরে।

পড়ন্ত বিকেল। ঈশানী আকাশে সাপের চোখের মণির মতো কালো মেঘ জমেছে। মেঘনা মেতে উঠতে শুরু করেছে।

ঘরের ভেতর বসে বুড়ি দাদী শিশুটার জন্য একটা কাঁথা সেলাই করছিল। বাইরে বেরিয়ে উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওসমান, রুস্তম—তরা অহনও বইসা রইছস! ব্যাপারখান কী?'

এইসময় রমজান নদীর ঘাট থেকে ফিরে এল। হেসে বলল, 'ডর নাই দাদী, ধান নিতে আহে নাই মহাজন। কুটুমবাড়ি যাইতে আছিল তিন বিবি নিয়া। আসমানে ম্যাঘ দেইখ্যা চরে নামছে। ম্যাঘনা যা খেপছে!'

বুড়ি দাদী সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'ঠিক তো?'

'হ হ—'

মেঘের ছায়ায় এই পড়ন্ত বিকেলটা কেমন যেন আবছা হয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে রুস্তম মহাজন এবং তার তিন বিবিকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে এসেছে। জলচৌকি পেতে বসিয়েছে।

এ ঘর থেকে সুখী মহাজনের গলাটা নির্ভুল ভাবে শুনতে শুনতে চমকে উঠল। গলাটার সঙ্গে তার পুরোপুরি এক বছরের পরিচয়। ছদন শিকদারকে এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায় না। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটা বাদুড়ের কালো ডানার মতো মনের মধ্যে দুলতে লাগল। সুখীর চোখজোড়া হিংস্র হয়ে উঠল, জ্বলতে লাগল। ঘুমন্ত শিশুটাকে জাগিয়ে বুকে তুলে পাশের ঘরে চলে এল সে।

ছদন শিকদার তখন বলছিল, 'কর্জের ট্যাকা আর বীজধান আমার আউশের আয়ামেই চাই —' বলতে বলতে গলাটা আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল। হঠাৎ নজরটা আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে সুখীর কোলের সেই ছোট্ট শিশুটার মুখে আটকে যায় তার।

তমিজ আর হালিম মহাজনের নৌকোর মাল্লা। তারাও এসেছে। দু'জনে উঠে সুখীর পাশে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত গলায় বলল, 'তুমি অহনও বাইচা আছ সুখী বুইন! কি আশ্চয্যি!'

'হ, আছি তো। এই দেখ, তোমাগো কেমুন সোন্দর ভাইগনা (ভাগনে) অইচে।'

শিশুটা ফিক করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে অনেকগুলো গোক্ষুর সাপের উদ্যত ফণা একসঙ্গে যেন দেখতে পেল ছদন শিকদার। আড়চোখে তিন বিবির দিকে তাকাল। বড় বিবির মেজাজ বাঘিনীর মতো। মেজো বিবির মেজাজ নেই, কিন্তু নখের ধার শিকারি বেড়ালের মতো, আর ছোট বিবিকে এই সেদিন নিকা করেছে ছদন। বুড়ো বয়সের কাঁচা বিবি। গোসা হলে কাছেই ঘেঁষবে না। এই মুহূর্তে শিশুটার জন্মের ইতিহাস জানতে পারলে তিনজনই তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভয়ে আতঙ্কে ছদনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। ফিসফিস গলায় বলল, 'কর্জের ট্যাকা আর বীজধান দিতে অইব না তুমাগো। আমি অহন যামু।'

সুখী ছোট্ট শিশুটাকে ধারাল হাতিয়ারের মতো সামনে তুলে ধরে বলল, 'আমাগো আরো পাচ শ ট্যাকা দিতে অইব।'

আড়ষ্ট গলায় ছদন বলল, 'দিমু।' তারপর তমিজ এবং হালিমের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঘাটে গিয়া নাও খোল, আমি ম্যাঘের মইধ্যেই গেরামে ফিরুম।'

একটা বাজ পড়ল যেন আচমকা। তমিজ এবং হালিম—তারাও নিরন্ন মাঝি। মাত্র কয়েকটা টাকার জন্য ছদন শিকদার তাদের দিয়ে মানুষ খুন করায়। সেই মানুষ-মারা রক্তাক্ত টাকাও আবার ঠিকমতো দেয় না। সহজ আদায়ের অধিকার ছেড়ে তারা যাবে না।

হালিম বলল, 'আমরা অহন যামু না ধলা মিযা।'

'কহন যাবি?'

'রবিবার। সুখী বুইনের লগে এক্কেবারে ট্যাকাটা আনতে যামু। আপনেই যান গা বিবিজানগো নিয়া।'

ছেলেটাকে সুখীর কোল থেকে একেবারে বুকের ওপর তুলে নিল তমিজ। আদায়ের পথটা কি চমৎকার ভাবেই না মসৃণ করে দিয়েছে শিশুটা!

আগামী রবিবারই শুধু তারা যাবে না। শিশুটাকে শাণিত হাতিয়ারের মতো সামনে তুলে নির্ভুল পা ফেলে তারা যাবে আরো, আরো অনেক বার।

গ্রন্থ-পরিচয়

নোনা জল মিঠে মাটি : পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি লেখক আন্দামান গিয়েছিলেন। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একশ' কুড়ি মাইল দূরে উত্তর আন্দামানের ডিগলিপুরে তখন পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। হাজার বছরের জঙ্গল নির্মূল করে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামের পর কিভাবে সর্বস্বহারানো ছিন্নমূল মানুষেরা নতুন বসতি গড়ে তুলল, লেখক তার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সেই দুর্গম দ্বীপে বহুদিন কাটিয়ে এসেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে 'নোনা জল মিঠে মাটি'। সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে এই উপন্যাসটি প্রকাশ করে 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স'। তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর 'দে'জ পাবলিশিং' এটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে 'দে'জ'-এর তৃতীয় মুদ্রণ চলছে। উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক প্রয়াত প্রেমেন্দ্র মিত্র। উৎসর্গ তাঁকেই করা হয়েছে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি পাঠকের বিপুল সমাদর লাভ করে। সুখ্যাত নাটকের দল 'শৌভনিক' এটির নাট্যরূপ দিয়ে শতাধিক রজনী মঞ্চস্থ করে। 'গুরুদাস' সংস্করণের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সুবোধ দাশগুপ্ত। 'দে'জ' সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী গৌতম রায়।

এখানে পিঞ্জর : এই উপন্যাসটি 'উল্টোরথ' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। গ্রন্থাকারে এটির প্রথম প্রকাশক 'বেঙ্গল পাবলিশার্স'। কয়েকটি সংস্করণ শেষ হবার পর বর্তমানে 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে প্রকাশিত লেখকের একটি রচনা সংকলন 'মানুষের মহিমা'য় এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রণবেশ মাইতি। উৎসর্গ : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, প্রিয়বরেষু। যাত্রিক গোষ্ঠী এই উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। প্রধান ভূমিকাগুলির শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার, অপর্ণ সেন, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায় এবং আরো কয়েকজন নাম-করা অভিনেতা ও অভিনেত্রী। ছবিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

আলোয় ফেরা : এই উপন্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে 'জীবন যৌবন' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। পরে আদ্যোপান্ত নতুন করে লেখার পর 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটির পঞ্চম সংস্করণ চলছে। উৎসর্গ : গিরীন্দ্র সিংহ'র স্মৃতির উদ্দেশে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন রবীন দত্ত। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রী তপন সিংহ 'রাজা' নাম এই উপন্যাসের ভিত্তিতে একটি ছবি নির্মাণ করেন। ছবিটি সমাদৃত হয়েছিল।

আমার নাম বকুল : 'প্রসাদ' পত্রিকার একটি পুজো সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। পরে 'দে'জ পাবলিশিং' গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশ করে। বর্তমানে উপন্যাসটির পঞ্চম সংস্করণ চলছে। উৎসর্গ : অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদেষু। দূরদর্শনে এটির ভিত্তিতে একটি জনপ্রিয় সিরিয়াল দেখানো হয়। পরিচালক : বিষ্ণু পালচৌধুরী।

ছোট গল্প : 'রচনা সমগ্র'র এই খণ্ডে চারটি গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'মাঝি', 'চোর', 'রাজা যায় রাজা আসে' এবং 'চর'। 'মাঝি' লেখকের প্রথম গল্প। প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়। 'চোর' এবং 'রাজা যায় রাজা আসে'ও 'দেশ'-এ ছাপা হয়। 'চর' বেরিয়েছিল অধুনালুপ্ত 'মুখপত্র' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়।